হিমালয়

—প্রথম খণ্ড—

শঙ্কু মহারাজ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৮৫

প্রচ্ছদপট
কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিস্তা
অঙ্কন : মণি সেন
(শিল্পীর কন্যা শ্রীমতী নীলিমা রায়ের সৌজন্যে)
বিন্যাস : পূর্ণেন্দু রায়

HIMALAYA VOL I
By
Sanku Maharaj
A collection of travelogues. Published by Mitra & Ghosh Publishers
Pvt. Ltd. 10 Shyama Charan Dey Street. Kolkata 700 073

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাগচী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯ গুলু
ওস্তাগর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে জয়ন্ত বাগচী কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে', 'গহন-গিরি-কন্দরে' ও 'গিরি-কান্তার' লেখকের এই তিনখানি রচনায় গোমুখী ও গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের এবং কৈলাস মানস সরোবর ও রূপকুণ্ড সহ প্রায় সমগ্র কুমায়ুন হিমালয়ের ভ্রমণকাহিনী। 'হিমালয়' গ্রন্থের এই পর্ব উপরোক্ত ক্রম-অনুসারে তিনটি রচনার সম্পূর্ণ সংকলন। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে রচনাগুলির বিষয়সূচী সূচীপত্রের পিছনে উল্লেখ করা হল।

'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহীর মন্তব্য ॥

"I was delighted to hear about your literary work which, I hope, will do something to encourage a spirit of adventure in many more of your countrymen."

Lord John Hunt.
Leader, Successful British Everest Expedition, 1953.

"Wishing you a good success for both your activities, climbing and writing. I hope to have the luck and opportunity of making your acquaintance once. I don't know if I will be able to come back to the Himalayas, because I am getting old."

André Roch
Leader, Successful Swiss Expedition to Satopanth, 1947.

"I am glad for the book and wish your book a success."

Brigadier Gyan Singh.
Leader, First Indian Everest Expedition, 1960.

"My best wishes are with you and I hope that the book would be widely read by a large number of our youth."

Cdr. M. S. Kohli.
Leader, Successful Indian Everest Expedition, 1965.

"...I heartily welcome your new publication venture and wish it all success and wide circulation.
May it inspire enthusiasm into our youngmen to lead more and more expeditions to the scores virgin peaks and beauty spots in the Himalaya, which is not a dead mountain to us but the Lord of mountains, the Divinity Incarnate."

Rev. Swami Pranavananda
F. R. G. S

সূচীপত্র

চতুরঙ্গীর অঙ্গনের বিষয়

গহন-গিরি-কন্দরের বিষয়

গিরি-কান্তার-এর বিষয়

ভূমিকা

শৈলসুনিবিড় আলমোড়ায় বসে বাংলা ১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নিস্তব্ধ গিরিসম্রাটের অভ্রভেদী সংগীত শুনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

হে হিমাদ্রি দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারম্বার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মুরতি।

হিমাদ্রিশেখর নগাধিরাজকে মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে বার বার দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে উপসিত করেছেন। আর কালিদাসের ভাবশিষ্য একালের রবীন্দ্রনাথের কল্পনা হল, হিমশৃঙ্গ যেন কঠিনপ্রস্তরকলেবর মহান দরিদ্র রিক্ত আভরণহীন মহারুদ্র, যার অঙ্গে অঙ্গে পার্বতীলীলা ঃ মৌনের চারপাশে যেন গীত, স্তব্ধকে ঘিরে চঞ্চলের রঙ্গনৃত্য। রিক্ত কঠিনের চরণপ্রান্তে যেমন শ্যামলশোভন কুসুমিত পল্লবের ছায়ারৌদ্র, গিরিশকে ঘিরে তেমনি পার্বতী মাধুরীচ্ছবি।

হিমালয় তাই আজও বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এবং মুখ্যতম বিষয়। এযাবত হিমালয় বিষয়েই যত ভ্রমণ-অভিজ্ঞতামূলক বাংলা বই লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে, হিমালয়-ব্যতিরিক্ত ভ্রমণসাহিত্যের সমগ্র পরিমাণের চেয়ে তা কম নয়। দুর্গমতা, নৈসর্গিক সৌন্দর্য, তীর্থ এবং রহস্যময়তা এই চতুর্বিধ আকর্ষণেই ভ্রমণস্থান পর্যটকপ্রিয় বা পর্যটনযোগ্য হয়ে থাকে। আর এই চারের সর্বোত্তম সমাবেশের নামই হিমালয়। পর্যটকদের কেউ কেউ 'ভ্রমণবিলাসী' বলে থাকেন। একালে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ-সুবিধে ও টুরিস্ট-গাইড-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায় ভ্রমণ কখনো-সখনো 'বিলাসে' পরিণত হলেও হিমালয়ভ্রমণ কিন্তু আজও ভ্রমণকারীদের পরীক্ষাকেন্দ্র। দুর্গমতা দুরূহতা ও দুরারোহত্ব হিমালয়-ত্রিপিটকের তিনটি অধ্যায়ের নাম। অদম্য আকর্ষণ তার উপক্রমণিকা এবং অপার বিস্ময় তার উপসংহার।

হিমালয়ভূমক ভ্রমণকাহিনীতে আমরা দুটি প্রধান বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই। একটি, অচল-শৈলের শৃঙ্গারোহণজনিত দুঃসাধ্য অভিযান-রোমাঞ্চ ; অন্যটি, হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে, 'লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের' মধ্যে, সানু-কান্তার-উপত্যকায় অবস্থিত, কর্মতৎপর সভ্যজগৎ থেকে নিভৃতবর্তী। পার্বত্য জনপদজীবন কিংবা দুশ্চর-গোপন তীর্থক্ষেত্র-মঠমন্দির-দেবস্থান-পুণ্যশিলা দর্শনের বিস্ময়। দ্বিতীয় বিষয়েই হিমালয়-আশ্রিত ভ্রমণকাহিনীর সংখ্যা বেশি, কিন্তু প্রথমটির দিকেও সাম্প্রতিক কালের অভিযাত্রীদের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্বতাভিযানের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর সঙ্গে নানাভাবে পরিচয় ঘটার ফলে সমতট-সমতলের নাগরিক জীবন মাঝে মাঝেই রহস্যজয়ের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত ঊর্ধ্বচর হয়ে উঠতে চায়।

আশা করা যায়, আরো এক দশকের মধ্যে এই বাংলায় এবিষয়ে একাধিক ভ্রমণকথা রচিত হবে।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের যশস্বী লেখক শঙ্কু মহারাজের হিমালয়-সংকলনটি আলোচ্য দুটি বিষয়েরই বর্ণনায় ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে হিমালয়ভ্রমণের পরম্পরায় এটিকে প্রথম সার্থক প্রতিনিধিমূলক সংকলনরূপে স্বাগত জানাই।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতার পর থেকে বাঙালির পর্যটনস্পৃহা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার একটি পরিশীলিত অংশ আমাদের ভ্রমণ-সাহিত্যভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সেই সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়, আমাদের ভ্রমণসাহিত্যও আমাদের ভ্রমণস্পৃহা বাড়াবার অন্যতম কারণ। পৃথিবীর যে দুর্গম দুশ্চর দুরধিগম্যতায় আমার প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে কল্পনাপরিবহনে মানসভ্রমণের জন্যেই তো ভ্রমণসাহিত্য-পাঠ। রবীন্দ্রনাথের সেই বহুশ্রুত উক্তি, সকলেরই স্মরণে আসবে—

> সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
> অক্ষয় উৎসাহে—
> যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
> কুড়াইয়া আনি।
> জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
> পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে॥

আজকাল দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করা কেবল নিষ্ক্রিয় অবকাশভোগীর গার্হস্থ্য সুখসম্ভোগ নয়—এখন তা ভ্রমণকারীর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়, টুরিস্ট-গাইড, পথনির্দেশক, যাত্রার প্রেরণা, স্বয়ং-দিগ্‌বিজয়ের স্বরাজপাঞ্জা। শঙ্কু মহারাজ এই ব্যাপারে যেন অদ্বিতীয় লেখক। তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত মোট গ্রন্থসংখ্যা তেতাল্লিশটি, তার মধ্যে উনচল্লিশটিই ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ; আর তার এক তৃতীয়াংশ, মোট চোদ্দটিই হিমালয়-ভ্রমণকথা। যদিচ তিনি নিতান্তই গৃহোপজীবী নাগরিক মানুষ, কিন্তু ভ্রমণ তাঁর স্নায়ুর তাপে, দেহের জীবকোষে, ধমনীর স্পন্দনে মিশে আছে। তাই বার বার তিনি পথিকবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং সেই অভিজ্ঞতার উৎসবে সকলকেই আমন্ত্রণ জানান। এই আতিথেয়তাই তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ। তাঁর গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠাই তাঁর পথচলার রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা, দৃষ্টির আনন্দকথা, শ্রুতির উত্তেজনা। আবার সেই সঙ্গে তাঁর গ্রন্থে থাকে গম্যস্থানের একটি সুবর্ণিত সুনির্দেশিত মানচিত্র, থাকে গন্তব্যের পারিপার্শ্বিকের যাবতীয় জিওফিজিক্যাল বিশেষত্ব, পূর্ব-অভিযানের নাড়িনক্ষত্রের খবর। ভ্রমণের কালিদাসের সঙ্গে ভ্রমণের মল্লিনাথকে আমরা একই গ্রন্থে পাই। তিনি একাধারে ভোক্তা ও বেত্তা, উন্মেষকার ও ভাষ্যকার, পরিব্রাজক ও পরিদর্শক। তাই তাঁর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতামূলক গ্রন্থপাঠে দর্শনীয় স্থানগুলি যথাযথ পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সূর্যস্নাত রূপালি শিবলিঙ্গ শিখর, ভয়াল সুন্দর সতপন্থ, বাসুকি হিমবাহ, ব্রহ্মকমলে সুরভিত অনামা অঞ্চল, কুমায়ুনের রমণীয় সোমেশ্বর উপত্যকা, স্বাস্থ্যবান কৌশানী, পিণ্ডারী হিমবাহ, করবেট ন্যাশনাল পার্ক—এ সবের বিবরণ আমাদের কাছে ধারাবাহিক পারম্পর্যে শোভমান হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে হিমালয়ের মঠে-মন্দিরে-গুম্ফায়

গিরিকন্দরে অতীত ও বর্তমানের ইতিহাসও জানা হয়ে যায় পাঠকের। ভ্রমণসাহিত্যের এই বিশেষ রীতিটি পূর্বসূরীর দ্বারা সূচিত হলেও শঙ্কু মহারাজই গত দুই দশকের বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের এই বিশিষ্ট লিখন-শৈলীটির শিল্পিত প্রবর্তনা ও সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' থেকেই তাঁর হাতে এই বিশেষ রচনারীতির অনায়াস স্বচ্ছন্দ প্রবাহ পরবর্তী ভ্রমণসাহিত্যের লেখকদেরও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

শঙ্কু মহারাজের গ্রন্থে তথ্যচয়নের নৈপুণ্য আমাদের বিস্মিত করে। দ্রষ্টব্যের সুচারু বিন্যাস, ইতিহাস-প্রসঙ্গের কথকতাময় উপস্থাপনা, নানা প্রাচীন শিল্প-স্থাপত্যের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা, কিংবা কোনো শৃঙ্গে অভিযানের পূর্ববৃত্তান্ত, পর্বত-বিশেষ বা পথ-বিশেষ সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের অভিমত— তাঁর ভ্রমণসাহিত্যের সঙ্গে এইসব তথ্যের নামাবলী থাকে বলেই সে পথিকটিকে চিনতে দেরি হয় না। অথচ এই সুযোগে বিশেষ সপ্রশংস কণ্ঠেই বলতে ইচ্ছে করে, এই পদ্ধতির সাফল্য রচনারীতির সংযম ও মাত্রাজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল যা পরবর্তী অনেক লেখকই রক্ষা করতে পারেন না।

হিমালয়-ভ্রমণের তিনটি পর্ব বা অধ্যায় হতে পারে। সাধারণত হিমালয়-ভ্রমণ বলতে আমরা বুঝি তার রমণীয় শৈলাবাসগুলিতে ভ্রমণ। কিন্তু শুধু শৈলনগরী ক্রোড়পত্রই পূর্ণ হিমালয় নয়। এখান থেকে শুরু দ্বিতীয় অধ্যায়ের, যার সমাপ্তি কোনো দুর্গমতম তীর্থে, কিংবা নদীর উৎসে, হিমবাহে, বিপদসংকুল গ্লেসিয়ারে—যেমন গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। হিমালয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য এইসব অঞ্চলেই—এখানে না পৌঁছলে যথার্থ হিমালয়কে দেখা যায় না। হিমালয়ের শেষ অধ্যায় তার আকাশচুম্বী মেঘস্পর্শী গিরিশৃঙ্গে তুষারশীর্ষে। হিমবাহ অঞ্চল থেকে শুরু সেই শৃঙ্গারোহণ-পর্ব। পর্বতবিজয়-অধ্যায় হিমালয়-ভ্রমণের শেষ কাণ্ড। এই শেষ অংশ সাধারণ পর্যটকদের পক্ষে সাধ্য হয় না, কারণ পর্বতাভিযান বিশেষ অনুশীলন ও ব্যয়সাপেক্ষ।

শঙ্কু মহারাজের হিমালয় বইটি হিমালয়-ভ্রমণের সেই তিনটি দিককে নিয়েই গড়ে উঠেছে। এই সংকলনের 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' হিমালয়-ভ্রমণের শেষতম অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত। উত্তরহিমাদ্রির দুর্গমসুন্দর সতপন্থ শৃঙ্গ-অভিযানের এই বিবরণ পাঠকদের রোমাঞ্চিত করে। ১৯৪৭ সালে একটি সুইস অভিযাত্রীদল সতপন্থ বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু বক্ষ্যমাণ অভিযানে লেখক ও তাঁর সহযাত্রীরা প্রতিকূল প্রকৃতিকে জয় করতে পারেন নি। পরিবর্তে একটি অনামী শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন তাঁরা এবং রাধানাথ শিকদারের স্মরণে তার নামকরণ করেছেন রাধানাথ পর্বত। ভারতাত্মা হিমালয়ের দুর্গমতম গোমুখী তীর্থ থেকে চতুরঙ্গীর অঙ্গনে যাত্রার প্রতিটি শঙ্কাতুর রহস্যভয়াল অথচ নয়নমোহন পর্ব পাঠককে কখনো কখনো রুদ্ধশ্বাস করে। 'গহন-গিরি-কন্দরে' গ্রন্থের অভীষ্ট শৈলজনপদ কুমায়ুন—সেই সঙ্গে পিণ্ডারী কৌশানী কৈলাস-মানসসরোবর নৈনিতাল ভাওয়ালী-ভীমতাল মায়াবতী রাণীক্ষেত রামগড় সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা জন্মায় পাঠকদের মানচিত্রে ও মানস চিত্রে। 'গিরি-কান্তার' রহস্যময় ও সুপ্রসিদ্ধ রূপকুণ্ড অভিযানের বিবরণ। ত্রিশূল পর্বতের পাদদেশে স্থাপিত এই

রূপকুণ্ডের তীরে সমাহিত কোন প্রাক্তন শতাব্দীর অভিশপ্ত যাত্রীদলের দেহাস্থি ভগ্নাবশেষ তাঁরা দেখতে পাননি, কিন্তু তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করে এসেছেন সর্বকালের নির্ভীক অভিযাত্রীর বীরাঞ্জলি।

আসামের ডিব্রুগড় থেকে গুজরাটের বেট-দ্বারকা, সিকিমের সিনিয়লচু থেকে হিমাচলের কৈলাসশৃঙ্গ, লাদাখের হেমিস গুম্ফা থেকে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো মন্দির—অখণ্ড ভারতের এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড শঙ্কু মহারাজের এতাবৎ-প্রকাশিত ভ্রমণসাহিত্যের পটভূমি। এছাড়া ইউরোপ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা তাঁর ভ্রমণসাহিত্যের সূচীপত্রকে দীর্ঘতর করেছে। এক্ষেত্রে কেবল ভারততীর্থের এই একনিষ্ঠ পরিব্রাজকের হিমালয় ভ্রমণকাহিনী থেকে তিনটি গ্রন্থ নিয়ে হিমালয়-ভ্রমণের 'গোমুখী ও রূপকুণ্ড' নামক প্রথম পর্বটিকে আমি সানন্দে পাঠক-পাঠিকাদের প্রীতিপ্রসন্ন করপুটে উপহার দিচ্ছি।

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে

(গোমুখী, গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও চতুরঙ্গী হিমবাহ এবং কালিন্দীখাল)

To

The Most Rev. Dr. H. L. J. DeMel
Bishop of Calcutta and Metropolitan
of
India, Pakistan, Burma and Ceylon
Who had been
the sole incarnate of this high adventure
through all its trials and tribulations.

স্থান—দেওয়ান-ই-খাস, ফতেপুর সিক্রী।

কাল—শরতের এক অপরাহ্ণ—পনেরোশ' আশি খ্রীষ্টাব্দ।

পাত্র-মিত্র-অমাত্য, মন্ত্রী সেনাপতি ও সভাসদসহ শাহানশাহ্ আকবর। বাদী-প্রতিবাদী, অর্থী-প্রার্থী, পন্ডিত, মৌলভী ও মিশনারীরা বহুক্ষণ হল বিদায় নিয়েছেন। কেবল প্রহরীরা বাইরে পায়চারি করছে। দৈনন্দিন দরবার শেষ হয়ে গেছে। তবু সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেননি—খোয়াবগাহের দিকে পা বাড়াননি, এমন কি ইবাদতখানার বৈঠকও বসেনি। সম্রাটের চোখে-মুখে কৌতূহল। তিনি প্রতীক্ষা করছেন।

আকবর—বীরবল, এত দেরি হচ্ছে কেন?

বীরবল—জাহাঁপনা, যে অভিনন্দনের আয়োজন করা হয়েছে তাতে তার এখানে পৌঁছতে একটু দেরি তো হবেই।

আকবর—কারা এ আয়োজন করল?

আবুল ফজল—প্রজাসাধারণ রইস্ রায়ত, হিন্দু-মুসলমান, সকলেই আছেন।

আকবর—কি রকম আয়োজন?

টোডরমল—সমস্ত প্রধান পথের সংযোগস্থলে সুসজ্জিত তোরণ। পথের দুধারে অভূতপূর্ব জন-সমাবেশ। প্রতি গৃহের অলিন্দে পুরনারীরা ফুল ও মালা হাতে উৎসবের সাজে প্রতীক্ষারতা। শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করে তারা সেই বাহাদুর নওজোয়ানকে অভিনন্দিত করবে।

ফৈজী—সরকারের তরফ থেকেও তাকে অভিনন্দিত করা উচিত। আগামীকাল তানসেনকে দিয়ে দেওয়ান-ই-আমে একটা মহ্ফিলের বন্দোবস্ত করা হোক্।

আকবর—উত্তম প্রস্তাব। ব্যবস্থা কর।

কোলাহল মিশ্রিত জয়ধ্বনি ভেসে আসে। সকলেই সচকিত হয়ে উঠলেন। অনতিকাল পরেই মহাবীর মানসিংহের সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবক দেওয়ান-ই-খাসে প্রবেশ করে। তার মাথায় উষ্ণীষ। তাতে ময়ূরের পালক। কপালে চন্দন-তিলক। গলায় অসংখ্য মালা। পরনে নূতন পোশাক—যোধপুরী পায়জামা ও মখমলের শেরওয়ানী। সে সম্রাটকে কুর্নিশ করে।

আকবর—তোমার শরীর কেমন আছে?

যুবক—আপনার আশীর্বাদে এখন ভালই, তবে যাবার পথে বারদুয়েক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

আকবর—পথের কথা পরে শুনছি। আগে বল, গঙ্গার উৎস দেখতে কেমন?

যুবক—জাঁহাপনা, গরুর মুখের মতো।

বীরবল—গরুর মুখ.....

যুবক—হ্যাঁ, গোমুখী।

"এ কি ! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, চলুন। অনেকটা পথ যেতে হবে।" স্বপন তাগিদ দেয়।

ফতেপুর সিক্রী অদৃশ্য হয় আমার মানসপট থেকে। মিলিয়ে যায় ষোড়শ শতাব্দী। আমি ফিরে আসি বিংশ শতাব্দীর গোমুখীতে।

গোমুখী তীর্থযাত্রীর শেষ কিন্তু পর্বতাভিযাত্রীর শুরু। তাই স্বপন তাগিদ দিচ্ছে। গোমুখীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই আমার। আমাকে যেতে হবে এগিয়ে দুর্গম তীর্থ ছাড়িয়ে দুস্তর হিমালয়ে।

দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই, তাই চলতে শুরু করি। চলেছি চতুরঙ্গীর অঙ্গনে, আমাদের সতপন্থ অভিযানের মূল-শিবিরে।

চতুরঙ্গী হিমবাহ গোমুখী (১২,৭৭০ফুট) থেকে প্রায় মাইল ছয়েক পূর্বে গঙ্গোত্রী হিমবাহে এসে মিলিত হয়েছে। সেই সঙ্গমেই স্থাপিত হবে আমাদের মূল-শিবির। আমরা মূল-শিবিরে চলেছি। চলেছি চতুরঙ্গীর অঙ্গনে।

চলতে থাকি, কিন্তু ভাবনা বন্ধ হয় না। চতুরঙ্গী বা সতপন্থ নয়, গোমুখীর ভাবনা। দূর থেকে গঙ্গার উৎসকে গরুর মুখের মতো দেখায়। কবে থেকে, তার কোন ইতিহাস নেই। ইতিহাস বলে--মহামতি আকবর একজন হিন্দু পরিব্রাজককে পাঠিয়েছিলেন এই উৎস দেখতে। বিস্মৃত অতীতের পরে, এই উৎস-দ্বারে সেই সম্ভবতঃ মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। আর আশ্চর্য, আপাতদৃষ্টিতে দূর থেকে আজও সে দেখতে গরুর মুখের মতো।

গঙ্গার উৎস গোমুখী। সেকালে সবাই বলত, একালেও বলে। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। গঙ্গা নয়, ভাগীরথী—গঙ্গার একটি ধারা। অলকানন্দা, মন্দাকিনী ও ভাগীরথীর মিলিত ধারা গঙ্গা।

অলকানন্দা সৃষ্ট হয়েছে বদ্রীনাথের উত্তর-পশ্চিমে খাদুঁ খড়ক ও অলকাপুরী পর্বতশ্রেণীর সানুদেশ থেকে। খড়ক শব্দের অর্থ হিমবাহ। খাদুঁ খরক সতপন্থ শৃঙ্গের অপর পাশে অর্থাৎ পূর্বদিকে অবস্থিত। সেদিক থেকে শৃঙ্গে আরোহণের পথ নেই। তাই বদ্রীনাথ না গিয়ে গঙ্গোত্রী এসেছি—চলেছি চতুরঙ্গীর অঙ্গনে।

সতপন্থের প্রায় মাইল ছয়েক দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের উচ্চতম শৃঙ্গমালা চৌখাম্বা—চারটি শৃঙ্গের এক দুর্ভেদ্য পর্বত-প্রাচীর। উচ্চতম শৃঙ্গটি ২৩,৪২০ ফুট উঁচু। ১৯৫২ সালে এক ফরাসী অভিযাত্রীদল এই শৃঙ্গে আরোহণ করেন। সাত বছর বাদে ১৯৫৯ সালের ১৭ই অক্টোবর এয়ার কমডোর এস. এন. গয়ালের নেতৃত্বে সর্বশ্রী এ. কে. চৌধুরী, পি. সি. চতুর্বেদী, সি. পি. রাওয়াত ও পাসাং দাওয়া লামা এই দুর্গম শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহ সৃষ্ট হয়েছে সেই চৌখাম্বা শৃঙ্গমালার তুষারপ্রবাহ থেকে। তারপরে প্রবাহিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিমে। এটি গাড়োয়াল হিমালয়ের দীর্ঘতম হিমবাহ—১৬ মাইল। এশিয়ার দীর্ঘতম হিমবাহ কারাকোরামের সিয়াচেন—৪৫মাইল। আর মেরু-অঞ্চলে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম হিমবাহ—দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ মাইল।

বলা বাহুল্য দুপাশের পর্বতশৃঙ্গ থেকে ছোট-বড় বহু হিমবাহ এসে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে সমৃদ্ধ করেছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের দুদিকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে নানা পর্বতশৃঙ্গ। পশ্চিমদিকে রয়েছে মন্দানী পর্বত (২০,৩২০), সুমেরু পর্বত (২০,৭৭০), খর্চাকুণ্ড (২১,৬৯৫), ভারতখুণ্টা (২১,৫৮০), কীর্তিস্তম্ভ (২০,৫১০), কেদারনাথ পর্বত (২২,৭৭০) ও শিবলিঙ্গ (২১,৪৬৬)। মন্দনী থেকে মন্দানী বামক, খর্চাকুণ্ড থেকে গনহিম বামক ও কীর্তিস্তম্ভ থেকে কীর্তি বামক এসে পড়েছে গঙ্গোত্রী হিমবাহে। বামক শব্দের অর্থও হিমবাহ। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পূর্বে যে

সব শৃঙ্গ রয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করতে হয় স্বচ্ছন্দ (২২,০৫০ফুট), সতপন্থ ও ভাগীরথীর কথা। এই দিক থেকেও চারটি হিমবাহ এসে মিশেছে গঙ্গোত্রীতে। প্রথমটির নাম নেই। তারপরে স্বচ্ছন্দ, চতুরঙ্গী ও রক্তবরণ হিমবাহ।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রায় কেন্দ্রস্থলে পশ্চিমদিকে অবস্থিত কেদারনাথ পর্বত—মন্দাকিনীর জন্মস্থান। কেদারনাথ পর্বতের পশ্চিমে কীর্তিস্তম্ভ। এই পর্বত থেকে সৃষ্ট হয়েছে কীর্তি হিমবাহ্। সে কেদারনাথ পর্বতের পাশ দিয়ে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথী পর্বতের বিপরীত দিকে গঙ্গোত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সঙ্গমের উত্তরদিকে দাঁড়িয়ে আছে মহান শিবলিঙ্গ। আমরা এই কীর্তি হিমবাহ দিয়েই কেদারনাথ শৃঙ্গে অভিযান চালিয়েছিলাম গত বছর। কিন্তু সেকথা এখন থাক।

কেদারনাথ পর্বতের অপর দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে কালীগঙ্গা বা চোরাবারি হিমবাহ্। এই হিমবাহের শেষপ্রান্তে চোরাবারিতাল থেকে সৃষ্ট হয়েছে মন্দাকিনী। মন্দাকিনী উপত্যকাতেই করুণাময় কেদারনাথের মন্দির। মন্দির থেকে মন্দাকিনীর উৎস প্রায় তিন মাইল।

দুর্গম বলেই এমন, নইলে তিন তীর্থ ও তিন উৎসের দূরত্ব বেশি নয়। একই হিমবাহ অঞ্চলের তিনদিকে তিন তীর্থ—ব্রহ্মাতীর্থ গঙ্গোত্রী, বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনাথ ও মহেশ্বরতীর্থ কেদারনাথ। তিন তীর্থ তিন ধারার উৎস। একই হিমবাহ্ অঞ্চলে সৃষ্ট ভাগীরথী, মন্দাকিনী ও অলকানন্দা। রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে মন্দাকিনী মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে। মিলিত ধারার নাম অলকানন্দা। আর ভাগীরথী ও অলকানন্দা মিলিত হয়েছে দেবপ্রয়াগে। একই হিমবাহ অঞ্চলে সৃষ্ট তিন ধারা আবার এক হয়েছে, আর সেই মিলিত ধারাই গঙ্গা। কাজেই গোমুখী নয়, দেবপ্রয়াগই গঙ্গার জন্মস্থান। গোমুখী ভাগীরথীর উৎস।

আকবরের আমলের গোমুখী আর আজকের গোমুখী এক নয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষপ্রান্তে Glacier-Snout মানে হিমবাহ-নাসিকা বা তুষারবিবর গোমুখী। অন্যান্য হিমবাহের মতো গঙ্গোত্রী হিমবাহও গলছে, তার দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে। ভগীরথের সময়ে এই স্নাউট ছিল গঙ্গোত্রীতে। অর্থাৎ ইতিমধ্যে গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রায় বারো মাইল গলে গেছে। প্রত্যেক হিমবাহই এইভাবে গলে যাচ্ছে। এই ক্ষয়ের গতি ক্রমেই বাড়ছে। ফলে এমন একদিন আসবে, যেদিন বিশ্বের সমস্ত হিমবাহ গলে যাবে। তবে সেদিনের কথা ভেবে শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই—সেদিন আমরা কেউ থাকব না।

পূর্ত-বিশারদ ভগীরথ ও তাঁর ষাট হাজার সহকর্মী ঠিক কতকাল আগে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে ভাগীরথী নদীর সৃষ্টি করেছিলেন, তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে অনেকের মতে সেটি খ্রীস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দের ঘটনা। এবং তখন বোধহয় গঙ্গোত্রী হিমবাহ গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ছ'হাজার বছরে হিমবাহ বারো মাইল কমে গেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, প্রতি হাজার বছরে দু' মাইল করে কমেছে।

১৯৩৫-৩৬ সালে Major Gordon Osmaston -এর নেতৃত্বে এ অঞ্চলের প্রথম সরকারী জরিপ করা হয়। কেবল এ অঞ্চল নয়, ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে সমগ্র কুমায়ুন হিমালয়ের বিশদ জরিপকার্য সুসম্পন্ন হয়। সে আমলে কুমায়ুন হিমালয় বলতে শতদ্রু থেকে গঙ্গা ও পিণ্ডার নদী এবং নেপাল-তিব্বত সীমান্ত থেকে সিমলা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে বোঝাতো।

কিন্তু কুমায়ুন হিমালয় নয়, আমি ভাবছি গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের কথা—ভাগীরথী,

মন্দাকিনী ও অলকানন্দা উপত্যকার ওপরে (Upper Bhagirathi Basin) যে অঞ্চল। চৌখাম্বা থেকে গোমুখী এবং কালিন্দী থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত অসংখ্য ছোট-বড় শৃঙ্গমালা ও হিমবাহে পরিপূর্ণ যে ভূভাগ।

জিওলজিক্যালসার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার ভূতাত্ত্বিক J. B. Auden ১৯৩৭ সালে গোমুখীর ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্পূর্ণ করেন। আমাদের ভূতাত্ত্বিক অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের মতে, তখন গোমুখী যেখানে ছিল, এখন তার থেকে প্রায় দু' ফার্লং পেছিয়ে গেছে। অর্থাৎ বত্রিশ বছরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ দু' ফার্লং কমে গেছে। সেই হিসেবে গঙ্গোত্রী থেকে ক্ষয়কার্যটি হাজার দেড়েক বছর আগে শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু সম্ভবতঃ শুরু হয়েছে আরও আগে। প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর উত্তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই হিমবাহসমূহের ক্ষয়ের গতিও বাড়ছে। বিগত বত্রিশ বছরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ যতখানি গলেছে, তার আগের বত্রিশ বছরে ততটা গলেনি এবং পরবর্তী বত্রিশ বছরে আরও বেশি গলবে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ গলছে। সেই সঙ্গে গোমুখীর আকৃতি ও অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। আকবরের সময় গোমুখী যেখানে ছিল, এখন গোমুখী সেখানে নেই। গত বছর (১৯৬৭) কেদারনাথ পর্বতাভিযানের সময় গোমুখীকে দেখে গেছি পশ্চিমমুখী। তাই হওয়া উচিত। কারণ ভাগীরথী এখানে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ আজ গোমুখীকে দেখলাম উত্তর-পশ্চিমমুখী, অর্ধচন্দ্রাকৃতি। দেখতে সে আরও বড় এবং ভয়ঙ্কর হয়েছে। তবে এখনও দূর থেকে দেখলে তাকে গরুর মুখ বলেই মনে হবে। আর তাই আজও সে গোমুখী।

এখান থেকে মাইল আধেক আগে গোমুখীর উত্তর-পশ্চিমে ভাগীরথীর ডানতীরে তাঁবু ফেলেছিলাম আমরা। প্রায় সমতল বালুকাময় বিস্তৃত প্রান্তর —দুভাগে বিভক্ত। মাঝখানে একটি নাতিপ্রশস্ত প্রস্তর প্রবাহ। প্রকৃতির সৃষ্ট সন্দেহ নেই। তবে যে রকম পাথরশূন্য তাতে মনে হয় মানুষের হাত পড়েছে। আর সে মানুষ তীর্থযাত্রী নয়, পর্বতাভিযাত্রী।

তীর্থযাত্রীরা তাঁবু নিয়ে আসেন না। তাই তাঁদের কোন কাজে আসে না ঐ প্রান্তর। তীর্থযাত্রীদের জন্য গোমুখীতে কোনো আশ্রয়ের ব্যবস্থা নেই। অথচ একান্তই থাকা উচিত। আজকাল বহু পুণ্যার্থী প্রতি বছর গোমুখী আসেন। তাঁদের বাস করতে হয় গোমুখীর মাইল তিনেক আগে ভূজবাসাতে—স্বামী বিহারীলালজীর আশ্রমে। আসার সময় পথের ডানদিকে বেশ খানিকটা নিচুতে ভাগীরথীর বেলাভূমিতে অনেকটা জায়গা নিয়ে তাঁর আশ্রম। গোমুখীর প্রায় প্রত্যেক যাত্রী সেখানেই রাত্রিবাস করেন। স্বামীজী যথাসাধ্য সেবা করেন তাঁদের। যাত্রীরা সানন্দে উদ্বৃত্ত খাবার, ওষুধপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম তাঁকে দিয়ে যান। আমরাও গত বছর কেদারনাথ পর্বতাভিযান শেষে সাধ্যমত সাহায্য করেছি তাঁকে। এবারও যা পারি, দিয়ে যাবো। না দিলে তিনি পাবেন কোথায় ? আমাদের জন্যই তিনি ভূজবাসাতে বাস করছেন। যাত্রীদের নিয়েই তাঁর জীবন।

পর্বতাভিযাত্রী ও পর্বতারোহণ শিক্ষার্থীদের অবশ্যই রাত্রিবাস করতে হয় গোমুখীতে। তাই ঐ প্রান্তর দুটিকে সুসমতল করা হয়েছে। করেছেন উত্তরকাশীর নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ। ১৯৬৫ সালে ঐ শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়েছে। এই অঞ্চলেই তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। বছরে সাত-আটবার তাঁদের শিবির ফেলতে হয় গোমুখীতে।

এবারেও আমরা তে-রাত্রি বাস করেছি গোমুখীতে। পুণ্যলাভের লোভে নয়,

পর্বতাভিযানের প্রয়োজনে। আমাদের মালপত্রের ওজন তিন টন। গঙ্গোত্রী থেকে সেই মাল গোমুখী পর্যন্ত বয়ে আনার জন্য অন্তত একশ' জন মালবাহকের দরকার। কিন্তু আমরা উত্তরকাশীতে মাত্র সত্তর জন মালবাহক সংগ্রহ করতে পেরেছি। হরশিল পর্যন্ত বাসে এসেছি। সেখান থেকে গঙ্গোত্রী পনেরো মাইল পথ আসতে কোনো অসুবিধে হয় নি। হরশিলে বারোটি ঘোড়া পাওয়া গিয়েছিল।

উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের রেজিস্ট্রার শ্রী কে. পি. শর্মা বলে দিয়েছিলেন, চীরবাসা অর্থাৎ গঙ্গোত্রী থেকে আরও সাত মাইল পর্যন্ত ঘোড়া আসবে। কথাটা মিথ্যে নয়। বেশ প্রশস্ত রাস্তা। অনায়াসে ঘোড়া চলতে পারে। কিন্তু ঘোড়াওয়ালা রাজী হয়নি। ফলে সত্তর জন কুলিকে নিয়েই আমরা ৭ই সেপ্টেম্বর সকালে গঙ্গোত্রী (১০,৮০০ফুট) থেকে রওনা হয়েছি। বাকি মাল নিয়ে সুজল ও প্রাণেশ দুদিন গঙ্গোত্রী রয়েছে। কোনো অসুবিধে হয়নি ওদের। সেই দুদিন ওরা মাতাজীর অতিথি হয়েছিল। মাতাজী নিজে রান্না করে খাইয়েছেন।

বাঙালী সন্ন্যাসিনী মাতাজী। নাম কৃষ্ণা ভারতী—সুদর্শনা ও বিদুষী। শুনেছি কলকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। আগে ঋষিকেশে থাকতেন। স্বর্গাশ্রমের কাছে গঙ্গার তীরে তাঁর কুঠিয়া আছে। এখন গ্রীষ্মকালে গঙ্গোত্রীতেই থাকেন। এজন্য অবশ্য তাঁকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যে কারণেই হোক্ গঙ্গোত্রীর সাধুসমাজ তাঁকে এখন থাকতে দিতে চান নি। কিন্তু পূজারীরা মাতাজীকে সাহায্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সরকারী সহায়তায় টিকে গেছেন গঙ্গোত্রীতে।

চীরবাসা ডাকবাংলোর ছায়াঘেরা ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে সেদিন আমরা রাত্রিবাস করেছি। ভূর্জ আর চীরগাছে ছাওয়া চীরবাসা ডাকবাংলোটি বড়ই সুন্দর। পথ থেকে অনেক নিচে ভাগীরথীর বেলাভূমিতে অবস্থিত। কিন্তু মাত্র দুখানি ঘর। তাই আমরা তাঁবুতে থেকেছি। আর এই অভিযানে সেই আমাদের তাঁবুতে প্রথম রাত্রিবাস। গঙ্গোত্রীতে আমরা ডাকবাংলোয় ছিলাম।

পরদিন সকালে রওনা হয়ে পাঁচ মাইল পথ পেরিয়ে দুপুরে গোমুখীতে এসেছি। ত্রিশজন কুলি সেদিনই নেমে গেছে গঙ্গোত্রী। তার পরদিন অর্থাৎ ৯ই সেপ্টেম্বর সুজল ও প্রাণেশ সেই কুলিদের সঙ্গে সব মাল নিয়ে গোমুখী পৌঁছেছে।

গোমুখী পর্যন্ত যে মাল বাইবার জন্য একশ' জন মালবাহকের দরকার হয়েছিল, এখান থেকে সেই মাল চতুরঙ্গীর অঙ্গনে নিয়ে যাবার জন্য অন্তত একশ' পঁচিশ জন মালবাহকের দরকার। মালের ওজন বাড়েনি, উচ্চতা ও পথের দুর্গমতার জন্য মালবাহকের বহন-ক্ষমতা কমে গেছে। তাই গতকাল দলের সমস্ত পর্বতারোহী সদস্য, শেরপা ও মালবাহকরা চতুরঙ্গীর অঙ্গনে গিয়ে কিছু মাল রেখে এসেছে। তারা মূল-শিবিরের স্থান নির্বাচন করে এসেছে। আজ বাকি মালপত্র নিয়ে আমরা চলেছি মূল-শিবিরে—চতুরঙ্গীর অঙ্গনে। আজ ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮।

গোমুখীকে ডাইনে রেখে বড় বড় পাথর পেরিয়ে আমরা ওপরে উঠছি। এবারে আমাকে তিনটি রাত কাটাতে হয়েছে গোমুখী। ফেরার পথেও অন্তত তিন রাত কাটাতে হবে। গত বছর কেদারনাথ পর্বতাভিযানের সময় আট রাত্রি বাস করতে হয়েছিল এখানে। গোমুখী ভারতের দুর্গমতম তীর্থ। শুনেছি দুর্গমতীর্থে রাত্রিবাস করলে নাকি অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় হয়। তাহলে স্বর্গের ব্যাঙ্কে আমার নামে অবশ্যই অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়েছে। এর পরেও ভাবছি

এ বছরে গঙ্গাসাগর মেলায় যাবো। একই বছরে গোমুখী ও গঙ্গাসাগরে স্নান করিলে নাকি মোক্ষলাভ হয়।*

গোমুখী ভারতের দুর্গমতম তীর্থ। কিন্তু এখন এই তীর্থপথের দুর্গমতা সামান্যই অবশিষ্ট আছে। যেভাবে রাস্তা তৈরির কাজ এগোচ্ছে, তাতে মনে হয় ১৯৭০ সালের মধ্যে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বাস আসবে। বিস্ময়কর! কয়েক বছর আগেও একথা কল্পনাতীত ছিল। বিজ্ঞান অকল্পনীয়কে বাস্তবে পরিণত করেছে। বিজ্ঞান ? না, বিজ্ঞান নয়, চীন। ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের পরেই আমরা হিমালয়ের দিকে নজর দিয়েছি। শাপে বর হয়েছে।**

যে যুগে হরিদ্বার কিংবা ঋষিকেশ থেকে হেঁটে গঙ্গোত্রী আসতে হত, সে যুগের কথা ছেড়ে দিলাম। মাত্র এক যুগ আগেও পুণ্যার্থীরা ধরাসু থেকে হেঁটে গঙ্গোত্রী ও গোমুখী আসতেন। তখন ধরাসু থেকে গঙ্গোত্রী ৭৫ মাইল, আর সেখান থেকে গোমুখী ছিল ১৮ মাইল। দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে তাঁরা এই দুর্গম পথ-পরিক্রমা পূর্ণ করতেন। অনেকে তীর্থপথের ধূলিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে স্বর্গলাভ করতেন। তবু যাত্রীরা আসতেন। আসতেন অন্ধ আর খঞ্জ, বৃদ্ধ এবং শিশু, ধনী ও দরিদ্র।

তীর্থ নয়, তীর্থপথ। শ্বাপদসঙ্কুল সেই দুর্গম পথের আকর্ষণেই তাঁরা জীবন তুচ্ছ করে ছুটে আসতেন। পথই যাত্রীদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসত। পথের প্রান্তে পৌঁছে তাঁরা দেবতাত্মা হিমালয়ের আশীর্বাদ লাভ করতেন। পথের প্রীতি পথের তীর্থে প্রশস্ততর হত।

সেই সুন্দর পথের একটুখানি এখনও অবশিষ্ট আছে। একটি দিনের জন্য এখনও গঙ্গোত্রীর যাত্রীরা পদ পরিক্রমার সুযোগ পান। কিন্তু বাস চলতে শুরু করলে, এই পথটুকুও যাবে ফুরিয়ে। গঙ্গোত্রীযাত্রার মৃত্যু হবে, যেমনটি হয়েছে বদ্রীনাথে।

অনেকের ধারণা বাস চলাচল শুরু হলে গঙ্গোত্রী উন্নত হবে। ধারণাটা মিথ্যে নয়। আধুনিক যুগে উন্নতি বলতে আমরা যা বুঝি, তা নিশ্চয়ই হবে গঙ্গোত্রীর। কিন্তু তাতে যাত্রীদের কি লাভ ? গঙ্গোত্রী দার্জিলিং হোক, এ তো কেউ চান না। অনেককে বলতেও শুনেছি, সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনে বদ্রীনাথে মোটরপথ তৈরি করতে হয়েছে। সে-পথে এখন বাস চলে, বলার কিছু নেই। কিন্তু গঙ্গোত্রী তো কোনো সীমান্ত নয়, লংকার পরে বাসপথ তৈরি করার কি প্রয়োজন ছিল ? কেদারনাথ ও যমুনোত্রীর পথেই বা কেন মোটরপথ প্রসারিত করা হচ্ছে ? পায়ে-চলা প্রাচীন পথগুলির সংস্কার করলেই কি যথেষ্ট ছিল না ?

তাঁদের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমার জানা নেই। তাই আমাকে নীরব থাকতে হয়েছে। কিন্তু সে-সব কথা থাক্। আমি ভাবছি গঙ্গোত্রীর কথা। গঙ্গোত্রী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গিরিতীর্থ। হরশিল থেকে পনেরো মাইল হেঁটে আমরা সেদিন সন্ধ্যায় গঙ্গোত্রী পৌঁছেছি। দেখেছি গঙ্গোত্রীর আরও উন্নতি হয়েছে। অনেক নতুন বাড়ি উঠেছে, আরও উঠছে। ১৯৬৬ সালে আগুন লেগে ধর্মশালা ও বাজার পুড়ে গিয়েছিল। বাজারের দোকানঘরগুলি আবার তৈরি হয়েছে। ধর্মশালা নির্মাণও প্রায় শেষ। পোস্ট অফিসের নতুন বাড়ি হয়েছে।

কেবল ভাল নয়, কিছু মন্দও হয়েছে। গঙ্গোত্রী গিরিতীর্থ হলেও সেখানে মানুষ বাস

---

* লেখকের 'গঙ্গাসাগর' দ্রষ্টব্য।

** এখন গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বাস যাতায়াত করছে।

করে। মানুষ যেখানে আছে, সেখানে পলিটিক্স থাকবে না, এ কেমন কথা। কাজেই গঙ্গোত্রীতেও পলিটিক্স জন্ম নিয়েছে।

গঙ্গোত্রীতে প্রধানতঃ দুটি সমাজ—সাধুসমাজ ও পূজারীসমাজ। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। গঙ্গোত্রীর দরিদ্র পূজারীরা প্রায় প্রত্যেকেই মুখীমঠের বাসিন্দা, তাঁরাই মন্দিরের মালিক—যে মন্দিরকে নিয়েই গড়ে উঠেছে গঙ্গোত্রী।

অপর পক্ষে সাধুরা সকলেই প্রায় অবস্থাপন্ন। প্রায় প্রত্যেক সন্ন্যাসীরই কিছু ধনী শিষ্য আছে। কাজেই তাঁরা পূজারীদের কর্তৃত্ব মেনে নেন নি। ফলে শুরু হয়েছে সংঘর্ষ।

কিন্তু এর ব্যতিক্রম আছে। গঙ্গোত্রীতে এমন কয়েকজন সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা পলিটিক্সের ধার ধারেন না। তাঁরা কারও সঙ্গে কলহ করেন না। তাঁদের কাছে প্রত্যেক মানুষই পরম প্রিয়। তাঁরা পূজারীদের পরম বন্ধু। যাত্রীদের যথাসাধ্য সেবা করেন। এঁদের প্রসঙ্গে প্রথম মনে পড়ে স্বামী সারদানন্দের কথা। দক্ষিণ-ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার। প্রথম যৌবনে যাঁকে ভালোবেসেছিলেন, তাঁকে পেলেন না জীবনে। বিরহী প্রেমিক চলে এলেন হিমালয়ে। অভিভাবকরা হার স্বীকার করলেন। তাঁরা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এলেন। প্রেয়সীকে নিয়ে তাঁকে সুখী হতে বললেন। কিন্তু সুখ সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিবর্তন হয়েছে ততদিনে। জীবনের অর্থ তখন তাঁর কাছে ভিন্নতর। যাঁকে না পাওয়ার ব্যথায় যুবক সারদানন্দ হিমালয়ে এসেছিলেন, হিমালয়ের জন্য তিনি তাঁর সেই প্রিয়তমাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করলেন।

সারদানন্দ স্বামী শিবানন্দের শিষ্য। তিনি ঋষিকেশ শিবানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষপদে মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু বেশি দিন তিনি সেই পদে থাকতে পারেন নি। সম্ভবতঃ সেখানেও পলিটিক্স ছিল, আর তাই তিনি চলে আসেন গঙ্গোত্রীতে। ইদানীং সেখানেও পলিটিক্স আরম্ভ হয়েছে। তবে সারাদানন্দ তার প্রভাবমুক্ত রয়েছেন।

সারদানন্দ আগে চীরবাসাতে বাস করতেন। কয়েক বছর যাবৎ তিনি গঙ্গোত্রীতে আছেন। গত বছর ছিলেন দণ্ডীস্বামীর আশ্রমের কাছে—অস্থায়ী পোস্ট অফিসের নিচে। এখন মন্দিরের পেছনে একখানি ঘরে বাস করছেন।

সারদানন্দ সুদক্ষ ফটোগ্রাফার। প্রিন্টিং ও এনলার্জমেন্ট সহ ফটোগ্রাফির যাবতীয় যন্ত্রপাতি তাঁর আছে। তবে এখন ফটো তোলা ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী ছোট একটি টাইপ মেশিন। পূজারী ও সাধুদের দরকারী চিঠিপত্র লিখে দিয়েও নিজের অসংখ্য ভক্তদের সঙ্গে পত্রালাপ করে যে সময়টুকু বাঁচে, তা তিনি প্রবন্ধ রচনায় ব্যয় করেন—দার্শনিক ও অধ্যাত্মিক প্রবন্ধ, সবই ভাগীরথী ও হিমালয়কে কেন্দ্র করে।

সারদানন্দ গঙ্গোত্রীর অবৈতনিক পোস্ট মাস্টার। প্রথমত, পোস্টমাস্টারজী ইংরেজী পড়তে পারেন না, কাজেই সারদানন্দের সাহায্য ছাড়া কাজ চালানো অসম্ভব তাঁর পক্ষে। দ্বিতীয়ত, তিনি যা মাইনে পান, তাতে তাঁর-পক্ষে স্থায়ীভাবে গঙ্গোত্রীতে বাস করা সম্ভব নয়—নিজের খাওয়া-খরচই কুলোয় না। তাই পোস্টমাস্টারজী থাকেন তাঁর গ্রামের বাড়িতে—মুখীমঠে, আর সারদানন্দজী গঙ্গোত্রী পোস্ট অফিসের সব কাজ করে দেন—ডাক পাঠানো ও ডাকবিলির ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু সারদানন্দজী সমাজসেবক নন, তিনি সন্ন্যাসী। তিনি যাত্রীদের সেবক, সাধুদের সতীর্থ এবং পূজারীদের সখা। সবাইকে ভালোবাসেন। ভালোবাসার জন্যই যে সংসার ত্যাগ করেছেন তিনি।

কেবল দর্শন নয়, সারদানন্দ বিজ্ঞানচর্চাও করেন। ভাগীরথীর জল ও পলি, এ অঞ্চলের মাটি পাথর বরফ গাছপালা ও পশুপক্ষী নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা করে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। দুঃখের কথা এই সব প্রবন্ধ আজও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কারণ এ যুগে লেখক হতে হলে যে-সব প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তার কোনোটাই যে জানা নেই তাঁর। আরও দুঃখের কথা, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কয়েকজন যাত্রী প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাঁর কাছ থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ চেয়ে নিয়ে গেছেন, কিন্তু প্রবন্ধগুলি আজও অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে। সারদানন্দজীর অবশ্য তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, কারণ তিনি জানেন, এই হল সমাজের নিয়ম আর তাই তিনি মানুষের সেই সমাজ থেকে পালিয়ে এসেছেন এখানে।

প্রবন্ধ প্রকাশিত না হলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন সারদানন্দ। আগামী শীতকাল তিনি গোমুখীতে বাস করবেন। কাঠের কুঠিয়া বানিয়ে একাকী তুষারাবৃত গোমুখীতে সারা শীতকাল কাটাবেন। মানুষের দেহ ও মনে নির্জনতা ও শীতলতার প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা করবেন। সারদানন্দজীর সেই মরণজয়ী পরীক্ষা সফল হোক।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নয়, তপস্যার প্রয়োজনে কিন্তু আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী গোমুখী এবং তার ওপরে শীতকাল কাটিয়েছেন। এঁদের একজনকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের। শুধু আমরা কেন বিগত আশি বছরে যাঁরা গঙ্গোত্রী এসেছেন, তাঁরা অনেকেই তাঁকে দেখেছেন। তিনি এ যুগের পরম বিস্ময় মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম।

গঙ্গোত্রী ডাকবাংলোর কাছে কেদারগঙ্গার পুল পেরিয়ে একটু ওপরে উঠেই কৃষ্ণাশ্রমের আশ্রম। ঠিক সেই একই রকম আছে। কৃষ্ণাশ্রম ও তাঁর আশ্রম সেই একই রকম, কোনো পরিবর্তন হয় নি। নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের পরম বিস্ময় মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম। উত্তরাখণ্ডের সকল সন্ন্যাসী একবাক্যে স্বীকার করেন—মহারাজ কৃষ্ণাশ্রম এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী।

মহাত্মার শিষ্যা ও সেবিকা ভগবৎস্বরূপ বলেছেন, গত যাট বছরে তিনি মহারাজের মধ্যে কোন মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন দেখতে পাননি। যাট বছর আগেও মহাত্মা এমনি ছিলেন। চল্লিশ বছর হল তিনি কৃষ্ণাশ্রমের কাছে আছেন। কৃষ্ণাশ্রম তারও চল্লিশ বছর আগে গঙ্গোত্রী এসেছেন। যখন তিনি প্রথম গঙ্গোত্রীতে আসেন, তখন পথ বলে কিছু ছিল না। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে বানরের মতো বেয়ে বেয়ে গঙ্গোত্রী পৌঁছতে হত। মহাত্মার সঠিক বয়স কেউ জানে না। তবে ভগবৎস্বরূপ অনুমান করেন, কৃষ্ণাশ্রমের বর্তমান বয়স অন্তত দেড়শ' বছর। অর্থাৎ তিনি পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে বয়সে বড়।

কৃষ্ণাশ্রমের বিগত জীবন সম্পর্কে সামান্য সংবাদই জানা যায়। তিনি নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেন না। অনুমান করা হয়, তিনি বড় ঘরের ছেলে ও প্রথম যৌবনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত। অল্প বয়স থেকেই গৃহত্যাগী। তাঁরা দু' ভাই। ভাই নারায়ণও সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি দেহরক্ষা করেছেন।

সন্ন্যাস জীবনের প্রথম দিকে কৃষ্ণাশ্রম কাশীতে বাস করতেন। চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাটের কাছে এক আশ্রমে থাকতেন। আশ্রমটি এখনও আছে। তাঁকে এই আশ্রমের অধ্যক্ষের পদ দিতে চাইলে, তিনি বলেছিলেন, 'এক পদ ছোড় দিয়া, আউর এক পদ লেগা?'

পাছে জোর করে তাঁকে পদ দেওয়া হয়, তাই তিনি পালিয়ে গেলেন বিন্ধ্যাচলে। বিন্ধ্যাচলে তিনি কতদিন ছিলেন বা তার পরে কোথায় গিয়েছিলেন, জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি এই সময় সমতল ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করেন। তারপরে হরিদ্বার হয়ে উত্তরকাশী আসেন। ইতিমধ্যে তিনি বসন পরিত্যাগ করেছেন।

সে প্রায় নব্বুই বছর আগের কথা। উত্তরকাশী তখন ছোট একটি গণ্ডগ্রাম। চারিদিকে ঘন জঙ্গল। দিনেও বাঘের ভয়। এখন যেখানে দুর্গা মন্দির, সেইখানে একটি গাছের ছায়ায় বসলেন তিনি। মেষপালকরা যাতায়াতের পথে তাঁকে দেখে। দেখে দীর্ঘদেহী এক সন্ন্যাসী পদ্মাসন করে বসে আছেন। তিনি বাক্যহীন ও নিশ্চল। হাত দুখানি মুষ্টিবদ্ধ। তাঁর চোখের পলক পড়ে না। যেন কোন জীবন্ত মানুষ নয়, পাথরের মূর্তি।

মেষপালকরা চারিপাশে ভিড় করে। তাঁর সামনে খাবার এনে রাখে। তিনি তেমনি বসে থাকেন। ওরা ভাবে ওদের সামনে সন্ন্যাসী আহার্য গ্রহণ করবেন না। তাই তারা চলে যায় সেখান থেকে।

পরদিন এসে দেখে, তিনি একইভাবে বসে আছেন, খাবার তেমনি পড়ে আছে। তখন তাদের একজন আবার রুটি ও দুধ নিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে তাঁর মুখের সামনে ধরে। আশ্চর্য তিনি সে খাবার খেয়ে নেন।

ভগবৎস্বরূপ বলেন, সেই ঘটনার পরে এতকাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু মহাত্মা ঠিক সেই রকমটি রয়ে গেছেন। এখনও তিনি তেমনি বসে থাকেন। কখনও শয়ন করেন না। খাইয়ে দিলে কখনও খান, কখনও খান না। নিজের থেকে কখনও খেতে চান না। জানি না শারীর-বিদ্যাবিশারদরা কি বলবেন, তবে তিনি যে বিজ্ঞানের বিস্ময়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম গঙ্গোত্রী এসেছিলেন আশি বছর আগে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি সেই থেকে স্থায়ীভাবে গঙ্গোত্রীতেই বাস করছেন। তিনি সারা হিমালয় ঘুরে বেড়িয়েছেন। যখন যেখানে মন চেয়েছে, সেখানেই থেকেছেন। কি খেয়েছেন, বাঘ-ভালুক তুষারপাত ও প্রবল শীতের কবল থেকে কেমন করে রক্ষা পেয়েছেন, তা বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বিষয়। আমি কেবল জানি, তিনি বেশ কিছুকাল গোমুখীতে কাটিয়েছেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের সমস্ত শিখরের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁর।

উত্তরকাশীতে অনেকের কাছেই শুনেছি, বছর দশেক আগেও মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম একদিনে গঙ্গোত্রী থেকে উত্তরকাশী যেতেন ও দেড়দিনে ফিরে আসতেন। একদিনে সাতান্ন মাইল দুর্গম চড়াই-উৎরাই পথ চলা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বতাভিযাত্রীর পক্ষেও কষ্টসাধ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণাশ্রমের পরিচয় ছিল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অতিশয় ভক্তি করতেন তাঁকে। তাঁরই অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার আগে মালব্যজী এলেন গঙ্গোত্রী। কিন্তু পেলেন না কৃষ্ণাশ্রমকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে মুখীমঠের মাইল তিনেক দূরে একটি গুহায় তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মালব্যজীর অনুরোধ রক্ষা করলেন কৃষ্ণাশ্রম। তিনি কাশীতে গিয়ে শিবমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করলেন।

দলে দলে দর্শনার্থী ছুটে এলো। এলো কয়েকজন বিত্তশালী ভক্ত। তারা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইল। কৃষ্ণাশ্রম বললেন, 'আমি কি দোকানের পণ্যসামগ্রী যে, পয়সা দিয়ে কিনে নিবি !'

এই উক্তির পরেও কিন্তু জ্ঞান হল না বিত্তবান ভক্তদের। তারা টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, হীরা-মুক্তা এনে কৃষ্ণাশ্রমের পদপ্রান্তে উপঢৌকন দিল। স্পর্শ করা তো দূরের কথা তিনি ফিরেও তাকালেন না সেদিকে। বিরক্ত বদনে বসে রইলেন। পরদিন সকালে আর কৃষ্ণাশ্রমকে খুঁজে কাশীতে পাওয়া যায়নি। রাতের অন্ধকারে সেই কাঞ্চনের জগৎ থেকে

তিনি পালিয়ে এসেছেন।

সন্ন্যাসী মাত্রই কামিনী ও কাঞ্চন পরিত্যাগ করে থাকেন। গৌতম বুদ্ধ, পার্শ্বনাথ, মহাবীর, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি প্রত্যেকেই তাই করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণাশ্রম নাকি তা করেননি। কাঞ্চন পরিত্যাগ করলেও তিনি কামিনী পরিত্যাগ করেননি। কারণ বলাই বাহুল্য, ভগবৎস্বরূপ তাঁর সঙ্গে থাকেন, সর্বদা সেবা করেন।

কথাটা উঠেছে বহুকাল আগে—ভগবৎস্বরূপকে ঠাঁই দেবার পর থেকেই। সাধারণ মানুষদের কথা বাদই দিলাম। সন্ন্যাসীরাও কৃষ্ণাশ্রমের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। উত্তরকাশীতে সন্ন্যাসীদের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একখানি পত্র রচিত হল। তাতে 'এই পাপ কার্যের' জন্য কৃষ্ণাশ্রমের 'কৈফিয়ৎ' তলব করা হল। দুজন সন্ন্যাসী সেই পত্রখানি নিয়ে গঙ্গোত্রী এলেন। কৃষ্ণাশ্রমের হাতে দিলেন।

মনোযোগ দিয়ে পত্রখানি পাঠ করলেন কৃষ্ণাশ্রম। তারপরে একবার সন্ন্যাসীদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে সেখানি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। সন্ন্যাসীরা শব্দহীন। কথা ছিল পত্রপ্রাপ্তির রসিদ নিয়ে যেতে হবে কৃষ্ণাশ্রমের কাছ থেকে। কিন্তু তাঁরা সেকথা বলতে সাহসী হলেন না।

সহসা উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণাশ্রম। নেমে এলেন কুঠিয়ার বাইরে। ভগবৎস্বরূপ ছুটে এলেন। সন্ন্যাসীদ্বয়কে দেখিয়ে কৃষ্ণাশ্রম তাঁকে বললেন, 'ওদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দে, আমি উত্তরকাশী থেকে ঘুরে আসছি।' কেউ কিছু বলতে পারার আগেই তিনি তরতর করে নেমে গেলেন উৎরাই পথে।

সেদিন বিকেলে তিনি রওনা হয়েছিলেন গঙ্গোত্রী থেকে। পরদিন সকালে সবাই দেখলেন মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম বসে আছেন যোগাসনে। কথাটা রটে গেল চারিদিকে। দলে দলে দর্শনার্থী ছুটে এলো। সন্ন্যাসীরাও সংবাদ পেলেন। আবার পরামর্শ করলেন তাঁরা। তারপরে দল বেঁধে সবাই এলেন তাঁর কাছে। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়েই তাঁরা যেন কেমন হয়ে গেলেন। কৈফিয়ৎ তলব করার কথা মনেও এলো না তাঁদের। তাঁরা সাষ্টাঙ্গে সশ্রদ্ধ প্রণাম করলেন মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমকে।

সামনাসামনি কেউ কৃষ্ণাশ্রমের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেননি। কিন্তু আজও আড়ালে অনেকে ভগবৎস্বরূপকে নিয়ে তাঁর সম্পর্কে নানা প্রকার মন্তব্য করে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য—'নিজে মহাপুরুষ হতে পারেন, কিন্তু মেয়েটা তো আর সে ঐশীশক্তি পায় নি।'

মেয়েটা—হ্যাঁ, তাই বলেন সবাই। কারণ তাঁরা এই মেয়েটার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। জানতাম না আমিও, যদি ডাক্তার নায়েক আমাকে না বলতেন তাঁর কথা। ডাক্তার সূর্যকুমার নায়েক, দন্তচিকিৎসক—মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের সামান্য সংখ্যক শিষ্যদের অন্যতম। ভগবৎস্বরূপ ও ডাক্তার নায়েক ছাড়া আর মাত্র চারজন শিষ্য আছেন তাঁর—সর্বশ্রী অচলানন্দ মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ভট্টাচার্য, জি এন মোদী এবং মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য, আমার মহিমদা।

ডাক্তার নায়েক আমাকে বলেছেন ভগবৎস্বরূপের কথা। ভাটোয়ারী থেকে গঙ্গোত্রীর দিকে আরও ন'মাইল এগিয়ে গাংনানী। ৬,২৮০ ফুট উঁচু এই গ্রামটি এখন সমৃদ্ধ জনপদ। কিন্তু তখন এমন ছিল না। তাহলেও উষ্ণ কুণ্ড আর ধর্মশালার জন্য যথেষ্ট জনপ্রিয় গ্রাম ছিল। গাংনানীর চার মাইল ওপরে সুনগর বলে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের মেয়ে ভগবৎস্বরূপ।

ছোট একটি মেয়ে—বছর তিনেক বয়স। মায়ের সঙ্গে ক্ষেতে যায়, ঝরণায় আসে। আর পথের ধারে দাঁড়িয়ে পথচারীদের দেখে। একদিন সে দেখে দীর্ঘদেহী একজন বিবস্ত্র বৃদ্ধ সন্ন্যাসী

পথ চলেছেন। মেয়েটি তাঁর কাছে আসে। ছোট হাত দুখানি একত্র করে সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানায়। সন্ন্যাসী কাছে আসেন। মেয়েটি ভয় পায় না। সন্ন্যাসী মেয়েটির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। তারপরে আপন পথে চলে যান।

এইভাবে প্রতি বছর উত্তরকাশী আসা-যাওয়ার পথে মেয়েটির সঙ্গে সন্ন্যাসীর দেখা হয়। মেয়েটির অনুরোধে কখনও বা সন্ন্যাসী সুনগরে একটি রাত কাটিয়ে যান। মেয়েটির মা-বাবা ও গ্রামবাসীরা সাধ্যমতো সন্ন্যাসীর সেবা করেন।

বছরের পর বছর কেটে যায়। মেয়েটি বড় হয়। সন্ন্যাসীর প্রতি তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না তার। কিশোরী মন সর্বদা সন্ন্যাসীর সেবা করার জন্য আকুল হয়ে থাকে। কিন্তু সুযোগ আসে বছরে দুবার, তাও দু-একদিনের জন্য।

সমাজের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। সেই নিয়মানুসারে বাবা মেয়ের বিয়ে দিলেন। সুপাত্র—হরশিলের সত্যনারায়ণ মন্দির যাদের, তাদের পরিবারের ছেলে। মেয়েটির বয়স তখন বছর দশেক।

বছরখানেক বাদে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে ফিরে এলো বাবার কাছে। বাবাকে বলল, 'আমি আর সংসার করব না।'

'সে কি!' বাবা বিস্মিত হলেন। 'কি করবি তাহলে?'

'আমি গুরুজীর কাছে যাবো, তাঁর সেবা করব।'

'কোন্ গুরুজী?'

'গঙ্গোত্রীর গুরুজী।'

মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে বোঝায়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আসে, তারাও বোঝায়। স্বামী এসে নানা প্রলোভন দেখায়। কিন্তু সে অবুঝ, সংসারের কোনো প্রলোভন তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারে না। সে সারাদিন চোখের জল ফেলে আর সবাইকে অনুরোধ করে—'মুঝে গুরু মিলা দো।'

কিছুদিন পরে নিরুপায় পিতা কন্যাকে নিয়ে গঙ্গোত্রী এলেন। কৃষ্ণাশ্রমের কাছে এসে পিতা তাঁকে সব কথা জানালেন।

তিনি তাকালেন মেয়েটির দিকে।

সে নির্ভয়ে বলে উঠল, 'আমি এখানে থাকব, তোমার সেবা করব।'

গর্জে উঠলেন কৃষ্ণাশ্রম, 'আমার কাছে থাকবি! তুই কি জানিস না, আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—কাঠের নারীমূর্তি পর্যন্ত কাছে রাখি না!'

মেয়েটি অনেক চোখের জল ফেলে। কিন্তু তাতে সন্ন্যাসীর মন ভেজে না।

বাধ্য হয়ে বাবা মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

বাবার সঙ্গে ফিরে আসে কিন্তু সে আর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যায় না। বাবার ঘরেও থাকে না। গাংনানী এসে ভাগীরথীর তীরে একটি কুঠিয়া বানিয়ে সেখানেই বাস করতে শুরু করে। সর্বদা জীবন-দেবতার কাছে সকরুণ মিনতি জানায়, 'মুঝে বহী গুরু মিলা দো।' তখন তার বয়স বছর বারো।

মানুষের পাওয়া না-পাওয়ার সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক নেই। তাই ভাগীরথীর জলধারার সঙ্গে মেয়েটির জীবনের সময়-ধারাও বয়ে চলে। কিন্তু তার মনতরণী উজান বেয়ে এসে ভেড়ে গঙ্গোত্রীর ঘাটে—পরমহংসের পদপ্রান্তে প্রাণের প্রণতি জানাতে।

এইভাবে তার জীবনের আরও বারো বছর কেটে যায়। তারপরে সে আবার গঙ্গোত্রী

আসে। কৃষ্ণাশ্রমকে সেই একই কথা বলে, 'আমি এখানে থাকব। তোমার সেবা করব।'

'তা হয় না। তোকে কিছুতেই আমার কাছে রাখতে পারি না। তুই চলে যা এখান থেকে।'

'না। আমি আর ফিরে যাবো না। যদি তুমি এবারেও ফিরিয়ে দাও, তবে আমি ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করব।'

কৃষ্ণাশ্রম আর কিছু বলতে পারলেন না। সে থেকে যায় তাঁর কুঠিয়ায়।

সেই থেকে তিনি আছেন কৃষ্ণাশ্রমের কাছে। তাঁর শিষ্যা ও সেবিকা ভগবৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী। গুরুজীর দেওয়া নাম। যে গুরুকে পাবার জন্য তিনি জীবনের একুশটা বছর সংগ্রাম করেছেন, সমাজ সংসার সব পরিত্যাগ করেছেন। সেই গুরুজী তাঁর পুরুষের নাম রেখেছেন। কারণ কৃষ্ণাশ্রমের কাছে তিনি নারী নন, সেবিকা নন, ব্রহ্মচারী—ভগবৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী। আশ্চর্য মানুষের মন, তবু তাঁদের নামে কুৎসা রটায়। আর তেমন মানুষ দেবভূমি গঙ্গোত্রীতেও আছে।

তারা বলে, ভগবৎস্বরূপ কৃষ্ণাশ্রমকে ভালোবাসেন। কথাটা মিথ্যে নয়, নিশ্চয়ই ভালোবাসেন, কারণ ভালোবাসা ভক্তিমার্গের প্রথম সোপান। কিন্তু এই ভালোবাসার মাঝে যে দেহগত কোনো সম্পর্ক নেই, এ কথাটা তাদের মনে আসে না। তারা ভুলে যায় যে, উভয়ের বয়সের পার্থক্য প্রায় নব্বুই বছর। দেহায়তনের বাইরে যে নর ও নারীর ভালোবাসা গড়ে উঠতে পারে, একথা তারা চিন্তা করতে পারে না।

কৃষ্ণাশ্রম মানুষ, কাজেই তাঁর দেহ আছে। কিন্তু সেই দেহ বিজ্ঞানের বিস্ময়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ঝড়-জল, শীত-গ্রীষ্ম, রোগ-শোক, জরা-বার্ধক্য ও ভয় সবই তিনি জয় করেছেন। কোনোদিন কেউ তাঁকে অসুস্থ হতে দেখেনি।

বছর বিশেক আগের কথা। গঙ্গোত্রীতে খাড়া একটা পাহাড়ের পাদদেশে উন্মুক্ত আকাশতলে বাস করতেন কৃষ্ণাশ্রম। বর্ষাকাল—প্রবল বৃষ্টি হল সেবারে। পাহাড়ের মাথায় ফাটল দেখা গেল। সবাই ছুটে এলেন তাঁর কাছে। আসন্ন ধস সম্পর্কে সাবধান করতে চাইলেন। নির্বিকারচিত্ত কৃষ্ণাশ্রম জবাব দিলেন, 'ভগবানের যদি ইচ্ছে হয় আমি ধস চাপা পড়ে মারা যাবো, কার সাধ্য আমাকে রক্ষা করে! কোথায় পালাবো, ভগবান যে সর্বত্র বিরাজমান।'

কিছুতেই সেই স্থান ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে এলেন না তিনি। ভগবৎস্বরূপও আসতে চাইছিলেন না। কিন্তু ভক্তদের অনুরোধে তাঁকে শেষ পর্যন্ত চলে যেতে হল অন্যত্র।

সন্ধ্যার একটু পরেই ধস নামল। সবাই শিউরে উঠলেন। ছুটে এলেন সেখানে। পাথর চাপা পড়েছেন কৃষ্ণাশ্রম। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সবাই। ভগবৎস্বরূপ কেঁদে উঠলেন। কারও কোনো সন্দেহ রইলো না, মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের সুদীর্ঘ জীবনের অবসান হয়েছে।

সহসা সেই প্রস্তরস্তূপের ভেতর থেকে ভেসে আসে মানুষের কণ্ঠস্বর। আর্তনাদ নয়, ওঙ্কারধ্বনি। তাড়াতাড়ি পাথর সরানো শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তাপ্লুত অর্ধ-চেতন কৃষ্ণাশ্রমকে উদ্ধার করেন ওঁরা। বেঁচে আছেন বটে কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে সবাই হায় হায় করে ওঠেন।

কিছুক্ষণ বাদে তিনি ইসারায় বলেন, 'আমাকে ভাগীরথীর তীরে নিয়ে চল।'

সবাই সে আদেশ পালন করেন। শব্দহীন কৃষ্ণাশ্রম শুয়ে থাকেন সেখানে। শুয়ে শুয়ে ভাগীরথীকে দেখেন।

পরদিন উত্তরকাশী থেকে ডাক্তার আসেন। টিহরীর মহারাজাও পাঠিয়ে দিলেন একজন

ডাক্তার। কিন্তু তাঁদের দেহ স্পর্শ করতে দিলেন না কৃষ্ণাশ্রম। বললেন, 'তোদের কি সাধ্য আমাকে ভাল করে তুলবি ! ভগবৎ ইচ্ছায় আমি আহত হয়েছি। ভগবান চাইলে ভাল হবো, না চাইলে তাঁর পায়ে আশ্রয় নেবো।'

বাইশ দিন সেইভাবে সম্পূর্ণ সমাধিস্থ অবস্থায় ভাগীরথীর তীরে শুয়ে রইলেন কৃষ্ণাশ্রম। তাঁর পাশে বসে রইলেন ভগবৎস্বরূপ। রইলেন ঝড়, জল ও রোদ মাথায় করে। কৃষ্ণাশ্রম কোনোদিন বা কিছু খেলেন, কোনোদিন খেলেন না তবে তিনি কোনো ওষুধ গ্রহণ করলেন না।

বাইশ দিন পরে তিনি নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। উঠে এলেন ওপরে। সবিস্ময়ে সবাই দেখলেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তারপরে বিশ বছর কেটে গেছে। আর কোনোদিন শয্যা নেননি কৃষ্ণাশ্রম। এখনও প্রতিদিন প্রত্যুষে তিনি খাড়া চড়াই বেয়ে দু'বালতি জল নিয়ে আসেন ভাগীরথী থেকে। কাজটা যে কোনো যুবকের পক্ষে কষ্টকর।

কৃষ্ণাশ্রম ভগবৎস্বরূপকে দীক্ষা দিয়েছেন অনেক পরে। সেই ক'বছর তিনি তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন আর বেদ সহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করিয়েছেন। বলা বাহুল্য কৃষ্ণাশ্রমের কাছে কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। স্মৃতি থেকেই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ভগবৎস্বরূপকে। এই শিক্ষা যে কতখানি, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৬৩ সালে মোদীনগরে। এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমবেত পাঁচ শতাধিক পণ্ডিত ধর্মালোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ভগবৎস্বরূপের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছেন।

মুগ্ধ হয়েছি আমরা তাঁর অমায়িক ব্যবহার দেখে আর মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের আশ্চর্য উত্তর শুনে। এবারে গঙ্গোত্রী থেকে চীরবাসা রওনা হবার আগে ডাক্তারবাবু, অসিতবাবু, করুণা ও বরেণ্যর সঙ্গে গিয়েছিলাম মহাত্মা-দর্শনে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁকে প্রণাম করে বলেছিলাম, 'আমরা কলকাতা থেকে আসছি। যাচ্ছি সতপন্থ অভিযানে। আপনি সর্বজ্ঞ, দয়া করে বলুন, আমাদের এই অভিযান সফল হবে কিনা।'

একটু কাল চুপ করে থেকেছেন। গভীর কৌতূহল নিয়ে আমরা প্রতীক্ষা করেছি। তারপরে তিনি নিজের একখানি হাতের ওপর আরেকখানা হাতের আঙুল দিয়ে কি যেন লিখেছেন। আমরা বুঝতে না পেরে ভগবৎস্বরূপের দিকে তাকিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন—মহাত্মাজী বলছেন যে, 'সতপন্থ কঠিন হ্যায়।'

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর বিচক্ষণতা মুগ্ধ করেছে আমাদের।*

---

* ১৯৬৯ সালে মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম দেহরক্ষা করেছেন।

॥ দুই ॥

পাথরে বোঝাই সেই ঢাল বেয়ে আমরা ওপরে উঠে আসি। এই জায়গাটাই গোমুখী থেকে একটা স্তূপের মতন দেখায়। কিন্তু এটা মোটেই প্রস্তরস্তূপ নয়, মোরেন বা গ্রাবরেখা—গঙ্গোত্রী হিমবাহের গ্রাবরেখা। এই হিমবাহ পেরিয়ে আমাদের পৌঁছতে হবে চতুরঙ্গীর অঙ্গনে।

চারিদিকে পাথর। বিরাট বিরাট পাথর। দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ-খেলানো প্রস্তর প্রবাহ। দেখে তাই মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ পাথর শুধুই পাথর নয়। পাথরের সঙ্গে বরফ আছে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আছে। আছে এই প্রস্তররাশির নিচে। দূর দুর্গম থেকে বয়ে আনা ও দুপাশের পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া প্রস্তররাশিকে বুকে ধারণ করে আছে হিমবাহ।

এখান থেকেও কিন্তু গোমুখীকে দেখা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে গঙ্গাবতরণের প্রণবধ্বনি আর ভাগীরথীর বিরামহীন জলকল্লোল। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে সেই ভয়াবহ শব্দ। হিমবাহ থেকে বরফের ধস নামছে গোমুখীতে। মনে হচ্ছে কেউ কামান দাগছে। পুণ্যার্থীরা একেও প্রণবধ্বনি বলেন, হয়তো হবে। আমার কিন্তু এই শব্দটা শুনলে শৈশবের স্মৃতি ভেসে ওঠে মানসপটে। বর্ষার রাতে এমনি একটা বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যেতো। ভয় পেয়ে আমি দিদিমার বুকে মুখ লুকোতাম। দাদু অভয় দিতেন, 'ও কিছু নয় রে, বরিশাল-গানস্—উচ্ছ্বসিত সাগরের ঢেউ সমুদ্রতলের সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে আছাড় খাচ্ছে।'

কোথায় সাগর আর কোথায় উৎস, কোথায় বরিশাল আর কোথায় গোমুখী! কিন্তু এই শব্দটার সঙ্গে সেই শব্দের একটা মিল আছে, যেন সেই একই শব্দ।

তাই তো হবে। দূরত্ব যাই হোক, প্রাকৃতিক পার্থক্য যাই হোক, প্রকৃত পার্থক্য কিছু নেই। উৎস আর মোহনা একই সূত্রে গ্রথিত। ওরা দুয়ে মিলেই গঙ্গা—পতিতপাবনী গঙ্গা।

তাই গোমুখী এলেই আমি শুয়ে শুয়ে অনেক রাত অবধি ঐ শব্দ শুনি। এবারেও শুনেছি আর ভেবেছি—'বরিশাল-গানস্' হয়তো আর কোনোদিন শুনতে পাব না, কিন্তু গোমুখীর গর্জন শোনার অধিকার আমার আছে। ভাবতে ভাল লেগেছে, এই গোমুখী আমার সেই ছেড়ে-আসা জন্মভূমিকে শস্যশ্যামলা করেছে। সেখানে আমার যাবার অধিকার নেই, তবু সে আমার জন্মভূমি। গোমুখী আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির ধাত্রী। গোমুখী আমার পুণ্যতম তীর্থ—তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কিন্তু না, আর গোমুখীর কথা নয়। গোমুখীকে আমরা পেছনে রেখে এগিয়ে এসেছি। পর্বতাভিযাত্রীর পেছনে তাকাতে নেই; তাকে সর্বদা সামনে নজর রাখতে হয়।

আমাদের সামনে ভাগীরথী পর্বতশ্রেণী ও ডাইনে শিবলিঙ্গ। এখানে উঠে আসার পরে সামনের সব বাধা অপসারিত হয়েছে। সোজা তাকালেই দেখা যাচ্ছে তাদের। কেবল ওদের নয় আরও অনেক ছোট-বড় পর্বতশৃঙ্গকে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ওদের কথা এখন থাক।

এখন নিজেদের কথা ভাবা যাক। ওরা মানে দলের পর্বতারোহী সদস্য ও শেরপারা সবাই এগিয়ে গেছে। দার্জিলিং থেকে পাঁচজন শেরপা এনেছি আমরা—ছুঞ্জে, দা রিঞ্জি,

দোরজি, সেরিং লাকপা ও আঙ নিমা। প্রথম তিনজন কেদারনাথ অভিযানেও আমাদের সঙ্গী ছিল। নিমাকে এনেছি সোনার পরিবর্তে। সোনা—আমাদের কেদারনাথ পর্বতাভিযানের প্রিয়তম শেরপা সোনা আর ইহজগতে নেই। এ বছরের ইন্দো-জাপ মহিলা পর্বতাভিযানের সময় সে তুষার-ধসের কবলে পড়ে প্রাণত্যাগ করেছে। তার স্বর্গীয় আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রথম দলে চলেছে অমূল্য, সুজল, প্রাণেশ, স্বপন ও করুণা। তাদের পেছনে হিমাদ্রি, অসিত, বীরেন ও বরেণ্য। সবার শেষে আমরা—ডাক্তারবাবু, প্রফেসার, আমেদ ও জামিদের সঙ্গে আমি। ধীরে ধীরে পথ চলছি আর ভাবছি সহযাত্রীদের কথা।

অমূল্য সেন আমাদের নেতা। বয়স ২৫ বছর। সে দার্জিলিং থেকে বেসিক, এ্যাডভান্স ও মেথডস অব ইনসট্রাকশন কোর্সে ট্রেনিং নিয়েছে এবং এর আগে পাঁচটি পর্বতাভিযানে অংশ নিয়েছে। পঞ্চচুলি (২০,৭১০ ফুট) (ক), চন্দ্রপর্বত ও কেদারনাথ ডোম আরোহণকারী অমূল্য সেন ভারতীয় পর্বতারোহণের একটি পরিচিত নাম।

সুজল মুখোপাধ্যায় (২৮) আমাদের সহ-নেতা ও ট্রান্সপোর্ট অফিসার। দার্জিলিং থেকে বেসিক ও এ্যাডভান্স ট্রেনিং নিয়েছে। তীরশূলী (খ) ও কেদারনাথ পর্বতাভিযানে অংশ গ্রহণ করেছে।

প্রাণেশ চক্রবর্তী (২৫), দলের সুদক্ষ পর্বতারোহী। সে মানা (২৩,৮৬০ ফুট) (গ) ও গৌরাঙ্গ পর্বত (২০,৩৩৬ ফুট) (ঘ) শিখরে আরোহণ করেছে। সেও দার্জিলিং থেকে বেসিক ও এ্যাডভ্যান্স ট্রেনিং নিয়েছে।

ডাক্তার স্বপন রায় চৌধুরী আমাদের মেডিক্যাল অফিসার। বয়স ২৫ বছর। সেও সুদক্ষ পর্বতারোহী। গত মে মাসে এ্যাডভান্স ট্রেনিং নেবার সময় ভাগীরথী-২ শৃঙ্গে আরোহণ করেছে।

স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ করুণাময় দাস বয়সে (৩২) ওদের থেকে বড় হলেও সামর্থ্যে সমান। দার্জিলিং থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়ে গত বছর সে জীবনের প্রথম পর্বতাভিযানেই কেদারনাথ ডোমে আরোহণ করেছে।

এ্যাডভান্স ট্রেনড হিমাদ্রি ভট্টাচার্য (২৯) আমাদের ফটোগ্রাফার। সেও কেদারনাথ পর্বতাভিযানের সদস্য ছিল।

পর্বতারোহী সদস্যদের প্রবীণতম অসিত বসু। বয়সের কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়—আটত্রিশ। আমার কিন্তু বিশ্বাস 'চল্লিশার' ভয়ে কমিয়ে বলে, আসল বয়স চল্লিশের

(ক) ইন্ডিয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশান কর্তৃক আয়োজিত ১৯৬৪ সালের সর্বভারতীয় অভিযান। নেতা—ফ্লাঃ লেঃ এ. কে. চৌধুরী।

(খ) কলকাতার হিমালয়ান এসোসিয়েশান আয়োজিত (১৯৬৫) অভিযান। নেতা—শ্রী কে. পি. শর্মা।

(গ) কলকাতার পর্বত অভিযাত্রী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত ১৯৬৬ সালের অভিযান। নেতা—শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাস।

(ঘ) কলকাতা মাউণ্টেনিয়ার্স ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত (১৯৬৮) অভিযান। নেতা—শ্রীসুনীল চৌধুরী।

কম নয়। প্রমাণ করাও কঠিন নয়, কারণ মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু মুশকিল হোল যে উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা দেখে তাকে দলের কনিষ্ঠতম সদস্য বলে মনে হয়। এই তো মাত্র গত বছর দার্জিলিং থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। সে আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার, কেদারনাথ পর্বতাভিযানেও তাই ছিল।

বীরেন সরকার (৩০) আমাদের অভিযানের সম্পাদক ও প্ল্যানমেকার। দার্জিলিং থেকে বেসিক ও এ্যাডভান্স ট্রেনড বীরেন সরকার এই নিয়ে পাঁচটি অভিযানে অংশ নিচ্ছে। খুবই অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। হিমালয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছে।

বরেণ্য মুখোপাধ্যায় (২৬) পর্বতারোহণ শিক্ষা গ্রহণ করে নি, কিন্তু সে অভিজ্ঞ, স্বাস্থ্যবান ও সুদক্ষ পর্বতারোহী। সবচেয়ে বড় কথা সে পরিশ্রমী ও জ্ঞানপিপাসু। কাজেই নেতা থেকে বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত প্রত্যেককে সাহায্য করে সে, আর সে সাহায্য অপরিহার্য।

ডাক্তারবাবু অর্থাৎ ডাক্তার অমিতাভ সেন আমাদের শারীরতত্ত্ববিদ বা ফিজিওলজিস্ট। তিনি মনুষ্যদেহের ওপর উচ্চতার প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা করবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বারোটি সাদা ইঁদুর নিয়ে চলেছেন। তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের শারীরতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, লণ্ডনের ডক্টরেট। আমাদের দলের প্রবীণতম সদস্য। বয়স ৪৪ বছর। কিন্তু উৎসাহে তরুণ। তিনি ১৯৬৬ সালের সফলকাম তীরশূলী (২৩,২১০ ফুট) অভিযানের সদস্য ছিলেন।

প্রফেসার ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় আমাদের ভূতাত্ত্বিক। প্রেসিডেন্সী কলেজের সহ-অধ্যাপক। দেখতে তরুণ কিন্তু পাণ্ডিত্যে প্রবীণ। বয়স উনত্রিশ বছর। লণ্ডনের ডক্টরেট ও সুইজারল্যাণ্ডের জামাই। স্ত্রী ভাল বাংলা বলতে পারে। ধ্রুব আল্পসে সমীক্ষার কাজ করেছে কিন্তু দুর্গম হিমালয়ে তার প্রথম আগমন। তাহলেও পিঠে ভারী রুকস্যাক নিয়ে সে বীরেনের সঙ্গে সমান তালে পথ চলেছে।

সঈদ আমেদ এলাহাবাদের মানুষ। বর্তমানে বম্বেতে স্থায়ী হয়েছেন; ভারত সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের সহকারী ক্যামেরাম্যান। বিলেতে পড়াশুনা করেছেন। পর্বতারোহণের ওপরে একটি পূর্ণাঙ্গ রঙীন প্রচার-চিত্র নির্মাণের জন্য তিনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে ফিল্মস ডিভিসানের ক্যামেরাম্যান কোনো বে-সরকারী পর্বতাভিযানের সঙ্গে যান নি।

আমেদ আর কখনও এত উঁচুতে আসেন নি। স্বভাবতই তিনি সর্দি কাশি ও মাথা-ধরায় কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু তাতে তাঁর কাজের উৎসাহ কমছে না। সমানে ছবি তুলে যাচ্ছেন। না তুলেই বা কি করবেন! সুন্দর হিমালয় যে সুন্দরতম হচ্ছে। কোনো সুন্দরের পূজারী কি এখানে নীরবে বসে থাকতে পারে?

পথ কঠিনতর বলে আজ জামিদ সিং সর্বদা সঈদের সঙ্গে থাকবেন। এতে অবশ্য তাঁরও সুবিধাই হচ্ছে। সব ছবিতেই তিনি থাকতে পারবেন। সিনেমার হিরো হবার সাধ কার না আছে!

জামিদ সিং উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক। এখন এ অঞ্চলে আসতে হলে সবাইকেই একজন করে শিক্ষক নিয়ে আসতে হয় উত্তরকাশী থেকে। বলা বাহুল্য তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হয় অভিযাত্রীদের।

উত্তরকাশীতে পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগে এ অঞ্চলে পর্বতাভিযানের আয়োজন করা বড়ই কষ্টকর ছিল। মালবাহকরা যথেচ্ছ মজুরী চাইত। কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্র সম্প্রতি তাদের মজুরী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে পর্বতাভিযান সহজসাধ্য হয়েছে।

পথকষ্ট ক্রমেই বাড়ছে। বিরাট বিরাট পাথর ডিঙিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। পথ কিন্তু অপরিচিত নয়। গত বছরও এই প্রস্তর-প্রবাহ পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপরে ডানদিকে মোড় ফিরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অতিক্রম করেছিলাম। ঐ জলধারাটার পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছি ওপরে, পৌঁচেছি তপোবনে। শিবলিঙ্গ পর্বতের পাদদেশে সেই বিস্ময়কর সমতল ও সবুজ প্রান্তরে। চমৎকার ঘাস ও ছোট ছোট ফুল। গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে দু-তিনশ' ফুট ওপরে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। প্রায় মাইল দুয়েক দীর্ঘ ও আধমাইল প্রস্থ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি ঝরণা। উচ্চতা ১৪,২৮০ ফুট থেকে ১৫,৫৪২ ফুট।

কিছুকাল আগে একজন সন্ন্যাসী স্থায়ীভাবে বাস করতেন ঐ প্রান্তরে—সবাই বলেন তপস্যা করতেন। অনেকটা গুহার মতো একখানি বড় পাথরের আড়ালে বাস করতেন তিনি। তাঁর সেই আশ্রয়টি এখনও আছে। আর তাই প্রান্তরটির নাম হয়েছে তপোবন।

তপোবনের দক্ষিণপ্রান্তে আমরা গত বছর কেদারনাথ পর্বতাভিযানের মূল-শিবির স্থাপন করেছিলাম। শিবলিঙ্গের পাদদেশে বসে আমি তাকিয়ে থাকতাম ভাগীরথী শৃঙ্গমালা ও চতুরঙ্গী হিমবাহের দিকে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের অপর তীরে ভাগীরথী শৃঙ্গ। তারই পাশে এসে চতুরঙ্গী গঙ্গোত্রীতে মিশেছে। সঙ্গমস্থলে ভাগীরথীর শৃঙ্গের পদপ্রান্তে নন্দনবন। সেখানে গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রায় চার মাইল চওড়া। কাজেই ওখান থেকে ভাল করে নন্দনবন দেখতে পাই নি, তার অবস্থান অনুমান করেছি মাত্র।

নন্দনবন না দেখলেও চতুরঙ্গীকে দেখেছি। দেখেছি তার বুকে রঙীন আভা। আজ সেই নানা রঙে রাঙানো চতুরঙ্গীর অঙ্গনে চলেছি। আজ আর গঙ্গোত্রী হিমবাহকে অতিক্রম করতে হবে না। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পূর্ব তীর দিয়ে দক্ষিণে এগিয়ে যাবো। তাই চলেছি।

আমাদের বাঁ দিকে সেই খাড়া পাহাড়—ভূজবাসা ধার। ধার মানে গিরিশ্রেণী। পাহাড়টার সারা গায়ে ছোট-বড় অসংখ্য পাথর। যে-কোনো সময় যে-কোনোটি পড়তে পারে গড়িয়ে। আর গড়ালে সোজা আমাদের মাথায়। জামিদ সিং বললেন, সাধারণত নাকি ওরা গড়ায়। আর তাই এ পথটা খুব সাবধানে পার হতে হয়। কাজটি খুবই কঠিন। বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে পথ। পাথরগুলি সর্বদা নড়ছে। ফলে সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। পায়ের দিকে নজর রাখতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। তারপরে যদি আবার মাথার দিকে নজর রাখতে হয় তো সমূহ-বিপদ। আজ আমাদের অদৃষ্ট ভাল। আজ আকাশ পরিষ্কার, একদম হাওয়া নেই। একটিও পাথর পড়ছে না।

পাহাড়ের গা বেয়ে নানা কারণে পাথর গড়ায়। বর্ষার পরে ধস নামে। তুষারপাতের পরে রোদ উঠলে পাথর গড়ায়, আর হাওয়া উঠলে পাথর পড়ে। হাওয়ার বেগে ছোট একটি নুড়ি হয়তো গড়ালো। পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে পড়তে শুরু করল। এসে আঘাত করল একটু বড় একটা পাথরের টুকরোকে। সেও তার সঙ্গী হল। দুজনে এসে আঘাত করল আর দুটি পাথরকে। তারাও তাদের সঙ্গী হল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির মতো পাথর পড়তে থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে। এই প্রস্তরবৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া পথচারীদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। ভরসার কথা, এখানে পথচারী প্রায় নেই বললেই চলে। নেহাৎ আমাদের মতো বেয়াড়া মানুষের দল, যাদের মাথার দাম খুব বেশি নয়, তারাই মাঝে মাঝে এপথে আসে।

মাথার মূল্য সবার সমান নয়। কিন্তু মূল্য যাই হোক, কে না নিজের মাথা বাঁচাতে চায় ! মনে পড়ছে গত বছরের কথা। অগ্রবর্তী মূল-শিবির থেকে ফিরে আসার সময় আমরা সেই

রকম প্রস্তরবৃষ্টির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। অনেক কষ্টে সেদিন আমরা মাথা বাঁচিয়েছি। তবে সেই জীবন-মরণ সংগ্রামের কথা ভাবলে আজও শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু সেকথা কেন ভাবব? আজ তো পাথর পড়ছে না।

মাথার ওপরে পাথর পড়ছে না, কিন্তু পায়ের নিচে পাথর নড়ছে—গ্রাবরেখার পাথর বা Moraine boulders. নামেই গঙ্গোত্রী হিমবাহ, আসলে পাথরের সমুদ্র। সমতল নয়, ঢেউ-খেলানো সমুদ্র। কেবল ঢেউগুলি উর্মিমালার মতো সচল নয়, অচল পাথরের ঢেউ। সেই ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে পথ। একবার নামতে হচ্ছে, একবার উঠতে হচ্ছে। এই উচ্চতায় এ রকম ওঠা-নামা করা খুবই শ্রমসাধ্য। দম বেরিয়ে যেতে চাইছে কিন্তু বিশ্রামের অবসর কোথায়? বসার মতো জায়গা নেই। জামিদ বলে দিয়েছেন, রক্তবরণ হিমবাহ সঙ্গমের আগে কেউ বসতে পারব না। কারণ বসা নিরাপদ নয়। নিরাপত্তা পর্বতাভিযানের প্রথম কথা।

খুব কষ্ট হচ্ছে। কেবল তো আমার একার নয়। কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু কষ্ট হচ্ছে সবারই। তবু ওরা চলেছে এগিয়ে, তাহলে আমি কেন পারব না? বন্ধুর পথ কিন্তু ভয় কি, বন্ধুরা সঙ্গে রয়েছে!

বন্ধু। হ্যাঁ, বন্ধু বৈ কি! হিমালয়ের সঙ্গীরা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। পদে পদে যেখানে মৃত্যুর হাতছানি, সেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। পথের-সাথী প্রাণের-সাথীতে পরিণত হয়। এ বন্ধুত্ব কোনোদিন ছিন্ন হয় না, অন্তত হওয়া উচিত নয়। তাই যখন দেখি, হিমালয় থেকে ফিরে গিয়ে সহযাত্রীরা কলহ করছে, তখন বড় দুঃখ হয়। ভাবতে বাধ্য হই যে, হিমালয়ের কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারে নি ওরা।

কিন্তু তাদের কথা থাক, নিজেদের কথা ভাবা যাক। আমাদের এই বন্ধুত্বের বয়স ছ-সাত বছরের বেশি নয়। কারও কারও সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মাত্র বছর তিনেক। তার আগে তারা কে কোথায় ছিল, তা আজও জানি না। বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন বৃত্তি আমাদের। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাস। তবু আজ আমরা অভিন্ন। এর মূলে রয়েছে হিমালয়। হিমালয়কে ভালোবেসে আমরা আমাদের ভালোবেসেছি। প্রার্থনা করি, আমাদের ভালোবাসা যেন হিমালয়ের মতোই সুন্দর আর সুমহান হয়।

"আরেকটু জোরে পা চালান, অনেকটা পথ যেতে হবে এখনও।" বীরেন মনে করিয়ে দেয়।

মনে পড়ে, আমি অভিযাত্রী। ভাবাবেগে বিচলিত হবার অবকাশ নেই আমার। আমাকে ওদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে যেতে হবে এগিয়ে। সূর্য ডোবার আগেই পৌঁছতে হবে চতুরঙ্গীর অঙ্গনে—সতপন্থ অভিযানের মূল শিবিরে।

চকচকে রোদে চারিদিক উজ্জ্বল। বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে শিবলিঙ্গ খর্চাকুণ্ড ও ভাগীরথী। এমন চমৎকার আবহাওয়া হিমালয়ে দুর্লভ। কলকাতা থেকে রওনা হবার পরে এবারে একদিনও বৃষ্টি হয় নি। ফলে আমরা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর চেয়ে আগে অগ্রসর হচ্ছি। কথা ছিল ১৪ই সেপ্টেম্বর মূল-শিবির প্রতিষ্ঠা করব, সেখানে আজ মাত্র ১১ই। অর্থাৎ তিনদিন আগেই অভিযানের প্রথম পর্যায় শেষ হবে। এতে কম করেও হাজার দেড়েক টাকার সাশ্রয় হোল। এই অগ্রগতি বজায় রাখতে পারলে হয়। আমরা অবশ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করব। নইলে অভিযান শেষে দেনার বোঝা মাথায় চাপবে।

বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাসহ তিনটি শৃঙ্গে অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলাম। কথা ছিল সতপন্থ শিখর ও রক্তবরণ হিমবাহের উপকণ্ঠে দুটি অনামী

শৃঙ্গে (২২,২৯৮ ফুট ও ২২,১০০ ফুট) অভিযান চালানো হবে। এজন্য আমাদের সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন ছিল। সেখানে জিনিসপত্র ও নগদ মিলিয়ে মোটে হাজার বিশেক টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছি; তাই বাধ্য হয়ে পরিকল্পনাকে সংক্ষেপ করতে হয়েছে। রক্তবরণ হিমবাহের অনামী শৃঙ্গদুটি আমরা অভিযানের থেকে বাদ দিয়েছি। প্রথমে সতপন্থে চলেছি। সেই দুর্গমশৃঙ্গে আরোহণ করার পরে যদি সম্ভব হয়, অর্থাৎ কুলিভাড়া ও খাবার থাকে তাহলে আমরা সতপন্থ থেকে নেমে আসা সুন্দর হিমবাহের বিপরীত দিকে খালিপেট হিমবাহের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ২১,৭১০ ফুট উঁচু অনামী শৃঙ্গটিতে আরোহণ করার চেষ্টা করব।

ঘণ্টা তিনেক একটানা পথচলার পরে সেই খাড়া পাহাড় অর্থাৎ ভূজবাসা ধার শেষ হল। এখানেই রক্তবরণ হিমবাহ এসে গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সঙ্গমস্থলে উঁচু পাথরের ঢিবি। বেশ খানিকটা নিচে নেমে আবার চড়াই ভেঙে আমরা ওপরে উঠে এলাম। এতক্ষণে বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি বসে পড়ি।

অসিত বলে, "এখানেই লাঞ্চ সেরে নাও।" অসিত কোয়ার্টার মাস্টার।

রুকস্যাক নামিয়ে খাবার বের করা গেল। রুটি, আলুর তরকারী ও ডিম সেদ্ধ। ফ্লাস্কে চা আছে। কাজেই খাওয়াটা খারাপ হবে না।

খেতে খেতে রক্তবরণের দিকে তাকাই। এখান থেকে তাকে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। দুদিকে খাড়া পাহাড়, মাঝখানে রক্তবর্ণ পাথরের প্রবাহ। পূব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে এসে মিশেছে। সঙ্গমস্থলে সৃষ্ট হয়েছে খাড়া একটি পাথরের দেওয়াল—প্রায় শ' তিনেক ফুট উঁচু।

সঙ্গমের পশ্চিমে এই পাথরের ঢিবি—গঙ্গোত্রী হিমবাহের বুকে রক্তবরণ হিমবাহের প্রান্তিক মোরেন। আর পূর্বে অনতিদূরে রক্তবরণের স্নাউট—প্রত্যেক হিমবাহের একটি স্নাউট থাকে। এবং তাদের চেহারা মোটামুটি একই রকম। তবে উচ্চতা তথা উত্তাপ ও হিমবাহের আকৃতির তারতম্যের জন্য স্নাউট ছোট-বড় হয়ে থাকে। রক্তবরণের স্নাউট গোমুখীর চেয়ে অনেক ছোট।

সশব্দে জল বের হচ্ছে। দুধের মতো সাদা জল। কিন্তু একটু বাদেই রক্তবরণের রক্তিম ছোঁয়ায় সে রক্তধারায় পরিণত। এখানে কোন নদী নেই। অল্প খানিকটা জায়গা জুড়েই জলধারার বিস্তৃতি। তারপরেই তারা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হয়তো এই প্রস্তরস্তূপের তলা দিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে গিয়ে পড়ছে। তারপরে?

তারপরে কি সচল-জলধারা আবার অচল-তুষারে পরিণত হয়েছে? অথবা তুষার-প্রবাহের তলা দিয়ে আপন পথ করে নিয়ে গোমুখীতে ভাগীরথীর প্রবাহে মিশেছে? সম্ভবত তাই হয়েছে। কারণ সচল-জলধারা কখনও অচল-তুষারে পরিণত হয় না। তুষার জড়, জল জীবন। জড় থেকে সৃষ্ট হয় যে জীবন, প্রকৃতির সাধ্য কি তার অকালমৃত্যু ঘটায়। কাজ শেষ না হলে জীবনের মৃত্যু নেই।

জলের শব্দটা বড় ভাল লাগছে। গোমুখী ছেড়ে আসার পরে এই শব্দ আর শুনি নি। এ তো যেমন তেমন শব্দ নয়, এ যে হিমালয়ের হৃৎস্পন্দন। আমি কান পেতে শুনি।

"যে অনামী শৃঙ্গদুটি আমাদের মূল পরিকল্পনায় ছিল, ঐ দেখুন তারা।" বীরেন হঠাৎ বলে ওঠে।

হ্যাঁ, হিমবাহের শেষপ্রান্তে পাশাপাশি দুটি তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছি। আজ পর্যন্ত কোনো অভিযাত্রীদল ওদের কাছে যায় নি। বড় আশা ছিল আমরা যাবো। কিন্তু সে আশা

অপূর্ণ রয়ে গেল। আমাদের যাওয়া হোল না। হিমালয়ের পথেও পাথেয়র প্রয়োজন। অর্থম্ অনর্থম্।

রক্তবরণ হিমবাহে যাওয়া হোল না আমাদের। তবে ভারতীয় পর্বতারোহীরা গিয়েছেন রক্তবরণে। গিয়েছেন গুজরাতের মহিলা পর্বতারোহীরা মাতৃ শৃঙ্গ (২২,০৪৭ ফুট) অভিযানে, ধ্রুবকুমার পাণ্ডা ও তাঁর সহযাত্রীরা ২২,৭৪২ ফুট উঁচু শ্রীকৈলাস শিখরে। ১৯৬৩ সালের ১৬ই জুন তাঁরা শ্রীকৈলাস শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

কিন্তু না, তাঁদের কথা নয়। আমি ভাবছি হিমালয় অভিযানের পথিকৃৎদের কথা। Marco Pallis ও তাঁর সহযাত্রী F. E. Hicks, C. F.Kirkus, R. C Nicholson এবং Dr. Charles Warren-এর কথা। তাঁরা গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ আট মাইল এবং তার উত্তর তীরের প্রধান দুটি উপ-হিমবাহ অর্থাৎ রক্তবরণ ও চতুরঙ্গীর প্রাথমিক সমীক্ষা করেন। কিন্তু মার্কো পালিস তাঁর রিপোর্টে এই উপ-হিমবাহ (Feeder Glacier) দুটিকে এক ও দুই নম্বর হিমবাহ বলে উল্লেখ করেছেন, কোনো নাম দেননি।*

রক্তবরণ ও চতুরঙ্গী দুটি স্থানীয় নাম। কিন্তু সরকারী ভাবে এই নাম দুটি দেন মেজর গর্ডন অসমাস্টোন। তিনি এসেছিলেন ১৯৩৫-৩৬ সালে সরকারী জরিপ করতে। তাঁর প্রণীত 'Half-inch surveys' আজও গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানচিত্র।

অসমাস্টোন বোধ হয় মালবাহকদের কাছে রক্তবরণ ও চতুরঙ্গী নাম দুটি শুনে থাকবেন। তাঁর অনুরোধে সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া নাম দুটিকে সরকারী স্বীকৃতি দেন। কিন্তু এই সব সমীক্ষার বহু পূর্বেই নাম দুটি প্রচলিত ছিল। তার মানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই সব দুর্গম অঞ্চল আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু তাঁরা সেই আবিষ্কারের কথা লিখে রেখে যান নি। কারণ সেকালে সে নিয়ম ছিল না। আর তারই ফলে আমরা পরবর্তী কালে হিমালয়কে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ইংরেজরা আবার হিমালয়কে খুঁজে বের করেছেন। দলে দলে ইয়োরোপীয় অভিযাত্রী তাঁদের অনুসরণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের সেই সব দুর্গম পদযাত্রা ও দুস্তর পর্বতাভিযানের কথা ও কাহিনী ছবি ও মানচিত্র সহযোগে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, ফলে আজ আমরা হিমালয়ে আসতে পারছি।

কিন্তু দুঃখের কথা, আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি না। আমরা কেবল পর্বতারোহণের রোমান্সটুকুকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকছি। যেমন বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। গত দশ বছরে বাংলা থেকে আঠারোটি** পর্বতাভিযান ও অসংখ্য পদযাত্রা আয়োজিত হয়েছে, কিন্তু বই লেখা হয়েছে মাত্র কয়েকখানি; পর্বতাভিযানের প্রসঙ্গ নিয়ে এ পর্যন্ত বাংলা

---

* 'Peaks and Lamas' by Marco Pallis.

** (১) নন্দাঘুণ্টি (২০,৭০০´)—১৯৬০, (২) মানা (২৩,৮৬০´)—১৯৬১, (৩) নন্দাখাত (২১,৬৯০´)—১৯৬১, (৪) নীলগিরি পর্বত (২১,২৬৪´)—১৯৬২, (৫) দেও দেখানি (২০,০০০´)—১৯৬৪, (৬) সিকিম হিমালয়—১৯৬৪, (৭) তীরশূলী (২৩,২১০´)—১৯৬৫, (৮) মানা (২৩,৮৬০´)—১৯৬৬, (৯) তীরশূলী (২৩,২১০´)—১৯৬৬, (১০) চতুরঙ্গী (২১,৩৬৪´)—১৯৬৬, (১১) যুগল মানা (২২,২৯০´)—১৯৬৬, (১২) শ্রীকান্ত (২০,১২০´)—১৯৬৭, (১৩) কেদারনাথ পর্বত (২২,৪১০´ ও ২২,৭৭০´)—১৯৬৭, (১৪) রণ্টি (১৯,৮৯৩´)—১৯৬৭, (১৫) গৌরাঙ্গ ও বিধান পর্বত (২০,৩৩৬´ ও ২১,৩৯০´)—১৯৬৮, (১৬) লাম্পাক (২১,৭৭০´)—১৯৬৮, (১৭) সতপন্থ ও রাধানাথ পর্বত (২৩,২১৩´ ও ২১,৭১০´)—১৯৬৮, (১৮) কুটি উপত্যকা [সাপ্টাং তথা রামকৃষ্ণ পর্বত (২১,৭৫০´)]—১৯৬৮।

ভাষায় মাত্র খানছয়েক বই লেখা হয়েছে। এটি খুবই দুঃখের কথা। শুনতে পেলাম ১৯৬৫ সালের সফলকাম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের নেতা কমাণ্ডার এম. এস. কোহলি বর্তমানে ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত আছেন। তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

অসমাস্টোন এসেছিলেন বিরাট দল নিয়ে—দুজন অফিসার, দশজন সার্ভেয়ার, পঞ্চাশজন খালাসী ও একশ বিশজন স্থানীয় মালবাহক ছিল তাঁর দলে। তাঁরা সর্বপ্রথম এই অঞ্চলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা করেছেন। সমীক্ষার সময়ে চতুরঙ্গী হিমবাহের শেষপ্রান্তে ২০,৯৭৬ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেছেন।

হিমালয় ভারতের। কিন্তু হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত পরিচয় হয়েছে ইয়োরোপীয়দের মাধ্যমে। ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত হয়ে পরিচিত পথে আজ যেখানে আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে, সেখানে তাঁরা মাসের পর মাস কাটিয়েছেন—ঈশ্বরলাভ কিংবা কোনো রোমাঞ্চকর অভিযানের আসক্তিতে নয়, কর্তব্যের প্রয়োজনে। তাঁদের ছিল না আধুনিক মাউন্টেনিয়ারিং বুট, ফেদার জ্যাকেট আর উইণ্ড-প্রুফ। ছিল না হাই-অলটিচুড টেণ্ট, স্লীপিং ব্যাগ আর এয়ার-ম্যাট্রেস। পথ ছিল অজানা। তবু তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আর শুধু তো হিমালয় নয়, সুলেমান হিন্দুকুশ তিয়েনসান কুনলুন কারাকোরাম অর্থাৎ পামীরগ্রন্থি থেকে যে ক'টি গিরিশ্রেণী প্রসারিত হয়েছে, তার সব ক'টিতেই কিছু না কিছু সমীক্ষা করা হয়েছে সে-যুগে। যাঁরা এই সব সমীক্ষার আয়োজন করেছেন, যাঁরা অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এই সব সমীক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন, দুর্গমের মানচিত্র প্রণয়ন করেছেন, তাঁরা উদ্দেশ্যহীন ছিলেন না—সাম্রাজ্য বিস্তার ও সীমান্ত সুরক্ষিত করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কেবল কি সেই কর্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন ?

না। অজানাকে জানা ও দূর-দুর্গমের সঙ্গে সখ্যতা করাও তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রাণ তুচ্ছ করে তাঁরা এই সব বিপদসঙ্কুল পথ-পরিক্রমা পূর্ণ করেছিলেন বলেই আজ আমরা হিমালয়ে আসছি। বিগত যুগের সেই সব হিমালয় পথিকৃৎদের প্রণাম জানাই।

ইয়োরোপীয়রা আয়োজন করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিন্তু কেবল তাঁরাই তো সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন নি ! সেই দুর্গম পথ-পরিক্রমার প্রতি পদে যাঁরা তাঁদের সাহায্য করেছেন, সেই সব সার্ভেয়ার, খালাসী ও মালবাহকদের অবদানও তো কিছুমাত্র কম নয়। তাই তাঁরাও আমাদের প্রণম্য।

১৯৩৫-৩৬ সালের সেই সমীক্ষায় কয়েকটি নতুন গিরিবর্ত্ম ও হিমবাহ আবিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে চতুরঙ্গীর উপ-হিমবাহ খালিপেট বামক অন্যতম। নামকরণের পেছনে একটি কাহিনী আছে। সাধারণ মানুষদের অসাধারণ ত্যাগের এক সকরুণ কাহিনী।*

একদিন বিকেলে অসমাস্টোন ঘোষণা করলেন পরদিন সেই অনামী হিমবাহটি জরিপ করা হবে, নিচের শিবির থেকে মালবাহকরা যেন সকাল সকাল আসে। পরদিন খুব সকালে তারা এলো। কিন্তু এসে ভয়ে ভয়ে অসমাস্টোনকে জানালো, তাড়াতাড়িতে খাবার আনতে ভুলে গেছে তারা। অতগুলি মানুষের খাবার ছিল না অসমাস্টোনের শিবিরে। নিচে গিয়ে

* 'Himalayan Journal' (viii)—1936.

খাবার আনার মতো সময়ও নেই। অথচ দুর্গম হিমবাহে সারাদিন না খেয়ে কাজ কবাও সম্ভব নয়। তাই অসমাস্টোন তাদের ফিরে যেতে বললেন। বললেন, কাজ বন্ধ থাকবে সেদিন।

কর্তব্যপরায়ণ মালবাহকরা সম্মত হল না। তারা বলল, 'বর্ষা এসে যাচ্ছে। একটা দিনের অনেক দাম। আমরা খালি পেটেই কাজ করব।'

'না, না, তা সম্ভব নয়, তোমরা ফিরে যাও।' আদেশ করেন অসমাস্টোন।

সে আদেশ অমান্য করল কর্তব্যপরায়ণ মালবাহকরা। আর শেষ পর্যন্ত অসমাস্টোনকে তাদের কথাই মেনে নিতে হয়। অভুক্ত মালবাহকরা অম্লান বদনে সারাদিন জরিপকার্যে সাহায্য করল।

কর্তব্যপরায়ণ কর্মীদের সেই অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারকে অক্ষয় করে রাখার জন্য অসমাস্টোন ঐ হিমবাহটির নাম রাখলেন—খালিপেট বামক!

"অসিতদা!" অমূল্য ডাকছে।

আমি বাস্তবে ফিরে আসি। রক্তবরণ ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গমে বসে ভাবছিলাম অসমাস্টোনের কথা, সেই ঐতিহাসিক সমীক্ষার কথা।

"আর মায়া না করে ডিমসেদ্ধটা খেয়ে নিয়ে এবারে রওনা হও।" অমূল্য তার কথা শেষ করে।

তাকিয়ে দেখি, ডিমসেদ্ধটি হাতে নিয়ে অসিত বসে আছে। সে অমূল্যর কথায় কান দেয় না। অমূল্য বোধ হয় ঠিকই বলেছে। ডিমসেদ্ধটা খেতে মন চাইছে না তার। খুবই স্বাভাবিক। গতবারে আমরা ডিমের কারি রান্না করে টিনে ভরে নিয়ে এসেছিলাম। তাতে দেখেছি কুসুমাংশ বড়ই শক্ত হয়ে যায়। খেতে বিস্বাদ লাগে। তাই এবারে কাঁচা ডিম নিয়ে এসেছি। এতে অবশ্য খরচ অনেক বেশি পড়ছে। বিশেষ ধরনের একটা বাক্সে দু'শ' ডিম বইবার জন্য একজন মালবাহক লাগছে অর্থাৎ দৈনিক দশ টাকা খরচ হচ্ছে। স্বভাবতই সেই অমূল্য সম্পদটিকে গলাধঃকরণ করতে অসিতের প্রাণ চাইছে না। প্রিয় বস্তুটিকে হাতে নিয়ে প্রিয়তম হিমালয়ের পানে তাকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু হিংসুটে সহযাত্রীদের জন্য কি তা পারার উপায় আছে! নিজেদেরটা খাবার সময় তারা ওর কথা ভাবে নি, কিন্তু ওর হাতে ডিমসেদ্ধ দেখে লুব্ধ হচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়েছে সুজল ও স্বপন। তারা এগিয়ে আসছে অসিতের দিকে। তাড়াতাড়ি গোটা ডিমটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় অসিত। দুহাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, "আয়, ডিম খাবি আয়।"

তার কথা ও ভঙ্গিমায় হেসে ওঠে সবাই। শেরপারাও আমাদের সঙ্গে হাসতে থাকে। খাড়া পাহাড়ের কোলে গিয়ে সেই হাসি আছাড় খায়। রক্তবরণ মানুষের হাসিতে মুখরিত হয়।

সূর্য পশ্চিমাচলের বুকে ঢলে পড়েছে। সামনে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ। রক্তবরণকে বিদায় জানিয়ে তাড়াতাড়ি পথচলা শুরু করি। খুব সাবধানে নামতে হচ্ছে প্রস্তরস্তূপ থেকে। মাঝে মাঝেই আলগা পাথর। পা দিতেই দুলে উঠছে। কোনোমতে ভারসাম্য বজায় রেখে তাড়াতাড়ি আর একখানি পাথরে পা ফেলছি।

এক সময় নেমে আসি নিচে। এখানেও বাঁ দিকে পাহাড়—কালাপাহাড়। তবে আগের মতো এত কাছে নয়, একটু দূরে। পাহাড়ের গা থেকে প্রস্তর-প্রবাহ নেমে এসেছে গঙ্গোত্রী

হিমবাহে। তারপরেই গঙ্গোত্রীর পার্শ্বগ্রাবরেখা— অনেকটা উঁচু, আমাদের ডানদিকে। দুয়ের মাঝে সরু একটি গলির মতো—আগের তুলনায় বেশ সমতল। সেই নিরাপদ গলির ভেতর দিয়ে নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলেছি আমরা।

গলিটা শেষ হয়ে গেল। অনেকটা ওপরে উঠতে হল। ইতিমধ্যে কালাপাহাড়ও খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তবে এখনও সে বেশ দূরে। মাথায় পাথর পড়ার ভয় নেই।

পায়ের নিচের পাথরগুলি কিন্তু আবার তেমনি বেয়াড়াপনা শুরু করেছে। তার ওপরে আবার সেই পাথরের ঢেউ ভাঙতে হচ্ছে—একবার নিচে নামছি, একবার ওপরে উঠছি। মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে। লজ্জার কিছু নেই, আমরা বালি-সুগ্রীবের বংশধর।

বাঁ দিকে কালাপাহাড়, ডানদিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। বহুদূর বিস্তৃত অচঞ্চল প্রস্তর-প্রবাহ। বীরেন বলল, এখানে গঙ্গোত্রী হিমবাহ পাশে প্রায় চার মাইল। ওপারে ভৃগু, শিবলিঙ্গ, খর্চাকুণ্ড আর ...হাঁ, কেদারনাথ ডোম। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

বীরেন বলে, "মূল-শিবির থেকে শিবলিঙ্গ আর কেদারনাথকে আরও সুন্দর দেখাবে। আর ঐ দেখুন তপোবন।"

"কোথায় ?"

বীরেন হাত দিয়ে দেখায়। বলে, "ঐ যে গঙ্গোত্রী হিমবাহের একটু ওপরে শিবলিঙ্গের পাদদেশে কালো একটা সরলরেখার মত।"

মনে পড়ে গতবছর তপোবন থেকে নন্দনবনকেও ভাগীরথীর পাদদেশে এমনি একটি কালো রেখার মতই মনে হত। তাহলে তো নন্দনবন তপোবনের মতই সুন্দর, সবুজ আর সমতল। এবারে না হয় নাই বা গেলাম তপোবনে, নন্দনবনে তো যাচ্ছি। সেও যে তপোবনের মতই নন্দনকাননের আর একটি সংস্করণ।

বেশ কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে বেলা আড়াইটের সময় আমরা চতুরঙ্গী ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গমে উপস্থিত হলাম। ভেবেছিলাম এখানে পৌঁছলেই শিবির দেখতে পাব। ইতিমধ্যে পর্বতারোহীর সদস্যরা, শেরপারা ও কয়েকজন কুলি নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে শিবিরে, তাঁবু টাঙিয়েছে।

ওরা অনেকক্ষণ হল আমাদের ছাড়িয়ে এসেছে, জোর কদমে এগিয়ে গেছে। আর আমরা ধীরে ধীরে পথ চলেছি। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়েছি। দেখেছি কালাপাহাড় আর গঙ্গোত্রী হিমবাহকে।

কালাপাহাড় পূর্বাচলকে আড়াল করে রেখেছে। সহজে সে কাছ-ছাড়া করবে না আমাদের। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবে চতুরঙ্গী ও গঙ্গোত্রী সঙ্গম পর্যন্ত। তারপরে বাঁয়ে মোড় নিয়ে চতুরঙ্গীর উত্তরতীরে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে যে চতুরঙ্গী অঙ্গনের সদাজাগ্রত প্রহরী।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখেছি গঙ্গোত্রী হিমবাহকে—তার বরফ আর পাথরের সাম্রাজ্যকে। মাঝে মাঝেই হিমবাহ হ্রদ বা Glacial lake—রঙীন জলাশয়। দেখে দুচোখ জুড়িয়ে গেছে। আর সঈদ প্রাণভরে ছবি নিয়েছেন।

তাই দেরি হয়েছে আমাদের। কিন্তু ওরা গিয়েছে এগিয়ে, ওরা যে পর্বতারোহী। এতক্ষণে ওদের তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায় তাঁবু ? সামনে বিরাট একটা পাথরের ঢিবি—গঙ্গোত্রী থেকে চতুরঙ্গীর ভেতরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুরঙ্গী হিমবাহের প্রান্তিক-গ্রাবরেখার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা চতুরঙ্গীর অঙ্গনে পৌঁছেছি। কিন্তু কোথায় আমাদের শিবির—সতপন্থ অভিযানের মূল-শিবির ?

"সামনে।" বরেণ্য ভরসা দেয়, "ঐ পাথরের ঢিবির ওপর উঠলেই শিবির দেখতে পাবে। এই প্রান্তিক মোরেনের মাঝখানটা অনেকটা পর্যঙ্ক বা Basin -এর মত। একটা তালাও বা হিমবাহ হ্রদও আছে। সেখানেই তাঁবু ফেলা হয়েছে।"

"তার মানে মোরেনের ওপর রাত কাটাতে হবে ?"

"হ্যাঁ", বরেণ্য বলে, "কিন্তু খুব একটা শীত করবে না। কারণ জায়গাটা ঢালু, চারিদিকে পাথর প্রাচীরের মত ঘিরে রেখেছে, ফলে একদম হাওয়া নেই।"

"কিন্তু কথা ছিল নন্দনবনে আমাদের মূল-শিবির স্থাপিত হবে !"

"ছিল। কিন্তু স্বপনের পরামর্শে আমরা মূল-শিবিরের স্থান পরিবর্তন করেছি। এর ফলে মাইল দুয়েক পথ বেঁচে যাবে।"

দু মাইল ! গ্রাবরেখার ওপরে অনেকটা পথ। কাজেই আর কথা না বাড়িয়ে কালাপাহাড়ের পাদদেশ থেকে চতুরঙ্গীর অঙ্গনে নামতে শুরু করি। পাথর আর পাথর। সকাল ন'টায় পাথর ভাঙতে শুরু করেছি, এখন তিনটে বাজে, এখনও পাথুরে পথ শেষ হয় নি। আর কেনই বা হবে ? আমরা যে মাটির জগৎ থেকে পাথরের জগতে এসেছি। পাথরের জগৎ থেকে তুষারের জগতে চলেছি। এরই মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লে চলবে কেমন করে ?

তবে আগের পাথরের সঙ্গে এ পাথরের পার্থক্য অনেক। নানা রঙে রাঙা চতুরঙ্গী—সাদা কালো বাদামী ও লাল। প্রধানত এই চার রঙের পাথরে পরিপূর্ণ। তারপরে আরও অনেক রঙের ছড়াছড়ি—ধূসর বেগুনী গোলাপী আরও কত রঙ। সত্যই বিচিত্র। বিচিত্র বর্ণময় চতুরঙ্গীর অঙ্গন।

আমরা সেই প্রান্তিক-গ্রাবরেখার পাশে এসে দাঁড়াই। লাল নিশান লক্ষ্য করে ওপরে উঠতে শুরু করি। কাল ওরা এখানে এবং পথের অনেক জায়গায় লাল নিশান লাগিয়ে রেখে গেছে। আজ সেই নিশানের দিকে লক্ষ্য রেখেই পথ চলছি আমরা।

বরেণ্য যত সহজে কথাটা বলেছিল, কাজটা মোটেই তত সহজ নয়। ঢিবিটার ওপরে উঠতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো সারাদিনের ক্লান্তির জন্যই এত কষ্টকর বলে মনে হচ্ছে।

তাহলেও নিশানটা ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি। প্রায় উঠে এসেছি। আর একটু—হ্যাঁ, ঐ পাথরখানার ওপরে উঠতে পারলেই....

উঠে এলাম। আমরা প্রস্তরস্তূপের ওপরে উঠে এলাম। সামনের দিকটা ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। আর ঢালের ভেতরে পড়েছে আমাদের রঙীন তাঁবু—চতুরঙ্গীর অঙ্গনে সতপন্থ অভিযানের শিবির—মূল-শিবির।

শেরপা ও সহযাত্রীরা দেখতে পায় আমাকে। তারা ছুটে আসছে আমার কাছে। আমি একখানি পাথরের ওপরে বসে পড়ি। একটু বিশ্রাম করে নিই। পূর্ণ হয়েছে আজকের পদ-পরিক্রমা।

॥ তিন ॥

"গুড্ মর্ণিং সাব, চায়।"

টিকারামের সম্ভাষণে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে তাকাই। সকাল হয়ে গেছে। চতুরঙ্গীর অঙ্গনে প্রথম প্রভাত।

স্লীপিং-ব্যাগের জীপ খুলে উঠে বসি। টিকারাম গরম চা-য়ের মগটা হাতে দেয়। সমতলের কাপ, পাহাড়ে এসে মগ হয়েছে—এক কাপের জায়গায় কম করে কাপ তিনেক চা না হলে হিমালয়ে শীত ছাড়ে না।

মগটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুম্বন-সুখ উপভোগ করি। গ্রাবরেখার ওপরে সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে শিবির। তাপাঙ্ক হিমাঙ্কের নিচে। এখন এখানে গরম চা-য়ের মূল্য সুন্দরী যুবতীর চেয়ে বেশি।

কর্তব্যপরায়ণ টিকারাম। শেষরাতে উঠে এই দুঃসহ শীতকে উপেক্ষা করে চা বানিয়েছে। যে মেট মালবাহকদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছে, টিকারাম তার লোক নয়। সে আমাদের পূর্ব-পরিচিত। গতবছর সে কেদারনাথ পর্বতাভিযানে গিয়েছিল। তাই এবার উত্তরকাশীতে দেখা হতেই, সানন্দে আমাদের সঙ্গী হয়েছে। সুদর্শন যুবা, সদা হাস্যময়। শান্ত ও শিষ্ট, কখনও কিছু চায় না। সে হরশিল থেকেই শেরপা-পাচক ছুঞ্জেকে সাহায্য করছে। ছুঞ্জে আজ সুজল প্রাণেশ স্বপন করুণা ও জামিদ সিং-য়ের সঙ্গে অগ্রবর্তী মূলশিবিরে চলে যাবে। তাই সে বোধহয় একটু বেশি ঘুমিয়ে নিচ্ছে। টিকারাম বেড-টি বানিয়েছে। আজ দুপুর থেকে তো সে-ই এ শিশিরের প্রধান পাচক।

মালবাহকদের দুটি, শেরপাদের তিনটি ও সদস্যদের দুটি তাঁবু পড়েছে। এ ছাড়া চারিদিকে পাথর সাজিয়ে ওপরে ত্রিপল টাঙিয়ে রান্নাঘর করা হয়েছে। গোমুখীতেও আমরা এইভাবে রান্নাঘর বানিয়েছিলাম। সেটিকে সেইভাবেই রেখে এসেছি। আজ থেকে তিনজন মালবাহক গোমুখীতে থাকবে। তারা কাঠ কাটবে।

মেট মনবাহাদুরকে বাদ দিয়ে আমাদের মালবাহক সত্তরজন। তাদের ষাটজন আজ মাল নিয়ে ওপরে যাবে। চল্লিশজন সেখানে থাকবে আর বিশজন বিকেলে ফিরে আসবে। বাকি দশজন যাচ্ছে গোমুখীতে—কাঠ আনতে। কাল কাঠ আনতে পারে নি।

শেরপারা সবাই ওপরে যাচ্ছে। তাদের দুজন কুলিদের নিয়ে বিকেলে ফিরে আসবে এখানে।

সঈদ ও জামিদকে নিয়ে আমরা চোদ্দজন। একটা মেস টেণ্ট ও একটা ফোর-মেন টেণ্টে রয়েছি। মেস টেণ্টে দশজন থাকার নিয়ম, কিন্তু কাল রাতে আমরা বারোজন থেকেছি। আজ থেকেই ছাড়াছাড়ি শুরু হবে। তাই কাল সবাই একসঙ্গে থাকতে চেয়েছি। স্বপন অবশ্য রয়েছে ফোর-মেন টেণ্টে—জামিদের সঙ্গে। আর একটু কষ্ট করলে ওকেও জায়গা দেওয়া যেত এই মেস টেণ্টে। কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না বলে স্বপন জামিদের সঙ্গে আছে। জামিদ আমাদের অতিথি, তাকে একা রাখা ঠিক নয়। তবে ওরা দুজনেই কাল অনেক রাত অবধি আমাদের তাঁবুতে থেকেছে। খাওয়া ও আড্ডা সবই হয়েছে এখানে। তাই তো হবে, মূল-

শিবিরে মেস টেন্টই হল হেড্ কোয়ার্টারস্।

আমাদের তাঁবুতে চা সরবরাহ শেষ করে টিকারাম স্বপনদের তাঁবুতে ঢোকে। ওদের ঘুম ভাঙায়। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বপন চিৎকার করে ওঠে, "গুড্ মর্ণিং বয়েজ !" স্বপন কনিষ্ঠতম সদস্যদের অন্যতম।

"গুড মর্ণিং ডক্, গুড মর্ণিং জামিদ !" আমরা সাড়া দিই।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও বিশ্বেশ্বরের আলয় হিমালয়। সে বিপুল বিরাট ও বিশাল। সে বিভাকরের মতই বিশল্য ও বিশুদ্ধ। তার প্রভাবে অভিযাত্রীদের মাঝে ছোট ও বড়র ব্যবধান ঘুচে যায়, মুছে যায় বয়সের পার্থক্য। আমাদের দলে ডাক্তারবাবু অর্থাৎ ডাক্তার অমিতাভ সেন প্রবীণতম সদস্য, আর ডাক্তার অর্থাৎ ডাক্তার স্বপন রায় চৌধুরী কনিষ্ঠতম সদস্যদের অন্যতম। ডাক্তার ও ডাক্তারবাবুর বয়সের ব্যবধান বিশ বছর। কিন্তু সেই ব্যবধান গেছে ঘুচে। এখানে আমরা সবাই সহযাত্রী, সবাই বয়েজ।

চা খেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। সূর্য উঠেছে চতুরঙ্গীর সীমান্তে—সেই অনামী শিখরটির পেছন থেকে। ভারী সুন্দর শিখরটি, সুবিরাট সাদা একটি ছাতার মত।

সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়ল চতুরঙ্গীর রঙীন পাথরে। ভাগীরথী কেদারনাথ আর শিবলিঙ্গ শৃঙ্গের রুপোলী শিখরে। আমাদের দক্ষিণে ভাগীরথী-২ আর দক্ষিণ-পশ্চিমে কেদারনাথ পর্বত। ডোম ও শৃঙ্গ দুটিকেই সুন্দর দেখাচ্ছে। ভাগীরথী পর্বতমালা আড়াল করে আছে স্বচ্ছন্দ ও চৌখাম্বা পর্বতকে। আমাদের পশ্চিমে শিবলিঙ্গ শিখর। শিবলিঙ্গ আড়াল করে আছে সুমেরু পর্বত ভৃগুপন্থ (২২,২১৮ ফুট) শ্রীকান্ত (২০,১২০ ফুট)* ও গঙ্গোত্রী (২১,৮৯০ ফুট) শিখরমালাকে। আমাদের উত্তরে চতুরঙ্গীরর ওপারে সেই কালাপাহাড়। সে আড়াল করে আছে সুদর্শন (২১,৩৫০ ফুট) ও মাতৃশৃঙ্গকে (২২,০৪৭ ফুট)।

সবাই সুন্দর। সুন্দর চারিদিকের দৃশ্যমান শৃঙ্গমালা। সুন্দর চতুরঙ্গী ও গঙ্গোত্রী হিমবাহ। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর লাগছে কেদারনাথ ডোম ও শিবলিঙ্গ শিখরকে। এর কারণ এই নয় যে, আমরা গতবছর কেদারনাথ ডোমে আরোহণ করেছি এবং শিবলিঙ্গের পাদদেশে শিবির স্থাপন করেছি। তুষারাবৃত বিশাল ও ব্যাপক কেদারনাথ ডোম অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের আধার। দুর্ভাগ্য যে, মন্দাকিনী উপত্যকা অর্থাৎ কেদারনাথ ধাম থেকে তাকে দেখা যায় না। যাত্রীরা সেখান থেকে কেদারনাথ শৃঙ্গকেও দেখতে পান না। সামনের পাহাড়গুলি শৃঙ্গ ও ডোমকে আড়াল করে রাখে। না রাখলে, শত শত কেদারনাথযাত্রী প্রতিদিন আমারই মত তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত।

আর শিবলিঙ্গ। তার রূপের তুলনা নেই। কীর্তি হিমবাহ ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গমে শিবলিঙ্গ। একটি নয়, দুটি শিখর—টুইন বা যমজ শিবলিঙ্গ। কিন্তু এখান থেকে কেবল মূল-শিখরটিকে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি রয়েছে ওপাশে, এর পেছনে। দেখতে একই রকম, তবে উচ্চতায় কম। গতবছর আমরা দেখেছি তাকে। শিবলিঙ্গের দক্ষিণ দিকে কীর্তি হিমবাহের ওপরে আমরা অগ্রবর্তী মূল-শিবির স্থাপন করেছিলাম।

শিবলিঙ্গ সুন্দর ও ভয়ঙ্কর। সে আপনার রূপে আপনি রূপায়িত, সে অতুলনীয়। তাকে বলা হয় 'ম্যাটারহর্ণ অব্ ইণ্ডিয়া'। ম্যাটারহর্ণের জনপ্রিয়তার জন্যই বোধ করি এই উপমাটি

---

* ১৯৬৮ সালে আসানসোলের মাউন্টেন লাভার্স এসোসিয়েশান এই শৃঙ্গে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। লাম্পাক বিজয়ী নেতা শ্রীনিমাই বসু সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন।

চালু হয়েছে। নইলে ম্যাটারহর্ণের উচ্চতা যেখানে ১৪,৭১৩ ফুট, শিবলিঙ্গ সেখানে ২১,৪৬৬ ফুট। ম্যাটারহর্ণ শিখরে মানুষ কয়েকবার আরোহণ করেছেন, আর শিবলিঙ্গ....।

না, এখন পর্যন্ত কোনো পর্বতারোহী তার শিখরে বসে তাকে প্রণাম করতে পারে নি। কাজেই শিবলিঙ্গকে 'ম্যাটারহর্ণ অব্ ইণ্ডিয়া' না বলে ম্যাটারহর্ণকেই 'শিবলিঙ্গ অব্ সুইজারল্যাণ্ড' বলা উচিত।

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম—ভাবছিলাম শিবলিঙ্গের সৌন্দর্যের কথা। শুনেছি ২২,৬০০ ফুট উঁচু সিকিম-হিমালয়ের সিনিঅলচু বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর পর্বতশিখর। ১৯৩৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এক জার্মান অভিযাত্রীদল এই অনিন্দ্যসুন্দর শিখরে আরোহণ করেন। তাঁদের মতে—'Its ridges are as sharp as a knife-edge, its flanks, though incredibly steep, are mostly covered with ice and snow, furrowed with the ice-flutings so typical of the Himalaya. The crest of the cornice-crowned summit stands up like a thorn.'*

আবার অনেকে বলেন, নেপাল-হিমালয়ের পুখোরি (২৩,৪১২ ফুট) বিশ্বের সুন্দরতম পর্বতশিখর। এটিও আরোহণ করেছেন (১৯৬২) এক জার্মান অভিযাত্রীদল।**

চোখে না দেখলেও আমি এদের ছবি দেখেছি। দেখেছি গাড়োয়াল-হিমালয়ের অনিন্দ্যসুন্দর শিখর নীলকণ্ঠ (২১,৬৪০ ফুট) ও নীলগিরি পর্বত (২১,২৬৪ ফুট)। দেখেছি ভাগীরথী শৃঙ্গকে। কিন্তু তারা যত সুন্দরই হোক, তাদের সৌন্দর্য স্বাভাবিক। পাহাড় বলতে আমরা যেমন বুঝি, তাদের আকার ঠিক সেই রকম। কিন্তু শিবলিঙ্গকে দেখলে পাহাড় সম্পর্কে সেই সহজাত ধারণাটি হারিয়ে যায়। ২১,৪৬৬ ফুট উঁচু একটা পর্বতশিখর যে এমন খাড়া, এত প্রস্তরপূর্ণ ও তুষারহীন হতে পারে, ধারণাই করা যায় না। কেবল সংকীর্ণ শিখরের কতকাংশ জুড়ে তুষারের ক্ষীণ আস্তরণ। ফলে শিখরারোহণ খুবই কষ্টকর ও বিপজ্জনক। জগতের শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীরা সভয়ে শিবলিঙ্গকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। শুনেছি ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উনিশ হাজার ফুটের ওপরে উঠতে পারেন নি। উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের সহঅধ্যক্ষ মেজর সুরৎ সিং আমাকে বলেছেন—'প্রতি এক ফুট অন্তর লোহার পিটন পুঁততে পারলে, ঐ বাকি আড়াই হাজার ফুট আরোহণ করা যেতে পারে।'

উপরিভাগ অবিকল শিবলিঙ্গের মতো। সার্থক নামকরণ। সত্যই শিবলিঙ্গ—বিশ্বের বৃহত্তম শিবলিঙ্গ।

প্রণাম করি—দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম করে বলি, 'হে বিশ্বেশ্বর! তুমি আশীর্বাদ করো—আমরা যেন সতপন্থ শিখরে আরোহণ করতে পারি।'

সুজল ও বরেণ্য খোলা বাক্সগুলো বন্ধ করতে লেগে গেছে। বীরেন ও প্রফেসার থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটার রিডিং নিচ্ছে। ডাক্তার সদস্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে। আমরা মালবাহকদের বোঝা ঠিক করে দিচ্ছি। যে-সব মাল বেশি দরকারী, কেবল তাই আজ ওপরে যাচ্ছে। সব মাল পাঠাতে দিন তিনেক সময় লাগবে।

আগে নিচের কুলিদের ছেড়ে দেওয়া হল। ওদের তিনজন গোমুখীতে থেকে যাবে। সাতজন জ্বালানী কাঠ নিয়ে ফিরে আসবে বিকেলে। এ অঞ্চলে জ্বালানী কাঠের বড়ই অভাব।

---

* 'Himalayan Journal' (IX)—1937.

** 'The Himalayas'—A Journey to Nepal by Takehide Kazami.

হিমবাহ অঞ্চলে বড় গাছ জন্মাবে কেমন করে! কিছু ঝোপঝাড় আছে রক্তবরণ হিমবাহের উত্তরতীরে আর ভূজ ও চিরবন আছে গোমুখীর নিচে। রক্তবরণের দূরত্ব কম, কিন্তু পথ দুর্গমতর। গোমুখীর পথ পরিচিত ও অপেক্ষাকৃত সুগম। আর পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের কুলিরা সেখানে বন পুড়িয়ে রেখেছে। ফলে সেখানকার কাঠ কাটা যেমন সহজ, তেমনি সে কাঠ সুদাহ্য।

তিনজন কুলি গোমুখীতে থাকবে। তারা দৈনিক ছ' বোঝা করে কাঠ কেটে গোমুখীতে নিয়ে আসবে। এখানে থাকবে ছ'জন কুলি। তারা প্রতিদিন গোমুখীতে গিয়ে সেই কাঠ নিয়ে আসবে। এক বোঝা কাঠ কুলিরা ব্যবহার করবে এখানে। অগ্রবর্তী মূল-শিবির থেকে পাঁচজন কুলি এসে বাকি পাঁচ বোঝা জ্বালানী ওপরে নিয়ে যাবে। তার মানে পাঁচ বোঝা অর্থাৎ তিন-চার মণ কাঠ ওপরে নিতে চোদ্দজন কুলিকে নিযুক্ত করতে হবে। তাদের জন্য আমাদের দৈনিক একশ' চল্লিশ টাকা খরচ হবে। কাঠ তো নয়, সোনা।

কিন্তু উপায় কি, এ ব্যয়ভার বহন করতেই হবে। আমরা চারটি প্রেসার-স্টোভ ও কেরোসিন তেল নিয়ে এসেছি। কিন্তু তা কেবল ওপরের শিবিরের জন্য। নিচের দিকে অর্থাৎ মূল ও অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে, যেখানে সদস্য সংখ্যা বেশি ও মালবাহকরা থাকে, সেখানে জ্বালানী কাঠ অপরিহার্য। স্টোভে রুটি বানানো যায় না। আর কুলিদের গরম পোশাক ও বিছানাপত্র খুবই কম। তাই সারারাত তাদের আগুন চাই।

চারিদিকের দৃশ্য যতই সুন্দর হোক, এ জায়গাটা কিন্তু মূল-শিবিরের মোটেই যোগ্য নয়। প্রস্তরময়। পাথর সরিয়ে মোটামুটি সমতল করে নিয়ে কাল কোনোমতে তাঁবুগুলো টাঙানো হয়েছে। কিন্তু তাঁবুর বাইরে একটু পায়চারি করার জায়গা পর্যন্ত নেই।

মূল-শিবির হচ্ছে পর্বতারোহণের প্রাণকেন্দ্র। আমাদের পাঁচ-ছ'জনকে স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে সেখানে। তাই নেতা চায় না যে আমরা এখানে থাকি। অথচ নন্দনবনে শিবির সরিয়ে নেওয়া অর্থহীন। নন্দনবন মূল-শিবিরের আদর্শ স্থান হলেও তাতে মাইল দুয়েক পথ বেড়ে যাবে।

অতএব নেতার নির্দেশে পরশুদিন এখানকার শিবির গুটিয়ে সবাই অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে চলে যাব। সেই শিবির থেকেই মূল-শিবিরের কর্তব্য পালন করা হবে। এখানে কেবল পাঁচজন মালবাহক থাকবে গোমুখী থেকে কাঠ নিয়ে আসার জন্য। তারা রান্নাঘরে রাত কাটাবে।

রান্না ও খাওয়া সেরে মাল নিয়ে মালবাহকরা রওনা হল ওপরে। শেরপা দা রিঞ্জি ও দোরজি যাচ্ছে ওদের সঙ্গে। ওরা দুজন বিকেলে ফিরে আসবে। নিমা, লাকপা ও ছুঞ্জে পরে রওনা হচ্ছে। ওরা ওপরেই থাকবে।

আজ সুজল প্রাণেশ করুণা স্বপন ও জামিদ যাচ্ছে অগ্রবর্তী মূল-শিবির স্থাপন করতে। জায়গাটা স্বপন ও জামিদের জানা। ভাগীরথী-২ পর্বতাভিযানের সময় তারা সেখানে শিবির স্থাপন করেছিল।

কাল কিন্তু ওদের বিশ্রাম নয়। চল্লিশজন কুলি নিয়ে ওরা এগিয়ে যাবে। এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করে সেখানে মাল ফেলে আসবে। পরশু এক নম্বর শিবির স্থাপিত হবে। পরশু ১৩ই সেপ্টেম্বর। কর্মসূচী অনুযায়ী ১৬ই আমাদের এক নম্বর শিবির স্থাপন করার কথা। নির্দিষ্ট সংখ্যক কুলি আনতে পারি নি। তবু আমরা কর্মসূচীর আগে আগে চলেছি। এই অগ্রগতি বজায় রাখতেই হবে।

অবশ্য এ সিদ্ধান্ত অর্থহীন। হিমালয় অভিযানের গতি নির্ভর করে হিমালয়ের মর্জি তথা

আবহাওয়ার ওপরে। সেদিক থেকে সৌভাগ্যবান আমরা। আজও আকাশ মেঘমুক্ত। অবশ্য 'মর্ণিং সোজ দি ডে' কথাটা হিমালয়ের বেলায় সত্য নয়। হিমালয়ে সাধারণত সকালের দিকে আবহাওয়া ভাল থাকে, দুপুরের পরে দুর্যোগ শুরু হয়। তবে এ যাত্রায় এ পর্যন্ত একদিনও ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়তে হয় নি আমাদের। এমন আবহাওয়া হিমালয়ে বড় একটা পাওয়া যায় না। আজও নাকি আবহাওয়া ভালই থাকবে। গতকাল বিকেলে বিশেষ বেতার-বিজ্ঞপ্তিতে আমাদের তাই জানানো হয়েছে। ডাইরেক্টার জেনারেল অব্ অব্জারভেটারিজের সহায়তায় আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্র আমাদের জন্য এই বিশেষ বেতার-বিজ্ঞপ্তির ব্যবস্থা করেছেন।

সকালের খাবার খেয়ে, দুপুরের খাবার নিয়ে সুজল প্রাণেশ স্বপন করুণা ও জামিদ তৈরি হল। ওরা রওনা হচ্ছে। আমরা ওদের কাছে এলাম। আজ তেরোদিন কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি। এর মধ্যে মাত্র দুদিন সুজল ও প্রাণেশ আমাদের ছেড়ে গঙ্গোত্রীতে ছিল। করুণা ও স্বপন সর্বদাই আমার সঙ্গে ছিল। আজ ওরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে দুর্গম থেকে দুস্তরে। দুরারোহ সতপন্থের দুনির্বার আকর্ষণে।

ভারতের কয়েকজন অতি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ পর্বতারোহী এ অভিযানের আয়োজন করতে আমাদের নিষেধ করেছিলেন। কারণ সতপন্থ কেবল দুর্গম নয়, সে বিপজ্জনক। তাঁরা বলেছিলেন—'It will bc too ambitious to attempt a difficult and dangcrous peak like Satopanth'. তাঁদের মতে—আবহাওয়া ভাল থাকলে এভারেস্ট শিখরে আরোহণ করা সম্ভব, কিন্তু আবহাওয়া ভাল থাকলেও সতপন্থে আরোহণ করা দুঃসাধ্য। তাঁরা আঁদ্রে রশ ও তাঁর সহযাত্রীদের সেই ঐতিহাসিক আরোহণকে বিশ্বাস করেন না।

তবে আনন্দের কথা প্রবীণ পর্বতারোহীরা সকলেই ওঁদের দলে নন। আর যাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন, শ্রীতেনজিং নোরগে তাঁদের অন্যতম। সতপন্থ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেকের থেকেই বেশি। কারণ আঁদ্রে রশ-য়ের সেই অভিযানের তিনিই শেরপা সর্দার ছিলেন। তেনজিং এই শিখর নির্বাচনের জন্য আমাদের অভিনন্দিত করেছেন। বলেছেন, আজকের ভারতীয় অভিযাত্রীরা কেবল সাফল্যের কথা মনে রেখেই শৃঙ্গ নির্বাচন করছেন। আমরা তার ব্যতিক্রম বলে তিনি আনন্দিত হয়েছেন।

আমাদের অভিনন্দিত করেছেন এভারেস্ট বিজয়ী কমাণ্ডার এম. এস. কোহলি ও শ্রীনওয়াং গম্বু, অভিনন্দন জানিয়েছেন হিমালয়-বিশারদ স্বামী প্রণবানন্দ, সন্তরণবীর শ্রীমিহির সেন, কলকাতার মেয়র, মানালী পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনের ডিরেক্টর শ্রীহরনাম সিং, ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশনের সভাপতি শ্রীএইচ. সি. সারিণ ও সম্পাদক শ্রীআর. এম. চক্রবর্তী, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, ভারতের শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী এবং আরও অনেকে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেছেন—

'I am glad to see...that you are combining high adventure with serious scientific studies.'

অভিনন্দন জানিয়েছেন কলকাতার বিশপ তথা ভারতের মেট্রোপলিটান। তিনি তাঁর আশীর্বাণীতে বলেছেন—'অতি স্নেহের পর্বতারোহীবৃন্দ, তোমাদের উদ্যম ও উচ্চকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয় এবং তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য আমি আমার দৈনন্দিন প্রার্থনায় তোমাদের স্মরণ করি! ঈশ্বর তোমাদের সহায় থাকুন।'

তাই আমরা আজ এসেছি এখানে, এই চতুরঙ্গীর অঙ্গনে: আমরা বিশ্বাস করি মহৎ

প্রচেষ্টায় পরাজয় বলে কিছু নেই। শ্রীমিহির সেনের ভাষায়--

'...even the ruins of greatness are great. The dedication and the effort are the stuff by which mighty adventures are made of.'

আমরা সতপন্থ শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করতে পারব কিনা জানি না, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আর তাই আমার সহযাত্রীরা আজ আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে দূরে—বহুদূরে।

করমর্দন করে দৃঢ় পদক্ষেপে ওরা এগিয়ে যায়। আমরা তাকিয়ে থাকি। ওরা পেছন ফেরে, ওরা হাত নাড়ে। আমরাও হাত নাড়ি।

ওদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বাড়ছে। ওরা দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

কর্তব্যপরায়ণ ক্যামেরাম্যান সঈদ আমেদ। তাঁর হাত নাড়ার অবসর নেই। তিনি নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের এই করুণ মুহূর্তটিকে তাঁর মুভি ক্যামেরায় চিরতরে বন্দী করে রাখছেন।

পর্বতারোহীরা প্রস্তরস্তূপের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঈদ ক্যামেরা থেকে মুখ তুললেন। কিন্তু নড়লেন না নিজের জায়গা থেকে। কারণ খানিকক্ষণ পরেই ওরা আবার দৃশ্যমান হবে।

সতপন্থ শিখরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিশ হাজার ফুট উঁচু শিখরমালা থেকে সৃষ্ট হয়েছে চতুরঙ্গ। এখানে সে মাত্র মাইলখানেক চওড়া, কিন্তু কোথাও কোথাও তিন মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত। এই হিমবাহটি প্রায় চৌদ্দ মাইল দীর্ঘ। এর প্রায় অর্ধেকটা প্রস্তরময়—গ্রাবরেখা, আর বাকি অর্ধেকটা তুষারাবৃত। কেবল প্রান্তিক-গ্রাবরেখা নয়, পার্শ্বশায়ী-গ্রাবরেখাও পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান। অনেক হিমবাহেই এমন হয় না। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বহু ছোট ছোট হিমবাহ এসে মিশেছে চতুরঙ্গীতে। এদের মধ্যে প্রধান উপ-হিমবাহ হল খালিপেট, কালিন্দী, বাসুকী, সুন্দর, সুরালয় ও শ্বেতা বামক। সুন্দর বামক এসেছে সতপন্থ থেকে। সুন্দর বামক দিয়েই সতপন্থের পথ। তাই তো হবে, সতপন্থ যে সত্যপথ, সে চিরসুন্দর।

চতুরঙ্গী হিমবাহ পূব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত। আমরা রয়েছি পশ্চিমপ্রান্তে গঙ্গোত্রী হিমবাহ সঙ্গমে, প্রান্তিক-গ্রাবরেখার মধ্যাঞ্চলে। ওরা এখন গ্রাবরেখার ওপর দিয়ে সোজা পূবে চলেছে। এই দিকে মাইল আধেক এগিয়ে ওরা ডাইনে অর্থাৎ দক্ষিণে মোড় ফিরবে। পাথর পেরিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে থাকবে চতুরঙ্গীর দক্ষিণ তীরে—অনেকটা উঁচুতে। তখন আবার ওদের দেখতে পাব।

"ঐ যে দেখা যাচ্ছে।" অসিত চেঁচিয়ে ওঠে।

"হ্যাঁ, ঐ তো।" অমূল্য সমর্থন করে তাকে।

প্রফেসর দুরবীন চোখে লাগায়। একটু বাদে বলতে শুরু করে, "প্রথমে প্রাণেশ তারপরে স্বপন করুণা ও সুজল। সবার শেষে জামিদ।"

"দেখি, দেখি..." ডাক্তারবাবু প্রফেসরের হাত থেকে দুরবীনটা কেড়ে নিলেন।

প্রফেসর ফ্যাল ফ্যাল করে ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডাক্তারবাবু কিন্তু বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে দর্শন-সুখ উপভোগ করতে থাকেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তারবাবুর নয়ন-মন তৃপ্ত হল। তিনি দুরবীনটা প্রফেসরকে ফিরিয়ে দিয়ে 'সিটি' মারতে শুরু করেন। কে বলবে মেডিক্যাল কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক এবং মোড়ের উঠতি মস্তান এক নয়। আশ্চর্য হিমালয়, সে ডাক্তারবাবুর তিরিশ বছর বয়স কমিয়ে দিয়েছে।

কেবল ডাক্তারবাবু নন, আমরা সবাই হিমালয়ের প্রভাবে প্রভাবিত। সমানে সহযাত্রীদের উদ্দেশে চিৎকার করছি। ডাক্তারবাবুর দম ফুরিয়ে আসতেই অমূল্য সিটি মারতে শুরু করল। বড় 'সিটিবাজ' অমূল্য। দেখা যাচ্ছে সিটির ব্যাপারেও তার নেতৃত্ব করার যোগ্যতা রয়েছে।

অসিত কিন্তু সিটির মধ্যে নেই। সে অনেক বড় মস্তান। তাই উপযুক্ত উপকরণ সঙ্গে নিয়েই হিমালয়ে এসেছে। সে মাউথ অরগ্যান বাজাচ্ছে।

কনসার্টটা মন্দ শোনাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই সমবেত ঐক্যতানের সুর সহযাত্রীদের কানে পৌঁছচ্ছে আর তাই ওরা মাঝে মাঝে আমাদের দিকে ফিরে হাত-পা নাড়ছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে এখানে সাধারণ শব্দও ভেসে যায় দূর থেকে দূরান্তরে।

কেবল একজন আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন নি—কর্তব্যপরায়ণ ক্যামেরাম্যান সঈদ আমেদ। তিনি কিছুক্ষণ ধরে আমাদের ছবি তুলেছেন। এখন ক্যামেরায় টেলিফটো লেন্স লাগিয়ে ওদের ছবি তুলছেন। মাঝে মাঝে জুম (Zoom) করছেন আর আপন মনে কি যেন বলছেন।

সেই সঙ্কীর্ণ গিরিশিরা সদৃশ চতুরঙ্গী হিমবাহের দক্ষিণ তীর দিয়ে অগ্রগামী সহযাত্রীরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলছে। তারা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। এখন খালি চোখে ওদের কয়েকটি সচল বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা শব্দহীন হলাম। মনটা ভারী হয়ে উঠল। দূরে হলেও এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম। তাও শেষ হয়ে গেল। আবার কবে ওদের সঙ্গে দেখা হবে জানি না। তবে জানি, আজ যেমন করে ওরা ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল, সেদিন তেমনি করেই ওরা এগিয়ে আসবে কাছে—আমার কাছে। সেদিন কি ওরা আমার জন্য জয়মাল্য আসবে নিয়ে? কে জানে?

সঈদ ক্যামেরা থেকে মুখ তুলেছেন। তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বলে ওঠেন, "ওয়াণ্ডারফুল!"

"কী?"

"শট্‌স। ওয়াণ্ডারফুল শট্‌স।"

হায় আল্লা! আমরা ভাবছি সহযাত্রীদের কথা। আর সঈদ ভাবছেন তাঁর 'শটের' কথা—ওয়াণ্ডারফুল শট্‌স।

হয়তো হবে। খালি চোখেই ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। বাঁয়ে কালাপাহাড়, ডাইনে সাদা ভাগীরথী, মাঝে রঙীন চতুরঙ্গী। ওপরে সুনীল আকাশ। তাতে দুয়েক ফালি ছেঁড়া মেঘ ও কয়েকটি হিমালয়ান ঈগলের অস্থির আনাগোনা। আর সেই সঙ্কীর্ণ তটরেখার ওপর দিয়ে সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছে দুর্ধর্ষ দামালের দল। একে একে তারা দিগন্তের পরপারে মিলিয়ে গেল।

নিঃসন্দেহে ওয়াণ্ডারফুল। অনেক ছবি তুলেছেন সঈদ আমেদ—রাণী এলিজাবেথের অভিষেক, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর, বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের ভারত সফর, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, কুম্ভমেলা, রোভার্স ফাইন্যাল, ইডেনের দক্ষযজ্ঞ, আরও কত ছবি। কিন্তু এমন ছবি তিনি আর কোনোদিন তোলেন নি।

সঈদ সেই কথাই বার বার বলেন। আমরা কেবল হাসি—নীরবে হাসি। আর ভাবি, এ কথা সঈদ আজই প্রথম বলছেন না। বলেছেন উত্তরকাশীতে, হরশিলে আর ভৈরবঘাটিতে, বলেছেন গঙ্গোত্রী, চিরবাসা আর গোমুখীতে, বলছেন এখানে। বলবেন প্রতিদিন। যতই তিনি

গহন থেকে গহনতর হিমালয়ে প্রবেশ করবেন, ততই সুন্দরতর দৃশ্যের সম্মুখীন হবেন। আর বার বার বলবেন—এমন চমৎকার ছবি আমি আর কখনও তুলি নি, 'শট্স, ওয়াণ্ডারফুল শটস।'

কিন্তু এসব ভেবে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। অনেক কাজ পড়ে আছে! আরও কয়েকটা বাক্স ভেঙে গেছে, কয়েকটার মালপত্র আংশিক খরচ হয়েছে। সেগুলি নতুন করে প্যাক করে ফেলতে হবে। অসুবিধে নেই। 'টুলবক্সে' হাতুড়ি বাটালি থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় যন্ত্রপাতি আছে। বরেণ্য ও অসিত দুজনেই ওস্তাদ ছুতার। ওরা কাজে লেগে যায়।

ক্লাইনো মিটার, লেন্স, পাথর ভাঙা হাতুড়ি ও অন্যান্য যন্ত্র রুকস্যাকে ভরে নেয় প্রফেসর। তারপর ক্যামেরা বাইনোকুলার আর ওয়াটার বট্‌ল কাঁধে ঝুলিয়ে রুকস্যাক পিঠে নিয়ে সে বীরেনের সঙ্গে গ্রাবরেখার ভেতরে নেমে যায়। চমৎকার ছেলে প্রফেসর ধ্রুবজ্যোতি। মধুরস্বভাব এই তরুণ বৈজ্ঞানিক আমাদের প্রত্যেকের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছে।

ডাক্তারবাবু হিমাদ্রির সাহায্যে তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। একে একে আমাদের ওজন নিচ্ছেন, দেহের বিভিন্ন অংশের উত্তাপ নিচ্ছেন আর নাড়ী পরীক্ষা করছেন। হিমাদ্রি ফলাফল খাতায় লিখছে। ডাক্তারবাবু বড়ই জ্বালাতন করছেন। কিন্তু আমরা নিরুপায়। মনুষ্যদেহে উচ্চ হিমালয়ের প্রভাব নিয়ে তাঁর পরীক্ষা। আমরা যখন দেহধারী মানুষ, তখন ডাক্তারবাবুর হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই। তাই নীরবে নিজেকে ডাক্তারবাবুর হাতে সমর্পণ করতে হচ্ছে।

সঈদ সাহেব মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। খুবই স্বাভাবিক, এর আগে তিনি কখনও আর এত উঁচুতে আসেন নি। 'Altitude effect' বা উচ্চতাজনিত কষ্ট হবেই। বারো হাজার ফুট উঁচু থেকেই মনুষ্যদেহে অক্সিজেনের অভাববোধ শুরু হয়। ফলে উচ্চতা-জনিত রোগ দেখা দেয়, যেমন—শ্বাসকষ্ট, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি ও বমি ইত্যাদি। সঈদের স্বাস্থ্য নেহাৎ ভাল বলেই কেবল মাথা ধরেছে, অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দেয় নি।

কিন্তু ভদ্রলোক তো এতক্ষণ বেশ ছবি তুলছিলেন। তাহলে কি এই মাত্র মাথাধরা আরম্ভ হল?

"না, না," হিমাদ্রি বলে, "কাল সারারাত ঘুমোতে পারেন নি।"

তাহলে মাথাধরা নিয়েই তিনি এতক্ষণ ছবি তুলেছেন। তাই হবে। ছবি তোলার সময় মাথার কথা মনে ছিল না। ছবি শেষ হতেই মাথা পেয়ে বসেছে।

ডাক্তারবাবুকে ওষুধ দিতে বলে আমি তাঁবুর ভেতরে আসি। আমার কালো ট্রাঙ্ক, ওদের ভাষায় 'Managerial box' খুলে বসি। টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে কলকাতা ও দিল্লীতে—মূল-শিবির ও অগ্রবর্তী মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার সংবাদ জানাতে হবে সারা দেশকে। আত্মীয়-স্বজন শুভানুধ্যায়ী ও সাহায্য-দাতাদের কুশল সংবাদ দিতে হবে। সতপন্থের ছবি দিয়ে 'Picture Post Card' ছাপিয়ে নিয়ে এসেছি। তাতেই চিঠি যাবে। সব মিলিয়ে প্রায় শ'চারেক চিঠি। যাদের সাহায্য ও সহানুভূতির ফলে আমরা আজ চতুরঙ্গীর অঙ্গনে আসতে পেরেছি, তাঁদের শুভেচ্ছাই যে আমাদের দুর্গম পথের পাথেয়।

"হ্যালো, শঙ্কুদা! কি করছ?" অমূল্য তাঁবুতে আসে।

কাজ করতে করতে বলি, "আজ ডাক আসছে, কাল যাবে। তার আগে চিঠি-পত্র সব শেষ করে ফেলতে হবে। অনেক চিঠি। তোরাও একটু হাত লাগা না।"

"লাগাব'খন। আর না লাগিয়েই বা উপায় কি? ম্যানেজারেরর আদেশ, হিমালয়ে এসেও

অফিস করতে হবে। তা করব। কিন্তু তার আগে চুপি চুপি খান বিশেক ইনল্যাণ্ড লেটার দাও তো।"

সতপন্থের ছবি ও সদস্যদের নাম ছাপিয়ে ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার ও লেটারহেড নিয়ে এসেছি। কিন্তু গোমুখীতে বসেই তো প্রত্যেক সদস্যকে পঁচিশখানি করে ইনল্যাণ্ড লেটার দিয়ে দিয়েছি। তাই ওকে বলি, "সেদিন দিলাম যে, সেগুলি কি সব লিখে ফেলেছিস ?"

"না।"

"তাহলে আবার চাইছিস কেন ?"

"সেগুলি ওপরে বসে লিখব, এখানকার জন্য চাইছি। দাও না কয়েকখানা, প্লীজ শঙ্কুদা ! এখন এখানে কেউ নেই, আমি কাউকে বলব না।"

ওর ভাষা ও কণ্ঠস্বরে হাসি পায় আমার। চেষ্টা করেও গম্ভীর থাকতে পারি না। আমি হেসে ফেলি। অমূল্য তাড়াতাড়ি পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আমাকে। এটি ওর ঘুষ। বাধ্য হয়ে বাক্স খুলি।

ইনল্যাণ্ড লেটার নিয়ে অমূল্য নিজের এয়ার-ম্যাট্রেসে চলে যায়। চিঠি লিখতে শুরু করে। চিঠি লেখার জন ওর সবার চেয়ে বেশি। অনেকের ধারণা, তাদের অধিকাংশই নিপুণিকা চতুরিকা ও মালবিকার দলে। তবে অমূল্য দাবী করে সে ধারণা নাকি সত্য নয়।

হলেও বলার কিছু নেই! ক্রিকেটারের যদি হিরোইন থাকতে পারে, তবে মাউন্টেনিয়ারের থাকবে না কেন ? কাজেই সে সব ব্যক্তিগত ব্যাপারের কথা থাক। আমি ভাবছি অমূল্যর চিঠি লেখার অসাধারণ ক্ষমতার কথা। আজ থেকে নয়, ১৯৬৯ সালের নীলগিরি পর্বতাভিযানের আমল থেকেই দেখে আসছি। তারপরে সে পঞ্চচুলি, চন্দ্রপর্বত, ট্রেল্‌স গিরিবর্ত্ম,* প্রি-এভারেস্ট ও কেদারনাথ পর্বত অভিযানে অংশ নিয়েছে, তিনটি শিখরেও আরোহণ করেছে। কিন্তু প্রতিটি অভিযানেই সে শতাধিক চিঠি লিখেছে। সফলকাম চন্দ্রপর্বত অভিযানের নেতা পায়লট অফিসার রাজুর ভাষায়—'This letter writing exploit is unequalled by any mountaineer so far,'

অমূল্য আমাদের নেতা। নেতার কর্তব্য সম্পর্কে সে সর্বদা সচেতন ; বয়সে ছোট হলেও হাসতে হাসতে তাকে অনেক বড় ত্যাগ করতে দেখেছি। কিন্তু কখনও দেখি নি, সে হিমালয়ে এসে কাউকে একখানি ইনল্যাণ্ড লেটার ধার দিয়েছে।

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে আমাদের প্রথম দিনটি প্রায় ফুরিয়ে এলো। প্রভাতে যে সূর্য এসেছিল অনামী শৃঙ্গের ওপার থেকে সে পালিয়ে গেল শিবলিঙ্গের পরপারে। চতুরঙ্গী যতই রঙীন হোক, সে হিমাবহ। তার অণু-পরমাণুতে হিমানীর হানাহানি। সে হিমমণ্ডল। তাই সূর্য ওঠার আগে যে শীতের শিহরণ বোধ করেছিলাম, সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা মূর্ত হয়ে উঠল। মুহূর্তে হিমবাহ হিমশীতল হল।

এই হয়, হিমবাহ অঞ্চলের এই নিয়ম। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন খুব তাড়াতাড়ি উত্তাপ বেড়ে যায়, তেমনি সূর্যাস্তের পরেই নেমে আসে মৃত্যুর শীতলতা। তাই চতুরঙ্গীর অঙ্গনে সূর্য কেবল দিবাকর নয়, সে প্রভাকর—সে জীবনের ভাস্কর।

---

* 'গিরি-কান্তার' দ্রষ্টব্য।

সূর্যোদয় হয়েছিল সকাল সাতটায় আর সূর্যাস্ত হল বিকেল চারটায়। সূর্যাস্ত হল কিন্তু দিনের আলো মিলিয়ে গেল না। আটটার আগে আঁধার নামে না এখানে। তারই মাঝে এসে যাবে ওরা—ওপরের কুলি ও শেরপারা। তারা সহযাত্রীদের সংবাদ নিয়ে আসবে—অভিযানের অগ্রগতির অমূল্য সংবাদ এনে দেবে নেতা অমূল্যকে।

আসবে নিচের কুলিরা—গোমুখী থেকে জ্বালানী কাঠ নিয়ে। আসবে ভীম বাহাদুর, আমাদের ডাক-রানার। আনবে চিঠি—প্রিয়জনের লিপি। আমরা পথ চেয়ে বসে আছি।

ওরা আসে। ওপর থেকে কুলি ও দুজন শেরপা ফিরে আসে। আমাদের অভিযানের অগ্রবর্তী মূল-শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ।

চিঠি লিখেছে প্রাণেশ। 'রাস্তা খুব ভাল। গোমুখী থেকে আসার সময় যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এ পথে তা নেই। পথ প্রায় সর্বদাই ঘাসের ওপর দিয়ে। ধীরেসুস্থে এলেও ঘণ্টা আড়াই লাগবে।'

জানি ওর হিসেবের সঙ্গে আমার হিসেব মিলবে না। ওর আড়াই ঘন্টা মানে আমার অন্তত চার ঘণ্টা। তা হোক্ গে।

প্রাণেশও লিখেছে—'জায়গাটা খুব সুন্দর। আমাদের কেদারনাথ পর্বতাভিযানের মূল-শিবিরের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এখান থেকে সতপন্থকে দেখতে পাচ্ছি না। বাসুকী পর্বত তাকে আড়াল করে রেখেছে। মনে হচ্ছে পথ খুব দীর্ঘ হবে।'

তা তো হবেই। কারণ এখন থেকে সতপন্থের পাদদেশ বারো মাইলের মত। ওখান থেকেও তার দূরত্ব কিছুতেই সাত-আট মাইলের কম নয়।

ওরা বিপদে পড়েছে। প্রাণেশ লিখেছে—'এখানে একটুও কাঠ নেই। অথচ আমাদের সঙ্গে স্টোভের পিন আসে নি। স্টোভ জ্বালানো যাচ্ছে না...

'সে কি !" বরেণ্য বলে ওঠে, 'স্টোভের পিন কি এখানে রয়ে গেছে ?"

"নিশ্চয়ই।" বীরেন ভর্ৎসনার স্বরে বলে।

অসিত ও বরেণ্য খুঁজতে আরম্ভ করে। আমরাও ওদের সাহায্য করতে এগিয়ে যাই।

না, বৃথা পরিশ্রম, কোথাও নেই। স্টোভের পিন পাওয়া গেল না।

"কিন্তু গেল কোথায় ? আনা তো হয়েছে।"

তাতে কি লাভ ? এনে কাজের সময় না-পাওয়া আর না-আনা যে একই কথা।

সর্বনাশ হয়ে যাবে যে। স্টোভ ছাড়া অভিযান অসম্ভব। আর পিন না হলে প্রেসার স্টোভ জ্বলবে না। শেষ পর্যন্ত কি আমাদের ফিরে যেতে হবে, এত আয়োজন পণ্ড হবে ?

"তাই হবে" ! বীরেন বলে, "মনে রাখবেন, একটি দেশলাইয়ের জন্য একটা অভিযান বিফল হয়েছিল।"

"এখন উপায় ? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"উপায় একটা বের করতেই হবে।" অসিত বলে।

"কি উপায় বের করবে ?" বরেণ্য অসহায়।

"কাল যারা কাঠ আনতে গোমুখী যাবে তাদের বলে দিন। ভাল করে খুঁজে দেখবে চারিদিকে।" প্রফেসর উপায় বাতলায়।

"কেবল তাই নয়", আমি বলি, "আজ ভীম বাহাদুর আসবে, কাল সে গঙ্গোত্রী যাবে। আমি স্বামী সারদানন্দকে চিঠি লিখে দেব। আশা করি তিনি পিন যোগাড় করতে পারবেন।"

"কিন্তু ওদের কাজ চলবে কেমন করে ?" বীরেন চিন্তিত।

চিন্তিত সবাই। আগুন ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না হিমালয়ে। অগ্নি অভিযাত্রীদের জীবন। রান্না না হয় না-ই করল, বিস্কুট, চকোলেট ও ফল রয়েছে। কিন্তু পানীয়—গরম পানীয় ছাড়া যে বাঁচা অসম্ভব এখানে। তবু বলি, "আজ যেভাবেই হোক ওরা চালিয়ে নেবে। কাল সকালেই কাঠ পাঠিয়ে দিচ্ছি। এক নম্বর শিবির পর্যন্ত কাঠ পাঠাতে পারব। ইতিমধ্যে পিন পাওয়া যাবে।"

কিছুক্ষণ বাদে ভীম বাহাদুর তাঁবুতে প্রবেশ করে। আমরা সচকিত হয়ে উঠে বসি।

দুঃখের কথা—অমূল্যর কোন চিঠি নেই।

"এখনও চিঠি আসার সময় হয়নি। অমূল্য নিজেকে সান্ত্বনা দেয়।

আমরা হেসে উঠি।

তিনখানি চিঠি এসেছে। লিখেছে অমিতাভ, দাশরথি ও সুনীল।

অমিতাভ—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত, আমাদের গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার এক্সপ্লোরেশান কমিটির সদস্য। এ বছর দার্জিলিং থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। কৈলাস, মানস-সরোবর ও রূপকুণ্ড* প্রত্যাগত অমিতাভ লিখেছে, 'অনিবার্য কারণে আমি তোমাদের সঙ্গী হতে পারি নি, তাই আমার দেহটা পড়ে আছে তোমাদের থেকে বহুদূরে, কিন্তু মন রয়েছে তোমাদেরই সঙ্গে—দুঃসাধ্যকে সাধন করার দুর্গম পথে।'

দাশরথি মানে হিমালয়ান ফেডারেশান ও অনিমা সেন মেমোরিয়াল কমিটির সাধারণ সম্পাদক দাশরথি সরকার লিখেছে—'তোমাদের হিমালয়প্রীতি, তোমাদের আন্তরিকতা ও সততা এবং সুকঠিন দায়িত্ববোধ নিশ্চয়ই সফলতা এনে দেবে। আমাদের শুভেচ্ছা রয়েছে তোমাদের ঘিরে। তোমরা আমার ভালোবাসা নিও।'

তৃতীয় চিঠিখানি লিখেছে সুনীল—উত্তর গাড়োয়াল হিমালয় অভিযানের নেতা ও সুলেখক—শ্রীসুনীল চৌধুরী। সে-ও সুন্দর ভাষায় আমাদের অভিনন্দিত করেছে।

সুনীলের অভিনন্দনের একটা বিশেষ মূল্য আছে। তার পরিচালিত দুটি অভিযানের একটি এই অঞ্চলে—যুগল মানা** (২২,২৯০ ফুট ও ২২,২১৪ ফুট) অভিযান—১৯৬৬। ছ'জন শেরপা ও আটজন অভিযাত্রী ছিলেন দলে। অন্যান্য অভিযাত্রীরা হলেন—সর্বশ্রী সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ রক্ষিত, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু কুমার খান ও ডাক্তার মুক্তিকান্ত মহাপাত্র।

অভিযাত্রীরা ২৪শে আগস্ট (১৯৬৬) কলকাতা থেকে রওনা হন। গোমুখী নন্দনবন ও বাসুকী হিমবাহ পেরিয়ে চতুরঙ্গী ও সুরালয় হিমবাহ সঙ্গমে ১৭,০০০ ফুট উঁচুতে মূল-শিবির স্থাপন করেন ১৪ই সেপ্টেম্বর। ১৮ই সেপ্টেম্বর চতুরঙ্গী, শ্বেতা ও কালিন্দী হিমবাহ সঙ্গমের কাছে ১৮,৫০০ ফুটে অগ্রবর্তী মূল-শিবির স্থাপিত হয়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম ত্রিবেণীতীর্থ যেমন বরণীয়, এই চতুরঙ্গী, শ্বেতা ও কালিন্দী হিমবাহের ত্রিবেণীসঙ্গমও তেমনি স্মরণীয়। সেখান থেকেই তুষারধবল চতুরঙ্গী হিমবাহ প্রস্তরময় রঙীন গ্রাবরেখায় রূপায়িত।

---

* 'গহন-গিরি-কন্দরে' ও 'গিরি-কান্তার' দ্রষ্টব্য।

** মানা পর্বত ও মানা শৃঙ্গ এক নয়। মানা শৃঙ্গ (২৩,৮৬০ ফুট) চামোলী জেলায় অবস্থিত হিমালয়ের একটি সুবিখ্যাত শৃঙ্গ। ১৯৬৬ সালে প্রাণেশ এই শৃঙ্গে আরোহণ করেছে ('উত্তরস্যাং দিশি' অথবা 'মানালীর মালঞ্চে' দ্রষ্টব্য)।

উত্তর-পূর্ব থেকে শুক্লা কালিন্দী ও দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে শুভ্রা শ্বেতা এসে শ্বেতচন্দন চতুরঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

১৯,৩০০ ফুটে কালিন্দী হিমবাহের পশ্চিম পাশে তুষারপ্রান্তরে এক নম্বর শিবির স্থাপিত হয় ১৯শে সেপ্টেম্বর। অভিযাত্রীরা এই শিবির থেকে মানা পর্বতশ্রেণীকে পরিষ্কার দেখতে পান।

২৪শে সেপ্টেম্বর ২০,৫০০ ফুট উঁচুতে একটি অনামী শৃঙ্গের (২২,০৮০ ফুট) পাদদেশে দু'নম্বর শিবির স্থাপিত হয়। জায়গাটি মানাপর্বত-১ শিখরের পূর্ব দিকে খুবই কাছে অবস্থিত। এই দিন থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে থাকে। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই অভিযাত্রীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে মানাপর্বত এক ও দু'নম্বর শিখারোহণের পথ তৈরি করতে আরম্ভ করেন। একজন সদস্য ও একজন শেরপা সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার সন্দেহ করেন যে, তাঁরা নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাড়াতাড়ি তাঁদের নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর চারজন শেরপার একটা মস্ত বিপদ কেটে যায়। তারা যখন মানাপর্বত-১ শিখরের দক্ষিণ-পশ্চিম গিরিশিরায় ২১,২০০ ফুটে দড়ি বাঁধছিল, তখন সহসা তুষারধস নেমে আসে তাদের ওপর। কোমল তুষার বলে তারা প্রাণে বেঁচে যায়, কিন্তু সকলেই আহত হয়। একজন শেরপার আঘাত ছিল খুবই গুরুতর। অমিয় মুখোপাধ্যায় চারজন কুলির সাহায্যে তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু ২৭শে তারিখেই সমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২১,৩০০ ফুট উঁচুতে মানাপর্বত-২ শৃঙ্গে তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিন বিশ্রাম নিয়ে ২৯শে তারিখে অভিযাত্রীরা শিখরের পথ তৈরি করেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। মানাপর্বত-২ সহাস্যে অভিনন্দন জানায় অভিযাত্রীদের—তাদের হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। সানন্দে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় অভিযাত্রীরা—সমর, বৈদ্যনাথ, মহাপাত্র ও তিনজন শেরপা। উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে তাঁরা মানাপর্বত-২ শিখরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। বেলা বারোটায় শিখরের পাঁচশ' ফুটের মধ্যে উপস্থিত হন। তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। জয় প্রায় করায়ত্ত।

সহসা প্রকৃতি বিমুখ হল। মুহূর্তে আকাশের চেহারা পালটে গেল। সূর্য গেল পালিয়ে। অতর্কিতে শুরু হল প্রচণ্ড তুষারঝড়। অসহায় অভিযাত্রীরা বাধ্য হয়ে ২১,৭০০ ফুট থেকে তিন নম্বর শিবিরে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পথও নিরাপদ ছিল না।

আবহাওয়া ভাল হবার আশায় তাঁরা একদিন অপেক্ষা করেন সেখানে—বিফল প্রতীক্ষা। অকরুণ প্রকৃতি। খাবার ফুরিয়ে গেল। আর অপেক্ষা করা অসম্ভব। গভীর দুঃখের সঙ্গে তাঁরা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তাঁদের পক্ষে সে দুঃখ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা সেদিন সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সংবাদে আনন্দিত হয়েছিলাম। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় পর্বতারোহীরা নিশ্চয়ই মানাপর্বত শিখরে আরোহণ করবেন, সেদিনই সুনীল ও তার সহযাত্রীদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে। সেই শুভদিনকে স্বাগত জানাই।

॥ চার ॥

বেড-টি শেষ করেই বরেণ্য বেরিয়ে গেছে বাইরে—মালবাহকদের বোঝা ঠিক করে দিতে। আজও সব মাল ওপরে যাবে না। তাই প্রয়োজন যাচাই করে মাল পাঠানো হচ্ছে। সুজল আমাদের ডেপুটি লীডার-কাম-ট্রান্সপোর্ট অফিসার। কাল সুজল চলে গেছে ওপরে। যাবার সময় নিজের কঠিন দায়িত্বটি ন্যস্ত করে গেছে বরেণ্যর ওপর। বরেণ্য নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করছে। সে আজ থেকে কুলির সর্দার।

কেবল ট্রান্সপোর্ট নয়, কোয়ার্টার মাস্টার অসিতও আজ ওপরে চলে যাবে। বিকেল থেকে এই শিবিরের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থাও বরেণ্যকেই করতে হবে। তাছাড়া ডক্টর সেন ও ডক্টর মুখার্জিকে গবেষণা কার্যে এবং আমাকে হিসেবপত্র ও লেখালেখিতে বরেণ্য সর্বদা সাহায্য করছে। তাই বরেণ্য অপরিহার্য। সে আমাদের এক্সপিডিশান ক্যাবিনেটের মিনিস্টার উইদাউট পোর্টফলিও।

কাজ শেষ করে বরেণ্য তাঁবুতে ফিরে আসে। একই সঙ্গে বেড-টি পেয়েছি আমরা। কিন্তু আমরা বেড-টি সাবাড় করে আবার স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে ঘাপ্‌টি মেরে ছিলাম। বাইরে বড্ড শীত।

বরেণ্য কিন্তু আর শুয়ে থাকার সুযোগ দেয় না। ফিরে এসেই হাঁক-ডাক শুরু করে, "তোমরা কি বল তো, এখনও শুয়ে আছ ! বাইরে বেরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখো একবার।"

সত্যিই লজ্জার কথা। সে এত কাজ সেরে ফিরে এল, আর আমরা... ? না, আর শুয়ে থাকা যায় না। টুপি ও জুতো পরে বেরিয়ে আসি বাইরে।

বরেণ্য ঠিকই বলেছে। সোনালী রোদে হাসছে হিমালয়। সোনা ঝরছে ভাগীরথী, কেদারনাথ আর শিবলিঙ্গ শিখরে—স্বর্ণশিখরে।

সঈদ আজও মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। কাল রাতেও ঘুমোতে পারেন নি—ছটফট করেছেন। তিনি অলটিচুড সিকনেস-য়ে ভুগছেন গোমুখী থেকেই। কিন্তু সে-কথা বড় একটা বলছেন না কাউকে। বরং এত উঁচুতে আসতে পারার জন্য তাঁর গর্বের সীমা নেই। গোমুখীতে এসেই দাবী করেছিলেন, 'I am the first mohammedan who reached Gomukhi.'

অমূল্য তাঁর ভুল ভাঙিয়ে বলেছিল, 'না, সেকালে সার্ভে পার্টিতে একাধিক মুসলমান আর একালে, মানে আমাদের চন্দ্রপর্বত অভিযানে, সিরাজ মনসুরি এসেছে।'

অমূল্যর কথায় সেদিন সঈদ একটু আহত হলেও পরক্ষণে বলেছিলেন, 'তাঁরা তো কেউ সতপন্থে যান নি।'

অমূল্য জবাব দিয়েছিল, 'না।'

'তাহলে ?" সঈদ প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমি যে সতপন্থে চলেছি।'

'কিন্তু আপনার মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে নির্দেশ আছে, আপনি ১৬,৬০০ ফুটের ওপরে যাবেন না।' অমূল্য, বলেছিল।

'Hang your certificate. If you permit me, I'll climb the Giant Satopanth.'

আমরা সেদিন সমস্বরে সঈদ আমেদের জয়ধ্বনি করে উঠেছিলাম।

আশাবাদী সঈদ আমেদের শরীরটা কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে কাল থেকেই। তিনি তাঁবুতে বসে আছেন। অথচ এখন তাঁর বাইরে আসা উচিত। হিমালয়ে এসে যত বেশি বাইরে থাকা যায় ততই ভাল। ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে না লাগালে তাঁর কষ্ট কমবে না। তাই তাঁকে ডাক দিই। বলি, "একবার বাইরে এসে দেখুন, চারিদিকে কি চমৎকার দৃশ্য !"

"Ah! Wonderful !" সঈদ বাইরে বেরিয়েই বলে ওঠেন।

তিনি আবার তাঁবুর ভেতরে চলে গেলেন। কি করছেন ভদ্রলোক !

সে কি, ক্যামেরা বের করছেন কেন ? ছবি তুলবেন নাকি ! কিন্তু তিনি যে অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন !

"তাতে কি হয়েছে ? মাথা ধরেছে বলে কাজ করব না ! চেয়ে দেখুন, কি অভূতপূর্ব সাবজেক্ট। এ কি আর কখনও পাওয়া যাবে ?"

শিবলিঙ্গ শিখরের দিকে তাকাই। ঠিকই বলেছেন সঈদ। তিনি শিল্পী, বিষয় নির্বাচনে তাঁর ভুল হবে কেন ?

মেঘশূন্য নীলাকাশ—ঘন নীল। কোথাও মেঘ নেই। মেঘ নেই অনামী শৃঙ্গের কাছে কিংবা ভাগীরথী ও কেদারনাথ পর্বতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এক টুকরো মেঘ লেগে রয়েছে শিবলিঙ্গের শিরে। কোথা থেকে এলো, কেমন করে এলো, কেনই বা এলো—কেউ জানে না। তবে তারা রয়েছে ওখানে—যেন দেবাদিদেব আপন জটায় একগুচ্ছ ফুল গুঁজে রেখেছেন। আর তাই না দেখে একঝাঁক ঈগল সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। কখনও মেঘের ভেতরে, কখনও বাইরের নীলাকাশে, শিবলিঙ্গ শিখরের চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো বা সূর্যসাক্ষী করে গরুড় মহাদেবকে পরিক্রমা করছে।

সঈদ সৌন্দর্যের পূজারী। তিনি কি এই সুযোগ হাতছাড়া করতে পারেন ! মাথা থাকলেই মাথা ধরে, কিন্তু হিমালয়ে এলেই এমন কম্‌বিনেশান পাওয়া যায় না। আমরা চেয়ে চেয়ে সঈদকে দেখি। তিনি একমনে ছবি তুলছেন।

সঈদের ছবি তোলা শেষ হল। জয়বাহাদুর ক্যামেরা, ব্যাটারী ও স্ট্যাণ্ড ভেতরে রেখে দেয়। সঈদ এসে আমাদের পাশে বসেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, "যাক্‌ বাঁচা গেল, মাথাধরাটা কমে গেছে।"

বিস্মিত হই। মাথা, ধরার অনেক রকম ওষুধ আমরা নিয়ে এসেছি। তার কয়েকটি সঈদ আমেদকে দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু সে-সব ওষুধে সঈদ তেমন ফল পান নি। নামকরা কোম্পানীর বিখ্যাত ওষুধের যে মাথাধরা কমে নি, তাই কিনা সেরে গেল ছবি তুলে, আশ্চর্য !

কেবল আমি নই, সঈদের আচরণে বিস্মিত হয়েছে সবাই। বিস্মিত হয়েছেন ডাক্তারবাবু। বিলেত-ফেরত ডাক্তার হাসিমুখে স্বীকার করলেন, মাথাধরার এমন ওষুধের কথা তাঁরও জানা ছিল না। তবে এই অজ্ঞতার জন্য তিনি আক্ষেপ করছেন না। বরং বলছেন, "হিমালয় আমার জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করছে।"

অধ্যাপক প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে পুনরায় পাঠ নিচ্ছেন।

অমূল্য, হিমাদ্রি ও অসিত তৈরি হচ্ছে। ওরা পোশাক পরছে। পর্বতারোহণে পোশাক ও সাজ-সরঞ্জামের অবদান অসাধারণ। বিগত পনেরো বছরে বিশ্বের পর্বতারোহণ যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে, তার মূলে কেবল পর্বতারোহীদের কৃতিত্ব নয়, আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের অবদানও অনেকখানি।

হিমালয়ে পর্বতাভিযান শুরু হয়েছে ১৮৮৩ সালে। ডাবলু গ্র্যাহাম নামে একজন ইংরেজ যখন দুজন সুইস পথ-প্রদর্শক নিয়ে হিমালয়ে এলেন—সিকিম হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গে আরোহণ করলেন। তারপর থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত অসংখ্য অভিযান হয়েছে হিমালয়ে। এই সব অভিযানের ফলে অনাবিষ্কৃত হিমালয় আবিষ্কৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু ২৫,০০০ ফুটের চেয়ে উঁচু মাত্র তিনটি শিখরারোহণ হয়েছে—অন্নপূর্ণা-১(২৬,৫০৪), নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫) ও কামেট (২৫,৪৪৭)। উচ্চতা অনুসারে এই শৃঙ্গ তিনটির স্থান যথাক্রমে তেরো, একত্রিশ ও চল্লিশ। আর ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৫, মানে লর্ড হাণ্টের সফলকাম এভারেস্ট অভিযান থেকে কমাণ্ডার কোহলির সফলকাম এভারেস্ট অভিযানের মধ্যে, ২৫,০০০ ফুটের চেয়ে উঁচু বাকি পঞ্চান্নটি পর্বতশৃঙ্গের একত্রিশটি বিজিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ, ষষ্ঠ ও নবম থেকে দ্বাদশ শৃঙ্গ কয়টি আছে।*

এই অসাধারণ সাফল্যের প্রথম কারণ শ্রীতেনজিং ও স্যার হিলারীর এভারেস্ট আরোহণের পরে পর্বতারোহণে বিশ্ববাসী বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আর এ আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে।

দ্বিতীয় কারণ পর্বতারোহণে আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার। এ ব্যাপারেও প্রথম সফলকাম এভারেস্ট অভিযানের নেতা লর্ড জন হান্ট পথিকৃৎ। তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করেন। কেবল তাই নয়, এই অভিযানে তিনি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ারও সাহায্য নিয়েছিলেন। যেমন, বিপজ্জনক ঢালের ওপর ঝুলে থাকা তুষারস্তূপের দু'ইঞ্চি মর্টারের গোলায় ভেঙে ফেলেছিলেন, যাতে আরোহণের সময় তুষারধস না নামে। এই সব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্য একটা সাময়িক প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বীকৃত হয়েছে যে, অভিযাত্রীদের নিরাপত্তা ও শ্রম লাঘবের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে কোনো বাধা নেই।

ভারতীয় পর্বতাভিযান আরম্ভ হয়েছে ১৯৫১ সালে, শ্রীগুরুদয়াল সিং-য়ের সফলকাম ত্রিশূল (২৩,৩৬০ ফুট) অভিযান থেকে। কিন্তু ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত পর্বতারোহণের প্রায় সমস্ত সাজ-সরঞ্জামই আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। ফলে ভারতীয় পর্বতারোহীরা এই নয় বছরে ২০,০০০ ফুটের চেয়ে উঁচু মাত্র দশটি শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন।

১৯৬০ সালে ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং-য়ের নেতৃত্বে প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানের প্রয়োজনে ভারতে প্রথম পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম তৈরি শুরু হয়েছে। এখন অধিকাংশ সাজ-সরঞ্জামই আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। আর তারই ফলে পরবর্তী আট বছরে ভারতীয় পর্বতারোহীরা বিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু অর্ধশতাধিক শিখরে আরোহণ করেছেন এবং এদের মধ্যে মাউণ্ট এভারেস্ট অন্যতম।

পর্বতারোহণে সবচেয়ে হালকা সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবু প্রত্যেক পর্বতারোহীকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ কে. জি. মাল বইতে হয়। কারণ পর্বতারোহণের সময় কে

---

*এভারেস্ট (২৯,০২৮)—১৯৫৩, ১৯৫৬, ১৯৬৩ ও ১৯৬৫ ; কে ২ (২৮,২৫০)—১৯৫৪ ; কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৪৬)—১৯৫৫ ; লোহৎসে (২৭,৮৯০)—১৯৫৬ ; মাকালু (২৭,৭৯০)—১৯৫৫ ; ধৌলাগিরি (২৬,৭৯৫)—১৯৬০ ; মানাসলু (২৬,৬৫৮)—১৯৫৬ ; চোউ (২৬,৭৫০)—১৯৫৪ ও ১৯৫৮ ; নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬২০)—১৯৫৩ ও ১৯৬২।

কোথায় কখন আটকে পড়বে, তা কেউ বলতে পারে না। কাজেই স্লীপিং-ব্যাগ, এয়ার-ম্যাট্রেস, ফেদার কোট ও জ্যাকেট ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সর্বদা সঙ্গে রাখা দরকার। এছাড়া সাধারণ পরিধেয় তো রয়েছেই।

পর্বতারোহণের জন্য ক্লাইম্বিং বুট পরতে হয়। এগুলি যথাসাধ্য হালকা করে তৈরি। কিন্তু পাথর তুষার বরফ ও বর্ষার কবল থেকে পা দুটিকে রক্ষা করার জন্য এই জুতোকে শক্ত, গরম এবং ওয়াটার-প্রুফ করতে হয়। তাই এতে রাবার, চামড়া, সোলা ও গরম কাপড়ের স্তর থাকে। আর তারই ফলে একজোড়া জুতোর ওজর দাঁড়ায় প্রায় চার কে. জি.। এছাড়া তিন জোড়া মোজা তো রয়েছেই। পায়ে এক কে. জি. বওয়া পিঠে তিন কে. জি. ওজন বওয়ার সমান। এছাড়াও এই জুতো এমনভাবে তৈরি, যাতে পায়ের ঘাম বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে পারে। নইলে সেই ঘাম জমে তুষারে পরিণত হয়ে পা দুখানিকে জুতোর সঙ্গে জমিয়ে রাখবে। আর তার ফলে ফ্রস্ট বাইট অবশ্যম্ভাবী।

পা দুখানি প্রত্যেক পর্বতারোহীর সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ। কিন্তু শরীরের অন্যান্য অঙ্গের দিকেও তাকে নজর দিতে হয়। তাই আমরা অন্তর্বাসের ওপরে উলি কট-য়ের ড্রয়ার ও ভেস্ট পরেছি। তার ওপর গরম ট্রাউজার, সার্ট ও সোয়েটার। পর্বতারোহণের সময় ফেদার ও উইণ্ড-প্রুফ সুট পরতে হয়। হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উইণ্ড-প্রুফ অপরিহার্য। হাওয়া পর্বতারোহীর একটি প্রধান শত্রু। হাওয়ার বাধা অতিক্রম করা যেমন কষ্টকর, তেমনি হাওয়া চললে উত্তাপ যায় কমে। সত্যিকারের উত্তাপ যেখানে—৩০° সেন্টিগ্রেড, সেখানে যদি ষাট কিলোমিটার বেগে বাতাস বয় তাহলে শরীরে—৯০° সেন্টিগ্রেড শীত অনুভূত হবে।

বিশ হাজার ফুটের ওপরে গলায় মাফলার, মাথায় বালাক্লাবা ও হাতে দস্তানা পরা উচিত। পঁচিশ হাজার ফুটের ওপরে তিন জোড়া দস্তানা পরতে হয়। কখনও খালি হাতে থাকা ঠিক নয়। এই সম্পর্কে একটা মজার উদাহরণ আছে। তৃতীয় ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের (১৯৬৫) সহ-নেতা লেঃ কঃ এন. কুমার একদিন আটাশ হাজার ফুট উঁচুতে ছবি তোলার সময় ভুলে সব ক'টি দস্তানা খুলে ফেলেছিলেন। ছবি তোলার পরে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর হাতের একটি আঙুল ক্যামেরার সাটারের সঙ্গে জুড়ে আছে। অনেক কষ্টে তিনি আঙুলটা ছাড়াতে সমর্থ হলেন, কিন্তু সাটারের সঙ্গে আঙুলের খানিকটা মাংস লেগে রইল। *

তুষারাবৃত হিমালয়ে সর্বদা রঙীন চশমা পরতে হয়। নিজেদের জন্য তো বটেই, কুলিদের জন্যও আমরা রঙীন চশমা নিয়ে এসেছি। কিন্তু কুলিরা অনেকে চশমা পরা পছন্দ করে না। খালি চোখেই বরফের ওপর চলা-ফেরা করে। ফলে তাদের কেউ কেউ তুষারান্ধ হয়ে যায়। এই অন্ধত্ব চিরস্থায়ী নয়, বড় জোর দিন চারেক স্থায়ী হয়। কিন্তু বড়ই কষ্টকর।

তারপরে বলতে হয় আইস এক সের কথা। অন্ধের যেমন যটি, পর্বতারোহীর তেমনি আইস এক্‌স। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, দ্বিতীয় ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের (১৯৬২) পরলোকগত নেতা মেজর জন ডায়াস একবার সোহন সিং নামে জনৈক পর্বতারোহীর সঙ্গে হকি স্টিক নিয়ে পঞ্চচুলি (২২,৬৫০ ফুট) শিখরে আরোহণ করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও দুখানা আইস এক্‌স যোগাড় করতে পারেন নি।

---

* 'Mountaineering Equipment' by Lt. Col. N. Kumar—Himalayan Mountaineering Journal, July, 1967

এই গেল মোটামুটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের কথা। এর পরে আছে দলগত সাজ-সরঞ্জাম। যেমন তাঁবু, দড়ি, এলুমিনিয়াম ও দড়ির মই, আইস ও রক্ পিটনস্, ক্যারাবিনা বা কপিকল. ট্রান্সিস্টার রেডিও, অক্সিজেন, বেতারপ্রেরক যন্ত্র এবং বুটেন গ্যাস ইত্যাদি।

শেষের দুটি জিনিস ছাড়া সবই আমরা নিয়ে এসেছি। ভাল সেট পাই নি বলে আমরা বেতার-প্রেরক যন্ত্র আনি নি। আর বুটেন গ্যাস আমাদের কোনো কাজে আসবে না। কাজে আসবে না অক্সিজেনও। পঁচিশ হাজার ফুটের চেয়ে নিচু কোনো পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। গাড়োয়াল-কুমায়ুনের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫ ফুট) অক্সিজেন ছাড়াই আরোহণ করা হয়েছে।

তবু আমরা এক সিলিণ্ডার অক্সিজেন নিয়ে এসেছি। পর্বতারোহণের জন্য নয়, অসুখ-বিসুখের জন্য। হিমালয়ের আশীর্বাদে আজ পর্যন্ত আমাদের কারও তেমন অসুখ হয় নি।

আজ ১৩ই সেপ্টেম্বর। ওরা আজ অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে যাচ্ছে। সেখানকার উচ্চতা ১৬,৭৫০ ফুট। তার মানে ওরা ১৪,২৫০ ফুট থেকে ১৬,৭৫০ ফুটে যাচ্ছে। এজন্য মাউন্টেনিয়ারিং বুটের কোনো প্রয়োজন নেই। তবু অমূল্য, হিমাদ্রি ও অসিত আজ মাউন্টেনিয়ারিং বুট পরে নিচ্ছে। কারণ ওরা অভ্যেস করে নিতে চাইছে। ওরা আজ বিকেল থেকেই পদসেবা শুরু করবে। শিবিরে পৌঁছে কিছুক্ষণ গরম জলে পা ডুবিয়ে রেখে দেবে। তারপরে শুকনো গামছা দিয়ে ভাল করে মুছে নিয়ে পায়ে পাউডার দিয়ে গরম মোজা ও কাপড়ের ক্যাম্প সু পরে থাকবে।

ওদের বুটের চেহারা দেখে কিন্তু চমকে ওঠে প্রফেসার। সে আলপ্‌সে পর্বতারোহণ করেছে, ইয়োরোপীয়ান পর্বতারোহীদের পোশাক ও সাজ-সরঞ্জাম দেখেছে। কিন্তু স্বদেশে এই তার প্রথম পর্বতাভিযান। বে-সরকারী ভারতীয় অভিযাত্রীরা কি ধরনের পোশাক ও সাজ-সরজ্জাম নিয়ে হিমালয়ে আসে, সে ধারণা নেই তার। আর তাই সে এমন চমকে উঠেছে। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করছে, "এই ছেঁড়া ও শক্ত জুতো পরে আপনারা ক্লাইম্ব করবেন নাকি ?"

"হ্যাঁ।" অমূল্য উত্তর দেয়।

"কি সর্বনাশ, জল আর বরফ ভেতরে ঢুকবে যে—ফ্রস্ট-বাইট হয়ে যাবে। জুতোর ঘায়েই তো পা ক্ষত-বিক্ষত হবে।"

তাই হয়। কাজেই ওরা অনভিজ্ঞ প্রফেসারের কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিজেদের কাজ করে যায়। ঠিকই করছে। কি হবে এসব কথা ভেবে ? কেবল তো জুতো নয়, তাঁবু, স্লীপিং-ব্যাগ, আইস এক্‌স কোন্‌টাই বা অক্ষত ! কিন্তু এই দিয়েই আমাদের অভিযান চালাতে হবে। কারণ আমাদের নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম নেই।

প্রফেসার প্রথম পর্বতাভিযানে এসেছে, তার এসব কথা জানা নেই। তাই সে পরামর্শ দেয়, "ফিরে গিয়েই সাজ-সরঞ্জামের এই দুরবস্থার কথাটা জানিয়ে দেবেন কর্তৃপক্ষকে।"

ওরা পোশাক পরে খেতে বসেছে। ব্রেক-ফ্রাস্ট করছে—ফেনা-ভাত, ঘি, আলুসিদ্ধ ও আচার। আমরা ঋষিকেশ থেকে চাল নিয়ে এসেছি—সুগন্ধী বাসমতী চাল। ঘি এনেছি উত্তরকাশী থেকে—খাঁটি ভয়সা ঘি। আর আলু, হিমালয়ের আলু সর্বশ্রেষ্ঠ। টক্, ঝাল ও মিষ্টি হিমালয়ে বড়ই ভাল লাগে। তাই আচার অভিযাত্রীদের খুবই প্রিয়। প্রিয় সহযাত্রীরা প্রিয় খাদ্য নিয়ে ব্রেক-ফাস্ট করছে।

অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে আজ দুপুরে রান্না হবে না। সে শিবিরের অভিযাত্রীরা আজ এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করতে যাবে, সেই সঙ্গে মাল ফেরী করবে। কাজেই অমূল্যরা দুপুরের খাবারও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে—রুটি, তরকারি, ডিমসিদ্ধ ও ফলের রস। পথে ওরা লাঞ্চ সেরে নেবে।

'মশাই, পাহাড়ে আপনারা কি খান ?' অসংখ্যবার আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রশ্নকর্তাদের ধারণা সমতলের খাদ্য খাওয়া যায় না উচ্চ-হিমালয়ে। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত অক্লেশে কঠিন খাদ্য খাওয়া যায়। আমরা ভাত-ডাল, রুটি-তরকারি, মাছ ডিম কি মাংস, বিস্কুট চিঁড়ে চানাচুর—সবই খেয়ে থাকি। সঙ্গে অবশ্য চা, কফি, কমপ্ল্যান প্রটিনিউল্‌স, গ্লুকোভিটা, ড্রিঙ্কিং চকোলেট, হরলিক্‌স, ফল ও ফলের রস ইত্যাদি থাকে। জ্বালানী কাঠ না পেলে রুটি খাওয়া যায় না—পরোটা খেতে হয়। স্টোভে রুটি বানানো সম্ভব নয়। তবে বিশহাজার ফুটের ওপরে অভিযাত্রীরা সাধারণত তরল খাদ্যই খায়। সঙ্গে বিস্কুট ও চকোলেট থাকে। কিন্তু কখনই মদ থাকে না। থাকা উচিত নয়। পাহাড়ে মদকে বড়জোর প্রয়োজনে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তার বেশি নয়।

খাওয়া শেষ হলে ওরা উঠে দাঁড়ায়। অমূল্য বলে, "কেউ একা কোথাও যেয়ো না। সন্ধ্যের পরে শিবিরের বাইরে যাবে না। কালই এ শিবির গুটিয়ে সবাই অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে চলে এসো।"

উপদেশ নয়, নির্দেশ—নেতার নির্দেশ। নেতা আমাদের সর্বাধিনায়ক। নিয়মানুবর্তিতা পর্বতাভিযানের প্রথম কথা।

আলিঙ্গন শেষে ওরা চলল এগিয়ে, আমরা রইলাম দাঁড়িয়ে। ওরা চলে যাচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে। এর আগে ওদের সবার সঙ্গেই আমি হিমালয়ে এসেছি। ওরা কেদারনাথ পর্বতাভিযানেরও সদস্য ছিল।

সেই প্রিয়সঙ্গীরা আজ আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে দূরে। যাচ্ছে দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে। কবে কোথায় কিভাবে ওদের সঙ্গে আবার দেখা হবে জানি না। কিন্তু এই যে নিয়ম। গৌরবময় অনিশ্চয়তার জন্যই পর্বতারোহণ এত আনন্দময়।

গতকাল সুজল স্বপন প্রাণেশ করুণা ও জামিদ যে পথে চলে গিয়েছে, আজ অমূল্য অসিত ও হিমাদ্রি সেই পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। কাল ওরা যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, আজ এরাও সেইভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের চমক ভাঙল। আমরা বাস্তবে ফিরে এলাম। কঠিন কর্কশ অকরুণ বাস্তব। হৃদয়াবেগের কোনো স্থান নেই পর্বতাভিযানে।

স্টোভ-পিন পাওয়া যায় নি। এখানে তো নয়ই, গোমুখীতেও না। আজ সকালে ভীম বাহাদুর ডাক নিয়ে গঙ্গোত্রী গেছে। স্বামী সারদানন্দের কাছে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু ভীম বাহাদুর তো পরশুর আগে ফিরে আসতে পারবে না। পরশুর যে এখনও দুদিন বাকি ! আবহাওয়া ভাল থাকলে কাল এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অগ্রগামী যাত্রীরা পরশু দু'নম্বর শিবিরের পথ তৈরি করবে।

কেমন করে করবে ? স্টোভ না হলে যে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া সারদানন্দ যদি পিন যোগাড় করতে না পারেন ?

বরেণ্যকে বলি, "আর একবার খুঁজে দেখবি নাকি ?"

"কি ?" বরেণ্য জিজ্ঞেস করে।

"স্টোভ-পিন।"

"অনেক খুঁজেছি, আজ সকালেও দেখেছি। এখানে নেই।"
"তাহলে গেল কোথায় ?" বীরেন বলে।
"আমার বিশ্বাস গোমুখীতেই রয়ে গেছে।" বরেণ্য জবাব দেয়।
"কিন্তু কুলিরা তো কাল খুঁজে পায় নি !"
"ওরা খুঁজতে পারে নি।"
"আজ খুঁজতে বলে দিয়েছিস ?" জিজ্ঞেস করি।
"না। কারণ তাতে কোনো লাভ হতো না।"
"তাহলে কি স্টোভ-পিন উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই হবে না !" বিরক্ত হই বরেণ্যর ওপরে।
"হবে বৈকি কি।" বরেণ্য বলে, "আমি যাচ্ছি।"
"কোথায় ?" আমরা বিস্মিত।
"গোমুখী।"
প্রস্তাবটা ভালই। কিন্তু বেলা ন'টা বেজে গেছে। দুর্গম ও দীর্ঘ পথ। আজই ফিরে আসতে হবে। তাই বলি, "যাবি যখন ঠিক করেছিস, তখন সকালে কুলিদের সঙ্গে চলে গেলি না কেন ?"
"অমূল্যরা ওপরে গেল, ওদের রওনা না করে দিয়ে তো আর যাওয়া যায় না ! যাক্‌গে, চিন্তা করো না, আমি সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসব।"
"কাজটা খুব সহজ নয় বরেণ্য।" বীরেন বলে।
"তবু তো যেতে হবে বীরেনদা !"
"হ্যাঁ।" বীরেন একটু চুপ করে থাকে, তারপরে বলে, "চলো, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।"
বরেণ্য যেন জ্বলে ওঠে, "এইগুলি তোমার বাড়াবাড়ি বীরেনদা। চেনা পথ, যাব আর আসব। তোমার আবার সঙ্গে যাবার দরকার কি ? তার চেয়ে তুমি প্রফেসারের সঙ্গে হিমবাহে যাও, পাথর বরফ আর জল যোগাড় করে নিয়ে এসো। আর শঙ্কুদা ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করুক।"
আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু বীরেন বলে, "তাহলে মেটকে সঙ্গে নিয়ে যাও। গ্রাবরেখার পথ, একা যাওয়া ঠিক নয়।"
"তাই করো বরেণ্য !" ডাক্তারবাবু বলেন।
প্রফেসারও সমর্থন করে তাঁকে। আমিও ঘাড় নাড়ি।
অতএব মেটকে ডেকে পাঠানো হল। কুলিরা চলে যাবার পরে তার অফুরন্ত অবসর। সে তাঁবুতে ঢুকেছে। হয়তো বা প্রথম রাউণ্ড দিবানিদ্রার আয়োজন করছে। প্রকৃতপক্ষে পর্বতাভিযানে মেট সবচেয়ে সুখী মানুষ। সে নিজহাতে কিছুই করে না, কিন্তু তাকে ছাড়া কোন কাজ হয় না।
তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেয় ওরা। খেয়ে নিয়ে বরেণ্য ও মেট রওনা হয়ে যায় গোমুখী। যায় স্টোভ-পিন আনতে। আমাদের কাছে এখন গঙ্গা আনয়নের মতই। বরেণ্য আজ ভগীরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ।
প্রফেসার বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে নেমে যায় হিমবাহের ভেতরে।
ডাক্তারবাবুও তাঁর পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। প্রথমে ইঁদুরগুলোর ওপরে পরীক্ষা চলল, তারপরে তিনি আমাকে নিয়ে পড়লেন। ডাক্তারবাবুর পরীক্ষার বিষয়বস্তু 'Response of

finger temperature of sudden cold before and after acclimatisation to high-altitude' এবং 'Temperature distribution over the human head in high altitude.'

ডাক্তারবাবু আমাকেই অভিযানের একমাত্র বেকার সদস্য বলে ধরে নিয়েছেন। তাই তাঁর ফিজিওলজিক্যাল রিসার্চের দায় সবচেয়ে বেশি সামলাতে হচ্ছে আমাকেই। এই বিরক্তির ব্যাপারটাকে অভিযানের অন্তর্ভুক্ত না করলেই হত। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে না আনলেই ভাল ছিল দেখছি।

আমার কথা শুনে হেসে ফেলেন ডাক্তারবাবু। বলেন, "কিন্তু মশাই, আমার ছুটির জন্য সবচেয়ে বেশি দরবার তো আপনিই করেছেন।"

"এখন বুঝতে পারছি, ভুল করেছি।"

"তাহলে ভুলের মাশুল দিন। চুপচাপ বসে থাকুন, আমাকে কাজ করতে দিন।"

ডাক্তারবাবু 'LIGHT' Resistance Thermometer ও Stop-watch ইত্যাদি যন্ত্রসহযোগে তাঁর পরীক্ষা শুরু করে দেন, আর আমি নীরবে সেই অত্যাচার সয়ে যাই।

এখনও আকাশ তেমনি মেঘ-মুক্ত। ভাগ্যদেবীর অশেষ কৃপা। হিমালয় এবারে আমাদের প্রতি বড়ই সদয়। তাঁকে প্রণাম করি।

হিমবন্ত হিমালয়—আমাদের চারিদিকে। সামনেই ভাগীরথী শৃঙ্গমালা। বলতে গেলে আমরা তার পাদদেশে। তবে ভাগীরথী বলা ভুল। ভাগীরথী নয়, ভাগীরথী-২ (২১,৩৬৪)। তিনটি শৃঙ্গ নিয়ে ভাগীরথী পর্বতশ্রেণী। এক নম্বর (২২,৪৯৫) ও তিন নম্বর (২১,১৭৬)। শৃঙ্গ দুটিকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। ভাগীরথী-২ তাদের আড়াল করে রেখেছে। দু' নম্বরের দক্ষিণে তিন এবং তার দক্ষিণে এক নম্বর। উচ্চতা অনুযায়ী নম্বর দেওয়া হয়েছে। গতবার কেদারনাথ অভিযানের মূল-শিবির তপোবন অর্থাৎ গঙ্গোত্রী হিমবাহের অপর তীরে শিবলিঙ্গ পর্বতের পাদদেশ থেকে ভাগীরথী পর্বতমালার তিনটি শৃঙ্গকেই দেখতে পেয়েছি। ভাগীরথী পর্বতশ্রেণীকে বড়ই ভাল লাগত ওখান থেকে। আমি কেবল তার দিকে চেয়ে থেকেই আমার সেই নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে অতিবাহিত করেছি। আমার মনে হল, একখানি শ্বেতপাথরকে বাটালি দিয়ে খোদাই করে বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করেছেন তাকে। প্রতিবার বাটালি চালাবার সময় তিনি ভেবেছেন—কোথায় কতটুকু খোদাই করলে তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে।

তপোবন থেকে ভাগীরথী-২ অবিস্মরণীয়। সকালে রোদ ওঠার আগে তাকে দেখে মনে হত যেন চুনাপাথরে তৈরি। তারপরে তার সারাগায়ে সোনা-রূপার ছুটোছুটি পড়ে যেত। কিন্তু কেবল সোনালী ও রুপোলী নয়, কালো আর বাদামীর বাহারেও বিমোহিত হয়েছি। সারাদিন ধরে নানারঙের লুকোচুরি খেলা চলত তাকে ফিরে। মাঝে মাঝে মেঘদল সেই খেলার সঙ্গী হত। আর তাই দেখে দেখে দিন কেটে যেত আমার।

এবারে সেই ভাগীরথীর আরও কাছে এসেছি। কিন্তু কোথায়! আমার সেই স্বপ্ন-সুন্দর ভাগীরথীকে তো আজ আর দেখতে পাচ্ছি না!

শিবলিঙ্গকে কিন্তু বড়ই ভাল লাগছে এবারে। শিবলিঙ্গ বিচিত্র, সে তুলনাহীন। গতবার আমি ছিলাম তার পাদদেশে। তবু গতবার যেন তার এই সুন্দর ও সুমহান রূপের সঙ্গে পরিচিত হইনি। আজ তার দিকে তাকিয়ে আমি বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ছি।

কেন এমন হচ্ছে! তাহলে কি ভাগীরথীর সৌন্দর্য কমেছে আর শিবলিঙ্গের সৌন্দর্য বেড়েছে?

না। সৌন্দর্য নয়, দূরত্ব। আজ আমার সঙ্গে ভাগীরথীর দূরত্ব যেমন কমেছে, তেমনি শিবলিঙ্গের দূরত্ব বেড়েছে। সুন্দর দূর থেকে সুন্দরতর। নৈকট্য সৌন্দর্যকে অপহরণ করে।

আচ্ছা, কত মানুষ তো এসেছেন এই চতুরঙ্গী হিমবাহে। এসেছেন বির্‌নি, পালিস, শিপ্‌টন, অসমাস্টোন ও মার্টিন। এসেছেন অস্ট্রো-জার্মান ও সুইস অভিযাত্রীরা। এসেছেন রণেশদা, উমাপ্রসাদবাবু,* স্বামী আনন্দ** ও কত জানা-অজানা অভিযাত্রী। তাঁরাও তো সবাই শিবলিঙ্গের দিকে তাকিয়ে আমারই মতো এমনি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছেন।

কেন জানি না আজ শিবলিঙ্গ শিখরের দিকে তাকিয়ে বার বার তাঁদের কথাই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বির্‌নির কথা—Capt. E. St. J. Birnie. ১৯৩১ সালে পর্বতারোহণে প্রথম যোগদান করেই তিনি এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন নিতান্তই অনভিজ্ঞ। হিমালয় তো দূরের কথা আল্‌পসেও যান নি তার আগে। Frank S. Smythe কামেট (২৫,৪৪৭) অভিযানে তাঁকে দলভুক্ত করেছিলেন। কারণ তিনি খুব ভাল হিন্দুস্থানী বলতে পারতেন। ট্রান্সপোর্ট অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। অন্যান্য সদস্যরা কেউই হিন্দুস্থানী বলতে পারতেন না। অন্য সদস্যরা হলেন—Wing Commander E. B. Beauman, R. L. Holdsworth, Eric Shipton এবং Dr. Raymond Greene. দশজন শেরপা ছিল তাঁদের দলে। ২১শে ও ২৩শে জুন (১৯৩১) অভিযাত্রীরা শিখরে আরোহণ করেন। সেকালের সর্বোচ্চ শৃঙ্গারোহণ। আর অনভিজ্ঞ বির্‌নি দ্বিতীয় শিখর অভিযাত্রী দলের সদস্য ছিলেন।***

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই অভিযান সফল হল। তখনও তাঁদের হাতে প্রায় একমাস সময়। ফিরে তো একদিন যেতেই হবে, কিন্তু কত কষ্ট করে আসা! তাই সময় অর্থ আর খাবার যখন আছে, তখন চারিদিকটা একটু ঘুরে দেখলে কেমন হয়? তাছাড়া ষাট বছর আগে অঙ্কিত এ অঞ্চলের যে মানচিত্র আছে, তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।

আঞ্চলিক সমীক্ষা ও মানচিত্র সংস্কারের জন্য সদস্যরা গামশালি অতিক্রম করে, যে পথে A. L. Mumm, T. G. Longstaff ও C. G. Bruce ১৯০৭ সালে ভুইন্দার খাল থেকে বদ্রীনাথ এসেছিলেন, সেই পথে বদ্রীনাথ পৌঁছান। পরে অলকানন্দার তীর ধরে ঘাসতলী। তাঁরা আরোয়া উপত্যকার উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা করেন। তারপর একটি নতুন গিরিপথ দিয়ে বির্‌নি চতুরঙ্গী হিমবাহে এসে উপস্থিত হন। এই গিরিপথটি আজও Birnie's Pass বলে পরিচিত।

বির্‌নি চতুরঙ্গী হিমবাহ ধরে এই পর্যন্ত, অর্থাৎ গঙ্গোত্রী-চতুরঙ্গী সঙ্গম পর্যন্ত আসেন ও এ অঞ্চলের একটি মানচিত্র (Sketch map) অঙ্কন করেন। সেই মানচিত্রটি পরবর্তীকালের সমীক্ষকদের খুবই সাহায্য করেছে।

বির্‌নির পরে ১৯৩৩ সালে এ অঞ্চলে এসেছেন Marco Pallis. তাঁর সমীক্ষাও নির্ভুল নয়; যেমন, মার্কো পালিস ভাগীরথী-২ শৃঙ্গটিকে সতপন্থ-উত্তররূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল ভাগীরথী পর্বতশ্রেণী সতপন্থের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু মার্কো পালিসই প্রথম চতুরঙ্গী

---

* 'গঙ্গাবতরণ'—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

** 'Across the Gangotri Glacier by Swami Anand.'

***'Kamet Conquered' by Frank S. Smythe.

হিমবাহের বিশদ সমীক্ষা করেন। সমীক্ষাকালে তাঁরা বিশহাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন। সমীক্ষা শেষে তিনি চতুরঙ্গী হিমবাহ, কালিন্দীখাল (১৯,৫১০) ও মানা গিরিবর্ত্ম (১৮,৪০০) অতিক্রম করে তিব্বতে চলে যান।

তাঁর পরে এ অঞ্চলে এসেছেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী Eric E. Shipton* এবং H. W. Tilman** এসেছেন ১৯৩৪ সালে। তাঁরা বেরিয়েছিলেন গাড়োয়াল হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (এখন ভারতীয় হিমালয়) ২৫,৬৪৫ ফুট উঁচু নন্দাদেবী শৃঙ্গের পথ খুঁজতে। ছ' সপ্তাহ্ ধরে চেষ্টা করার পরে তাঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু বর্ষা নেমে যায়। তাঁদের চলে আসতে হয় যোশীমঠে। কথা ছিল, বর্ষাকালটা তাঁরা বিশ্রাম করবেন সেখানে। বর্ষার শেষে আবার যাবেন নন্দাদেবীর পথ খুঁজতে।

কিন্তু তাঁদের মত অশান্ত পর্বতারোহীরা কি শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারেন ! এক সপ্তাহ বিশ্রাম নেবার পরই তাঁরা অস্থির হয়ে উঠলেন। বেরিয়ে পড়লেন বদ্রীনাথের পথে। কারণ, অলকানন্দা উপত্যকায় বৃষ্টি কম হয়।

প্রথমে তাঁরা মানা গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত সমীক্ষা করেন। তারপর গঙ্গোত্রী হিমবাহের পথ খুঁজতে থাকেন। তাঁদের আশা ছিল ভাগীরথী খড়ক দিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে আসা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হল। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁরা বির্‌নির গিরিবর্ত্ম দিয়েই চতুরঙ্গী হিমবাহে আসেন। তাঁরাও গঙ্গোত্রী-চতুরঙ্গী সঙ্গম অর্থাৎ আমাদের এই শিবির পর্যন্ত এসেছিলেন।

টিলম্যান ও শিপ্‌টনের পরে অসমাস্টোন আসেন এ অঞ্চলে—১৯৩৬ সালে। তাঁর পরে J. A. K. Martyn ও J. T. M. Gibson. তাঁরা আসেন ১৯৩৭ সালে। তাঁরাও এ অঞ্চলের জরিপ (Plane-table Survey) করেন।

তাঁদের পরে আসেন অস্ট্রো-জার্মান (১৯৩৮) ও সুইস (১৯৪৭) অভিযাত্রীরা। তাঁরা আসেন পর্বতারোহণ করতে। বিস্ময়কর তাঁদের সাফল্য।....

কিন্তু সেকথা পরে ভাবা যাবে। ডাক্তারবাবু মুক্তি দিয়েছেন আমাকে। আজকের মত তাঁর গবেষণা শেষ হয়েছে। এবার নিজের কাজ শুরু করা যাক। কাল শিবির গুটিয়ে অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে চলে যাচ্ছি। কাল সময় পাবো না। পরশু সকালে ডাক যাবে। কাজকর্ম সব আজই শেষ করে ফেলতে হবে।

ওরা ফিরে আসে—বীরেন ও প্রফেসর। প্রফেসর যেন আনন্দে উপচে পড়ছে। সে আজ অনেক নমুনা সংগ্রহ করতে পেরেছে। এজন্য অবশ্য তাদের খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছে। বীরেন পর্বতারোহী। তার এখন পরিশ্রম গা-সহা। কিন্তু প্রফেসর। বলতে গেলে হিমালয়ের দুর্গম-গিরি-কান্তারে এই তার প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু তাকে দেখে কে বলবে সেকথা ! সে ফিরে এসেই মাইক্রোস্কোপ নিয়ে বসেছে।

---

* শিপ্‌টন ১৯৩১ সালের ২১শে জুন স্মাইথের সঙ্গে কামেট শৃঙ্গ আরোহণ করেন। তিনি ১৯৩৫ ও ১৯৫১ সালের এভারেস্ট, ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ সালের কারাকোরাম এবং ১৯৫২ সালের চো-উ অভিযানে অংশ নিয়েছেন।

** টিলম্যান এই সমীক্ষার দু'বছর বাদে ১৯৩৬ সালের ১৯শে আগস্ট নন্দাদেবী শিখরে আরোহণ করেন। তিনি ১৯৩৮ সালের এভারেস্ট অভিযানের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ২০শে জুন ভারতীয় অভিযাত্রীরাও নন্দাদেবী শিখরে আরোহণ করেছেন।

কাজ-কর্ম আর ভাবনা-চিন্তায় ভরা একটি দিন ফুরিয়ে আসে। চতুরঙ্গীর অঙ্গনে তৃতীয় গোধূলি ঘনিয়ে এলো। আজ ১৩ই সেপ্টেম্বর। দু'সপ্তাহ হল আমরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি।

ওপরের কুলিরা ফিরে আসছে। মানুষ নয়, যেন কয়েকটি সচল বিন্দু— সূর্যাস্তের জগৎ থেকে সূর্যালোকের জগতে আসছে। আসছে আঁধার থেকে আলোর রাজ্যে। বিন্দুগুলি বড় হচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা মানুষের মূর্তি ধারণ করল। এখন সারিবাঁধা চলমান মানুষের মিছিল। তারা একে একে নেমে আসছে প্রস্তরময় চতুরঙ্গীর অঙ্গনে। আমরা তাদের পথ চেয়ে বসে আছি। ওরা খবর আনছে—সহযাত্রীদের খবর, অভিযানের অগ্রগতির খবর।

সেতীরাম আসে সবার আগে। জিজ্ঞেস করি, "ক্যায়সা হালচাল ভাই?"

"আচ্ছাই হ্যায় সাব্।'

"জ্যায়সা?"

"এক লম্বর কেম্প্‌কা বহুৎ বঢ়িয়া জাগা মিল গ্যয়া। সাবলোগ কাল চলে যায়েঙ্গে।"

সুসংবাদ সন্দেহ নেই। আমরা আনন্দিত হই।

সেতীরাম তার উইণ্ড-প্রুফ জ্যাকেটের পকেট থেকে একখানি কাগজ বের করে আমার হাতে দেয়। খুলে দেখি চিঠি—অসিতের চিঠি। চিঠিখানি বীরেনের হাতে দিই। বীরেন জোরে জোরে পড়তে থাকে—

এ. বি. সি.
১৩. ৯. ৬৮

'কম্‌রেড্‌স,

আমরা নির্বিঘ্নে অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে পৌঁছে গেছি। আমার তিনঘণ্টা লেগেছে। প্রথম দিকের মোরেনটুকু বাদ দিলে রাস্তা ভালই। মনে হয় যেন পার্ক স্ট্রীট দিয়ে হাঁটছি। কিন্তু মাইরি একটাও স্কার্ট-পরা মেয়ে দেখতে পেলাম না।

যাক্ গে, সে দুঃখের কথা। যেকথা বলছিলাম, মোরেন কিন্তু কেবলই পাথর নয়, মাটিও আছে—ঝুরো মাটি। অবশ্য মাটি কম, পাথরই বেশি। এই পথটুকু খুবই কষ্টকর। পাথর থেকে পাথরে পা দিয়ে চলতে হয়। প্রায়ই পা পিছলে যায়। মাঝে মাঝে ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে। একটা প্রকাণ্ড পাথর তো হিমাদ্রির ওপরে প্রায় এসে পড়েছিল। পড়লে আর রক্ষে ছিল না। ভাগ্যিস সে দেখতে পেয়েছিল। আইস এক্‌সের সাহায্যে কোনো রকমে নিজেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু তার আইস এক্‌স উদ্ধার করতে অমূল্য আর আমাকে হিমসিম খেতে হয়েছে।

তোমাদের শিবির থেকে এ শিবিরের দূরত্ব চার মাইলের মত। এর মাঝে মাইলখানেক মোরেনের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। তারপরই সেই গিরিশিরা বা চতুরঙ্গীর দক্ষিণতীর। একে তোমরা নন্দনবনের রক্ষা-প্রাচীরও বলতে পারো।

গিরিশিরাটি তোমাদের শিবির থেকে যেমন সরু দেখায় মোটেই কিন্তু তেমন নয়। বেশ চওড়া। নানা রঙের ছোট ছোট ফুল আর নানা রকমের ফার্ণে বোঝাই। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে থাকা ফুলগুলি কিন্তু গন্ধহীন নয়। তাদের গন্ধে উতলা হয়েছি আমরা।

A. B. C. মানে Advance Base Camp তথা অগ্রবর্তী মূল-শিবির।

ডাইনে নন্দনবন বাঁয়ে চতুরঙ্গী। নন্দনবন নন্দনকাননের* মত ফুলবন না হলেও সে ফুলহীন নয়। ছোট ছোট ফুল আছে অনেক। গিরিশিরার ওপর থেকে তাদের হদিস পাওয়া যায় না। তাতে কিন্তু তার সৌন্দর্য কমেনি। তাকে দেখায় একখানি সবুজ কোমল গালিচার মত। আর সেই সবুজের বুক চিরে বয়ে চলেছে রুপোলী ঝর্ণা। ভাগীরথী পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে শিশু ভাগীরথী। চটুল চরণে চলেছে মর্ত্যলোকে।

নন্দনবন ও চতুরঙ্গীর দিকে নজর রাখতে গিয়ে কখন সে শিবলিঙ্গকে হারিয়ে ফেলেছি খেয়াল নেই। গিরিশিরার মৃত্তিকাময় ঢাল বেয়ে আমরা নেমে এসেছি নিচে অর্থাৎ নন্দনবনের দিকে। দূর থেকেই তাঁবু দেখেছি। এক সময়ে পৌঁছেছি এখানে। পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে বসে পড়েছি তাঁবুর সামনে আর সঙ্গে সঙ্গে কেটলি ও মগ হাতে ছুটে এসেছে ছুঞ্জে। সেলাম ঠুকে সানন্দে বলেছে—সাব্ চায় লিজীয়ে।

সুজল স্বপন প্রাণেশ ও করুণা দুজন শেরপা ও কুলিদের নিয়ে সকালে গিয়েছিল সতপন্থের দিকে। সুন্দর বামক ও চতুরঙ্গী সঙ্গম থেকে মাইল আধেক ভেতরে ঢুকে তারা এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করেছে। মালপত্র রেখে ফিরে এসেছে। কাল বাকি মাল নিয়ে ওরা এক নম্বরে চলে যাবে।

বলছে—যাবে, কিন্তু কেমন করে! এদিকে যে স্টোভ-পিন পাওয়া যায় নি। আমিও আজ অনেক খুঁজলাম। না, এখানে আসে নি। শেষে কি স্টোভ-পিনের জন্য অভিযান বন্ধ করে দিতে হবে!

আর একটা জিনিস বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে—বাড়ির চিঠি। চোদ্দ দিন হয়ে গেল, বাড়ির খবর....।'

"থামুন মশাই, থামুন দেখি....আর পড়তে হবে না।" প্রফেসর সহসা বলে ওঠে।

বীরেনকে থামতে হয়। সে অসিতের চিঠিখানি আমার হাতে দিয়ে প্রফেসরের দিকে তাকায়।

প্রফেসর আবার বলে, "অসিতবাবুর সবই ভাল, কিন্তু ভদ্রলোক বড্ড Homesick. আমি মশাই আট মাসের ছেলে আর মাত্র দু'বছর হল বিয়ে করা বউকে ফেলে চলে এসেছি, একবারও বাড়ির কথা বলছি না!..."

"অসিতদা ছেলেদের বড্ড ভালোবাসেন।" বীরেন অসিতবাবুর হয়ে ওকালতি করতে চায়।

কিন্তু সফল হয় না। ডাক্তারবাবু পাল্টা-প্রশ্ন করেন, "কে না বাসে? তোমার ছেলেকে তুমি ভালোবাসো না? ডক্টর মুখার্জি তাঁর ছেলেকে, সঈদ সাহেব তাঁর ছেলে-মেয়েকে ভালোবাসেন না? আমি আমার মেয়েদের ভালোবাসি না? আমারও তো বাড়ির চিঠি পাই নি।"

"তাহলে অসিতদা এত উতলা হয়েছেন কেন?" বীরেন হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

ডাক্তারবাবুও হাসিমুখেই উত্তর দেন, "বাৎসল্য নয়, প্রেম— প্রেমের ফাঁদ পাতা হিমালয়ে। নন্দনবনের অপার সৌন্দর্য অসিতবাবুকে বিরহী যক্ষ করে তুলেছে। আর তাই বাড়ির জন্য তার মন এমন উতলা হয়ে পড়েছে।....হাসবেন না ডক্টর মুখার্জি, যে কোন

---

* 'Valley of Flowers' by Frank S. Smythe'. শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'হিমালয়ের পথে পথে' ও 'নীল-দুর্গম' দ্রষ্টব্য।

সময়ে আমরাও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারি।”

হাসি বন্ধ করা তো দূরের কথা, ডাক্তারবাবুর উক্তি শুনে প্রফেসর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আমরাও তার সঙ্গে যোগ দিই।

কথাটা মনে পড়ে আমার—বরেণ্যর কথা। সন্ধ্যে হয়ে এলো। টর্চ এবং ওয়াটারপ্রুফ নিয়ে গেছে। মেট সঙ্গে আছে। আর তার ফিরে আসার সময় হয় নি এখনও। কুলিরা গোমুখী থেকে কাঠ নিয়ে ফিরে এসেছে। তাদের সঙ্গে দেখাও হয়েছে ওদের—চিন্তার কিছু নেই।

তবু চিন্তা হয়। চিন্তা তো বরেণ্যর জন্য নয়, চিন্তা স্টোভ-পিনের জন্য। যদি পিন না পাওয়া যায়, তাহলে ? তাহলে কি অভিযান বন্ধ করে দিতে হবে ? বৃথা হবে এত আয়োজন ?

“একটা কাজ করলে কেমন হয় ?” বীরেন বলে, “আমরা জন দুয়েক খানিকটা এগিয়ে যাই না ?”

“তাতে লাভ ?” প্রশ্ন করি।

“ছেলেটা সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েছে। ফ্ল্যাস্কে করে চা ও কয়েকখানা বিস্কুট নিয়ে এগিয়ে গেলে ওর সুবিধেই হবে।”

প্রস্তাবটা ভালই। টিকারামকে তাড়াতাড়ি চা বানাতে বলি। একটা উনুনে সর্বদাই জল ফুটছে। দেরি হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু কে কে যাবে ? বীরেন যাচ্ছে। তার সঙ্গে আর কারও যাওয়া দরকার। জিজ্ঞেস করি, “আমি আসব নাকি তোমার সঙ্গে ?”

“না।” বীরেন কিছু বলে ওঠার আগেই প্রফেসর বলে ওঠে, “আমি যাচ্ছি। আপনি এখানে থাকুন।”

আমি থাকি কিন্তু সেতীরাম ও জয়বাহাদুর থাকে না। তারা প্রফেসরের আদেশ অমান্য করে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এ সময় মোরেনের পথে কিছুতেই সাহেবদের তারা একা একা ছেড়ে দেবে না। আশ্চর্য ভালোবাসা হিমালয়ের এই দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষগুলির।

সেতীরামের কাঁধে ফ্লাস্ক, জয়বাহাদুরের হাতে বিস্কুটের প্যাকেট। উইণ্ড-প্রুফ পরিহিত বীরেন এবং প্রফেসর টর্চ ও আইস এক্‌স নিয়ে ওদের পেছনে নেমে যায় চতুরঙ্গী হিমবাহে। আমি বসে থাকি একখানি পাথরের ওপর। এখান থেকে অনেকটা দূর অবধি দেখা যায়। ওরা আমাকে সঙ্গে নেয় নি। আমি এইখানে বসে থাকব। ওদের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করব।

হিমবাহ—চতুরঙ্গী হিমবাহ। ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছি—‘হিমরেখার উপরিভাগে তুষার ক্রমশঃ যত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকে, ততই তাহার নীচের অংশ অধিক চাপের ফলে কঠিন বরফে পরিণত হয়। আবার পৃথিবীর আকর্ষণে ও তুষারস্তূপের নীচের অংশ পিচ্ছিল হওয়াতে তাহার কতক অংশ পর্বতের উপত্যকা দিয়া অতি ধীরে অগ্রসর (বৎসরে কয়েক গজ মাত্র) হইয়া বরফের নদীরূপে নামিয়া আসে। সেই জন্য ইহাকে বলে হিমবাহ বা Glacier.

হিমবাহের সহিত প্রচুর পাথরের টুকরা, কাঁকর ও বালি প্রবাহিত হয়। ইহার কতক অংশ হিমবাহের নিম্ন ও পার্শ্বদেশে গিয়া সারিবদ্ধভাবে সঞ্চিত হয়। ইহাকে গ্রাবরেখা বলে।’

সেদিনকার শিশুমনের ওপর এই বর্ণনা কি প্রভাব বিস্তার করেছিল, আজ মনে নেই। তবে সেদিন যে আমার সম্পর্কে স্বচ্ছ কোনো ধারণা হয় নি, তা বেশ মনে আছে।

সেদিন বড়জোর বুঝেছিলাম যে, হিমালয় হিমমণ্ডল। আজ দেখতে পাচ্ছি এখানে পাহাড়ে

পাহাড়ে হিমানীর মেলা। বৃষ্টির বদলে তুষারপাত। বাতাসের জলকণা তুষারকণায় রূপান্তরিত হয়ে পাহাড়ের মাথায় সঞ্চিত হয়। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে সেই তুষারধারা নেমে আসে নিচে—দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিখাতে কিংবা পাহাড়ী উপত্যকায়। আস্তে আস্তে অগ্রসর হয় নিচের দিকে। দু'পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ছোট ছোট হিমবাহ এসে বড় হিমবাহদের সমৃদ্ধ করে তোলে। পাহাড় থেকে পাথর আর মাটি গড়িয়ে পড়ে তার গায়ে। সে তাদের নিয়েই চলতে থাকে। যত নিচে আসে ততই উত্তাপ বাড়ে, আর সেই উত্তাপে ওপরের বরফ যায় গলে। ফলে এক সময় দেখা যায় ওপরে কোথাও বরফ নেই, কেবল পাথর আর পাথর। হিমবাহের পাথুরে সেই অঞ্চলকে বলে গ্রাবরেখা।

কিন্তু গ্রাবরেখা হিমবাহেরই অংশ। সেখানেও বরফ আছে। আছে নিচে—প্রস্তর প্রবাহের নিচে। কোথাও বা পাথরের সঙ্গে মিশে। নদী যেমন মোহনায় পলিমাটি দিয়ে বদ্বীপ-য়ের সৃষ্টি করে হিমবাহও তেমনি সঙ্গমে পাথরের টিলার সৃষ্টি করে। এই টিলাকে বলে Terminal moraine বা প্রান্তিক গ্রাবরেখা।

ভূগোলের সেই সংজ্ঞা থেকে হিমবাহ বা গ্রাবরেখার প্রকৃত প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করা বৃথা। এটি ভূগোল-প্রণেতাদের অযোগ্যতা নয়, বিশাল বিচিত্র ও রহস্যময় হিমবাহের আকৃতি ও প্রকৃতিই এজন্য দায়ী। চোখে না দেখলে হিমবাহের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব।

ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে। ওরা আসছে। আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। আমি হিমবাহ ও গ্রাবরেখার কথা ভুলে যাই। বীরেন ও প্রফেসর গেছে বরেণ্যকে এগিয়ে নিয়ে আসতে। বরেণ্য গোমুখী গেছে স্টোভ-পিন খুঁজে আনতে। পেয়েছে কি ?

ওরা না এলে কেমন করে তা জানতে পারব ? বীরেন ও প্রফেসর বেশ চালাকি করেছে। বরেণ্যকে এগিয়ে আনার নাম করে এগিয়ে গিয়েছে। এতক্ষণে জানতে পেরেছে—পিন পাওয়া গেছে কিনা ?

আর আমি ? বোকার মত এখানে বসে আছি। ইতিমধ্যে দিনের আলো গেছে মিলিয়ে। সঙ্গীদ ও ডাক্তারবাবু তাঁবুর ভেতরে চলে গিয়েছেন। আমি বসে রয়েছি বাইরে, ওদের পথের দিকে তাকিয়ে। অন্ধকার পথ—পাশে পাহাড়, কালাপাহাড়।

ওরা আসছে। আলো দেখা যাচ্ছে। টর্চের আলো—অনেকগুলি টর্চ। এখানে এ সময় ওরা ছাড়া আর কে আসবে ? ওরাই আসছে। কিন্তু যা আনতে গিয়েছিল, তা আনতে পেরেছে কি ! বরেণ্য কি সেই পরম ঈপ্সিত পিনের প্যাকেটটি খুঁজে পেয়েছে ?

কেমন করে বুঝব ! ওরা যে এখনও দূরে। তবে বেশ গল্প করতে করতে আসছে মনে হচ্ছে। বোধহয় পেয়েছে।

ওরা আসছে। উঠে আসছে এই প্রান্তিক মোরেনের ওপর। এবারে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। কালাপাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হবে আমার প্রশ্ন। ঠিক শুনতে পাবে ওরা।

আর সবুর সয় না। আমি চিৎকার করে উঠি, "বরে.....ণ... !"

"কি...ই...ই ?"

"পে .য়ে....ছিস ?"

"কি...ই....ই ?"

"পি....ন ?"

"না....আ....আ !"

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কি সর্বনাশ, স্টোভ-পিন পাওয়া যায় নি ! এখন উপায় ?
আর ভাবতে পারি না। আবার বসে পড়ি পাথরখানির ওপরে।

ওরা উঠে আসে ওপরে। দেখতে পায় আমাকে।

"কে ?" বীরেন বলে।

আমি সাড়া দিই না। চুপ করে বসে থাকি।

বরেণ্য এগিয়ে আসে। বলে, "কে, শঙ্কুদা ?"

"হ্যাঁ।" কোনোমতে জবাব দিই। কিন্তু ওর দিকে তাকাতে পারি না।

টর্চটা বাঁ হাতে নিয়ে ডানহাতটা প্যান্টের পকেটে ঢোকায় বরেণ্য। কি যেন একটা বের করে পকেট থেকে। সেটাকে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলে,"এই নাও।"

"কী ?"

"স্টোভ-পিন।"

"পেয়েছিস ! কোথায়, দেখি !" আমি ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নিই।

হ্যাঁ। সত্যিই পেয়েছে—পাওয়া গেছে সেই পরম ঈপ্সিত বস্তু। গোমুখী থেকে নিয়ে এসেছে বরেণ্য। বরেণ্য নয়, ভগীরথ। স্টোভ-পিন নয়, গঙ্গা।

"তবে যে একটু আগে বললি, পাওয়া যায় নি ?" বরেণ্যকে জিজ্ঞেস করি।

"আমি বলি নি। তোমাকে নার্ভাস করে দেবার জন্য প্রফেসর বলেছেন।"

"না, এই বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি।"

"বুড়ো বাবা, এবারে তাঁবুতে চলুন। ডাক্তারবাবু ও সঈদ সাহেবকে খবরটা দেওয়া যাক যে, পিন পাওয়া গেছে, আর তাই আজ রাতে মাংস খাওয়া হবে।"

সবাই হেসে উঠি। হাসির শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চতুরঙ্গীর অঙ্গনে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

॥ পাঁচ ॥

গানের সুরে ঘুম ভাঙে। বরেণ্য গান গাইছে—

'আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন সে কাটায় গণি গণি বিশ্বলোকের চরণধ্বনি
তারাই আলোয় গায় সে সারা রাতি।'

বেশ ভাল গান গায় বরেণ্য, গলাটি ভাল। আমাদের দলে সে-ই একমাত্র গায়ক। গান অবশ্য সবাই গায়। তবে সে গান নিজের জন্য, অপরকে শোনাবার মত নয়। তাই আমরা চুপ করে গান শুনি। বরেণ্য গাইছে—

'কত যুগের রথের রেখা বক্ষে তাহার আঁকে লেখা,
কত কালের ক্লান্ত আশা
ঘুমায় তাহার ধূলায় আঁচল পাতি॥
আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।'

ঘুম ভেঙেছিল ঘণ্টাখানেক আগে। টিকারাম 'বেড-টি' নিয়ে এসেছিল। চা খেয়ে আবার

স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়েছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল বরেণ্যর সুরে।

গান শেষ করে বরেণ্য বেরিয়ে যায় বাইরে। কিন্তু আমরা শুয়ে থাকি। কোনো তাড়া নেই আজ। চিঠি ও রিপোর্ট লেখা হয়ে গেছে। হিসেবপত্রও সব মিলিয়ে রেখেছি। কুলিদের রওনা করে দিয়ে আমরা খেয়ে নেব। রুকস্যাক কাঁধে রওনা হব।

মেট মন বাহাদুর তাঁবুতে আসে। সেলাম করে সুপ্রভাত জানায়, "গুড মর্ণিং সাব!"

"গুড মর্ণিং।" ডাক্তারবাবু সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই তার দিকে ছুঁড়ে দেন। মেট পর্বতাভিযানের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। সে কুলির সর্দার। কুলি ছাড়া পর্বতাভিযান অচল।

মেট ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সবিনয়ে বলে, "অভি আপলোগকা বাহর নিকালনা পড়েগা।"

"কিঁউ?"

"তাম্বু খুলনে পড়েগী।"

তাই তো, কথাটা যে খেয়ালই ছিল না। আজ যে বাসা বদলের দিন। এখানকার বাস উঠল। তাঁবু খুলতে হবে। তাঁবু যাবে সবার আগে। নইলে ওখানে বাসা বাঁধব কেমন করে। এক শিবির থেকে অন্য শিবির—পর্বতাভিযানের পূর্বরাগ।

তাড়া নেই ভেবে শুয়ে ছিলাম। কিন্তু মেট মনে করিয়ে দিল কথাটা। তাড়া না থাকলেও শুয়ে থাকার সুযোগ নেই। অতএব উঠি বসি। তাড়াতাড়ি এয়ার-ম্যাট্রেসের হাওয়া ছেড়ে দিই। কাগজ কলম, টর্চ ওয়াটার বটল, মোজা মাফলার, টুপি দস্তানা রুমাল আরও কত জিনিস ছড়িয়ে আছে বিছানার ওপরে। পর্বতাভিযানে এই বিছানাটুকু ছাড়া আর নিজস্ব বলে কিছু নেই—সবই সরকারী। তাই বিছানার ওপরেই নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে হয়।

জিনিসপত্র রুকস্যাক ও কিটব্যাগে ভরে বাক্সটাও গুছিয়ে ফেলি। এ তো বাকস নয়, অভিযানের অফিস—একে অবহেলা করার উপায় নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোছগাছ শেষ হয়ে যায়। মেট বলে, "আপনারা বেরিয়ে যান, আমি মালপত্র বের করে দিচ্ছি।" সে কুলিদের ডাক দেয়।

ডাক্তারবাবু কিন্তু খালিহাতে বের হন না। ইঁদুরের খাঁচাটি হাতে নিয়ে তিনি আমাদের অনুসরণ করেন। আমরা বাইরে এসে বসি।

চারিদিকে চকচকে রোদ। এখানে-ওখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে তুষার পড়ে আছে। শেষরাতের শিশির-জমা তুষার।

আজ আকাশটা যেন আরও পরিষ্কার। তাই কেদারনাথ ডোম ও কেদারনাথ শৃঙ্গ যে আলাদা শিখর, তা এখান থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। অকরুণ প্রকৃতির জন্য শৃঙ্গের হাজারখানেক ফুট নিচ থেকে গতবার আমাদের ফিরে আসতে হয়েছে। তাই সে এমন করে আজ আমাদের কাছে ডাকছে। যতদিন না শৃঙ্গের তুষার-শীর্ষে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত হবে, ততদিন আমরা এ আহ্বান শুনতে পাব। হিমালয়ের ডাক যে নিশির ডাক।

এ ডাক ভারতবাসীর কানে এসেছে মহাভারতের যুগে। তারা সে ডাকে সাড়াও দিয়েছে। কিন্তু সে সাড়ার সঙ্গে পর্বতারোহণের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ভারতবাসীদের নিয়ে প্রথম পর্বতারোহণ প্রচেষ্টা হয় ১৯৪২ সালে। দুন স্কুলের শিক্ষক আর. এল. হোল্ডসওয়ার্থ* এবং জে. এ. কে. মার্টিন** বদ্রীনাথের ওপরে আরওয়া (অর্বা) উপত্যকায় একটি পদযাত্রার আয়োজন করেন। এই পদযাত্রায় পনেরো বছর বয়সের যে তিনটি কিশোর অংশ নিয়েছিল, তাদের একজনই পরবর্তীকালের মেজর নান্দু জয়াল—ভারতীয় পর্বতারোহণের জনক।***

তারপর ১৯৫১ সালে এই দুন স্কুলেরই শিক্ষক শ্রীগুরুদয়াল সিং ত্রিশূল (২৩,৩৭০´) অভিযানের আয়োজন করেন। তিনি ২১শে জুন এই শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেন। ত্রিশূল ভারতীয় পর্বতারোহণের প্রথম শিখর। আবার বিশ্ব পর্বতারোহণেও প্রথম সুউচ্চ হিমালয় শিখর। ১৯০৭ সালের ১২ই জুন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী ডঃ টি. জি. লংস্টাফ্ এই শিখরে আরোহণ করে পর্বতারোহণে নবযুগের সূচনা করেন।

১৯৫১ থেকে ১৯৬৮—এই আঠারো বছরে ভারতীয় পর্বতারোহীরা এভারেস্টসহ অর্ধশতাধিক হিমালয় শিখরে (বিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু) আরোহণ করেছেন। এ সাফল্য অতিশয় গৌরবময়। কিন্তু কেবল শিখরা- রোহণের খতিয়ান দিয়েই ভারতীয় পর্বতারোহণকে পরিমাপ করা যাবে না।

উনিশ বছরের ছেলে সুমন দুবে ছাব্বিশ হাজার ফুট উঁচু সাউথ কলে তিন রাত কাটিয়েছে।**** সুমনের চেয়েও ছোট একটি মেয়ে • কিন্তু তার আগেই ২২,৪০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেছিল। দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযানের ডাক্তার ক্যাপ্টেন সোয়ারেস ২১,২০০ ফুটে দেড় মাস কাটিয়েছিলেন। গুরুদয়াল সিং জনৈক সহযাত্রীর সঙ্গে অক্সিজেন ছাড়াই ছ'রাত সাউথ কলে ছিলেন। আর শিখরাভিযাত্রী কমাণ্ডার এম. এস. কোহলি, শ্রীসোনাম গিয়াৎসো ও শ্রীহরি দাং ২৭,৬৫০ ফুটে তিন রাত অতিবাহিত করেছেন এবং অধিকাংশ সময়ই তাঁরা অক্সিজেন ছাড়া ছিলেন। ১৯৬১ সালের সফলকাম নীলকণ্ঠ (২১,৬৪০´) অভিযানের নেতা লেঃ কেঃ এন. কুমার তিনজন সহযাত্রী ও তিনজন শেরপাকে নিয়ে খাদ্য ও পানীয় ছাড়া প্রায় বিশ হাজার ফুটে তিনদিন কাটিয়েছিলেন! তাঁদের সঙ্গে কেবল একজন মানুষের বাসোপযোগী একটি তাঁবু ছিল।

ভারতীয় পর্বতারোহীদের অসাধারণ সাহসিকতা ও সীমাহীন ত্যাগ স্বীকারের এমন আরও অসংখ্য বিস্ময়কর উদাহরণ আছে। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, পর্বতারোহী

---

* ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথের সফলকাম কামেট (১৯৩১) অভিযান এবং নন্দনকানন (Valley of Flower) আবিষ্কারের সহযাত্রী। তিনি এই উপত্যকার নাম রাখেন Flora Valley.

** ইনিই জে. টি. এম. গিবসনের সঙ্গে ১৯৩৭ সালে চতুরঙ্গী হিমবাহ জরিপ করেছিলেন।

*** দার্জিলিং পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনের প্রথম অধ্যক্ষ এবং সফলকাম আবি গামিন (২৪,১৩০´—১৯৫৩), কামেট (২৫,৪৪৭´—১৯৫৫) ও সাকাং (২৪,০০০´—১৯৫৬) অভিযানের নেতা। ১৯৫৮ সালের চো-উ (২৬,৭৩০´) অভিযানের সময় তিনি নিমোনিয়ায় অকালে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

**** দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযান—১৯৬২। তার চেয়ে কম বয়সের কোনো অভিযাত্রী আজ পর্যন্ত আর এভারেস্ট অভিযানে অংশ নেয় নি।

•নিমা। ১৯৫৯ সালের চো-উ অভিযানে (মহিলা)। এই অভিযানের সময় নেতৃ মাদাম কোগান (ফরাসী) জনৈকা বেলজিয়ান সহযাত্রিণীর সঙ্গে শহীদ হন।

হিসেবে আমরা কারও চেয়ে কম নই। তাই আজ সকৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম জানাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অমর আত্মার উদ্দেশে। তাঁরা যদি দার্জিলিং পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা না করতেন, তাহলে বিশ্ব পর্বতারোহণের ইতিহাসে আমরা আজ এই গৌরবময় অধ্যায় রচনা করতে পারতাম না।

ভারতীয় পর্বতারোহণে বাঙালীর অবদান সামান্য নয়। ভারতের প্রথম বে-সরকারী ও উচ্চতম বে-সরকারী অভিযান আয়োজিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে—নন্দাঘুন্টি ও মানা অভিযান। গত ন'বছরে আঠারোটি পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে পশ্চিমবাংলা থেকে। এর মধ্যে অধিকাংশ অভিযানই সফল হয়েছে। কিন্তু এতগুলি পর্বতাভিযানের পরেও হিমালয় আমাদের কাছে অপরিচিত রয়ে গেছে।

এইদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের কমিটি গতবারে কেদারনাথ অভিযানের আয়োজন করেছিলেন এবং এবারে সতপন্থ অভিযানের আয়োজন করেছেন। বারোজন অভিযাত্রী অংশ নিয়েছিল কেদারনাথ পর্বতাভিযানে—অমূল্য সেন (নেতা), প্রাণেশ চক্রবর্তী (সহ-নেতা), বীরেন সরকার, সুজল মুখোপাধ্যায়, হিমাদ্রি ভট্টাচার্য, করুণাময় দাস, অসিত বসু, রামনাথ শর্মা, কমল গুহ, বরেণ্য মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার স্বপন রায় চৌধুরী ও আমি।

এছাড়া ছিলেন প্রতিরক্ষা-দপ্তরের একজন ইঞ্জিনিয়ার, জিওলজিক্যাল সার্ভের জনৈক ভূতাত্ত্বিক ও বটানিক্যাল সার্ভের চারজন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী। আঠারোজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল দল। এত বড় কোনো বে-সরকারী দল ইতিপূর্বে কোনো পর্বতাভিযানে যায় নি। কিন্তু আমরা সঙ্গে মাত্র পাঁচজন শেরপা নিয়েছিলাম। কারণ গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার সঙ্গে স্বল্প-ব্যয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে কেদারনাথ পর্বত (কেদারনাথ শৃঙ্গ ও কেদারনাথ ডোম) আরোহণ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য।

আমরা ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৭) কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ১২ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় উত্তরকাশী পৌঁছই। ১৮ই বিকেলে আমরা গঙ্গোত্রী আসি। তপোবনে মূল-শিবির স্থাপিত হয় ২৩শে সেপ্টেম্বর।

২৫শে সেপ্টেম্বর গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও কীর্তি বামক সঙ্গম থেকে দেড় মাইল ভেতরে, কীর্তি হিমবাহের ওপরে, ১৬,৫০০ ফুটে অগ্রবর্তী মূল-শিবির স্থাপিত হয়। ২৭শে তারিখে কীর্তি বামক পেরিয়ে কেদারনাথ ডোমের পশ্চিম গিরিশিরার নিচে ১৮,৭৫০ ফুটে এক নম্বর শিবির স্থাপিত হয়। পর্বতারোহী সদস্যরা শেরপাদের সঙ্গে এই শিবির পর্যন্ত মাল রয়েছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে নেতা অমূল্য, করুণাময়, রামনাথ ও তিনজন শেরপাকে নিয়ে কেদারনাথ ডোম শীর্ষে আরোহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তারা সকাল পৌনে ন'টার সময় রওনা হয়েছিল। ওদের ধারণা ছিল ঘন্টা চারেকের মধ্যেই শীর্ষে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু প্রায় আট ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে বিকেল সাড়ে চারটার সময় ওরা শীর্ষে উপস্থিত হতে সমর্থ হয়।

কেদারনাথ ডোমের শীর্ষদেশ সমতল ও সুবিরাট। প্রায় দু'শ ফুট দীর্ঘ ও বিশ ফুট প্রশস্ত। তারা সেখানে জাতীয় ও অন্যান্য পতাকা প্রোথিত করে। কাগজে হিমালয়-শহীদ অনিমা সেন, গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও অমর রায়ের নাম লিখে একটি কৌটোয় ভরে তুষার চাপা দেয়। তারপর ফটো তুলে করুণাময় কেদারনাথের কাছ থেকে বিদায় নেয়। শ্রান্ত ও অবসন্ন অভিযাত্রীরা অসংখ্য তুষার-ফাটল পেরিয়ে রাত আটটার সময় শিবিরে ফিরে আসে।

তারপর প্রাণেশ ও সুজল নতুন পথে কেদারনাথ শৃঙ্গে অভিযান চালায়। দুজন শেরপাকে

নিয়ে ওরা ৩রা অক্টোবর ২১,৮০০ ফুটে তিন নম্বর শিবির স্থাপন করে। কথা ছিল পরদিন পথ তৈরি করবে ও ৫ তারিখে শৃঙ্গে আরোহণ করবে।

ওরা সকলেই ছিল সুস্থ ও সবল। কাজেই সাফল্য সম্পর্কে ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সাধল। সেদিন শেষরাত থেকেই সহসা শুরু হল প্রবল তুষার-ঝড়। তাঁবুর শিক ধরে বসে রইল অভিযাত্রীরা। রাত কাটল, কিন্তু ঝড় কমল না। দুটি স্টোভের একটি বিকল হয়ে গেল। ওরা বুঝতে পারল, দ্বিতীয়টি বিকল হলে মৃত্যু অনিবার্য। তাছাড়া বৃথাই প্রতীক্ষা, প্রকৃতি শান্ত হবে না। অগত্যা সেই তুষার-ঝড় মাথায় করেই ওরা নেমে এলো দু'নম্বর শিবিরে।

আমাদের আশা ছিল, আবার চেষ্টা করব। কিন্তু কেদারনাথ চান নি যে, সে আশা পূর্ণ হয়। নির্দয়া প্রকৃতি শান্ত হল না। আবহাওয়ার উন্নতি হল না কয়েকদিনে। বাধ্য হয়ে কেদারনাথ শৃঙ্গে দ্বিতীয় অভিযান না চালিয়েই আমরা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলাম। চল্লিশদিন বাদে ১৮ই অক্টোবর সকলে সুস্থ শরীরে কলকাতায় ফিরে গেলাম।

এই অভিযানকালে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীরা সওয়া দু'শ প্রজাতি সংগ্রহ করেছেন। ইতিপূর্বে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের কোনো উদ্ভিদ্‌-সমীক্ষা হয় নি। অভিযানের ভূতাত্ত্বিক হরশিল থেকে কীর্তি বামক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভৌগোলিক মানচিত্র সংশোধন করেছেন। বরেণ্য ও করুণাময় মুখীমঠের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা করেছে।

যদিও কেদারনাথ ডোম জয় এ অঞ্চলের উচ্চতম পর্বতারোহণ, তবু তা পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বে-সরকারী পর্বতাভিযাত্রীরা ইতিপূর্বে এর চেয়ে উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় পর্বতাভিযানের ইতিহাসে কেদারনাথ পর্বতাভিযান একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। কারণ এমন বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিপূর্বে কোনো ভারতীয় পর্বতাভিযান আয়োজিত হয় নি।

আমরা কেদারনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারি নি, তাই সে আজ আমাদের আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে কেদারনাথ ডোম যোগ দিচ্ছে কেন? সে-ও আমাদের আকর্ষণ করছে কেন? অমূল্য আর করুণা তো তার স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে করুণাময়-কেদারনাথের কাছে আমাদের সবার প্রাণের প্রণতি নিবেদন করে এসেছে!

এ আকর্ষণ শিখরারোহণের জন্য নয়—এ যে সৌন্দর্যের শাশ্বত আকর্ষণ, ক্ষুদ্রকে বৃহতের আকর্ষণ, মানুষকে প্রকৃতির আকর্ষণ। কেদারনাথ ডোমের চেয়ে উচ্চতর পর্বত-শীর্ষ আছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে। কিন্তু এমন শুভ্র-সুন্দর সুবিস্তৃত তুষার-স্তম্ভ আর নেই। তাই পর্বতারোহীরা তাকে বলেন 'দি গ্রেট-ডোম'—সত্যিই গ্রেট।

আশ্চর্য! কেদারনাথ দেখতে পাচ্ছি, শিবলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছি, এমন কি উল্টোদিকে চতুরঙ্গী হিমবাহের শেষপ্রান্তের সেই অনামী শৃঙ্গটিকে পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দেখছি না ভাগীরথীকে। আকাশে মেঘ নেই অথচ মেঘ জমেছে ভাগীরথীর শিরে—মেঘের ঘোমটায় মুখ লুকিয়েছে ভাগীরথীর শৃঙ্গমালা।

কিন্তু কতক্ষণ সে অভিমান করে থাকতে পারবে! আমরা তো তাকে কাছছাড়া করছি না, বরং আজ তার আরও কাছে গিয়ে বাসা বাঁধছি। তবে আজ আমরা শিবলিঙ্গ ও কেদারনাথকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আর তাঁদের প্রণাম করতে পারব না। মনটা বিয়োগব্যথায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় কি? সতপন্থের কাছে যেতে হলে যে ওঁদের ছেড়ে যেতে হবে!

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে—জোর হাওয়া দিচ্ছে। ইঁদুরগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে। ডাক্তারবাবুর নজর এড়ায় না। তিনি তাড়াতাড়ি মেডিসিন-ট্রাঙ্ক খুলে তুলো বের করেন। খাঁচার চারিদিক তুলো দিয়ে ঢেকে দেন।

কাল থেকে রাম বাহাদুর টিকারামকে সাহায্য করছে। প্রকৃতপক্ষে টিকারাম রাম বাহাদুরকে রান্না শিখিয়ে দিচ্ছে। ওকে আগামীকাল এক নম্বর শিবিরে চলে যেতে হবে। কাল দু' নম্বর শিবির স্থাপিত হবে। ছুণ্ড্রেও চলে যাবে সেখানে।

ছোটখাটো শান্ত-শিষ্ট রাম বাহাদুর খাবার নিয়ে আসে—খিচুড়ি আলুভাজা পাঁপড়-পোড়া, ঘি ও আচার। উপাদেয় লাগছে। বিলেত-ফেরতরা কিন্তু খুশি হন নি এতে। তাঁরা তিনজনে একটা সারডিন্‌স-য়ের টিন নিয়ে বসেছেন। প্রফেসরের তো আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। একটু একটু করে খাচ্ছে আর আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, "Sardine—a small fish of the herring family, abundant about the island of Sardina."

সঈদ আর ডাক্তারবাবুরও নাকি খুব ভাল লাগছে। লাগুক্ গে, আমরা বাপু ও বিলিতি মাছ পাতে নিচ্ছি না, খাওয়াটাই মাটি হয়ে যাবে।

কুলিরা চলে গেল মাল নিয়ে। আমরাও রওনা হলাম—ন'টা বাজে। রাম বাহাদুর আর টিকারাম পরে আসছে। বাসন-পত্র পরিষ্কার করে কিচেন-বাক্স নিয়ে আসতে হবে ওদের। রান্নাঘরটা কিন্তু রয়ে গেল। জ্বালানী আনার জন্য যে পাঁচজন কুলি এখানে থাকবে তারা ঐ ঘরে বাস করবে।

বীরেন চলেছে সবার আগে। তারপর প্রফেসর আমি ও সঈদ আমেদ। সঈদের সঙ্গে ক্যামেরা ও ফিল্মের বাক্‌স নিয়ে জয় বাহাদুর। সবার শেষে বরেণ্য। দুর্গম পাহাড়ী পথে এইভাবেই চলা উচিত। যারা অভিজ্ঞ ও পটু তারা থাকবে সামনে ও পেছনে। অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ ও অপটুরা থাকবে মাঝখানে। বীরেন পথ-প্রদর্শক আর বরেণ্য নিরাপত্তার প্রহরী।

অসিত জানিয়েছে, চতুরঙ্গীর ঐ দক্ষিণ তীর পর্যন্ত যেতে যা কষ্ট, তারপরে পার্ক স্ট্রীট। কেবল মিনি-স্কার্ট পরা মেয়ে দেখতে পাবো না, এই যা। না পাই, এখন শুধু ওখানে উঠতে চাই।

কাজটা কিন্তু খুবই কঠিন। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে চলতে হচ্ছে। কেবল পাথর আর পাথর—চতুরঙ্গীর রঙীন পাথর। সেই প্রস্তর প্রবাহের ওপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ চলতে হচ্ছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই আছাড় খেতে হবে। মুহূর্তের তরে অন্যমনস্ক হওয়া চলবে না। কখন কোথা থেকে কোন্ পাথরটা গড়িয়ে আসবে তার কোন ঠিক নেই। কাল অল্পের জন্য হিমাদ্রি বেঁচে গেছে।

পথ দুর্গম হতে পারে, দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু কোনো পথই অন্তহীন নয়। এক সময় আমরা উঠে এলাম সেই গিরিশিরাসদৃশ চতুরঙ্গীর তীরে—নন্দনবনের রক্ষাপ্রাচীরে।

সত্যিই সুন্দর! সামান্য উঁচু-নিচু একফালি মাটির পথ—যেন নদীর বাঁধ।

সুন্দর দুদিকের দৃশ্য। উত্তরে চতুরঙ্গী—রঙীন প্রস্তর প্রবাহ। তারপরে কালাপাহাড়। মাঝে মাঝে তার গা বেয়ে তুষারপ্রবাহ নেমে এসেছে চতুরঙ্গীর বুকে। তবে তারা চতুরঙ্গীর রঙীন গায়ে সাদার প্রলেপ বুলোতে পারে নি। আর কালাপাহাড়ের পেছন থেকে আসা এই সব তুষারধারা ঠিক সাদা নয়, কেমন যেন ধূসর তাদের রঙ। চতুরঙ্গী সেই সব ধূসরধারাকে আপন রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে।

দক্ষিণ দিক আরও সুন্দর। দক্ষিণে নন্দনবন (১৪,২৩০)। সার্থক তার নাম। আমাদের

পথ থেকে শুরু হয়ে ভাগীরথীর পদপ্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাঁধটা আস্তে আস্তে নেমে গেছে। তারপর প্রায় সমতল সবুজ প্রান্তর—ঘন সবুজ ঘাস আর নানা রঙের ছোট ছোট ফুল। ভাগীরথীর পা ছুঁয়ে পুব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। মাইল তিনেক দীর্ঘ। প্রস্থে প্রায় আধ মাইলের মত। চতুরঙ্গীর সমান্তরাল এক বিস্ময়কর তৃণভূমি। ভাগীরথী শৃঙ্গের তুষার-বিগলিত ধারা কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত করে বয়ে যাচ্ছে তার বুক দিয়ে—স্বর্গের ভাগীরথী চলেছে মর্ত্যের মানুষের কাছে।

আমরা একখানি পাথরের ওপরে বসি। বিশ্রাম করতে নয়, নন্দনবনের স্বর্গীয় শোভা দেখতে। এমনি কোনো দৃশ্য দেখেই বুঝি বা ফ্রাঙ্ক স্মাইথ লিখে গেছেন—"Is there any region......of the world to excel this region in beauty and grandeur ?......it cannot fail to inspire in the dullest a nobler conception of the universe."

কথা ছিল এখানেই আমাদের মূল-শিবির স্থাপিত হবে। পথ সংক্ষেপ করবার জন্য আমরা তা করি নি। এখন মনে হচ্ছে এই মাইল দুয়েক পথ না বাঁচালেই হত।

নন্দনবনের কথা আমি প্রথম শুনেছি রণেশদার কাছে। হিমালয়ান ফেডারেশানের সহ-সভাপতি রণেশকুমার চট্টোপাধ্যায়। শৈলেশ চক্রবর্তী ও অমল দাসের সঙ্গে ১৯৬০ সালে তিনি চতুরঙ্গীর অঙ্গনে এসেছিলেন। কালিন্দীখাল অতিক্রম করে গোমুখী থেকে বদ্রীনাথ গিয়েছিলেন। তাঁরা নন্দনবনে রাত্রিবাস করেছিলেন। এ যুগে তাঁদের আগে আর কোনো বাঙালী নন্দনবনে এসেছেন বলে আমার জানা নেই। তারপর অবশ্য আরও অনেকে এসেছেন। এসেছেন শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়*। তিনি ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে স্বামী সুন্দরানন্দ, মেজর সত্যেন বসু এবং সস্ত্রীক ডাক্তার মণি বিশ্বাসের** সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। তাঁরাও এই পথে বদ্রীনাথ গিয়েছিলেন এবং কালিন্দীখালে রাত্রিবাস করেছিলেন। মিসেস বিশ্বাস কালিন্দীখাল অতিক্রমকারিণী প্রথম বাঙালী মহিলা। তারপর অতিক্রম করেছেন গঙ্গোত্রীর মাতাজী—বাঙালী সন্ন্যাসিনী কৃষ্ণা ভারতী।

ইদানীং আর এ-পথে বদ্রীনাথ যেতে দেওয়া হচ্ছে না। চামোলীর জেলাশাসক ইনার লাইন পারমিট দিচ্ছেন না। গোমুখী-বদ্রীনাথ পথটির শেষাংশ চামোলী জেলায়। কালিন্দীখাল পর্যন্ত উত্তরকাশী জেলা, তারপর চামোলী। কাজেই এই পথ-পরিক্রমা পূর্ণ করতে হলে দুই জেলা-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। চামোলী জেলা-শাসক এখন কেন অনুমতি দিচ্ছেন না, তা আমার জানা নেই।

উত্তরকাশীর জেলা-শাসক কিন্তু অনুমতি দিচ্ছেন। আর সেই অনুমতি নিয়েই কলকাতা থেকে এবার তিনদল পদযাত্রী আসছেন এ-পথে। তাঁদের কালিন্দীখাল দর্শন করে আবার এ-পথেই গোমুখী ফিরতে হবে। এতে অনেক বেশি সময় লাগবে। ফলে অধিক অর্থব্যয় ও পরিশ্রম হবে। তবু তাঁরা আসছেন। আসছেন, কারণ, এমন রোমাঞ্চকর বর্ণগন্ধময় বিচিত্র-সুন্দর পথ হিমালয়ের খুব কমই আছে। আর আছে কালিন্দীখাল—১৯,৫১০ ফুট উঁচু হিমালয়ের দ্বিতীয় উচ্চতম গিরিবর্ত্ম। কুমায়ুন হিমালয়ের অমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য নাকি আর কোনো জায়গা থেকে দেখা যায় না।

---

* 'গঙ্গাবতরণ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
** 'হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ'—শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস।

কেদারনাথ পর্বত অদৃশ্য হয়েছে ভাগীরথীর পেছনে। ভাগীরথী মেঘের ঘোমটা সরিয়েছে। আর শিবলিঙ্গ তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। কি ভাবছে কে জানে!

চতুরঙ্গীর দক্ষিণ তীর দিয়ে আমরা পশ্চিম থেকে পূর্বে চলেছি। সেই অনামী শৃঙ্গটি ক্রমেই বড় হচ্ছে। আমরা তার দিকেই এগোচ্ছি।

প্রত্যেক হিমবাহেরই গতি অত্যন্ত মন্থর—দিনে কয়েক ইঞ্চি মাত্র। চতুরঙ্গী আবার তাদের মধ্যে মন্থরতর।

দু'দিকের পাহাড় থেকে পাথর আর তুষারপ্রবাহ নেমে এসে চতুরঙ্গীকে সমৃদ্ধ করেছে। ছ'টি প্রধান উপ-হিমবাহ আছে চতুরঙ্গীর। উত্তর থেকে এসেছে খালিপেট ও কালিন্দী। খালিপেট বামক এসেছে মানা পর্বতশ্রেণী (২২,২১০) থেকে আর কালিন্দী বামক সৃষ্ট হয়েছে কালিন্দীখাল থেকে। খালিপেট ও চতুরঙ্গী সঙ্গমেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ অনামী শৃঙ্গটি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। আমরা ওর কাছে যাচ্ছি কিনা!

দক্ষিণ থেকে যে চারটি প্রধান উপ-হিমবাহ চতুরঙ্গীতে এসে মিশেছে তারা হল—বাসুকি, সুন্দর, সুরালয় ও শ্বেতা। বাসুকি বামক এসেছে বাসুকি পর্বত (২২,২৮৫) থেকে। যে পর্বতের পেছনে অর্থাৎ পশ্চিমে আমাদের অগ্রবর্তী মূল-শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুন্দর বামক সৃষ্ট হয়েছে সতপন্থ শিখর থেকে। সুন্দর বামক দিয়েই আমাদের পৌঁছতে হবে সতপন্থের পাদদেশে। যেখানে পৌঁছবার জন্য আমরা আজ এখানে—এই চতুরঙ্গীর অঙ্গনে।

সুরালয় বামক এসেছে চন্দ্রপর্বতের একটি সহ-শিখর (satellite) থেকে আর শ্বেতা বামক চন্দ্রপর্বত (২২,০৭৩) থেকে।

চন্দ্রপর্বত—সপ্তমীর চাঁদের মতো একটি শুভ্র-সুন্দর শিখর, সীমাহীন সৌন্দর্যের আধার। চন্দ্রপর্ব-বিজয়ী অমূল্য সেন আমাদের নেতা।

১৯৬৫ সালের সেই অভিযানের আয়োজন করেছিলেন পায়লট অফিসার এম. কে. এম. রাজু। তিনিই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিয়ে অভিযাত্রীদল গঠিত হয়েছিল। অমূল্য ছিল সহনেতা। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন দিল্লীর ডাক্তার সন্তোষ কুমার এবং চন্তমোহন কুমার, গুজরাটের এ. সি. কাশ্যপ ও সিরাজ মনসুরী, হায়দ্রাবাদের এম. আর. অপ্রেমেয়ান এবং পাঞ্জাবের ক্যাপ্টেন কে. এল. কৌশল।

তাঁরা ২৬শে এপ্রিল (১৯৬৫) দিল্লী থেকে উত্তরকাশী পৌঁছান। ভাটোয়ারী, ভৈরবঘাঁটি, গঙ্গোত্রী ও চীরবাসা হয়ে ৩রা মে গোমুখী আসেন। ৪ঠা মে নন্দনবনের বিপরীত দিকে মূল-শিবিরের স্থান নির্বাচন করলেন। অমূল্য সেই অপরিচিত স্থানের নাম দিয়েছিল সুন্দরবন। সেই নামে সে আজও পরিচিত।

১৬,০০০ ফুট উঁচুতে এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচিত হয় ১০ই মে। এর দু'দিন পরে হঠাৎ ভগবান এসে উপস্থিত হন তাঁদের মূল-শিবিরে।

ভগবান! হ্যাঁ, তিনি তাই বলেছিলেন। রাজু ও তাঁর কয়েকজন সহযাত্রী তাঁবুর ভেতরে বসে অভিযানের আলোচনা করছিলেন। সহসা শুনতে পেলেন—"ম্যাঁয় ভগবান হুঁঃ, মুঝে সিগারেট দো।"

সুযোগ পেলে কে না ভগবানকে দেখতে চায়! ওঁরাও তাই তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়েছিলেন—সম্পূর্ণ উলঙ্গ একজন মধ্যবয়সী সাধু সেখানে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিলেন।

ওঁরা ভাবলেন—পথ ভুলে তিনি সেখানে এসে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে ভেতরে নিয়ে সিগারেট ও জামা-কাপড় দিয়েছেন।

সিগারেটে সুখটান দিয়ে ভগবান যা বলেছিলেন তা কিন্তু সাংঘাতিক কথা। পথ ভুলে নয়, ইচ্ছে করেই মালবাকদের অনুসরণ করে তিনি সেখানে এসেছেন। আর তিনি সাধু নন, কলির কেষ্ট। প্রেমিক, ব্যর্থ প্রেমিক। রাধা পরিত্যাগ করেছেন তাঁকে আর সেই শোকে বিগত তিরিশ বছর ধরে হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে তার এই উদ্দেশ্যহীন পরিক্রমা। ভরপেট খাইয়ে সেদিন ওঁরা ভগবানকে বিদায় করেছিলেন অনেক কষ্টে।

যাক্‌গে ভগবানের কথা, এবারে মানুষের কথায় ফিরে আসা যাক্। মানুষ। হ্যাঁ, মানুষ তো বটেই—অভিযাত্রীরাও মানুষ। প্রতি অভিযানেই তারা দুঃসহ মানসিক ও দৈহিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, অমানুষিক পরিশ্রম করে, তবু তারা মানুষ। আর মানুষ বলেই তারা তা করে। কারণ, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

রাজু ও তাঁর সহযাত্রীরা সেই শাশ্বত সত্যই আর একবার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রমাণ করেছেন, মানুষ বিপদকে উপেক্ষা করে অজেয়কে জয় করতে পারে।

১৬ই মে সুরালয় হিমবাহের পশ্চিম তীরে চন্দ্রপর্বতের পাদদেশে দু' নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রপর্বতের সংকীর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম গিরিশিরা বেয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেন এবং ১৭ই মে ২০,০০০ ফুটে তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯শে মে তাঁরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কৌশল, মনসুরী ও দুজন শেরপাকে নিয়ে ভোর সাড়ে চারটার সময় রাজু এই সংগ্রাম শুরু করেন। তাঁরা দক্ষিণ গিরিশিরা দিয়ে শিখরের দিকে এগিয়ে চলেন।

শিখর তখন মাত্র আটশ ফুট দূরে। বড়জোর ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। কাজেই ওঁরা তখন সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত। এই সময় সহসা কৌশলের পা ফসকায়। তার দড়িতে ছিল আঙ দাওয়া। সে ঝুলন্ত কৌশলকে কোনোমতে ধরে রাখে। দ্বিতীয় দড়ির শেষে ছিল দোরজি। সে কৌশলের কাছে এগিয়ে যায়। তার কোমরে দড়ি বাঁধে। তার তখনই আঙ দাওয়ার আইস একস খুলে যায়। সে পড়ে যায়, কৌশল পড়ে, দোরজি পড়ে আর সেই সঙ্গে রাজু এবং মনসুরী। ওঁরা প্রায় হাজার ফুট নিচে পড়ে যান। সবাই আহত হন, তবে প্রাণে বেঁচে যান। অনেক কষ্টের পরে আহত অভিযাত্রীরা গভীর রাতে তিন নম্বর শিবিরে ফিরে আসেন। তারপরে দু' নম্বরে। পরাজিত অভিযাত্রীরা তখন ফিরে আসার কথা চিন্তা করছেন। কি করবেন, দলের পাঁচজন আহত ? খাবার ও কেরোসিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

এই সময় হঠাৎ তাঁরা শুনতে পেলেন—'Everest has been conquered by the Indians.'

রেডিওর ঘোষণা শুনে লাফিয়ে উঠলেন ওঁরা। আরও শুনলেন যে, পঞ্চচুলি অভিযানে রাজু ও অমূল্যর সহযাত্রী ক্যাপ্টেন অবতার সিং চীমা শিখর আরোহণকারীদের অন্যতম।

'আমরাও পারব।' অমূল্য বলে ওঠে।

'কী ?' রাজু প্রশ্ন করেন।

'চন্দ্রপর্বত শিখরে ভারতের পতাকা প্রোথিত করতে।'

'আমাদের খাবার নেই, তেল নেই!'

'যা আছে, তাই নিয়ে যাব।'

'পারবে ?'

'নিশ্চয়ই!' অমূল্য দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেয়। আর তাই শুনে আহত নেতা আশাবাদী সহ-

নেতাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

পেরেছিল। অমূল্য, কাশ্যপ, শেরপা গিয়ালজেন ও আঙ দাওয়া চন্দ্রপর্বত শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছিল মাত্র তিনদিন পরে। ফিরে এসে আনন্দাশ্রু বিগলিত স্বরে অমূল্য বলেছিল—'Raju! We have fulfilled....the dream....the task...you laid out for us. We have made it....We have made the Chandra Parbat—the Moon peak on May 22, 1965.'

চারজন লোকের তিনদিনের খাবার ও আড়াই বোতল কেরোসিন তেল নিয়ে ২৩শে মে সকাল দশটার সময় শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। অমূল্যর নেতৃত্বে চন্দ্রপর্বত অভিযানের দ্বিতীয় শিখরাভিযাত্রীদল। চারজন মানুষ, তিনদিনের খাবার—তিন হাজার ফুট আরোহণ। যে রকম খাড়া পাহাড়—একদিনে সম্ভব নয়। তাই মাঝখানে একটা শিবির করতে হবে। রাজু নিচে যাবার সময় শিবির ভেঙে নিয়ে গেছেন।

ওরা নতুন পথে এগিয়ে চলে। আবহাওয়া কখনই ভাল ছিল না। কিন্তু ওদের দেখে প্রকৃতি যেন আরও ক্ষেপে উঠল। ওরা কিন্তু সেই তুষার-ঝড়কে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলল। সুরালয় হিমবাহকে ডান দিকে রেখে ওরা অব্যাহত গতিতে পুবদিকে এগিয়ে চলে।

একটানা ছ' ঘন্টা চলার পর থামল ওরা। প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝেও দেড় হাজার ফুট আরোহণ করেছে দেখে খুশি হয় অমূল্য। সেইখানেই শিবির স্থাপন করে। চিন্তা-ভাবনার ভেতর দিয়ে রাতটা কেটে যায়। পরদিন সকালে উঠে দেখে সুনীল আকাশে উজ্জ্বল সূর্য। ওরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেয়। কোমরসমান তুষার ভেঙে রওনা হয়। সামনেই চন্দ্রপর্বত—সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর, প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর। তাই সে তাদের কাছে ডাকছে। ওরা তাই ছুটে চলে।

সকাল সাড়ে দশটার সময় ওরা ২০,৫০০ ফুটে পৌঁছয়: আকাশ তখনও মেঘ-মুক্ত। একটু বিশ্রাম নেয় সেখানে। তারপর আবার এগিয়ে চলে। যতই ওপরে ওঠে গতি হয় মন্থরতর। ওরা জানে আবহাওয়া যে কোন মুহূর্তে খারাপ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবু ওরা জোরে চলতে পারে না। চলবে কেমন করে, শেষ পাঁচশ' ফুট আরোহণ করা যে বড়ই কষ্টকর! শ্বেতপাথরের মতো শক্ত ও মসৃণ পিচ্ছিল বরফের ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে ওদের। বরফের ঘন সবুজ রঙ দেখে বুঝতে পারে খুবই পুরনো বরফ। তার ওপর আবার খাড়া পঞ্চাশ ডিগ্রির মতো কোণ করে শিখরশিখা উঠে গেছে। তাই বেয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছে। কখনও বা আইস এক্স দিয়ে ধাপ কাটতে হচ্ছে, কখনও কাঠের পিটন পুঁততে হচ্ছে, কখনও বা কোমরে দড়ি বেঁধে একে অপরকে টেনে তুলছে।

এইভাবে এক-পা দু'পা করে অগ্রসর হয়ে বেলা আড়াইটার সময় ওরা শিখরে আরোহণ করে। 'Oh, what a peak!' অমূল্য বলে উঠল, 'It is a perfect summit of mountaineers dream.'

"এই যে ম্যানেজার! ওদিকে যাচ্ছেন কোথায়?"

ডাক্তারবাবুর কথায় আমার ভাবনা ভেঙে যায়। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। আরে, তাই তো। ওরা সবাই নিচে নামছে আর আমি কিনা সোজা এগিয়ে যাচ্ছিলাম! অমূল্যর চন্দ্রপর্বত আরোহণের কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম চন্দ্রপর্বত নয়, আমি সতপন্থ অভিযানে এসেছি। মূল-শিবির থেকে অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে চলেছি। ভাগ্যিস ডাক্তারবাবু ডাক দিয়েছিলেন!

গিরিশিরাসদৃশ চতুরঙ্গীর তীর ছেড়ে ওরা নিচে নেমে যাচ্ছে। নামছে ভাগীরথীর দিকে। এখানে উপত্যকাটা অসমতল আর তৃণহীন। ঝরনাটিও চলে গেছে বহু দূরে। আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। তবে ঝরনার শব্দটা এখনও যায়নি মিলিয়ে। দূরাগত সঙ্গীতের সুরের মতো আসছে ভেসে।

"ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন ? ঐ যে শিবির দেখা যাচ্ছে।" ডাক্তারবাবু দেখিয়ে দেন।

আমিও দেখেছি--উপত্যকার প্রায় শেষপ্রান্তে ভাগীরথী ও বাসুকি পর্বতের কোলে রঙীন শিবির। তবু বলি, "নিচে নেমে গেলে তো আর শিবলিঙ্গকে দেখতে পাব না, তার চেয়ে আসুন না এখানে একটু বসা যাক। আরও কিছুক্ষণ শিবলিঙ্গকে দেখে নিই।"

কথাটা প্রফেসর ও বরেণ্যর পছন্দ হয়। ওরা বসে পড়ে পথের ওপরে। সঈদ কি বোঝেন কে জানে, তিনিও গিয়ে ওদের পাশে বসে জয় বাহাদুরকে কাছে ডাকেন। বাধ্য হয়ে বীরেন ও ডাক্তারবাবু উঠে আসেন ওপরে।

সঈদ আমেদ শিবলিঙ্গের ছবি নেন, চতুরঙ্গী ও ভাগীরথীর ছবি, আমাদের ছবি।

বীরেন কিন্তু ক্যামেরা বন্ধ করতে দেয় না তাঁকে। সে অনামী শৃঙ্গটিকে দেখিয়ে ছবি নিতে বলে। সঈদ ছবি নিতে থাকেন।

শৃঙ্গটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে। মনে হচ্ছে, যেন সাদা ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো পাহাড়টা।

ছবি নেওয়া শেষ হলে সঈদ জিজ্ঞেস করেন, "এটা কোন্ শৃঙ্গ ?"

"রাধানাথ পর্বত।"

বিস্মিত হই বীরেনের কথায়। বীরেন বুঝতে পারে আমাদের মনোভাব। হেসে উত্তর দেয়, "আমরা ঐ অনামী শৃঙ্গে আরোহণ করে এভারেস্ট আবিষ্কর্তার নামে ওর নাম রাখব রাধানাথ পর্বত। নামটি ঠিক করে দিয়েছেন অমিতাভদা, মানে অমিতাভ দাশগুপ্ত।"

"থ্রি চিয়ার্স ফর ব্রেন ছারখার।" ব্রেন ছারখার বীরেন সরকারের অপভ্রংশ।

"হিপ্ হিপ্ হুররে...হিপ্ হিপ্..."

নন্দনবনের ঝরনার কলতান যায় হারিয়ে। মানুষের কলহাস্যে মুখরিত হয় চতুরঙ্গীর অঙ্গন। আমরা নিচে নামতে শুরু করি। পাথর নয়, মাটি। মাটির বঁধের গা বেয়ে সমতলে নামছি আমরা। সামনে সারি বেঁধে চলেছে মালবাহকের দল। দূরে শিবির দেখা যাচ্ছে। আমাদের অগ্রবর্তী মূল-শিবির—এ. বি. সি.।

চতুরঙ্গীর অঙ্গন মানুষের কলহাস্যে আরও কয়েকবার এমনি মুখরিত হয়েছে। হয়েছে সেই ১৯৩৮ সালে। সেবার Prof. R. Schwarzgruber-এর নেতৃত্বে এক অস্ট্রো-জার্মান অভিযাত্রীদল এসেছিলেন এখানে। পাঁচজন অভিযাত্রী, একজন ডাক্তার ও ছ'জন শেরপা নিয়ে দল গঠিত হয়েছিল। অস্মাস্টোনের নকশার ওপর নির্ভর করেই তাঁরা সেই শরৎকালীন অভিযান চালিয়েছিলেন।

অভূতপূর্ব সাফল্যময় সে অভিযান। তাঁরা নন্দনবনে মূল-শিবির স্থাপন করে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের পাঁচটি শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তাঁদের সেই বিস্ময়কর অভিযানের কথা ভাবলে নিজেদের বড়ই অযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁরা ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) ভাগীরথী-২ (২১,৩৬৪), ১১ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রপর্বত (২২,০৭৩) ২০শে সেপ্টেম্বর মন্দানী পর্বত (২০.৩২০), ২৩শে স্বচ্ছন্দ (২২,০৫০) ও ১৬ই অক্টোবর শ্রীকৈলাস (২২,৭৪২) শিখরে আরোহণ করেন।

তাঁদের এই অভিযানের ফলে বিরনি ও মার্কো পালিসের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত

হয়। বিরনি চন্দ্রপর্বতকে সতপন্থ এবং মার্কো পালিস ভাগীরথী-কে উত্তর সতপন্থ বলে ভেবেছিলেন।

এই অবিশ্বাস্য সাফল্য কিন্তু অস্ট্রো-জার্মান অভিযাত্রীদের সন্তুষ্ট করতে পারল না। তখন তাঁরা সতপন্থের দিকে নজর দিলেন। তাঁরা উত্তর দিক থেকে সতপন্থের প্রাথমিক সমীক্ষা করেন। তারপর উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরা দিয়ে শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভেদ্য বরফের দেওয়ালের জন্য বিশ হাজার ফুটের বেশি আরোহণ করতে পারেন না। বীর অভিযাত্রীরা কিন্তু নিরাশ হলেন না। তখন উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা ধরে শীর্ষে ওঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হল। বিপজ্জনক তুষারের জন্য সেপথেও তাঁরা উনিশ হাজার ফুটের বেশি অগ্রসর হতে পারলেন না।

দু'সপ্তাহে যাঁরা চারটি দুর্গম শৃঙ্গ আরোহণ করতে পারেন, সেই শক্তিশালী অভিযাত্রীদলকে শতপন্থ ফিরিয়ে দিয়েছে। তবু আমরা চলেছি সতপন্থে। চলেছি, কারণ, সতপন্থ অজেয় নয়। চলেছি, কারণ, সহজ সাফল্যের চেয়ে সুকঠিন বিফলতা বেশি মহীয়ান।

আমরা সমতলে নেমে এসেছি। প্রথম দিকে সামান্য উঁচু-নিচু, তারপর প্রায় সমতল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। ছোট ছোট ফুলের ছড়াছড়ি। প্রান্তরের শেষে দক্ষিণে ভাগীরথী আর পুবে বাসুকি পর্বত (২২,২৪৫´)। বাসুকি শিখরকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। নন্দন অর্থাৎ গঙ্গোত্রী হিমবাহের কোল থেকে যে তৃণাচ্ছাদিত কোমল সবুজ সমতল প্রান্তর শুরু হয়েছে, তা এইখানে বাসুকি পর্বতের গায়ে এসে শেষ হল। ভাগীরথীর দিক থেকে একটি ঝরণা নেমে এসেছে। কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হচ্ছে—প্রান্তরকে সিক্ত করে নন্দনবনের দিকে ধেয়ে চলেছে। তারই তীরে তাঁবু পড়েছে আমাদের।

রঙীন তাঁবু। একটি নয় তিনটি—দুটি মেস টেণ্ট ও একটি ফোরমেন টেণ্ট। রঙনী মেস টেণ্টটি আজই প্রথম টাঙানো হয়েছে। রঙটি ভারী সুন্দর। সঈদ আমেদ খুশি হন তাঁবুর রঙ দেখে। বলেন, "চমৎকার ছবি উঠবে।"

হেসে বলি, "সঈদবাবু, চক্‌চক্ করলেই সোনা হয় না। দেখছেন না, তাঁবুতে অসংখ্য তালি। বৃষ্টি নামলেই ভেতরে জল পড়বে।"

"তা না হয় একটু পড়ুক," সঈদ বলেন, "তবে ছবি তো ভাল উঠবে!"

তা ঠিক, ১৬,৭৫০ ফুট উঁচুতে শিবির। ভেতরে জল পড়ে ক্ষতি নেই। কিন্তু রঙীন তাঁবু, ভাল ছবি উঠবে। সঈদ আমেদ ক্যামেরাম্যান। তাঁর কাছে ছবির চেয়ে মূল্যবান বস্তু নেই এ সংসারে।

আমাদের দেখতে পেয়েই ছুটে আসে ওরা—অসিত ও জামিদ সিং। হিমাদ্রি নেই কেন? তার তো এখানে থাকার কথা! আর জামিদ এখানে! তিনি সুজলদের সঙ্গে এখানে এসেছেন। তাঁর তো ওপরে চলে যাবার কথা! কিন্তু সেকথা জিজ্ঞেস করা যাবে না। আর তার দরকারই বা কি? আমরা তাঁকে সঙ্গে এনেছি, আনতে হয় বলে। তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু সাহায্যই তিনি আমাদের করবেন। না করলেও ক্ষতি নেই। কারণ তাঁর ভরসায় আমরা এ অভিযানের আয়োজন করি নি।

অসিত এসে জড়িয়ে ধরে আমাকে। দুদিন পরে দেখা: আর এ দেখা একটি রাতের জন্য। কাল সকালেই সে ওপরে চলে যাবে।

আলিঙ্গন শেষ করেই অসিত জিজ্ঞেস করে, "স্টোভ-পিন পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ!"

"এ্যাঁ!" অসিত বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছে না।

"হ্যাঁ।" বরেণ্য আবার বলে, "পাওয়া গেছে। কাল গোমুখী গিয়ে খুঁজে এনেছি। আমার রুকস্যাকে আছে।"

"আছে!...পেয়েছিস...স্টোভ-পিন পাওয়া গেছে...ইউরেকা..." অসিত নাচতে আরম্ভ করে। কুলিরা চলা বন্ধ করে থমকে দাঁড়ায়। আমরা লজ্জা পাই।

"এই অসিতদা, কি করছেন?" বীরেন ধমক দেয়।

নাচ থামিয়ে অসিত বলে, "একটু নেচে নিলাম। নাচব না? শালার পিনের চিন্তায় দু' রাত ঘুমাই নি।"

"যাক্‌গে, এবারে চলুন তাঁবুতে যাওয়া যাক্‌।" বীরেন বলে।

"হ্যাঁ, চল।" আমার রুকস্যাকটা কাঁধে নিয়ে অসিত এগিয়ে যায়। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

অসিত বলে, "শরীর ভাল নয় বলে জামিদ আজ ওপরে যায় নি, কাল যাবে। আর তাই আজ হিমাদ্রিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সুন্দর বামকে ১৭,৫০০ ফুটে এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাস্তা ভালই, কেবল মাঝখানে শ'খানেক ফুট ফিক্‌সড রোপ করতে হয়েছে। দু'নম্বর শিবিরের জায়গা ঠিক হয়েছে ১৮,৫০০ ফুটে। হিমাদ্রিকে রেখে ওরা সবাই কাল দু' নম্বরে চলে যাবে।"

"হিমাদ্রি একা থাকবে এক নম্বরে?"

"না, একা থাকবে কেন? আমি আর জামিদ কাল এক নম্বরে যাচ্ছি।"

কথা বলতে বলতে আমরা এসে পৌঁছই তাঁবুর সামনে। ভেতরে ঢুকি। বীরেন ও বরেণ্য এয়ার-ম্যাট্রেস ফোলাতে শুরু করে। ডাক্তারবাবু আর আমি অসিতের এয়ার-ম্যাট্রেসে বসে পড়ি। এখন থাক্‌, পরে এয়ার-ম্যাট্রেস ফোলানো যাবে। অনেকটা দম খরচ হয়। এই উচ্চতায় তা মোটেই সুলভ নয়।

সঈদ আমেদ তাঁবুতে ঢোকেন। আমার পাশে এসে বসেন। তারপর শুয়ে পড়েন। কি হল ওঁর? আমরা চিন্তিত।

সঈদ বলেন, "বড্ড পরিশ্রান্ত, একটু বিশ্রাম করে নিই।"

"শরীর ভাল আছে তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। না থাকলে চলবে কেমন করে? কেবল তো শুরু। শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকতে হবে যে!"

"সাবাস সঈদ!..." আমি শেষ করতে পারি না।

টিকারাম কেটলি ও মগ নিয়ে তাঁবুতে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে সঈদ উঠে বসেন। বলেন, "সাব্বাস টিকারাম, চায় পিলাও।"

আমরা হেসে উঠি। টিকারাম হাসিমুখে চা বিতরণ করে। সদাহাস্যময় টিকারাম।

"খাবে নাকি একটু চা?" অসিতকে জিজ্ঞেস করি।

"না...থাক!"

"ইচ্ছে আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"ইচ্ছে থাকবে না কেন? সকাল নটায় গলাভাত আর আলুসেদ্ধ গিলিয়ে ছুঞ্জে চলে গেছে ওদের সঙ্গে। কিচেনে কিছু রেখে যায় নি। কুলিরা নিজেদের চা থেকে আধ মগ চা দিয়েছে এই একটু আগে।"

"তা খাবার তো সব এখানে এসে গেছে, খাও নি কেন ?" বরেণ্য বিস্মিত।

"হ্যাঁ, তোদের অনুপস্থিতিতে বাক্স খুলি আর তোরা রটিয়ে দে যে, শালার কোয়ার্টার মাস্টার একাই এক টন খাবার সাবাড় করেছে।"

সবাই হেসে উঠি। হাসি থামলে বলি, "যাক্‌গে যা হবার হয়েছে, আমাদের কাছে যা আছে, এসো তাই ভাগ করে খাওয়া যাক্ !"

"হ্যাঁ, দাও। দেখি তোমাদের ওখানে আজ কি রান্না হয়েছে !" অসিত আমার হাত থেকে পরোটা ও আলুর তরকারী নিয়ে নেয়। টিকারাম তাকে চা দিয়ে বেরিয়ে যায় তাঁবু থেকে।

"একবার ভেবেছিলাম—" অসিত খেতে শুরু করে, "খুলে ফেলি চানাচুর ও বিস্কুটের বাক্সটা।"

"তা খুললেন না কেন ?" প্রফেসর প্রশ্ন করে।

"খুলব কেমন করে ?" অসিত ক্ষেপে ওঠে, "কেমন করে জানব যে, কোন্ বাক্সে বিস্কুট আর চানাচুর আছে ?"

"কেন, প্যাকিং লিস্ট... ?" ডাক্তারবাবু শেষ করতে পারেন না।

"দেয় নি।" গম্ভীর স্বরে অসিত বলে। সে বরেণ্যর দিকে তাকায়।

"সে কি মশায়, আপনি কোয়ার্টার মাস্টার আর আপনাকে প্যাকিং লিস্ট দেয় নি !" ডাক্তারবাবু ইন্ধন যোগান।

"ভুল হয়ে গেছে।" বরেণ্য তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। "তাছাড়া সুজলদা যে দু' সেট প্যাকিং লিস্ট নিয়ে চলে যাবে জানব কেমন করে ?"

"খুব জানতে। এ সবই তোদের ইচ্ছাকৃত। আমি শালা যেন এখানে উপোস করে থাকি, তাই তোদের এই ব্যবস্থা।"

"তা যদি ভেবে থাকো, তাহলে তাই। আর তোমার কাছে প্যাকিং লিস্ট দেওয়াটা সত্যিই খুব সেফ্ নয়।"

বরেণ্য শেষ করা মাত্র অসিত চিৎকার করে ওঠে, "ম্যানেজার !"

হাসি চেপে কোনোমতে উত্তর দিই, "কি বলছ ?"

"আমি রিজাইন করছি, ফোর্থউইথ্। তুমি আমার রেজিগনেশান এক্সেপ্ট করো।"

"রিজাইন করছ !"

"হ্যাঁ। আমাকে যখন তোমরা বিশ্বাস করো না, তখন আমার আর কোয়ার্টার মাস্টারের পদে থাকা উচিত নয়।"

"কিন্তু তোমাকে ঐ পদে এ্যাপয়েণ্ট করেছে এক্সপ্লোরেশান কমিটি, আমি কেমন করে তোমার রেজিগনেশান এক্সেপ্ট করব ?"

"তুমি কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট, প্রেসিডেণ্ট এখানে নেই।" বলেই বোধ করি খেয়াল হয় আমার অক্ষমতার কথা। একটু থেমে বীরেনকে বলে, "বেশ, তুই এ্যাক্সেপ্ট কর. তুই কমিটির সেক্রেটারী আবার এক্সপিডিশানেরও সেক্রেটারী।"

বাঁচা গেল। এবার বীরেন বুঝুক. বীরেন কিন্তু মোটেই ঘাবড়ায় না। হাসিমুখে বলে, "এক্সেপ্ট করার ক্ষমতা আমারও নেই। তবে বরেণ্যর এই দুর্ব্যবহারের জন্য আমি তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশন নিতে পারি।"

"বেশ, তাই নে।" অসিত শান্ত হয়।

'বরেণ্য !" বীরেন গম্ভীর স্বরে ডাক দেয়।

" কি বলছ ?"

"বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাও। প্যাকিং লিস্ট সঙ্গে নিয়ে যাও। বাক্‌স খুলে বিস্কুট ও চানাচুর নিয়ে এসো। সেই সঙ্গে টিকারামকে বলে দাও আমরা আর একবার চা খাব।"

তুমুল হাস্যরোল। অসিতও সেই হাসির উৎসবে যোগদান করে। বরেণ্য হাসতে হাসতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

জামিদ সিং এবং সঈদ আমেদও আমাদের সঙ্গে হাসছেন, কিন্তু তাঁরা যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি, তা তাঁদের মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওঁরা বাংলা বোঝেন না। তাই প্রফেসর হিন্দীতে সমস্ত ব্যাপারটা ওঁদের বলে দেয়। আর তাই না শুনে ওঁরা আবার হাসতে শুরু করেন। আমরাও দ্বিতীয় দফা হেসে নিই।

ঋষীকেশে সঈদ আমেদ দলে যোগ দেবার পরেই আমরা ঠিক করেছি, তাঁর সামনে আমরা নিজেদের মধ্যেও ইংরেজীতে কথাবার্তা বলব। জামিদ সিং আবার ইংরেজী বোঝেন না। তাই গোমুখীতে তিনি আসার পর থেকে আমরা হিন্দীতেই বেশির ভাগ কথাবার্তা বলছি; অনিবার্য কারণে কখনও বাংলা বললেও, তারপরই হিন্দীতে ওঁদের সব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। প্রফেসর তাই করেছে।

প্যাকিং পর্বতারোহণের একটা প্রধান বিষয়। পথের ও শিবিরগুলির প্রয়োজন হিসেব করে বাক্‌স কিংবা থলিতে মাল বোঝাই করা হয়। বড় বাক্‌স চলে না। কারণ কুলিরা বইতে পারে না। জিনিসপত্র সব থরে থরে সাজিয়ে ছেঁড়া কাগজ গুঁজে দিতে হয় যাতে পরিবহনের সময় নড়াচড়া না করতে পারে। তারপর পেরেক দিয়ে ডালা বন্ধ করে লোহার পাত দিয়ে মোড়া হয়। কোনো বাক্‌সকে আবার চট দিয়ে মুড়তে হয়, বাক্‌সের নম্বর ও অভিযানের নাম লিখে দিতে হয়—অনেক হাঙ্গামা। রণেশদা, দাশরথি, বিমান, বিষাণ ও অমূল্যর ভাই-বোনেরা সাতদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের মালপত্র প্যাক করে দিয়েছে। এক-একটা বাক্‌স বন্ধ করতে কম করেও ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছে। আর তার একটা খুলতে বরেণ্যর দশ মিনিটও লাগল না। সে বিস্কুট ও চানাচুরের টিন নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এল।

অসিত চিৎকার করে বলে ওঠে, "বরেণ্য মুখার্জীকী..."

"জয়", আমরা সবাই সাড়া দিই।

বরেণ্য কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সে এগিয়ে যায় অসিতের দিকে। তার পদপ্রান্তে টিন দুটি রেখে নিঃশব্দে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে।

আবার হাস্যরোল।

অসিত নির্বিকার। টিন দুটি খুলে বিস্কুট ও চানাচুর পরিবেশন করতে শুরু করে দেয়।

ভীম বাহাদুর তাঁবুতে ঢোকে। অসিতের পরিবশন বন্ধ হয়ে যায়; তাড়াতাড়ি টিন দুটি বরেণ্যকে দিয়ে বলে, "দে, সবাইকে ভাগ করে দে তো, আমি দেখছি চিঠিপত্র কিছু এলো কিনা ? আজ চিঠি না এলে আবার ফিরে গিয়েই আলিপুর কোর্টে ছুটোছুটি করতে হবে।"

"কেন ?" বীরেন প্রশ্ন করে।

"ডাইভোর্স এ্যাপলিকেশান করতে। আজ চিঠি না পেলে ফিরে গিয়েই তোর বৌদিকে ডাইভোর্স করব।"

"ডাইভোর্স করব ?" বীরেন ভেংচি কাটে, "করলেই যেন হল, টেকো বুড়োর গলায় কে আবার মালা দেবে ?"

"দরকার নেই। চাই নে আর কোনো মেয়ের মালা। আমি সন্ন্যেসী হয়ে যাব।"

আলিপুরের উকিলদের দুর্ভাগ্য আর ভাগ্যবতী মঞ্জুলাবৌদি। অসিতকে ডাইভোর্স এ্যাপলিকেশান করতে হল না, সন্ন্যাসীও হতে পারল না সে। স্বামীর কাছে চিঠি লিখেছেন তিনি। চিঠিখানি ভীম বাহাদুরের হাত থেকে নিয়ে পকেটে রাখে অসিত। তারপর বরেণ্যর দিকে ফিরে বলে, "দে, আমার চানাচুর দে।"

আজ অনেক চিঠি এসেছে নিচের থেকে। কিন্তু কার কার চিঠি এসেছে তা দেখে উঠবার আগেই প্রেম বাহাদুর তাঁবুতে প্রবেশ করে। আমরা একযোগে প্রশ্ন করি, "কেয়া সমাচার প্রেম বাহাদুর?"

"আচ্ছাই সাব, সব ঠিক হ্যায়, চিঠ্‌ঠি—"

"দো।"

হিমাদ্রি চিঠি লিখেছে বীরেনকে। বরেণ্য জোরে জোরে পড়তে শুরু করে—

এক নম্বর শিবির, ১৭,৫০০
১৪.৯.৬৮
বেলা ৩টা

'বীরেনদা,

আধঘণ্টা হল অমূল্য, প্রাণেশ, সুজলদা, করুণাদা ও ডাক্তারের সঙ্গে আমি এখানে এসেছি। ঠিক সঙ্গে আসিনি, এসেছি সবার শেষে প্রকৃতির অপরূপ রূপ দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে। তবে অমূল্য বরাবরই ছিল আমার সঙ্গে। Camp site ঠিক করাই ছিল, আমরা এসে শুধু তাঁবু টাঙিয়েছি। কাল আমাকে একা থাকতে হবে, যতক্ষণ না অসিতদা, জামিদ সিং আর সঙ্গীদসাহেব এখানে আসেন।

একা একা থাকতে খুবই খারাপ লাগবে। কাল চিঠি লেখার অনেক সময় পাব তবু আজ লিখছি; কারণ আপনারা আমাদের খবরের আশায় রয়েছেন। তাই এসেই কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি। ছুঞ্জে চা খাইয়েছে। দুটো 4-men ও চারটে 2 men Tent খাটানো হয়েছে। পাথর সাজিয়ে দেওয়াল বানিয়ে তার ওপরে ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে রান্নাঘর করেছে ছুঞ্জে। সুজলদা প্যাকিং বাক্স ভেঙে দেখছে কাল ওদের সঙ্গে কি কি মাল নেবে। আমরা সকলেই ক্লান্ত, কিন্তু বিশ্রাম নেবার অবকাশ নেই। এখনও রোদ আছে। চেষ্টা করে দেখি যদি কিছু ছবি তোলা যায়—

কিছু ছবি তুলে আবার লিখতে বসেছি। ডাক্তার ট্রানজিস্টারের 'নব' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেষ্টা করছে যদি বাংলা খবর অথবা গান কিছু শোনা যায়।

এতদিন পর্যন্ত আমরা যেখানে যেখানে শিবির করে থেকেছি তার মধ্যে আজকের জায়গাটা সবচেয়ে খারাপ। সুন্দর হিমবাহের ভাঙা-চোরা মোরেণের ওপর তাঁবু পড়েছে। চারদিকে বড় বড় পাথরের স্তূপ ডিঙিয়ে ওপরে তাকালে দেখা যায় সতপন্থের ঝকঝকে চূড়া আর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বাসুকি শৃঙ্গ। বাসুকির ফণা-রূপ শিখর থেকে অনবরত বরফ ভেঙে ভেঙে পড়ছে—পাথরও পড়ছে সেই সঙ্গে। যেখানে বসে আছি তার ঠিক নিচ দিয়ে বরফগলা-জলের ধারা বয়ে চলেছে—তার আওয়াজ কানে আসছে।

সতপন্থের চূড়ায় উঠব এই উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতা থেকে বেরিয়েছি। ঠিক চৌদ্দ দিন পরে আজ প্রথম তার দর্শন মিলল। জীবন ধন্য হল—সত্যিই অপূর্ব। ছবি নিয়ে আসব। কলকাতায় ফিরে সবাইকে দেখাব সতপন্থের Majestic চেহারাটা।

এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। এবারই শুরু হবে আসল পরীক্ষা। প্রাণেশ অমূল্য ও ডাক্তার কাল স্থাপন করবে দু' নম্বর শিবির। সেখান থেকেই শুরু হবে ওদের প্রাণপাত প্রচেষ্টা। ওদের কাছ থেকে খবর পেলেই আমরা এগিয়ে যাব ওদের মদত্ দিতে।

আজ সকালে যখন এ. বি. সি. থেকে যাত্রা করেছিলাম, তখন মনের যে কি অবস্থা হয়েছিল তা সত্যিই অবর্ণনীয়। একদিকে আপনাদের ছেড়ে আসার বেদনা, অন্য দিকে সতপন্থের ডাক। আবার কবে সবার সঙ্গে দেখা হবে ঠিক নেই—আদৌ হবে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। যাই হোক, এখন বরং আজকের পথের কথা লিখি।

আজকের পথ দীর্ঘ ছিল না। মাত্র ছ' মাইল। খুব কঠিন এবং কষ্টদায়কও নয়। অগ্রবর্তী মূল-শিবির থেকে চড়াই ভেঙে গিরিশিরায় উঠলাম। চতুরঙ্গী তখন আমাদের বাঁ-দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে। আর ঠিক পুবে ছোট্ট বাসুকি হিমবাহ। তারপর আবার শুরু হল উৎরাই। অগ্রবর্তী মূল-শিবিরের রঙ-বেরঙের তাঁবুগুলো দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল। সোজা বাসুকির ওপর এসে পড়লাম। সুজলদা আর ডাক্তার এগিয়ে গেছে অনেকটা। ওদের আর দেখা যাচ্ছিল না। আমি ও অমূল্য লাল নিশান দেখে দেখে এগিয়ে চলছিলাম। আমাদের গতি ছিল খুবই ধীর। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করতে করতে পথ চলেছি আমরা। ছবিও তুলেছি অনেক। হঠাৎ নজরে পড়ল—বাসুকির অপর পারে আমাদের কুলিরা সারিবদ্ধ পিঁপড়ের মত এগিয়ে চলেছে। ওদের সামনেই খাড়া পাহাড়। ওখানেই খানিকটা জায়গায় ফিক্সড-রোপ করতে হয়েছে। আর অপেক্ষা না করে হিমবাহের ভাঙাচোরা মোরেণের ওপর দিয়ে আমরা চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলছিলাম। সুজলদাদের পায়ের দাগ ধরে পথ খুঁজে নিতে অবশ্য বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি! দড়ির নিচে এসে যখন পৌঁছলাম, তখনও দুজন কুলি সেখানে অপেক্ষা করছে। শেরপা দোরজি সবাইকে ওপরে উঠতে সাহায্য করছে। সুজলদারাও ওপরে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আমি রুকস্যাকের খাঁজে আইস এক্স গুঁজে নিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলাম। তখন প্রায় মাঝামাঝি এসেছি, এমন সময় দোরজি চিৎকার করে উঠল—হুঁশিয়ার!

ওপরদিকে তাকিয়ে দেখি একটা মণ-দুই ওজনের পাথর গড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। পাথরটা কাছাকাছি আসতেই শক্ত করে দড়ি ধরে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে পা ফাঁক করে শূন্যে লাফ দিলাম। নিমেষের মধ্যে পাথরখানা পায়ের নিচ দিয়ে গড়িয়ে সোজা নিচে হিমবাহের বুকে গিয়ে পড়ল। ওপর থেকে তখন সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দম নিয়ে সোজা ওপরে উঠে এলাম। ডাক্তার কাছে এসে পিঠ চাপড়ে বলল—সাবাস!

সকলেই খুব ক্লান্ত। সামনেই একটা বিরাট Glacial Lake. তার তীরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আবার চলতে শুরু করলাম। প্রথমে প্রায় জলাশয় পর্যন্ত নেমে এলাম। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে আবার চড়াই শুরু হল। চড়াই পথ শেষ হলে একটা গিরিশিরায় পৌঁছলাম। এবার গিরিশিরা ধরে সোজা পথ। মূল-শিবির থেকে অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে আসার পথের মতো।

কালিন্দী, বাসুকি এবং চতুরঙ্গীর অপর তীরের অনামী শৃঙ্গগুলো চোখের সামনে আরও পরিষ্কার হয়ে এল। তখনও আমরা সতপন্থের দেখা পাই নি। আরো মাইলখানেক চলার পর দেখতে পেলাম সেই Mighty peak, কি চমৎকার চেহারা। ধীরে ধীরে মাথা নত হয়ে

এল। শ্রীতেনজিং-এর একটা কথা মনে পড়ল। ট্রেনিং নেবার সময় তিনি বলেছিলেন, 'Don't come in the mountain with a challenging mood.'

সতপন্থকে প্রণাম করে মনে মনে বললাম—প্রতিযোগিতা করার মনোভাব নিয়ে আমরা তোমার কাছে আসি নি। তোমার অনুমতি পেলেই আমরা তোমার শিখরে আরোহণ করব। না পেলে ফিরে যাব। দুঃখ হয়তো পাব, কিন্তু আফসোস করব না। তোমার দেওয়া জয়-পরাজয়কে সানন্দে বরণ করে নেব।

এবার কাজে লেগে যেতে হবে। অনেক কাজ—কালকের প্রস্তুতি। সব গরম পোশাক ওপরে পাঠিয়ে দিতে হবে। ওরা কাল সকালেই রওনা হচ্ছে।

সম্ভব হলে সামান্য কিছু চিনি পাঠিয়ে দেবেন। আমা আজ থেকেই "তিব্বতী চা" অর্থাৎ মাখন আর লবণ দিয়ে চা খেতে আরম্ভ করেছি। উপস্থিত আর কোন "টিন ফুডের" প্রয়োজন নেই। জ্বালানী কাঠ পাঠালেই চলবে। কিছু চানাচুরও পাঠাবেন। একটা তাঁবু ফেরত পাঠালাম।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। আমাদের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। চিঠিপত্র এলে পাঠিয়ে দেবেন। ইঁদুরগুলো বেঁচে আছে তো?

ইতি আপনাদের
হিমাদ্রি

॥ ছয় ॥

সকালে ঘুম ভাঙে কীর্তনের সুরে। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। পদের কথা আর বলা যাবে না, তাহলে অশ্লীলতার অপরাধে অভিযুক্ত হব।

"বাপু হে! দেবতাত্মা হিমালয়ে এসেছো, একটু বাদেই দুর্গম-পথ পাড়ি দিতে হবে! কোথায় সকালে উঠে ভগবানের নাম করবে, তা নয়..."

"পবিত্র জায়গায় এসেছি বলেই তো সকালে উঠে অপবিত্র কথা বলছি। অপবিত্র কথাগুলি বের করে নিয়ে মনটাকে পবিত্র করে নিচ্ছি।" একটু থেমে অসিত আবার বলে, "কিন্তু তা কি শালা পারার উপায় আছে? কে আমার গানের ধুয়ো ধরবে...সুজল স্বপন আর প্রাণেশ নেই।"

সত্যিই দুঃখের কথা! ওরা অসিতের 'Language Club'-এর সদস্য। অসিত আর কবে Language Class নিতে পারে ঠিক নেই। আজ সে এক নম্বরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা হবে না—ওরা ততক্ষণে চলে যাবে দু' নম্বরে। হিমাদ্রি অবশ্য থাকবে ওর সঙ্গে। তবে হিমাদ্রি জমাতে পারবে না—সে Language Club-এর সদস্য নয়।

অথচ অসিত ভাল চাকরি করে। তিন ছেলের বাবা। কিন্তু হিমালয়ে এলেই যেন ওর বিশ বছর বয়স কমে যায়। আর কেবল ওর কথাই বা বলি কেন, ডাক্তারবাবুর কি দশা! তিনিও যে কম যাচ্ছেন না! তিনি তো আরও বেশি সম্ভ্রান্ত! কেন এমন হয়!

হিমালয় চিরতারুণ্যের প্রতীক। হিমালয় জরা ও বার্ধক্যকে ভুলিয়ে দেয়। বয়সের ব্যবধান

ঘুচিয়ে দেয়। বিভিন্ন বৃত্তির সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের দল, কিন্তু আমরা সবাই অভিযাত্রী। এখন আমরা সবাই সমান। হিমালয় সত্যিই বিস্ময়কর, সে বৈচিত্র্যময়, সে সদানন্দ নিকেতন।

কর্ণ-ফ্লেক্স, চিঁড়েভাজা ও কফি দিয়ে ব্রেক-ফাস্ট শেষ হল। এক নম্বর শিবিরে স্থায়ীভাবে বিশজন কুলি আছে। তারা দু' নম্বরে মাল ফেরী করবে। দু' নম্বরের উচ্চতা সাড়ে আঠারো হাজার ফুট। এত উঁচুতে কুলি দিয়ে মাল পাঠাতে পারব আশা করি নি। সাধারণতঃ বরফের জন্য ষোলো-সতেরো হাজার ফুটের ওপরে কুলিরা মাল নিয়ে যেতে পারে না। এরা সাধারণ মালবাহক—বরফে চলার তেমন অভ্যেস নেই। ওপরের দিকে মাল বয় শেরপা ও সদস্যরা।

কিন্তু এবারে একদম বরফ নেই। তাই কুলিরাই সাড়ে আঠারো হাজার ফুট পর্যন্ত অক্লেশে মাল নিয়ে যেতে পারছে। এতে আমাদের সময় ও খরচ বেঁচে যাচ্ছে। প্রকৃতি আমাদের খুবই সাহায্য করছে। বরফ নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই। এমন বড় একটা হয় না। এখন সতপন্থ একটু কৃপা করলেই সবকিছু সার্থক হয়।

বরফ নেই, কিন্তু শীত আছে। নিজেদের পোশাক কুলিদের দিয়ে দিতে হয়েছে। তাতেও কুলোয় না। রাতে ওদের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এক নম্বর শিবিরের জন্য দৈনিক অন্তত তিন বোঝা কাঠ দরকার। তাই পাঠিয়ে দিলাম। এখানে এখন সামান্য কাঠ রয়েছে। এতেই এখন চলে যাবে। দুপুরে নিচ থেকে কাঠ এসে যাবে। সকালে পাঁচজন কুলি চলে গেছে মূল-শিবিরে।

না, আর মূল-শিবির বলা ঠিক হবে না। সেখানে শিবির নেই এখন। নামে অগ্রবর্তী মূল-শিবির বা এ. বি. সি. হলেও এটাই এখন মূল-শিবির। প্রাক্তন মূল-শিবিরকে এখন বড়জোর চতুরঙ্গী শিবির বলা যেতে পারে।

এ শিবিরকেও অবশ্য চতুরঙ্গী শিবির বলা যেতে পারে। আমরা চতুরঙ্গী হিমবাহ থেকে নেমে এসে এ শিবির স্থাপন করেছি সত্য, কিন্তু আমরা চতুরঙ্গীর অঙ্গনেই রয়েছি। কেবল আমরা কেন, অগ্রবর্তী অভিযাত্রীরাও তাই রয়েছে। তারা সুন্দর বামকে শিবির স্থাপন করেছে। সুন্দর বামক চতুরঙ্গীর উপ-হিমবাহ। চতুরঙ্গীকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনেই সতপন্থ ও ভাগীরথী-১ শৃঙ্গ তাকে সৃষ্টি করেছে।

কাল ওরা প্রয়োজনীয় মালের ফর্দ পাঠিয়েছিল। সে সব মালই ওপরে চলে গেল। আর সঙ্গে যাচ্ছে সেই অমূল্য সম্পদ—স্টোভ পিন। অসিত নিজে নিয়ে যাচ্ছে।

এবারে অসিত সঈদ আমেদ ও জামিদের রওনা হবার পালা। সঈদসাহেব স্বেচ্ছায় যাচ্ছেন। আমরা বলেছিলাম তাঁকে ১৬,৬০০ ফুট পর্যন্ত নিয়ে আসব। সেই অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১৬,৬০০ ফুট অবধি আসবার অনুমতি দিয়েছেন। তার ওপরে গিয়ে যদি তাঁর কোন বিপদ হয়, সেজন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হবেন না।

তবু সঈদ স্বেচ্ছায় ওপরে যাচ্ছেন। আমরা আপত্তি করতে বলে উঠেছেন—"Hang your responsibility. Don't want any compensation if I am dead. But I must go ahead and take shots of Satopanth."

কাঁধে রুকস্যাক ও হাতে আইস একস তুলে দিলাম ওদের। করমর্দন করলাম, আলিঙ্গন করলাম। তারপর ওরা হিমবাহের তীর বেয়ে ওপরে উঠতে থাকল। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা চলল সতপন্থের কাছে, আমরা পড়ে রইলাম ভাগীরথীর পাশে—বাসুকির পেছনে।

বাধা-বিপদকে জয় করে নির্ভয়ে ওদের যেতে হবে এগিয়ে। আমরা এখান থেকে ওদের সেই শক্তি যোগাব আর ওদের কথা ভাবব। সতপন্থের শুভ্রশিখরে ওরা জাতির জয়পতাকা প্রোথিত করবে, আর আমরা সেই শুভ সংবাদের অপেক্ষায় দিন গুনব, ওদের ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকব।

আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, ওরা এগিয়ে চলে। আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে যাওয়া চতুরঙ্গীর তীর বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা—পুবে এগোচ্ছে। বাসুকি পর্বতকে ডান দিকে রেখে ওরা এগিয়ে চলেছে। চতুরঙ্গী প্রসারিত হয়েছে বাসুকির পাদদেশ পর্যন্ত আর সেখানে বাসুকি হিমবাহ এসে মিলিত হয়েছে চতুরঙ্গীর সঙ্গে।

ওরা ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে—ছোট হচ্ছে। ওরা গিরিশিরা-সদৃশ চতুরঙ্গীর তীরে পৌঁছে গেছে। ছোট হয়ে গেছে। খুব ছোট, যেন লিলিপুট। ওদের কাউকে আর চেনা যাচ্ছে না। ওরা কি এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে? কিছু যেন বলছে? হাত নাড়ছে কি? হয়তো বিদায় জানাচ্ছে।

ভুল করছে। বিদায় জানাবার কি আছে? ক'দিন পরেই তো আবার ফিরে আসবে। আসবে বিজয়গৌরবে। ওরা বরং ওখানে দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা জানাক আমাদের। আমরাও তাই জানাই। ডাক্তারবাবু বলে ওঠেন, "May (you) climb from peak to peak."

ওরা চলে গেল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে।

"আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? চলুন, এবারে কাজে হাত দেওয়া যাক।" ডাক্তারবাবু বলেন।

ঠিকই বলেছেন। কাজ, অনেক কাজ। প্রত্যেক পর্বতাভিযাত্রীকে নিজ নিজ কাজ করে যেতে হবে। সমবেত প্রচেষ্টাই কেবল পর্বতাভিযানকে সফলকাম করে তুলতে পারে।

বীরেন ও প্রফেসর তৈরি হয়ে নেয়। তারা আজ যাচ্ছে বাসুকি হিমবাহে—পাথর, বরফ ও জল সংগ্রহ করতে।

ডাক্তারবাবু তাঁর যন্ত্রপাতির বাক্স খুললেন। বরেণ্য তাঁবু থেকে ইঁদুরের খাঁচা বের করে আনল। রোদ পেয়ে ইঁদুরগুলো মনের আনন্দে খাঁচার ভেতরে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। ডাক্তারবাবু হেসে বলেন, "দেখছেন, এত উঁচুতে এসেও কেমন প্রাণবন্ত রয়েছে।"

সত্যি এজন্য অসাধারণ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন ডাক্তারবাবু। এর আগে কেউ সাদা ইঁদুর নিয়ে এত উঁচুতে এসেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এখানকার উচ্চতা ১৬,৭৫০ ফুট। আজ সকালের তাপমাত্রা মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ষোলো দিন হল এরা কলকাতা অর্থাৎ ওদের পরিচিত আবহাওয়া ছেড়ে এসেছে। আজ পনেরোই সেপ্টেম্বর। কিন্তু এদের হাল-চাল দেখলে কার সাধ্যি বলে যে, এটা চৌরঙ্গী নয়, চতুরঙ্গী। এজন্য অবশ্য ডাক্তারবাবুকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আমাদের দিকে তিনি যত না নজর দিচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি নজর দিচ্ছেন এই মূষিক-সদস্যদের দিকে।

বরেণ্যর সহায়তায় ডাক্তারবাবু তাঁর পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। আমি চলে এলাম তাঁবুতে। বেশ গরম লাগছে—চড়া রোদ উঠেছে কিনা। সোয়েটারটা খুলে ফেলে কাগজপত্র নিয়ে বসি। কালকের ডাক এখনও দেখা হয় নি ঠিকমত, কেবল সদস্যদের ব্যক্তিগত চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি। আরও অনেক চিঠি আছে। লিখেছেন—প্রবোধদা, হিমালয়ান ফেডারেশানের সভাপতি সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। লিখেছেন সুসাহিত্যিক শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীসুমথ নাথ ঘোষ। লিখেছে দাশরথি, দেবকীদা ও মোহিত। লিখেছেন ন্যাশনাল

ইনস্টিটিউট অব্ স্পোর্টসের ডিরেক্টর কর্ণেল বি. এস. জসওয়াল, দার্জিলিং পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ লেঃ কঃ এন. কুমার, রেডক্রশ সোসাইটি ও হিমালয়ান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ এবং ভারতের মেট্রোপলিটনের সুযোগ্য সহকারী শ্রীমুকুল সাহা। লিখেছেন আরও অনেকে। তাঁরা সবাই আমাদের আশীর্বাদ করেছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তাঁদের প্রত্যেককে উত্তর দিতে হবে। খবর পাঠাতে হবে দিল্লী ও কলকাতায়, ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থা এবং অমৃতবাজার পত্রিকা ও দৈনিক বসুমতীর কাছে। আজ সকালে ডাক চলে গেছে, তাকে এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠার খবর পাঠিয়েছি। দু' নম্বর শিবিরের জায়গা ঠিক হয়েছে, কিছু মালপত্রও কাল চলে গেছে। দু' নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে না। সদস্যরা রাত্রিবাস না করলে শিবির প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ভীম বাহাদুর এখান থেকে ডাক নিয়ে যাচ্ছে গঙ্গোত্রী। দিচ্ছে স্বামী সারদানন্দের হাতে। তিনি ডাক-রাণার মারফত তা পাঠিয়ে দিচ্ছেন ভাটোয়ারী। যদিও হরশিল থেকে ভাটোয়ারী পর্যন্ত বাস চলে, তবু আগের নিয়মই রয়ে গেছে, রাণার মারফতই ডাক পৌঁছয় ভাটোয়ারী। এতে একটা দিন বেশি লাগে। জানি না আর কতদিন এই পুরনো নিয়ম চালু থাকবে।

ভাটোয়ারী থেকে বাসযোগে ডাক যায় উত্তরকাশী। সেখান থেকে টেলিগ্রাম চলে যায় দেশের সর্বত্র আর চিঠি যায় ঋষিকেশ। আমরা উত্তরকাশীর পোস্টঅফিসে টেলিগ্রামের খরচ বাবদ টাকা জমা রেখে এসেছি। খবর সব সময়েই টেলিগ্রামে যাচ্ছে—আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম। জানি না ক'দিন বাদে কলকাতা ও দিল্লীতে সে টেলিগ্রাম বিলি হচ্ছে। উত্তরকাশী যেতেই তো ছ-সাতদিন সময় লাগছে।

আত্মীয়-স্বজন ও অগণিত শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের সংবাদের পথ চেয়ে আছেন। কিন্তু আমরা নিরুপায়। গঙ্গোত্রীর পথে ডাক-ব্যবস্থা বড়ই খারাপ। ভাটোয়ারীর পথে আর টেলিগ্রাফ অফিস নেই।

ডাক্তারবাবু ডাকছেন আমাকে। এই রে ! ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে, এবারে আমার ওপর পরীক্ষা শুরু হবে।

উপায় নেই। বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। না, শেষ হয় নি। এখনও ইঁদুরদের পরীক্ষা চলছে। বরেণ্য সাহায্য করছে তাঁকে। যাক, তাহলে আমার পালা আসতে এখনও কিছু বাকি আছে। খুশি হয়ে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করি, "ডাকলেন কেন ?"

"কি একা একা তাঁবুর ভেতরে বসে আছেন ! দেখুন না, কি রকম লেবরেটারী বানিয়ে ফেলেছি !"

সত্যিই তাই। ডাক্তারবাবু তাঁর যন্ত্রপাতি ও খালি প্যাকিং বাক্স দিয়ে ছোট একটি গবেষণাগার তৈরি করেছেন। কার সাধ্য বলে যে, চতুরঙ্গীর অঙ্গনে সতপন্থ অভিযানের অগ্রবর্তী মূল-শিবির, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের ফিজিওলজিক্যাল লেবরেটারী নয় !

কথায় কথায় বরেণ্য বলে, "ভাগীরথী কিন্তু খুবই কাছে।"

"হ্যাঁ, এখানে শিবির করেই অস্ট্রো-জার্মান ও ক্যালকাটা ক্লাইম্বার্সের অভিযাত্রী দল আর স্বপনরা ভাগীরথী-২ শৃঙ্গে আরোহণ করেছে।"

"আমরা একবার চেষ্টা করব নাকি ?"

হেসে বলি, "আমরা বলতে কাকে বোঝাচ্ছিস ? দলের পর্বতারোহী তো সবাই ওপরে চলে গেছে।"

"কেন, আমরা রয়েছি !" বরেণ্য তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দেয়, "বীরেনদা, প্রফেসর মুখার্জী ও আমি। তোমার কাছে কেবল দিন তিনেকের খাবার ও দুটি তাঁবু চাই।"

"শেরপা কোথায় পাবি ?"

"দরকার নেই, জয় বাহাদুর আর সেতীরাম রয়েছে। ওদের নিয়েই আমরা ক্লাইম্ব করে ফিরে আসব।"

"কাজটা এখান থেকে যত সহজ মনে হচ্ছে, ঠিক তত সহজ নয় বরেণ্য ! তাছাড়া পর্বতারোহণের নিয়মও তা নয়। আমরা সতপন্থ ও অনামী শৃঙ্গ অভিযানে এসেছি। ইচ্ছে হলেও আমরা ভাগীরথী শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারি না।"

বরেণ্য চুপ করে থাকে। বোধ হয় সে একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে আমার ওপর। তা হোক্ গে, যা হবার নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক নয়। এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া বাতুলতা।

বোধ করি আবহাওয়াকে হাল্‌কা করার জন্যই ডাক্তারবাবু বলেন, "স্বপন কবে ভাগীরথী-২ শিখরে আরোহণ করেছে ?"

"এ বছর ১৬ই মে।" উত্তর দিই।

"তার মানে, স্বপন একই বছরে দুটো অভিযানে এলো ?"

"হ্যাঁ। শুধু স্বপন নয়, প্রাণেশও এ বছর গ্রীষ্মকালে উত্তর-গাড়োয়াল হিমালয় অভিযানে গিয়েছিল।"

"তাহলে স্বপন ও প্রাণেশ যদি এ অভিযানে শৃঙ্গারোহণ করতে পারে তাহলে ওরা একই বছরে দুটি শৃঙ্গারোহণের গৌরব অর্জন করবে !" ডাক্তারবাবু বলেন।

"হ্যাঁ।" আমি উত্তর দিই, "তবে স্বপন কিন্তু মে মাসে পর্বতাভিযানে আসে নি, এসেছিল পর্বতারোহণ শিক্ষা করতে।"

"মানে ?" ডাক্তারবাবু বিস্মিত। "আরে মশাই, একটু খুলে বলুন না ওরা কেমন করে ভাগীরথী-২ শিখরে আরোহণ করল ?"

আমি ডাক্তারবাবুর পাশে এসে বসি। ভাগীরথীর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকি, "স্বপন উত্তরকাশীর নেহরু ইনস্টিটিউট অব্ মাউন্টেনিয়ারিং থেকে এ্যাডভান্স ট্রেনিং নিতে এসেছিল। আরও পাঁচজন শিক্ষার্থী ছিল ওর সঙ্গে—জি. আর. শা, এন. রাউত, এইচ. আর. ঠাকুর, ভাগমল এবং এ. পি. তলাটি। ইনস্টিটিউটের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল মেজর সুরৎ সিং ছিলেন প্রধান শিক্ষক। এস. সাংবু ও জাম্মিদ সিং ছিলেন তাঁর সহকারী।

চীরবাসা ও গোমুখীতে রক-ক্লাইম্বিং ট্রেনিং শেষ করে ওরা এল এখানে—তারিখটা ছিল ১২ই মে, ১৯৬৮। আবহাওয়া খুবই ভাল ছিল। পরদিন সকালে ওরা রাস্তা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। কোমল তুষারাবৃত প্রান্তরের ওপর দিয়ে পথ। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বেলা প্রায় একটার সময় শিখরের ঠিক পাদদেশে পৌঁছল। জায়গাটার উচ্চতা ১৮,৫০০ ফুট। ওরা সেদিন আবার নেমে এল এখানে।

পরদিন, অর্থাৎ ১৪ই মে মালপত্র নিয়ে সবাই উঠে গেল সেই জায়গায়, স্থাপন করল এক নম্বর শিবির।

আবহাওয়া অপরিবর্তিত। পরদিন ওরা এক নম্বর শিবির থেকে শিখরের পথ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। তেমনি কোমল তুষার পেরিয়ে এগিয়ে চলে ওরা। সেদিন প্রায় দু' হাজার ফুট রাস্তা তৈরি করে শিক্ষার্থীরা নেমে এল শিবিরে।

পরদিন অর্থাৎ ১৬ই মে, সামান্য জলখাবার খেয়ে সকাল সাড়ে ছ'টার সময় সবাই বেরিয়ে

পড়ল শিখরের পথে। আগের দিন যে পর্যন্ত পথ তৈরি করে এসেছিল, বেলা সাড়ে এগারোটার সময় তারা সেখানে পৌঁছল। তারপরই শুরু হল দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ। পাথরের ওপরে নতুন তুষার অত্যন্ত পিচ্ছিল। কোমরে দড়ি বেঁধে অতি সাবধানে আরোহণ করতে থাকল ওরা। একসঙ্গে বেশিক্ষণ চলতে পারছিল না কেউ। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন সে পথ আর ফুরোবে না, সারাজীবন ধরে ওদের তেমনি করে পথ চলতে হবে স্বপ্ন-ভাগীরথীর দিকে।

স্বপ্ন সত্যি হল। সহসা স্বপন চেঁচিয়ে উঠল, আমি শিখরে—ভাগীরথীর স্বপ্ন-শিখরে।

বেলা তখন তিনটা। প্রবল উদ্দীপনা ও প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে মেজর উচ্ছ্বসিত স্বরে ঘোষণা করলেন,—প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা ভাগীরথী-২ শৃঙ্গে আরোহণ করেছি। তোমাদের এই অসাধারণ কৃতিত্বের কথা পর্বতারোহণের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।"

টিকারামের আগমনে আমাদের আলোচনা থেমে যায়। আমরা তার দিকে তাকাই। মুচকি হেসে টিকারাম জিজ্ঞাসা করে, "চায় বানাউঙ্গা সাব?"

"জরুর।" ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন।

টিকারাম চলে যায়।

ইঁদুরদের পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকান। উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার—ইঁদুরদের পালা শেষ হয়েছে, এবারে আমার পালা। আপত্তি করে লাভ নেই। তাই সুবোধ বালকের মতো শান্ত-শিষ্ট হয়ে বসে থাকি। ডাক্তারবাবু যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসেন। বরেণ্য খাতা ও ডট্ পেন হাতে প্রস্তুত হয়েই আছে। পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়।

আমি চুপচাপ বসে আছি। বসে বসে ভাবছি সেই দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের কথা--মঁসিয়ে আঁদ্রে রুশ ও তাঁর সহযাত্রীদের কথা। অস্ট্রো-জার্মান অভিযাত্রীদের পরে তাঁরা এ অঞ্চলে পর্বতাভিযানে আসেন। আসেন ১৯৪৭ সালে।

Schweizerische Stiftung fur Alpine Forschungen এই অভিযানের আয়োজন করেছিলেন। Andre Roch অভিযানের নেতৃত্ব করেন। অন্যান্য অভিযাত্রীরা হলেন, Mme. Annelies Lohner. Alfred Sutter, Alexandre Graven ও Rene Dittert.

তাঁরা বিমানযোগে সুইজারল্যাণ্ড থেকে ভারতে আসেন। ২৬শে মে মুসৌরী থেকে তাঁদের পদযাত্রা আরম্ভ হয়। ১১ই জুন নন্দনবনে তাঁরা মূল-শিবির স্থাপন করেন। হিমালয়ান ক্লাবের তৎকালীন সম্পাদক T.H. Braham ও রাম রাহুল* নামে জনৈক তরুণ ভারতীয় পর্বতারোহী এবং আটজন শেরপা তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন। তেনজিং নোরগে শেরপাদের অন্যতম। তখন অবশ্য তিনি একজন সাধারণ শেরপা। এই অভিযানকালেই তিনি প্রথম পর্বতশীর্ষে আরোহণ করেন এবং শেরপা-সর্দার পদে উন্নীত হন।

অভিযাত্রীরা প্রথমে কেদারনাথ ডোম ও কেদারনাথ শৃঙ্গে অভিযান চালান। ২৫শে জুন তারিখে তাঁরা এক ভয়ানক দুর্ঘটনায় পতিত হন। কিন্তু তাতেও বিচলিত না হয়ে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় কেদারনাথ শিখরে উঠতে সক্ষম হন।** তারিখটা ছিল ১১ই জুলাই, ১৯৪৭।

---

* ডকটর রাম রাহুল এখন দিল্লীর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট্ অব এশিয়ান স্টাডিজ-য়ের প্রধান অধ্যাপক।

** বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'পঞ্চ-প্রয়াগ' দ্রষ্টব্য।

তারপর বিশ বছরে আর কেদারনাথ শৃঙ্গে কোন অভিযান পরিচালিত হয় নি। বিশ বছর বাদে গত বছর আমরাই প্রথম অভিযান চালিয়েছি। কিন্তু আকস্মিক তুষার-ঝড়ের জন্য ২১,৮০০ ফুট থেকে প্রাণেশ ও সুজলকে নেমে আসতে হয়েছে। তিন দিন পর ঝড় থেমেছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করা সম্ভব হয় নি। কারণ অর্থাভাব। মাত্র বাইশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে সেই অভিযানের আয়োজন করতে হয়েছিল। আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য এবারে অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। এবার আরও কম টাকা নিয়ে অভিযানে এসেছি। জানি না অদৃষ্টে কি আছে?

সুইস অভিযাত্রীরা কেদারনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন দ্বিতীয় প্রচেষ্টায়। তাঁরা নন্দনবনে এসেছিলেন ১১ই জুন আর শিখরে আরোহণ করেন ১১ই জুলাই। অর্থাৎ কেবল কেদারনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করার জন্য তাঁরা এক মাস সময় ব্যয় করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, কতখানি প্রস্তুত হয়ে তাঁরা হিমালয়ে এসেছিলেন। উপযুক্ত প্রস্তুতি থাকলে যে আমরাও অসাধ্য সাধন করতে পারি তার প্রমাণ ১৯৬৫ সালের সফলকাম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযান। ১৬ই এপ্রিল অভিযাত্রীরা সাউথ কল-য়ে (২৬,০০০) পৌঁছান। শিখরাভিযানের সমস্ত আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখন সহসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়। বাধ্য হয়ে অভিযাত্রীদের ১৭,৪০০ ফুটে অবস্থিত মূল-শিবিরে নেমে যেতে হয়। তিন সপ্তাহ প্রতীক্ষা করার পর আবহাওয়া ভাল হয়। ১৭ই মে অভিযাত্রীরা আবার আরোহণ শুরু করেন। তিন দিনে সাড়ে দশ হাজার ফুট আরোহণ করে ১৯শে মে ২৭,৯৩০ ফুটে পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপিত করেন। পরদিন ৩০শে ক্যাপ্টেন এ. এস. চীমা ও নওয়াং গম্বু বিশ্বের উচ্চতম পর্বত-শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেন। সেখানেই শেষ নয়, তারপর নয় দিনে আরও তিনবার। ২২শে মে সোনাম গিয়াৎসো ও সোনাম ওয়াঙ্গিল, ২৪শে মে সি. পি. ভোরা ও আঙ কামি আর ২৯শে মে এইচ. এস. রাওয়াত, ক্যাপ্টেন এইচ. এস. আলুওয়ালিয়া ও ফু দোরজি।

যাকগে, যে কথা ভাবছিলাম। কেদারনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করার পরে সুইস অভিযাত্রীরা এসেছিলেন এখানে। গিয়েছিলেন সদুর্গম সতপন্থ শৃঙ্গে। তাঁরা কেদারনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন, আমরা পারি নি। তাঁরা সতপন্থ শিখরে আরোহণ করেছেন, জানি না আমরা পারব কিনা।

তবু আমরা এসেছি এখানে আর আমাদের সহযাত্রীরা এগিয়ে গেছে সতপন্থের পাদদেশে। কারণ সতপন্থ কেবল সুদুর্গম নয়, সে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ।

২৩,২১৩ ফুট উঁচু বিশালকায় সতপন্থ ৭৯° ১৩ অক্ষাংশ ও ৩১° ৫১′ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর উনিশ হাজার ফুট পর্যন্ত পাথর। তার তিনটি প্রধান গিরিশিরার প্রথমটি ১৯,০০০ ফুট থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে নেমে এসেছে। শেষ হয়েছে সুন্দর ও চতুরঙ্গী হিমবাহের সংযোগস্থলে। গিরিশিরাটির পূর্বদিকে সুরালয় বামক ও পশ্চিমে সুন্দর বামক। দুই হিমবাহের মাঝে সীমারেখা টেনে খাড়া দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে গিরিশিরাটি।

দ্বিতীয় গিরিশিরাটি দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে। এই গিরিশিরার ওপরে দুটি গিরিশৃঙ্গ আছে।

আর তৃতীয় গিরিশিরাটি প্রসারিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিমে। ভাগীরথী-১ শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা সুন্দর বামকের অপরাংশের মাঝে খাড়া প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে।

সতপন্থ দূর থেকে দেখতে অনেকটা মীনাক্ষী মন্দিরের মত। যেন সতপন্থ দেখেই শিল্পীরা মন্দিরটি তৈরি করেছেন।

১৯৩৮ সালে অস্ট্রো-জার্মান অভিযাত্রীরা প্রথমে উত্তর-পশ্চিম ও পরে উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা দিয়ে শিখরারোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৪৭ সালে সুইস অভিযাত্রীরা আঁদ্রে রশ-য়ের নেতৃত্বে এই উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা দিয়েই তাঁদের সফলকাম অভিযান পরিচালনা করেন।

সুইস ফাউণ্ডেশান তাঁদের সচিত্র হিমালয় স্মারক গ্রন্থে নেতা আঁদ্রে রশ কর্তৃক লিখিত এই সফলকাম অভিযানের বিবরণ প্রকাশ করেছেন। অভিযানের সদস্য মঁসিয়ে রেনে ডিটার্টের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ আমাদের সেই গ্রন্থখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বইখানি থেকে আমরা সতপন্থ সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছি।*

সতপন্থের গঠন-বৈচিত্র্যে স্বকীয়তা বর্তমান। অন্যান্য পর্বত-শৃঙ্গের মত সে ত্রিভুজাকৃতি নয়। তার শিখর সংকীর্ণ হলেও সুদীর্ঘ ও প্রায় সমতল। ১৯,০০০ ফুট থেকে ২৩,০০০ ফুট পর্যন্ত খাড়া পর্বতগাত্র চির-তুষারাবৃত। শিখরের নিচে ২১৩ ফুটের ঢাল মোটামুটি সহজ ও স্বাভাবিক। শিখরের উচ্চতম অংশটি পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত।

সতপন্থের উত্তরে চতুরঙ্গী হিমবাহ ও মানা পর্বতশ্রেণী ; উত্তর-পূর্বে চন্দ্র পর্বত ; কালিন্দী খাল ও অর্বা (আরোয়া) হিমবাহ ; উত্তর-পশ্চিমে বাসুকি পর্বত, শিবলিঙ্গ, রক্তবরণ হিমবাহ ও সুদর্শন শৃঙ্গ ; পূর্বে সুরালয় হিমবাহ ; পশ্চিমে ভাগীরথী-১ শৃঙ্গ ; দক্ষিণে সচ্ছন্দ শৃঙ্গ ; দক্ষিণ-পূর্বে চৌখাম্বা আর দক্ষিণ-পশ্চিমে খর্চাকুণ্ড ও কেদারনাথ পর্বত।

বিকেল পাঁচটায় প্রফেসর ও বীরেন ফিরে এল। প্রফেসর খুব খুশী অনেক নমুনা সে সংগ্রহ করেছে আজ। বীরেন তাকে সাহায্য করার ফাঁকে ফাঁকে কিছু গাছ, পাতা ও ফুল যোগাড় করে এনেছে। এবারে আমরা কোনো বটানিস্টকে নিয়ে আসি নি। গতবার বটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বটানিস্টরা এ অঞ্চলের উদ্ভিদ-সমীক্ষা করে গেছেন। তাই এবারে বীরেন বটানিস্টের অভাব পূরণ করতে চাইছে।

রোদ পড়ে গেছে অনেকক্ষণ—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। একে একে কুলিরা ফিরে আসছে ওপর থেকে। কিন্তু সেভীরামটা আসছে না কেন ? সে যে ওদের খবর নিয়ে আসবে। তাহলেও আর বাইরে বসে থাকা যাচ্ছে না। আজ খুব বাতাস বইছে—ঠাণ্ডা বাতাস। এখানে সবই ঠাণ্ডা—পাহাড়, প্রান্তর, জল, বায়ু, আকাশ। গরম কেবল সূর্য। সূর্যই বাঁচিয়ে রাখে জীবন। তাই সূর্য ডোবার পরে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

তাঁবুর ভিতরে আসি। স্লীপিং-ব্যাগের ভেতরে পা'দুখানি ভরে এয়ার-ম্যাট্রেসের ওপর আরাম করে বসি। প্রফেসর মাইক্রোসকোপ বের করেছে। বরেণ্য তার পাশে গিয়ে বসে। ওরা যন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্বকর্মার বিচিত্র লীলা দেখবে—দেখুক গে !

বীরেন তার বটানিক্যাল স্পেসিস্ নিয়ে অস্থির। ডাক্তারবাবু আজকের পরীক্ষার ফলাফলের ওপর চোখ বোলাচ্ছেন আর সিগারেট ধ্বংস করছেন। সঈদ চলে যাবার পরে এ শিবিরে এখন তিনিই একমাত্র স্মোকার। ডাক্তারবাবু একা পড়ে গেছেন। আর এজন্য

---

* 'Montagncs Du Moddc' (Mountains of the world)—'Foundation Suissc ponrd' Exploration Alpinc' (Swiss Foundation for Alpine Exploration).

তাঁর আফসোসের সীমা নেই। এতগুলি বেরসিক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁকে দিন কাটাতে হবে জানলে, তিনি নাকি আসতেন না এ অভিযানে। জানলে আমরাই কি ছাই তাঁকে সঙ্গে আনতাম। শারীরবিদ্যার নামে ভদ্রলোক অসহ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

তখনো সব চিঠিগুলি দেখতে পারি নি; তাই মোমের আলোয় আবার চিঠি নিয়ে বসি। চিঠি লিখেছেন শ্রীশর্মা—উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনের রেজিস্ট্রার শ্রী কে. পি. শর্মা। এর আগে দার্জিলিং শিক্ষায়তনের ইকুইপমেন্ট অফিসার ছিলেন। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব। নৌবাহিনী থেকে পর্বতারোহণে এসেছেন। সুদক্ষ পর্বতারোহী। ১৯৫৯ সালের ২৫শে মে কমাণ্ডার এম. এস. কোহলির সঙ্গে নন্দাকোট (২২,৫১০) শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালের অন্নপূর্ণা-৩ (২৪,৮৫৮) ও ১৯৫২ সালের ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের সদস্য ছিলেন। তারপর ১৯৬৫ সালে তিনি দুর্গম ভীরশৃলী (২৩,২১০) অভিযানের নেতৃত্ব করেন। আমাদের প্রাণেশ, সুজল, স্বপন ও বীরেন সেই অভিযানের সদস্য ছিল।

শ্রীশর্মা আমাদের অভিযানের প্রধান সহায়। তাঁর সাহায্য না পেলে এত সামান্য টাকায় আমরা এই অভিযানের আয়োজন করতে পারতাম না।

শ্রীশর্মা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। লিখেছেন, কলকাতার 'পথিকৃৎ'-এর পরিচালনায় এক মহিলা শিক্ষার্থী দল পর্বতারোহণ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগামী মাসে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে আসছে। রোন্টি অভিযানের সদস্যা শ্রীমতী সুদীপ্তা সেনগুপ্তা ও শ্রীমতী সুজয়া গুহ* যথাক্রমে এই শিক্ষার্থী দলের নেত্রী ও পরিচালিকা।

"নমস্তে সাব।"

তাড়াতাড়ি তাঁবুর দরজার দিকে তাকাই। সেতীরাম! সেতীরাম ফিরে এসেছে ওপর থেকে। কি খবর? ওরা কেমন আছে? আবহাওয়া কেমন? সতপন্থ শিখর আর কতদূরে?

হাতের কাজ ফেলে সবাই তাকিয়ে আছে সেতীরামের দিকে. সেতীরাম তো নয়, স্বর্গের দূত।

বরেণ্য জিজ্ঞেস করে. "কেয়া হাল-চাল সেতীরাম?"

"আচ্ছাই সাব। চিঠ্‌ঠি হ্যায়।" উইণ্ড-প্রুফের পকেট থেকে খামখানি বের করে বরেণ্যর হাতে দেয়।

বরেণ্য বলে, "সুজলদা লিখেছে।"

সুজল, আমাদের সহ-নেতা সুজল মুখোপাধ্যায় দু' নম্বর শিবির থেকে লিখেছে। বরেণ্য পড়তে শুরু করে—

15.9.68
রবিবার

'সাধের সতপন্থ, স্বপ্নের সতপন্থ, ভয়াল সুন্দর সতপন্থ।

এক নম্বর ক্যাম্পে ভোর হয়েছে, সামনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের গত এক বছরের স্বপ্ন—তারই মুখোমুখি, তারই কোলে এসে পৌঁছেছি। গতকাল আমরা এক নম্বর শিবির স্থাপন করেছি সুন্দর হিমবাহের প্রায় আধ মাইল ভেতরে, ১৭,৫০০ ফুট উচ্চতায়। চারিদিকে হিমেল পরশ। আমাদের ক্যাম্পে রোদ আসতে এখনো অনেক বাকী।

---

* ১৯৭০ সালের সফলকাম লাহুল মহিলা পর্বতাভিযানের নেত্রী।

সতপন্থের উত্তর-পূর্ব গিরিশিরাটিকেই আমরা কাল বার বার দেখছিলাম—ঐ গিরিশিরা ধরেই আমাদের পথ। গিরিশিরাটি এক কথায় ভয়ঙ্কর। মাথার দিকটা ছুরির ফলার মত—এক দিকের গা-টা বেশ খাড়া। আগাগোড়া বরফে ঢাকা। তারই মধ্যে কালো কালো পাথর দেখা যাচ্ছে।

যাত্রার আয়োজন চলেছে। অমূল্য, আমি, প্রাণেশ, স্বপন আর করুণা ; দা রিঞ্জি, দোরজি আর ছুঞ্জেকে নিয়ে সুন্দর হিমবাহ ধরে এগিয়ে যাব দু'নম্বর শিবিরের পথে। আমাদের রসদ নিয়ে যাবে দশজন মালবাহক। দু'নম্বর শিবিরের জায়গা খুঁজে বার করে আজ সেখানেই থেকে যাব। হিমাদ্রি কেবল এখানে থাকবে। নিচের শিবির থেকে মালবাহক ও রসদ নিয়ে আজ আসছে অসিতদা, সঈদ আমেদ আর জামিদ সিং—ওরা হিমাদ্রির সঙ্গে আজ এই শিবিরে থাকবে।

চা এবং ভর-পেট জলযোগ তৈরি হয়েছে—কেননা, মনমতো শিবির ফেলার জায়গা খুঁজে পেতে কত সময় লাগবে, সামনে পথ কেমন—কিছুই জানা নেই। কাজেই ইঞ্জিনে কয়লা ভাল করে ঠেসে নিতে হবে, যেন স্টীমের অভাবে গাড়ি না অচল হয়ে পড়ে।

বেরিয়ে পড়তে সাতটা বাজে। এই শিবির থেকে সতপন্থের দিকে যেতে প্রথমেই একটি ফুট ত্রিশেক উঁচু জায়গা পেরোতে হয়—তারপর সতপন্থের গোড়া পর্যন্ত দৃষ্টি আর বিশেষ বাধা পায় না। সুন্দর হিমবাহ ধরে আমরা দক্ষিণে চলতে থাকি সতপন্থের উত্তর ঢালের দিকে। বাঁ দিকে রয়েছে সতপন্থের বিখ্যাত উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা। পথে কোনো বিশেষ বাধা নেই। সুন্দর হিমবাহ এখানে প্রায় সমতল।

আমরা এত ধীরে ধীরে উচ্চতা লাভ করছি যে বুঝতেই পারছি না ওপরে উঠছি। চলার আনন্দে সবাই মত্ত। সবায়ের শরীর ভাল—যেটা পাহাড়ে সব থেকে বেশি প্রয়োজন। তারপর আবহাওয়া। চমৎকার সুন্দর সকাল—রোদটা বেশ মিঠে মিঠে লাগছে। উত্তরকাশী থেকে বেরোনোর পরে কোনদিন মেঘ, ঝড় বা বৃষ্টির কণামাত্র আভাস পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। প্রকৃতি দেবী আমাদের ওপর খুবই সদয়া বলতে হবে। কাজেই সবার মনে প্রচণ্ড উৎসাহ। হিমালয়ের আকাশে মেঘ করলে সেই মেঘের ছায়া মনের ওপর যেমন ছায়াপাত করে তেমনটি কিন্তু সমতলে নয়। সমতলের মত পাহাড়ে মেঘ দেখে "মনের ময়ূর" নেচে ওঠে না বরং ময়ূর পেখম বন্ধ করে কোনো নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজতে থাকে।

সতপন্থ শিখরে প্রভাতী রোদের পরশ লেগেছে। ফটো তুলতে তুলতে বেশ সহজ ছন্দে আমরা এগিয়ে চলি মাইলখানেক। চারিদিকে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর Glacial table—সুন্দর হিমবাহ সত্যই সুন্দর ! সতপন্থের উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরার কাছ বরাবর এসে আমরা অল্প একটু বাঁদিকে ঘুরি। উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরাটি সুন্দর হিমবাহ ও সতপন্থের গোড়া থেকে বয়ে-আসা অনামী হিমবাহটিকে পৃথক করেছে এইখানে। সুন্দর হিমবাহ এই গিরিশিরার পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে গিয়ে চলে গেছে ভাগীরথী-১ শৃঙ্গের পাদদেশ পর্যন্ত। আমরা এখান থেকে সতপন্থ ধরেই এগিয়ে চলি।

আরও মাইলটাক এগিয়ে একটা ছোটখাটো বরফের প্রান্তরে এসে পড়ি। প্রান্তরটি অসংখ্য ফাটলে ভরা। বিরাট বিরাট ফাটলগুলি মুখব্যাদান করে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। নিরাপত্তার জন্য চটপট্ কোমরে দড়ি বেঁধে নিই। এক-একটা ফাটলের ধারে গিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করি—কিছু দেখা যায় না, ভেতরটা জমাট-বাঁধা অন্ধকার।

এবারে শুরু হয় ফাটলের জালের মধ্য দিয়ে পথ খোঁজা। বিপদ-বাধার সম্মুখীন হয়ে

আমাদের দায়িত্ব বেড়ে যায়, পথ চলার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। সকালবেলাকার সেই পরম-নিশ্চিন্ত-নির্ভর এগিয়ে চলায় যতি পড়ে। প্রতি পদক্ষেপে এখন আমরা সতর্ক হয়ে চলি। কোনো ফাটলকে লাফিয়ে, কোনো ফাটলকে ঘুরে এড়িয়ে, আবার কোনো বড় ফাটলের ওপরকার বরফের সেতুর ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলার পথ করে নিই। জুতোর নিচে ক্র্যাম্পন বা কাঁটা লাগিয়ে নিয়েছি। প্রথমে আমরা পার হই, তারপর দড়ির সাহায্যে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে মালবাহকদের একে একে পার করাই। সবাই বেশ উত্তেজিত, আর আনন্দিতও বটে। পরম নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পথ চলায় আনন্দ কোথায়?

ধীরে ধীরে যতই আমরা প্রান্তরের মধ্যে এগিয়ে চলি, বড় বড় ফাটলগুলো ততই আমাদের ঘিরে ধরতে থাকে। ঘণ্টাখানেক এইভাবে চলার পর আমরা সবাই এক জায়গায় পিঠের বোঝা নামিয়ে ফেলি বিশ্রামের জন্য।

সামনে সতপন্থ—অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। সাংঘাতিক খাড়া বলে মনে হচ্ছে। আবহাওয়া চমৎকার। কিছু বিস্কুট আর চকোলেট বার করে সকলে মিলে ভাগ করে খাই। প্রাণেশ হঠাৎ আমসত্ত্বর একটা প্যাকেট বার করে হাতে নাচাতে থাকে—আমরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। শেষে রফা হয়। ডাক্তারের ওপর ভাগ করে দেওয়ার ভার পড়ে। কিন্তু হায়, এ তো সেই বানরের পিঠে ভাগ করা! পাহাড়ে আমসত্ত্ব প্রাণেশের সব থেকে প্রিয় খাদ্য—খালি আমসত্ত্ব খেয়েই সে শিখরে আরোহণ করতে পারে।

সময় এগিয়ে চলে। বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই। এখনো শিবিরের জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। বরফের প্রান্তরটি ভরে আছে অসংখ্য ছোট ছোট Icicle বা তুষারঝাড়। আমরা চলি আর ভারী বুটের ঘায়ে সেগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে। সকলের চলার ছন্দে এক বিচিত্র শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু পথ কোথায়? এবার তো আমরা পুরোপুরি ফাটলে বেষ্টিত হয়ে পড়েছি! যেদিক দিয়েই এগোবার চেষ্টা করি, সেদিকেই এক-একটি ছ'-সাত ফুট চওড়া ফাটল হাঁ করে রয়েছে। এগোবার পথ নেই। আবার আমরা বোঝা নামাই। শুরু হয় পথ খোঁজা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি সম্ভাব্য পথ পাওয়া যায়। ছ'-সাত ফুট চওড়া একটি ফাটল, দশ-বারো ফুট গভীর। আইস এক্স দিয়ে বরফের গায়ে সিঁড়ি তৈরি করে ফাটলের মধ্যে নেমে আবার সামনের বরফের দেওয়ালে সিঁড়ি তৈরি করতে হয়। সাবধানে সবাই ফাটলের এপারে আসি। আর ফাটল নেই। সামনে হিমবাহ ধীরে ধীরে উঠে গেছে সতপন্থের পাদদেশ পর্যন্ত। একটু পশ্চিম দিকে এগিয়ে তাঁবু ফেলার সুন্দর একটি জায়গা পাই। ঘড়িতে এখন বেলা একটা। চটপট তাঁবু লাগানো হয়ে যায়। Altimeter উচ্চতা নির্দেশ করে ১৮,৫০০ ফুট। মালবাহকেরা নেমে যাবে। ছুঞ্জে তাড়াতাড়ি চা চাপায়। চা-বিস্কুট খাইয়ে আধঘণ্টার মধ্যে ওদের নিচে পাঠিয়ে দিতে হবে। আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি। ওরা এই চিঠি নিয়ে এক নম্বরে যাবে। সেখানে সেতীরাম অপেক্ষা করছে।

উত্তর-পূর্ব গিরিশিরার কাছেই তাঁবু লাগানো হয়েছে। সতপন্থের ঠিক কোলে একটা Icefall। মনে হয় বিরাট একটা শহর যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ওলটপালট হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

তার পেছনে গিরিশিরা। গিরিশিরাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। আগামীকাল ওর ওপরে ওঠা পথ খুঁজতে হবে। এখান থেকে গিরিশিরাটি ভয়াবহ মনে হচ্ছে। সাংঘাতিকভাবে খাড়া—মাঝে মাঝে কালো পাথর। ওপরটা তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলার মত। গিরিশিরাটি যেখানে গিয়ে সতপন্থের উত্তর-পূর্ব গিরিশিরার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে একটু সমতল জায়গা আছে

বলে মনে হচ্ছে। তারপরই সতপন্থের মূল-শিরা ধরে এগোতে হবে। প্রথমেই সম্মুখীন হতে হবে একটি ছোট্ট hump-য়ের। এই hump টিকে এড়াবার জন্য আমাদের নেমে যেতে হবে গিরিশিরার পূর্বে অর্থাৎ সুরালয় হিমবাহের দিকে। কেননা ঐদিকে অর্থাৎ গিরিশিরার পশ্চিম দিক দিয়ে যাবার কোনো রাস্তা নেই বলেই এখান থেকে মনে হচ্ছে। সুইসদের report-এ আছে, পুবদিকে এই গিরিশিরা সোজা চার হাজার ফুট নেমে গেছে সুরালয় হিমবাহে। ওদিকের ঢাল কত ডিগ্রী সুইসরা তা কিছু বলেন নি। তবে আমরা আশা করছি, যদি নরম বরফ থাকে তবে ঐদিকের ঢাল ধরে এগোনো অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে। আর যদি শক্ত বরফ থাকে তবে পথ হবে খুবই কষ্টকর এবং বিপজ্জনক।

সতপন্থের কোলে সন্ধ্যার ছায়া নামতে দেরি আছে। এখন তার চূড়ায় সূর্যের সোনালী আভা। পেছনে ফেলে-আসা পথের দিকে তাকাই। উত্তরে অনেক নিচে সতপন্থ হিমবাহের সঙ্গে সুন্দর হিমবাহ এসে মিশেছে। সতপন্থের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরা দুটি প্রায় যেন মিশে আছে—তারই মধ্য দিয়ে সরু গলির মত একটি রাস্তা আরো নিচে নেমে গেছে। আরো দূরে চতুরঙ্গী পেরিয়ে উত্তর দিগন্তে ঘন জমাট-বাঁধা মেঘ—পাহাড়গুলোর গায়ে কিছুদূর উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে যেন। ওরা কি আমাদের দেখছে? ওদের সারা গায়ে নানারঙের আলপনা।

প্রকৃতির লীলানিকেতনে ক্ষণে ক্ষণে পটপরিবর্তন হচ্ছে—ভাঙছে, গড়ছে, আবার ভাঙছে। আমরা ভাগ্যবান—প্রকৃতির এই বিচিত্র ভাঙা-গড়ার খেলা দু'চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি। সতপন্থের কোলে বসে প্রকৃতির এই খেলা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছি। বিরাটের সামনে দাঁড়িয়ে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি আমাদের সকল সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাড়া জাগাচ্ছে। একটা আবেগ গলার কাছে পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে। ভুলে গেছি আমরা কোথায় আছি—কি করতে আজ আমরা এখানে এসেছি।

গুড়ুম...গুড়ুম...গ্রাম!

চমকে উঠি। প্রচণ্ড শব্দ—শত কামানের গর্জনকেও হার মানাচ্ছে। চারিদিকের পাহাড়ে কম্পন লেগেছে। নিচে কোথায় যেন ধস নেমেছে—বাসুকি পর্বত থেকে বোধ হয়।...

॥ সাত ॥

আসা আর যাওয়া নিয়ে যেমন জীবন, তেমনি যাওয়া আর আসা নিয়েই পর্বতারোহণ। যাওয়া-আসার পথের ধারে শিবির। সেই শিবির থেকে অভিযাত্রীরা যায় অজানা জগতে—জীবনকে যেখানে মনে হয় মৃত্যুর মত সত্য ও সুন্দর। তারপর একদিন মৃত্যুকে মিথ্যে প্রমাণ করে তারা ফিরে আসে। শিবিরে সেদিন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের জয়গানে জগৎ মুখরিত হয়। মৃত্যুর চেয়ে জীবন সত্য ও সুন্দর হয়ে দেখা দেয়।

অভিযাত্রীরা চলে গেছে সেই অচেনা ও অজানা জগতে। তারা এখন মৃত্যুর জগতে জীবনের জয়গান গাইছে। আমরা তাদের ফিরে আসার পথ চেয়ে রয়েছি।

আজ ১৬ই সেপ্টেম্বর। সকালে কুলিরা মাল নিয়ে ওপরে চলে গেছে। ওরা বিকেলে ফিরে আসবে। আসবে সহযাত্রীদের খবর নিয়ে।

আমরা "ওয়াকি টকি" তথা Wircless set নিয়ে আসি নি। আনি নি কারণ, যে যন্ত্র পাওয়া যায় তাতে কাজ হয় না, উপরন্তু যন্ত্রটি বইবার জন্য দুজন মালবাহক নিয়োজিত করতে হয়। তাই এ অভিযানে আমরা মালবাহকদের মারফতে সংবাদ আদান-প্রদান করছি।

বীরেনকে নিয়ে প্রফেসর আজ গেছে ভাগীরথীর দিকে পাথর ও বরফ সংগ্রহ করতে। ডাক্তারবাবু যথারীতি তাঁর পরীক্ষা আরম্ভ করার আয়োজন করছেন। কথায় কথায় ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করি, "পরীক্ষার নাম করে জ্বালাতন তো করছেন যথাসাধ্য, কিন্তু এর ফলে উল্লেখযোগ্য কিছু জানতে পারা যাবে কি?"

"নিশ্চয়ই।" ডাক্তারবাবু দৃঢ়স্বরে উত্তর দেন।

"আচ্ছা, আপনার পরীক্ষার মূল বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলুন না!" ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করি।

একটু ভেবে নিয়ে ডাক্তারবাবু বলতে শুরু করেন, "শরীর-যন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর খুবই নির্ভরশীল। কারণ আলো বাতাস ও তাপের নির্দিষ্ট পরিমাপেই শরীর-যন্ত্র অব্যাহত গতিতে কাজ করতে পারে। বর্হিপরিবেশের পরিবর্তন হলেই দেহের ভেতরকার পরিবেশও পরিবর্তিত হতে চায়। জীবিত অবস্থায় দেহের এই আভ্যন্তরীণ পরিবেশে অতি সামান্য পরিবর্তনই সম্ভব। অধিক পরিবর্তন ঘটলে জীবন সম্ভব নয়। কিন্তু দেখা যায়, মেরুদেশের তুষার-ঝটিকা থেকে আরম্ভ করে অগ্নিময় সাহারায়, ক্ষীণবায়ু পর্বত-শিখর থেকে সাগরতলের প্রবল চাপের মধ্যেও—মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব।

এটা সম্ভব হয় কারণ, শরীরের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ—যেমন তার তাপমাত্রা, অম্লতা বা ক্ষারতা, জলীয় পদার্থের পরিমাণকে অনুকূল সীমার মধ্যে রাখার প্রয়োজনে দেহে কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে। একটা সাধারণ উদাহরণ দিলেই জিনিসটা পরিষ্কার হবে।

তাঁবুর ভেতরের গরম স্লীপিং-ব্যাগ থেকে নগ্নগাত্রে সহসা তুষারের মধ্যে এলেই শরীরে প্রবল কাঁপুনি দেখা দেবে। এই কাঁপুনির সৃষ্টি হয় ত্বকের নিচে ছোট ছোট মাংসপেশীর বারংবার দ্রুত সঙ্কোচন-প্রসারণে। এরই ফলে উৎপন্ন হয় তাপ। যার ফলে, বাইরের তাপাঙ্ক শূন্য ডিগ্রীর বহু নিচে হলেও শরীরের তাপাঙ্ক স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই থাকবে। আবার মনে করুন, গ্রীষ্মকালে রান্না হচ্ছে। বন্ধ ঘরে বিশাল বিশাল উনুন। তাপাঙ্ক একশ' বিশ ডিগ্রী—আপনি দর-দর করে ঘামছেন। তখনো আপনার শরীরের তাপাঙ্ক স্বাভাবিক। কারণ নিঃসৃত ঘর্ম বায়ুভূত হচ্ছে—আর সেই সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আপনার দেহের বাড়তি তাপ।

আরেকটা দিক এবার দেখুন। আপনি স্লীপিং-ব্যাগের বাইরে এসে হি-হি করে কাঁপছেন। মনে করুন, গোমুখীর সেই নাঙ্গা সাধুর কথা। সারা গায়ে বিভূতি-মাখা বস্ত্রহীন অবস্থায় সেই প্রবল হিমশীতল বাতাসেও তাঁর কোনো কাঁপুনির লক্ষণ দেখা যায় নি। কারণ দীর্ঘকাল ঠাণ্ডায় থেকে থেকে তাঁর শরীরের বিভিন্ন কলায় সাময়িক বা চিরকালীন পরিবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি অনেক বেশি ঠাণ্ডা সহ্য করতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একে বলা হয়, বাতানুসহন বা acclimatisation.

আমাদের এই সাদা ইঁদুরের শরীরে উচ্চ পর্বতের শীতলতা ও অক্সিজেন ক্ষীণ বায়ুতে বাতানুসহনের ফলে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় তা লক্ষ্য করতে হবে। এই বিষয়ে অনেক কিছু জানা থাকলেও আমাদের সবকিছুই জানা নেই। বিশেষ করে দেখতে হবে হৃৎপেশীর রক্তবাহী নালিকাগুলির অবস্থা। উচ্চ পর্বতের আবহাওয়ায় এর কি পরিবর্তন হয় সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে।

তুষাররাজ্য সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁরা তুষার-ক্ষত নামক যন্ত্রণাদায়ক রোগের সঙ্গে পরিচিত। এই যন্ত্রণা নিরসনে অনেক সময়েই শরীরের আক্রান্ত অংশ কেটে বাদ দিতে হয়। এই অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানের এখনও অভাব আছে। হয়তো ত্বকের বাতানুসহন ক্ষমতার অভাবের সঙ্গে তুষার-ক্ষতের একটা সম্বন্ধ রয়েছে। ত্বকের নিজস্ব কোন বাতানুসহন ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীমহলে মতভেদ আছে।

অভিযাত্রীদের মাথার, মুখের ও আঙুলের ত্বকে বিভিন্ন অবস্থায় তাপমাত্রা নির্ণয় করে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি। এই ধরনের পরীক্ষা গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পার্বত্য আবহাওয়ায় সেই পরীক্ষার মূল্যায়ন হওয়া দরকার।"

"সাব, আদমি..." মেট চিৎকার করে ওঠে।

থামতে হয় ডাক্তারবাবুকে। আমরা তাকাই সেদিকে—ওপরে নয়, নিচে। একসারি মানুষ আসছে। যেমন করে আমরা সেদিন এসেছি এখানে।

এরা কারা ? আমাদের কুলিরা কি—যারা রোজ কাঠ নিয়ে আসে ? কিন্তু তারা তো মোট পাঁচজন ! এরা যে অনেক...পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ... এরা কারা ?

যারাই হোক, মানুষ। এই জনহীন হিমালয়ে মানুষ আসছে মানুষের কাছে। মানুষের জগতে মানুষ যতই মূল্যহীন হোক, এখানে মানুষের মূল্য অনেক। আমরা এদের সানন্দে বরণ করব।

পড়ে থাকে ডাক্তারবাবুর পরীক্ষা। আমরা এগিয়ে চলি সেই অপরিচিত অভিযাত্রীদের অভিনন্দন জানাতে।

আমরা এগিয়ে চলি, ওরা এগিয়ে আসে। ওরা কাছে আসে। আর এসেই আমাদের জয়ধ্বনিতে ভরিয়ে তোলে চারিদিক—

"সতপন্থ অভিযান...জিন্দাবাদ !

গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার এক্সপ্লোরেশান কমিটি জিন্দাবাদ !

অমূল্য সেন...জিন্দাবাদ !"

ওরা কেবল মানুষ নয়, ওরা বাঙালী। শত সহস্র সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত মানুষ। আমরা ওদের জড়িয়ে ধরি। অপরিচয়ের সব ব্যবধান দূর হয়ে যায়।

দলনেতা প্রদীপ্ত চক্রবর্তী পরিচয় দেয়, "আমরা সবাই হিমালয় লাভার্স এসোসিয়েশনের সদস্য, দিলীপ ভট্টাচার্য—কোয়ার্টার মাস্টার, আশীষ দাশগুপ্ত—ম্যানেজার, অমর ঘোষ—ডাক্তার, দেবব্রত সরকার—সদস্য ও উজাগর সিং—উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের ইন্‌স্ট্রাক্‌টার, আমাদের পথ-প্রদর্শক। চলেছি কালিন্দীখাল দর্শন করতে।

আমরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী। নিজব্যয়ে এই পদযাত্রার আয়োজন করেছি। প্রতি সদস্যের প্রায় আটশ' টাকার মতো খরচ পড়বে।

উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের ডায়াস মেমোরিয়াল ফাণ্ড থেকে আমরা সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া করে এনেছি।"

দার্জিলিংয়ের জয়াল মেমোরিয়াল ফাণ্ডের অনুকরণে, দ্বিতীয় ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের স্বর্গত নেতা জন ডায়াসের স্মৃতিরক্ষার্থে উত্তরকাশীতেও পর্বতারোহণ সাজ-সরঞ্জামের একটি ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

ওদের কুলিরা এসে যায়। তাদের তাঁবু টাঙাতে বলে আমরা ওদের নিয়ে আসি আমাদের তাঁবুতে। বাইরে বেশ জোরে বাতাস বইছে।

একটু বাদেই টিকারাম কফি নিয়ে আসে। বরেণ্য বিস্কুট বের করতেই ওরা একসঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে— "কি দরকার আবার বিস্কুটের ! আমরা সকালে পেট ভরে খাবার খেয়ে বেরিয়েছি।"

"বিস্কুট তো খাবার নয়", ডাক্তারবাবু চুট্‌কি ছাড়েন, "বিস্কুট মুখশুদ্ধি।"

ওরা হেসে ওঠে। বরেণ্যর কাছ থেকে বিস্কুট হাতে নেয় ওরা। কিন্তু সঙ্কোচ কাটে না। বলে, "আপনারা এসেছেন সতপন্থের মতো দুর্গম শৃঙ্গাভিযানে। অর্থাভাবের মধ্যে আয়োজন করেছেন এতবড় অভিযান। আপনাদের খাবার কম পড়ে গেলে বিপদ হবে।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন," বরেণ্য বলে, "অর্থাভাব থাকলেও খাদ্যাভাব নেই আমাদের। কারণ দলের কোয়ার্টার মাস্টার ও মেডিক্যাল অফিসার দুটোই আধ-মণী কৈলাস।"

কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তারবাবু কাজের কথা পাড়েন, "আমি আপনাদের একটু কষ্ট দেব।"

ওরা জানে না কি কষ্ট, তাই সানন্দে বলে ফেলে, "দিন !"

ডাক্তারবাবু বাইরে যান যন্ত্র আনতে। ওরা জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকায়। আমি বলি, "পরীক্ষা করবেন।"

"কিসের পরীক্ষা ?"

"মানুষ নিয়ে পরীক্ষা। আপনারা যখন মানুষ, আর এখানে এসে পড়েছেন, তখন ডাক্তারবাবুর হাই অলটিচ্যুড ফিজিওলজিক্যাল রিসার্চের হাত থেকে পরিত্রাণ পারেন না।"

"বেশ তো, ভাল কথা", প্রদীপ্ত বলে, "তাছাড়া দিলীপ আর উজাগরের শরীরটাও ভাল নয়। ডাক্তারবাবু এখানে থাকায় ভালই হল।"

"তা এখুনি টের পারেন !" আর কিছু বলার সুযোগ পাই না। ডাক্তারবাবু ফিরে আসেন এবং ওদের পরীক্ষা করতে শুরু করে দেন।

ওরা কিন্তু বেশ চুপচাপ বসে আছে। বোধকরি মজা পাচ্ছে। একে অপরের পরীক্ষা মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করছে।

বীরেন ও প্রফেসর তাঁবুতে প্রবেশ করে। আশ্চর্য হয়। হবারই কথা। বাসুকি ও ভাগীরথী পর্বতের পাদদেশে পাঁচ-পাঁচটা জলজ্যান্ত বাঙালী যুবককে পাকড়াও করে ডাক্তারবাবু তাঁর ফিজিওলজিক্যাল রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছেন ! এর চেয়ে আর কি বেশি আশ্চর্যের হতে পারে !

বীরেন ও প্রফেসরের সঙ্গে কালিন্দী-যাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর আবার গল্প শুরু হয়।

কথায় কথায় প্রদীপ্ত বলে, "যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলব ?"

"অসঙ্কোচে বলে ফেলুন।" বীরেন বলে।

প্রদীপ্ত জিজ্ঞেস করে, "বাইরে দেখলাম একখানি ত্রিপল পড়ে আছে, ওটা কি আপনাদের কাজে লাগছে ?"

"না। কেন বলুন তো ?"

"আপনাদের অসুবিধে না হলে ওটা আমরা ধার চাইছি।"

বীরেন আমার দিকে তাকায়।

হেসে বলি, "এতে আমাদের অসুবিধের কি আছে ?"

নানা গল্পের মাঝে সময় গড়িয়ে যায়। আমাদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের বাণী বহন করে এনেছে কালিন্দী-অভিযাত্রীরা। বীরেন ও প্রফেসরের কাছ থেকে ওরা কালিন্দীখাল পথের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করে। ওদের দুজনের এ অঞ্চলের মানচিত্র মুখস্থ।

দিলীপ ও উজাগরকে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু ওষুধ দেন। আর তাই দেখে ওদের জনকয়েক কুলি এসে হাজির হয় ডাক্তারবাবুর সামনে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কেয়া বাত্ ?"

"ডগ্‌দারসাব, শির দরদ।"

"বুক দরদ।"

"পেট দরদ।"

"পায়ের দরদ।"

ডাক্তার দেখলে অসুস্থ হওয়া একটা স্বাভাবিক নিয়ম। বরযাত্রী এসেও ডাক্তারকে প্রেসক্রিপশান লিখতে হয়, হয়তো বা বিয়ে করতে বসেও। শহরে যেখানে অলিতে-গলিতে ডাক্তারের মেলা, সেখানেই যদি এই হয়, তাহলে হিমালয়ে কি হবে ? গত বছরের কথা মনে পড়ছে। কেদারনাথ পর্বতাভিযানের শেষে হিমালয়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রয়োজনে বরেণ্য, করুণা ও স্বপনকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম মুখীমঠে। ধরালীর উল্টোদিকে ভাগীরথীর অপর পারে একটি গ্রাম—বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ-প্রধান প্রাচীন গ্রাম। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের নিবাস। আমাদের সঙ্গে একজন ডাক্তার ও ওষুধ আছে শুনে সারা গাঁয়ের মানুষ জড়ো হয়েছিল। তাদের সবাই যে অসুস্থ ছিল, সেকথা বলছি না। কিন্তু অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিল। স্বপন সেদিন তাদের সাধ্যমত চিকিৎসা করেছে। জানি না, একদিনের সে চিকিৎসায় তাদের কতটা উপকার হয়েছে। কিন্তু কৃতজ্ঞ সেই মুমূর্ষু মানুষগুলির কথা আমি আজও ভুলতে পারি নি। হয়তো কোনোদিন পারব না।

প্রবোধদার কাছে শুনেছি, তাঁরা যখন কৈলাস যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের কাছে হোমিওপ্যাথী ওষুধ আছে খবর পেয়ে দুর্গম পথ পেরিয়ে দলে দলে মানুষ ছুটে আসত।

কিন্তু সে ১৯৫০ সালের কথা। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে হিমালয়ের উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের কোনো উন্নতি হয় নি। হলে মুখীমঠের মত গ্রাম, যেখান থেকে বাস-পথের দূরত্ব মাত্র মাইল তিনেক আর জেলা-সদর উত্তরকাশী যেতে মাত্র ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে, সেই গ্রামের অধিবাসীদের এমন হাল হবে কেন ?

হিমালয়ের প্রধান সমস্যা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। এই দুটি সমস্যার সমাধান করতে পারলে অন্য সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। রাস্তা তৈরির সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক আছে অস্বীকার করি না, কিন্তু রাস্তা নির্মিত হওয়া মানেই উন্নত হওয়া নয়। পথ মানেই স্বর্গের পথ নয়।

দরদী ডাক্তারবাবু ধৈর্য সহকারে কুলিদের দরদের কারণ নির্ণয় করে ওষুধ দেন। তারা হাসিমুখে চলে যায়। কালিন্দী-যাত্রীরা খুশি হল। কুলিরা খুশি হলে অভিযাত্রীরা বাধিত হয়।

আমাদের কুলিরাও হাসিমুখে ওপর থেকে নেমে আসে, কিন্তু আমরা খুশি হতে পারি না। চিঠি আনে নি ওরা, খবর আনে নি। কারণ কি ? অগ্রবর্তী দল কাল দু' নম্বরে চলে গেছে। আজ ও কাল তাঁরা সতপন্থ শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করবে। কঠিন ও বিপজ্জনক শৃঙ্গ সতপন্থ।

আমরা বার বার একই প্রশ্ন করি। সেতীরাম সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে না। কেবল জানায়—সঈদকে নিয়ে জামিদ আজ চলে গেছে দু' নম্বরে। হিমাদ্রি ও অসিত রয়েছে এক নম্বরে ! তারাও ওপরের কোনো খবর জানে না। সকালে যে কুলিরা দু' নম্বরে গেছে তারা সেতীরামদের রওনা হবার সময় পর্যন্ত এক নম্বরে ফিরে আসে নি। পথে রাত হয়ে যাবে বলে অসিত তাদের ফিরে আসার আগেই সেতীরামকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

এমন তো হওয়া উচিত নয় ! পর্বতাভিযানের প্রথম কথা, নিরাপত্তার দিকে নজর রাখা এবং সেই নিরাপদ সংবাদ নিচের শিবিরে পৌঁছে দেওয়া। অমূল্য, সুজল, স্বপন, প্রাণেশ ও করুণার মত অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরা একটা খবর পাঠাল না !

সারা শিবিরের আবহাওয়াটা কয়েক মিনিটের মধ্যে দুঃসহ হয়ে উঠল। হাস্য-কৌতুকে ভরা সেই সুন্দর বিকেলটা যেন বিদায় নিয়েছে বহুক্ষণ। আমরা নীরবে বসে থাকি।

দিলীপ সেই নীরবতার অবসান করতে চায়। বলে, "আপনারা এমন মন-মরা হয়ে পড়লেন কেন ? খবর আসে নি, তাতে কি হয়েছে—নো নিউজ ইজ গুড নিউজ।"

"না ভাই।" ম্লান হেসে বলি, "পর্বতারোহণে নো নিউজ ইজ ব্যাড নিউজ।"

'কথাটা মেনে নিতে পারলাম না দাদা।" প্রদীপ্ত বলে, "কোনো কারণে আর ওঁরা খবর পাঠাতে পারেন নি, কাল নিশ্চয়ই খবর পাওয়া যাবে।"

"আপনার কথা সত্যি হোক। কিন্তু যতক্ষণ সেই সংবাদ না আসে, ততক্ষণ তো দুশ্চিন্তা না করে পারি না।"

"পারেন।" অমর বলে।

আমরা তার মুখের দিকে তাকাই।

অমর আবার বলে, "ততক্ষণ আপনারা আমাদের সতপন্থের কথা বলতে পারেন।"

"কি কথা ?" বুঝতে পারি না।

"বলতে পারেন, আঁদ্রে রশ ও তাঁর সহযাত্রীরা কিভাবে সতপন্থ শিখরে আরোহণ করেছিলেন ?"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সতপন্থের আলোচনায় ব্যস্ত থাকলে সতপন্থ-অভিযাত্রীদের কথা কিছুক্ষণ ভুলে থাকা যাবে। কিন্তু সে দুঃসাহসিক সংগ্রামের কথা বিস্তারিত ভাবে বলতে পারে একমাত্র বীরেন। আমি তার দিকে তাকাই।

বীরেন কিছু বলে ওঠার আগেই হঠাৎ আশীষ প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, সুইস অভিযাত্রীরা কি সত্যিই সতপন্থ শিখরে আরোহণ করেছিলেন ?"

"কেন আপনার কোনো সন্দেহ আছে কি ?" প্রফেসর আশীষকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

লজ্জা পায় আশীষ। কোনোমতে বলে, "সন্দেহ....হ্যাঁ....মানে ঠিক আমার নয়, যাঁরা এই অঞ্চলের খবরাখবর রাখেন, তাঁদেরই কয়েকজনের কাছে শুনেছি, সুইসরা সতপন্থ শিখরে আরোহণ করেন নি। কারণ সতপন্থ নাকি আরোহণ করার মত শিখর নয়।"

"এবং আমরাও পারব না।" বরেণ্য যোগ করে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁরা তাই বলেছেন।" অমর বরেণ্যর দিকে তাকিয়ে বলে।

এতক্ষণে বীরেন আলোচনায় অংশ নেয়। বলে, "আমরা সতপন্থে আরোহণ করতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু না পারলেও বলব, সতপন্থ শিখরে আরোহণ করা অসম্ভব নয় এবং সুইস অভিযাত্রীরা নিশ্চয়ই আরোহণ করেছেন।"

"তাহলে একটু বলুন না সেই বিস্ময়কর আরোহণের কথা।" এবারে দলনেতা প্রদীপ্ত অনুরোধ করে।

এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না বীরেন। সে বলতে শুরু করে, "কেদারনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করার পরে সুইস অভিযাত্রীরা সাব্যস্ত করলেন তাঁরা ২২,৪৯৫ ফুট উঁচু ভাগীরথী-১ শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করবেন। অপরাজিত সুবিশাল ভাগীরথী-১ মুগ্ধ করেছিল তাঁদের। ভাগীরথী-১ এবং সতপন্থের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত সুন্দর বামক থেকে উত্তর-

পূর্বদিক দিয়ে আরোহণ করাই তাঁদের কাছে সবচেয়ে সহজ পথ বলে মনে হয়েছিল। তাই তাঁরা নন্দনবন থেকে চতুরঙ্গী হিমবাহে উঠে ১৬,০০০ ফুটে একটি শিবির স্থাপন করলেন। তারিখটা ছিল ১৯৪৭ সালের ২৯শে জুলাই।

তারপর আঁদ্রে রশ দুজন সহযাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দর বামকের দিকে অগ্রসর হলেন। হিমবাহের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। কিন্তু যতটুকু দেখলেন, তাতে তাঁরা মোটেই আশান্বিত হতে পারলেন না। গ্রানাইট শিলায় গঠিত খাড়া একটা দেওয়ালের ধারে গিয়ে হিমবাহটি শেষ হয়ে গেছে! ওপরদিকে নীল বরফ ঝুলছে। ঝুলন্ত বরফ মাঝে মাঝেই ভেঙে পড়ছে হিমবাহের ওপরে। তাঁরা বুঝতে পারলেন তুষার-ধস এড়িয়ে ভাগীরথী-১ শৃঙ্গে আরোহণ করা অসম্ভব, বরং সতপন্থ সহজতর। তাঁরা সতপন্থ শৃঙ্গে অভিযান চালাতে মনস্থ করলেন। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। তারই মধ্যে তাঁরা ১৮,০০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করলেন। হিমবাহের ওপরে, ঠিক সতপন্থের পাদদেশে শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন।

পরদিন অর্থাৎ ৩০শে জুলাই সকাল ছ'টার সময় রশ, ডিটার্ট ও গ্র্যাভেন পথ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। দুটি গিরিশিরা দিয়ে শিখরারোহণ ওঁদের কাছে সম্ভবপর বলে মনে হল—একটি উত্তরে, অপরটি উত্তর-পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিমের গিরিশিরাটি কম খাড়া দেখে ওঁরা সেই দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কিছুদূর এসেই দেখতে পেলেন পথ বন্ধ। রশ-য়ের ভাষায়— 'Our path was blocked by impassable walls of red and green gneiss'.* সুতরাং তাঁরা উত্তর দিকের গিরিশিরাটি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা ১৯,০০০ ফুট উঁচু একটি ছোট শিখরে উপস্থিত হলেন।

এই আরোহণের বর্ণনা দিতে গিয়ে রশ বলেছেন—

'...the other ridge to the right of which the long northerly arete rises to Satopanth which to the left a snowy-ridge led us in twenty minutes to a little peak'.....

সেখান থেকে তাঁরা চন্দ্র পর্বতের চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন ১৯৩৮ সালের অস্ট্রো-জার্মান শিবিরের চিহ্ন। সেখানেই দু'নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করে তাঁরা সেদিন নেমে এলেন এক নম্বর শিবিরে।

এই নেমে আসার কাজটি কিন্তু মোটেই সহজ হল না। সকালে তাঁরা সোপান (Step) কেটে কেটে উঠেছিলেন, কিন্তু নামার সময় সেই পথে নামতে সাহসী হলেন না। কারণ ততক্ষণে রোদের উত্তাপে শিখরের বরফ গলতে শুরু করেছে আর সেই সঙ্গে ওপর থেকে সর্বনাশা পাথর পড়ছে। প্রস্তরবৃষ্টি যে দিকটায় অপেক্ষাকৃত কম হচ্ছিল, তাঁরা সেই পাথুরে পথ বেয়ে ঢালের নিচে নামতে থাকেন। এপথে তাঁদের মোটে ছ'সাত গজ বরফ পেরোতে হয়েছিল। তাতেই প্রায় মারা যাবার যোগাড়। ক্র্যাম্পন পরে নিয়ে সিঁড়ি কাটতে কাটতে খুব তাড়াতাড়ি নামতে হচ্ছিল। আর প্রতি মুহূর্তে ওপরদিকে নজর রাখতে হচ্ছিল—মাথায় পাথর পড়ে কিনা। কয়েকটা পাথর খুবই কাছাকাছি পড়ল। একটা রশ-য়ের প্রায় পায়ের ওপর। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত অক্ষত শরীরেই তাঁরা ফিরে এলেন শিবিরে। কিন্তু তখন তাঁদের দম ফুরিয়ে গেছে।

৩১শে জুলাই তেনজিং, আঙ দাওয়া, আঙ নরবু, আজীবা ও পে নরবুকে নিয়ে সদস্যরা

---

* Himalayan Journal, 1949.

দু'নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই তুষারাবৃত ঢালটা সেদিন কিন্তু তাঁরা নির্বিঘ্নেই পেরোতে পারলেন। কারণ তখনও বরফ-গলা শুরু হয় নি। কিন্তু তারপরই আবহাওয়া খারাপ হল। সকাল সাড়ে দশটার সময় তাঁরা যখন তাঁবু খাটাচ্ছিলেন, তখন তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়লেন সবাই।

বিকেল চারটে নাগাদ আকাশ পরিষ্কার হল। ডিটার্ট ও তেনজিংকে নিয়ে রশ শিখরের পথ তৈরি করতে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা সোপান কেটে অগ্রসর হলেন। চল্লিশ মিনিট ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর সেই ভয়ঙ্কর তুষারাবৃত ঢাল অতিক্রম করে একটা সংকীর্ণ ও সুদীর্ঘ গিরিশিরার সামনে পৌঁছলেন। সৌভাগ্যবশত আগের মে-জুন মাসের গরমে বরফ গলে সেখানে চলার মত একটা পাথরের ধাপ (ledge) সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তাঁরা গিরিশিরাটির উপরিভাগকে এড়িয়ে, বাঁ দিক দিয়ে ঘুরে, তার ঠিক নিচে পৌঁছতে পেরেছিলেন। এই পাথরের ধাপটি জায়গায় জায়গায় ঝুলন্ত আর এক এক দিকে চার হাজার ফুট খাদ—একেবারে নিচের সুরালয় হিমবাহ পর্যন্ত।

তারপর তাঁরা একটা অত্যন্ত খাড়া তুষারাবৃত ঝুলন্ত ঢালের সামনে পৌঁছলেন। এরও একদিকে গভীর খাদ। অন্য কোনো পথ না থাকায় রশ সেই ঢালের ভিজে বরফের ওপরেই সোপান কাটতে শুরু করলেন। এটা খুবই শ্রমসাধ্য ও সূক্ষ্ম কাজ। তবু রশ আধঘণ্টার মধ্যে সেই ঢালটা অতিক্রম করতে পারলেন। আর সেখানে সেই হারিয়ে যাওয়া পাথরের ধাপটিকে আবার খুঁজে পেলেন। কিন্তু তখন ছ'টা বেজে গিয়েছে। কাজেই তাঁরা আর না এগিয়ে ফিরে এলেন শিবিরে। ফিরে এলেন পরবর্তী প্রভাতের প্রতীক্ষায়।

পরদিন—১লা আগস্ট, ১৯৪৭। ভোর চারটের সময় অভিযাত্রীরা যাত্রা করলেন—প্রথম দড়িতে সাটার ও গ্র্যাভেন আর দ্বিতীয় দড়িতে ডিটার্ট এবং রশ। তখনও আঁধার ছিল, কিন্তু প্রথম ঢালটি অতিক্রম করার সময়েই সূর্যোদয় হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা আগের দিনের জায়গায় পৌঁছলেন। একটু বাদেই কিন্তু সেই খুঁজে পাওয়া পাথরের ধাপটা শেষ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তাঁদের তখন সোজাসুজি শিখরের দিকে এগিয়ে চলতে হল। সোপান কেটে কেটে গ্র্যাভেন গিরিশিরার অপর দিকে এগিয়ে গেলেন। উপস্থিত হলেন একটা ঢালের ওপর। যেখানে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরে যায়। রশ-য়ের ভাষায়— 'Giddy slope which ended in a contour that dropped 4,000 ft. to the long glacier.'

সেই ঢাল অতিক্রম করার জন্য যখন রশ এবং ডিটার্ট গ্র্যাভেনের প্রশংসা করছিলেন, তখন তাঁদের দুজনকে বিস্মিত করে সাটারও গ্র্যাভেনের কাছে চলে গেলেন। অবশেষে রশ এবং ডিটার্টও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তারপর তাঁরা সেই সংকীর্ণ শিখর-শিরার (arete) বাঁ দিকের ঝুলন্ত তুষার-কার্নিশের নিচ দিয়ে শিখরকে ঘুরে এলেন। আবার ডানদিকে এগোলেন। সোজা উঠে এলেন একটা স্তম্ভের ওপরে। এজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সোপান কেটেছেন গ্র্যাভেন।

ওঁরা সৌভাগ্যবান। পশ্চিম ঢালের ওপরে ঝরা আগের রাতের তুষারধারা ততক্ষণে জমে গিয়েছিল। সেখানে পাহাড়টা ঢালু হয়ে একটা ঢিবির সৃষ্টি করেছে। তাঁরা সেখানে বসে একটু বিশ্রাম করে নিলেন।" বীরেন একটু থামে। আমরা তার দিকে তাকাই।

বীরেন আবার বলে, "এই জায়গাটার বর্ণনাপ্রসঙ্গে রশ বলছেন— 'We climbed straight up to a dome... where we sat the mountain sloped up over a rounded hump...'

এখানে দুটি টু-মেন টেন্ট টাঙাবার মত জায়গা থাকতে পারে। থাকলে অমূল্য ওখানে একটি শিবির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। সে চেষ্টা সফল হলে ওদের আর একদিনে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট আরোহণ করতে হবে না। ঐ জায়গাটার আনুমানিক উচ্চতা বাইশ হাজার ফুট। তার মানে, ওরা দু'নম্বর শিবির থেকে প্রথম দিন সাড়ে তিন হাজার ফুট আরোহণ করবে। আর পরদিন দেড় হাজার ফুট আরোহণ করে নেমে আসবে সেই প্রস্তাবিত তিন নম্বর শিবিরে।"

বীরেন একটু থামে। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই সে আবার বলতে শুরু করে, "যাক্‌গে সেকথা, যেকথা বলছিলাম—সেই ঢিবির ওপর থেকেই শিখর-শিরা উঠে গেছে। শিরাটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী খাড়া। কোথাও বা আরো বেশি। মাঝে মাঝে আবার পাথর হাঁ করে আছে। কিন্তু বরফ শক্ত হওয়ায় সুইস অভিযাত্রীরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে সক্ষম হলেন।

ঘণ্টা অতিবাহিত হতে থাকল। তাঁরা আস্তে আস্তে শিখরের দিকে এগিয়ে চললেন।

বেলা এগারোটার সময় তাঁরা শেষ ঢালের পাদদেশে পৌঁছলেন। আবহাওয়া ছিল খুবই ভাল। কিন্তু উত্তর দিক থেকে প্রবল বেগে হিমশীতল বাতাস বইছিল। তবে তাঁদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল না। বাতাসের বেগ দেখে স্বভাবতই তাঁরা তুষার-ধসের আশঙ্কা করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ কান পেতে থেকেও কোনো খারাপ শব্দ শুনতে পেলেন না। তুষার-ধস নামবার মত জায়গাও দেখতে পেলেন না। তাঁরা নিশ্চিন্তে সেই ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলেন।

শিখরের পাঁচশ ফুট নিচে শেষ বড় পাথরটার পাশে পৌঁছে তাঁরা আর একবার থমকে দাঁড়ালেন। কারণ সেখান থেকে ঢালটা হঠাৎ আরও বেশি খাড়া হয়েছে। আর ওপর থেকে বরফের কার্নিশ ঝুলছে। সেখানে তুষার-ধসের সম্ভাবনা আগের চেয়ে বেশি। কি করবেন? ঠিক করে উঠতে পারেন না ওঁরা।

একটু বাদে রশ সহযাত্রীদের একখানি পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন, যাতে তাঁরা হাওয়ায় উড়ে না যান। তারপর তিনি সেই খাড়া ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। প্রায় সত্তর গজ আরোহণ করলেন। সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সেখানে বরফ খুঁড়ে একটা গর্ত খুঁড়লেন। বরফ পরীক্ষা করলেন। দেখলেন —কঠিন পুরনো বরফের ওপর দু' ফুট পুরু নতুন তুষারের আলগা আবরণ। উভয়ের মাঝে দানাবাঁধা তুষারের আস্তরণ। নিচের বরফ থেকে ওপরের তুষারকে পৃথক করে রেখেছে। তার মানে, ঠিক তুষার-ধসের উপযোগী অবস্থা— 'Perfect for avalanches.'

কিন্তু হল না তো! রশ ভাবলেন, এই যে তিনি এর ওপর দিয়ে এতটা পথ উঠে এলেন, তাতে তো তুষার-ধস নামল না—এমন কি ফাটল পর্যন্ত দেখা দিল না। অতএব দেখে যতই বিপজ্জনক মনে হোক, প্রকৃত অবস্থা ঠিক তত খারাপ নয়। মনে হচ্ছে এই তুষারাস্তরণ চারজন মানুষের ওজন সইতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা, শিখরের এত কাছে এসে আরোহণ না করে ফিরে যাওয়া পর্বতাভিযাত্রীর ধর্ম নয়।

রশ কোমর থেকে দড়ি খুলে আরও খানিকটা আরোহণ করলেন। দেখলেন তাঁর অনুমান সত্য—তুষার আস্তরণ তাঁর ওজন সইতে পারছে। তিনি শিখরারোহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত। সর্বকালের পর্বতারোহীরা এই সিদ্ধান্তের জন্য আঁদ্রে রশকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবে। একটানা আট ঘণ্টা ক্লান্তিকর পর্বতারোহণের পর, অজানা দুর্গম পর্বতগাত্রে তেইশ হাজার ফুট উচুঁতে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শান্ত ও স্থির-মস্তিষ্কে

এমন নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ সত্যিই বিস্ময়কর।" শ্রদ্ধায় বীরেনের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে। একবার থামে সে। আমরা নীরব।

বীরেন আবার বলতে শুরু করে, "বিশ মিনিটের চেষ্টায় রশ শিখর-শিরার কাছে পৌঁছতে পারলেন। আর পৌঁছেই তিনি এক অতুলনীয় দৃশ্যের সম্মুখীন হলেন। সেই স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করবার জন্য তিনি সহযাত্রীদের আহ্বান করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা নেতার সঙ্গে যোগ দিলেন।

শিখরটি গিরিশিরার পূর্বদিকে অর্থাৎ বাঁ পাশে অবস্থিত। গিরিশিরাটি আংশিক ঝুলন্ত এবং তার দক্ষিণাংশে ভিজে তুষার। তাই সেই সামান্য দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে অভিযাত্রীদের দেড়ঘণ্টা সময় লাগল। গ্র্যাভেন সিঁড়ি কেটে সবার আগে পথ চলছিলেন।

বেলা ঠিক দুটোর সময় সুইস পর্বতারোহীরা সতপন্থ শিখরে আরোহণ করলেন। সেই পরম মুহূর্তটিকে রশ বলেছেন— 'Le moment supreme pour l' expedition (The supreme moment of the expedition)' এ থেকেই মনে হয় সতপন্থ তাঁদের পর্বতাভিযানের দুর্গমতম পর্বতশৃঙ্গ।

সংকীর্ণ শিখর। কাজেই সেখানে তাঁদের অপেক্ষা করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু চারিদিকের শ্বাসরোধকারী দৃশ্য দেখে তাঁরা সেকথা ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন নিজেদের কথা, অতীত আর ভবিষ্যতের কথা। তাঁরা কেবল অপলক নয়নে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। চেয়ে রইলেন বৈকালী সূর্যের সোনালী রোদে উদ্ভাসিত গাড়োয়াল হিমালয়ের দিকে। হিমালয় তাঁদের অভিনন্দিত করছিল। অভিনন্দন জানাচ্ছিল কামেট থেকে নন্দাদেবী, দুনাগিরি, ত্রিশূল, চৌখাম্বা ও গঙ্গোত্রী অঞ্চলের অন্যান্য পর্বতশৃঙ্গ। এই আশাতীত আরোহণের বিহ্বলতা কেটে যাবার পরে সাটার ও গ্র্যাভেন কিছুক্ষণ ধরে চারিদিকের ছবি তুললেন।

শিখর-শিরার শেষপ্রান্তে নেমে আসতে তাঁদের মাত্র পনেরো মিনিট সময় লাগল। তারপর সেই সুদীর্ঘ গিরিশিরার শেষে পৌঁছতে লাগল আরও একঘণ্টা। ততক্ষণে সতপন্থের পশ্চিমাংশ সোনালী রোদে ভরে গিয়েছে। ফলে সেখানকার তুষার গলতে শুরু করেছে। স্বভাবতই সেখানে তুষার-ধসের সম্ভাবনা ছিল। তাই রশ দড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। তারপর কার্নিশের একখানি পাথরে খাঁজ কেটে দড়িটা বেঁধে রাখলেন। দড়ি বেয়ে সঙ্গীরা নেমে এলেন তাঁর কাছে।

গ্র্যাভেন সোপান কেটে গিরিশিরার পূর্বপ্রান্তে চলে গেলেন। সেখানে কিন্তু তখন ছায়া পড়েছে—তুষার জমতে শুরু করে দিয়েছে। বিপদ কেটে গেল।

অভিযাত্রীরা বরফের সীমা ছাড়িয়ে পাথরের রাজ্যে ফিরে এলেন। মৃত্যুর জগৎ থেকে জীবনের জগতে। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলেন। শিবিরে তখন হাসি আর গানের হুল্লোড় শুরু হয়ে গেছে।" বীরেন চুপ করে।

নীরব কিছুক্ষণ। তারপর মুগ্ধকণ্ঠে প্রদীপ্ত বলে ওঠে, 'সত্যই ধন্য সেই অভিযাত্রীরা। আর ধন্যবাদ দিই আপনাদের—এত দুর্গম জেনেও আপনারা সতপন্থকে নির্বাচিত করেছেন।"

টিকারাম ও রাম বাহাদুর তাঁবুতে ঢোকে। ওরা খাবার নিয়ে এসেছে। ঘড়ির দিকে তাকাই—আটটা বাজে। গহন-গিরি-কন্দরে গভীর রাত। সাধারণত এর আগেই আমরা শুয়ে পড়ি। আজ প্রদীপ্তরা আমাদের সঙ্গে খাবে বলে রান্না করতে টিকারামের একটু বেশি সময় লেগেছে।

উজাগর সিং-ও এসে যান। টিকারাম পরিবেশন করে, আমরা খেতে শুরু করি—রুটি, মাংস, আলুর তরকারী ও আচার। সাধারণত রাতে একটা পদ রান্না হয়। আজ ওদের সম্মানে টিকারাম দুটি পদ রেঁধেছে।

খেতে খেতে দিলীপ বলে, "সুইস অভিযাত্রীরা তাহলে নন্দনবন থেকে রওনা হয়ে চারদিনের মধ্যে সতপন্থ শিখরে আরোহণ করেছিলেন?"

"না, পাঁচদিন।" বীরেন জবাব দেয়, "ওঁরা ২৮শে জুলাই চতুরঙ্গী হিমবাহের ওপরে ১৬,০০০ ফুটে শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। ২৯শে জুলাই ১৮,০০০ ফুটে, সতপন্থ থেকে নেমে আসা অনামী হিমবাহের গ্রাবরেখায় এক নম্বর শিবির স্থাপিত হয়। ৩০শে জুলাই ১৯,০০০ ফুটে দু' নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করেন। ৩১শে জুলাই দু' নম্বর শিবির স্থাপনের পর শিখরের পথ তৈরি করা হয়। ১লা আগস্ট শিখরে আরোহণ করেন।"

"আচ্ছা, এই আরোহণ করতে কতটা সময় লেগেছিল?" আশীষ প্রশ্ন করে।

বীরেন মনে মনে একটু হিসেব করে নিয়ে বলতে থাকে, "এক নম্বর থেকে দু' নম্বরে যেতে সাড়ে চার ঘণ্টা লেগেছে। তাঁরা সকাল ছ'টায় রওনা হয়ে সাড়ে দশটায় পৌচেছেন। উচ্চতার পার্থক্য মোটে হাজার ফুট—আঠারো থেকে উনিশ হাজার ফুট।

দু' নম্বর থেকে শিখর, মানে ১৯,০০০ ফুট থেকে ২৩,২১৩ অর্থাৎ ৪,২১৩ ফুট আরোহণ করতে তাঁদের সময় লেগেছে দশ ঘণ্টা। ওঁরা ভোর চারটায় রওনা হয়ে বেলা দুটোয় শিখরে পৌছান। আর এই পথটুকু নেমে আসতে সময় লেগেছিল চার ঘণ্টা। বিকেল আড়াইটায় নামতে শুরু করে সাড়ে ছ'টার সময় তাঁরা দু' নম্বরে ফিরে এসেছিলেন। তার মানে, সেদিন তাঁদের সাড়ে চোদ্দ ঘণ্টা ক্লাইম্বিং, অর্থাৎ পর্বতারোহণ করতে হয়েছিল।"

পরিবেশন শেষ করে টিকারাম হরলিক্স বানাতে চলে যায়। রাতের খাবারের পরে একটু গরম পানীয় না হলে শীতের জন্য ঘুম আসে না। খাবার পরে তাঁবুর বাইরে থেকে ঘুরে এসে আমরা আবার স্লীপিং-ব্যাগের ভেতরে বসব। টিকারাম হরলিক্সের মগ হাতে তুলে দেবে। গরম পানীয়ে ঠোঁট ঠেকিয়ে আমরা স্বর্গসুধা আস্বাদন করব।

এক সময় মগটা খালি হয়ে যাবে, খারাপ লাগবে। আর একটু পেলে যেন ভাল হত, কিন্তু সেকথা বলতে পারব না। কাজেই মগটা টিকারামের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে স্লীপিং-ব্যাগের ভেতরে ঢুকে যাব। জিপটা টেনে শুয়ে পড়ব হুডটা তুলে দেব মাথার ওপর।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ব না। কারণ রাত তখনও অনেক বাকি। তার ওপর কাল ছ'টার আগে ঘুম থেকে ওঠার কোনো দরকার নেই। কাল ওপরে কোনো মাল যাবে না। কেবল দুজন কুলি খালিহাতে এক নম্বরে যাবে খবর আনতে।

কাল অন্য কুলিদের বিশ্রাম। হরশিল ছাড়ার পরে ওরা একদিনও বিশ্রাম পায় নি। অসাধ্য সাধন করেছে। ওদের সহযোগিতা না হলে আমরা এত তাড়াতাড়ি সতপন্থের পাদদেশে পৌঁছতে পারতাম না। শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হোক্ বা না হোক্, ওদের কাছ থেকে যে আশাতীত সাহায্য পেয়েছি, সেকথা চিরকাল মনে থাকবে। তাই কাল কুলিদের বিশ্রাম। যে দুজন খবর আনতে ওপরে যাবে, তাদের একদিনের মাইনে বেশি দেওয়া হবে।

উচ্চ হিমালয়ে প্রায় প্রত্যেকেরই ঘুম কমে যায়। এটা এক ধরনের হাই অলটিচ্যুড সিক্‌নেস। যাঁরা উচ্চ হিমালয়ে এসেও ভাল ঘুমোতে পারেন, তাঁরাই ভাল পর্বতারোহী। আমি তাঁদের দলে নই। কাজেই আমার পক্ষে একটানা দশ ঘণ্টা ঘুমনো সম্ভব নয়। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে খুব খারাপ লাগে। কিছুতেই বাকি রাতটুকু ফুরোতে চায় না। অথচ

আর ঘুমও আসে না। বড্ড শীত করে। সহযাত্রীরা হয়তো সবাই ঘুমোচ্ছে। একা একা জেগে থাকতে ভীষণ কষ্ট হয়।

তাই গরম পানীয় ফুরিয়ে যাবার পর শুরু হয় গল্প আর গান। বরেণ্যর গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত আর ডাক্তারবাবু ও প্রফেসরের গল্প—ছাত্রজীবনের গল্প, মাস্টারী জীবনের গল্প, ইংল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের গল্প আর হিমালয়ের গল্প।

গল্প আর গানে কেটে যায় সময়—রাত গভীর হয়। এক সময় গান থেমে যায়, গল্প শেষ হয়, ঘুম জড়িয়ে আসে দু'চোখের পাতায়। আমরা ঘুমের কোলে ঢলে পড়ি। তারপর ?

তারপর আমরা ঘুমের দেশ থেকে চলে যাই স্বপ্নের দেশে। আমরা স্বপ্ন দেখি—স্বপ্ন সফল হবার স্বপ্ন। আমরা সতপন্থ শিখরে আরোহণ করেছি। আমাদের স্বপ্ন সফল হয়েছে—ভারতের জাগ্রত যৌবনের স্বপ্ন।

॥ আট ॥

"গুড মর্ণিং !" প্রদীপ্ত ও দিলীপ আমাদের তাঁবুতে আসে।

আমরা বিছানার ওপর উঠে বসি। ওদের বসতে বলি।

প্রদীপ্ত বলে, "কাল থেকে তো আপনাদের অন্ন ধ্বংস করছি, আজ আমাদের একটু আতিথেয়তা করার সুযোগ দিন !"

"আজ আপনারা রওনা হচ্ছেন, কেন আবার এসব হাঙ্গামা করছেন ! কালিন্দীখাল দর্শন করে ফিরে আসুন, তখন দেখা যাবে !" প্রফেসর প্রদীপ্তর প্রস্তাব নাকচ করে দিতে চায়।

পারে না। প্রদীপ্ত হাতজোড় করে বিনীতকণ্ঠে বলে, "না, না, ওকথা বলবেন না ভাই। আমাদের সাধ্য সামান্য, যাবার আগে একসঙ্গে একটু চা খাব। আপনারা মুখ ধুয়ে আমাদের তাঁবুর সামনে চলুন। চা হয়ে গেছে, ওরা বসে আছে।"

এরপর আর আপত্তি করা চলে না। আমরা মুখ ধুয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গে চলি। আমাদের রান্নাঘর পেরিয়ে খানিকটা উঁচু জমি। সেখানেই তাঁবু ফেলেছে ওরা। একটি ছাড়া ওদের সবই টু-মেন-টেন্ট। কেবল কুলিদের জন্য একটি বড় তাঁবু। উত্তরকাশীতে ডায়াস মেমোরিয়াল ফাণ্ড এ বছর থেকেই খোলা হয়েছে। ওদের তাঁবু ও সাজ-সরঞ্জাম সবই নতুন। দেখে হিংসে হচ্ছে।

আমাদের দেখে উজাগর সিং বেরিয়ে আসেন তাঁবু থেকে। ডাক্তারবাবু, বীরেন ও আমি এগিয়ে আসি তাঁর কাছে। ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ দেন উজাগর, "বহৎ মেহেরবাণী ডাক্তারসাব, বুখার ছুট্ গ্যয়া। অভি অচ্ছা হ্যায় !"

ডাক্তারবাবু বলেন, "কিন্তু ওষুধ বন্ধ করে দেবেন না যেন।"

উজাগর মাথা নাড়েন। ডাক্তারবাবুর মাথা ছাড়িয়ে এক ফুট উঁচুতে তাঁর মাথা। দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান ও ফরসা—সুপুরুষ উজাগর সিং। পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক।

মাস্টারমশাই কিন্তু মোটেই সন্তুষ্ট নন তাঁর ছাত্রদের ওপর। ছাত্রই তো ! অন্তত ওঁরা আমাদের তাই মনে করেন। নইলে অভিযাত্রী ও পদযাত্রী দলের সঙ্গে ইনস্ট্রাক্টার দেবার দরকার কি ?

না, তিনি গাইড নন। কারণ শ্রীউজাগর ইতিপূর্বে কোনোদিন কালিন্দীখাল পর্যন্ত যান নি এবং তাঁর ধারণা কালিন্দীখাল একটি পর্বতশৃঙ্গ।

বীরেন তাঁর এই ধারণার পরিবর্তন করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়।

উজাগর ক্ষেপে যান। পর্বতারোহণ তাঁর পেশা। তিনি ভেবেছিলেন, 'পিক্ ক্লাইম্ব' করবেন, তাঁর প্রমোশন হবে। শেষে কিনা একটা খাল দেখতে চলেছেন! কালিন্দীখাল—কালিন্দী পিক্ নয়! "কেয়া ফয়দা?" উজাগর প্রশ্ন করেন।

কালিন্দীখাল দর্শন করলে কি 'ফয়দা' হবে, তা ওঁকে বোঝানো সম্ভব নয়। ওঁরা কেবল জানেন 'পিক্ ক্লাইম্ব'। তবে ওঁকেও অনায়াসে পাল্টা-প্রশ্ন করা যেতে পারে, পিক্ ক্লাইম্ব করকে কেয়া ফয়দা? পাহাড়ের মাথায় উঠলে তো অন্ন-সমস্যার সমাধান হয় না! তুষার-মৌলি হিমালয়ে কি ধানচাষ করা যায়?

কিন্তু তাঁকে সে প্রশ্ন করা বৃথা। তাই আমরা নীরব থাকি। আর আমাদের নীরবতাকে তাঁর প্রতি নীরব সমর্থন ভেবে নিয়ে উজাগর প্রদীপ্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করেন—ওরা বেশি মাল বইতে পারে না, শীত সহ্য করতে পারে না, জোরে জোরে হাঁটতে পারে না।

না, না, আর না। উজাগররা আমাদের সবার সম্পর্কেই এই সব অভিযোগ করে থাকেন। প্রথমত, ওঁদের সব অভিযোগ সত্য নয়। দ্বিতীয়ত, মাস্টারমশাইদের খেয়াল থাকে না যে, পর্বতারোহণ আমাদের পেশা নয়, 'পিক্ ক্লাইম্ব' করলে আমাদের প্রমোশন হয় না। অভিযোগ করার সময় ওঁরা একবারও ভেবে দেখেন না যে, ব্যবহারিক জীবনে আমাদের মাল বইবার প্রয়োজন পড়ে না, শীত সইতে হয় না এবং জোরে জোরে না হাঁটলেও কিছু এসে যায় না। তা সত্ত্বেও আমরা হিমালয়ে আসি, তার দুর্গম পথে পদচারণা করি এবং শিখরে আরোহণ করি।

আমাদের অভিযানের সাফল্য কামনা করে কালিন্দীখাল-যাত্রীরা বিদায় নিল। আমরা ফিরে এলাম তাঁবুতে।

আজ প্রফেসর আর বেরুবে না। সংগৃহীত পাথর, বরফ ও জল নিয়ে শিবিরে বসেই পরীক্ষা চালাবে। তাই বীরেন আজ ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করছে। সে তাঁবুর ভেতর থেকে ইঁদুরের খাঁচাটা বের করে নিয়ে আসে। ইঁদুরগুলি দেখেই আঁতকে ওঠেন ডাক্তারবাবু, "এই রে! ওদের প্রোটিনের অভাব হয়েছে, শীগ্‌গীর প্রোটিনিউলস খাইয়ে দাও!"

"কেমন করে, শুধু শুধু?" বীরেন প্রশ্ন করে।

"না, না।" ডাক্তারবাবু বলেন, "আটার সঙ্গে মিশিয়ে চিনি আর জল দিয়ে মেখে দাও।"

বীরেন ইঁদুরের পরিচর্যায় লেগে যায়।

বরেণ্য কিন্তু আজ আর ডাক্তারবাবুর কাছে ঘেঁষছে না। সে আজ প্রফেসরের পাশে ঘুর ঘুর করছে। কারণ খবুই স্পষ্ট—ডাক্তারবাবুর পরীক্ষা পুরনো হয়ে গেছে আর প্রফেসর আজ মাইক্রোস্‌কোপ নিয়ে বসেছে। মাইক্রোস্‌কোপে বরফ আর পাথরের আজ মাইক্রোস কোপ নিয়ে বসেছে। মাইক্রোস্‌কোপে বরফ আর পাথরের টুকরোগুলো ভারী সুন্দর দেখায়।

তাতে অবশ্য ডাক্তারবাবুর কিছু ক্ষতি হয় নি। বরেণ্য নেই, বীরেন আছে। আর আমি তো রয়েছিই। তিনি বীরেনকে সহকারী করে তাঁর পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। পরীক্ষা করতেই এসেছেন। যত বিরক্তিকর ও কষ্টসাপেক্ষ হোক, বৃহত্তর প্রয়োজনে এ পরীক্ষা অপরিহার্য। হিমালয়কে জানতে হবে। অজ্ঞানতার সকল অন্ধকার দূর করে দিতে হবে। আমরা কেবল অভিযাত্রী নই, আমরা জ্ঞানের পূজারী।

. আমার পালা আসতে দেরি আছে। এখন ইঁদুরদের পালা চলছে। কাজেই আমি ডাক্তারবাবুর কাছে না থেকে প্রফেসরের পাশে এসে বসি। একটু বাদে তাকে জিজ্ঞেস করি, "উল্লেখযোগ্য কিছু পেলে ?"

মাইক্রোস্‌কোপ থেকে মুখ তুলে প্রফেসর জবাব দেয়, "নিশ্চয়ই। আর তা আজ থেকে নয়, যেদিন উত্তরকাশী থেকে রওনা হয়েছি সেদিন থেকেই।"

"যেমন ?"

"উত্তরকাশীর দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরে বহু জায়গায় নদীখাত সোপানাকৃতি। অনেক জায়গাতেই এই সোপানের তিনটি ধাপ পাওয়া যায়। এদের উচ্চতমটি বর্তমান উপত্যকার চেয়ে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশ' ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত।"

"তা এ থেকে কি প্রমাণিত হয় ?" বরেণ্য জিজ্ঞেস করে।

"এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, নদীগর্ভ বিভিন্ন সময়ে সমুত্থিত হয়েছিল।"

"তারপর কি দেখলে ?" প্রশ্ন করি।

প্রফেসর উত্তর দেয়, "আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন যে, উত্তরকাশী থেকে সুখীর মধ্যে ভাগীরথী নদী ইংরেজী 'V' অক্ষরের মত গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিতা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নদী গিরিখাতটিকে সৃষ্টি করেছে।

এবারে ঝালার কথা ভাবুন। ঝালা ও জংলার মধ্যে, বিশেষ করে ধরালীর কাছে দেখেছেন নদীগর্ভ সহসা প্রকাণ্ড প্রশস্ত হয়ে গেছে। জে. বি. অডেন বলেছেন যে, সে জায়গাটার প্রাচীনকালে একটা হ্রদ ছিল। কোনো কারণে পাশের পাহাড় থেকে ধস নেমে নদীর গতিপথ রুদ্ধ হয় গিয়ে সেই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। কথাটা সত্যি হতেও বা পারে, আবার এও হতে পারে যে, ঐ জায়গাটায় একটা বিশাল হিমবাহ হ্রদ বা Glacial lake ছিল।..."

"গ্লেশিয়াল লেক ! ধরালীতে ! কি বলছ !" আমি মাঝখান থেকে বলে উঠি।

"হ্যাঁ।" প্রফেসর হাসে। বলে, "আমার ধারণা সেকালে সুখী পর্যন্ত গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রসারিত ছিল।"

"সুখী !"

"হ্যাঁ, বর্তমান গোমুখী থেকে চল্লিশ মাইল আগে অবস্থিত সুখীতেই সেকালে ছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহের নাসিকা বা স্নাউট তথা গোমুখী। হিমবাহের ভেতরে বরফ গলে এখন যেখানে হরশিল ও ধরালী, সেখানে সৃষ্ট হয়েছিল এক সুবিশাল হ্রদ। সে অবশ্য হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। তবে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে সুখী অঞ্চলের Geomorphology বা ভূ-প্রকৃতি নিয়ে আরও অনেক কাজ করা দরকার।"

"তার মানে, আপনি বলছেন গঙ্গোত্রী হিমবাহ সুখী থেকে গোমুখীতে সরে এসেছে ?" বরেণ্য প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" প্রফেসর উত্তর দেয়, "কিন্তু তখন হয়তো মানুষ জন্মায় নি এ জগতে।"

"যাক্‌গে, এবারে জংলার পরের কথা বলুন !"

প্রফেসর বলে চলে, "জংলা থেকে গোমুখী পর্যন্ত নদী, মানে ভাগীরথীর বর্তমান উপত্যকা একটি হিমবাহ দিয়েই তৈরি হয়েছিল। পরে অবশ্য নদী এর অনেক পরিবর্তন করেছে। ভৈরবঘাটি ও গঙ্গোত্রীর মাঝে ভাগীরথী একটা মসৃণ গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিতা। কেউ কেউ অবশ্যি বলেন—" প্রফেসর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, তারপর আবার শুরু করে, "পূর্ত-বিশারদ ভগীরথের ষাট হাজার শ্রমিক হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে কঠিন পাহাড়কে

কেটে কেটে সেই গিরিখাত তৈরি করেছেন। কিন্তু আমি বলি, Glaciation বা হিমক্রিয়ার জন্যই অমন মসৃণ ও গভীর গিরিখাতের সৃষ্টি হয়েছে।"

হেসে বলি, "আমি তোমার এই মতটা মেনে নিতে পারলাম না। কিন্তু সেকথা থাক। তুমি তার পরের কথা বলো।"

"১৯৩৭ সালের সমীক্ষার সময় অডেন গোমুখীতে জরিপের জন্যে যে কয়েকটি পাথরের ঢিবি বা Survey Cairns তৈরি করেছিলেন আমি সেগুলিকে খুঁজে বের করেছি। অডেনের সমীক্ষার সঙ্গে আমার সমীক্ষার তুলনামূলক বিচার করে আমি দেখেছি, বিগত একত্রিশ বছরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রায় দু' ফার্লং পেছিয়ে গেছে। আর তাই গোমুখীতে ঐ সমতল প্রান্তরটির সৃষ্টি হয়েছে। গোমুখীতে আমরা যেখানে শিবির ফেলেছিলাম, একদিন ঐ প্রান্তরের ওপর দিয়েই গঙ্গোত্রী হিমবাহ বিস্তৃত ছিল এবং সেটা খুব বেশিদিন আগের কথা নয়।"

"এবারে আপনি যে সব পাথর সংগ্রহ করেছেন, তাদের কথা বলুন !" বরেণ্য অনুরোধ করে।

"আমি ঝালা থেকে বাসুকি হিমবাহ পর্যন্ত পথের একটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করেছি। ঝালা থেকে প্রায় ভৈরবঘাটি পর্যন্ত পথের ধারে রূপান্তরিত পাললিক শিলা বা Pelitic Schists—এই সব পাথরে ক্যালসিয়াম সিলিকেট মণিকের পাতলা স্তর দেখতে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে গার্নেট কায়ানাইট আছে।

ভৈরবঘাটি থেকে পাথরগুলির মধ্যে বড় বড় ফেল্ডস্পারের দানা আসতে শুরু করেছে। উচ্চতা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফেল্ডস্পারের ভাগও ক্রমশঃ বেড়ে গেছে এবং অবশেষে রূপান্তরিত শিলার পরিবর্তে গ্রানাইট শিলা শুরু হয়েছে। ভূতত্ত্বের ভাষায় একে Granitization বলে।

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখীর পাথর বিভিন্ন ধরনের গ্রানাইট, তারা বিভিন্ন যুগের।

গোমুখীর ওপরে শিবলিঙ্গ শৃঙ্গের ঢালে, রক্তবরণ ও চতুরঙ্গী হিমবাহের দুই তীরে অধিকাংশই Phyllites এবং Schists বা রূপান্তরিত শিলা।

শিবলিঙ্গ ও ভাগীরথী শৃঙ্গের ওপর দিকের পাথর Towmaline-যুক্ত গ্রানাইট শিলা। এরা পরে Schists ও Phyllites-দের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে।"

"এবার আর একটা খবর দিচ্ছি।" প্রফেসার বলে, "এই যে উপত্যকাটি, যার একপ্রান্তে আমাদের এই শিবির আর একপ্রান্তে নন্দনবন, এটি এককালে হিমবাহ ছিল—ভাগীরথী হিমবাহ। চতুরঙ্গী হিমবাহের সমান্তরাল ছিল এটি। ভাগীরথী শৃঙ্গের গা বেয়ে নেমে আসা তুষারপ্রবাহ এইখান দিয়ে গিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে পড়ত। যে গিরিশিরাটির ওপর দিয়ে আমরা মূল-শিবির থেকে এখানে এসেছি, সেটি সেকালে সেই হিমবাহ আর চতুরঙ্গী হিমবাহের সীমারেখা অর্থাৎ পার্শ্ব-গ্রাবরেখা ছিল। পরে কোনো কারণে ভাগীরথীর তুষারপ্রবাহ গলে গলে পেছনে সরে গেছে। আর সেই মৃত হিমবাহে জন্ম হয়েছে তৃণাচ্ছাদিত এক রমণীয় উপত্যকা—নন্দনবন।" প্রফেসর থামে।

আর ঠিক তখুনি বীরেন বলে ওঠে, "ভীম বাহাদুর এসে গেছে।"

আমরা নন্দনবনের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, ভীম বাহাদুর। এসে গেছে আমাদের ডাক-রানার, স্বর্গ ও মর্তের সেতু। দুর্গম পথ পেরিয়ে সে দেবলোকের খবর নিয়ে যায় নরলোকে, আমাদের কুশল সংবাদ নিয়ে যায় প্রিয়জনের কাছে, তাদের সংবাদ এনে আমাদের দেয়। দেবলোকে বসেও আমরা নরলোকের মায়া ত্যাগ করতে পারি নি। কি করব, এ মায়া যে কঠিন মায়া !

নরলোকের পথ তো কেবল দুর্গম নয়, বিপজ্জনকও। গোমুখীর পরে, বিশেষ করে চীরবাসায় ভালুক আছে। তাই একা পথ চলা ঠিক নয়। ভীম বাহাদুর কিন্তু একাই পথ চলে। সঙ্গী পাবে কোথায় ? যদিও বা কোনোদিন দু'য়েকজন সাধু কিংবা তীর্থযাত্রী পেয়ে যায়, তাঁদের সঙ্গে পথ চলা পোষায় না ওর। আস্তে হাঁটা ধাতে সয় না ভীম বাহাদুরের।

ডাক-রানার হলেও কেবল ডাক আনে না ভীম বাহাদুর। যেমন আজ এনেছে মসুর ডাল, নুন, সরষের তেল ও বিড়ি ইত্যাদি।

ডাল ও নুন কম পড়ে গেছে। আমরা রান্নার জন্য ডাব্‌ল রিফাইন্‌ড বাদাম তেল নিয়ে এসেছি। মাখন এবং ঘি-ও রয়েছে। তবু সরষের তেল আনতে বলেছিলাম। রান্না নয়, স্নানের জন্য। এখানে নয়, যাবার পথে মহালয়ার দিনে গোমুখীতে স্নান করব সবাই।

বিড়ি আনার কোনো দরকার ছিল না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা প্রচুর সিগারেট উপহার পেয়েছি। এখনও তার অর্ধেকটা রয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দশ টাকার বিড়ি আনতে হল—কুলিদের আদেশ। সিগারেট খেলে তাদের 'খাঁসি' হয়, আর ধূমপান না করলে তারা চড়াই ভাঙ্গতে পারে না। ওরা অচল হলে আমরা অচল। তাই ওদের চালু রাখার জন্য বিড়ি নিয়ে এসেছে ভীম বাহাদুর।

আরও অনেক জিনিস নিয়ে এসেছে ভীম বাহাদুর। শুকনো কপি, পেট্রোম্যাক্সের মেন্টেল ও স্টোভ-পিন। সারদানন্দ জানেন না যে, আমরা স্টোভ-পিন খুঁজে পেয়েছি। আশ্চর্য এই স্নেহশীল মানুষটি। আমাদের জন্য তাঁর এতো চিন্তা আর এমন অসীম স্নেহ ! মনে মনে সেই সন্ন্যাসীর উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

আগামী শীতকালে সারদানন্দ গোমুখীতে বাস করবেন—স্পিরিচ্যুয়াল রিসার্চ করবেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা 'Scientific Universe'-য়ের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ উজ্জ্বলকুমার দত্ত। এবারে আমাদের গোমুখী শিবিরে তিনি একটি রাত কাটিয়ে গেছেন। ডঃ দত্তর স্থায়ী নিবাস কলকাতা। শুনেছি, নন্দনকাননের পথে ভুইন্দার উপত্যকায় তাঁর আশ্রম আছে।

জানি না, অভিযান শেষে আমাদের রসদ এবং ওষুধপত্র কিছু উদ্বৃত্ত হবে কিনা ! যদি হয়, সেগুলি সারদানন্দের জন্য আমরা গোমুখীতে রেখে যাব। তবে লুকিয়ে রেখে যেতে হবে। আজকাল আবার গোমুখীতেও চুরি হচ্ছে। কারণ পায়ে-চলা পথ হয়েছে। সাধু ও পুণ্যার্থীরা নিয়মিত আসছেন সেখানে।

কেবল একটি জিনিস আনে নি ভীম বাহাদুর—ডাক-টিকেট। উত্তরকাশী থেকে আমরা প্রয়োজনীয় ডাক-টিকেট আনতে পারি নি। সেদিন সেখানে আর ডাক-টিকেট ছিল না। উত্তরকাশীর পোস্টমাস্টার বলেছিলেন, গঙ্গোত্রীতে পেয়ে যাব। পাই নি, আর না পাওয়াই স্বাভাবিক। গঙ্গোত্রী ডাকঘর অত্যন্ত অবহেলিত। তবু শুনেছিলাম ডাক-টিকেট আসার কথা আছে। কিন্তু এখনও আসে নি। খুবই মুস্কিলে পড়া গেল।

না, কিসের মুস্কিল ! সদস্যদের নিজেদের কিছু ডাক-টিকেট এখনও আছে। তাই দিয়েই অভিযানের কাজ চালাতে হবে। আগে অভিযান, তারপর সদস্যদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ভীম বাহাদুর কাল সকালে নিচে যাবে। পরশু গঙ্গোত্রীতে ডাক আসবে। সপ্তাহে তিনদিন ডাক আসে গঙ্গোত্রীতে। চিঠিপত্র প্রস্তুত, কিন্তু সংবাদের কি হবে !

আজ যে-সব চিঠি ভীম বাহাদুর নিয়ে এসেছে, তার প্রত্যেকখানিতে আমাদের সংবাদ চাওয়া হয়েছে। সংবাদ জানতে চেয়েছে অমিতাভ, দাশরথি, রণেশদা ও শ্রীমতী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়। জানতে চেয়েছেন প্রবোধদা, সধীর কুমার ও মহামান্য মেট্রোপলিটান এবং

আরও অনেকে। আমাদের জন্য তাঁদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কিন্তু আমি কেমন করে তাঁদের চিন্তামুক্ত করব ? কি খবর দেব ? ওপর থেকে যে কোনো খবর নেই !

খেয়ে নিয়ে ভীম বাহাদুরকে বিশ্রাম করতে বলি। আমরাও খেয়ে নিই। কিছুই ভাল লাগছে না। সকালে খালিহাতে লোক দুটি ওপরে গেল, এখনও ফিরে আসছে না কেন ?

"কেমন করে আসবে ?" বরেণ্য প্রশ্ন করে।

কোনো উত্তর দিই না। চুপ করে থাকি।

বরেণ্য আবার বলে, "দু' নম্বর থেকে এক নম্বরে খবর আসবে, তারপর ওরা এখানে রওনা হবে তো !"

"কিন্তু কাল এখানকার কুলিরা চলে আসার পরেও তো এক নম্বরে খবর আসতে পারে !"

"তা পারে।"

"আমি সেই খবরই জানতে চাইছি।"

"কিন্তু কাল যদি "দু' নম্বর থেকে খবর না পাঠাতে পেরে থাকে ?" বীরেন বলে।

"তাহলে আজ সকালে নিশ্চয়ই পাঠাবে। আর সে খবর এতক্ষণে এসে যাওয়া উচিত ছিল।"

কথাটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই ওরা চুপ করে থাকে।

একটু বাদে ডাক্তারবাবু বলেন, "অসিতবাবু আর হিমাদ্রিই বা এক নম্বর থেকে একটা খবর দিচ্ছে না কেন ?"

হেসে বলি, "দু' নম্বর থেকে খবর না পেলে ওরা কি খবর দেবে !"

"কিন্তু তাঁরাই বা দু' নম্বর থেকে খবর পাঠাচ্ছেন না কেন ?" প্রফেসর প্রশ্ন করে।

আবার হাসি পায় আমার। বলি, "তা জানলে তো আর খবরের জন্য এমন ছটফট করতাম না ! কেন খবর পাঠাচ্ছে না সেইটেই তো খবর !"

কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই কুলিদের তাঁবু থেকে চীৎকার ভেসে আসে, "আদমী... আ গ্যয়া. পাত্তা আ গ্যয়া...সাব্ !"

ওপরের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছে ওরা। পাহাড়ী চোখ, ভুল হবার জো নেই। দুজন মানুষ নেমে আসছে ওপর থেকে। আমরা উঠে দাঁড়াই, এগিয়ে আসি।

ওরা আসে। সকালে যে দুজন কুলিকে খবর আনতে ওপরে পাঠিয়েছিলাম, তারা ফিরে এসেছে। খবর নিয়ে এসেছে। চিঠি এনেছে—অসিতের চিঠি—

'শঙ্কু, বীরেন, ডাক্তারবাবু, প্রফেসর ও বরেণ্য,

আমরাও তোমাদেরই মত অন্ধকারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছি। কাল থেকে ওপরের কোন নির্দেশ নেই, আমরা কর্মহীন।

গতকাল নিচের কুলিরা চলে যাবার পরে নেতার একখানি চিঠি এসেছে। কিন্তু দুদিন আগের সে চিঠি আমাদের মনের অন্ধকার ঘোচাতে পারে নি। জানি না তোমাদের মনের আঁধার ঘোচাতে পারবে কিনা ? তবু সেই চিঠিখানি এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। দুশ্চিন্তায় আমরা কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি।

আমাদের শিবিরে আটা চিনি দুধ মোমবাতি ও দেশলাই নেই। পাঠিয়ে দিও। সব স্টোভ ওপরে চলে গেছে, কাঠ অবশ্যই পাঠাবে। আজ রাতে আলো ছাড়া থাকতে হবে। কাঠ না এলে কাল অরন্ধন।

বরণ্যে ডালমুট পাঠায় নি কেন ? ওগুলো কি কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ? ডাক্তারবাবু

কতদিন আপনার গল্প শুনি না ! বীরেন, তোকে খিস্তি করতে পারছি না ! কতদিন প্রফেসরকে দেখি না ! আর শঙ্কু, কাল বাড়ির চিঠি না পাঠালে তোমাকে খুন করব। তুমিই যত নষ্টের গোড়া।

অসিত'

এক নম্বর শিবির
১৭.৯.৬৮.
অমূল্যর চিঠি।
'অসিতদা ও হিমাদ্রি !

আমাদের চারপাশের অগণিত পর্বতশৃঙ্গগুলির দিকে তাকিয়ে তোমাদের কি মনে হচ্ছে জানি না। কিন্তু আমি ভাবছি—এই যে দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট, এই যে নিষ্ঠা ও ত্যাগ আর এই যে কঠিন পণ, কেন ? কেন বার বার এই হিমালয়ে আসা ? ফ্রাঙ্ক স্মাইথের মত আমিও জিজ্ঞেস করছি নিজেকে— "What was the force that had impelled me?" আর সেই একই উত্তর পাচ্ছি— "Glimmer of the high snows " গতানুগতিক জীবনে আমরা যে মুক্তির স্বাদ খুঁজে বেড়াই, তা আমরা পাই এখানে, প্রকৃতির এই ভীষণ ও মধুর লীলাভূমিতে—জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে।

আর তাই তো আমরা আজ এসেছি সতপন্থের পাদদেশে। আমরা তো জেনেই এসেছি, প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে, প্রবল লড়াই করতে হবে। তাই করছি আমরা।

আজ এখানে এসেই কয়েকজনকে পথ দেখতে পাঠিয়েছিলাম—সতপন্থ শিখরের পথ। সম্ভাব্য কোনো পথ চোখে পড়ে নি তাদের। তবে ওরা অনুমান করছে, হাজার দুয়েক ফুট ফিকসড রোপ করতে পারলে সুবিধে হত। কিন্তু আমরা তো মোট হাজার ফুট দড়ি এনেছি ! বিশ হাজার ফুটের ওপরে কোনো ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড চোখে পড়ছে না।

আমাদের এখানে আরও চারজন শক্তিশালী মালবাহক দরকার। জুতো, মোজা ও কম্বল দিয়ে কাল তাদের পাঠিয়ে দিও। তোমাদের ওখানে টিন-ফুড ও যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম আছে সব তাদের কাছে দিয়ে দেবে। তোমাদের কষ্ট হবে জানি, কিন্তু উপায় নেই !

A.B.C. থেকে আর কোনো সদস্য যেন ওপরে না আসে। তোমাদেরও এখানে আসার দরকার নেই। ওখানে যদি অপ্রয়োজনীয় মাল কিছু থেকে থাকে, তা নিচে পাঠিয়ে দাও। ১৮ই সকালে সব কুলি খালিহাতে দু' নম্বর শিবিরে চলে আসবে।

আমি চির-আশাবাদী। আশা করি, ভগবানের কৃপায় আমাদের স্বপ্ন সফল হবে এবং তোমাদের কাছে বিজয়-গৌরবে ফিরে আসব।

তোমরা সাবধানে থেকো, A.B.C.-র সদস্যদের সাবধানে থাকতে বলো। আমাদের জন্য চিন্তা করো না।

Here we are all in HIGH SPIRIT for HIGH ADVENTURE. The clarion-call of SATOPANTH is drawing us to HIGHER and HIGHER like a magnet.

With all love,

Camp-II (18,500') — Yours,
15.9.68. — Amulya Sen.'

॥ নয় ॥

কথাটা প্রথম বলে বীরেন, তারপর ডাক্তারবাবু।

স্বপ্ন দেখেছে। দুজনেই স্বপ্ন দেখেছে—আমাদের স্বপ্ন সফল হবার স্বপ্ন। সহযাত্রীরা সতপন্থ শিখরে আরোহণ করেছে।

সব শুনে প্রফেসর গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে, "তাহলে হয়ে গেছে।"

"কেমন করে বুঝলেন ?" বরেণ্য প্রশ্ন করে।

"জয়েন্ট-স্বপ্ন মিথ্যে হতে পারে না।" প্রফেসর উত্তর দেয়।

ব্যাপরাটা একটু বিচিত্র বৈকি ! দুজনে একরাতে একই স্বপ্ন দেখেছে !

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? এ যে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। দুজন কেন, আমরা পাঁচজনেও কাল রাতে ঐ একই স্বপ্ন দেখতে পারতাম। আজ ক'দিন ধরেই আমাদের চেতন ও অবচেতন মনকে আচ্ছন্ন করে আছে এই এক চিন্তা। তার ওপর কাল অসিত ও অমূল্যর চিঠি পাবার পরে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা এই আলোচনা করেছি। স্বভাবতই ডাক্তারবাবু ও বীরেন স্বপ্ন দেখেছে।

অমূল্য চিঠি লিখেছে পনেরো তারিখে, যেদিন ওরা সাড়ে আঠারো হাজার ফুটে দু' নম্বর শিবির স্থাপন করেছে। সেদিনই ওরা প্রাথমিক সমীক্ষা করেছে। ওদের মনে হয়েছে দু' হাজার ফুট ফিক্সড রোপ করতে পারলে সুবিধে হবে। কিন্তু আমরা তো মোটে হাজার ফুট ফিক্সড রোপ নিয়ে এসেছি। তারও একশ' ফুট বাসুকি পর্বতের কাছে লাগানো হয়েছে। অবশ্য ক্লাইম্বিং রোপ রয়েছে, কিন্তু ফিক্সড রোপ করার জন্য তা খরচ করা চলবে না। তাহলে ন'শ ফুট দড়ি দিয়ে দু' হাজার ফুটের কাজ চালাবে কেমন করে ?

চারজন কুলি, টিনের খাবার ও পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম অসিত নিশ্চয়ই ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অমূল্য আজ খালিহাতে সব কুলি ওপরে চেয়ে পাঠিয়েছে কেন ? ওরা কি শিবির গুটিয়ে আজ নেমে আসবে ? তা কেমন করে সম্ভব !

সুইসদের অবশ্য দু' দিন লেগেছিল। তাঁরা দু' নম্বর শিবিরে গিয়েছিলেন ৩১শে জুলাই সকাল সাড়ে দশটায়, আর সতপন্থ শিখরে আরোহণ করেছেন ১লা আগস্ট বেলা দুটোর সময়। কিন্তু তাঁদের দু' নম্বর শিবির হয়েছিল ১৯,০০০ ফুটে, আমাদের ১৮,৫০০ ফুটে।

আচ্ছা, ওরা কি সুইসদের পথে যায় নি ? গেলে এই পাঁচশ' ফুটের পার্থক্য কেন হল ?

'অলটিমিটার ভুল রিডিং দিতে পারে।' বরেণ্য বলেছিল।

'কিন্তু তা তো হতে পারে না।' বীরেন বলেছে, 'সেই ছোট শৃঙ্গটি, যেখানে সুইসরা দু' নম্বর শিবির স্থাপন করেছিলেন, তার কথা ওরা সবাই জানে। সেখানে শিবির করলে অলটিমিটারে যাই রিডিং দিক, ওরা ১৯,০০০ বলে উল্লেখ করত। মনে হচ্ছে ওরা সেখানে শিবির করে নি। তাছাড়া ফিক্সড রোপের কথাই বা লিখছে কেন ? সুইসরা তো ফিক্সড রোপ করেন নি। পাহাড়টা কি বদলে গেছে ?'

সেই একই ব্যাপার। গতবছর কেদারনাথ শৃঙ্গ অভিযানেও দেখেছি বিগত বিশ বছরে পর্বতের তুষারপ্রপাত ও সংলগ্ন হিমবাহের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। ৩রা অক্টোবর তুষার-

ঝড় শুরু হয়েছিল, কিন্তু অমূল্যরা কেদারনাথ ডোমে আরোহণ করেছিল ৩০ সেপ্টেম্বর। সুইসরা ১৯৪৭ সালে ডোম থেকেই শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু এখন সে পথের অবস্থা আগের চাইতে অনেক পরিবর্তিত। যার জন্য ডোমশীর্ষের কাছাকাছি একটা শিবির স্থাপন করার প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ এখন শৃঙ্গে আরোহণ করতে হলে সুইসদের মত কেদারনাথের তুষারপ্রপাত দিয়ে নেমে আসা চলবে না। শীর্ষে আরোহণ করে ডোম দিয়েই ফিরতে হবে। আর তাই ওরা ২রা অক্টোবর শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারে নি।

যাক্‌গে, এবারে দেখছি ওদের ১৮,৫০০ ফুটের শিবির থেকে শিখরে উঠতে হবে। অর্থাৎ একদিনে ৪,৭১৩ ফুট আরোহণ করে আবার নেমে আসতে হবে। পারবে কি?

'পারতেই হবে।' বীরেন বলেছে।

কাল অনেক রাত অবধি আমরা এইসব আলোচনা করেছি। তারপর ডাক্তারবাবু ও বীরেন স্বপ্ন দেখেছে।

আজ সকালেও আমরা সেই একই আলোচনা করছি। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ওরা ওদের অগ্রগতির খবর দিচ্ছে না কেন? চিঠিটা অমূল্য লিখেছে পনেরো তারিখে, আজ আঠারোই। ষোলো এবং সতেরো তারিখের খবর নেই কেন? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আমরা কাল পাই নি, আজও পাচ্ছি না।

বরেণ্য বাইরে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে বলে, "সব কুলি পাঠিয়ে দিলাম ওপরে।"

ঠিকই করেছে বরেণ্য। নেতার নির্দেশ পালন করেছে। বরেণ্য আবার বলে, "ডাক্তারবাবু ও বীরেনদার স্বপ্ন সত্যি নয়।"

"কেমন করে বুঝলে?" ডাক্তারবাবু কর্কশ স্বরে বলেন।

"আজ এখনও রোদ ওঠে নি। আকাশ মেঘে ঢাকা। ওরা আজ শিখরে উঠবে।"

"তাই তো করবে।" বীরেন অবিচলিত স্বরে বলে, "আমরা এ্যাডভান্স স্বপ্ন দেখেছি।"

ওর কথায় হাসি পায়, এত দুর্ভাবনার মাঝেও হাসি পায়। যাক্, আমাদের একটু হাসা দরকার। পরশু সন্ধ্যে থেকে বড় বেশি গম্ভীর হয়ে পড়েছি। মনোবল পর্বতাভিযানের প্রধান শক্তি।

টিকারাম ও রাম বাহাদুর ব্রেক-ফাস্ট নিয়ে আসে। রাম বাহাদুর অসুস্থ হয়ে ওপর থেকে নেমে এসেছে। সে ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু বসে থাকছে না। টিকারামকে সাহায্য করছে।

আমরা তাঁবুর বাইরে আসি। দিনের খাবার আমরা বাইরে বসেই খেয়ে নিই। আজ কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কোনো লাভ হল না। রোদ নেই। এবারে আজই প্রথম রোদ উঠল না।

মেঘ দেখে স্বপনচারীরা আনন্দিত হয়। বীরেন, বলে, "আজ ক্লাইম্ব হবেই। নীলগিরি পর্বত* যেদিন ক্লাইম্ব হল সেদিনও এমনি হয়েছে।"

"ঠিকই বলেছে বীরেন।" ডাক্তারবাবু বলেন, "তীরশূলী** আরোহণের দিনও আকাশ এমনি ছিল।"

কথাটা মিথ্যে নয়। প্রবাদ আছে—মনুষ্য-পদলাঞ্ছিত হবার পরে প্রত্যেক পর্বতশিখর নাকি

---

* 'নীল-দুর্গম' দ্রষ্টব্য।

** চঞ্চলকুমার মিত্রের নেতৃত্বে কুমায়ুনের অপরাজিত পর্বতশিখর তীরশূলী (২৩,২১০) বিজিত হয়েছে ১৯৬৬ সালের ৯ই অক্টোবর। দুজন শেরপা, শ্যামল চক্রবর্তী ও নিরাপদ মল্লিক শিখরে আরোহণ করেছে।

লজ্জায় মেঘের আড়ালে মুখ লুকায়। ফলে আকাশ মেঘময় হয়ে ওঠে।

"যতদূর মনে পড়ে", বরেণ্য বলে, "কেদারনাথ ডোম আরোহণের পরেও আকাশের অবস্থা এমনি হয়েছিল।"

মানসিক অবস্থা যাই হোক, বসে থাকলে চলবে না। আমরা ওদের কথা ভাবছি, কিন্তু ওরা তো বসে নেই! ওরা কাজ করছে। তাহলে আমরা বসে থাকব কেন?

আমরা কাজ শুরু করে দিই। বীরেন ও প্রফেসর হিমবাহে চলে যায়।

আজ কাজ কিন্তু খুব বেশি এগোয় না। প্রফেসরও ফিরে আসে তাড়াতাড়ি। কি করবে! মনটা যে বড়ই অবাধ্য। কিছুতেই কথা শোনে না। যত বলি ওদের কথা ভেবো না, কাজ করে যাও। ওরা ভাল আছে। অবাধ্য মন তবু তর্ক করে, তাহলে খবর আসছে না কেন?

আমরা বাইরে বসে আছি। রোদ নেই, তবু বসে আছি। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তবু বসে আছি। এখান থেকে যে অনেক দূর অবধি দেখা যায়।

সেই দেখার জন্যই হিমশীতল বায়ুপ্রবাহ সহ্য করে এখানে বসে আছি। তাকিয়ে আছি ওপরের দিকে। আমরা সেই পরম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছি। খবর আসবে—সুখবর। সফল হয়েছে আমাদের অভিযান। সার্থক হয়েছে বিগত কয়েক মাসের পরিশ্রম। বাড়ির কথা না ভেবে, অফিসের কাজ না করে, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকে উপেক্ষা করে পাগলের মতো পথে পথে ঘুরে এই অভিযানের আয়োজন করেছি। কত অপমান সয়েছি, কত বাধা জয় করেছি—সবই শুধু সেই সুখবরটির জন্য।

আমরা সতপন্থ শিখরারোহণ সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে বাইরে বসে আছি। উৎকণ্ঠা তো কেবল সাফল্য সংবাদের জন্য নয়। উৎকণ্ঠা সহযাত্রীদের কুশল সংবাদের জন্যও। সতপন্থ কেবল দুর্গম নয়, সে বিপদসঙ্কুল। তার বুকে প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর হাতছানি। সেই অমোঘ আবাহনকে উপেক্ষা করে অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে ওদের যেতে হবে এগিয়ে। তবেই সতপন্থ ওদের কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরিয়ে দেবে। পারবে কি? ওরা কি পারবে সেই জয়মাল্য নিয়ে আসতে?

কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। নীলগিরি, পঞ্চচুলি, চন্দ্র পর্বত ও কেদারনাথ ডোম জয়ী অমূল্য, মানা ও গৌরাঙ্গ পর্বত বিজয়ী প্রাণেশ, ভাগীরথী-২ জয়ী স্বপন এবং কেদারনাথ ডোম বিজয়ী করুণাময় রয়েছে ওদের দলে। রয়েছে অভিজ্ঞ সুজল, হিমাদ্রি ও জামিদ। রয়েছে ছুঞ্জে, দা রিঞ্জি, দোরজি, লাকপা ও নিমার মতো অভিজ্ঞ শেরপা। কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। মানুষের অসাধ্য না হলে সতপন্থের শুভ্র-শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করে ওরা নির্বিঘ্নে আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

"ঐ যে আসছে!" বরেণ্য চেঁচিয়ে ওঠে।

"হ্যাঁ, আসছে....আসছে..." আমরা সমবেত স্বরে বলে উঠি। আমরা উঠে দাঁড়াই। ছুটে চলি।

আসছে, সত্যই আসছে। একজন নয়, দুজন নয়, তিনজন। পোশাক দেখে মনে হচ্ছে একজন সদস্য ও দুজন কুলি। কে? সঈদ? অসিত? হিমাদ্রি? না আর কেউ?

কিন্তু তাকে কুলিরা ধরে ধরে নিয়ে আসছে কেন? কি হয়েছে ওর?

দুর্ঘটনা? আঁতকে উঠি।

ডাক্তারবাবু ধমক দেন, "এত নার্ভাস হয়ে পড়ছেন কেন ? আসতে দিন না, দেখুন কি হয়েছে ! যাই হোক, ভয় পাবার কি আছে ? আমি তো রয়েছি এখানে। আর দেখছেন না, কুলির কাঁধে ভর করে নিজেই হেঁটে হেঁটে নামছে। নিশ্চয়ই তেমন গুরুতর কিছু নয়।"

ভগবান তাই করুন ! আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকি।

বীরেন আমাকে বলে, "শঙ্কুদা, দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে। অস্ট্রো-জার্মান অভিযান ও আমাদের কেদারনাথ পর্বতাভিযান ছাড়া এ অঞ্চলে প্রতিটি অভিযানে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কাজেই দুর্ঘটনাকে ভয় করার মতো মানসিক গঠন তো আমাদের নয়। ওদের আসতেই দিন না।"

কিন্তু কে ? যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিচে নেমে আসছে, সে কে ? আর যে তর সইছে না। তবু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি ?

যতই পীড়াদায়ক হোক, সময়টা কিন্তু কেটে গেল। আমাদের প্রতীক্ষার অবসান হল। ওরা আমাদের কাছে এল। আমরা ওদের চিনতে পারলাম।

না, সঈদ, অসিত কিংবা হিমাদ্রি নয়। আমাদের দলের কেউ নয়। দিলীপ—কালিন্দীখাল পদযাত্রীদের কোয়ার্টার মাস্টার দিলীপ ভট্টাচার্য দুজন কুলিকে নিয়ে ফিরে আসছে।

কি হয়েছে ওর ? পরশুদিন অসুস্থ শরীরেই এখানে এসেছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবুর ওষুধ খেয়ে তো ভাল হয়ে গিয়েছিল ! কাল সকালে সুস্থ শরীরেই রওনা হয়েছে ওপরে। আজ আবার কি হল ?

ডাক্তারবাবু দিলীপের একখানি হাত হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "পড়ে গিয়েছ নাকি, কোথায় লেগেছে ?"

"না", একটু শুষ্কহাসি হেসে ক্ষীণকণ্ঠে দিলীপ বলে, "পড়ে যাই নি। এখান থেকে রওনা হবার পরেই অসহ্য শ্বাসকষ্ট ও মাথার যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে বমি। গত দুদিন চোখের পাতা এক করতে পারি নি, যা খেয়েছি সব বমি হয়ে গেছে।"

"এখন কেমন লাগছে ?"

"ভাল, অনেক ভাল।"

"চল, তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়বে। নিচে নেমে এসেছ। একটু বিশ্রাম করলেই দেখবে, একেবারে ভাল হয়ে গেছ।"

দিলীপকে নিয়ে আমরা তাঁবুতে আসি। সে বরেণ্যর বিছানায় শুয়ে পড়ে। ওর কুলিকে বলি, সে আমাদের তাঁবুতেই থাকবে।

সহসা দিলীপ বলে ওঠে, "শেষ পর্যন্ত আমার অদৃষ্টে আর কালিন্দীখাল দর্শন করা হয়ে উঠল না শঙ্কুদা !" তার দু'চোখে জল।

আমি ওর কাছে এগিয়ে আসি। চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বলি, "তাতে কি হয়েছে ভাই ! যা দেখেছ, তাই বা ক'জনের অদৃষ্টে জোটে ? তাছাড়া সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, আবার আসবে।"

করুণ হাসি হেসে মৃদুস্বরে দিলীপ বলে, "আর কি হবে দাদা ! মধ্যবিত্ত মানুষ, কত কষ্টে টাকা ও ছুটি যোগাড় করেছি। আর কি আসতে পারব ?"

কোনো জবাব দিতে পারি না। সত্যই তো, কত কষ্ট করে আসা ! সেই আসা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে কে না দুঃখ পায় ?

কিন্তু সত্যই কি ব্যর্থ হয় ? লক্ষ্যে না পৌঁছলেই তো অভিযান ব্যর্থ হয় না !

সেই কথাটাই আমরা বার বার দিলীপকে বলি। নানা উদাহরণ দিই। জানি না, এতে

ওর দুঃখের বোঝা কতটা লাঘব হবে। তবু আমরা তাকে সান্ত্বনা দিই। তার অশান্ত চিত্তকে শান্ত করার চেষ্ট করি। আর তার তলায় নিজেদের অশান্তিটা যে কখন চাপা পড়ে যায়, তা টের পাই না।

ডাক্তারবাবু দিলীপকে ওষুধ দেন। বরেণ্য তার এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলিয়ে দেয়। সে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ বাদে চা আসে। দিলীপকে চা ও বিস্কুট দিতে বলেন ডাক্তারবাবু। সে আপত্তি করে, "আমি এখন কিছু খাব না। খেলেই বমি হয়ে যাবে।"

"হবে না।" ডাক্তারবাবু বলেন।

বাধ্য হয়ে দিলীপ উঠে বসে। সে ভয়ে ভয়ে চা-বিস্কুট খায়। অবাক হয়, বমি আসে না—বরং বমি-বমি ভাবটা কমে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু হেসে বলেন, "বমিরও ভয় আছে ভাই! আমার ওষুধের ভয়ে বমি তোমাকে ছেড়ে পালিয়েছে।"

দিলীপ একটু সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই চাপাপড়া অশান্তিটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। এ যে তুষের আগুন। ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল, আবার ফুটে বেরিয়েছে।

সন্ধ্যে হয়ে এল, কিন্তু ওপরের খবর নেই। ওরা কি করছে, কেমন আছে?

আবহাওয়াটা যেন ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে। আজ প্রায় সারাদিনই মেঘলা ছিল। বোধ হয় বৃষ্টি হবে, বরফ পড়বে। ওপরের কি অবস্থা কে জানে!

আশ্চর্য! আজ তিনদিন হল কোনো খবর নেই! কেন খবর আসছে না? ওরা খবর পাঠাচ্ছে না কেন? ওরা কি আমাদের চমকে দিতে চাইছে? ইচ্ছে করেই নীরব রয়েছে? একসঙ্গে সাফল্যের সংবাদ দেবে? সাফল্য করায়ত্ত বলেই কি এই নীরবতা?

কিন্তু এ যে নিতান্তই অর্থহীন পরিকল্পনা, বুদ্ধিহীন ব্যবস্থা। ওরা তো কেউ নির্বোধ নয়! যেখানে প্রতিমুহূর্তে জীবনসংশয়, সেখানে তিনদিন খবর না পাঠানো অমার্জনীয় অপরাধ। অগ্রবর্তী দলকে প্রতি পদক্ষেপের সঠিক সংবাদ জানাতে হবে পরবর্তী শিবিরে। এ কথা তো সবাই জানে!

তাহলে কি অন্য কোনো কারণে সংবাদ আসছে না? কি কারণ হতে পারে? কোনো দুর্ঘটনা?

না, না। দুর্ঘটনা ঘটবে কেন? ওরা সকলেই সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। নেতা অমূল্য অতিশয় সাবধানী। তার প্রথম কথা—সেফ্‌টি ফার্স্ট। আগে নিরাপত্তা, তারপর সাফল্য।

আর দুর্ঘটনা ঘটলে নিশ্চয়ই খবর আসত। খবর আসছে না, মানে সুখবর আসবে। কিন্তু কবে? আর যে নীরবতা সইতে পারছি না!

এখনও কেন এই নীরবতা! সকালে কুলিরা ওপরে গেছে। খালিহাতে গিয়েছে। তারা দশটার মধ্যে এক নম্বর শিবিরে পৌঁছে গিয়েছে। হিমাদ্রি ও অসিত রয়েছে সেখানে। ওরা অনায়াসে একজন কুলিকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারত।

সারটা দিন কেটে গেল। কিন্তু কেউ এল না। তাহলে কি অসিত এবং হিমাদ্রিও কোনো খবর পায় নি?

না, আর ভাবতে পারছি না। কি ভাবব? যে ভাবনার মাঝে সমাধানের সূত্র মেলে না, সে ভাবনায় কি লাভ?

কিন্তু লাভ-লোকসানের সীমারেখায় তো ভাবনাকে আবদ্ধ করা যায় না! কাজেই মন

না চাইলেও ভাবনার তরী বয়ে চলে চিন্তায় সরিৎ থেকে দুশ্চিন্তার অতল সাগরে।

সইতেই হবে, এ জ্বালা সইতে হবে। আমরা নিচের শিবিরের বাসিন্দা। প্রতিটি পর্বতাভিযানে নন্-ক্লাইম্বিং মেম্বারদের এই শাস্তিভোগ করতে হয়।

কিন্তু আর কতদিন ? কতদিন আর এই দুঃসহ জ্বালা সইতে হবে ? কতদিন এই চরম শাস্তিভোগ করতে হবে ? আর যে পারছি না !

কে ? চমকে উঠি। ভাবনা থেমে যায়। কে যেন তাঁবুতে ঢুকছে। না, একজন নয়, দুজন... তিনজন।

"গুড ইভনিং কমরেড্স...."

কে ? সঈদসাহেব ! হ্যাঁ। আমাদের ক্যামেরাম্যান সঈদ আমেদ। ফিরে এসেছেন। দু' নম্বর শিবির থেকে সঈদসাহেব এসে গেছেন। তাঁর সঙ্গে জয় বাহাদুর ও সেতীরাম। আনন্দে ও আবেগে আলিঙ্গন করি সঈদসাহেবকে।

কিন্তু আমার উষ্ণ আলিঙ্গনে যেন উত্তপ্ত হচ্ছে না সঈদ আমেদ। আমাদের আন্তরিক অভিনন্দনে অভিভূত হলেন না তিনি। তাঁর হিমশীতল দেহ আর গম্ভীর মুখ দেখে বিচলিত হই। তিনি যেন নিরুৎসাহিত, নিস্তেজ ও নিরানন্দ।

কেবল সঈদ আমেদ নন, ওরা সবাই। স্ফূর্তিবাজ সেতীরাম শব্দহীন, কর্মচঞ্চল জয় বাহাদুর গম্ভীর। তারা মাটিতে বসে পড়েছে।

"কি হয়েছে ? ওরা কেমন আছে—আমাদের সহযাত্রীরা কেমন আছে ?" আমি চেঁচিয়ে উঠি।

"ভাল।" সঈদ ক্লান্তকণ্ঠে বলেন।

আমি তাঁকে ছেড়ে দিই। তিনি একটা এয়ার-ম্যাট্রেসে বসে পড়েন। মনে হচ্ছে পরিশ্রান্ত। তা তো হবেনই ! অনেকটা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। কিন্তু কেবল কি পরিশ্রমের জন্যই ওরা এমন নীরব ?

না। ওরা যত পরিশ্রান্তই হোক্, সুসংবাদ থাকলে তা এতক্ষণে দিয়ে দিত। তাহলে কি কোনো দুঃসংবাদ ? কিন্তু সঈদ যে বলছেন, ওরা সবাই ভাল আছে ! তাহলে তিনি এমন গম্ভীর কেন ?

"খবর কি, ওরা সতপন্থে আরোহণ করেছে ?" উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করি।

শান্তস্বরে সঈদ জবাব দেন, "না।"

জয় বাহাদুর ও সেতীরাম মাথা নিচু করে আছে।

আমরাও নীরব থাকি। একটু বাদে সঈদ সেই নীরবতার অবসান করেন। বলতে থাকেন, "কি আশ্চর্য সুন্দর শৃঙ্গ ! শৃঙ্গ তো নয়, একটি ত্রিকোণাকৃতি পরমার্থ নিকেতন। পৃথিবীর পাপমোচনের জন্যই যেন পরমেশ্বর তাকে সৃষ্টি করেছেন। যতবার সতপন্থের দিকে তাকিয়েছি, ততবার আমার মাদুরাই-য়ের মীনাক্ষী মন্দিরের কথা মনে পড়েছে। তবে সতপন্থ তার চেয়েও মনোহর। সে কেবল সুন্দর নয়, সে সুবিশাল—সে সত্যলোক।"

সঈদের ভাষা ও বক্তব্যে বিস্মিত হই। সঈদ আমেদ মুসলমান। তাঁর মাতৃভাষা উর্দু। এলাহাবাদের মানুষ বলে হিন্দী বলতে ও বুঝতে পারেন, কিন্তু লেখা ও পড়া জানেন না। তাহলে তিনি এসব কথা বলছেন কেমন করে ? তিনি তো পুরাণ পাঠ করেন নি ! পুরাণে*

---

* স্কন্দ পুরাণম্— বিষ্ণুখণ্ডম্, বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যম্। শ্লোক— ৪৭, ৫১, ৫৩ ও ৫৪।

যে সতপন্থের তুষার-বিগলিত হ্রদ সতপন্থতাল সম্পর্কে এই এক কথাই বলা হয়েছে—

'ততঃ সত্যপদন্নাম তীর্থং সর্ব্বমনোরম্।
ত্রিকোণাকারমেবৈতৎ কুণ্ডং কল্মষনাশনম্।
একদশ্যাং হরিস্তত্র স্বয়মায়াতি পাবনে॥'

তারপর অত্যন্ত মনোহর সত্যপদ নামে পরম তীর্থ। এই সত্যপদকুণ্ড ত্রিকোণাকার ও পৃথিবীর পাপমোচনক্ষেত্র। একাদশী তিথিতে স্বয়ং হরি এই পূততীর্থ সত্যপদকুণ্ডে আগমন করেন।

'স্বশাখোক্তবিধানেন স্নানং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
সত্যলোকমবাপ্নোতি ততো নৈশ্রেয়সং পদম্॥'

বিচক্ষণ মানুষ স্ববেদোক্ত বিধানে এই তীর্থে স্নান করে সত্যলোকে গমন করেন এবং তারপর নিঃশ্রেয়স পাদ লাভ করেন।

'ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিকোণস্থাঃ সমাহিতাঃ।
তপঃ কুর্ব্বন্ত্যনুদিনং সর্ব্বলোকাদিতোষণম্॥'

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিকোণাকার সত্যপদতীর্থের তিন কোণে অবস্থান করে সর্বদা সর্বলোকের মঙ্গলের জন্য তপস্যা করেছেন।

'ত্রিকোণমণ্ডিতং তীর্থং নাম্না সত্যপদপ্রদম্।
দর্শনীয়ং প্রযত্নেন সর্ব্বপাপমুমুক্ষুভিঃ॥'

ত্রিকোণাকার এই সত্যপদতীর্থ প্রত্যেক মুক্তিকামী মানুষের অবশ্য দর্শনীয়।

সঙ্গদ সৌভাগ্যবান। সত্যপদকুণ্ড দর্শন করতে না পারলেও সত্যপদ শিখর দেখে এসেছেন। আর তারই স্বর্গীয় রূপ তাঁকে এখনও অভিভূত করে রেখেছে। তিনি সহযাত্রীদের কথা বিস্মৃত হয়ে সতপন্থের কথা বলে চলেছেন।

জানি সতপন্থ অবিস্মরণীয়। তবু আমরা সঙ্গদকে জিজ্ঞেস করি, "ওরা আগামীকাল আবার শিখরারোহণের চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই?"

সঙ্গদ সে প্রশ্নের উত্তর দেন না। তিনি উইণ্ড-প্রুফের পকেটে হাত দিয়ে একখানি কাগজ বের করেন। ডাক্তারবাবু তাঁর হাত থেকে কাগজখানি নেন। আমরা কাছে আসি।

চিঠি—প্রাণেশ চিঠি লিখেছে। ডাক্তারবাবুকে বলি, "জোরে জোরে পড়ুন!"

ডাক্তারবাবু নিজের এয়ার-ম্যাট্রেসে গিয়ে বসেন। বীরেন মোমবাতিটা এগিয়ে দেয়। ডাক্তারবাবু প্রাণেশের চিঠি পড়তে শুরু করেন—

'আপনাদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম বিফল হয়েছে। সতপন্থ আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। কোনো রকমে উনিশ হাজার ফুট পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, তারপর আর এগোতে পারি নি। পেছন থেকে আপনারা আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন। কিন্তু প্রতিদানে আমরা আপনাদের কিছুই দিতে পারলাম না।

আমাদের দিক থেকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, চেষ্টার কসুর করি নি। সর্বশক্তি নিয়োগ করেও আমরা সতপন্থের শিখর-শিরাকে স্পর্শ করতে পারি নি। এতবড় ব্যর্থতাকে যে বরণ করে নিতে হবে, তা ছিল কল্পনাতীত। তবু বলব, এ ব্যর্থ প্রচেষ্টা গৌরবময়। সতপন্থকে কোন দিন ভুলব না। সে আমার মনের মণিকোঠায় চিরসুন্দর হয়ে থাকবে।

এবারে সেই ব্যর্থতার ইতিহাস বলছি—

১৬ই সেপ্টেম্বর—যথারীতি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। প্রাতরাশ সেরেই শেরপা দা রিঞ্জি ও দোরজি এবং করুণাদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম দু' নম্বর শিবির থেকে—তিন নম্বর

শিবিরের জায়গা, তথা সতপন্থের পথ খুঁজতে।

সামান্য কিছু খাবার ছাড়া সঙ্গে নিয়েছিলাম নাইলন দড়ি ও ফিক্সড রোপ, আইস ও রক পিটন্স, ক্যারাবিনা এবং হাতুড়ি।

বাইনোকুলার দিয়ে দু' নম্বর শিবির থেকে সতপন্থ শৃঙ্গের উত্তর-পূর্ব গিরিশিরার যেটুকু নজরে পড়ে, তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। গিরিশিরাটি যেখানে শেষ হয়ে শিখরের সঙ্গে মিশেছে, তারই সংযোগস্থলে একটি hump আছে। সুতীক্ষ্ণ ও সুদীর্ঘ গিরিশিরা—দেখে মনে হয় যেন ছুরির ফলা।

গিরিশিরার ঠিক নীচে Ice-fall বা হিমপ্রপাতের যতটুকু দেখা যায়, তাতে তাকে খুব ভয়াবহ কিংবা অনতিক্রম্য মনে হয় না। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেছি সে অনুমান কতখানি মিথ্যে। তবে সেকথা এখন থাক্।

সতপন্থ শৃঙ্গের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরার মধ্যাঞ্চল থেকে সৃষ্ট ক্ষুদ্র হিমবাহটি ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। সেই অনামী হিমবাহটি অদূরে সুন্দর বামকের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। আর সুন্দর মিশেছে চতুরঙ্গীতে—আমাদের দু' নম্বর শিবিরের মাইলখানেক দূরে।

ঘণ্টাখানেক আমরা বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়েছিলাম। যদিও আমাদের আশেপাশে অসংখ্য ছোট-বড় ফাটল ছিল, তবু সেগুলো তেমন অসুবিধের সৃষ্টি করতে পারে নি। অসুবিধের সৃষ্টি হল সেখানে, যেখান থেকে হিমপ্রপাতের ঢেউ-খেলানো বরফের ভাঁজ শুরু হয়েছে। আমরা তার ছবি নিয়েছি। ছবি দেখে তার অপার সৌন্দর্য হয়তো অনুমান করতে পারবেন, কিন্তু জানতে পারবেন না তার বীভৎস ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতিকে—যেজন্য আমাদের এই পরাজয়।

যতদূর দৃষ্টি চলে ঢেউ-খেলানো তুষারাবৃত প্রান্তর। আপাতদৃষ্টিতে স্থির ও অচঞ্চল। মনে হয় কঠিন বরফ, কিন্তু পা ফেললেই হুড়মুড় করে সশব্দে ভেঙে পড়ে প্রকাণ্ড হাঁ হয়ে যায়। হিমপ্রপাত তো নয়, যেন গোলকধাঁধা।

কোমরে দড়ি বেঁধে, কখনও ফাটল পেরিয়ে, কখনও এড়িয়ে সন্তর্পণে হিমপ্রপাতের অলি-গলি অতিক্রম করে আমরা অনেকটা এগিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর থামতে হল। সামনে বিরাট গহ্বর—পাতাল পর্যন্ত প্রসারিত। তাকাতে ভয় করে—নিচে নিকষ কালো আঁধার। ফাটল নয়, পরিখা। সতপন্থ পরিখা খনন করে তার শিখর-শিরাকে পৃথক করে রেখেছে—গড়ে তুলেছে দুর্ভেদ্য রক্ষা-ব্যূহ।

এরই ঠিক নিচে আমরা পরিত্যক্ত শিবিরের কিছু চিহ্ন পেয়েছি—কয়েকটা লাল ডিমার্কেশান ফ্ল্যাগ, খালি টিনের কৌটা, মোমবাতি, স্টোভ-পিন ও দগ্ধ সিগারেটের অংশ ইত্যাদি। ইতিপূর্বে মাত্র তিন দল অভিযাত্রী সতপন্থে এসেছেন। অস্ট্রো-জার্মান ও সুইস দল এবং সুজিত বসুর নেতৃত্বে ক্যালকাটা ক্লাইম্বার্সের অভিযাত্রীরা। অস্ট্রো-জার্মানরা এসেছিলেন ত্রিশ বছর আগে আর সুইসরা ১৯৪৭ সালে। কাজেই এগুলো তাঁদের শিবিরের চিহ্ন নয়, নিশ্চয়ই ক্যালকাটা ক্লাইম্বার্সদের। মনে হচ্ছে তাঁরাই শিবির ফেলেছিলেন সেখানে।

আমরা চারটি প্রাণী প্রকৃতির সেই বিশাল কর্মশালায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবছিলাম কি করে, কোন্ পথে শিখর-শিরায় পৌঁছানো যায়। করুণাদা বললেন—অসম্ভব, অন্তত পনেরোটা এলুমিনিয়ামের মই থাকলে চেষ্টা করা যেত।

দা রিঞ্জি ও দোরজির ধারণাও তাই। তবু তারা চেষ্টা করতে চায়। আমরা তাদের সাহায্য করি।

১৯৪৭ সালের সুইস অভিযাত্রীরা এই গিরিশিরা দিয়েই শিখরারোহণ করেছেন। কিন্তু কেমন করে? এ যে মানুষের সাধ্যাতীত। তবে কি তখনকার সতপন্থের সঙ্গে আজকের সতপন্থের কোনো পার্থক্য রচিত হয়েছে? বিচিত্র হিমালয়—বিচিত্রতর তার প্রকৃতি।

তখন সূর্যের সোনালী-ছোঁয়া লেগেছে গিরিশিরার গ্রীবায়। তুষার-গলা রুপোলী ধারা গড়িয়ে পড়ছে সতপন্থের গা বেয়ে। যেন ঝুমুর-ঝুমুর নূপুর বাজছে।

দা রিঞ্জি পাহাড়ের গা বেয়ে গিরিশিরার ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। দোরজি তাকে 'রিলে' করে। শূলের মতো সুতীক্ষ্ণ বরফের ঝুরিগুলোতে আইস-এক্সের ঘা মারে দা রিঞ্জি। টুং-টাং শব্দে সেগুলি ভেঙে পড়ে। আর তারই নিচ থেকে বেরিয়ে আসে খানিকটা ফিক্সড রোপ—হয়তো ক্যালকাটা ক্লাইম্বার্সের বিফল অভিযানের আর-একটি নিদর্শন।

খাড়া পাহাড়ের গায়ে টিকটিকির মতো দাঁড়িয়ে দা রিঞ্জি দড়িটাকে পরীক্ষা করে। তুষারবরফ ও বাতাসে পিটনের গোড়া নরম হয়ে গেছে। টান দিতেই পিটনটা উঠে এল। আর সেই সঙ্গে গিরিশিরার ওপর থেকে পাথর পড়তে শুরু করল। দা রিঞ্জি কোনোমতে নেমে আসে নিচে। মাথা বাঁচিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি দূরে সরে যাই।

কিন্তু কতটা সরে যাব? সবটাই যে সতপন্থের এলাকা। গিরিশিরার মাঝামাঝি জায়গা থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর বুলেটের বেগে নেমে আসে নিচে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। করুণাদা হঠাৎ আমাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন। পাথরটা বিদ্যুৎগতিতে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল—প্রায় পাঁচশ' গজ দূরে গিয়ে পড়ল। ভগবানের অশেষ কৃপা এবং আপনাদের আশীর্বাদে আমি এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

ভুতুড়ে খেলাটা তারপর আরও জমে উঠল। প্রবলতর বেগে পাথর পড়তে থাকল চারিদিকে। উপায়ান্তর না দেখে আমরা পিছু হটলাম। কারণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা অগ্রসর হওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু—আত্মহত্যা।

সেদিন শিবিরে ফিরে আসার পথে বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছি—এপথে কি সতপন্থের শিখরে আরোহণ করা সম্ভব?

না। প্রতিবার মনের কাছ থেকে, আমার বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার কাছ থেকে এই একই উত্তর পেয়েছি—বর্ষার পরে এই হিমপ্রপাত পেরিয়ে সতপন্থের উত্তর-পূর্ব গিরিশিরায় পৌঁছানো সম্ভব নয়।

বর্ষার আগে হয়তো সম্ভব হতে পারে। কারণ তখন শীতের তুষারে এই সব ফাটল ঢাকা থাকে। এখন সে তুষার গলে গেছে। কিন্তু তখন তো চীরবাসা থেকেই বরফ! সেই সুদীর্ঘ তুষারাবৃত পথ পেরিয়ে সতপন্থের পাদদেশে পৌঁছবার জন্য অন্ততঃ তিনগুণ অর্থ আর দ্বিগুণ সময়ের প্রয়োজন।

আমরা সতপন্থের শিখর-শিরাকে স্পর্শ করতে পারি নি। কিন্তু পারলেও শিখরারোহণ খুব সহজ হত না। গিরিশিরাটি ৪৫-৫০° ডিগ্রি খাড়া ও প্রস্তর পরিপূর্ণ। সূর্যরশ্মি পড়বার আগে এই সংকীর্ণ গিরিশিরার প্রস্তরাবৃত অঞ্চলটি অতিক্রম করা দুরূহ কাজ। আর চতুরঙ্গী ও সুন্দর সঙ্গমের কাছে, সেখানে গিয়ে গিরিশিরাটি শেষ হয়েছে, সেখান থেকে সরাসরি গিরিশিরা ধরে এলেও শীর্ষারোহণ সহজ নয়। তবে সে-পথে চেষ্টা করা যেতে পারে।

যাই হোক, আমরা সেদিন ডানদিকে সরে গিয়ে হিমপ্রপাত ধরে সোজাসুজি সতপন্থের উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরার দিকেও অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাতে আরও ভয়াবহ

অবস্থার সম্মুখীন হতে হল। বরফ কেটে ধাপ তৈরি করে ও দড়ি লাগিয়ে চার-পাঁচতলা বাড়ির সমান উঁচু এক-একটা পর্বত-প্রমাণ নীলাভ বরফের চাঁই পেরিয়ে প্রায় মাইল আধেক এগিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরই থামতে হয়েছিল—প্রশস্ততর ফাটলে পথ রুদ্ধ।

হিমপ্রপাতের এমন নারকীয় গঠন আমি আর কখনও দেখি নি। তীরশূলী শৃঙ্গের সেই হিমপ্রপাতের কথা আপনারা সবাই শুনেছেন, বীরেনদা ও ডাক্তারবাবু তো দেখেছেনই। কিন্তু তার মধ্যেও আমরা পথ খুঁজে পেয়েছিলাম, এখানে পাই নি। এ হিমপ্রপাত তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক। একটার পর একটা নীলাভ বরফের ঢেউ আর তার মাঝে মাঝে অতল গহ্বর—মৃত্যুফাঁদ। তবে কেবল বীভৎস ও ভয়ঙ্কর নয়, নয়নাভিরামও বটে। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের এমন নিদর্শন আমি আর কোনোদিন দেখতে পাই নি।

দূর থেকে সতপন্থকে দেখে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল, কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার পরে বুঝতে পারলাম, সে আশা নিরাশা। বাধ্য হয়ে আমরা শিবিরে ফিরে এলাম। নেতা সহ-নেতা ও ডাক্তার সব শুনে চিন্তিত হল, কিন্তু পরাস্ত হল না। স্থির করল, পরদিন অর্থাৎ আজ আবার পথের সন্ধান করা হবে। এক নম্বর শিবির থেকে শেরপা শেরিং লাকপা ও আঙ নিমাকে নিয়ে আসা হল।

আজ সকালে চারজন শেরপা—ছুঞে, দোরজি, লাকপা ও নিমা এবং আমরা পাঁচজন—অমূল্য, সুজলদা, ডাক্তার, করুণাদা ও আমি আবার গিয়েছিলাম। সারা দিন ধরে সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হয়েছে। সতপন্থ পথ দেয় নি। ফিরিয়ে দিয়েছে আমাদের।

দু' নম্বর শিবির গুটিয়ে আজ সন্ধ্যায় আমরা ফিরে এসেছি এক নম্বরে। এখানে হিমাদ্রি, অসিতদা, জাম্মিদ সিং ও সঈদসাব রয়েছেন। তাঁরা আমাদের ব্যর্থতায় ব্যথিত হয়েছেন, আপনারাও ব্যথা পাবেন। আপনাদের সাধনা বিফল হয়েছে, স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে। আমরা আপনাদের অযোগ্য সহযাত্রী। আপনারা আমাদের ক্ষমা করবেন।

এক নম্বর শিবির, প্রাণেশ।'

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

থামলেন ডাক্তারবাবু। প্রাণেশের চিঠি শেষ হয়েছে। তবু আমরা চুপ করে থাকি। কি বলব? যার জীবনপণ সংগ্রাম করে সতপন্থ থেকে ফিরে এসেছে, আমাদের সেই বীর সহযাত্রীরা অযোগ্য নয়। তাদের ক্ষমা করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমরা তাদের এই গৌরবময় পরাজয়ে গৌরবান্বিত।

কিন্তু তারা কোথায়? তারা আজ এখানে ফিরে এল না কেন?

সঈদসাহেব বলেন, "ওরা তো আজ এক নম্বর শিবির ভেঙে চলে গেছে।"

"কোথায়?"

"খালিপেটে হিমবাহের অনামীশৃঙ্গে।"

"সাবাস!" আমি বলে উঠি, "সাবাস অমূল্য, সাবাস তার সহযাত্রীদল! এই বিরাট ব্যর্থতার পরেও তারা কর্তব্য বিস্মৃত হয় নি।"

হয়তো আরও অনেক কিছু বলে যেতাম। কিন্তু পারি না। সেতীরাম তার পাত্‌লুনের পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে। সেদিকে নজর পড়ে আমাদের। সেতীরাম বলে, "চিঠ্‌ঠি!"

"কৌন্ দিয়া?"

"লীডার সাব।"

ডাক্তারবাবু সেতীরামের হাত থেকে কাগজখানি হাতে নিয়ে বলেন, "অমূল্যর চিঠি।" তিনি পড়তে শুরু করেন—

এক নম্বর শিবির, সকাল সাতটা
সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৬৮

'শঙ্কুদা, বরেণ্য, ডাক্তারবাবু ও প্রফেসর,

সতপন্থ হল না। কেন হল না, প্রাণেশের চিঠিতে জানতে পারবে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, আবহাওয়া ভাল থাকা সত্ত্বেও হল না। আমাদের দিক থেকে শুধু-সান্ত্বনা এই যে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি— We have tried our best.

জানি তোমরা দুঃখ পাবে, আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ী দুঃখিত হবেন। কিন্তু তোমরা তো বুঝতে পারছ, আমার দুঃখও বড় কম নয়। ষষ্ঠ পর্বতাভিযানে প্রকৃতপক্ষে এই আমার প্রথম পরাজয়।

কিন্তু এ পরাজয়ে আমি বিচলিত হই নি। কেন জানো? দার্শনিক পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক স্মাইথের সেই ছত্রক'টি আমি মন্ত্রের মতো জপ করে চলেছি —দুনাগিরির (২৩,১৮৪) কাছে পরাজিত হয়ে তিনি যা লিখে* গেছেন— "We had been beaten, soundly thrashed...but it was an experience we could not hardly regret.... we had tasted all that mountaineering has to offer in the Himalayas. Swiftly perish the memories of failure and success imperishable are the memories of good adventuring." সেই অক্ষয় স্মৃতি দিয়ে মন ভরে নিয়ে আজ আমরা সতপন্থের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

কিন্তু তোমাদের কাছে ফিরে আসছি না, যাচ্ছি অনামীশৃঙ্গের কাছে। গৌরবময় অনিশ্চয়তা পর্বতারোহণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। খানিকটা ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। তাই তোমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই অজানা পথে যাত্রা করছি। আশা করি, তোমরা আমার এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করবে।

আমাদের জন্য কোনো চিন্তা করো না। অনামীশৃঙ্গের নামকরণ শেষ করে সবাই নির্বিঘ্নে ফিরে আসব তোমাদের কাছে।

আমার প্রাণভরা প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো তোমাদের জন্য।

তোমাদের
অমূল্য।

---

* 'The Valley of Flowers'

॥ দশ ॥

সতপন্থ ফিরিয়ে দিয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে আমাদের অভিযান। দীর্ঘ ছ'মাসের সংগঠন ও তিন সপ্তাহের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব বিফল হয়েছে। সহযাত্রীরা সতপন্থ শিখরের পথ খুঁজে পায় নি। আবহাওয়া ভাল থাকলেও যে পর্বতাভিযান বিফল হতে পারে, আমরা তার সাক্ষী হয়ে রইলাম।

কিন্তু কেন এমন হল ? কেন আমাদের এই চরম পরাজয় ?

অনেক রাত অবধি আমরা সেই আলোচনাই করেছি। আলোচনায় প্রধান অংশ নিয়েছে বীরেন ও প্রফেসর। আমাদের মতো ওরাও সতপন্থকে দেখে নি। কিন্তু এ অঞ্চলের মানচিত্র ওদের নখদর্পণে। ওরা সুইস ফাউণ্ডেশানের বই ও ছবি, অস্‌মাস্টোন এবং অন্যান্যদের মানচিত্র খুলে বসেছিল।

কেন পথ খুঁজে পাওয়া গেল না ? বার বার এই প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পাই নি। সুইস অভিযাত্রীরা ১৮,০০০ ফুটে একনম্বর আর ১৯,০০০ ফুটে দু'নম্বর শিবির করেছিলেন। আমাদের দু'নম্বর শিবির স্থাপিত হয়েছিল ১৮,৫০০ ফুটে। এই পাঁচশ' ফুটের পার্থক্য কেন হল ? সুইস অভিযাত্রীরা সেদিন (৩০শে জুলাই, ১৯৪৭) সকাল ছ'টায় একনম্বর শিবির থেকে বেরিয়েছিলেন। তাঁদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়,—'We approached the foot of the north-westerly ridge, but our path was blocked by impassable walls of red and green gneiss...where rappel was necessary. This seemed all too complicated, so we turned our attention to the other ridge to the right of which the long northerly arete rises to Satopanth which to the left a snowy ridge led us in twenty minutes to a little peak...and decided to pitch Camp-II, 19,000 ft. there...'

তবে সেদিন একনম্বর শিবিরে অর্থাৎ হিমবাহে ফিরে আসার পথে তাঁরা একটু অসুবিধায় পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে নেতা আঁদ্রো রশ বলেছেন,—'We dared not follow the steps we had cut that morning for the slope was being swept by falling stones, loosened by the heat of the sun, so followed the rocks right to the bottom of the slope where there was only 6 or 7 yards of ice to cross.'

তাঁরা মাত্র ছ'সাত গজ বরফ পেরিয়ে হিমবাহে পৌঁছেছিলেন। আর প্রাণেশ ও স্বপন লিখেছে—একটির পর একটি নীলাভ বরফের ঢেউ আর তাদের মাঝে মাঝে অতল গহ্বর। সুইসরা এই নারকীয় হিমপ্রপাতের সম্মুখীন হন নি। হলে তাঁরা ছ'সাত গজ বরফ পেরিয়ে গিরিশিরায় আরোহণ করতে পারতেন না। কাজেই হয় আমরা পথ ভুল করেছি, না হয় হিমপ্রপাতের এই অংশটা ইদানীংকালে অর্থাৎ বিগত একুশ বছরের মধ্যে এমন নারকীয় হয়ে উঠেছে।

পথ ভুল হওয়া খুবই অস্বাভাবিক। কারণ ওরা প্রত্যেকেই যাবার আগে সব কিছু জেনে গেছে। তার ওপর ওদের সঙ্গে মানচিত্র আছে। কাজেই মনে হয় সুইসদের সতপন্থ আরোহণের পরে হিমবাহটির প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে, আর তাই আমাদের এই বিফলতা।

এমনি আলোচনায় রাত গভীর হয়েছে। ওরা একে একে নীরব হয়েছে। হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুম আসে নি আমার চোখে। আমি ঘন আঁধারের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছি। ভেবেছি এই অভিযানের কথা—কলকাতার সেই কর্মক্লান্ত দিনগুলির কথা। কত পরিশ্রমের পর আয়োজিত হয়েছে এই অভিযান। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে দরবার, রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের অসহযোগিতা। দাতাদের দুয়ারে হানা—অর্থ ও রসদের জন্য পাগলের মতো ছুটোছুটি। সবশেষে অভিযাত্রীদের ছুটির সমস্যা।

সব সমস্যার সমাধান হয় নি। তবু আমরা নির্দিষ্ট দিনেই হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হয়েছি। শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছাসহ শুভদিনে যাত্রা করেছি সতপন্থের পথে। পথেও অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সতপন্থ ছাড়া কেউ আমাদের পথরোধ করতে পারে নি। অর্থাভাব বলে একটা দিন বিশ্রাম নিই নি। পর্বতারোহী সদস্যরা একটি মুহূর্ত নষ্ট করে নি। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করে তারা ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়েছে। জীবনসংশয় করে পথ খুঁজেছে।

পায় নি—তারা সতপন্থের শিখরের পথ খুঁজে পায় নি। সতপন্থ প্রত্যাখ্যান করেছে—ফিরিয়ে দিয়েছে আমাদের। বীরেন ও ডাক্তারবাবুর স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে। সকল আশা বৃথা হয়েছে, আমাদের সতপন্থ অভিযান বিফল হয়েছে।

সতপন্থ! না, আর সতপন্থ নয়। আমি ভাবছি সহযাত্রীদের কথা—অমূল্য, সুজল, স্বপন, প্রাণেশ, হিমাদ্রি, করুণা, অসিত ও জামিদ সিং-য়ের কথা। ভাবছি শেরপাদের কথা। যারা জীবনসংশয় করে সতপন্থ শিখরে আরোহণ করতে চেয়েছিল। পারে নি, ওরা পারে নি। প্রাণপণ সংগ্রাম করে পরাজিত হয়েছে। সফলতার শুভলগ্নের চেয়ে বিফল মুহূর্তের মূল্য অনেক বেশি। সে-সময়ে কাছে থাকলে হয়তো ওদের একটু শান্তি দিতে পারতাম। ওদের ব্যর্থতার গ্লানিকে খানিকটা মুছে দিতাম। কিন্তু আমরা যে ওদের থেকে বহু দূরে!

রাত পোহালে যে ওদের কাছে যাব, তারও উপায় নেই। ওরা গতকাল সতপন্থ অভিযানের এক নম্বর শিবির ভেঙে অনামীশৃঙ্গের পথে যাত্রা করেছে। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও মাত্র তিনদিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে গেছে। সেতীরাম ও জয় বাহাদুর ছাড়া অন্য সব কুলিদের কাল ওরা রেখে দিয়েছে। তাদের নিয়েই যাত্রা করেছে অনামীশৃঙ্গের পথে। আজ সকালেই শৃঙ্গারোহণের চেষ্টা করবে। আজ ১৯শে সেপ্টেম্বর।

গোমুখী ও চতুরঙ্গী শিবিরের কুলিরা আজ এখানে আসবে। তারা জয় বাহাদুর ও সেতীরামের সঙ্গে পরিত্যক্ত এক নম্বর শিবিরে রওনা হবে। অমূল্যরা অপ্রয়োজনীয় মালপত্র রেখে গেছে সেখানে। কুলিরা সেগুলি সব নিয়ে আসবে এখানে।

ওরা কোন্ পথে অনামীশৃঙ্গের দিকে গেছে জানি না। কোথায় শিবির করেছে তাও জানি না। কাজেই এখানে ফিরে আসার আগে আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে না।

তাই ওদের জন্য দুশ্চিন্তা করা ছাড়া আমাদের এখন আর কিছু করার নেই। সারারাত ধরে তাই করেছি। ঘুম আসেনি আমার চোখে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভেবেছি—কখন এই কালরাত্রির অবসান হবে! প্রভাতের পরশ হয়তো আমাকে সেই দুঃসহ দাহ থেকে মুক্তি দিতে পারবে।

কিন্তু হিমালয়ের রাত যে বড়ই দীর্ঘ। তার ওপর দুঃখের রাত্রি তো সহজে ফুরায় না! দীর্ঘ রাত দীর্ঘতর হয়েছে। আমি শুয়ে শুয়ে অগ্রগামী সহযাত্রীদের কথা ভেবে চলেছি।

ব্যর্থতার গ্লানি বুকে বয়ে অনামীশৃঙ্গের পথে যাত্রা করেছে তারা। ওদের মানসিক অবস্থা

অভিযানের অনুকূলে নয়। অথচ মনোবলই পর্বতাভিযাত্রীর সকল শক্তির শ্রেষ্ঠ উৎস। এই মানসিক অবস্থায় ওরা পারবে কি অনামীশৃঙ্গে আরোহণ করতে? না পারলেও দুঃখ করব না। কিন্তু যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে? অচেনা-অজানা শৃঙ্গ, ক্লান্ত ও অবসন্ন অভিযাত্রীদল!

তাই সারারাত ধরে ওদের কথা ভাবছি। সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। এখনও সে ভাবনা শেষ হয় নি, বরং বেড়েছে। ওদের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অমর রায়ের ভাবনা। সেই সঙ্গে অণিমাদি ও গৌরাঙ্গর ভাবনা। তিনটি জীবন-তরঙ্গের কাহিনী।

সাগরে কত তরঙ্গ, মাটিতে কত মানুষ! তরঙ্গ আসে, আছাড় খায়, মুছে যায়। মানুষ জন্ম নেয়, সে সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে—সে একদিন চলে যায়। চিরস্থায়ী নয়। তবু সাগর-সৈকতে দাঁড়িয়ে এমন দু'একটি তরঙ্গ চোখে পড়ে, যা মনে দাগ কাটে। মাটির এ পৃথিবীতেও অমন দু'একজন মানুষ আসে, যাদের কথা বহুদিন মনে থাকে। অনিমা সেন, গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও অমর রায় তাদেরই তিনজন।

মাটির পৃথিবীকে ভালোবেসেছিল তারা। বিশ্বের বৈচিত্র্য খুঁজতে গিয়ে তারা বৈচিত্র্যময় হিমালয়ের পথে শহীদ হয়েছে।

প্রথম শহীদ হয়েছে অণিমাদি। ১৯৬৪ সালে কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম গিরিখাত ট্রেল্‌স পাস (১৭,৭০০´) অতিক্রম করতে চেয়েছিল সে। অন্যান্যদের মধ্যে অমূল্য, অসিত, রণেশদা ও দাশরথি তার সঙ্গে ছিল। তারা গৌরীগঙ্গা উপত্যকা থেকে পিণ্ডারী উপত্যকায় উপনীত হতে চেয়েছিল।

পারে নি। অণিমাদি ও তার সহযাত্রীরা ট্রেল্‌স পাস অতিক্রম করতে পারে নি। প্রচণ্ড ঝড়, প্রবল তুষারপাত, ভূমিকম্প, খাদ্যাভাব ও কুলিদের অসহযোগিতার জন্য সেই পদযাত্রা বিফল হয়। তারা ১৬,৩০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

ফেরার পথে ২রা অক্টোবর (১৯৬৪) সন্ধ্যা ছ'টা দশ মিনিটের সময় শহীদ হয় অণিমাদি। হিমালয়ের পথে প্রথম ভারতীয় মহিলা শহীদ। লিলাম পুলিশ ব্যারাক থেকে মাইলখানেক আগে, মাত্র ৬,০০০ ফুট উঁচুতে একটা ধস পেরোবার সময় পথের পাশের খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে হঠাৎ একখানি পাথর তার মাথায় পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পথের বুকে লুটিয়ে পড়ে অণিমাদি। হিমালয়দুহিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে হিমালয়ের বুকে। ম্যাডান কোগানের সঙ্গে অণিমা সেনগুপ্তার নামও স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হল পর্বতারোহণের ইতিহাসে।

অণিমাদির পরে আমরা হিমালয়ে হারিয়েছি গৌরাঙ্গ চৌধুরীকে, আমাদের সোনার গৌরাঙ্গকে। পুণার পর্বতারোহী ডাক্তার জি আর পটবর্ধনের সঙ্গে গঙ্গোত্রী-১ (২১,৮৯০´)* শৃঙ্গাভিযানে অংশ নেয় গৌরাঙ্গ।

এই অভিযানকালে ২১শে জুন (১৯৬৫) সকালে তিন নম্বর শিবির (১৯,০০০´) থেকে নিখোঁজ হয় গৌরাঙ্গ। তখন সেই শিবিরে কেবল মিনজুর নামে একজন শেরপা ছিল। মিনজুর বলেছে—তার কয়েকদিন আগে গৌরাঙ্গ তুষারান্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন সে তাকে নিচে নেমে

---

* তিনটি শিখর নিয়ে গঙ্গোত্রী শৃঙ্গমালা। দুই ও তিন নম্বর শিখর দুটির উচ্চতা যথাক্রমে ২১,৬৫০ ও ২১,৫৭৮ ফুট। ১৯৫২ সালে এক ব্রিটিশ অভিযাত্রীদল এক ও তিন নম্বর শিখর দুটিতে আরোহণ করেন। আর দু' নম্বর শিখরটিতে সর্বপ্রথম আরোহণ করেন গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযাত্রীদল।

যেতে বলেছিল। কিন্তু গৌরাঙ্গ রাজী হয় নি। যাই হোক্, সেদিন সকালে গৌরাঙ্গ বেশ সুস্থ ছিল। তাই সে শিখরের দিকে এগিয়ে যেতে চলেছিল।

মিনজুর বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, 'আপনি অসুস্থ। চলুন, নিচে নেমে যাই।'

'না।' গৌরাঙ্গ গর্জে উঠেছিল, 'নেমে গেলে সবাই আমাদের কাপুরুষ বলবে। বলবে, আমরা ভয় পেয়েছি। আমার চোখের জন্য চিন্তা করো না তুমি। চোখ আমার ভাল হয়ে গেছে। তুমি একটু দাঁড়াও এখানে, আমি একবার সেই বিপজ্জনক জায়গাটার ছবি নিয়ে আসি। দেখে আসি শিখরের অন্য কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা। আমি আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।'

সে আধঘণ্টা আজও শেষ হয় নি, কোনদিনও হবে না। ১৯৬৫ সালের ২১শে জুন সকাল ছ'টার সময় কাঁধে ক্যামেরা ও হাতে আইস এক্স নিয়ে গৌরাঙ্গ সেই যে শিবির থেকে বেরিয়ে গেছে, আর সে ফিরে আসে নি। আর্ভিন ও ম্যালোরির মতো গৌরাঙ্গ চৌধুরীও চিরতরে হারিয়ে গেছে। তবে তাঁদের মতো তাকেও চিরকাল খুঁজে পাওয়া যাবে পর্বতারোহণের ইতিহাসে, দুঃসাহসী তরুণদের তালিকায়।

গৌরাঙ্গর পরে অমর—অমর রায়। যে অমরের কথা এই শিবিরে আসার পর থেকে প্রতিদিন মনে করেছি। কারণ যে শৃঙ্গের পাদদেশে আমাদের এই শিবির, সেই ভাগীরথী-২ শিখরে আরোহণ করতে গিয়েই শহীদ হয়েছে অমর। এইখানেই শিবির হয়েছিল ওদের। সতপন্থ শিখরে আরোহণ করতে না পেরে ওরা এসেছিল এখানে। পরাজিত অভিযাত্রীরা ভাগীরথী-২-কে দেখে লোভ সামলাতে পারে নি। দুর্বল দেহ নিয়েও তারা এগিয়ে গিয়েছিল দুর্গম শিখরের দিকে। শহীদ হয়েছে অমর। অমরের সেই অমরত্বলাভের কথা আজ বড় বেশি করে মনে পড়ছে।

লেখাপড়ায় মোটামুটি মন্দ ছিল না অমর। কিন্তু খেলাধূলা ও নৌকা বাওয়ায় তার জুড়ি পাওয়া যেত না। কলেজ স্পোর্টস ও স্বাস্থ্যশ্রী প্রতিযোগিতায় অমর অনেক পুরস্কার পেয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবের সে একজন নামকরা সদস্য ছিল। এই রোয়িং ক্লাবেই তার সঙ্গে একদিন অমূল্যর পরিচয় হয়। অমূল্যর কাছ থেকে পর্বতাভিযানের কাহিনী শুনে অমর পর্বতারোহণে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তারই পরামর্শে সে বেসিক ট্রেনিং নিতে দার্জিলিং যায়। কথা ছিল, তারপর এড্‌ভান্স ট্রেনিং নেবে। কিন্তু সে সুযোগ পাবার আগেই অমর চতুরঙ্গী অভিযানে যোগদান করার সুযোগ পায়।

পর্বতাভিযানের আমন্ত্রণ যে কোনো পর্বতারোহীর পরম পুরস্কার। অমর সানন্দে সুজিত বসুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। যশোহর নিবাসী বৃদ্ধ পিতার কাছে অভিযানে যোগদান করার অনুমতি চেয়ে পাঠায়। পিতা নিষেধ করেন না, তবে পর্বতাভিযানের বিপদ সম্পর্কে পুত্রকে সতর্ক করে দেন। হয়তো বা পিতার মনে কোনো আশঙ্কা দেখা দিয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি জানতেন দুঃসাহসী পুত্রের জনক হলে সে-সব আশঙ্কাকে আমল দিতে নেই। শাস্তি যা পাবার তা পেতেই হবে। অণিমাদি ও গৌরাঙ্গের বৃদ্ধ পিতাদের সঙ্গে তিনিও সেই একই শাস্তি ভোগ কবে চলেছেন। তবে বীরপুত্রের জনক হতে পারা পরম সৌভাগ্য। সেদিক থেকে সৌভাগ্যবান তাঁরা।

খবরে প্রকাশ—চতুরঙ্গী অভিযাত্রীরা ৮ই অক্টোবর (১৯৬৬) মূল শিবির স্থাপিত করে। তারা প্রথমে সতপন্থ শিখরে আরোহণ করতে চায়, পারে না। ফেরার পথে তারা ভাগীরথী-২ শিখরে অভিযান চালায়। ২২শে অক্টোবর সকালে অমর, গোবিন্দরাজ, শেরপা গিয়ালবু

ও কারমা শেষ শিবির থেকে যাত্রা করে। বিকেল পাঁচটার সময় তারা শিখরে পৌঁছায়।

সফলকাম অভিযাত্রীরা আধঘণ্টা শিখরে অতিবাহিত করে নামতে থাকে। আঁধার ঘনিয়ে আসে, হাওয়ার বেগ বেড়ে ওঠে, শুরু হয় তুষারপাত। একই দড়িতে নিজেদের বেঁধে খাড়া গিরিশিরা বেয়ে তারা নিচে নামতে থাকে। হঠাৎ কারমার পা ফসকায়। সে ছিল সবার পেছনে। পেছনের আকস্মিক টান সামালাতে পারে না আগের তিনজন। সবাই গড়িয়ে পড়ে—প্রায় তিন হাজার ফুট নিচে একটা গভীর খাদে। সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হয় অমর, তারপর গিয়ালবু। সারারাত ধরে মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে কারমা, চিৎকার করে গোবিন্দরাজ। কিন্তু কেউ তাদের মুখে এক ফোঁটা জল ঢেলে দেয় না। তারা সেইভাবে সেখানে সারারাত পড়ে থাকে। কারমার জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসে। পরদিন সকালে সে-ও অমরলোকে যাত্রা করে।

সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েও গোবিন্দরাজ শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে। ভারতীয় পর্বতারোহণের বৃহত্তম দুর্ঘটনার একমাত্র জীবিত অভিযাত্রী—ভাগীরথী-২ শিখর বিজয়ের সাক্ষী।

আমি কিন্তু অমরের কথাই ভাবছি, ভাগীরথী-২ আরোহণের কথা নয়। সতপন্থ ফিরিয়ে দেবার পর ভাগীরথী-২ শিখরে আরোহণ করতে এসে সে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে—শহীদ হয়েছে। আমার সহযাত্রীরাও সতপন্থের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার পরে আশাহত মন নিয়ে অবসন্ন দেহে এগিয়ে গেছে অনামীশৃঙ্গের দিকে। আজ তাদের শৃঙ্গে আরোহণ করার কথা। পারবে কি? তারা পারবে কি সেই অজানা ও অচেনা দুর্গম শিখরে উঠতে? না পারুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি তেমনি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে? আমাদের কেদারনাথ পর্বতাভিযান ছাড়া এ অঞ্চলের প্রতিটি ভারতীয় অভিযানে দুর্ঘটনা ঘটেছে। গতবছর ঘটে নি বলে এবারেও যে ঘটবে না তার কি মানে আছে? আর গতবছর নেহাৎ বরাতজোরে প্রাণেশ, সুজল ও শেরপারা সেই তুষার-ঝড়ের ভেতর থেকে ফিরে আসতে পেরেছে। এবারে যদি না পারে? আর ভাবতে পারি না। ভাবতে চাই না।

কিন্তু ভাবনা তো চাওয়ার প্রত্যাশী নয়। বিশেষ করে, প্রকৃতি যেখানে দুর্ভাবনার সঙ্গী। কাল থেকেই মেঘলা করে ছিল। সহসা বৃষ্টি নামল। এখানে বৃষ্টি, ওপরে তুষারপাত। নতুন তুষারে পথ যে আরও দুর্গম হয়ে উঠবে! ওরা কেমন করে অনামীশিখরে আরোহণ করবে?

নির্দয়া প্রকৃতি। আজ যখন আমাদের ভাল আবহাওয়ার একান্ত প্রয়োজন, তখনই সে এমন বিগড়ে বসল। ৩১শে আগস্ট আমরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি, আর আজ ১৯শে সেপ্টেম্বর। বিশ দিন বাদে বৃষ্টি পেলাম। কিন্তু পেলাম সেদিন, যেদিন বৃষ্টি আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে।

"সাব চায়!" টিকারাম বেড-টি নিয়ে এসেছে। টিকারাম সবই শুনেছে। সে আমাদের দুঃখের অংশীদার। তবু সে নির্বিকার। আজও অন্যদিনের মতো একই সময়ে বেড-টি নিয়ে এসেছে। এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—পর্বতাভিযানে ভাবাবেগের কোনো স্থান নেই। সাফল্যের মতো ব্যর্থতায়ও অবিচলিত থাকতে হয় পর্বতাভিযাত্রীকে। স্থির চিত্তে প্রত্যেককে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি। টিকারামের হাত থেকে গরম চা-য়ের মগটা নিই। সঙ্গীদসাহেব, দিলীপ, ডাক্তারবাবু, প্রফেসর, বীরেন, বরেণ্য—সবাই উঠে বসে; চা নেয়, চুমুক দেয়। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না। সবার সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে।

না, যায় নি। আমরা কথা না বললেও কথা বলে টিকারাম। সে বরেণ্যকে জিজ্ঞেস করে, "সাব, আজ কেয়া খানা হোগা ?"

রোজ সকালে যে প্রশ্ন করে আজও সেই একই প্রশ্ন করছে টিকারাম। যেন কিছুই হয় নি। গতকাল সকালের সঙ্গে আজ সকালের কোনো পার্থক্য নেই। সাবাস টিকারাম, সাবাস হিমালয়ের সরল ও দরদী মানুষের দল ! তোমাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টিটা কমে এল। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টিভেজা হিমালয়, ভারী সুন্দর। কিন্তু এখন সৌন্দর্য উপভোগের সময় নয়। স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে চারিদিক, কোথাও কোথাও জল জমেছে। রান্নাঘরে আসি। টিকারাম রান্না করছে, ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে। রাম বাহাদুর তাকে সাহায্য করছে। সেতীরাম ও জয় বাহাদুর বসে আছে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউ কথা বলে না।

আমরাও নীরবে নিষ্ক্রান্ত হই সেখান থেকে। কুলিদের তাঁবুতে আসি। কেউ নেই। ওরা চারজন ছাড়া এ শিবিরের সব কুলিরা কাল ওপরে চলে গেছে। চতুরঙ্গী থেকে কুলিরা এলে সেতীরাম ও জয় বাহাদুর তাদের নিয়ে যাবে সতপন্থের এক নম্বর শিবিরে। পরিত্যক্ত রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসবে।

এ তাঁবুতেও জল পড়ে দেখছি। আমাদের তাঁবুতে তো অনেক জায়গা দিয়েই জল পড়ে। পৌনে সতেরো হাজার ফুট উঁচুতে যদি তাঁবুর ভেতরে জল পড়ে, কি হয় ? আমাদের যা হয়েছে। সব ভিজে যায়, শীতে হি হি করে কাঁপতে হয়।

নিচ থেকে কুলিরা আসে। তারা চা ও জলখাবার খেয়ে সেতীরাম ও জয় বাহাদুরের সঙ্গে ওপরে রওনা হয়ে যায়।

সঈদ আমেদ ইঁদুরের শট্ নিচ্ছেন। জয় বাহাদুর নেই, কাজেই বরেণ্য তাঁকে সাহায্য করছে। জীবন্ত অবস্থায় সবক'টি ইঁদুরের ছবি নেবার এই শেষ সুযোগ। একটু বাদেই ডাক্তারবাবু সেই নিষ্ঠুর কর্মটি সম্পন্ন করবেন—ছ'টি ইঁদুরকে কেটে-কুটে তাদের দেহের অংশগুলি ওষুধে ভিজিয়ে বোতলে ভরে বাঁকুড়ার লেবরেটরীতে নিয়ে যাবেন। বাকি ইঁদুর ছ'টি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে। উভয় দলের দেহাংশ নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা করবেন ডাক্তারবাবু। তাঁর রিপোর্ট থেকে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হবে।

কিন্তু তা যে ঐ নিরপরাধ প্রাণীদের প্রাণের বিনিময়ে ! আজ বিশ দিন হল ওরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। রেলে, বাসে, হাঁটাপথে জানা-অজানা মানুষের কত কৌতূহল তাদের নিয়ে ! মালবাহকদের অবসর-বিনোদনের বিষয় তারা। ওরা আমাদের অভিযানের সদস্যে পরিণত। সেই সদস্যদের ছ'জনকে আজ হত্যা করা হবে।

হত্যা ? না, এ হত্যা নয়, এ যে আত্মাহুতি। মানুষের মঙ্গলের জন্য, জগতের উন্নতির জন্য, সভ্যতার অগ্রগতির জন্য, যুগে যুগে দেশে দেশে প্রতিনিয়ত এমন আত্মাহুতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ! হতে পারে যে, এই মূষিকরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করছে না, আমরা তাদের মেরে ফেলছি। কিন্তু তা কেবল ওরা অবুঝ ও বাক্যহীন বলে। ওরা যদি আমাদের কথা বুঝতে পারত, যদি কথা বলতে পারত, তাহলে কি আজ এই আত্মদানে আপত্তি করত ?

না। মৃত্যুভয় তো মানুষকে কখনও কোনো মহৎ প্রচেষ্টা থেকে বিরত করতে পারে নি !

ডাক্তারবাবুর আশা কিন্তু অপূর্ণ রইল। মূষিক-নিধন-পর্ব সম্পন্ন করা সম্ভব হল না আজ। আবার মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। ডাক্তারবাবু অবশ্য বলেছিলেন তাঁবুর ভেতরে বসে তাঁর কাজ

সারবেন। কিন্তু সঈদ সম্মত হন না। তিনি ছবি নিতে পারবেন না—তাঁবুর ভেতরে আলো খুবই কম। সঈদ ডাক্তারবাবুকে বলেন, "কালকের দিনটা তো আমরা নিশ্চয়ই এখানে আছি। দেখা যাক্ না, কাল আবহাওয়া ভাল হয় কিনা!"

তাই সাব্যস্ত হয়। আগামীকাল মূষিক-নিধন-পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। কেবল তাই নয়, প্রফেসর মুখার্জীরও মাইক্রোস্‌কোপের কিছু পরীক্ষা বাকি আছে, তাও কাল হবে। অতএব আজ বিশ্রাম।

কিন্তু নিশ্চিন্ত অবকাশ যাপন নয়। ওপরের জন্য বড়ই চিন্তা হচ্ছে। এখানেই যখন এমন আবহাওয়া, ওপরের কি অবস্থা কে জানে! আজ ওদের অনামীশৃঙ্গে আরোহণের কথা। পারবে কি?

বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু দুর্যোগ থামল না, বরং বাড়ল। শুরু হল তুষারপাত। সাবুদানার চেয়ে একটু বড় বড় তুষারকণা ঝরছে অজস্র ধারায়। ধূসর মাটি, কালো পাথর আর সবুজ তৃণভূমি ধীরে ধীরে সাদা হচ্ছে।

তুষারপাত দেখে সঈদ খুব খশি হলেন। হরশিলে পদযাত্রা শুরু হবার পর থেকেই তিনি তুষারপাতের প্রতীক্ষা করছেন। পর্বতাভিযানের চলচ্চিত্রে তুষারপাতের দৃশ্য সংযোজিত না হলে যে চিত্রপ্রযোজনাই ব্যর্থ! খোদাতাল্লা তাঁকে দোয়া করেছেন, হিমালয় তাঁর মান রেখেছে—তুষার পড়ছে। তাড়াতাড়ি ক্যামেরা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যান সঈদ আমেদ।

তুষারকণা আর পড়ছে না। তবে তুষারপাত বন্ধ হয়নি। পেঁজা তুলোর মতো কোমল তুষারধারা পড়ছে। পড়ছে আইস-ফ্লেক্স—অবিশ্রান্ত ধারায়। রঙ বদলের যে পালা শুরু হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে, এখন তার বেগ বেড়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু সাদা হয়ে যাচ্ছে।

আর সঈদ আমেদ ছবি নিচ্ছেন, প্রাণভরা ছবি নিচ্ছেন। মাঝে মাঝে ফিল্ম পালটাতে তাঁবুতে আসছেন। তখন কোনো প্রশ্ন করলে সেই একই উত্তর দিচ্ছেন, "ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল শট্‌স্!" তারপর ফিল্ম ভরে নিয়ে আবার চলে যাচ্ছেন বাইরে।

সঈদ ক্যামেরাম্যান। ভাল সাবজেক্ট পেয়ে তিনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না। এই আকস্মিক তুষারপাতকে স্বাগত জানাতেও পারি না। সহযাত্রীরা রয়েছে ওপরে—অচেনা ও অজানা পরিবেশে। আজ তাদের চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার কথা। যদি সে সংগ্রামও বিফল হয়?

হলে আর কি করব! মানুষের সাধ্য কি হিমালয়ের ইচ্ছাকে অস্বীকার করে, খেয়ালী প্রকৃতিকে বশে আনে! অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট যেন বড়ই মন্দ। যেদিন আমাদের সবচেয়ে ভাল আবহাওয়া প্রয়োজন, সেদিনই কিনা শুরু হল দুর্যোগ!

টিকারাম ও রাম বাহাদুর লাঞ্চ নিয়ে তাঁবুতে ঢোকে—খিচুড়ি ও মটরশুঁটির চচ্চড়ি। আলু ফুরিয়ে গেছে। তবে এখনও কয়েকটা চাটনির শিশি ও ফলের টিন অবশিষ্ট আছে।

ঘড়ির দিকে তাকাই—সাড়ে বারোটা বাজে। নির্ভুল টিকারাম। মানসিক অবস্থা যাই হোক, যতই দুর্যোগ ঘনিয়ে আসুক, তার সময় ঠিক আছে। সে যথাসময়ে খাবার নিয়ে এসেছে। আমরা খেতে শুরু করি।

কিন্তু শেষ করতে পারি না। বাইরে কোলাহল। মানুষের কণ্ঠস্বর। রাম বাহাদুর তাঁবুর দরজা দিয়ে গলা বাড়ায়। তারপর বলে, "সাব, আদমী!"

আমরা খাওয়া ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসি। ঠিকই বলেছে রাম বাহাদুর। মানুষ! মানুষ এসেছে, মানুষ আসছে! একজন নয়, দুজন নয়, অনেক মানুষ—সারি সারি মানুষ। ওপর

থেকে নয়, নিচে থেকে—অপরিচিত মানুষের দল।

এরা কারা ? কলকাতা থেকে আরও দু'দল যাত্রীর এবার কালিন্দীখাল দর্শনে যাবার কথা, তাঁদের কেউ কি ?

না, তাঁরা কেউ নন। এঁরা ইন্ডো-টিবেট বর্ডার পুলিশ, সংক্ষেপে আই. টি. বি. পি.। তবে এঁরাও কালিন্দীখালেই যাচ্ছেন। যাচ্ছেন গোমুখী থেকে বদ্রীনাথ।

করমর্দন করে সেই কথাই বললেন ওঁদের দলনেতা শ্রীত্রিপাঠী। বললেন, "আমাদেরই মতো আরও একদল রওনা হয়েছে বদ্রীনাথ থেকে গোমুখী। তাদের সঙ্গে আমরা কালিন্দীখালের ওপর মিলিত হব।"

"ভালই হল আপনাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে। বরফ পড়ছে, চলুন ভেতরে যাওয়া যাক্!"

"হ্যাঁ, চলুন। আপনাদের কষ্ট হবে, তবু আমরা নিরুপায়। কারণ আমাদের তাঁবু রয়েছে কুলিদের কাছে, তারা অনেক পেছনে।"

"না, না, কষ্টের কি আছে ! চলুন আমাদের তাঁবুতে।" আমরা ওঁদের নিয়ে তাঁবুতে আসি।

কষ্ট কিন্তু একটু হয়। ওঁরা সংখ্যায় অনেক, তিনজন অফিসার ও জন বারো কনস্টেবল। একজন অফিসার পাঞ্জাবী শিখ আর ত্রিপাঠী ও আরেকজন অফিসার উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী। কনস্টেবলরা সকলেই পাহাড়ী, কয়েকজন শেরপাও আছে। পর্বতময় সীমান্ত এলাকা সংরক্ষণের প্রয়োজনে গঠিত হয়েছে এই বাহিনী কাজেই। পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই শেরপারা যোগদান করেছে। আমাদের শেরপা লাকপা কিছুকাল এই বাহিনীতে কাজ করেছে। কিছুদিন হল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কারণ খাবার ভাল নয়। লাকপা পেটুক মানুষ।

যাক্‌গে সেকথা। এখন ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাক্। সত্যিই ওঁদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তাঁবুর অর্ধেক জিনিসপত্রে বোঝাই। হাত-পা মেলে সবার বসার জায়গা হচ্ছে না। খুবই কষ্ট করে বসেছেন ওঁরা।

একটু বাদে টিকারাম কফি নিয়ে আসে। বরেণ্য বিস্কুট বের করে। ওঁরা কফি খেতে শুরু করেন, আমরা অবশিষ্ট খিচুড়ির সদ্ব্যবহার করি।

কথায় কথায় ওঁরা নিজেদের দুরবস্থার কথা আমাদের বলেন। পনেরোজন কর্মচারীর এই দুর্গম পদযাত্রার জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার অঙ্ক শুনে বিস্মিত হই।*

ওঁদের দুরবস্থায় স্বভাবতই আমরা বিচলিত হই। তাই যথাসাধ্য সাহায্য করি—কফি, দুধ, বিস্কুট, দেশলাই ও সিগারেট দিই। ওঁরা বার বার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দেন আমাদের।

কিছুক্ষণ বাদে কুলিরা আসে। তারা তাঁবু টাঙায়। কিন্তু সে তাঁবু সদস্যদের। কুলিদের কোন তাঁবু নেই। কাজেই আমাদের কুলিদের তাঁবুতে তারা আশ্রয় নেয়। এজন্য শ্রীত্রিপাঠী আমাদের আবার ধন্যবাদ দেন।

---

* পরে অবশ্য এঁদের কমান্ডান্টের কাছে শুনেছি, এইসব পদযাত্রার মাধ্যমে এঁদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। আলোচ্য পদযাত্রায় ওঁদের কোন মালবাহক নেবার কথা ছিল না। আদেশ ছিল ওঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ মাল বহন করবেন। যে টাকাটা মঞ্জুর হয়েছিল, সেটা কেবল ওঁদের খাওয়া খরচ। কিন্তু ওঁরা সে নির্দেশ পালন না করে মালবাহক নিয়োগ করেছিলেন। ফলেই ওঁদের অর্থাভাব ঘটেছিল।

কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে খেয়াল করি নি। খেয়াল হয় প্রফেসরের কথায়। প্রফেসর জিজ্ঞেস করে, "আমরা কি আজ আর বাইরে বের হব না?"

"বাইরে বরফ পড়ছে।" বরেণ্য উত্তর দেয়।

"তাই তো যেতে চাইছি।" প্রফেসর বলে, "ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশে যেদিন বছরের প্রথম বরফ পড়ে, সেদিন সবাই বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে।"

ক্যাম্প-সু পড়ে আমরাও বেরিয়ে আসি তাঁবুর বাইরে। সত্যিই সুন্দর। অবিশ্রান্ত ধারায় তুষার ঝরছে। তুষার নয়, যেন থোকা থোকা সাদা ফুল। প্রকৃতি পুষ্পবৃষ্টি করছে। কিন্তু কেন? ওরা কি আরোহণ করেছে অনামী শিখরে?

করবে কেমন করে? এখানে এই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে যাকে পুষ্পবৃষ্টি বলে মনে হচ্ছে, তা যে সেখানে মত্তহস্তীর ধ্বংসলীলা নয়, বলব কেমন করে?

না, আর ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না। দুর্ভাবনার শেষ নেই। তার চেয়ে এখানকার কথাই ভাবা যাক্।

প্রফেসর বরফের বল বানিয়ে গায়ে ছুঁড়ে মারছে। আমরাও হাত লাগাই। খেলাটা বেশ জমে ওঠে।

কিছুক্ষণ বাদে প্রফেসর খেলার ধরন পালটায়। সে "স্নো-ম্যান" বানায়, আমরা তাকে সাহায্য করি। ছেলেমানুষিতে মেতে উঠি আমরা। ভাগ্যিস ছেলে-মেয়েরা এখানে নেই।

একজন কিন্তু যোগ দেয় নি এই ছেলেখেলায়—বীরেন। আমাদের সম্পাদক এবং প্ল্যান-মেকার বীরেন সরকার। কাল দুঃসংবাদ আসার পর থেকে সে কেবলই ম্যাপ দেখেছে আর বই পড়ছে। সেই একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে বীরেন—কেন পথ পেল না ওরা?

দু হাত ভরে ঝুরো বরফ নিয়ে প্রফেসর তাঁবুতে ঢোকে। বীরেনের দিকে এগিয়ে যায়। বই ফেলে উঠে দাঁড়ায় বীরেন। সভয়ে বলে, "আরে আরে, কি করছেন?"

"আপনার গায়ে আর স্লীপিং-ব্যাগে বরফ দিয়ে দিচ্ছি।"

"সে কি! শীতে কষ্ট পাব যে!"

"তাই তো দিতে চাইছি।" প্রফেসর ঘোষণা করে।

"আমার অপরাধ?" বীরেন প্রশ্ন করে।

"আপনি আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ না দিয়ে তাঁবুতে বসে আছেন।"

"আমার ভাল লাগছে না।"

"তাই বরফ নিয়ে এসেছি।" প্রফেসর হাত উঁচু করে।

হাতজোড় করে বীরেন, "প্রফেসর, প্লীজ....."

"তাহলে বাইরে চলুন!"

"চলুন।"

ত্রিপাঠীর সহযাত্রীরা বেতার-যন্ত্র চালু করেন। তাঁরা টিহরীর সঙ্গে কথা বলছেন। টিহরীতে ওঁদের কমাণ্ডাণ্ট অফিস। আমাদের খবরও দিয়ে দেন ওঁরা। ওঁদের টিহরী অফিস খবরটা টেলিফোনে উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনকে জানিয়ে দেবেন।

খবর আসে, ওঁদের যে দল বদ্রীনাথ থেকে গোমুখীর পথে রওনা হয়েছিলেন, তাঁদের দুজনের তুষারক্ষত হয়েছে। আহতদের পিঠে করে নিয়ে আসা হচ্ছে।

খবরটা শুনে ডাক্তারবাবু বলেন, "তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আসতে বলুন, আমার কাছে সব রকমের ওষুধ আছে।"

ওঁরা তাই বলেন।

তুষারপাত থেমে গেছে। বোধ হয় আর প্রয়োজন নেই বলেই থেমে গেছে। যেদিকে তাকানো যায়—সাদা। সাদা ছাড়া আর কোনো রঙ নেই। তাঁবু সাদা, প্যাকিং বাক্স সাদা, পাথর সাদা, প্রান্তর সাদা, ঝরণা সাদা, গিরিশিরা সাদা, পাহাড় সাদা। সঈদ বেরিয়ে এসে বলেন, "ওয়াণ্ডারফুল !"

সত্যিই তাই। সুন্দর—অদ্ভুত সুন্দর ! কিন্তু এ সৌন্দর্যে মোহিত হতে পারি না। এখানেই যখন এত বরফ পড়েছে, তখন ওপরে না জানি কি অবস্থা !

না, সে অবস্থার কথা আজ কিছুতেই জানা যাবে না। আজকের খবর আসবে কাল। আরও একটা দিন উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে কাটাতে হবে। তবে আশা করছি আজ একটা খবর আসবে—গতকালের খবর। সতপন্থ অভিযানের এক নম্বর শিবির থেকে অনামীশৃঙ্গের পাদদেশে শিবির স্থাপনের কাহিনী।

সে আশা পূর্ণ হয়। সন্ধ্যার আগেই খবর আসে—করুণাময়ের লেখা—

'দু দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি—তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি সতপন্থের উত্তর-পূর্ব গিরিশিরায় উঠবার একটি সহজ সরল নিরাপদ পথ। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে আমাদের সব প্রচেষ্টা। সতপন্থকে ঘিরে রয়েছে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিরোধ পরিখা। প্রতি পদক্ষেপে ওখানে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ, অসংখ্য অন্তহীন গহ্বর, তুষার-সম্প্রপাত, ধস আর প্রস্তর পতন।

গভীর হতাশা নিয়ে ফিরে এলাম এক নম্বর শিবিরে। পরিত্যক্ত হল সতপন্থ অভিযান। ওখানে আমাদের অপেক্ষায় ছিল অসিতদা, হিমাদ্রি, জামিদ আর সঈদ।

আমরা জানতাম সতপন্থ কঠিন, দুর্গম—কিন্তু এত সহজে আমরা পরাজিত হব ভাবি নি। পরাজয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কোন অভিযাত্রীই হয়তো ভাবে না। সতপন্থের দুর্বার আকর্ষণে আমরা ছুটে এসেছিলাম ওর বিচিত্র, দুর্গম, শান্ত, স্তব্ধ মায়ার রাজ্যে—সমস্ত বাধা বিপদ আর মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে। সতপন্থ আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে শুধু হাতে।

সুন্দর শিবিরের কাছাকাছি আসতে বন্ধুরা এগিয়ে এল। হাসিমুখে জড়িয়ে ধরল আমাদের—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওদের হাসিমুখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিষণ্ণতার কালোছায়া। ওরা এতদিন গভীর উৎকণ্ঠায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছে। আমরা এগিয়ে যাব, ওরা পেছন থেকে আমাদের মদৎ দেবে—রসদ যোগাবে। অভিযানের এই-ই রীতি। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয় নি। এগিয়ে যাবার পরিবর্তে এখন আমরা ফিরে চলেছি।

রাতে ঘুম আসে না। স্লীপিং-ব্যাগের মধ্যে ছটফট করতে থাকি। চেয়ে থাকি অন্ধকারের মধ্যে। গত দুদিনের ঘটনাগুলি মনের কোণে ভিড় করে। বাসুকিতে, অর্থাৎ আমাদের অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে অন্য সদস্যরা রয়েছে উদগ্রীব উৎকণ্ঠায়। ওখানে রয়েছে বীরেন, বরেণ্য, শঙ্কুদা, ডাঃ সেন ও ডঃ মুখার্জী। ওরা এখনও জানে না সতপন্থ অভিযান পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে কি ফিরে যাব বাসুকিতে ? হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে চমকে উঠলাম। বিরাট একটা তুষার-ধস নেমেছে দূরে কোথাও। রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে সে শব্দ অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে গভীর মেঘ-গর্জনের মতো।

ঘুম ভাঙলো ১৮ই সেপ্টেম্বরের রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে। সতপন্থের দিকে চাইতেই দেখতে পেলাম গতরাতের সেই ভয়ঙ্কর তুষার-ধসের চিহ্ন। শীর্ষদেশ থেকে তিনটি সমান্তরাল রেখা পরিষ্কার নেমে এসেছে নিচের দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ধসটি ওই পথেই নেমেছিল।

পরাজয়ের আঘাত আমাদের চিন্তা ও বিচারবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করেছিল। কি করব এবার ?

একই প্রশ্ন সবার মনে। অনেকের ইচ্ছে, বাসুকিতে ফিরে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করা। কিন্তু আমরা জানি আমাদের রসদপত্র আর টাকা-পয়সার টানাটানির কথা। অযথা ক'টা দিন নষ্ট হবে। শুধুহাতে ফিরে যেতেও মন চায় না। অনেক আশা নিয়ে বাসুকির সদস্যরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

চা খেতে খেতে ভাবি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা—চলে তর্ক-বিতর্ক। অমূল্য অনামীশৃঙ্গটি আরোহণের প্রস্তাব করে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা পারব শৃঙ্গটি আরোহণ করতে। সতপন্থের পরাজয়ে অমূল্য যেন একটুও দমে যায় নি।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, আমরা ঐ অনামীশৃঙ্গটি আরোহণের চেষ্টা করব। আমরা যেখানে রয়েছি তার ঠিক উত্তরে, চতুরঙ্গী হিমবাহের অপর তীরে রয়েছে শৃঙ্গটি। খুব ক্ষিপ্রগতিতে দিন দুয়েকের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। কারণ রসদপত্র বেশি নেই।

তাঁবুগুলি গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। বাঁধাবাঁধিও শেষ। কুলিরা ওদের বোঝাগুলি নিয়ে প্রস্তুত—আদেশ পেলেই ওরা রওনা হয়ে যাবে। সঙ্গীদ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—উচ্চতার প্রতিক্রিয়ায়। ওঁকে ফিরে যেতে হবে বাসুকিতে। আমাদের খবরও উনি দেবেন অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে।

আমরা রওনা হলাম নতুন লক্ষ্যের দিকে। চলেছি সুন্দর হিমবাহ ধরে। বাসুকির বাঁকে সঙ্গীদ অদৃশ্য হলেন ওঁর কুলিদের নিয়ে। আমরা নেমে এলাম চতুরঙ্গীর বুকে, যেখানে সুন্দর এসে পড়েছে চতুরঙ্গীতে। চতুরঙ্গীতে পাথর আর বরফ ছড়ানো বুকের ওপর দিয়ে পথ চলেছি। জোর কদমে যতটা সম্ভব আমাদের আজ এগিয়ে যেতে হবে। চতুরঙ্গীর উত্তর তীরবর্তী শৈলশিরার মাথায় কোথাও শিবির করতে হবে।

সতপন্থ পরাজয়ের গ্লানি যেন ক্রমশঃ মুছে যাচ্ছে মন থেকে। নতুন লক্ষ্যের সন্ধানে আমরা আবার সজীব হয়ে উঠেছি। আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করছি চতুরঙ্গী। অতি দ্রুত আমাদের গতি।

চতুরঙ্গীকে দেখেছিলাম অনেক উঁচু থেকে—আজ নেমে এসেছি একেবারে কাছে—ওর বুকে। বিশাল হিমবাহ এই চতুরঙ্গী। নানা রঙের অতিকায় পাথরের নিচে শক্ত কঠিন জমাট বরফের প্রবাহ। কত সহস্র বছরের বরফ কে জানে!

পাথর আর বরফের অতিকায় স্তূপগুলি যেন এক-একটা বিরাট পাহাড়। ক্ষুদে মানুষ হারিয়ে যায় ওর বুকে। ক্যারাভেনের মতো একটা লম্বা রেখায় আমরা চলেছি এঁকেবেঁকে। কখনো উঠছি একটা পাথরের ঢিবি বেয়ে—আবার নেমে যাচ্ছি পিঁপড়ের সারির মতো। মাঝে মাঝে ছোট-বড় "গ্লেসিয়াল লেক"—বরফগলা জল জমে আছে সরোবরে। জলে রঙের বাহার—লাল নীল সবুজ সাদা—চতুরঙ্গী রঙের তরঙ্গ।

চলার শেষ নেই, ওঠা-নামার বিরাম নেই। যেন অন্তহীন পথ—যুগ যুগ ধরে চলেছি। আবহাওয়া ভাল, সূর্য প্রখর। এত ঠাণ্ডাতেও ঘেমে উঠেছি।

দোরজির পিঠে রুকস্যাকের সঙ্গে বাঁধা রেডিওটা কিন্তু বেজে চলেছে—প্রতিদিনের মতো। ও যখন পথ চলে, রেডিও বেজে চলে ওর সঙ্গে। গানের তালে তালে দোরজি পথ চলে। চতুরঙ্গীর বিশাল নিস্তব্ধ প্রান্তরে গানের সুর বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে।

ক্রমশ আমরা আড়াআড়ি ভাবে পেরিয়ে আসি চতুরঙ্গী। দক্ষিণ তীর বরাবর শৈলশিরাটি বেয়ে উঠতে থাকি। খাড়া উঠে গেছে প্রায় এক হাজার ফুট। আমাদের গতি মন্থর হয়ে

পড়ে। পিঠের বোঝা ভারি মনে হয়। দশ কদম—একটু বিশ্রাম, আবার দশ কদম। হাঁফ ধরে সহজেই। বিশ্রামটুকু দাঁড়িয়েই করতে হয়। বসার উপায় নেই—বসলেই বিপদ। অসাড় পা-দুটো আর চাইবে না এগিয়ে যেতে—প্রতিবাদ করবে। যতখানি উঠি, সামনের চড়াই যেন ততখানি বেড়ে যায়। একঘেয়েমি এড়াবার জন্য কদম ফেলার তালে তালে গুনতে থাকি, এক দুই তিন চার। গোনার তালে তালে পা চলে। একটা ছন্দ আসে গতিতে—শ্বাস-প্রশ্বাসে। চড়াই ভাঙা সহজ হয়। এই ক্লাইম্বিং রিদ্‌ম রপ্ত না করলে পাহাড়ে চড়া কষ্টকর।

হিমালয়ের পথে প্রতি পদে বৈচিত্র্য, বাঁকে বাঁকে বিস্ময়। ক্রমশ উঠে আসি শৈলশিরার মাথায়। সামনেই এক অপূর্ব দৃশ্য—যা আমরা একেবারেই আশা করিনি বা ভাবিনি। আমরা তখন উঠে এসেছি আঠারো হাজার ফুটে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে প্রায় শ'দুয়েক ফুট নিচে ছোট্ট একটি নীল সরোবর—দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় দু'শ ফুট হবে। পরিষ্কার নীল জল। ওপরের হিমবাহ থেকে বরফ-গলা-জলের একটি ধারা নেমে এসেছে হ্রদের বুকে। এত উঁচুতে এমন হ্রদ অভাবনীয়। শৈলশিরার মাথা থেকে একটি সহজ ঢাল নেমে গেছে হ্রদের তীর পর্যন্ত। শিবির স্থাপনের আদর্শ স্থান। অমূল্য শিবিরের নাম রাখে—"লেক-ক্যাম্প"।

স্থানটি কেবল সুন্দর নয়, চারিপাশের দৃশ্যও মনোরম। দক্ষিণে দাঁড়িয়ে সারি সারি শিখর। প্রথমেই চন্দ্র পর্বত—অমূল্যর চন্দ্র পর্বত। মনে হচ্ছে, সে অমূল্যকে চিনতে পেরেছে। তাই এমন মন-ভোলানো হাসিতে ভরে তুলেছে চারিদিক—চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।

তারপর সতপন্থ—স্বপ্নের সতপন্থ। আমরা তাকে প্রণাম করে বলি, আশীর্বাদ করো আমরা যেন আবার আসতে পারি তোমার কাছে, আর সেদিন যেন আমাদের স্বপ্ন সত্যি হয়।

সতপন্থের পরে দাঁড়িয়ে আছে বাসুকি—নাগরাজ বাসুকি। সশ্রদ্ধ চিত্তে তার উদ্যত ফণারূপ শিখরের দিকে তাকিয়ে তার কাছে আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আপনারা তো তারই আশ্রয়ে রয়েছেন।

আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে ভাগীরথী আর শিবলিঙ্গ। আমরা তাদেরও প্রণাম করি। আমরা প্রণাম করি দেবতাত্মা হিমালয়কে।

বেলা তখন প্রায় আড়াইটে। কুয়াশার একটা আবরণ পশ্চিম থেকে এসে চারিপাশের পাহাড়ের মাথাগুলোকে যেন জড়িয়ে ধরেছে। অথচ একটু আগেও আকাশ ছিল খুবই পরিষ্কার—রৌদ্রোজ্জ্বল। মেঘ বা কুয়াশার চিহ্ন কোথাও ছিল না।

চড়াই ভাঙার ক্লান্তিকর একঘেয়েমি শেষ। আনন্দে হৈ-চৈ করে নেমে এলাম হ্রদের তীরে। হ্রদের জলে ঢিল-ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে যায়। কোলাহলে ভরে যায় চতুরঙ্গীর অঙ্গন। হ্রদের জলে তরঙ্গ ওঠে। শেরপারা বাধা দেয়। বলে, পাহাড়ে হৈ-চৈ করলে প্রকৃতি রুষ্টা হন—আবহাওয়া বিগড়ে যায়।

আবহাওয়া ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছে। একটু পরে রাশি রাশি মেঘে ছেয়ে যায় সমস্ত আকাশ। বাতাসে একটা চাপা আক্রোশ যেন লুকিয়ে আছে—এখুনি ফেটে পড়বে।

আরম্ভ হয় তুষারপাত। প্রথমে হাল্‌কা তুলোর মতো, তারপর ক্রমশ ঘন আর ভারি। গাঢ় কুয়াশার আবরণ পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসে হ্রদের বুকে।

পিঠের বোঝাগুলি নামিয়ে সবাই তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। প্রচণ্ড বাতাস আমাদের বিব্রত করে। তাঁবুগুলি সোজা করে খাটানো কষ্টকর হয়। তুষারকণার চাবুক এসে পড়ে চোখে-মুখে।

স্তরে স্তরে ফেলা হয় তাঁবুগুলি—এক জায়গায় সবগুলির জায়গা হয় না। কুলিরা চলে যায় হ্রদের পশ্চিম তীরে। কোনরকমে সবাই আশ্রয় নিলাম তাঁবুর ভেতরে। বেলা তখন তিনটে হবে। বাইরে কিন্তু তখন অন্ধকার। কালো পাথরগুলি নতুন বরফে সাদা হয়ে গেছে।

সরোবরের তীর ঘেঁষে আমাদের তাঁবু। উজ্জ্বল হলদে রঙের জাপানী "হাই অল্টিচিউড" তাঁবু। এত দুর্যোগেও ওর আশ্রয়ে নিজেদের নিরাপদ বোধ করি। তাঁবুর ছোট গোল দরজা দিয়ে দেখি হ্রদের বুকে তুষারপাতের দৃশ্য। নীল সরোবর তখন সাদা হয়ে গেছে। হ্রদের জল স্তব্ধ, কোন তরঙ্গ নেই। হাল্‌কা বরফে ওপরটা জমে গেছে।

প্রাণ ছটফট করছে এক মগ গরম চা-য়ের জন্য। ছুঞ্জের তাঁবুতে স্টোভের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছুঞ্জে নিশ্চয়ই চা-য়ের জল চাপিয়েছে। বরফ-গলা ঠাণ্ডা জল গরম হবে, ফুটবে, তারপর চা—এখনো অনেক দেরি। তবু তো এখানে জল আছে, যেখানে বরফ গলিয়ে চা করতে হয়! তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি।

চিঁড়ে আর বাদাম ভাজার সঙ্গে গরম চা এল। সত্যি অভাবনীয়। এ অবস্থায় এখানে এমন মুখরোচক জলখাবার! ছুঞ্জের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

তাঁবুতে তাঁবুতে তখন জটলা বেশ জমে উঠেছে। যেন খোপে খোপে পায়রার গুঞ্জন। বাইরের দুর্যোগে কারো কোনো ভ্রূক্ষেপ বা ভাবনা নেই। শেরপাদের তাঁবু থেকে "বিবিধ ভারতী"-র গান ভেসে আসছে।

সুজল, প্রাণেশ আর আমি একটা তাঁবুতে—একেবারে হ্রদের ধারে। সুজল আর প্রাণেশ ব্যক্তিগত আলোচনায় মগ্ন। এসব জায়গায় মানুষের মনের দুয়ার আপনি খুলে যায়। দু'একটা কথার টুকরো ভেসে আসে আমার কানে। শরীরটাকে স্লীপিং-ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে মুখে একটা চুরুট গুঁজে চেয়ে থাকি হ্রদের দিকে। ওখানে অন্ধকার আরো জমাট বেঁধে উঠেছে। এত কষ্ট, এত দুর্যোগের মধ্যে হঠাৎ কেন যেন মনে হয় আমার চেয়ে সুখী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। হিমালয়ের স্নেহ যে বর্ষিত হচ্ছে আমার ওপর!

রাতে খাবার সময় ঠিক হল, আগামীকাল ভোর চারটেয় আমরা রওনা হব—উদ্দেশ্য অনামীশৃঙ্গে আরোহণ। আবহাওয়া সহায় হবে কিনা বলা যাচ্ছে না। তাই অন্ধকার থাকতেই আমরা রওনা হব। সঙ্গে থাকবে "ড্রাই লাঞ্চ"। আজই বিলি করে দেওয়া হল। সবকিছু গুছিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। এখন বিকেল ছ'টা।

চলেছে অবিশ্রান্ত তুষারপাত। তাঁবুর অর্ধেক চলে গেছে বরফের নিচে। বরফের ভারে তাঁবুর ছাদ নিচে নেমে আসছে—মাঝে মাঝে ঝেড়ে দিতে হচ্ছে। তাঁবুর দু'পাশে বরফের চাপ অনুভব করছি—দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি মাঝে মাঝে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—স্লীপিং-ব্যাগের মধ্যে যেন কেউ জল ঢেলে দিয়েছে, এমন একটা ঠাণ্ডা জলো ভাব।

ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে ভাবি আগামীকাল কি হবে? নতুন বরফে আমাদের পথ পেছল হবে, ফাটলগুলি ঢাকা পড়বে—আমাদের বিপদ বাড়বে। প্রচণ্ড বাতাস আমাদের বিব্রত করবে, তুষারকণার চাবুক পড়বে চোখে-মুখে। ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করে আমাদের দৃষ্টি যাবে না বেশি দূর। এবারেও কি ফিরব ব্যর্থ হয়ে? ভাবেত ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ব জানি না।

॥ এগারো ॥

"থাকিতে চরণ মরণে ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

আমাদের পিছু ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যু পড়িবে হাঁপায়ে,
জিভ্ বা'র হ'য়ে পড়িবে যমের, জীবন তখন বাঁ পায়ে !...."

বরেণ্য গান গাইছে। সাধারণত সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। কিন্তু আজ নজরুলগীতি গাইছে। বোধ হয় বিদ্রোহী কবির কথায় নিজের কথা বলতে চাইছে। পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। আমি চুপ করে থাকি, গান শুনি—শ্রীচরণের জয়গান।

এক সময়ে বরেণ্য থামে, গান শেষ হয়। স্লিপিং-ব্যাগ থেকে মাথা বের করি—সকাল হয়েছে, ২০শে সেপ্টেম্বরের সকাল। সুন্দর সকাল। অন্তত তাঁবুর পরদার ফাঁক দিয়ে বাইরের যতটা দেখা যাচ্ছে, তাতে তাই মনে হচ্ছে। তুষারপাত থেমে গেছে। ঠিক কখন থেমেছে বলতে পারব না, তবে শেষরাতের দিকে নিশ্চয়ই। কাল অনেক রাত অবধি আমরা জেগেছিলাম। তুষারপাতের জন্যই সে জাগরণ। জেগে জেগে তাঁবুর ওপরকার বরফ ফেলে দিতে হয়েছে, যাতে তাঁবু ছিঁড়ে না যায়। তবু বড় তাঁবু বলে খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। ছোট্ট তাঁবু হলে সারারাতই জেগে কাটাতে হত। জানি না, ওপরে কি অবস্থা ! জানি না, পুলিসদলের রাত কিভাবে কেটেছে—ওদের সবই ছোট তাঁবু।

বরেণ্য বাইরে বেরিয়ে যায়। ফিরে এসে বলে, "পুলিসদল রওনা হয়ে গেছে।"

"এত ভোরে !" বিস্মিত হই।

"হ্যাঁ।" বরেণ্য বলে, "ভালই করেছে। আকাশ পরিষ্কার। আজ আবহাওয়া ভাল হবে।"

তাই হয়ে থাকে। তুষারপাতের পর হিমালয় উজ্জ্বল সূর্যালোকে আলোকিত হয়। তাই হোক, আমরা তাই চাইছি। কাল যদি তুষারপাতের জন্য ওরা অনামীশৃঙ্গে আরোহণ না করতে পেরে থাকে, তাহলে আজ চেষ্টা করবে।

"পারবে কি ?" বীরেন বলে, "এখানেই যে রকম বরফ পড়েছে...."

"দশ ইঞ্চির ওপর।" প্রফেসর মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

"হ্যাঁ।" বীরেন প্রফেসরকে সমর্থন করে, "ওপরে এর থেকে অনেক বেশি বরফ পড়েছে। নরম তুষারের ওপর দিয়ে পর্বতারোহণ যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি বিপজ্জনক।"

বলতে গেলে আজ আমি বেকার। আজ ওপরে পাঠাবার মাল নেই, নিচে পাঠাবার খবর নেই। আজ কুলিরা খালিহাতে ওপরে যাবে। যদি অমূল্যরা আজ নেমে আসে, মাল নিয়ে আসবে।

আজ অবশ্য নিচ থেকে ডাক আসবে। কিন্তু ওপর থেকে খবর না এলে ডাক পাঠাবার দরকার নেই। পুলিস পদযাত্রীদের নেতা শ্রীত্রিপাঠী সতপন্থ শিখরে আমাদের ব্যর্থতার সংবাদ

বেতারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আশা করছি, আজ সে-সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। শুভানুধ্যায়ীরা সবাই দুঃখিত হবেন। কেউ কেউ হয়তো আমাদের অযোগ্য ভাববেন। মনে পড়ছে গতবারের কথা—কেদারনাথ ডোম জয় করে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পর কি সুবিপুল সংবর্ধনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তারপর মাসাধিককাল ধরে চলেছে সেই সাদর অভিনন্দনের পালা। কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সংবর্ধনা থেকে ডায়না এসোসিয়েশানের আন্তরিক অভিনন্দন।

আর এবারে ? এবারে হয়তো আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আর কেউ স্টেশনেই আসবেন না। আমরা যে পরাজিত পর্বতাভিযাত্রী !

রাম বাহাদুর সাড়ে ছ'টায় বেড-টি দিয়ে গেছে। সেই থেকেই জেগে আছি। কিছুক্ষণ কেটেছে বরেণ্যর গান শুনে। তারপর থেকে রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় জুটেছে। কে ভাল বলল, কে মন্দ বলল ; কে অভিনন্দন জানাল, কে অভিশাপ দিল ; তাতে অভিযাত্রীর কি যায় আসে ? তাছাড়া আমাদের অভিযানের চূড়ান্ত ফলাফল তো নির্ধারিত হয় নি—এখনও অনামী শৃঙ্গাভিযানের খবর আসে নি। আশা করছি আজ আসবে। তারপরই এ অভিযানের জয়-পরাজয় নির্ণীত হবে।

কাজেই সেকথা এখন থাক্। অন্য কথা ভাবা যাক্। আজ ডাক আসবে। কিন্তু আর বোধ হয় ডাক পাঠাবার দরকার হবে না। অনামীশৃঙ্গের নামকরণ করতে পারুক আর নাই পারুক, আজ-কালের মধ্যে ওদের নেমে আসতে হবে এই শিবিরে। নইলে খাবারে টান পড়ে যাবে। ওরা নেমে এলেই পরদিন সকালে শুরু হবে প্রত্যাবর্তন। এখান থেকে একদিনে আমরা গোমুখীতে নেমে যাব। সেখানে অবশ্য দুদিন থাকতে হবে। কারণ কুলি কম। এখানে এসে দু'বারে আমরা ত্রিশজন কুলি ছেড়ে দিয়েছি। সত্তরজন কুলিকে এতদিন রাখার মতো টাকা নেই আমাদের। তাছাড়া এক নম্বর শিবিরে প্রয়োজনীয় মাল চলে যাবার পর তখনকার মতো তাদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওপরে ও এখানে যা মাল আছে, তা গোমুখী পর্যন্ত নিয়ে যেতে কুলিদের দুবার মাল ফেরী করতে হবে। তাই গোমুখীতে আমাদের দু'দিন থাকতে হবে। আশা করছি, গোমুখীতে পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের কয়েকজন কুলি পাওয়া যাবে। পেলে সব মাল একদিনে গঙ্গোত্রী চলে যাবে। আর গঙ্গোত্রীতে কুলি কিংবা খচ্চর পেয়ে যাব।

আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। ঝড়ের বেগে মেট তাঁবুতে ঢোকে। সঙ্গে সেতীরাম ও রাম বাহাদুর।

"কেয়া খবর মেট ! বৈঠিয়ে !" ডাক্তারবাবু সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই তার দিকে ছুঁড়ে দেন।

মেট কিন্তু সে উপঢৌকনের দিকে নজর দেয় না। বিস্মিত হই—অমৃতে অরুচি !

মেটের মুখের দিকে তাকাই। তাকে অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছে। তাই হবে, কারণ সে এখন পর্যন্ত একবারও "গুড-মর্ণিং" বলে নি। ব্যাপার কি ?

জিজ্ঞেস করতে হয় না। মেট নিজেই বলে, "সাব ! পুলিসপার্টি হামারা দো আদমী লেকর ভাগ গ্যয়া।"

"আদমী...."

"জী সাব। দো কুলি—জিসকে আঁখোমে দরদ হুঁয়া থা।"

"সে কি ! তাদের যে আজ নিচে পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল !" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন,

"পুলিসপার্টি উন দো আদমীকো কাঁহা পর লে গ্যয়া ?"

"ওপার। কালিন্দীখাল।"

"তব তো ওলোগ মর যায়গা।" ডাক্তারবাবু চিৎকার করে ওঠেন। একটু থেমে বলতে থাকেন, "কেউ তুষারান্ধ হলে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে, মানে যেখানে তুষার নেই, সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। আর মিঃ ত্রিপাঠী তাদের ওপরে নিয়ে গেলেন !"

"অব ম্যাঁয় কেয়া করুঙ্গা ? আদমী কমতি হ্যায়, ওলোগ হামসে রূপয়া লে গ্যয়ে ; ফির আপকা কম্বল ঔর সোয়েটার লেকর ভাগ গ্যয়া !"

চমৎকার ! কাল এখানে আসার পর থেকে যাদের আমরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছি, সেই পুলিসদল আমাদের কুলি ভাগিয়ে নিয়ে গেছে—এই গিরি-কান্তারে যার থেকে বড় অপরাধ আর কিছুই হতে পারে না। চমৎকার সীমান্ত-রক্ষক, বিস্ময়কর কৃতজ্ঞতাবোধ !

রাম বাহাদুর এতক্ষণ নীরবে নতমস্তকে দাঁড়িয়েছিল। এবারে কথা বলে সে —দুটি কথা, "সাব, চিঠ্‌ঠি ! পুলিসসাহাব আপকো দেনে বোলা।"

তাড়াতাড়ি রাম বাহাদুরের হাত থেকে কাগজখানি নিই। পেনসিল দিয়ে লেখা একখানা সাধারণ কাগজে অসাধারণ লিপি। ত্রিপাঠীর চিঠি। পাছে হিন্দী বুঝতে অসুবিধে হয়, তাই ইংরেজীতে লিখেছেন। আমাকেই লিখেছেন—

'As the following 2 porters are suffering from snow-blindness, we have engaged them to accompany us in real good faith. Please arrange to make payment to the In-charge porter the amount shown below :–

(1) Ram Bahadur Rs. 100.00 for 17 days.

(2) Lok Bahadur Rs. 100.00 for 17 days.

না, ধন্যবাদ দিতে ভুল করেন নি ! চিঠির শেষে লিখেছেন, 'Thanking you. Yours faithfully–N. C. Tripathi.' বিশ্বস্তই বটে !

আমরাও তাকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই তাঁর কৃতজ্ঞতাজ্ঞানকে, ধন্যবাদ দিই তাঁর অদ্ভুত যুক্তিকে। যেহেতু ঐ দুজন কুলি তুষারান্ধতায় ভুগছিল, সেই হেতু সত্যিকারের সদিচ্ছা থেকেই আমাদের না জানিয়ে তিনি তাদের আরও ওপরে, তথা তুষারাবৃত কালিন্দীখালে নিয়ে গেছেন। আমরা যেন ভাল ছেলের মতো তাদের মাইনেটা মেটের কাছে রেখে যাই। তিনি যথাসময়ে সেই টাকা পালিয়ে-যাওয়া কুলিদের বিতরণ করে আমাদের মহৎ উপকার সাধন করবেন।

আরও একটি উপকার তিনি করেছেন। গতকাল পর্যন্ত হিসেব করলে ঐ দুজন কুলি ষোলদিন আমাদের কাজ করেছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠী সতরো দিনের মাইনে রেখে যাবার ফরমান রেখে গেছেন। ঠিকই করেছেন। আজ আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই যখন তিনি আমাদের কুলি নিয়ে পালিয়েছেন, তখন সেই পালিয়ে-যাওয়া কুলিদের আজকের দিনের মাইনেটাও আমাদেরই দিয়ে দেওয়া উচিত !

এমন পরোপকার ও সুবিচারের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠী সারা জীবনের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার নাগপাশে আবদ্ধ করে রাখলেন। তাঁর জয় হোক !

মেট কিন্তু সমানে রাম বাহাদুরকে বকে চলেছে। বলছে, তার জন্যই আমাদের এই অপূরণীয় ক্ষতি হল। কারণ পুলিস পদযাত্রীরা যখন রওনা হয়, তখন সে কিচেনে কাজ করছিল। টিকারাম আজ সকালে ওঠে নি, রাম বাহাদুরকে বেড-টি বানাতে বলেছিল। কেবল

তাই নয়, তার কাছে ত্রিপাঠী চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল।

তাই তো, তাহলে কি রাম বাহাদুরও এর মধ্যে আছে ? দেখতে গোবেচারা হলেও আসলে সে একটা শয়তান।

"ইয়ে বাত অভি তক্ কিঁউ নহী বাতায়া ?" আমি গর্জে উঠি।

রাম বাহাদুর কেঁদে ফেলে। কোনমতে বলে, "পুলিসসাহাব নে মানা কিয়া।"

"কেয়া মানা কিয়া ?"

"জী বোলাথা, উনকো জানেকা এক ঘন্টা পিছে ইয়ে চিঠ্‌ঠি আপকো দেনা। পহেলে দেনেসে মুঁঝে উত্তরকাশীসে নিকাল দেগা।"

তা পারেন। ওঁরা সীমান্ত-রক্ষক। নেপালী মালবাহক রাম বাহাদুরকে শ্রীত্রিপাঠী ভারতের নিরাপত্তার প্রয়োজনে উত্তরকাশী থেকে বিতাড়িত করতে পারেন। কেবল তাই নয়, চীনা গুপ্তচর প্রমাণ করে হাজতে পুরতেও পারেন। কাজেই রাম বাহাদুর চুপ করে ছিল। ঠিকই করেছে। সে কোনো অন্যায় করে নি।

"সাব !" এতক্ষণ বাদে সেতীরাম কথা বলে। আমরা তার দিকে তাকাই। সেতীরাম বলে, "ম্যাঁয় যাউঙ্গা সাব।"

"কিধর ?"

"কালিন্দীখাল।"

"কিঁউ ?'

"আপ্‌কা কম্বল ঔর সোয়েটার লানেকে লিয়ে।"

"ও আদমী তো বহুৎ দূর চলা গ্যয়া !"

"তুম্ ফিকর মত্ করো সাব। ম্যাঁয় ওলোগকে পকড় লুঙ্গা। তুম্ অরডার দো দো।"

সেতীরাম উঠে দাঁড়ায়। সে সত্যিই যেতে চাইছে। আশ্চর্য, যারা সামান্য কয়েকটা টাকার লোভে পালিয়ে গেল, সেতীরামও তাদের মতই একজন সাধারণ মালবাহক। অথচ আমাদের কম্বল আর সোয়েটারের জন্য সে এই দুর্গম পথ পাড়ি দিতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি নিবৃত্ত করি সেতীরামকে। বুঝিয়ে বলি, কম্বল আর সোয়েটার যাওয়ায় আমাদের ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি হবে যদি সেতীরাম এখন তাদের পেছনে ছোটে। কারণ কুলিদের নিয়ে সেতীরামকে এখন যেতে হবে লেক-ক্যাম্পে।

কথাটা বোধ করি মোটেই মনে ধরে না সেতীরামের। তবু সে অবাধ্য হয় না। মেট ও রাম বাহাদুরকে নিয়ে চলে যায় বাইরে—যাত্রার আয়োজন করতে।

ওরা চলে যায়। কিন্তু আমরা ওদের কথা ভেবে চলি। গাড়োয়াল-কুমায়ূনে হিমালয় অভিযানে যে-সব মালবাহকরা আমাদের সঙ্গে আসে, তারা প্রায় সবই নেপালী। স্বদেশে এদের কাজ জোটে না। তাই দশ-পনেরো দিনের দুর্গম পথ পেরিয়ে এরা আমাদের দেশে আসে। মাল বইবার কিংবা রাস্তা বানাবার কাজ করে। বর্ষাকাল বাদ দিয়ে বড়জোর পাঁচ-ছ'মাস রোজগার। খুব বেশি হলে চার-পাঁচশ' টাকা। দেশে এদের পরিবার-পরিজন আছে। তাদের টাকা পাঠাতে হয়। তাই এরা নিজেরা অর্ধাহারে থাকে, ধর্মশালার বারান্দায় রাত কাটায়। উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াই গহন-গিরি-কন্দরে শীতে ও তুষারে অমানুষিক পরিশ্রম করে।

যে টাকার জন্য এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম, সেই টাকা কিন্তু অনেকেই ঘরে নিয়ে যেতে

পারে না। জুয়া খেলে উড়িয়ে দেয়। জুয়াখেলার দিকে এদের অনেকেরই অদ্ভুত ঝোঁক। দুর্গম চড়াই-উৎরাই পথে সারাদিন মাল বয়ে কোথায় রাতে একটু বিশ্রাম করবে তা নয়, দুঃসহ শীতে সারারাত বসে জুয়া খেলে। কেউ হারে, কেউ বা জেতে।

ওরাও হেরেছে—রণবাহাদুর ও লোকবাহাদুর, যাদের ত্রিপাঠী নিয়ে গেছেন। জুয়ায় হেরে ওরা মেটের কাছ থেকে ধার চেয়েছে। আর সেই ধার শোধ না দিয়ে ত্রিপাঠীর সঙ্গে পালিয়েছে।

কি বলব ওদের ? অসৎ ? না, অশিক্ষিত। অভাব ওদের সমস্যা নয়, প্রকৃত সমস্যা শিক্ষার অভাব।

আর ওদের কথা ভাবতে পারি না। ওদেরই একজনের আগমনে ওদের চিন্তায় ছেদ পড়ে। ভীমবাহাদুর তাঁবুতে ঢোকে। ডাক-রানার ভীমবাহাদুর। স্বর্গ আর মর্ত্যের সেতু। সে চিঠি নিয়ে এসেছে, অনেক চিঠি।

স্বামী সারদানন্দ আজও চিঠি দিয়েছেন। সাদা কাগজে টাইপ করা চিঠি। প্রফেসরের হাতে দিয়ে বলি, "পড়ো !"

'Blessed Self,

Om Namo Narayana.

Loving Namaskars'

প্রফেসর শুরু করে—

'May God bless you all with health, peace, prosperity and happiness.

It is God's will, let us tolerate. Be sportsman, failure and success both are mentel conception to give disappointment and happiness. But for both effort is the same. You have done your duty.

Wish you happiniess and better luck next time. I pray to Mother Gonga, to help you again to come to Satopanth and fulfil your desire..'

অবাক কাণ্ড ! সারদানন্দ কেমন করে জানলেন যে, আমরা সতপন্থ শিখরে আরোহণ করতে পারি নি ! এ খবর তো তাঁর পাবার কথা নয় ! আমরাই খবর পেয়েছি পরশু বিকেলে। তারপরে কোনো কুলি গঙ্গোত্রী যায় নি। তাহলে কি পুলিসদের পাঠানো সংবাদ পেয়ে আকাশবাণী কোন সংবাদ দিয়েছে !

কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব ! পুলিসদের পাঠানো খবর টিহ্‌রীতে পৌঁছেছে গতকাল রাতে আর সারদানন্দ এ চিঠি ভীমবাহাদুরকে দিয়েছেন গতকাল সকালে।

কেমন করে সারদানন্দ এ সংবাদ পেলেন ?

যেমন করে পেয়েছিলেন স্বামী কৃষ্ণাশ্রম। আমার প্রশ্নের উত্তরে সেদিন গঙ্গোত্রীতে বসে তিনি বলেছিলেন, 'সতপন্থ কঠিন হ্যায়।'

যুক্তি দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, বুদ্ধি দিয়ে এর কারণ ব্যাখ্যা করা যাবে না। আর তার প্রয়োজনই বা কি ? বিশ্বাস করা যাক, এই সব মুক্তপুরুষরা মহামানব, তাঁরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।'

কিন্তু এ কি করছি আমরা ! ত্রিপাঠী আমাদের যত ক্ষতিই করে থাকুন, সেই শোকে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না ! এবারে কাজ শুরু করা যাক। অনেক কাজ পড়ে

আছে। প্রফেসরের পরীক্ষা, ডাক্তারবাবুর ইঁদুর-নিধন, বীরেনের থার্মোমিটার রিডিং, কুলিদের তাড়াতাড়ি ওপরে পাঠানো, মালপত্র গোছানো।

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসি। ইস্ ! তাকানো যাচ্ছে না। চড়া রোদ উঠেছে তুষারাবৃত প্রান্তরে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। তুষার তো নয়, মুক্তো। মুক্তো ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তার বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির অনুলেপনে চারিদিক উদ্ভাসিত।

মনোহর হলেও কিন্তু দুঃসহ। তুষারপাতের পর প্রখর রোদ ওঠে, আলো বাড়ে। দিনে গরম লাগে, রাতে প্রচণ্ড শীত পড়ে।

রাতের কথা পরে হবে, এখন দিনের কথা ভাবা যাক্। তাঁবুতে এসে গরম পোশাক খুলে ফেলি। রঙীন চশমা চোখে দিয়ে, গেঞ্জি গায়ে আবার বাইরে বেরিয়ে আসি।

এখন তবু খানিকটা সওয়া যাচ্ছে। আশ্চর্য, এর মধ্যে ত্রিপাঠী ঐ তুষারান্ধ লোক দুটিকে ওপরে নিয়ে গেলেন ! ওরা খানিকটা সেরে উঠেছিল। আজ তো আবার তুষারান্ধ হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে কোনো ডাক্তার নেই।

কিন্তু এ চিন্তা আমি করছি কেন ? লোভে পড়ে যারা স্বেচ্ছায় এমন বিপদের ঝুঁকি নেয়, তাদের জন্য চিন্তা করা অনর্থক। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

তবু চিন্তা হয়। ওরা যে অবুঝ ! নিজেদের ভাল-মন্দও বুঝতে পারে না।

সেতীরাম সঙ্গীদের নিয়ে ওপরে রওনা হয়ে গেল। বার বার বলে দিলাম, কখনই যেন চশমা না খোলে এবং আগুন না পোহায়। কেবল তাই নয়, বরেণ্য প্রত্যেকের জুতো পরীক্ষা করে তবে ওদের ওপরে যেতে দিল।

প্রফেসর ও ডাক্তারবাবু তাঁদের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দুজনেই তাঁবুর বাইরে বসেছেন। প্রফেসর মাইক্রোস্কোপ আর ডাক্তারবাবু ইঁদুর বের করেছেন। সঙ্গীদ ক্যামেরা নিয়ে অস্থির। আজ তাঁর আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। মেঘ-মুক্ত সুনীল আকাশতলে মুক্তাচ্ছাদিত প্রান্তরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলছে। তিনি তার ছবি নিচ্ছেন। বার বার নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। আর আপন মনে বলে উঠছেন—ওয়াণ্ডারফুল শট্স !

আজ দিলীপ সঙ্গীদকে সাহায্য করছে। দিলীপ সুস্থ হয়ে উঠেছে। ডাক্তার অমিতাভ সেন তো নন, যেন স্বয়ং ধন্বন্তরি।

টিকারাম ব্রেক-ফাস্ট নিয়ে আসে। আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই। টিকারাম আজ একা। এর পরে তাকে লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে। ওকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া দরকার।

আমরা ছেড়ে দিই, কিন্তু টিকারাম আমাদের ছাড়ে না। না, ঠিক আমাদের নয়, সে সঙ্গীদসাহেবকে ছাড়ছে না। তাঁর পাশে ঘুর ঘুর করছে। জিজ্ঞেস করি, "হ্যাঁরে, কিছু বলবি ?"

"সাব..."

"কি ?"

"সাব, তসবীর..."

ব্যস, আর কিছু শোনার দরকার নেই। লাজুক ও স্বল্পভাষী হয়েও সে যতটা বলেছে, তাই যথেষ্ট। বটেই তো ! সেই থেকে সঙ্গীদ কত মানুষের ছবি নিলেন। আমাদের তো নিয়েছেনই, কুলিরাও অনেকে একাধিকবার তাঁর ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। অথচ যে লোকটি নীরবে আমাদের সেবা করে যাচ্ছে, তাকে আমরা কখনও সে সুযোগ দিই নি ! হয়তো ভেবেছি টিকারাম এ বিষয়ে উৎসাহী নন। ভুল, নেহাতই ভুল ভেবেছি—সংসারে কে না সিনেমায় নামতে চায় !

ছবি তুলে টিকারাম কিচেনে চলে যায়। ওরাও যে-যার কাজ করতে থাকে। আমি তাঁবুতে ফিরে আসি। ডাক্তারবাবুর ইঁদুর-নিধন পর্ব শুরু হবে এবারে। ও আমি চোখে দেখতে পারব না। ওরা অবশ্য দুর্বলচিত্ত বলে আমাকে উপহাস করছে। তা করুক্ গে, সংসারে সবাইকে যে সব ব্যাপারে সমান সবল হতে হবে, তার কোনো মানে নেই।

আমি এয়ার-ম্যাট্রেসে গা এলিয়ে দিই। ভেবে চলি ওদের কথা। ওপরে কি হচ্ছে, কে জানে!

কতক্ষণ কেটে গেছে ঠিক খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা চিৎকার কানে ভেসে আসে—"আদমী!"

মনে হচ্ছে মেটের গলা। হ্যাঁ, মেট। সে আবার বলছে, "সাব,... আদমী ...উপার!"

ওপর থেকে লোক আসছে! তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি।

হ্যাঁ, মেট ঠিকই দেখেছে। ওরাও দেখতে পেয়েছে—সঈদ, ডাক্তারবাবু, প্রফেসর, দিলীপ, বরেণ্য। কাজ বন্ধ করে ওরাও তাকিয়ে আছে ওপরে।

মানুষ নয়, একটি সচল কালো বিন্দু। বিন্দুটা এই দিকেই আসছে। একটু একটু করে বড় হচ্ছে। আস্তে আস্তে মানুষের আকার ধারণ করছে।

যেন একটি লিলিপুট হেলেদুলে এই দিকে আসছে। আমরা অপলক নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছি।

লিলিপুট নয়, মানুষ—মর্ত্যের মানুষ। আমাদের সঙ্গীরা ফিরে আসছে। সংবাদ আসছে—কুশল-সংবাদ অনামী শৃঙ্গারোহণের সংবাদ।

মানুষটা অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেকটা নেমে এসেছে। খুব তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে।

কিন্তু আর মানুষ নেই—কেবল একটি মানুষ। তাহলে কি সহযাত্রীরা কেউ আসে নি! কেবল খবর পাঠিয়েছে!

কি সে খবর? ভাল খবর? অনামী শৃঙ্গারোহণের খবর?

কবে আরোহণ করেছে? কাল? নইলে আজ এ সময়ে সংবাদ আসবে কেমন করে!

কাল ঐ অবিশ্রাম তুষারপাতের মধ্যে অচেনা-অজানা পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছে! নিশ্চয়ই করেছে। নাহলে মানুষ আসছে কেন?

কিন্তু তাহলে তো ওরা সবাই আসবে, একজন আসছে কেন?

তাই তো আসবে। আরোহণ করতে পেরেছে বলেই তো একজন আসছে। শুধু সংবাদ আসছে। সহযাত্রীরা শিবির গুটিয়ে পরে আসবে। চিঠি দিয়ে ওদের একজনকে খালিহাতে খুব সকালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

অদম্য উৎকণ্ঠা আর ঔৎসুক্যে আন্দোলিত হচ্ছে মন। আমরা ধৈর্যহারা, তবু ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে হয়। এই প্রতীক্ষা পর্বতারোহণের পৈশাচিক শাস্তি।

কে? লোকটি নেমে এসেছে প্রান্তরে। চিনতে পারছি না তো! এ যে দেখছি আমাদের কেউ নয়, শেরপা নয়, মালবাহক নয়। তবে কি পুলিসদলের কেউ? ওরা কোনো বিপদে পড়েছে? আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

"ধ্যান সিং!" সহসা দিলীপ বলে ওঠে, "আমাদের মালবাহক ধ্যান সিং। কি

ব্যাপার ?"

ধ্যান সিং কাছে আসে। নমস্কার করে দিলীপের হাতে একখানি খাম দেয়। সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। রীতিমতো হাঁফাচ্ছে। মনে হচ্ছে ছুটতে ছুটতে সারা পথ এসেছে।

কি যেন বলছে সে। অস্ফুট কণ্ঠস্বর। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাকে কথা বলতে নিষেধ করি। টিকারামকে বলি চা ও খাবার দিতে। মেট তাকে ধরে কিচেনে নিয়ে যায়।

খাম ছিঁড়ে দিলীপ আমাকে বলে, "প্রদীপ্ত চিঠি দিয়েছে।"

"তাঁবুতে চলো, বাইরে অসহ্য আলো।"

আমরা তাঁবুর ভেতরে আসি। দিলীপকে বলি, "চিঠিটা পড়ো!"

"আপনাকে লিখেছে।" দিলীপ বলে।

"তা হোক্, তুমিই জোরে জোরে পড়ো!"

দিলীপ পড়তে শুরু করে—

২০.৯.৮৮

'শঙ্কুদা,

ফিরে আসছি।

সেদিন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অজানা পথে পা রেখেছিলাম। বুকে আশা ছিল স্বপ্ন-দেখা কালিন্দী গিরিপথের সর্বোচ্চ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে উপভোগ করব বিশাল হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য। তা আর এবারকার মতো সম্ভব হল না। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে লক্ষ্যস্থলের মাত্র আধ মাইল দূর থেকে আমাদের ফিরে আসতে হয়েছে। প্রকৃতি আমাদের যেতে দেয় নি সেই রূপালয়ে। তবে চরম দুর্ঘটনার হাত থেকে এগারোটা জীবন রক্ষা করেছে। আমরা ফিরে এসেছি সুরালয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে।

দিলীপ আপনাদের স্নেহ এবং যত্নে এতদিনে নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওকে বলবেন, আমরা সবাই সুস্থ আছি।

আমাদের চারজন পোর্টার আজ স্নো-ব্লাইণ্ডনেস-এর পাল্লায় পড়েছে। সুস্থ আছে শুধু সর্দার আর রাঁধুনী। আশঙ্কা করছি, এদের কাল আর পথ-চলার ক্ষমতা থাকবে না। অথচ আবহাওয়া দ্রুত খারাপ হচ্ছে। সুরালয়ের এই সুন্দর ক্যাম্প-সাইট বরফে ঢেকে গিয়েছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। নতুন করে তুষারপাত শুরু হয়েছে আর বইছে বিশ্বাসঘাতক ঝোড়ো হাওয়া। আমাদের রেশন কমে এসেছে। এ অবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের নেমে যাওয়া দরকার।

অতএব শঙ্কুদা, সম্ভব হলে আমাদের কয়েকজন পোর্টারকে অবিলম্বে ওপরে পাঠিয়ে দেবেন। আমি যত দ্রুত সম্ভব অসুস্থদের নিয়ে নিচে নেমে যেতে চাই।

এবারে সুন্দর অথচ ভয়াবহ এই ক'টা দিনের অভিজ্ঞতার কথা লিখছি—

সেদিন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মনটা ভারি হলেও পথ চলতে খারাপ লাগছিল না। খাড়া চড়াই ভেঙে একেবারে বাসুকি হিমবাহের ঠিক ওপরে উঠে এলাম। রিজ-এর ওপর দাঁড়িয়ে দেখা গাড়োয়াল হিমালয়ের পূর্ণচিত্রটা চিরকালের মত মনের কোণে গাঁথা হয়ে থাকবে।

বাসুকি হিমবাহ পার হয়ে এলাম একটা খাড়া রিজ-এর তলায়। একেবারে নাক বরাবর খাড়া পাথরের দেয়াল বেয়ে উঠতে হল। তবে উঠতে অসুবিধা হয় নি। আপনাদের ফিক্সড-রোপ ছিল। দড়ি ধরে, দেয়ালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে সোজা উঠে এলাম।

দেয়াল বেয়ে সবাই উঠে একত্রিত হবার পর আবার যাত্রা। প্রায় ময়দানবের পথ বললেই হয়। ক্রমাগত ঢালু হয়ে পথ নিচে নেমেছে। আধ মাইলের মধ্যে ছোট্ট সুন্দর হ্রদ—বাসুকি তালাও। উচ্চতা ১৬,০০০ ফুট। চারিধারে ছোট ছোট সুগন্ধী গাছের ঝোপ। শীত এসে যাচ্ছে। ওদের ওপর পড়েছে তুষার-প্রলেপ। গ্রীষ্মকালে এখানে ভেড়াওয়ালারা আসে। চারিদিকে তার চিহ্ন। এখানে পৌঁছে মনে হচ্ছিল, এ জায়গাটা ক্যাম্প-এর পক্ষে বড় বেশি উপযোগী।

বাসুকি তালাও-য়ের তীরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ-চলা শুরু করলাম। বাঁদিকে চতুরঙ্গী। চড়াই বেয়ে এগিয়ে যেতে হলেও তেমন কষ্ট নেই। দিলীপটা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

মাইল দেড়েকের মাথায় সুন্দর হিমবাহ। চোরা ফাটল, নরম তুষার আর বিশ্বাসঘাতক লুজ বোল্ডার-য়ে ভরা। এর পাশ দিয়েই ডানদিকে চলে গিয়েছে আপনাদের সতপন্থের পথ। দেখতে পাচ্ছি আপনাদের এক নম্বর শিবির। বোঝা যাচ্ছে বাইরে কয়েকজন ঘোরা-ফেরা করছে। দূরে দেখা যাচ্ছে আপনাদের স্বপ্ন—সতপন্থ।

সুন্দর হিমবাহের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে সাদা বরফের বুকে একেবারে পাশাপাশি ছোট ছোট জলাশয়। মজা কি জানেন—তার কোনোটা গাঢ় লাল, কোনোটা বা ঘন নীল, আবার কোনোটা ধবধবে সাদা। প্রকৃতির অদ্ভুত লীলা!

সুন্দর হিমবাহ পার হয়ে হাজির হলাম এক বিপজ্জনক ভাঙা পাহাড়ের রাজত্বে। দু'ধারের গিরিশিরা বেয়ে অবিরাম নেমে আসছে নানা আকারের পাথর। অথচ দুই গিরিশিরার মাঝ দিয়েই চলতে হচ্ছে আমাদের। আমরা সন্ত্রস্তভাবে পথ চলছি। পরস্পরকে সাবধান করছি। ক্লান্ত লাগলেও বিশ্রাম নেবার উপায় নেই।

বেলা তিনটে নাগাদ উঠে এলাম ছোট একটা সুন্দর উপত্যকায়। মাঝ দিয়ে তির তির করে বয়ে চলেছে ছোট্ট ঝর্ণা। ডানদিকে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে চন্দ্র পর্বর্তের গিরিশিরা, বাঁয়ে একটা গিরিশিরার নিচে চতুরঙ্গী। আর সামনে প্রায় এক মাইল চড়াই ভেঙে গিরিশিরার ওপর দাঁড়ালে নিচে দেখা যায় সুরালয় হিমবাহ, আর অদূরে শ্বেতা এবং অল্প দূরে আমাদের স্বপ্ন—কালিন্দীখাল। এখানেই আমাদের শিবির হল। উচ্চতা ১৭,৫০০ ফুট।

পরদিন সকালে বেশ বোঝা গেল দিলীপকে আর নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক হল, দুজন মালবাহক তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে আপনাদের কাছে। আর আমরা সারাদিন গিরিশিরা বেয়ে ওঠা-নামা করে শরীরটাকে তৈরি করব।

আমরা সারাদিন ঘুরে কাটালাম। বেলা দুটো নাগাদ দেখলাম, চতুরঙ্গীর অপর পারে—প্রায় মাইল তিনেক দূরে কয়েকজন মানুষ এগিয়ে চলেছে খুব দ্রুত পদক্ষেপে। ঠিক বুঝতে পারলাম না ওরা কারা? কেননা এই অঞ্চলে এখন আপনারা এবং আমরা ছাড়া আর কোনো অভিযাত্রীদল নেই। তাহলে ওরা কি আপনাদের সহযাত্রীরা? সতপন্থ শিখরে আরোহণ করে অনামীশৃঙ্গে চলেছে?

দিলীপকে পৌঁছে দিয়ে মালবাহকরা ফিরে এল। শুনে আনন্দিত হলাম যে, আপনারা তাকে নিজেদের শিবিরে রেখে দিয়েছেন। আর চিন্তা নেই। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লাম। কেননা কাল খুব সকালেই যাত্রা করতে হবে।

১৯শে সেপ্টেম্বর সকালে ঘুম ভাঙতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সারা ক্যাম্প-সাইট তুষারে সাদা হয়ে গিয়েছে। সূর্যদেবের দেখা নেই। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে একটানা তুষারপাত

চলেছে। তাঁবুর বাইরে বেরুলেই ঠাণ্ডায় জমে যাবার যোগাড়।

তবু তৈরি হতে হবে, তবু চলতে হবে। অর্থ খাদ্য ও সময়ের অভাব। শীত এগিয়ে আসছে দ্রুত পদক্ষেপে। এখন প্রতিটি দিনই খুব মূল্যবান।

পথ প্রথম থেকেই কষ্টকর। তুষারপাতের ভেতরই মাইলখানেক একটানা চড়াই ভাঙা। পোর্টার কম থাকায় মাল বইতে হচ্ছে বেশি। দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সুরালয় হিমবাহকে আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। সাদা—শুধুই সাদা। জীবনে এত সাদা আর কখনো দেখি নি।

সুরালয় হিমবাহ পার হবার পর আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকল। চোরা ফাটল, নরম বরফ কিছুই আর বোঝার উপায় নেই। আইস এক্স ঠুকে ঠুকে আন্দাজে পথ চলা। ভীষণ ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাবার যোগাড়। তবু পার হয়ে এলাম শ্বেতা হিমবাহ।

শ্বেতা পার হয়ে কালিন্দী হিমবাহে উঠে এলাম। ঘড়িতে দুটো বাজে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। শরীর অসাড়। কথাও বলা যাচ্ছে না। আচ্ছন্নের মতো পথ চলছি। মাথা ঝিম ঝিম করছে।

না, আর পারা গেল না। শরীরে আর সইছে না। তুষারপাত না বলে একে বরফের ধারাপাত বলাই ভাল। হাঁটুসমান বরফের মধ্যে আমরা সবাই দাড়িয়ে গেলাম। আরও আধ মাইল এগিয়ে কালিন্দী গিরিপথের ঠিক নিচে ক্যাম্প করার কথা। কিন্তু আমরা কালিন্দী হিমবাহের ওপরেই তাঁবু খাটাব স্থির করলাম। এই আবহাওয়াতে আর চলার শক্তি নেই।

খুব তাড়াতাড়ি বরফ খুঁড়ে তিনটে তাঁবু খাটানো হল। বরফের গর্তের ওপর আপনাদের ত্রিপল খাটিয়ে তৈরি করা হল কিচেন। শোর বাহাদুরকে চা বানাতে বললাম। আমি, দেবু ও আশীষ ঢুকলাম এক তাঁবুতে। ডাক্তার আর উজাগর অন্যটায়। পোর্টাররা থাকছে একটা তাঁবু আর কিচেনে ভাগাভাগি করে।

বেলা তিনটেতেই আঁধার নেমে এসেছে। শীতে হাত-পা জমে গিয়েছে। জমে গিয়েছে সব অনুভূতি। নাইলন টেন্ট-এর ভেতর ফেদার এবং উইণ্ড-প্রুফ জ্যাকেট পরে স্লীপিং-ব্যাগে পা ঢুকিয়ে বসেও দারুণ ঠাণ্ডা লাগছে। চিমটি কেটে, থাপ্পড় মেরে ক্রমাগত চেষ্টা চলছে অসাড় হাত-পায়ের জ্ঞান বজায় রাখার।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। ঝোড়ো হাওয়া ক্রমাগত তাঁবুকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। বাইরে সে এক ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য! পাথরের চিহ্নমাত্র নেই। বরফ তাঁবুর বাইরে মাঝামাঝি পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে।

শোর বাহাদুর চা ও বিস্কুট দিয়ে গেল। আমি তাঁবুর দরজায় আবার জিপ টেনে দিলাম—আর সেই সঙ্গে চতুরঙ্গীর অঙ্গন থেকে ভেসে এল প্রকৃতির উন্মত্ত ও নিষ্ঠুর কোলাহল। আমাদের তাঁবুর বাঁদিকের খুঁটি উপড়ে গেল। থর থর করে কাঁপছে তাঁবুটা। চল্‌কে উঠল চায়ের কাপ। বিরাট ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজে চমকে উঠল অন্তরাত্মা। এ্যাভালাঞ্চ—তুষারধস!

পাশের তাঁবু থেকে উজাগরের অসহায় কান্না ভেসে এল—লিডার সাহাব, বাহার নিকলো। এ্যাভালাঞ্চ আয়ী হ্যায়! বাঁচনা হ্যায় তো ভাগো, জলদি ভাগো।

দুহাত দিয়ে ভেতরের তুষার সরিয়ে তাঁবুর জিপ খুললাম।

না, বাইরে যাবার উপায় নেই। বরফে পথ বন্ধ। আইস এক্স দিয়ে খুঁচিয়ে লাভ হল না। তিন বন্ধুতে সেই তুষারস্তূপে লাথি মারতে লাগলাম। মানুষ যাবার মতো একটা পথ সৃষ্টি হল। বাইরে বেরিয়ে এলাম।

উত্তরকাশী মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের দুঁদে ইনস্ট্রাকটর উজাগর সিং ভেউ ভেউ করে কাঁদছে—বাঁচান সবাইকে। চলুন নিচে পালিয়ে যাই, এখানে কেউ বাঁচব না।

তবু এখানেই থাকতে হবে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। সুরালয় অন্তত দু'ঘণ্টার পথ। আজ সেখানে ফিরব কি করে ? এই বিরাট বিশাল তুষার-সাম্রাজ্যে তিনটি ক্ষুদে টর্চ কতটা পথ দেখাবে ! সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে পথ। এ্যাভালাঞ্চ সে-পথেও নামতে পারে।

চিন্তা-ক্লান্তি-বির্তক। তবু ঠিক হয়, এখানেই থাকব কাল সকাল অবধি। ফিরতে হবেই। কিন্তু আজও নয়। এখন যাত্রা করলে যদিও বা প্রাণ বাঁচে, ফ্রস্টবাইট এড়াতে পারব না। তার চেয়ে দেখাই যাক্ না, মৃত্যু কেমন করে আসে !

ঠিক হল সারারাত আমরা জেগে থাকব। পালা করে তাঁবুর বরফ পরিষ্কার করব। আর সকালবেলা ফিরে যাব সুরালয়ের পথে।

শঙ্কুদা, ধ্যান সিং এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে তৈরি—আপনাদের কাছে যাবে আমাদের খবর নিয়ে। কাজেই দীর্ঘ পত্র দীর্ঘতর করার সুযোগ পেলাম না। দেখা হলে বাকি গল্প শোনাব। বলব সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা।

তবে সেই কালরাত্রির অবসান হয়েছে। আমরা প্রাণে বেঁচেছি। আবার দেখা হবে।

—প্রদীপ্ত'

॥ বারো ॥

"আদমী, সাব আদমী !"

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি। টিকারাম কিচেনের সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখতে পেয়েই সে গিরিশিরার দিকে হাত দেখায়। আবার বলে, "আদমী সাব...আ গ্যয়া !"

হ্যাঁ, আসছে। ঠিকই দেখেছে টিকারাম। গিরিশিরার ওপরে মানুষ। একজন নয়, দুই...তিন...চার...পাঁচ—না, আরও বেশি। মানুষ—মানুষের মিছিল। সারি বেঁধে নিচে নামছে।

এরা কারা ? প্রদীপ্তরা কি ?

না, তারা আজই এখানে আসবে কেমন করে !

তাহলে বোধ হয় বদ্রীনাথ থেকে রওনা হওয়া পুলিসদল !

প্রফেসর ছুটে তাঁবুতে চলে যায়। আর আমরা তাকিয়ে থাকি সেই সারি বেঁধে নেমে-আসা আগন্তুকদের দিকে।

প্রফেসর বাইনোকুলার নিয়ে ফিরে আসে। সে ডাক্তারবাবুকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। যাতে তিনি দুরবীনটা কেড়ে নিতে না পারেন।

আমি প্রফেসরের কাছে আসি। প্রফেসর দুরবীন চোখে লাগায়। আমরা নীরবে তার

দিকে তাকিয়ে থাকি। প্রফেসর চুপ করে আছে। কি দেখছে এতক্ষণ ধরে! না, আর ধৈর্য ধরা যাচ্ছে না।

"মনে হচ্ছে আমাদের দল।" প্রফেসর হঠাৎ বলে ওঠে।

"আমাদের দল!" আমরা চমকিত।

"হ্যাঁ।" প্রফেসর আবার বলে, "ওদের গায়ে কমলা রঙের পুলওভার।"

"কমলা রঙের পুলওভার?" আমরা সচকিত।

"হ্যাঁ, কমলা রঙ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।" প্রফেসর ভাল করে দেখে নেয়।

"তাহলে আমাদের দল নয়, আমাদের কারও কমলা রঙের পুলওভার নেই।" দিলীপ জানায়।

"পুলিসদের কারও কমলা রঙের সোয়েটার ছিল না।" বরেণ্য বলে।

"এ পুলিস সে পুলিস নয়। এঁরা বদ্রীনাথ থেকে আসছেন।" একটু থামেন ডাক্তারবাবু। তারপর প্রফেসরের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বলেন, "দিন তো মশাই, দুরবীনটা একবার আমাকে দিন দেখি!"

প্রফেসর অনেকক্ষণ দেখেছে। কাজেই সে ডাক্তারবাবুর দাবি উপেক্ষা করতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুরবীনটা ডাক্তারবাবুর হাতে দেয়।

ডাক্তারবাবু দুরবীন চোখে লাগান। চাকা ঘুরিয়ে ঠিক করে নেন। তারপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওদের লক্ষ্য করতে থাকেন। আমরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি।

"অমূল্য।"

"অমূল্য!"

"হ্যাঁ, অমূল্য। নিশ্চয়ই অমূল্য। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি অমূল্য।"

ডাক্তারবাবু চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'তার পেছনে অসি.... হ্যাঁ, অসিতবাবু। তার...পর হি....হ্যাঁ, হিমাদ্রি, তারপর... না, ঠিক চিনতে পারছি না। শেরপাদের কেউ হবে হয়তো।"

এসেছে। যাদের পথ চেয়ে বসে আছি, তারাই এসেছে। আমার সহযাত্রীরা ফিরে এসেছে।

আর কিছু ভাবতে পারি না। নিজের অলক্ষ্যেই ছুটে চলি। প্রস্তরময় চড়াই প্রান্তর, পায়ে হাওয়াই চপ্পল—তবু ছুটে চলি। বীরেন বরেণ্য প্রফেসর ডাক্তারবাবু দিলীপ টিকারাম মেট—সবাই আমার সঙ্গে ছুটছে। এখানে এভাবে ছোটা ঠিক নয়, পড়ে যেতে পারি। তবু আমরা ছুটছি।

অমূল্যদের গতিও যেন বেড়ে গেছে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি করে নামছে। এভাবে নামা উচিত নয়, পা ফস্‌কে যেতে পারে। তবু ওরা নামছে।

অবাধ্য জুতো আর বে-রসিক পাথরগুলিকে বেয়াদপি উপেক্ষা করে আমরা ওপরে উঠছি।

শ্রান্ত দেহের সকল দাবিকে অস্বীকার করে ওরা নিচে নামছে।

আমরা যেতে চাইছি ওদের কাছে।

ওরা আসতে চাইছে আমাদের কাছে।

এসে গেছে, ওরা এসে গেছে! ঐ তো অমূল্য, অসিত, হিমাদ্রি, দা রিঞ্জি, দোরজি,

ছুঞ্জে, জামিদ, লাকপা, নিমা....

এসেছে, ওরা ফিরে এসেছে! দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে যাদের চোখের জলে বিদায় দিয়েছিলাম, তারা ফিরে এসেছে—সকল বিপদ ও বাধাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, ভয়কে জয় করে, মৃত্যুর জগতে জীবনের জয়গান গেয়ে ওরা আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। বিগত কয়েকদিন ধরে প্রতিক্ষণে যে পরম-মুহূর্তের প্রতীক্ষা করেছি, সেই শুভলগ্ন সমাগত—পরমানন্দের লগ্ন।

কিন্তু ওরা নীরব কেন? আমাদের সাদর সম্ভাষণে সাড়া দিচ্ছে না কেন? ওদের চোখে জল কেন?

হ্যাঁ, কাঁদছে, ওরা কাঁদছে। আমার সহযাত্রীরা কাঁদছে।

কেন? ওরা কি অনামীশৃঙ্গে আরোহণ করতে পারে নি?

না পারুক, ওরা তো চেষ্টা করেছে!

না, সেজন্য নিশ্চয়ই কাঁদছে না। অন্য কোনো কারণ আছে। কি কারণ? ...দুর্ঘটনা?

করুণা, স্বপন, সুজল আর প্রাণেশ কোথায়? তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না! তাহলে কি কাল তুষারপাতের মধ্যে অনামীশৃঙ্গে আরোহণ করতে গিয়ে....

আর ভাবতে পারি না।

ওরা কাছে এসেছে—অমূল্য, হিমাদ্রি, অসিত, জামিদ, ছুঞ্জে, দা রিঞ্জি, দোরজি, নিমা.. কাছে আরও কাছে, আমার বুকের মাঝে।

অমূল্য দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। আমার বুকে মুখ রেখে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছে।

আমি কোনো কথা বলতে পারছি না। কি বলব? ভয়ে আর আনন্দে আমার সব কথা হারিয়ে গেছে।

অমূল্যর অশ্রুতে সিক্ত হচ্ছে আমার বক্ষোদেশ। কিন্তু তাতে আমার বুকের আগুন নিভছে না।

কি হয়েছে? কেন এমন করে কাঁদছে ওরা? অথচ ভয়ে সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারছি না।

সহসা রোদন-রুদ্ধ স্বরে অমূল্য বলে ওঠে, "শঙ্কুদা, আমি পারি নি।"

"কি?" কোনোমতে প্রশ্ন করি।

"সতপন্থ শিখরে জাতীয় পতাকা ওড়াতে.... তোমাদের দেওয়া দায়িত্ব পালন.... কর্তব্য সম্পাদন করতে। আমি অযোগ্য নেতা।"

এই জন্য কাঁদছে অমূল্য! এ তো কোনো দুঃসংবাদ নয়! তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি, "তোদের শরীর কেমন আছে?"

"ভাল।"

"সবাই?"

"হ্যাঁ।"

"সুজল, স্বপন, প্রাণেশ, করুণা...."

"আসছে। রাস্তা ভাল নয় বলে, কুলিদের সঙ্গে নিয়ে আসছে।"

আসছে, ওরাও আসছে. সবাই সুস্থ শরীরে ফিরে আসছে! কি আনন্দ!

"তাহলে তোরা কাঁদছিস কেন ?" বীরেন জিজ্ঞেস করে অমূল্যকে।
আমি জোর করে আমার বুক থেকে ওর মাথাটা সরিয়ে দিই।
বরেণ্য রুমাল বের করে অমূল্যর চোখদুটি মুছিয়ে দেয়।
ডাক্তারবাবু ও প্রফেসর অসিত আর হিমাদ্রিকে বুকে টেনে নেয়।
বীরেন আবার জিজ্ঞেস করে, "তোরা কাঁদছিস কেন ?"
অমূল্য সেই প্রশ্নের জবাব দেয় না। কেবল বলে, "অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পেলাম না।"
"কি ?"
"সতপন্থ শিখরের পথ।"
"সে তো আমরা সবাই জানি !" ডাক্তারবাবু অমূল্যকে বলেন, "কিন্তু তার জন্য এমন কান্নাকাটি করছ কেন ? 'Defeat is not failure so long as the will to try again persists.' আবার আসবে। আজ যা পারলে না, সেদিন তা পারবে। সতপন্থ তো পালিয়ে যাচ্ছে না, সে থাকবে। যখন আমরা কেউ থাকব না, তখনও থাকবে।"
"ছিঃ ছিঃ !" অমূল্য ডাক্তারবাবুর কথার কোনো উত্তর দেবার আগেই প্রফেসর তাকে ধমক লাগায়, "চরম বিপর্যয়ের মুখে স্থির ও অবিচলিত থেকে, সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে, আজ কিনা আপনি নিজেই কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন ! যাক্‌গে, যা কাঁদার কেঁদে নিয়েছেন, আর কাঁদলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি !"
প্রফেসরের চরম উক্তিতে কাজ হয়। হিমাদ্রি আর অসিত চোখ মোছে। সুযোগ পেয়ে অমূল্যকে জিজ্ঞেস করি, "অনামীশৃঙ্গের খবর কি ?"
সহসা কোথা থেকে যেন এক পশলা হাসি এসে হাজির হয় অমূল্যর সারামুখে। সে মৃদুস্বরে বলে, "পেরেছি।"
"এ্যাঁ ! কি..কি পেরেছিস ?"
"ক্লাইম্ব, মানে আমরা আরোহণ করতে পেরেছি।"
"পেরেছিস ?"
"হ্যাঁ।"
"কবে ?"
"কাল।"
"তুষারপাতের মধ্যে ?"
"হ্যাঁ।"
"কে কে শিখরে উঠেছে ?"
"সবাই।"
"মানে ?"
"আমি সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা সাতজন, জামিদ ও পাঁচজন শেরপা।"
"তার পরও তোরা কাঁদছিস !" বীরেন চেঁচিয়ে ওঠে।
অমূল্য নীরব, অসিত, হিমাদ্রি ও জামিদ নীরব, শেরপারা নীরব। সতপন্থের পরাজয় ওদের মনের আকাশকে আজও বর্ষণমুখর করে রেখেছে। অনামী শৃঙ্গারোহণকে ওরা বিজয় বলে ভাবতে পারছে না।
ভুল, নিতান্তই ভুল। পর্বতারোহণের কোনো সাফল্যই কম কৃতিত্বপূর্ণ নয়। কঠিনতম

শিখর-বিজয়ীও সহজতম শিখরে পরাজিত হতে পারে। একাধিকবার কোনো শিখরে আরোহণ করার পরেও কেউ বলতে পারে না, সে আর একবার ঐ শিখরে আরোহণ করতে পারবে।

কাজেই ২১,৭১০ ফুট উঁচু এই অপরাজিত অনামী শিখরারোহণ নিশ্চয়ই কৃতিত্বপূর্ণ। আমরা তাই আর মনমরা হয়ে থাকব না। সফলকাম অভিযাত্রীদের অভিনন্দন জানাব।

আমরা ওদের আবার বুকে টেনে নিই। আলিঙ্গন করি।

"থ্রি চিয়ার্স ফর সামিটারস অমূল্য সেন, জামিদ সিং, হিমাদ্রি ভট্চাজ এ্যাণ্ড অসিত বোস..." বরেণ্য বলে ওঠে।

"হিপ্ হিপ্ হুররে..." আমরা সাড়া দিই।

আমাদের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত হয়েছে। চতুরঙ্গীর অঙ্গন মুখরিত হয়েছে মানুষের জয়গানে। আমাদের প্রতীক্ষা সার্থক হল, মন-শরীর শাপমুক্ত হল।

কিন্তু বার বার আমরা অনামীশৃঙ্গ বলছি কেন? আর তো সে নামহীন নয়! আমরা তার নাম দিয়েছি রাধানাথ পর্বত—বন্ধুবর অমিতাভ দাশগুপ্তর দেওয়া নাম। এখন থেকে সেই হবে তার পরিচয়, যে পরিচয়ে হিমালয়ের একটি শিখরের পরিচিত হওয়া উচিত ছিল বিশ বছর আগে—ভারত স্বাধীন হবার অনতিকাল পরে।

কিন্তু তা হয় নি। কারণ আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা এভারেস্ট জয় করেছি, অথচ মাউন্ট এভারেস্ট-এর আবিষ্কর্তাকে ভুলে গেছি। ভুলে গেছি ১৮৫২ সালের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা, যার আগে মাউন্ট এভারেস্ট-এর নাম ছিল Pcak XV আর K-2 বা গডউইন অস্টেন (২৮,২৫০) ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখর।

১৮৩২ সালে মেধাবী ছাত্র রাধানাথ সিকদার হিন্দু কলেজের অধ্যাপক টাইটলারের সুপারিশে চাকরি পেলেন ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসে। অচিরে তিনি সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্ট-এর প্রিয়পাত্রে পরিণত হলেন। এর কিছুকাল পরে স্যার জর্জ "Ray Tracc Systcm" নামে জরিপে এক নতুন পদ্ধতির প্রণয়ন করেন। তরুণ বৈজ্ঞানিক রাধানাথ এই পদ্ধতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। স্যার জর্জ তখন তাঁকে হিমালয়ে পাঠালেন।

১৮৪৩ সালে স্যার জর্জ এভারেস্ট অবসর গ্রহণ করার পরে স্যার এণ্ড্রু অ (Andrew Waugh) সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত হলেন। রাধানাথের অসাধারণ মেধা ও অমায়িক ব্যবহারে তিনিও মুগ্ধ হলেন।

১৮৪৯ সালে রাধানাথ Pcak XV শিখরের উচ্চতা নির্ণয় আরম্ভ করেন। ১৮৫২ সালে যেদিন সেই গণনা শেষ হয়, সেই দিনটি হিমালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকা উচিত। গণনা শেষ হওয়া মাত্র রাধানাথ ছুটে এলেন সার্ভেয়ার জেনারেলের ঘরে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'Sir, I havc discovered the highest mountain in thc world!'

ইদানীং অবশ্য কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন, রাধানাথ সিকদারের নামে মাউন্ট এভারেস্টের নাম রাখা হোক—মাউন্ট রাধানাথ। অবাস্তব প্রস্তাব। প্রথমত, এভারেস্ট নেপালে অবস্থিত, তার নাম পাল্টাবার কোনো অধিকার নেই আমাদের। দ্বিতীয়ত, বিগত শতাধিক বছর ধরে সে ঐ নামে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়ে আসছে। তৃতীয়ত, নেপালীদের এই গিরিশৃঙ্গের একটি নিজস্ব নাম আছে—সাগরমাতা।

তাছাড়া এই বা কেমন কথা যে, একজনকে সম্মান দেখাতে হলে আরেকজনের

সম্মান কেড়ে নিতে হবে ! রাধানাথ বেঁচে থাকলে কিছুতেই তিনি এ প্রস্তাব সমর্থন করতেন না।

আর তার কি কোনো প্রয়োজন আছে ? এত বড় আমাদের দেশ, সমস্ত উত্তর দিক জুড়ে রয়েছে হিমালয়। বিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু কয়েকশ' অনামী শিখর রয়েছে ভারতীয় হিমালয়ে। এ বছর এর ছ'টি শিখরে ভারতীয়রা আরোহণ করেছেন, তাদের নামও রেখেছেন। কিন্তু তখন কারও মনে পড়ে নি রাধানাথের নাম।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যতটুকু সম্ভব হল আমরা তাই করলাম। জানি না, এতে জাতির অকৃতজ্ঞ অপবাদ ঘুচবে কিনা ! কিন্তু আমরা আজ শুধু সেই প্রতিভাধর হিমালয়-প্রেমিক রাধানাথ সিকদারের অমর আত্মাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বলছি—তুমি আমাদের প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করো। আমরা তোমাকে ভুলি নি, কোনোদিন ভুলব না।

*　　*　　*

দিনের শেষ আলো গেল মিলিয়ে, গোধূলির ছায়া নামল হিমালয়ে—বাসুকি আর ভাগীরথী পর্বতের পাদদেশে, চতুরঙ্গীর অঙ্গনে।

ওরা ফিরে এল—সুজল, প্রাণেশ, স্বপন ও করুণা। ফিরে এল কুলিরা। সবাই এসেছে ফিরে। আমরা ওদের আলিঙ্গন করি, অভিনন্দিত করি। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আমাদের আনন্দে চতুরঙ্গীর অঙ্গন আজ আনন্দলোকে পরিণত।

দিন ফুরলো, সন্ধ্যে হল। চতুরঙ্গীর অঙ্গনে শেষ দিন—শেষ সন্ধ্যা। কাল সকাল থেকেই শুরু হবে ফেরার পালা। আগামীকাল আমরা বিদায় নেব চতুরঙ্গীর কাছ থেকে—নেমে যাব গোমুখী।

মনে পড়ছে সেদিনের কথা, যেদিন গোমুখী থেকে এই যাত্রা শুরু করেছিলাম। সেদিন কত আশা ছিল, আশঙ্কা ছিল ; ছিল কত ভয় আর ভাবনা। আজ সে সবের অবসান হয়েছে। যুদ্ধের পরে যেমন আসে শান্তি, অভিযানের পরে তেমনি আসে বিশ্রাম। আজ আমাদের বিশ্রাম।—পরিপূর্ণ বিশ্রাম। বহু-আকাঙ্খিত সেই সুন্দর সন্ধ্যা সমাগত।

অথচ ক'দিনেরই বা কথা ! আমরা গোমুখী থেকে রওনা হয়েছি ১১ই আর আজ ২০শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু হাসি-কান্নায় ভরা এই দশ দিনের দাম বছরেরও বেশি ! জীবনের শেষ সন্ধ্যায়ও তাই আজকের এই সন্ধ্যাটির কথা মনে থাকবে।

আজ কুলি ও শেরপারাই সব করে দিয়েছে। ওদের এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলিয়ে, রুক্‌স্যাক ও কিট গুছিয়ে রেখেছে। আজ জামিদ আলাদা তাঁবুতে শোবে। দিলীপ থাকবে সেই তাঁবুতে। বাকি সবাই মেস-টেন্টে থাকব। একটু কষ্ট হবে। তা হোক্‌গে !

তাই বলে তাঁবুতে বসি নি আমরা। কিচেনের সামনের উঠানে বসেছি গোল হয়ে। না, আর বরফ নেই। এখন শিবির তুষার-মুক্ত। সব বরফ গলে গেছে।

দোরজি আগুন জ্বালিয়েছে। সেই আগুনে আলোকিত হয়েছে সারা শিবির। আগুন—যে আগুন থেকে সভ্যতার সূত্রপাত। মাটির জগতে আমরা আগুনের অবদানকে ঠিক এমন করে উপলব্ধি করতে পারি না। আজ এই হিমশীতল হিমালয়ে আগুনের উষ্ণ-পরশকে মঙ্গলময়ের আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছে।

কাল এমন সময় মুষলধারে তুষার পড়েছে আর আজ নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ। আকাশে লক্ষ তারার দেয়ালী। আমাদের বিজয়-উৎসবে প্রকৃতির উপহার।

যাক্‌গে, যে কথা বলছিলাম। কিচেনের সামনে আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসেছি সবাই। কেবল সদস্যরাই নয়, শেরপা ও কুলিরাও অনেকে রয়েছে। ওরা আমাদের বেতনভুক্‌ হতে পারে, কিন্তু ওরাও অভিযাত্রী—আমাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার।

ফিরে আসার পরে টিকারাম যথারীতি সবাইকে চা, চানাচুর ও বিস্কুট খাইয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রধান পাচক ছুঞ্জে তাতে সন্তুষ্ট নয়। সে নিজে গিয়ে কিচেনে ঢুকেছে। আমরা নিষেধ করছি, তাকে আজ বিশ্রাম নিতে বলেছি কিন্তু সে শোনে নি। বরং বলেছে, আজ ডিনার দেরিতে হবে—রাত দশটায়। কারণ ঘি এবং কনডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক যথেষ্ট আছে। তাই দিয়ে পোলাও আর পায়েস রান্না হবে। তবে আমরা যাতে খিদেয় কষ্ট না পাই, তাই মাঝখানে একবার পকোড়া ও কফি পাব।

"আরে সাবাস, এই না হলে বেস-ক্যাম্প!"

"বেস নয়, এ্যাড্‌ভান্স বেস—এ. বি. সি.।" সুজলের ভুল ধরিয়ে দিয়েছি।

"ঐ হল আর কি, যেখানে ভাল খাওয়া, সেখানেই বেস-ক্যাম্প।" সুজল বলেছে।

তাই আমরা বসে আছি কিচেনের সামনে। আগুন পোহাতে পোহাতে গল্প করছি আর অপেক্ষায় আছি কখন পকোড়া আসে!

এসেছে, লাকপা নিয়ে এসেছে পকোড়া। সুজল তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলে, "দাও লাকপা, আমার হাতে থালাটা দাও।"

"তোকে দেবে কেন?" অসিত গর্জে ওঠে, "তুই কে?"

"আমি ডেপুটি লীডার।" সুজল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

"সে যতক্ষণ ওপরে ছিলি। এখন আবার তুই ট্রান্সপোর্ট অফিসার। যা, কুলিদের তাঁবু থেকে ঘুরে আয় একবার।" একটু থেমে অসিত বলে, "লাকপা ভাই! তুম তো জানতাই হ্যায় জো ম্যাঁয় কোয়ার্টার মাস্টার হুঁ। দো ভায়া, পকোড়াকো থালি মুঝকো দো!"

লাকপা বিভ্রান্ত। সে অমূল্যর দিকে তাকায়। অমূল্য বুঝতে পারে না কি বলবে! সে ইসারায় বীরেনকে একটা সমাধান করে দিতে বলে।

"লাকপা, কোয়ার্টার মাস্টারসাবকো দো!"

লাকপা তাড়াতাড়ি থালাখানি অসিতের হাতে তুলে দিয়ে কিচেনে চলে যায়।

"ঠিক আছে সেক্রেটারী!" সুজল বীরেনের ওপরে ক্ষেপে গেছে, "কলকাতায় ফিরে ঐ কোয়ার্টার মাস্টারকে দিয়েই রিপোর্ট টাইপ করিও।"

বীরেন প্রমাদ গনে। আমাদের মধ্যে একমাত্র সুজল স্টেনোগ্রাফি জানে। তার সাহায্য ছাড়া বীরেনের পক্ষে কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। কাজেই, সে তাড়াতাড়ি বলে, "না, মানে এই, খাবার ভাগ-টাগ করা তো কোয়ার্টার মাস্টারেরই কাজ!"

"কখনই নয়!" প্রাণেশ মন্তব্য করে, "কোয়ার্টার মাস্টারের কাজ খাবার তৈরি করা। বিশেষ করে, সেই কোয়ার্টার মাস্টার যদি পেটুক হয়।"

অসিত এসব কথায় কান দেয় না। সে পকোড়া ভাগ করছে।

হিমাদ্রি প্রাণেশকে জিজ্ঞাসা করে, "তাহলে খাবার ভাগ করবে কে?"

"কেন, মেডিক্যাল অফিসার!" প্রাণেশ উত্তর দেবার আগেই স্বপন বলে ওঠে, "সদস্যদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব যখন আমার ওপর, তখন আমাকেই খাবার ভাগ করতে দেওয়া উচিত।

তবে..." সে একটু থামে, "অসিতদা যদি আমার শেয়ারটা একটু স্পেশালী কনসিডার করেন, তাহলে আমি এই কাজে কোয়ার্টার মাস্টারকে ডেপিউট করতে পারি।"

ছুঞ্জে নিজেই কফি নিয়ে আসে। কফিতে চুমুক দিয়ে অমূল্যকে বলি, "এবারে রাধানাথ পর্বত বিজয়ের কাহিনী শোনা।"

"আমি নয়, সে-কাহিনী সুজল শোনাবে।"

ইতিমধ্যে সুজলের মেজাজ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। কারণ, অসিত পকোড়া পরিবেশনের সময় তাকে ঠকায় নি।

সুজল জিজ্ঞেস করে, "আপনারা তো ১৮ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ, যেদিন আমরা সতপন্থ অভিযানের এক নম্বর শিবির গুটিয়ে আড়াআড়ি ভাবে চতুরঙ্গী হিমবাহকে অতিক্রম করে..."

"জানি।" আমি সুজলকে বাধা দিই। বলি, "সেদিনকার কথা করুণা জানিয়েছে আমাদের। তোরা রাধানাথ পর্বতের শিখরশিরার ঠিক নিচে ছোট্ট একটি জলাশয়ের তীরে ১৮,০০০ ফুটে লেক-ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করলি। করুণা ও প্রাণেশের সঙ্গে তুই এক তাঁবুতে ছিলি। ব্যর্থতার ঘায়ে সেদিন তোদের মনের বন্ধ দুয়ার খুলে গিয়েছিল। তোরা ব্যক্তিগত আলোচনায় ব্যস্ত হয়েছিলি।"

"কি সেই আলোচনা?" হঠাৎ স্বপন প্রশ্ন করে।

হেসে বলি, "করুণা ও প্রাণেশ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।"

"করুণাদা বলো!" সঙ্গে সঙ্গে ফরমাশ করে বরেণ্য।

"না", আমি বলি, "সেগুলো প্রাইভেট ব্যাপার।"

"পর্বতারোহণে এসে পর্বতারোহীর প্রাইভেট কোনো ব্যাপার থাকতে পারে না।" বরেণ্য বলে।

আমি কিছু বলে ওঠার আগেই অসিত বলে ওঠে, "বরেণ্য ঠিকই বলেছে। আমার বউ-য়ের চিঠি যদি ওরা সবাই দেখতে পারে, তাহলে ওদের 'তাদের' কথাই বা আমি শুনতে পাব না কেন?"

অকাট্য যুক্তি। কাজেই, আমি চুপ করে থাকি।

কিন্তু সুজল ঘাবড়াবার ছেলে নয়। সে বলে, "তোমার বউ আমাদের পরম-পূজনীয়া বৌদি, তাই তো আমরা তাঁর চিঠি পড়ি।"

"তোদের তারাও তো আমার আদরের বৌমা হবে, তাই তো আমি তাদের কথা শুনতে চাইছি!" সঙ্গে সঙ্গে অসিত উত্তর দেয়।

আমরা হেসে উঠি। হাসি থামলে বলি, "আচ্ছা, সে-সব কথা আরেক দিন হবে। আজ রাধানাথ পর্বতের কথা হোক্। এখন ১৯শে সেপ্টেম্বরের কথা শোনা যাক্।"

সুজল যেন বেঁচে যায়। সে তাড়াতাড়ি বলতে থাকে, "করুণা আপনাদের ১৮ই সেপ্টেম্বরের কথা জানিয়েছে। তাহলেও আমাকে সেদিন থেকেই শুরু করতে হবে। নইলে, আপনাদের বুঝতে অসুবিধে হবে।"

"বেশ তো, তাই বল! আমাদের শুনতে কোনো আপত্তি নেই।"

সুজল শুরু করে—

"সতপন্থ পথ দেয় নি। আবার আসার ইচ্ছা নিয়ে ওকে বিদায় জানিয়ে চলে এসেছি চতুরঙ্গীর দক্ষিণ ঢাল থেকে উত্তর ঢালে। হিমবাহ গর্ভ থেকে প্রায় হাজার ফুট

ওপরে—১৮,০০০ ফুট উঁচুতে সুন্দর ছোট্ট একটি হ্রদের ধারে আমরা শিবির ফেলেছি। আবহাওয়া এতদিন বেশ পরিষ্কারই ছিল, কিন্তু আজ আকাশটা কেমন ঘোলাটে লাগছে। আমাদের শিবিরের উত্তর-পূর্ব দিকে সেই অনামী শৃঙ্গ। এখানে আসার সময় তাকে দেখেছি। এখান থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না—সামনের গিরিশিরায় আড়াল পড়েছে। দলের সবাই সুস্থ। আগামীকালের পরিকল্পনা করি। আবহাওয়া ইতিমধ্যে খারাপ হয়েছে—ঝির ঝির করে তুষার পড়ছে।

ঠিক হয়, আগামীকাল আমরা যত ভোরে সম্ভব বেরিয়ে পড়ব। চারটি দল হবে। প্রথম দলে থাকবে প্রাণেশ, স্বপন, লাকপা ও নিমা, দ্বিতীয় দলে আমি করুণা ও দা রিঞ্জি, তৃতীয় দলে অসিতদা, হিমাদ্রি ও দোরজি এবং চতুর্থ দলে অমূল্য, জামিদ সিং ও ছুঞ্জে। রুকস্যাক গুছিয়ে ফেলি। কাল অত ভোরে গোছগাছ করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। প্রত্যেক দলের খাবার ভাগ করে দেওয়া হয়। চকোলেট আমসত্ব, কিসমিস, কাজু প্রভৃতি শুকনো খাবার। গলা ভেজানোর জন্য টিনে-ভর্তি ফলের রস আর রসে-ভেজানো আনারস ইত্যাদি। এ ছাড়া থাকে দড়ি পিটন ক্যারাবিনা প্রভৃতি। প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখে হিসেব করে নেওয়ার দায়িত্ব দলের এক-একজনের ওপর দিয়ে দেওয়া হয়।

দিনের আলো কমে এসেছে। তুষারপাতের বিরাম নেই। ইতিমধ্যে আমাদের ক্যাম্পের আশপাশে বড় বড় পাথরগুলো তুষারের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে—তাঁবুর ওপর থেকে মাঝে মাঝে তুষার ঝেড়ে ফেলে দিতে হচ্ছে। ছুঞ্জে রান্নাঘরে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ বাদে বাদে কফি ও বিস্কুট পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিকেল ছ'টা নাগাদ রাতের খাওয়া শেষ করে যে যার তাঁবুর মধ্যে ঢুকি। এখন তুষারপাত আরও বেড়েছে। করুণা আমি আর প্রাণেশ এক তাঁবুতে। মোমবাতির আলোয় স্লীপিং-ব্যাগের মধ্যে আধখানা শরীর ঢুকিয়ে আধশোয়া অবস্থায় আমরা গল্প করি।

রাত বেড়ে চলে, ঘুম বিশেষ পাচ্ছে না—তাঁবুর ওপর বরফ পড়ার একটানা টিপ টিপ শব্দ। চারদিকে একটা মোহাচ্ছন্ন পরিবেশ। নিজেদের কথাগুলোই কেমন যেন জোরে জোরে শোনাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। একসময় ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আমরা ঘুমের কোলে ঢলে পড়ি।

ভোরবেলা ছুঞ্জের হাঁক-ডাকে ঘুম ভাঙে। তখনো ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চে ঘড়ি দেখি—ভোর চারটে। তাঁবুর ওপর বেশ বরফ জমে গেছে, তাই বরফ পড়ছে কিনা ঠিক বুঝতে পারি না। ছুঞ্জেকে জিজ্ঞেস করি। সে বলে, 'পড়ছে, তবে কমের দিকে। বোধ হয় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবে।'

মগের ঠুন ঠুন আওয়াজ কানে আসে। তাঁবুতে তাঁবুতে চা-য়ের মগ এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় স্লীপিং-ব্যাগের উষ্ণ পরশ ছেড়ে ওঠার নির্দয় নির্দেশ। এই সময় এদের বড় হৃদয়হীন বলে মনে হয়।

চা-য়ের মগ খালি করে তৈরি হয়ে বাইরে আমি। বাইরে তখনও অন্ধকার—অল্প অল্প বরফ পড়ছে। কিন্তু আকাশে আলোর আভাস—মেঘ কাটছে বলে মনে হয়।

পাঁচটার সময় আমরা বেরিয়ে পড়ি। তখনও পুরো আলো ফোটে নি। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করি। উত্তর-পূর্বের গিরিশিরাটি ধরে উঠতে আরম্ভ করি। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে—আমাদের নিঃশ্বাসও ঘন হয়েছে। পথ এখন বেশি দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। গিরিশিরাটি গিয়ে মিশেছে শিখর-শিরার সঙ্গে। মাঝে মাঝে

দম নেবার জন্য একটু দাঁড়াচ্ছি, আবার উঠছি।

বরফ পড়া থেমেছে। দিনের আলো ফুটেছে, কিন্তু আকাশ মেঘলা। অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। মাঝে মাঝে থেমে চারিদিকের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছি—কিন্তু বৃথা। ঘন মেঘে দৃষ্টি আহত হয়ে ফিরে আসছে। চারিদিকের চূড়াগুলো মেঘের আড়ালে নিজেদের এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছে যে, সন্দেহ জাগে, আদৌ তারা ওখানে আছে কি না! শিখরে ওঠার পথে চারিদিকের এই মহিমময় দৃশ্য পর্বতারোহী-জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদকেই সে ক্যামেরায় ধরে রাখতে চায়। আমাদের ভাগ্য খারাপ। আমরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রকৃতি আজ আমাদের প্রতি বিরূপা। তবু আমরা তাঁকে প্রণাম জানাই। তাঁর প্রসাদ ছাড়া শিখরারোহণ সম্ভব নয়।

বেলা আটটা নাগাদ আমরা একটি ছোট্ট সমতলে পৌঁছুই। অলটিমিটারে উচ্চতা দেখাচ্ছে বিশ হাজার ফুট। এতক্ষণ আমরা একটুও বসি নি, একটানা উঠে এসেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়েছি। সবায়ের গলা শুকিয়ে এসেছে। এখানে আমরা মিনিট পনেরো বিশ্রাম নেব। আমের রসের টিনে চুমুক দিতে দিতে আবার চারিদিকে তাকাই। এখানেই কয়েক মিনিটের জন্য প্রকৃতি সদয়া হন। নিশ্ছিদ্র মেঘের চাঁদোয়ার কয়েক জায়গা যেন ছিঁড়ে যায়, আর তারই ফাঁক দিয়ে চারিপাশের চূড়াগুলোর ঝাঁকি-দর্শন লাভ করি। অনামী শৃঙ্গের চূড়াটিকেও দেখতে পাই। গতকাল লেক-ক্যাম্পে পৌঁছবার পর থেকে এই তার সঙ্গে প্রথম দেখা। কয়েক মুহূর্ত মাত্র—মেঘের ছিদ্র ভরাট হয়, আবার আগের অবস্থা।

শিখরটির দর্শনলাভ করায় আমাদের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়। বেলা দশটা নাগাদ আমরা মূল-শিখর শিরায় পৌঁছই। এখান থেকেই বরফ আরম্ভ হয়েছে। সামান্য জলযোগ সেরে নিয়ে আমরা দল অনুসারে কোমরে দড়ি বেঁধে নিই। জুতোর নিচে ক্র্যাম্পন লাগিয়ে নিতে হয়। গিরিশিরাটি ফুট তিনেক চওড়া। পুবদিকে উঠতে শুরু করি। গিরিশিরার উত্তর দিকটা খাড়া নেমে গেছে এবং দক্ষিণ দিকটা ক্রমশঃ ঢালু। ডানদিক চেপে চলতে থাকি। ফটো তুলতে তুলতে যাব বলে আমি রোপের শেষে রয়েছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তবু গিরিশিরাটির অনেকটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

বরফ অল্প। জুতোর তলার কাঁটা বেশ ভালভাবেই ধরছে। ঢালটিও ক্রমোচ্চ, সুতরাং অসুবিধে বিশেষ নেই। প্রাণেশদের দল এগিয়ে গেছে। ঘন কুয়াশার মধ্যে চলন্ত বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে ওদের। আমাদের পেছনে অন্য দল দুটি আসছে। ধীরে ধীরে উচ্চতা লাভ করছি। প্রায় ৪০০ ফুটের মতো উঠে গিরিশিরাটি একটি ছোট্ট বরফের প্রান্তরে এসে মিশেছে। এখান থেকে শিখরটি দেখা যাচ্ছে।

প্রাণেশরা হাত নাড়ছে। ওদের চলা শেষ হয়েছে—ওরা শিখরে পৌঁছে গেছে।

প্রান্তরটির মধ্যে কয়েকটি অনুচ্চ বরফের ঢিবি। আমরা তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে চলি লক্ষ্যের দিকে। অবশেষে শেষ ঢালটির সামনে এসে পড়ি। শিখরঢালটিকে বরফের প্রান্তর থেকে আলাদা করে একটা বিরাট ফাটল মুখব্যাদান করে রয়েছে।

ডানদিকে কোনো পথ নেই। আমরা প্রান্তরটির বাঁদিকে একটু নেমে আসি। এখানে প্রকৃতি তাঁর নিজের খেয়ালে শিখরঢাল ও প্রান্তরের মধ্যে একটি বরফের সেতু রচনা করেছেন। আর দেরি সইছে না। সামনে শিখর—আমাদের নাগালের মধ্যে।

আর কোনো বাধা নেই। শ'খানেক ফুট—তারপরই আমরা এসে দাঁড়াই শিখরে—রাধানাথ পর্বতশিখরে, আমাদের চলার শেষ-প্রান্তে। সামনে আর পথ নেই।

পেছনের দল দুটিও এসে পড়েছে। এখন আমরা তেরজন রাধানাথ পর্বতের শিখরদেশে—ঘড়িতে বেলা সাড়ে এগারটা।

শুরু হয় শিখর-পূজা। তারপর ফটো তোলা। ঠিক এই মুহূর্তে আর কোনো চিন্তার অবকাশ নেই। ফটোতে ধরে রাখতে হবে রাধানাথ পর্বত-শিখর। ধরে রাখতে হবে তার শিখরে মানুষের এই প্রথম উপস্থিতিকে।

চারদিকে তাকাই, আকাশ তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। দূরের কোনো দৃশ্যই দেখা যায় না। মনটা খারাপ হয়ে যায়। আমার জীবনে এই প্রথম শিখরে আরোহণ। কিন্তু শিখর থেকে চারিদিকের সেই মন-ভোলানো রূপ দেখতে পেলাম না।

শিখরের পূর্ব-দক্ষিণ দিক খাড়া নেমে গেছে—কোথায় কোন্ অতল গহ্বরে, জানি না। দক্ষিণ দিকের ঝুলে-থাকা কার্নিশের ছবি নিই। পুবদিকের ফটো পাওয়া সম্ভব নয়—ওদিকে এগোবার পথ নেই।

তিন ফুট লম্বা একটি কাঠের পিটন পুঁতে তার কড়ার সঙ্গে দড়ি বেঁধে দেওয়া হল—আমাদের শিখর প্রণামের চিহ্ন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। চারিদিকে তাকাই, দৃষ্টি বার বার ঘন মেঘে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। মনে হয়, হঠাৎ যদি কোনো অদৃশ্য যাদুকরের মায়াস্পর্শে মেঘগুলো একবার সরে যেত, তবে জীবনটা ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় না।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার উপায় নেই। মেঘ ঘন হতে শুরু করেছে। বাতাসেও বেগের সঞ্চার হয়েছে—ঝড়ের ইঙ্গিত। পুনরায় শিখরকে প্রণাম জানিয়ে নামতে শুরু করি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছই। জুতো থেকে ক্র্যাম্পন এবং কোমর থেকে দড়ি খুলে ফেলি। ইতিমধ্যে বরফ পড়া শুরু হয়েছে—বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। দক্ষিণ দিক থেকে প্রচণ্ড বাতাস সোজাসুজি মুখে এসে আঘাত করছে—বরফের কণাগুলি সূঁচের মতো বিঁধছে।

ওঠার সময় পাথরের ওপর পা দিয়ে বেশ সহজেই উঠে এসেছিলাম। এখন নামার সময় সেই পথই অসুবিধার সৃষ্টি করছে। পাথরের ওপর তুষারের হাল্‌কা স্তর—পা পড়া মাত্রই পিছলে যাচ্ছে। ফলে, খুব সাবধানে নামতে হচ্ছে।

নামছি তো নামছিই। এ নামার যেন আর শেষ নেই। ওঠার সময় তো বুঝতে পারি নি, পথ এত দীর্ঘ!

ঝড় একই ভাবে বয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে তুষারপাত। পথ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। এগিয়ে-যাওয়া ছায়ামূর্তির দিকে একবার মুখ তুলে তাকানো—আবার মাথা নিচু করে নেমে চলা।

একসময় কিন্তু পথ শেষ হয়। ক্লান্ত দেহটাকে টেনে এনে তাঁবুর মধ্যে ফেলে দিই। বাইরে প্রচণ্ড তুষারপাত, প্রবল দাপাদাপি।

কিন্তু আমার মন ভরে উঠেছে এক অপার্থিব আনন্দে। হৃদয় পূর্ণ হয়েছে স্বর্গীয় সুষমায়। আমার জীবন ধন্য হল।

সুজল আর কিছু বলতে পারে না। ভাবাবেগে তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে আসে।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘরের ভেতর থেকে বাঁশির শব্দ ভেসে আসে—ডিনারের হুইসিল পড়েছে।

আমরা উঠতে যাই। অসিত বাধা দেয়, "না, না, কিচেনে যাবার দরকার নেই, খাবার

এখানেই আসবে। ছুঞ্জে শুধু জানিয়ে দিল যে, ডিনার রেডি।"

ঘড়ির দিকে তাকাই—ঠিক দশটা। এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ছুঞ্জে যেন ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করে।

একটু বাদেই ছুঞ্জে সহকারীদের সঙ্গে খাবার নিয়ে আসে। পরিবেশন করতে করতে অমূল্যকে বলে, "লীডারসাব, আজ হরলিস্কা বাদ কেম্ফায়ার হোগা।"

প্রাণেশ বলে ওঠে, "ঠিক বোলা ছুঞ্জে মা! হোগা।"

পাহাড়ে এসে অভিযাত্রীরা ছুঞ্জের মধ্যে মাতৃস্নেহের স্পর্শ পায় বলে অনেকেই তাকে "ছুঞ্জে মা" বলে ডাকে। সে-ও ঠিক সাড়া দেয়।

আমরা সকলেই ছুঞ্জের প্রস্তাব সমর্থন করি। কারণ ফ্রাঙ্ক স্মাইথ বলেছেন,—"There is nothing that promotes an intimacy of spirit better than a camp-fire. He is dull and unimaginative who cannot sense the spirit of comradeship that persists within this warm circle of dancing light."

ঠিক হয়, হরলিক্স তথা গরম পানীয়ের পরে ক্যাম্প-ফায়ার শুরু হবে। ছুঞ্জে হরলিক্সকে হরলিস্ বলে।

অবশ্য রাতটা একটু বেশি হয়ে গেছে। তাহলেও আমরা আজ ক্যাম্প-ফায়ার করব। চতুরঙ্গীর অঙ্গনে শেষ রাত। এ রাত তো আর ফিরে আসবে না এ জীবনে।

হঠাৎ সঈদসাহেব দোরজিকে বললেন, "পেট্রোম্যাক্স জ্বালাও।"

বিস্মিত হই। পেট্রোম্যাক্সের আবার কি দরকার! কাঠের আগুনে শীত ও আঁধার উভয়ই বিদায় নিয়েছে এখান থেকে।

কিন্তু সে-কথা জিজ্ঞেস করার আগেই সঈদ বলেন যে, তিনি ক্যাম্প-ফায়ারের ছবি নেবেন। কাজেই, তাঁর আরও আলো চাই।

অনেক দিন এমন ভাল খাবার খাই নি—মাংস-পোলাও। এর পরে আবার মিষ্টান্ন আছে। ছুঞ্জের জয় হোক্!

খেতে খেতে অসিতকে বলি, "আচ্ছা, তুমি যখন রাধানাথ পর্বতশিখরে উপস্থিত হলে, তখন তোমার কি মনে হল?"

"সবার আগে মনে হয়েছে", অসিত উত্তর দেয়, "তাঁদের কথা, যাঁদের সাহায্য আর শুভেচ্ছায় আমার বহুকালের বাসনা পূর্ণ হল। মনে পড়েছে আমার বাবার কথা—কষ্টসহিষ্ণুতা আর মনোবল থাকলে মানুষ সকল বাধা ও বিপদকে জয় করে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। মনে পড়েছে যাঁরা হিমালয় অভিযানে এসে জীবনদান করেছেন। বিশেষ করে আর্ভিন, ম্যালোরি, ম্যাডাম কোগান, মেজর জয়াল, অণিমাদি, গৌরাঙ্গ ও অমরের কথা। আর মনে পড়েছে তোমাদের কথা—যারা সকল দুঃখ ও কষ্টকে জয় করে আমাদের বিজয়-তোরণ তৈরি করে দিয়েছ।"

অসিত থামতেই হিমাদ্রিকে বলি, "সুজল ও অসিতের মতো তোরও তো এই প্রথম শিখরারোহণ! তোর কি মনে হয়েছে?"

হিমাদ্রি বলে, "কত পরিশ্রম, কত সাধনার ফল পেলাম। সে যে কি আনন্দ, তা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক এক করে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরেও সে উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনা প্রশমিত হল না। অবশ্য চারিদিকের দৃশ্য না দেখতে পারায় একসময় সামান্য একটু দুঃখবোধ করেছিলাম যেন! কিন্তু তারপরই মনে হয়েছে—যা পেলাম না তার জন্য

দুঃখ করব কেন? যা পেলাম, তাই যে পরম পাওয়া! আনন্দে পরিপূর্ণ মন নিয়ে ফিরে এসেছি শিবিরে। আজও সেই আনন্দে মন আমার উপচে পড়ছে। জীবনের শেষদিনটিতেও এ আনন্দ অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

"এবারে করুণা বল, তোমার কি মনে হয়েছে শিখরে দাঁড়িয়ে?"

"সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কিন্তু কেন জানি না, শৃঙ্গারোহণ সম্পর্কে আমার মনে কোনো সংশয় ছিল না। তাই শিখরে দাঁড়িয়ে আমি মোটেই ক্লান্তি বোধ করি নি। মনে হয়েছিল শিখর যদি আরও দু' হাজার ফুট উঁচু হত, তবু আমি আরোহণ করতে পারতাম।"

ছুঞে মিষ্টান্ন পরিবেশন করে। দোরজি পেট্রোম্যাক্স জ্বালাচ্ছে। খাওয়া শেষ হলেই শুরু হবে ক্যাম্প-ফায়ার—সভ্যতার প্রথম উৎসব, চতুরঙ্গীর অঙ্গনে আমাদের শেষ উৎসব।

মিষ্টান্ন মুখে দিয়ে কথাটা মনে পড়ে আমার। তাড়াতাড়ি বলি, "এবারে অমূল্য কিছু বল। নেতার কথা শুনে আজকের আলোচনা শেষ করা যাক্।"

"আমি আর নতুন কথা কি বলব?"

"যা মনে হচ্ছে, তাই বল!"

অমূল্য একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকে, "আমাদের চারিদিকে এই যে সব অগণিত পর্বতশৃঙ্গ, আজ এদের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে—এরা কত সফল অভিযানের সাক্ষী। আবার এদেরই কোলে ছড়িয়ে আছে কত অভিযাত্রীর দুঃসহ যন্ত্রণার ইতহাস—নিষ্ঠা আর ত্যাগের স্বাক্ষর।

আমরা তো জানি, এর যে-কোনো একটি পর্বত-শিখরে শুধু একবার দাঁড়াতে হলে কত বিপদের সম্মুখীন হতে হবে--এমন কি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হবে। তবু আমরা হিমালয়ে আসি। কেন আসি?

আসি, কারণ সকল কষ্ট, সমস্ত বিপদ, এমন কি মৃত্যুর মধ্য দিয়েও আমরা মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে তুলতে চাই। সেই বিকাশের পরম-সহায়ক বলেই হিমালয় আমাদের এমন প্রিয়। আমরা সমস্ত ঔদ্ধত্যকে ত্যাগ করে তাঁর কাছে আসি। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি। তাঁর দেওয়া জয় অথবা পরাজয়কে মাথা পেতে নিই।

ব্যর্থতার ব্যথা বুকে নিয়েও সেদিন প্রণাম করে সশ্রদ্ধ-চিত্তে সতপন্থকে বলেছি—আমরা অপেক্ষা করব। কারণ অনুচিত ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে অপেক্ষা করা ভাল। 'It is better to pause than to pant, to sing than to shout.' সেই গানই আমরা এখন গাইব। চতুরঙ্গীর অঙ্গনে আমাদের শেষ গান।"

অমূল্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে বরেণ্য শুরু করে—

"আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।
আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে ॥..."

নেতার ইসারায় গায়ককে থামতে হয়। আমরা বিরক্ত হই। সুমধুর একটি পরিবেশ রচিত হয়েছিল, অমূল্য সেটি নষ্ট করে দিল। আমরা তার দিকে তাকাই।

অমূল্য বরেণ্যকে বলে, "মহাকবির এই গান ক্যাম্প-ফায়ার-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। তবু আজ আমরা অন্য একটি গান গাইব।"

"কি সেই গান?"

অমূল্য গাইতে শুরু করে—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।
সুন্দর হে সুন্দর!"

সত্যই ভাল লাগছে। গানের কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চতুরঙ্গীর পাথরে পাথরে, সুর স্বর্গসুধা সিঞ্চন আমাদের অন্তরে। আমরাও নেতার সঙ্গে গলা মেলাই—

"এই তোমারি পরশ-রাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর
সুন্দর হে সুন্দর!!"

গহন-গিরি-কন্দরে

(আলমোরা, করবেট ন্যাশনাল পার্ক, কৈলাস-মানস সরোবর, ট্রেল্‌স
গিরিবর্ত্ম, দ্বারাহাট, নৈনিতাল, পিণ্ডারী হিমবাহ, ভাওয়ালী,
মায়াবতী, রানীক্ষেত ও সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহ)

উৎসর্গ

সুজয়াকে

কমনীয়া কুমায়ুন, বরণীয়া কুমায়ুন, স্মরণীয়া কুমায়ুন—তুমি কথা কও।

তোমার গহন-গিরি-কন্দরের মাঝে, পাহাড়ী গাঁয়ের পথে, সরযূ আর গোমতীর তীরে দাঁড়িয়ে আমরা তোমার অপরূপ রূপলাবণ্যে মোহিত হয়েছি। তোমাকে বরণ করে নিয়েছি আমাদের অন্তরের অন্তরলোকে। কিন্তু আমরা কি কেবল তোমার কমনীয়া রূপ দর্শন করেই হৃদয় পূর্ণ করব ? তোমার মহান্ অতীত স্মরণ করব না ? আমরা তোমার গহন-গিরি-কন্দরের কথা শুনতে চাই। তুমি কথা কও।

'পুচ্ছেতে ধরিল দেব মুখে দৈত্যগণ।
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন॥'

দুঃসংবাদটা মুহূর্তের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে প্রচার হয়ে গেল— মা-লক্ষ্মী স্বর্গ ছেড়ে চলে গেছেন। অমরাবতীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। নারায়ণহীন স্বর্গ তবু সওয়া যায়, লক্ষ্মীছাড়া হলে স্বর্গ যে নরকে পরিণত হবে। অথচ সত্যই নারায়ণী স্বর্গ ছেড়ে চলে গেছেন। দেব-দেবীরা বৈজয়ন্তের সামনে এসে সমবেত হলেন। স্বয়ং দেবরাজের কাছেই তাঁরা দাবী পেশ করতে চান। কিন্তু ইন্দ্রই বা কেমন করে তাঁদের দর্শন দেন ? তিনি যে শ্রীভ্রষ্ট হয়েছেন। আর তিনি শ্রীহীন হয়েছেন বলেই তা স্বর্গ আজ লক্ষ্মীহীন।

নিরুপায় দেবরাজ তখন মেনকাকে পাঠিয়ে দেব-দেবীদের আপন আলয়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি শীঘ্রই লক্ষ্মীকে স্বর্গে ফিরিয়ে আনবেন।

কিন্তু কেমন করে ?

অগত্যা ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণাগত হলেন। ব্রহ্মা বললেন—সমুদ্রমন্থন করতে পারলে লক্ষ্মীলাভ হবে।

ইন্দ্র সমুদ্রমন্থনের আয়োজন করলেন। অসুরদের আহ্বান করা হল। মন্দার পর্বত হল মন্থনদণ্ড আর নাগরাজ বাসুকি হলেন মন্থনরজ্জু। কিন্তু বরুণ বললেন—মন্দারকে ধারণ করার শক্তি নেই আমার।

দেবরাজ আবার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। দেবতা ও অসুরগণ মাথায় হাত দিয়ে সমুদ্র সৈকতে বসে পড়লেন। এই সময় নারায়ণ উপস্থিত হলেন সেখানে। লক্ষ্মী স্বর্গ ছেড়ে চলে যাবার পরে দেবতারা সকলেই নারায়ণকে এড়িয়ে চলছিলেন। আর তিনিও কদিন ধরে কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নি। তাই তাঁর এই আকস্মিক আগমনে দেবতারা আর বিচলিত হয়ে পড়লেন। দেবরাজ মাথা নত করে রইলেন। তাঁর কাছে বিষ্ণুর আবির্ভাব কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত মনে হতে লাগল। বিষ্ণু কিন্তু সোজা ইন্দ্রের সামনেই এসে দাঁড়ালেন। তারপরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আপনারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন ? আমার দ্বিতীয় অবতার মহাকায় কূর্ম রয়েছে সাগরে। তার আরাধনা করুন।

'এত শুনি দেবগণ কূর্মে আরাধিল।
মন্দার ধরিতে কূর্ম অঙ্গীকার কৈল॥
কূর্মপৃষ্ঠে গিরিবর করিয়া স্থাপন।
বাসুকি নাগের দড়ি কৈল নিয়োজন॥
পুচ্ছেতে ধরিল দেব মুখে দৈব্যগণ।
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন॥'

মন্দারের ঘর্ষণে শ্রান্ত বাসুকি বার বার নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকলেন। ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। জন্ম নিল দলে দলে মেঘ। দেবতারা মেঘ থেকে বৃষ্টি করে শ্রম লাঘব করলেন। বাসুকির গর্জনে ত্রিভুবন কম্পিত হল। মন্দারের আন্দোলনে বরুণ বিচলিত হলেন। বাসুকির বিষে বহু অসুর মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর দেহের ঘর্ষণে মন্দার পর্বতের বনে আগুন লাগল। বনবাসীরা যাতে সেই আগুনে পুড়ে না যায় তাই দেবতাদের নির্দেশে মেঘদল পর্বতের ওপরে আবার বৃষ্টি সৃষ্টি করল।

সহসা পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি নিয়ে সুধার ষোড়শকলা চাঁদ উঠে এলেন সমুদ্র থেকে। ঠাঁই নিলেন আকাশে। একে একে উঠে এল অশ্ব ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা সুরভি-গাভী অপ্সরা আর নন্দনকাননের পারিজাত। উঠে এলেন মণিরাজ। অমৃতের কমণ্ডলু নিয়ে উঠে এলেন দেববৈদ্য ধন্বন্তরী।

কিন্তু কোথায় লক্ষ্মী?

নিরুপায় জলরাজ তখন কমলার আরাধনা করলেন। অবশেষে সিন্ধু থেকে উঠে এলেন লক্ষ্মী—

'রূপেতে হইল আলো এ তিন ভুবনে।
হইল মলিন সূর্য আদি জ্যোতিগণে॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কোমলতা।
কমল বরণ চক্ষু কমলের পাতা॥
দ্বিভুজা কমলদন্তা চড়ি চতুর্দোলে।
করকমলেতে ধৃত যুগল কমলে॥
যুগল কমল পদ কমল আসন।
বিদ্যুৎ-বরণী নানা রত্নে বিভূষণ॥'

দেবগণ তখন করজোড়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। দেব ও ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদ কণ্ঠে বললেন,

'তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল তুমি সর্বরূপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি সর্বব্যাপী॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর॥'

দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন শেষ হল। মহাদেব আবার সমুদ্রমন্থন করালেন। অমৃতের পরিবর্তে উঠল হলাহল। মহাদেব সেই হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে হলেন নীলকণ্ঠ। অমৃত নিয়ে দেবাসুরের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল। নারায়ণ মোহিনীমূর্তি নিয়ে অসুরদের বঞ্চনা করলেন। অমৃত পান

করে দেবগণ অ-মৃত হলেন। লক্ষ্মীহীন স্বর্গে লক্ষ্মী ফিরে এলেন। কিন্তু যাঁর সাহায্য ছাড়া সমুদ্রমন্থন সম্ভব হত না, সেই কূর্মাবতারের কি হল ?

কুমায়ুনীরা বলেন, কার্যোদ্ধারের পরে দেবতারা আর তাঁর কোন খোঁজ করলেন না। অকৃতজ্ঞ দেবতাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন কূর্মাবতার। অসুরদের বঞ্চিত করে অমৃত বণ্টনের পরে তিনি সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে উঠে এলেন সাগর থেকে। এগিয়ে চললেন চম্পাবতের দিকে। ছোট একটি পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে চলা বন্ধ করলেন। তিন বছর দাঁড়িয়ে থেকে বিষ্ণুর তপস্যা করলেন। তারপরে...... ?

তারপর তাঁর কি হল, তা আর কেউ বলতে পারেন না।

স্থানীয়দের মতে—কূর্মাবতারের তপোভূমিই পরবর্তীকালে কূর্মপবর্ত (কামদেব পর্বত) নামে পরিচিত হয়েছে। এই পর্বতশীর্ষে একখানি পাথরের ওপরে এখনও নাকি কূর্মাবর্তারের চরণচিহ্ন বর্তমান। আর এই কূর্মপর্বত থেকেই কূর্মাচল নামের উৎপত্তি।

কূর্মাচল নাম সম্পর্কে আরও কয়েকটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়টি হল—লঙ্কা-বিজয় কালে শ্রীরাচন্দ্র কুম্ভকর্ণের শিরশ্ছেদ করে মস্তকটি ছুঁড়ে ফেলে দেন। সেই ছিন্ন-মস্তক এসে পড়ে এখানে। তাই কুমায়ুনের ভূ-প্রকৃতি এমন অসমতল। আর কুম্ভকর্ণের নাম থেকেই কূর্মাচল।

কেউ কেউ বলেন—কালু তড়াগী নামে চম্পাবতের একজন রাজা তাঁর প্রজাপুঞ্জের দ্বারা মনুষ্যরূপী কূর্মদেব বলে স্বীকৃত হন। তাঁর এই নতুন নাম থেকেই চম্পাবত রাজ্যের নাম হয় কূর্মাচল।

প্রাচীন সাহিত্যে কিন্তু কুমায়ুঁ নামের কোন উল্লেখ নেই। বরং কূর্মাচল নামটিরই প্রচলন আছে। সেকালের সাহিত্যে হিমালয়কে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নেপাল, কাশ্মীর, জলন্ধর (হিমাচল প্রদেশ), কেদারখণ্ড (গাড়োয়াল) ও কূর্মাচল।

প্রথমে চম্পাবত ও কালী নদীর বাঁ তীরের কয়েকটি গ্রামকেই কূর্মাচল বলা হত। এখনও এই অঞ্চলে কালী-কুমায়ুঁ বলা হয়। কালীগঙ্গার তীরভূমিই কুমায়ুনী সংস্কৃতির সূতিকাগৃহ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ চাঁদ রাজারা চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে চম্পাবত রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁদের আমল থেকেই কূর্মাচল নামের প্রচলন হয়। ১৫৬০ সালে চাঁদ রাজারা চম্পাবত থেকে আলমোরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁদের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কূর্মাচল নামটিও বিস্তৃত হতে থাকে। কালক্রমে বর্তমান পিথোরাগড় আলমোরা ও নৈনিতাল জেলার উত্তরাঞ্চল কূর্মাচল নামে অভিহিত হয়।

কুমায়ুঁ বা কুমু শব্দটি নিঃসন্দেহে কূর্মাচল শব্দের অপভ্রংশ। অনেকে বলেন কুমায়ুঁ শব্দটি কামাউ (যাদের কামাই করে খেতে হয়) শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু এ মত মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

লিখিত ভাবে কুমায়ুঁ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় 'পৃথ্বীরাজ রাসো' নামে একখানি হিন্দী গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে—কুমায়ুঁর দুর্জয়গড়ে কুমোদমণি রাজত্ব করতেন।

আপন সীমারেখার বাইরে কুমায়ুঁ আজ কুমায়ুন নামে পরিচিত। ইংরেজরা কুমায়ুঁ লিখতে গিয়ে KUMAON লিখেছেন। 'N' বর্ণটি তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন 'ঁ'-র বদলে। কিন্তু এই 'N'-কে অহিন্দী ভাষাভাষীরা 'ন' রূপে উচ্চারণ করে থাকেন। ফলে কুমায়ুঁ কুমায়ুন হয়েছে।

হিন্দীতে কিন্তু এ ভুলটি করা হয় নি। সংসারের মত সাহিত্যেও অনেক ভুলকে মেনে নিতে হয়। আমিও তাই কুমায়ুঁকে কুমায়ুন বলেই অভিহিত করব।

এবারে আমরা কুমায়ুনে চলেছি। পরশু সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে রওনা হয়ে কাল বিকেলে পৌঁছেছি লখনউ। রাতে ছোট লাইনের গাড়িতে চেপে চলেছি কাঠগুদাম—কমনীয়া কুমায়ুনের প্রবেশ তোরণ। যদিও কয়েক বছর হল নৈনিতাল থেকে ৪৪ মাইল দূরে ফুলবাগে একটি বিমানক্ষেত্র নির্মিত হয়েছে। দিল্লী—ফুলবাগ—লখনউয়ের মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচল করে। কিন্তু সে পথ ভি. আই. পি. বা তাঁদের স্নেহভাজনদের জন্য। এছাড়া টনকপুর হয়েও কুমায়ুনের পূর্বপ্রান্তে পৌঁছনো যায়। কিন্তু সে পথে বহিরাগতদের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই কাঠগুদামই কুমায়ুনের প্রধান তোরণ।

নৈনিতাল, আলমোরা ও পিথোরাগড় জেলা নিয়ে বর্তমান কুমায়ুন। আগে সবই আলমোরা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৯১ সালে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য দক্ষিণ-অংশকে নৈনিতাল নামে পৃথক জেলায় পরিণত করা হয়। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী আলমোরা জেলার উত্তর-পূর্ব অংশকে পিথোরাগড় নামে পৃথক জেলায় উন্নীত করা হয়েছে।

শৈলপুরী কুমায়ুনের প্রধান আকর্ষণ—নৈনিতাল, রাণীক্ষেত ও আলমোরা। সাধারণ পর্যটকদের কাছে এই তিনটি শৈলাবাস কুমায়ুন। কিন্তু কুমায়ুনে কতই না দর্শনীয় স্থান আছে—ভাওয়ালী, ভীমতাল, সাততাল, রামগড়, মুক্তেশ্বর, দ্বারাহাট, কৌসানী, বিনসর, শীতলাক্ষেত, কাটারমল, বৈজনাথ, বাগেশ্বর, মুনসিয়ারী, পিথোরাগড় আরও কত। রয়েছে পিণ্ডারী ও মিলামের মত রমণীয় হিমবাহ, রয়েছে কুংরী-বিংরী ও উন্টাধূরার মত সুগম গিরিবর্ত্ম, রয়েছে পঞ্চচুলী ও তীরশূলীর মত দুর্গম গিরিশৃঙ্গ। পর্যটকদের সারাজীবনের খোরাক রয়েছে কুমায়ুনে। কিন্তু কজনই বা তার খোঁজ রাখে!

কুমায়ুনের সবচেয়ে জনপ্রিয় শৈলাবাস নৈনিতাল। আমার রেল-সহযাত্রীদের অধিকাংশ তাই নৈনিতালে চলেছেন। এক যাত্রায় পৃথক ফললাভ সমীচীন নয়। আমিও তাই নৈনিতাল থেকে কুমায়ুনের কথা আরম্ভ করতে চাই।

অনেকে আগের স্টেশন হলদোয়ানীতে নেমে গেলেন। তাঁদের ধারণা—-ওখান থেকেই সব বাস ছাড়ে। ফলে খালি বাসে বেশ আরামপ্রদ স্থান মেলে। ধারণাটা সত্য নয়। হলদোয়ানী থেকে লাইনের একখানি করে বাস ছাড়ে বটে কিন্তু একখানি বাস তো রেলের সব যাত্রীকে নিয়ে যেতে পারে না। রেল-যাত্রীদের জন্য বাস কাঠগুদাম থেকেই চালু হয়। যাত্রীর সংখ্যা দিয়ে বাসের সংখ্যা ঠিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ বেশী যাত্রী এলে বেশী বাস ছাড়ে। কাজেই তাড়াহুড়ো করে হলদোয়ানীতে নামা অর্থহীন। তার চেয়ে রেলের প্রান্তসীমা কাঠগুদামে নেমে, খেয়েদেয়ে ধীরে-সুস্থে বাসে চাপাই যুক্তিসঙ্গত।

তবে যাঁরা হলদোয়ানীতে নেমে গেলেন, তাঁরা একটি জায়গা ফাউ দেখতে পেলেন। হলদোয়ানী নৈনিতাল জেলার একটি মহকুমা শহর। এখানে একজন প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী সাধু বাস করেন। জমি-জমা গাড়ি-বাড়ি (আশ্রম) শিষ্য-শিষ্যা নিয়ে তাঁর বিরাট এস্টাব্লিশমেন্ট। আশ্রমে প্রতি বছর খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজো হয়। স্থানীয় অনেকেই এই পূজোয় চাঁদা দেন। বাঙ্গালীরা পূজোর দিন ক'টি প্রবাস-বাসের ব্যথা ভুলে থাকেন।

হলদোয়ানীতে কুমায়ুন মোটর ওনার্স ইউনিয়নের সদর দপ্তর। নৈনিতালের বাস সার্ভিস রাজ্যসরকারের একচেটিয়া কিন্তু কুমায়ুনের অন্যান্য অঞ্চলের বেশীর ভাগ বাস সার্ভিসই এই

ইউনিয়নের। সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ে ফেললে এঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ এঁরা শুধু বাসের ব্যবসাই করেন না, সেই সঙ্গে দুর্গম কুমায়ুনকে সুগম করে তোলার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। বহু রাস্তা এঁরা তৈরি করেছেন এবং করছেন।

॥ দুই ॥

কাঠগুদাম স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। রেলের ইঞ্জিন দুখানি নিষ্কৃতি পেল। ভোজীপুরা জংশন থেকে একখানি সাহায্যকারী ইঞ্জিন আমাদের গাড়িতে সংযুক্ত হয়েছিল। উভয়ে মিলে প্রচুর পরিশ্রমে ও প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক সচকিত করে আমাদের গাড়িকে টেনে নিয়ে এসেছে। সমুদ্রসমতা থেকে কাঠগুদামের উচ্চতা ১৭১৮ ফুট। তার মানে আমরা রেলে চেপে কলকাতা থেকে ১৬৪০ ফুট উঠে এসেছি। কলকাতার উচ্চতা মাত্র ৩৮ ফুট।

কাঠগুদাম স্টেশনটি ছোট নয়, তবে জনপদটিকে বড় বলা চলে না। কোন সুদূর অতীতে কাঠ রপ্তানিকে কেন্দ্র করে এখানে এই জনপদটি গড়ে উঠেছিল। তারপর এসেছে রেল। এখন রেল স্টেশনই কাঠগুদামের প্রাণকেন্দ্র। তাই বলে কাঠের গুদাম বিলুপ্ত হয় নি বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কুমায়ুনের প্রধান সম্পদ কাঠ। আজও কাঠ রপ্তানির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে কাঠগুদাম তার নামের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখছে।

স্টেশনটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের একটি টুরিস্ট সেণ্টার ও রেলের একটি চমৎকার ক্যান্টিন আছে। ক্যান্টিনের ম্যানেজার মিস্টার ঘোষ বর্ধমানের লোক। কৈশোরকালে বাড়ি থেকে পালিয়ে অজানা পথে পা বাড়িয়েছিলেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে কাঠগুদামের কূলে এসে তাঁর জীবনতরী নঙ্গর করেছিলেন। সে বহুকাল আগের কথা। তখন কাঠগুদামে কেবল রেল হয়েছে। এক কণ্ট্রাক্টর এই ক্যান্টিন চালাতেন। তাঁর কাছেই চাকরি নিয়েছিলেন মিস্টার ঘোষ। তার পরে পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাঠগুদামেরও পরিবর্তন হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ ক্যান্টিন পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মিস্টার ঘোষ আজও সেই ক্যান্টিনেই রয়ে গেছেন। শীতকালে তিনি লখনউ বা বেরিলী বদলি হয়ে যান। তখন এ ক্যান্টিন বন্ধ থাকে। মরসুমের সময় আবার এখানে ফিরে আসেন। সংসারী হন নি। এই ক্যান্টিনই তাঁর সংসার। দেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু বাঙ্গালী পেলে ভারী খুশি হন। পাশে বসে পরম সমাদরে খাওয়ার তদারক করেন, যেন অতিথি সৎকার করছেন।

আমাদের ঢুকতে দেখেই মিস্টার ঘোষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। এ বেলাটা এখানেই কাটিয়ে যাবার অনুরোধ করেন। ফেরার সময় তাঁর আথিত্য গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিই। তারপরে কিছুক্ষণ গল্প করে চা খেয়ে আমরা বিদায় নিই তাঁর কাছ থেকে।

বেরিয়ে আসি স্টেশনের বাইরে। কোলাপসিবল্ গেট ছাড়িয়েই যাত্রীদের বসার জায়গা ও টিকেট ঘর। শুধু রেলের নয় বাসেরও। এখানে রেলের চেয়ে বাসের টিকেট-কাউণ্টার বড়। সরকারী ও বেসরকারী বাসের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। কাঠগুদাম থেকে বাস চলে কুমায়ুনের সর্বত্র।

সরকারী বাস সার্ভিসের বয়স বেশী নয়। নৈনিতালের বাস সার্ভিসটি তাঁদের একচেটিয়া। নৈনিতালে বেসরকারী বাসের প্রবেশ নিষেধ। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত প্রায় আধ ঘন্টা অন্তর নিয়মিত বাস যাতায়াত করছে নৈনিতাল ও কাঠগুদামের মধ্যে। বাইশ মাইল পথ, পৌনে দু-ঘণ্টার মত সময় লাগে। গাড়োয়ালের মত এখানেও বাসে শ্রেণীবিভাগ আছে, আপার ও লোয়ার। ম্যানেজার অসিতবাবুর নির্দেশে আমাদের লোয়ার ক্লাসের যাত্রী হতে হল। তার বক্তব্য, অযথা কেন বেশী খরচ করব? সেই টাকায় খেলে গায়ে দেবে।

বাস ছাড়ল সাড়ে সাতটায়। ছায়াসুনিরিড় প্রায় সমতল পথ। বেশ জোরেই বাস চলেছে। দু মাইল এসে রাণীবাগ—একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাকবাংলো আছে।

রানীবাগের পরেই পাহাড়ী পথ শুরু হল। সবুজ বনময় পাহাড়। দূরে দু-একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে ছবির মত। পথের দুপাশেই নানা রংয়ের জংলী ফুল। একটানা দশ মাইল চলে বাস এসে থামল জিওলিকোট বা নালেনায়। এখানকার উচ্চতা ৪৩০০ ফুট। স্বাস্থ্যকর স্থান, বর্ষা ও শীতকালে অনেকে নৈনিতাল থেকে এখানে ছুটি কাটাতে আসেন। পি. ডাবলু. ডি.-র রেস্টহাউস আছে। আর আছে একটি সরকারী মৌমাছি সংরক্ষণ কেন্দ্র। জিওলিকোট বাস পথের একটি বড় জংশন। বেরিলী রানীক্ষেত ও নৈনিতালের পথ এসে মিলেছে এখানে। বেরিলী ও রাণীক্ষেত এখান থেকে যথাক্রমে ৭৭ ও ৩৭ মাইল।

যাত্রীদের ওঠানামা ও আমাদের চা খাওয়া শেষ হলে আবার বাস ছাড়ল। পাঁচ মাইল এসে বলদিয়াখান। ছোট্ট গ্রাম।

আঁকাবাঁকা মসৃণ চড়াইপথে যন্ত্রদানব চলেছে ছুটে। আমরা চলেছি কদমীয়া কুমায়ুনের অন্তরালোকে—যে কুমায়ুনের আকর্ষণে যুগে যুগে মানুষ এসেছে ছুটে দূর-দূরান্তর থেকে। মধ্যএশিয়া আর তিব্বত থেকে, মগধ আর কনৌজ থেকে, নেপাল আর ইউরোপ থেকে।

হিমালয়ের মেয়ে কুমায়ুন। হিমালয়ের মতই সে সু-প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এদেশে মনুষ্যবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সেকালের কুমায়ুনীদের বংশ আজ লুপ্তপ্রায়। আজকের কুমায়ুনীরা কুমায়ুনে নবাগত। অনেকটা আমেরিকায় আমেরিকানদের মত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে কুমায়ুন কিরাতদের বাসভূমি ছিল। পরে গঙ্গার পশ্চিম তীর তথা গাড়োয়াল ও হিমাচল প্রদেশ থেকে কয়েকদল কিন্নর নাগ ও ভিল সম্প্রদায়ের মানুষ এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। এঁরা সম্ভবতঃ আর্য কিংবা খসদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কুমায়ুনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, কিরাতরা পরম সমাদরে তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। কারণ ভিন্ন সম্প্রদায়ের হলেও তাঁরা ছিলেন ভারতের আদি অধিবাসী। কালক্রমে কিন্নর, নাগ ও ভিলরা কিরাতদের সঙ্গে মিশে গেলেন।

আর্যরা তখন আর্যাবর্তে অনার্য বিতাড়নে ব্যস্ত। হিমালয়ের দিকে তখন তাঁদের নজর দেবার অবকাশ ছিল না। তাঁরা হিমালয়ে এসেছেন অনেক পরে। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে খস বা শকরা মধ্য এশিয়ার কাশগড় (খসগিরি) ও খোতান থেকে ভিন্ন পথে কুমায়ুনে আসেন। তাঁদের ভিন্ন পথে আসার কারণ, তাঁরা আর্যদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে চান নি। তাঁরা ছিলেন আর্যদের জ্ঞাতিভাই।

কিরাতগণ কিন্তু খসদের এই অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করলেন না। তাঁরা যথাসম্ভব বাধা দিলেন। বহু শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চলল। অবশেষে পরাজিত কিরাতরা পালিয়ে গেলেন আসকোটের দিকে। সেখানে অত্যন্ত দুরবস্থায় তাঁদের দিন কাটতে থাকে। ক্রমেই তাঁদের সংখ্যা

হ্রাস পায়। বর্তমানে কেবল পিথোরাগড় জেলায় কালীগঙ্গার পশ্চিম তীরে কয়েক ঘর কিরাত আছেন। তাঁদের রাজ-কিরাত বলা হয়।

ইতিহাসের অমোঘ বিধানে প্রায় প্রত্যেক দেশেরই আদিবাসীরা এমনি করে লুপ্ত হয়ে গেছেন। লুপ্ত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ানরা, ইংলন্ডের বিকাররা ও প্যালেস্টাইনের নাটুফিয়ানরা। বড় মাছ ছোট মাছকে উদরস্থ করে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। শক্তিশালীরা দুর্বলকে মেরে ফেলে, এটাই ইতিহাসের বিধান। যাঁরা পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছেন, কালের ধোপে তাঁরাও টিকতে পারছেন না। ধীরে ধীরে তাঁদের বংশ লোপ পাচ্ছে। এমনি করেই আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা, আফ্রিকার বুশম্যানরা ও পাকিস্তানের আফ্রিদিরা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে, সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে, ধ্বংস অনিবার্য।

কেদারদণ্ডের প্রথম দিকে ও মহাভারতের বনপর্বে কুমায়ুনকে কিরাতভূমি বলা হয়েছে। মহাকবি কালিদাসও তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যে এই অঞ্চলের বর্ণনা প্রসঙ্গে কিরাতদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেদারখণ্ডের শেষ দিকে কুমায়ুনকে খসমণ্ডল নামে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই মনে হয়, কেদারখণ্ড রচনার সময়েই এই কিরাত বিতাড়ন পর্বটি সম্পন্ন হয়েছিল।

শিব ছিলেন কিরাতদের রাজা। কুমায়ুনই প্রকৃত শিবক্ষেত্র। শিবালয় কৈলাস সেকালে নিশ্চয়ই কুমায়ুনের অংশ ছিল। বর্তমান কুমায়ুন থেকেও কৈলাসের দূরত্ব সামান্য এবং ভারত থেকে কৈলাসে যাবার জনপ্রিয় পথ কয়টি কুমায়ুন দিয়ে। কৈলাস তিব্বতীদের করায়ত্ত হয় অনেক পরে। হর্ষবর্ধনের (৬০৫। ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে) মৃত্যুর পরে ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে তিব্বতীরা কুমায়ুন দখল করেন। দু-শ' বছর পরে তাঁরা বিতাড়িত হন। কিন্তু কৈলাস আর পুনর্দখল করা হয় নি। সম্ভবত জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তর বলে এবং পুনর্দখলকারীদের দূরদৃষ্টির অভাবে শিবালয় কৈলাস আজ আমাদের বিদেশ হয়ে গেছে। এগারোশ' বছর পরে একই ভাবে আমরা হারাতে বসেছি ভূস্বর্গ কাশ্মীরের দুই-পঞ্চমাংশ। সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে।

নিজেদের আচার-আচরণ ও সামাজিক অনুশাসনের প্রতি খসদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ফলে তাঁরা কুমায়ুনে এসেও নিজেদের সামাজিক নিয়ম-কানুনের প্রচলন করেছিলেন। তাঁরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করতেন। কিন্তু সমাধিস্থ করার নিয়মটি মুসলমান বা খৃষ্টানদের মত ছিল না, ছিল অনেকটা প্রাচীন মিশরীয়দের মত। মৃতদেহের মাথার কাছে মাটি বা পাথরের একখানি থালা ও একটি গেলাস রেখে সমাধি বুজিয়ে দেওয়া হত। সেকালে দক্ষিণ রাশিয়া এবং অলতাই অঞ্চলেও এই একই ভাবে সমাধি দেওয়ার নিয়ম ছিল। দ্বারাহাট বৈজনাথ ও বাগেশ্বরে কয়েকটি খস্ সমাধি-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো থেকে খসদের সামাজিক নিয়ম-কানুনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। পরবর্তীকালে কুমায়ুন আর্য কবলিত হবার পরে খসদের সামাজিক প্রথা কুমায়ুনের সমাজ-জীবন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়।

পার্শীদের মত খসরাও সূর্য-উপাসক ছিলেন। আলমোরা জেলার কাটারমলের সূর্য-মন্দির, গঙ্গোলীর কাছে বেলার ও পভাই-য়ের আদিত্য-মন্দির, কালীকুমায়ুনে রমকের (মহারের কাছে) আদিত্যদেবের মন্দিরে এবং চৌগরখানে নৈনীর (লখনপুরের কাছে) ও জগেশ্বরের আদিত্য-মন্দিরে খসদের সূর্যভক্তির প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুমায়ুন যখন খস্-করতলগত, পীর-পাঞ্জাল অঞ্চলে তখন কশ নামে এক জাতি বাস করতেন। তাঁদের নামানুসারেই ঐ অঞ্চলের নাম হয় কাশ্মীর। কশ ও খস্ একই জাতি।

প্রাকৃতিক প্রভাবে ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত। মনে হয় খস্‌রা কেবল কুমায়ুনেই আসেন নি। তাঁদের আর একটি শাখা ঝিলম উপত্যকা অধিকার করে বহুকাল সেখানে রাজত্ব করেছেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শক নামে এক জাতি ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করেন। অনেকের মতে শক, কশ ও খস্‌ একই জাতি। এঁরা সকলেই মধ্য এশিয়ার অধিবাসী এবং আর্যদের প্রতিবেশী। আর্যদের আর্যাবর্ত অধিকারে প্রলুব্ধ হয়েই তাঁরা কুমায়ুন কাশ্মীর ও গান্ধারে এসেছিলেন। কুসান্‌রাজ কনিষ্ক এঁদেরই স্বগোত্র। অনেকের মতে তিনিই শকাব্দের প্রচলন করেন। কাশগর থেকে কাশী পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজ্য। কিন্তু সে সব অনেক পরের কথা।

আর্যরা বহু শতাব্দী ধরে সমতলে দ্রাবিড় ও আদিবাসী বিতাড়নে ব্যস্ত ছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের দুর্গম হিমালয়ের দিকে নজর দেবার অবকাশ হয় নি। বৈদিক যুগে হিমালয়ে আর্যসভ্যতা বিস্তারের কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু হিমালয়, বিশেষ করে কুমায়ুনের প্রতি, আর্যদের দুর্নিবার একটা আকর্ষণ ছিল। রামায়ণে কুমায়ুনকে উত্তর-কুরু রাজ্য বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে এই রাজ্যে বর্ষা নেই, রোদ নেই, রোগ নেই, দুঃখ নেই।

মহাভারতেই প্রথম হিমালয়ে আর্য বসতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্যাবর্ত সম্পূর্ণরূপে আর্য অধিকৃত হবার পরে আর্যরা হিমালয়ের দিকে নজর দেন। মহাভারতের যুগেই তাঁরা পাঞ্চাল (রোহিলখণ্ড) থেকে কুমায়ুনে প্রবেশ করেন। খসরা কিন্তু তাঁদের কোন বাধাই দিলেন না। বরং সানন্দে বরণ করে নিলেন। বিনা যুদ্ধে আর্যরা কুমায়ুনের শাসক হয়ে বসলেন। তাঁরাও খসদের বিতাড়িত করলেন না, মিলেমিশে বাস করতে থাকলেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। এক নতুন জাতির সৃষ্টি হল। সে জাতির বর্তমান না কুমায়ুনী। সরল শক্তিশালী ও পরিশ্রমী কুমায়ুনীরা ভারতের গৌরব—কুমায়ুনী সৈনিকরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পদ।

দুর্ধর্ষ কুমায়ুনীরা তাঁদের রাজ্যসীমা কেবল কুমায়ুনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখলেন না। প্রতিবেশী গাড়োয়ালের ওপরেও তাঁদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল। বর্তমান বিজনোরের পঞ্চাশ মাইল উত্তর পর্যন্ত তাঁদের রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়েছিল। রাজ্যের নাম ছিল ব্রহ্মপুর। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৬৬০ মাইল ছিল এই বিশাল রাজ্যের আয়তন। সুবর্ণগোত্র বা সুবর্ণভূমি পর্যন্ত এই রাজ্যের উত্তরসীমা বিস্তৃত ছিল। সেকালের সুবর্ণভূমি একালের মানস-সরোবর। সত্যই সে আজ আমাদের মানস-লোকের সামগ্রী, পুণ্যার্থীর বাস্তব-জীবনের পুণ্যতীর্থ নয়—তার মানস-লোকের পুণ্য সরোবর। শ্রেষ্ঠ তীর্থের পথ আজ হিন্দুর কাছে প্রায় রুদ্ধ।

সমগ্র কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের অধিকাংশ জুড়েই ছিল ব্রহ্মপুর। কানিংহ্যামের মতে লখনপুর বা বৈরাপট্টন ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। ব্রহ্মপুর বিশাল হলেও হর্ষবর্ধনের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিল। হর্ষবর্ধনের জীবদ্দশায় বাইরের কোন শক্তি ব্রহ্মপুরকে আক্রমণ করতে সাহসী হয় নি। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে, তাঁর সেনাপতি ভণ্ডির ভাগে ব্রহ্মপুর রক্ষার ভার পড়ে। ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের রাজা মোং-চন্‌-গামফো ব্রহ্মপুর আক্রমণ করেন। ভণ্ডি তাঁকে বাধা না দিয়ে সমতলে পালিয়ে যান। গামফো কুমায়ুন অধিকার করে নেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা পশ্চিমে গিলগিট, উত্তরে হোয়াংহো, পূর্বে মূল চীন ও নেফার কিছু অংশ ও দক্ষিণে কুমায়ুন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ভণ্ডি মোং চন্‌কে কুমায়ুনের পার্বত্যভূমি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে তরাই অঞ্চলে নামতে দেন নি। তিব্বতীরা প্রায় দু-শ বছর এই পাবর্ত্যভূমি অধিকার করে ছিলেন। কিন্তু

বহু চেষ্টা করেও সমতলভূমি দখল করতে পারেন নি। যতবার আক্রমণ করেছেন ততবারই ভণ্ডি অথবা তাঁর বংশধরদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। অথচ তাঁরা তিব্বতীদের প্রতি-আক্রমণ করেন নি। করলে হয়ত কুমায়ুনে তিব্বতী শাসন সংক্ষিপ্ততর হত।

কিন্তু এই নির্লিপ্ততার কারণ কি ? শক্তিহীনতার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তাঁরা শক্তিহীন ছিলেন না। তাহলে কি এর কারণ তিব্বতীদের তাঁরা বিদেশী বলে মনে করেন নি ? প্রকৃতপক্ষে তিব্বত বিদেশ ছিল না। সভ্যতার সূত্রপাত থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিব্বত ও ভারতের মধ্যে এই অচ্ছেদ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন বিদ্যমান ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু প্রজাদের মধ্যে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি। বরং মিলেমিশে এক মিশ্র সমাজের সৃষ্টি করেছে। শক্তিমদে মত্ত সাম্যবাদী শক্তির সাম্রাজ্যলিপ্সা এই মিশ্রসমাজে এক কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। কুমায়ুন ও তিব্বতের মধ্যে এক নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

তিব্বতীরা কুমায়ুনের দক্ষিণে রাজ্যসীমা বিস্তৃত করতে না পেরে নজর দিয়েছিলেন চীনের দিকে। ৭৬৩ সালে তাঁরা চীনের রাজধানী ছাঙ্গান অধিকার করেন ও আনুমানিক ৮১৫ সালে সিনকিয়াং দখল করেন। প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে চীনের একটি বিরাট অংশ যে তিব্বতীদের অধিকারে ছিল, সেই তিব্বতীরা আজ চীনাদের ক্রীতদাসে পরিণত। ইতিহাসের কি বিচিত্র লীলা !

তীব্বতীরা কুমায়ুন জয় করে নিলেও, কুমায়ুনীদের সঙ্গে বিজয়ীর মত ব্যবহার করেন নি। তাঁরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে আরও বেশী ভারতীয় হয়েছেন। তিব্বতের স্রোংল দেবচন্ (৭৫৫—৭৮০ খৃঃ) নালন্দা মহাবিহারের আচার্য শান্ত রক্ষিতকে ধর্মপ্রচারের জন্য তিব্বতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আচার্য রক্ষিত সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও সম্-য়ে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তিব্বতের প্রাচীনতম বৌদ্ধবিহার। চীনা অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত এই বৌদ্ধবিহারটি শান্তি ও মৈত্রীর মহাতীর্থরূপে বিবেচিত হত। কে বলতে পারে সেই শান্তি-তীর্থ আজ সেনানিবাসে পরিণত হয় নি ?

৬৪৯ থেকে ৮৪৮ সাল পর্যন্ত তিব্বতীরা কুমায়ুনে রাজত্ব করেছেন। দেশের কয়েক বছরের কথা ছেড়ে দিলে, তাঁদের এই দু-শ বছরের রাজত্বকালে কুমায়ুনে রাজনৈতিক ও সামাজিক শান্তি বিরাজ করেছে। শেষদিকে অবশ্য কুমায়ুনীদের মধ্যে তিব্বতী শাসনের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। তাঁদেরই অনুরোধে মগধরাজ ধর্মপাল (৭৭০-৮১৬ খৃঃ) কুমায়ুন আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি কুমায়ুনকে তিব্বতী শাসনমুক্ত করতে পারেন না।

৮৩৯ সালে তিব্বতের সৌভাগ্যসূর্য অস্তাচলগামী হয়। আত্মকলহে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১৫-৮৫৪ খৃঃ) কুমায়ুন আক্রমণ করেন। ৮৪৮ সালে তিব্বতের রাজা ওদ স্রোংস থাং দেবপালের কাছে পরাস্ত হন। ৮৫০ সালে দেবপাল নেপাল ও কুমায়ুনের পূর্বাংশ থেকে তিব্বতীদের তাড়িয়ে দেন। প্রায় একই সময় কনৌজের রাজা প্রথম ভোজ কুমায়ুনের পশ্চিমাংশ থেকেও তিব্বতীদের বিতাড়িত করেন।

মগধ ও কনৌজের সম্মিলিত আক্রমণের ফলে কুমায়ুন তিব্বতী শাসনমুক্ত হল। কিন্তু তাঁরা কেউই কুমায়ুনকে শাসন করতে পারলেন না। কুমায়ুনের মাটি থেকেই কুমায়ুনের শাসক আত্মপ্রকাশ করলেন। এই মহানায়কের নাম—বসন্তন দেব। তিনিই কুমায়ুনের বিখ্যাত কাত্যুরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মগধরাজ দেবপালের প্রতিনিধিরূপে তিনি কুমায়ুনের

সিংহাসনে বসেন। কুমায়ুনের নতুন ইতিহাস শুরু হয়। তবে স্বাধীন কুমায়ুনের স্বর্ণযুগের সূচনা হয় প্রায় একশ বছর পরে, এই বংশের অষ্টম রাজা ললিত সুরের আমল থেকে। কিন্তু সে যুগের কথা পরে হবে। আপাতত বাস থেকে নেমে একটু হাত পায়ের জড়তা ভাঙা যাক। আমরা নৈনিতাল শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছি।

বাস থেমেছে চুঙ্গিঘরের সামনে। আমাকে নামতে দেখে দাশু আমায় অনুসরণ করে। কিন্তু যে আশায় সে বাস থেকে নেমে এল, সে আশা পূর্ণ হল না। এখান থেকেও নৈনিতাল দেখা যায় না। নৈনিতালের চারিদিকে পাহাড়—যেন পাঁচিল-ঘেরা দুর্গ।

চুঙ্গি মানে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স। উত্তর প্রদেশের অনেক শহরেই এই দর্শনী দিতে হয়, তবে সমান হারে নয়। কুমায়ুনেও এই তারতম্য আছে। নৈনিতাল ও আলমোরার বাসযাত্রীদের জনপ্রতি এক টাকা ও ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ির যাত্রীদের দু টাকা করে চুঙ্গি দিতে হয়। রানীক্ষেতের দর্শনী যথাক্রমে পঁচাত্তর পয়সা ও দেড় টাকা।

নৈনিতাল মিউনিসিপ্যাল বোর্ড বেশ পুরোনো। ১৮৪৫ সালে এর জন্ম। প্রথমে ইংলিশ ব্যুরো কাউন্সিলের অনুকরণে এটি সংগঠিত হয়। তারপর বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এটি বর্তমান রূপ নিয়েছে! এখন চারজন সরকার-মনোনীত ব্যক্তি ও আটজন নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে বোর্ড গঠিত। এরাই একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত করেন। পৌরদায়িত্ব পালনের সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। কয়েক মাইল দূরে দুর্গাপুরে মিউনিসিপ্যালিটির পুরোনো পাওয়ার হাউস। ইদানীং খতিমাতে সারদা হাইডেল পাওয়ার হাউস চালু হয়েছে। এই হাইড্রো ইলেকট্রিক যোজনার কল্যাণে নৈনিতাল শহরের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

মিউনিসিপ্যাল বোর্ড জল সমস্যারও চমৎকার সমাধান করেছেন। আগে ঝরণার জলই তাদের একমাত্র সম্বল ছিল। ফলে মে-জুন মাসে যখন অধিকাংশ ঝরণা যেত শুকিয়ে আর নৈনিতাল ভরে উঠত পর্যটকদের ভিড়ে, তখন নিয়মিত জলাভাব দেখা দিত। ইদানীং হ্রদের জল পরিশোধিত করে শহরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের প্রধান আয় বাড়ি ও কুকুরের ট্যাক্স এবং চুঙ্গি। সে বিচারে পর্যটকরা নৈনিতালের লক্ষ্মী। এখানকার সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হোটেল, সবচেয়ে জমজমাট জায়গা বাস স্টেশন, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জীবিকা অশ্বপালন।

॥ তিন ॥

চুঙ্গির ঝামেলা মিটিয়ে বাস চলল এগিয়ে। পাইন বনের বুক চিরে পথ উঠে গেছে ওপরে। এ পথ নৈনিতালের লাইফ লাইন—১৮৯১ সালে নির্মিত। প্রথম দিকে পর্যটকরা মোরাদাবাদ থেকে কালাধুঙ্গী হয়ে এখানে আসতেন। পরে কাঠগুদাম থেকে রাস্তা তৈরি শুরু হয়। তখন পর্যটকরা পথটুকু টাঙ্গায় ও পাকদণ্ডীটুকু ডাণ্ডিতে চেপে নৈনিতাল পৌঁছুতেন। সেকালে টাঙ্গাই ছিল দ্রুততম যান। ১৯১৫ সালে মোটরের আবির্ভাব হলে স্বাভাবিক ভাবেই টাঙ্গাযুগের অবসান ঘটে।

পথের ধারে দু-একটি বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। শুরু হল লোকালয়। নির্মীয়মান একটি মন্দির ও জেলখানা ছাড়িয়ে ঘন লোকালয় পেরিয়ে বাস এসে থামল হ্রদের তীরে।

অনেকটা জায়গা জুড়ে বাস-স্ট্যাণ্ড। পাঁচ মাথার মোড়ও বলা যেতে পারে। পাহাড় কেটে একেবারে সমতল করা হয়েছে। বহু বাস দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে নিয়মিত বাস চলে কাঠগুদাম, রানীক্ষেত, আলমোরা, বেরিলী ও দিল্লী। তাছাড়া ট্যাক্সি তো আছেই। ওয়েটিং হলটি বেশ বড়—অনেকগুলো টিকিট ঘর। সব সময়েই কর্মমুখর। যাত্রীদের ভিড় লেগেই আছে।

পথের শেষেই হ্রদ। দু পাহাড়ের কোলে অপরূপ সরোবর—যেন কোন মহামানবের বিশাল একখানি পদচিহ্ন। সমুদ্রসমতা থেকে উচ্চতা ৬৩৬০ ফুট। দৈর্ঘ্যে ৪৭১০ ও প্রস্থে ১৫১৮ ফুট। সর্বাধিক গভীরতা ৯৩ ফুট। হ্রদের মাঝখান দিয়ে একটি গিরিশিরা চলে গেছে। সেখানকার গভীরতা মাত্র ২২ ফুট। হ্রদের চারিদিকে পিচঢালা মসৃণ পথ—সবটা মিলে দু মাইলের একটু বেশী—৩৬৯০ গজ।

কুমায়ুনীরা হ্রদকে বলে তাল। নৈনী দেবী এই তালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাই এর নাম নৈনিতাল। কিন্তু কেমন করে সৃষ্টি হল এই তাল ? কেউ বলেন ধস নেমে সৃষ্ট হয়েছে, কেউ বা বলেন কোন সুদূর অতীতে হিমবাহ নেমে এসে হ্রদে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে এটি একটি মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। চারিদিকের পাহাড়ের কালো রং তাঁদের মতকে সমর্থন করে। তাছাড়া শীতকালে জলের রং বাদামী হয়ে যায় ও মাছগুলো মরে যেতে থাকে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভূবিজ্ঞানীরা এই রহস্য উদঘাটন করতে সমর্থ হবেন।

এ সম্পর্কে স্থানীয়দের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা অত্রি, পুলস্ত্য ও পুলহ নামে তিন সাধু চীনা পিক-য়ে আরোহণ করেন ! চড়াই পথ। স্বভাবতই তাঁরা পথকষ্টে কাতর ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু চীনা পিক-য়ে তাঁদের তৃষ্ণাবারি মেলে না। তাঁরা নিচে নেমে এসে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বসুন্ধরার বুক চিড়ে উঠে আসে সুশীতল সুমিষ্ট জলধারা ! সেই জলধারাই পরিণত হয় এই বিশাল হ্রদে।

বিদেশীরা নৈনিতালের সঙ্গে বিলেতের উইণ্ডারমেয়ার ও সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্ন-য়ের তুলনা করেন। আর আমরা তুলনা করি কাশ্মীরের সঙ্গে। কিন্তু সৌন্দর্যের বিচারে নৈনিতালের স্থান শ্রীনগরের ওপরে। ডাল হ্রদ থেকে পাহাড় বেশ দূরে, তাছাড়া সে সব পাহাড়ে এমন সুন্দর সুন্দর বাড়িঘরও নেই। এখানে সারা শহরের ছায়া পড়ে সরোবরের শান্ত বুকে। আকাশের রংয়ের সঙ্গে জলের রং পালটায়। মাঝে মাঝে কুয়াশায় সারা হ্রদ ঢেকে যায়। রাতে যখন তীরের সরণীতে থরে থরে আলো জ্বলে, তখন সরোবরে শুরু হয় দেয়ালী। আলো আর আঁধারের এই খেলায় পর্যটক পাগল হয়। সে শীতকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে হ্রদের তীরে। মর্ত্যের নগরে সে স্বর্গের শোভা দর্শন করে।

বাস থেকে নামামাত্র যথারীতি দালালের দল আমাদের আক্রমণ করল। এরা পুরীর পাণ্ডাদের চেয়ে কম যায় না। পার্থক্য কেবল, তাদের বগলে থাকে খাতা, আর এদের হাতে হোটেলের প্রশস্তি-পত্র।

অমিতাভ ও মোহিতের সমবেত বক্তৃতার ফলে আক্রমণকারীরা রণে ভঙ্গ দিল। সুজল ও প্রাণেশের প্রদর্শিত পথে আমরা চলি ধর্মশালার দিকে। আমাদের কুমায়ুন পরিক্রমা বিলাস-ভ্রমণ নয়, তাই আমরা হোটেলে না উঠে ধর্মশালায় চলেছি।

ভুবনেশ্বর যদি হয় সিটি অব্ টেম্পেল্স, নৈনিতাল তাহলে সিটি অব্ হোটেল্স। দেশী-

বিদেশী মিলিয়ে বহু ভাল হোটেল এখানে আছে। বাহারী সব নাম—গ্র্যাণ্ড রাজমহল রয়েল, অশোক অলকা ভারত, এভারেস্ট হিমালয় মানস-সরোবর। অধিকাংশ হোটেলেই ইচ্ছে করলে শুধু ঘর ভাড়া নেওয়া যায়। কোন কোন হোটেল মাসিক বা মরসুমের জন্য ঘরভাড়া দিয়ে থাকে। হোটেল ছাড়াও এখানে ওয়াই. এম. সি. এ. এবং ওয়াই. ডাবলু. সি. এ. সহ পাঁচটি হস্টেল আছে। আর আছে টুরিস্ট লজ এবং কয়েকটি স্টার হোটেল।

বাস-স্ট্যাণ্ডের পাশ দিয়ে রাস্তাটি নেমে গেছে দক্ষিণে। বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। বাঁ দিকটা ঢালু, বাড়িঘর নেই। যা আছে সবই ডাইনে। এটি নিম্নমধ্যবিত্তের এলাকা। আমরা গল্প করতে করতে চলেছি, কারও দিকে তেমন নজর দিচ্ছি না। কিন্তু আমাদের দিকে দেখছি সবাই নজর দিচ্ছেন। অকারণে নয়। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিতান্তই আটপৌরে, নৈনিতালে টুরিস্ট হবার উপযুক্ত নয়। এখানে টুরিস্টরা ট্রাংক ভর্তি স্যুট-বুট-টাই টেনে আনেন। সকাল-বিকেল পোশাক পালটানোর পালা চলে। হোটেলের কামরায় কামরায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। স্বামী-স্ত্রী (বা অন্য কিছু) একই পোশাক পরে পথে বেরিয়ে পড়েন। একাত্ম আর কাকে বলে ?

আমরা এই ফ্যাশান প্যারেডে এ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। তার চেয়েও বড় কথা, প্রত্যেকের পিঠে রুকস্যাক আর হাতে আইস-এক্স—সোনায় সোহাগা। দিশী সাব্-মেমদের দোষ কী ? অবাক বিস্ময়ে তাঁরা আমাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন।

হঠাৎ মনে হল কেউ কাউকে ডাকছে। আমাদেরই ডাকছে। কিন্তু কে ? ওপরদিকে তাকাতেই দেখি—একটা বাড়ির বারান্দা থেকে একজন লোক হাত নেড়ে আমাদের কিছু বলার চেষ্টা করছে। এগিয়ে যাই। সে সপ্তমে গলা ছেড়ে আহ্বান জানায়, "আইয়ে, ইধার আইয়ে, সস্তামে ঘর মিলেগা।"

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অসিত উত্তর দেয়, "হামলোগ ধরমশালা যায়েঙ্গে।"

"উয়ো তো বহুত দূর—বহুত নিচে। পানিকে লিয়ে পয়সা লাগেগা, বিজ্লীকে লিয়ে পয়সা লাগেগা, খাটিয়াকে লিয়ে পয়সা লাগেগা। জমাদারকো পয়সা দেনে হোগা, চৌকিদারকো পয়সা দেনে হোগা। ঘর মিলনেকোভি কোই ঠিক নেহি হ্যায়।"

"লোকটা পটাবার তালে আছে অসিতদা।" মোহিত মন্তব্য করে।

"আরে, ও আমার চেনা গোঁফ। অত সহজে পটছি না।"

"আহা। একবার জিজ্ঞেস করেই দেখ না, শুধু থাকার জন্যে কত চায়।"

জিজ্ঞেস করতেই উত্তর আসে, "আদমী পিছু দো রূপেয়া, দো আদমীকো এক ঘর।"

"এতনা পয়সা নেহী হ্যায় বাবা।" তারপর অসিতবাবু আমাদের দিকে ফিরে বলে, "চল ফেরা যাক। শুধু ভ্যাজর-ভ্যাজর করে সময় নষ্ট।"

"আপহী বোলিয়ে না।" লোকটি নাছোড়বান্দা।

"এক এক রূপেয়া।" দেবকীদা দর দেন।

কি একটু ভেবে নিয়ে লোকটি বলে, "ঠিক হ্যায়, আপ থোরা ঠাহরিয়ে, ম্যায় পুছকে আতা হুঁ।" সে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি।

মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে আসে লোকটি। বলে—তার ম্যানেজার দৈনিক এক টাকা হারে আমাদের আশ্রয় দিতে রাজী আছেন। তবে চারখানি নয়, দুখানি ঘরের একটা স্যুট আমরা পাব। সঙ্গে বাথরুম থাকবে।

হোটেল-ম্যানেজারের শর্ত নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। এই মাগ্গী শহরে এক টাকায় আশ্রয় !

ধর্মশালা সত্যই বেশ দূরে। আমার এসেছি বেড়াতে। হ্রদের যত কাছে থাকা যায় ততই ভাল। কিন্তু আমাদের ম্যানেজার কেন যেন বেঁকে বসল, "আট টাকায় একটা ভাল স্যুট অনেক হোটেলেই পাওয়া যায়।"

"এ হোটেলটাও তো খারাপ মনে হচ্ছে না।" অমিতাভ বলে।

"না, তা নয়, তবে....."

"তবে আবার কী?" সুজল জিজ্ঞেস করে।

"ব্যাপারটা খুলে বলুন তো অসিতদা।" দাশু যোগ দেয়।

"আপনি কি আগে কোনদিন এ হোটেলে ছিলেন?" প্রাণেশ প্রশ্ন ছাড়ে।

অসিতবাবু শব্দহীন।

"কিহে চুপ মেরে গেলে কেন? একটা কিছু বল।"

"না, মানে বলছিলাম কি, এখানে না উঠলেই হত।"

কিন্তু আমরা ততক্ষণে হোটেলের দরজায় এসে গেছি। সেই লোকটি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাদের স্বাগত জানায়। আমরা অসিতকে একবার দেখে নিয়ে মালপত্র পিঠে নিয়ে দোতলায় উঠে আসি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অসিত আমাদের অনুসরণ করে। লোকটি একখানি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলতে যায়।

"সে কি, এই স্যুটটাই আমাদের দিচ্ছ নাকি?" অসিত যেন আঁতকে ওঠে।

"জী হুজুর, খুব ভাল। সামনেই দেখুন না লেক।"

"আর কোন ঘর খালি নেই?"

"আছে, তবে নিচে।"

"চল না দেখে আসি।"

"তোমার কি হয়েছে বল তো? ওপরে ঘর পেয়ে নিচে দেখতে যাব?" তারপর লোকটিকে বলি, "খোল খোল, এই ঘরেই থাকব।"

অগত্যা অসিত চুপ করে থাকে। তাকে বড়ই অসহায় মনে হচ্ছে।

আমরা ঘরে প্রবেশ করি। বড় বড় দুখানি ঘর। মেঝেতে কার্পেট, চেয়ার টেবিল আয়না আলনা আলমারি সবই রয়েছে। রয়েছে নেয়ারের চারখানি খাট। লাগোয়া বাথরুম। এক কথায় আশাতীত। কিন্তু অসিতবাবু অপরিবর্তিত। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে। এক ফাঁকে তাকে ডেকে নিয়ে আসি বারান্দায়। তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞেস করি, "বল না ব্যাপারটা কি?"

"মানে আমি এই ঘরে থেকে গেছি।"

"কবে?"

"আট বছর আগে।"

"কার সঙ্গে?"

"মানে ঐ.....মানে, বিয়ের পরে ওকে নিয়ে সেই যে প্রথম বেড়াতে বেরিয়েছিলাম না......"

"তার মানে হানিমুন করতে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না যেন।"

বৈকালী রোদ এখনও মিলিয়ে যায় নি হ্রদের বুক থেকে। আমরা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি

পথে। রঙীন পথ, উচ্ছল পথ, উৎসব-মুখর পথ। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন বেশের, বিভিন্ন বয়সের—সবাই একই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে পথে। এখানে ওভারটাইম নেই, প্র্যাকটিস নেই, রেজলিউশান নেই। কে কি করে কত কামিয়ে নিলে, তা নিয়ে নেই কারও মাথাব্যথা। এখানে সবার উপরে প্রকৃতি সত্য, তাহার উপরে নাই।

কেউ বা দলে, কেউ বা জোড়ায়—পায়চারি করছে হ্রদের তীরে। একা এলেও কেউ একা থাকে না এখানে। কিন্তু ঐ যে ওরা? একজন বাগানে আর একজন বারান্দায়? ওরা যে একই সঙ্গে এসেছে এখানে। ওদের তো ঠাঁই নেই নৈনিতালের সমাজে। যাক্‌গে, ওরা থাকুক ওদের সমস্যা নিয়ে, আমরা চলুন এগিয়ে যাই।

হ্রদের শান্ত জলে সাদা পাল তুলে ভাসছে নৌকো। পর্যটকরা নৌবিহার করছেন। সামান্য ব্যয়ে এমন অনাবিল আনন্দ—কে ছাড়ে? হ্রদের পশ্চিম পাড়ে যেখানে পথের পাশে পাহাড় এসে মিশেছে, সেখানে জলে ভাসছে অসংখ্য রাজহংস। নির্ভয়ে জলকেলি করছে।

পাষাণীদেবীর মন্দির দেখে হ্রদের পূর্ব তীর ধরে আমরা উত্তর দিকে হেঁটে চলেছি। এদিকটাই নৈনিতালের প্রধান আকর্ষণ। রাস্তাটি প্রশস্ততর—পাহাড়টাও আস্তে আস্তে উঠে গেছে। ফলে পথের পাশে বড় বড় হোটেল ও দোকানপাট গড়ে উঠেছে। বাড়িঘর একটু ওপরে। ওপরের দিকে বেশ গাছপালা রয়েছে—ওক এ্যাশ বার্চ হর্ণবিম ফ্রেক্‌স পপ্‌লার মেপল দেওদার পাইন আখরোট ও বাদাম। এ ছাড়া হ্রদের তীরে রয়েছে সারি সারি উইপিং উইলো। এখানকার বনবিভাগ সযত্নে এই সব গাছপালার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। তাঁদের অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর নিজের জমিতেও গাছ কাটতে পারেন না। কারণ এই সব গাছ বর্ষাকালে নৈনিতালকে ধসের কবল থেকে রক্ষা করে।

আমাদের বাঁদিকে হ্রদের ওপরে তৈরী হয়েছে একাধিক ক্লাব, রেস্তোরাঁ ও মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী। এখানে কলকাতার সংবাদপত্র পাঠ করা যায়।

হ্রদের উত্তর তীরে, রাস্তা থেকে খানিকটা নিচে ফ্ল্যাট্‌স—তৃণহীন সুবিশাল কাঁকড়ময় রক্তিম প্রান্তর। নৈনিতালের ময়দান। এখানে ফুটবল ও ক্রিকেটের বড় বড় আসর বসে। তাছাড়া নিখিল ভারত হকি প্রতিযোগিতাও এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু আগে এই ময়দানটি এমন বিশাল ছিল না। এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এর এমন আয়তন হয়েছে। ধ্বংসের মধ্য থেকেই সৃষ্ট হয়েছে এই নয়নাভিরাম ক্রীড়াক্ষেত্র। নৈনিতাল শহরের জীবনে অমন বিপর্যয় আর আসে নি।

নৈনিতাল মোটেই পুরোনো শহর নয়। ১৮৩৯ সালে এই রমণীয় শৈলাবাসটি আবিষ্কৃত হয়। সে বছর পি. ব্যারন নামে শাজাহানপুরের এক ইংরেজ ব্যবসায়ী তার সম্বন্ধী ব্যাটেনের সঙ্গে শিকার করতে হলদোয়ানি থেকে ভীমতালে আসেন। সেখানকার স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাঁদের জানায়—মাত্র এগারো মাইল দূরে আরও সুন্দর একটি হ্রদ আছে। তবে সে হ্রদের তীরে কোন জনবসতি নেই।

ব্যাটেন ও ব্যারন বহু কষ্টে শের-কা-ডাণ্ডা পাহাড় পেরিয়ে এই হ্রদের তীরে এসে পৌঁছান। কলকাতার ইংরেজী দৈনিক "দি ইংলিশম্যান"-য়ে তাঁদের এই আবিষ্কারের সংবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ব্যারন নিজেও "পিলগ্রিম" ছদ্মনামে "আগ্রা আখওয়ার" কাগজে এখানকার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে বলেন, "It is by far the best site I have witnessed in the course of a 1500 mile trek in the Himalayas."

সে আমলে এখানে আসা মোটেই সহজ ছিল না। মোরাদাবাদ থেকে কালাধুঙ্গি হয়ে

আসতে হত। তবু এই প্রচারের ফলে শাসক মহলে সাড়া পড়ে যায়। এখানে জমি সংগ্রহের জন্য দরখাস্তের স্তূপ জমে ওঠে। কর্তৃপক্ষ ১৮৪২ সালে জমি বণ্টন শুরু করেন। ব্যারনকে প্রথম বাড়ি করার অনুমতি দেয়া হয়। নৈনিতাল ক্লাবের কাছে এখনও তাঁর সেই "পিলগ্রিম কটেজ" দাঁড়িয়ে আছে। খুবই তাড়াতাড়ি শহর গড়ে উঠতে থাকে। তৎকালীন কুমায়ুনের কমিশনার লাশিংটন নিজেও এখানে একটি বাড়ি তৈরি করেন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত কেউ হ্রদের জলে নামতে সাহসী হন নি। পাহাড়ীরা প্রচার করেছিল যে হ্রদের জলে ডাইনী আছে, তাই তারা এখানে বাস করে না।

ব্যারন কিন্তু তাদের উপদেশ শুনলেন না। তিনি সত্যিসত্যিই একদিন নৌকো ভাসালেন হ্রদের জলে। আর অজানা আশঙ্কা বুকে নিয়ে হ্রদের তীরে সবাই রইলেন দাঁড়িয়ে। সে আশঙ্কা সত্য হয় নি। ডাইনীর দেখা মেলে নি। বরং ব্যারন নৈনিতালের জব চার্ণক হয়ে আজও বেঁচে আছেন।

ডাইনীর দেখা মেলে নি কিন্তু স্থানীয়দের সেই আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয়। এই হ্রদে জলের নিচে একপ্রকার জলজ-গাছ আছে, যা মানুষকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে তার শাখাবাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে মেরে ফেলে। এখনও এই হ্রদের জলে নামা নিরাপদ নয়।

এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ভ্রমণকাহিনী 'তীর্থভ্রমণের কথা' মনে পড়ছে। লেখক রঘুনাথ সর্বাধিকারী ১৮৫৩ সাল থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, পালকি ও গাড়িতে চেপে কেদার-বদ্রীসহ উত্তর ভারতের তাবৎ তীর্থ দর্শন করেছিলেন। বদ্রীনাথ থেকে ফেরার পথে তিনি ১৮৫৫ সালের জুন মাসে বর্তমান নৈনিতাল জেলার মহকুমা শহর কাশীপুরে আসেন। কাশীপুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'এস্থানে তহশীলদার ও কোতোয়াল আছে। পূর্বে জজ্, ম্যাজিস্টর, কালেক্টর ও কমিশনারের কাছারি এবং পল্টন ছিল। এক্ষণে সকল কাছারি ও সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের অফিস সকল এখান হইতে আট ক্রোশ দূরে নৈনিতালের পাহাড়ে হইয়াছে। এ পাহাড়ে নৈনিতাল নামে দেবী আছেন—প্রত্যক্ষ। এখানে এক কুণ্ড আছে, কুণ্ডে স্নান (ও) দেবীদর্শন। মহাপীঠস্থান, তালেশ্বর ভৈরব পর্বত উপরে আছেন। ছাউনি হইতে দুই ক্রোশ উচ্চে দেবদেবী কুণ্ড, অতি মনোরম স্থান। এখানে বাঙ্গালী বাবুলোক আছেন, ডাকঘর আছে, বাজার বসাইয়া নগরতুল্য স্থান হইয়াছে। নৈনিতাল তীর্থস্থান। পূর্বে মনুষ্য পশুভয়ে এবং বিকট পথজন্য কেহ গমন করিতে পারিত না। এক্ষণে কাছারি সকল এবং সৈন্যগণ থাকাতে উত্তম পথ হওয়ায় সকল মনুষ্য অনায়াসে গমনাগমন করিতেছে।'

নৈনিতালের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল। ১৮৮০ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াল ৭৫৮৯। আর সে বছরই এই শ্রীবৃদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত হানলেন প্রকৃতিদেবী। প্রকৃতির সেই প্রচণ্ড আঘাতে নৈনিতাল প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল।

নৈনিতালে বৃষ্টিপাত অন্যান্য শৈলাবাসের মতই। সেবারেও অধিবাসীরা তাই সেপ্টেম্বর মাসের আগমনে আনন্দিত হয়েছিলেন—বর্ষাকাল সমাপ্তপ্রায়। কিন্তু বর্ষা আবার নতুন করে অভিযান আরম্ভ করল। দিনের পর দিন ধরে চলল অবিশ্রান্ত বর্ষণ। তিন দিনে ৩৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হল। হ্রদের জল উপচে উঠল পথে। চারিদিক তলিয়ে গেল জলে। সবাই উপরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তখনও তাঁদের দুর্ভোগের পালা শেষ হয় নি। ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে সহসা প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত হল নৈনিতাল। সৃষ্টি বুঝিবা রসাতলে যায়। অসহায়

মানুষ মহাপ্রলয়ের কাল গুনতে থাকলেন। সত্যই মহাপ্রলয় হল নৈনিতালে। Kumaon Gazetteer-য়ের ভাষায়—"The rain commenced to fall steadily and without cessation from Thursday the 16th of September 1880 until Sunday evening the 19th. About 10 a. m. on Saturday morning the first slip occured in a part of the hillside immediately behind Victoria Hotel carrying away a portion of the outhouses and of the western wing of the Hotel······at 1·30 the landslip took place. The motive power was a shock of earth-quake, a very common occurence in these hills, and which was felt by competent observers in the Bhabar below and Nainital itself."

এই দুর্ঘটনার ফলে ১৫১ জন অধিবাসী নিহত অথবা নিখোঁজ হলেন। আবার নির্ঘাত মৃত্যুর কবল থেকেও কেউ কেউ আশ্চর্যজনক ভাবে রক্ষা পেলেন। অবশেষে রুদ্রাণী প্রকৃতি প্রকৃতিস্থা হলেন। কিন্তু তখন নৈনিতালের ভু-প্রকৃতি পালটে গেছে। অধিকাংশ বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে হ্রদের উত্তর তীরের সমতল ক্ষেত্রটি বিশালতর হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নয়নাভিরাম ক্রীড়াক্ষেত্র—ফ্ল্যাট্‌স। ধ্বংসের মধ্যে থেকে সৃষ্টির এক মহান্ নিদর্শন। ভয়ঙ্করী প্রকৃতির এক অপূর্ব অবদান।

শুধু তাই নয়, এই দুর্বিপাকের ফলে নৈনিতাল ভবিষ্যতের বৃহত্তম ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। তখন শহর নিতান্তই ক্ষুদ্র। বর্তমান নৈনিতালে অমন ধস নামলে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাবে, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হবে। কিন্তু ১৮৮০ সালের সেই দুর্ঘটনা সে সম্ভাবনাকে চিরতরে নির্মূল করেছে। এই দুর্ঘটনার ফলে কর্তৃপক্ষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। তাঁরা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করেন। এ ব্যবস্থা ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। যত বৃষ্টিই হোক, নৈনিতালে এখন আর অমন ধস নামার সম্ভাবনা নেই। প্রকৃতির আঘাতে জর্জরিত মানুষ শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিকে জয় করেছে।

ফ্ল্যাট্‌স রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা নিচে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। স্কুলের ছেলেরা হকি খেলছে। রাস্তার ধারে রেলিংয়ে ভর দিয়ে আমরা খেলা দেখছি। খেলার মাঠের দক্ষিণ দিকে, হ্রদের উত্তর তীরে, সুবৃহৎ মন্দির—নন্দাদেবীর মন্দির। আর মাঠের উত্তরে পথের ধারে একটি প্রেক্ষাগৃহ—দি ক্যাপিটল। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে, ছেলেরা হকি খেলছে আর সিনেমা হলের মাইকে বেজে চলেছে—বোল রাধা বোল্.....। অপূর্ব সমন্বয়।

আগে কিন্তু নন্দাদেবীর মন্দিরটি ছিল না। এখন যেখানে Nainital Yacht Club, সেখানেই ছিল প্রাচীন মনিদর ও ধর্মশালা। ১৮৮০ সালের ধসে সেই মন্দির ও ধর্মশালা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ধ্বংসলীলার পরে প্রাচীন মন্দিরের ঘণ্টাটিকে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই নির্মিত হয়েছে বর্তমান মন্দির। নৈনিতালের সমাজ-জীবনে এই মন্দিরের অবদান অসামান্য।

গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পরমারাধ্যা দেবী নন্দা। তাই কুমায়ুন হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের (২৫,৬৪৫) নাম নন্দাদেবী। গাড়োয়ালের জুনিয়াগড় দুর্গ জয় করে কুমায়ুনরাজ রাজবাহাদুর নন্দাদেবীর বিগ্রহ আলমোরায় নিয়ে আসেন। সেই থেকেই নন্দাদেবী গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পরবর্তীকালে গাড়োয়ালীরা কুমায়ুন আক্রমণ করলেন। চাঁদ রাজা মহাদেবী নন্দার করুণা প্রার্থনা করে মানত করলেন—আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করতে পারলে তিনি আলমোরায় নন্দাদেবীর নতুন মন্দির নির্মাণ করে দেবেন। অঘটন ঘটল। সত্যই সে-যুদ্ধে চাঁদ রাজার জয় হল। বিজয়ী রাজা তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। আলমোরায় অপূর্ব সুন্দর ও সুবৃহৎ

একটি মন্দির নির্মাণ করে নন্দাদেবীর নামে উৎসর্গ করলেন। মন্দিরের জাগ্রতা ভগবতী নন্দাদেবীর সম্পর্কে বহু আশ্চর্য সত্য কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু নৈনিতালে দাঁড়িয়ে আলমোরার মন্দিরের জয়গান গেয়ে কি হবে?

আলমোরার মন্দিরের অনুকরণে স্থানীয় বিত্তবানেরা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত নৈনিতালের সেই প্রাচীন মন্দিরটি নির্মাণ করেন। সে মন্দির আজ নেই। তবে নতুন নন্দাদেবীর মন্দিরও নৈনিতালের নৈতিক জীবনের প্রধান অবলম্বন। যেমনি অবস্থান, তেমনি এর গঠন। মূল-মন্দিরে নন্দাদেবীর কল্পিত প্রতিমূর্তি। আরও তিনটি মন্দির আছে মন্দির-চত্বরে—শিব, শ্রীকৃষ্ণ ও হনুমানের মন্দির। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসে। এই দিন কটি নৈনিতালের সবচেয়ে আনন্দমুখর দিন। আলোর মালায় মন্দির সাজানো হয়। দূর-দূরান্তর থেকে দলে দলে দোতিয়ালরা এসে সাময়িক সংসার পাতেন নৈনিতালে। দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশা বিস্মৃত হয়ে তাঁরা সুখের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন। আনন্দমেলায় চা-বিড়ি, মিঠাই-মণ্ডা, নকল মুক্তা আর শৌখিন খেলনার সওদা চলে। আর মন্দিরে চলে পূজা-পার্বণ। তিন দিনে ছটি মোষ সহ অসংখ্য পাঁঠা বলি দেয়া হয়। বলিদানের নিয়মটি মোটেই সহজ নয়। কুকড়ির এক কোপে বধ্য-প্রাণীর মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে হয়।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক উল্টো দিকে রাস্তার অপর প্রান্তে রিজিওন্যাল টুরিস্ট ব্যুরো—পর্যটকদের পরম সহায়। এই রাস্তাটির নাম পন্থমার্গ—স্বর্গত দেশনেতা গোবিন্দবল্লভ পন্থের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। টুরিস্ট ব্যুরোর দোতলায় রেলওয়ে বুকিং অফিস। রেলগাড়ি নেই কিন্তু বুকিং অফিস আছে। এখান থেকে মাল বুক ও বার্থ রিজার্ভেশান হয়ে থাকে, যেমন হয় শ্রীনগর মানালী ও মুসৌরি থেকে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। ছেলেদের হকি খেলা শেষ হয়ে গেল। আমরাও আস্তে আস্তে এগিয়ে চলি। খানিকটা এগিয়ে রাস্তাটি দু-ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকের অংশ একটু উঁচু হয়ে বাজারের পাশ দিয়ে উত্তরে চলে গেছে। এই পথেই চীনা পিক-য়ে যেতে হয়। আর বাঁদিকের অংশটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সামনে দিয়ে হ্রদের অপর তীরের পথটির সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। পথটি যেখানে বিভক্ত হয়েছে, ঠিক সেখানেই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াওয়ালাদের দল। তারা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে আমাদের সওয়ার হতে আমন্ত্রণ জানায়। ভারতে শৈলাবাস বস্তুটি ইংরেজের অবদান। কিন্তু ইংরেজ ভারত ছেড়েছে। 'আংরেজি হটাও' বলতে আজ আমরা অনেকেই অজ্ঞান হয়ে যাই। কিন্তু হায়! শৈলাবাসগুলিতে ইংরাজী যেন আরও বেশী কায়েম হয়ে বসছে। এখানে সবাই ইংরেজের পোশাক পরে, ইংলিশ হোটেলে লাঞ্চ সেরে, ইংরাজী সুর ভাঁজতে ভাঁজতে হ্রদের তীরে ভ্রমণ করে থাকেন। অথচ যারা আংরেজীকে হটাতে চাইছেন তাঁদের অনেকেরই নিবাস এখান থেকে খুব দূরে নয়।

অশ্বারোহণের একটা আকর্ষণ আছে। ঘোড়ায় সওয়ার হলে নিজেকে রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' থেকে ছত্রপতি শিবাজী পর্যন্ত যা ইচ্ছে কল্পনা করা যায়। তা ছাড়া যাঁরা পায়ে হেঁটে নৈনিতালের সব দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করে উঠতে পারেন না, তাঁরা ঘোড়ার সাহায্য নিয়ে থাকেন। কাজেই ঘোড়াওয়ালাদের বাজার এখানে বেশ ভাল। যদিও আমাদের প্রতি তাদের আকুল ইংরেজী আমন্ত্রণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল।

"চীনা পিক্-য়ে আমরা তো কাল সকালে যাচ্ছিই, আজ বরং লেকের ওপারটা ঘুরে হোটেলে ফেরা যাক।" অমিতাভ প্রস্তাব করে।

"তাই ভাল।" সুজল সমর্থন করে তাকে।

অসিত সম্মতি দেয় ঘাড় নেড়ে। অতএব আমরা এগিয়ে চলি পশ্চিমে। মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং ছাড়িয়ে পথটি এসে মিশেছে হ্রদের পশ্চিম তীরের পথে। সংযোগস্থলের কাছেই হ্রদের তীরে নৈনী দেবীর মন্দির। আমরা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। আনত হয়ে প্রণাম করি দেবী নৈনীকে। এই মন্দিরের সঙ্গে শিব-পুরাণের সম্পর্ক অতি নিবিড়। এটি ভারতের একান্ন পীঠের অন্যতম।

ব্রহ্মার অনুরোধে শিব শেষ পর্যন্ত প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতীদেবীকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন। বিয়ের পরে তাঁরা কৈলাসে সুখে সংসার করতে থাকলেন।

কিছুকাল পরেই এক অঘটন ঘটল। নৈমিষারণ্যে বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞস্থলে প্রজাপতি দক্ষকে প্রবেশ করতে দেখেও শিব আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন না। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সঙ্গে গল্প করতে থাকলেন। জামাইয়ের এই আচরণে শ্বশুর অপমানিত বোধ করলেন। সবার সামনে শিবকে যা-তা বলে গালাগালি করে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিলেন। শিব কিন্তু সব নীরবে সহ্য করলেন। তবু দক্ষের রাগ কমল না। অহঙ্কারী দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করে শিব ও সতী ছাড়া অন্য সব দেব-দেবীকে নেমন্তন্ন করলেন। শিবের অমতে সতী এলেন সেই যজ্ঞস্থলে। দক্ষ তাঁকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। সতী তবু আসন গ্রহণ করে পিতাকে প্রশ্ন করলেন—সংসারে যার কোন শত্রু নেই, যিনি সকল প্রাণীর প্রিয়তম এবং যাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কেউ নেই, সেই দেবাদিদেব মহাদেব কেন নিমন্ত্রিত হন নি এই মহাযজ্ঞে?

ক্রোধান্ধ পিতা উত্তর দিলেন—শিব অশিব। সে দেবতাদের অধম, তাই তাকে নেমন্তন্ন করি নি।

স্বামী-নিন্দা শুনে সতী শিবকে স্মরণ করে হোমানলে নিজেকে আহুতি দিলেন—সমাধিতে দেহত্যাগ করলেন।

সংবাদ শুনে শিব নিজের জটা ছিঁড়ে সৃষ্টি করলেন বীরভদ্র। বীরভদ্র দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস করে দক্ষের শিরশ্ছেদ করলেন। সতীহারা শিব তখন প্রিয়তমার মৃতদেহ কাঁধে করে ত্রিভুবন পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। শিবের স্পর্শে মৃতদেহ অবিকৃত রইল। সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি সেই মৃতদেহে প্রবেশ করে সতীদেহকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। এই সময় সতীর চোখ দুটি যেখানে পড়ে যায়, সেই পুণ্যস্থলেই গড়ে উঠেছে এই পবিত্র মন্দির—দেবীর নয়ন বা নৈনী দেবীর মন্দির।

আমাদেরই মতো সকলের অগোচরে একদিন এই মন্দিরতলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নবভারতের দীক্ষাগুরু ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯০ সালের আগস্ট মাস—ভারত পরিক্রমাকালে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তিনি এখানে আসেন। নগ্ন পায়ে, সুতি-বস্ত্র পরিধান করে, দুর্গম পাকদণ্ডী ভেঙে তাঁরা এখানে পৌঁছেছিলেন। সম্বল বলতে ছিল লাঠি আর কমণ্ডলু। ভিক্ষাই ছিল জীবনধারণের একমাত্র উপায়। তখন বিবেকানন্দ নিতান্তই অখ্যাত এক তরুণ সন্ন্যাসী। তাই সেদিন কেউ এসে ভিড় জমায় নি এখানে, কেউ তাঁর দর্শন প্রার্থনা করে নি।

আট বছর বাদে ১৮৯৮ সালের মে মাসে ভগিনী নিবেদিতা ও কয়েকজন শিষ্য-শিষ্যার সঙ্গে স্বামীজী আবার এসেছিলেন নৈনিতালে। ইতিমধ্যে শিকাগো ধর্মমহাসভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে বিবেকানন্দ বিশ্ববিজয়ী। তিনি তখন খেতড়ির মহারাজার মহামান্য অতিথি। তাঁর আগমনে নৈনিতালের আকাশে বাতাসে উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দূর-দূরান্তর থেকে ভক্তবৃন্দ ভিড় করেছিলেন নৈনিতালে। তাঁরা প্রতি সন্ধ্যায় সমবেত হতেন এখানে।

স্বামীজী তাঁদের কাছে বৈদান্তিক ধর্ম প্রচার করতেন। এই মহতী সম্মেলনে কোন ধর্মবিভেদ বা জাতিবৈষম্য ছিল না। হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খৃষ্টান, বৌদ্ধ-জৈন, ভারতীয় অভারতীয় সকলেই স্বামীজীর উপদেশামৃত পান করে জীবন ধন্য করতেন। একজন স্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজীকে বলেছিলেন—স্বামীজী, যদি ভবিষ্যত কেউ আপনাকে অবতার বলে দাবি করেন, মনে রাখবেন, আমি মুসলমান হয়েও তাঁদের সকলের অগ্রণী।

সেবারে স্বামীজী প্রথম যখন এই নৈনী মন্দিরে আসেন, তখন দুজন বাঈজী মন্দিরে পূজো করছিলেন। সমবেত জনতা স্বামীজীর কাছে সেই বাঈজীদের তাড়িয়ে দেবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভক্তদের সে অনুরোধ রক্ষা করা তো দূরের কথা, বরং পূজান্তে বাঈজীরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এলে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁর এই আচরণে অসন্তুষ্ট হলে তিনি তাঁদের কাছে খেতড়ির বাঈজীর গল্প বললেন।

একবার স্বামীজীকে খেতড়ির মহারাজা সেই বাঈজীকে দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী এই অদ্ভুত প্রস্তাবে খুবই বিরক্ত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মহারাজার অনুরোধ রক্ষা করতে হয়। বাঈজী বিবেকানন্দকে পরম শ্রদ্ধায় বরণ করে ভজন গাইলেন—

'প্রভু মেরা অবগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হ্যায় নাম তুম্‌হারো।
এক লোহ পূজামে রহত হ্যায়, এক রহে ব্যাধ ঘর পরো॥
পারশকে মন দ্বিধা নহী হোয়, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভয়ো।
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গানাম পরো॥
এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগড়ো।
অজ্ঞানসে ভেদ হোয়, জ্ঞানী কহে ভেদ করো॥'

স্বামীজীর চোখের সামনে থেকে একটা আবরণ অপসারিত হল। তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করলেন—জগৎ-সংসারে সবাই সমান, সবই এক। যুগাবতার স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের এক অমূল্য শিক্ষা লাভ করলেন সমাজ-পরিত্যক্তা এক বাঈজীর কাছ থেকে।

মন্দির দর্শন করে আমরা হ্রদের পূর্বতীরের পথ ধরে এগিয়ে চললাম দক্ষিণে। পথের বাঁদিকে হ্রদ আর ডানদিকে পাহাড়। মাঝে মাঝে রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ে। পাহাড়ের ওপর বাড়িঘর। এদিকটাই নৈনিতালের চৌরঙ্গী। সেক্রেটারিয়েট রাজভবন সবই এদিকে। নৈনিতাল উত্তর প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।

নৈনিতালের রাজভবন ভারতের একটি সুন্দরতম প্রাসাদ। ১৯০০ সালে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ করে এই প্রাসাদ নির্মিত হয়। নির্মিত করতে চার বছর সময় লাগে। প্রাসাদের পাশে প্রশস্ত শ্যামল কোমল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর ও পার্ক পর্যটককে নন্দনকাননের সৌন্দর্য স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে একটি চমৎকার গল্‌ফ কোর্সও আছে। সপ্তাহে পাঁচদিন গল্‌ফের আসর বসে।

নৈনিতালের সেক্রেটারিয়েট ভবনও ১৯০০ সালে নির্মিত হয়েছে। বাড়ি হিসেবে এর স্থান রাজভবনের পরেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এটিকে বর্মা ও মালয়াগত উদ্বাস্তু শিবিরে পরিণত করা হয়েছিল।

আধো আলো আধো আঁধারে ছাওয়া জনবিরল পথ। আমরা নিঃশব্দে চলেছি এগিয়ে। সুনীল আকাশে চাঁদ উঠেছে। দু-এক টুকরো মেঘ যাচ্ছে ভেসে। তাদের ছায়া পড়েছে হ্রদের জলে। হ্রদেও চাঁদ উঠেছে। জলের দোলায় তাল মিলিয়ে সেও দুলছে। চাঁদ কিন্তু একা নয়।

পথের আলোর প্রতিবিম্ব পড়েছে জলে। তারাও চাঁদের সঙ্গে দুলছে। যেন রাতের রানী সহস্র হীরের গয়না পরে অভিসারে এসেছে। তার রূপের ছটায় আমরা বিহ্বল হয়ে পড়েছি।

॥ চার ॥

পরদিন সকালে। চা ও জলখাবার খেয়ে ওয়াটার-বট্‌ল ও ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি পথে। আমরা চলেছি চীনা পীক্‌-য়ে—নৈনিতাল শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে সাড়ে তিন মাইল। উচ্চতা ৮৫৬৮ ফুট। তার মানে বাইশশ' ফুটের বেশী চড়াই ভাঙতে হবে। নৈনিতালের উচ্চতা ৬৩৬০ ফুট।

হ্রদ ছাড়িয়ে আমরা বাজারের কাছে এসে পৌঁছই। বাজারের পাশ দিয়ে আমাদের পথ। বড় ছেলে-মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে ও ছোটরা কুলির পিঠে চেয়ারে বসে স্কুলে চলেছে। বাবুরা অনেকে ইতিমধ্যেই বাজার সেরে ফেলেছেন। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে বাড়ি ফিরছেন। বাজার করাটা যেমন এখানকার আভিজাত্য, তেমনি নিজ হাতে বাজার বয়ে নিয়ে যাওয়াটা নিতান্তই লজ্জাকর। কুলিভাড়া মেটাতে গিয়ে যদি বাজারের পরিমাণ কমে যায়, তাও শ্রেয়।

এদিকটা নৈনিতালের সবচেয়ে জনবহুল অংশ। ১৯৬১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী নৈনিতালের জনসংখ্যা ১৪,৯৬৫ জন। স্বাভাবিক ভাবেই এই জনসংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু এ হল গিয়ে স্থায়ী জনসংখ্যার হিসেব। এ ছাড়া তেরো থেকে পনের হাজার পর্যটক প্রতি বছর নৈনিতালে আসেন। দুদিকেই বাড়িঘর ও দোকানপাট। হোটেল-রেস্তোরাঁও রয়েছে। জায়গাটাও অপেক্ষাকৃত সমতল। খানিকটা হেঁটে আমরা ডানদিকের পথ ধরি। আরও কিছুটা এগিয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু হল। আমরা শহরের প্রায় প্রান্তে পৌঁছেছি। নৈনিতাল খুবই ছোট শহর। আয়তন মোটে ৪.৫৩ বর্গমাইল। সবুজ বনাচ্ছাদিত পাহাড়। এই পাহাড়েই এক অমূল্য লতা পাওয়া গেছে, যা থেকে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগের ওষুধ তৈরি সম্ভব হবে।

দু-একটি ছোট ছোট ঝরণারও সাক্ষাৎ মিলল। মসৃণ ও প্রশস্ত হলেও বেশ চড়াইপথ। প্রাণেশ, সুজল ও অমিতাভ চলেছে আগে আগে। আমরা ক্রমেই ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ছি। পড়বই তো। প্রাণেশ ও সুজল মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়েছে, আর অমিতাভ ট্রেনিং না নিলেও হিমালয়ের দুর্গমতম তীর্থপথ কৈলাস-মানস পরিক্রমা পূর্ণ করেছে কয়েক বছর আগে। সে আমাদের দলেও অভিজ্ঞতম সদস্য।

অতএব ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বৃথা। আর তার প্রয়োজনই বা কি ? কে কোথায় আরোহণ করল এটাই পর্বতারোহণের প্রধান প্রশ্ন, কে কতক্ষণে সেখানে পৌঁছল সেটা বিচার্য নয়। পর্বতারোহণে প্রতিযোগিতা মারাত্মক। তা ছাড়া আমরা চলেছি প্রকৃতির অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করতে। সব দেখেশুনে ধীরেসুস্থে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। দেখতে গিয়ে পিছিয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই।

প্রায় দু ঘণ্টা চড়াই ভেঙে আমরা পৌঁছলাম চীনা পিক্‌-য়ে। ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্বতশীর্ষে। চির-তুষারাবৃত হিমালয় এখান থেকে মোটে ৬৫ মাইল। কাজেই একটি ভাল বাইনোকুলার সঙ্গে নিয়ে এলে আর আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে, এখানে দাঁড়িয়ে সর্বপশ্চিমে

দেখা যায় পোরবন্দী (২১,৭৬০)। পোরবন্দীর পাশে শিবালয় কেদারনাথ শৃঙ্গ (২২,৭৭০)। ১৯৪৭ সালে আঁদ্রে রশ-এর নেতৃত্বে এক সুইস অভিযাত্রী দল এই শৃঙ্গে আরোহণ করেন। শ্রীতেনজিং নোরগে শিখর-আরোহণকারীদের অন্যতম। * কেদারনাথের পরেই দেখা যাচ্ছে গাড়োয়াল-কুমায়ুনের সুন্দরতম গিরিশৃঙ্গ ভগবান বিষ্ণুর নিবাস নীলকণ্ঠ (২১,৬৪০)। মেজর এন. কুমারের নেতৃত্বে ১৯৬১ সালের ১৩ই জুন তিনজন ভারতীয় অভিযাত্রী এই দুর্গম শৃঙ্গে আরোহণ করেন। যদিও তাঁদের এই আরোহণ নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নীলকণ্ঠের পাশে রয়েছে কামেট (২৫,৪৪৭) ও ত্রিশূল (২৩,৩৬০)। ভারতীয় পর্বতারোহণের জনক পরলোকগত মেজর এন. ডি. জয়াল ১৯৫৫ সালের ৬ই জুলাই কামেট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। প্রবীণ পর্বতারোহী শ্রীগুরুদয়াল সিং ১৯৫১ সালের ২১শে জুন ত্রিশূল জয় করেন। তাঁর এই বিজয় থেকেই ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাস শুরু হয়েছে। গৌরবের কথা, প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযানের এই নেতা চোদ্দ বছর বাদে ১৯৬৫ সালের সফলকাম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছেন।

চীনা পিক্ থেকে তুষারাবৃত হিমালয়ের দিকে তাকালে যে পর্বতশৃঙ্গটির প্রতি পর্যটকদের প্রথম নজর পড়ে, আশেপাশের সকল শৃঙ্গকে ছাড়িয়ে যে গৌরবদীপ্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সেই উন্নতশির শৃঙ্গটিই ভারতের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫)। ১৯৬৪ সালের ২০শে মে শেরপা দা নরবু ও এভারেস্ট-বিজয়ী বীর শ্রীনওয়াং গমবু এই শিখরে আরোহণ করেন। মেজর এন. কুমার এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

নন্দাদেবীর পাশেই দেখা যাচ্ছে ত্রিভুজাকৃতি নন্দাকোট (২২,৫১০) ও মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চচুলি (২০,৮৫০, ২২,৬৫০, ২০,৭১০, ২০,৭৮০, ২১,১২০)। ১৯৬৫ সালের এভারেস্ট ও তীরশূলী অভিযানের নায়কদ্বয় লেঃ কমঃ এম. এস. কোহলি ও শ্রীকে. পি. শর্মা ১৯৫৯ সালের ২৫শে মে নন্দাকোট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। পঞ্চচুলিও অপরাজিত নয়। ফ্লাঃ লেঃ এ. কে. চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী ১৯৬৪ সালের ৪ঠা ও ৫ই জুন তিন, চার ও পাঁচ নম্বর শৃঙ্গ তিনটি জয় করেন। এভারেস্ট বীর ক্যাপ্টেন এ. এস. চীমা ও চন্দ্রপর্বত-বিজয়ী শ্রীঅমূল্য সেন সাফল্যময় শিখরাভিযানের নেতৃত্ব করেন।

চীনা পিক্ থেকে নেপাল হিমালয়ের আপি (২৩,৩৯৯) ও আরও পূর্বে নানজাং শৃঙ্গ দুটিও দেখা যায়। দেখা যায় রোহিলখণ্ড, গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের কমনীয়া রূপ। দেখা যায় নয়নাভিরাম নৈনিতাল। আর শোনা যায় গহন-গিরি-কন্দরের কথা।

সব মিলিয়ে চীনা পিক্-য়ের মত সহজগম্য সাতটি শিখর আছে নৈনিতালে। নৈনিতাল বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে কেউ যদি হ্রদের দিকে মুখ করে তাকায় তাহলে বাঁদিকে প্রথম যে পাহাড়টি দেখতে পাবে সেটির নাম আয়ারপাট্টা হিল। উচ্চতা ৭,৬৮৯ ফুট। আগে এই পাহাড় আয়ার বৃক্ষ (Andromeda Ovalifolca) পরিপূর্ণ ছিল বলে এর এমন নাম হয়েছে। নৈনিতালের প্রায় সমস্ত স্কুল-কলেজ এই পাহাড়ে অবস্থিত। এই পাহাড়টি সবচেয়ে নিরাপদ—কখনই ধস নামে না।

পরের পাহাড়টির উচ্চতা ৭৯৮৯ ফুট—নাম দেওপাতা হিল। অনেকে মনে করেন আয়ারপাট্টা শব্দটি অসুরপথ বা অসুরপত্তন শব্দের অপভ্রংশ। কেউ কেউ আবার বলেন

---

* লেখকের 'পঞ্চ-প্রয়াগ' ও 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' দ্রষ্টব্য।

এটি আর্যপত্তন শব্দের অপভ্রংশ কারণ দক্ষিণ ভারতে আর্যকে আইয়ার বলা হয়। এই সূত্র অনুসারে তাহলে দেওপাতারও আদি নাম দেবপত্তন। তারপরে হিন্দী-বন্দী অথবা ইকো (প্রতিধ্বনি) ছিল। উচ্চতা ৭,১৫৩ ফুট। সামনে দেখা যাবে চীনা পিক্—আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি। ডানদিকে দেখা যাবে আলমা হিল (৭,৯৮০)। তারপরে লারিয়া কান্টা (৮,১৪৪)—নৈনিতালের দ্বিতীয় উচ্চতম শিখর। এখানে দাঁড়িয়ে ডানদিকে প্রথম যে পাহাড়টি দেখা যায়, সেটি শের-কা-ডাণ্ডা (৭৮৬৯)। এই পাহাড় অতিক্রম করেই ১৮৪১ সালে পি. ব্যারন ভীমতাল থেকে এখানে এসেছিলেন।

দর্শনীয় স্থান হিসেবে চীনা পিক্-য়ের পরেই লারিয়া কান্টা। এটিরও দূরত্ব বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে সাড়ে তিন মাইল। পথটি অপেক্ষাকৃত দুর্গমতর, তবে বড়ই সুন্দর। পাইন আর দেবদারু ছাওয়া পথ—সব সময়েই পাগল হাওয়ার মাতামাতি চলেছে। তারা আসে ডানদিকের তুষারাবৃত গিরিশিরার গা ছুঁয়ে। তাই তাদের পরশে পথিকের দেহের শিরায় শিরায় শীতের শিহরণ লাগে। হিমশীতল সেই স্পর্শে শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর হয়। নিস্তব্ধ নির্জন পথ পথচারীকে সর্বদা সচকিত করে তোলে। গাছের পাতা ঝড়ে পড়ার শব্দে সে চমকে ওঠে। তার মনে পড়ে—এই পথে কবে কে কালো ভালুকের কবলে পড়ে অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল। কিন্তু তবু সে পথের টানে পথ চলে। ভয় পেয়ে যদি চলাই বন্ধ করবে, তাহলে মানুষ অপরূপকে দর্শন করবে কেমন করে?

নৈনিতালের সবচেয়ে সহজগম্য পর্বতশীর্ষ স্নো-ভিউ বা শের-কা-ডাণ্ডা পাহাড়ের শীর্ষদেশ। এখান থেকেও হিমালয়ের অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে দূরত্ব মোটে দেড় মাইল। ফ্ল্যাট্স্ থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার চড়াই। মেঘমুক্ত দিনে নিচে দাঁড়িয়ে শিখরের সাদা নিশানটি দেখতে পাওয়া যায়।

আরও দুটি অবশ্য দর্শনীয় স্থান আছে নৈনিতালে—রাসটিক কটেজ (গ্রাম্য কুটির) ও ডরোথীজ সিট্। ল্যাণ্ডস্ এণ্ডে অবস্থিত রাসটিক কটেজ থেকে থুরপা তালের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায়। দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ক্ষেত। বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে রাসটিক কটেজের দূরত্ব আড়াই মাইল, উচ্চতা ৬,৯৫০ ফুট। ওখানে একা যাওয়া নিরাপদ নয় কারণ মাঝে মাঝে বাঘের উৎপাতের কথা শোনা যায়।

মিসেস্ ডরোথী কেলেট মারা যান এক বিমান দুর্ঘটনায়। বিমানটি তৈরী করেছিলেন তাঁর সেনানায়ক স্বামী। বিরহী সেনানায়ক প্রিয়তমা পত্নীর নামে উৎসর্গ করেছেন এই শৈল-শিখর—উচ্চতা ৭,৫২০ ফুট। এরও দূরত্ব বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে আড়াই মাইল। এখান থেকে নৈনিতাল বড়ই সুন্দর দেখায়। শের-কা-ডাণ্ডা ও আয়ারপাট্টা পাহাড় পরিষ্কার দেখা যায়, চেনা যায় বিড়লা বিদ্যামন্দির, রাজভবন, সেণ্ট জোসেফস ও শেরউড কলেজ। দূরে দেখা যায় ঘেটিয়ার টিউবারকিউলোসিস স্যানাটোরিয়াম, চিরতুষারাবৃত হিমালয় আর চির-সবুজ সমতল প্রান্তর।

আমরা ফিরে চলেছি। এতক্ষণ চারিদিকে চকচকে রোদের রাজত্ব চলছিল। হঠাৎ কোথা থেকে দলে দলে মেঘ ছুটে এসে দখল করে ফেলল রোদের রাজ্যকে। পার্বত্য প্রকৃতির এ এক অদ্ভুত স্বভাব। সে বড়ই অস্থির। কখন কাঁদবে, কখন হাসবে, কেউ আগের থেকে বুঝতে পারে না। আমরাও পারি নি। ভাবি নি যে মায়াময়ীর এই মনোহর মূর্তি চিরস্থায়ী নয়। তাই আমরা ওয়াটারপ্রুফ না নিয়েই চীনা পিক্-য়ে এসেছিলাম।

তাড়াতাড়ি নামতে থাকি। কিন্তু পালাবার প্রচেষ্টা বৃথা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশ

ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। আমরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি। নৈনিতালের বৃষ্টি অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। গাছের পাতার সাধ্য নেই আমাদের রক্ষা করে। পাতা চুঁইয়ে জল পড়ছে আমাদের গায়ে। এর চেয়ে চীনা পিক্-য়ে থাকলেই হত। ওখানকার কাঠের ঘরে তবু মাথাটা বাঁচত। নৈনিতালের বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০৫ ইঞ্চি। সবচেয়ে বেশী হয়েছিল ১৯৪০ সালে—১৫০ ইঞ্চি।

শীতকাল হলে এই বৃষ্টির বদলে বরফ পড়ত। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত নিয়মিত তুষারপাত হয় নৈনিতালে। সবচেয়ে বেশী তুষারপাত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে—১লা থেকে ১২ই জানুয়ারী, বারো দিন ধরে। পাহাড়ে আট থেকে দশ ফুট ও সমতলে তিন থেকে চার ফুট গভীর বরফ জমে গিয়েছিল। তুষারের ভারে বহু বাড়ির ছাদ ভেঙ্গে পড়েছিল। বৃক্ষপতনের ফলে টেলিফোন ও ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। কাঠগুদামের সঙ্গে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল নৈনিতাল।

বৃষ্টি একটু কমলে আমরা পিচ্ছিল পথ বেয়ে সাবধানে নেমে আসি। হোটেলে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে আসে। খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেবার জন্য খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে আবার বেরিয়ে পড়া গেল পথে। আজ আর প্রাকৃতিক শোভা নয়, আজ আমরা শহর দেখতে বেরিয়েছি।

প্রথমে আসা গেল সেন্ট জনস্ ইন দি ওয়াইল্ডারনেস গীর্জায়। এখন একে ইন দি ওয়াইল্ডারনেস না বলে ইন দি পপুলাসনেস বলাই উচিত হবে। কিন্তু ১৮৪৮ সালে যখন এই গীর্জা নির্মিত হয়, তখন এ অঞ্চল গহন অরণ্যাবৃত ছিল। এটি নৈনিতালের প্রথম গীর্জা ও একটি প্রাচীনতম অট্টালিকা।

এ ছাড়া আরও চারটি বড় বড় গীর্জা আছে নৈনিতালে—সেন্ট মেরী ও সেন্ট নিকোলাস, সেন্ট ফ্রান্সিস (ক্যাথলিক), ইউনিয়ন (মেথডিস্ট) ও মেথডিস্ট চার্চ।

তারপরে আমরা এলাম শেরউড কলেজে। শেরউড নামটি রবিনহুডের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যে বয়সে রবিনহুডের বীরত্ব ও মহত্ত্ব মনে স্থায়ী দাগ কাটে, সেই বয়সের ছেলেরাই এখানকার শিক্ষার্থী। আয়ারপাট্টা পাহাড়ে শান্ত সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশে এই বিদ্যায়তন। ১৮৭৩ সালে শেরউড এস্টেটে, বর্তমান রাজভবন প্রাঙ্গণে এই বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে রাজভবন নির্মাণের প্রয়োজনে ১৮৯৭ সালে বিদ্যায়তনটি এইখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কলেজ হলেও এর শিক্ষাক্রম স্কুলের নিম্ন শ্রেণী থেকে শুরু। সারা ভারতে এর সুনাম সুবিদিত। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মন গঠনের দিকেও কর্তৃপক্ষ বিশেষ নজর দেন। রোমাঞ্চকর বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতি শিক্ষার্থীদের যাতে আসক্তি জন্মে, তাই তাঁরা মাঝে মাঝে পথযাত্রা ও পর্বতাভিযানের আয়োজন করে থাকেন।

নৈনিতালের অন্যান্য বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে অল সেন্টস্ কলেজ, সেন্ট জোসেফস্ কলেজ, দি দেবসিং বিস্ত গভর্ণমেন্ট কলেজ, রামনী পার্ক হাই স্কুল, চেতারাম শাহ হাই স্কুল, গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল ও বিড়লা বিদ্যামন্দিরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের নৈনিতাল পরিক্রমা পূর্ণ হল। এবারে শৈলপুরীর কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। কাল সকালে চলেছি রুদ্রপুরে। পূর্ব-বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ দেখতে। রুদ্রপুরের আশেপাশে শিবপুর, হরিদাসপুর, খানপুর, বাসন্তীপুর, আনন্দখাড়া,

বিজয়নগর, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদি ছত্রিশটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। প্রায় তিন হাজার কৃষিজীবী বাঙ্গালী সেখানে সংসার পেতেছেন। শুনেছি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের চেয়ে তাঁরা অনেক সুখে আছেন। ১৯৫২ সালে খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুর থেকে আগত এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেন উত্তরপ্রদেশ সরকার। পরিবার প্রতি তাঁদের ২৪ বিঘা করে জমি ও ৮৮০.০০ টাকা করে দেওয়া হয়। সেই বাঘ ভালুকের আস্তানা বন্ধ্যা-ভূমিকে তাঁরা সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা মাতা বসুন্ধরায় রূপান্তরিত করেছেন। এখন তাঁদের গোলা ভরা ফসল, গোয়াল ভরা গরু আর ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সন্তান। অনেকেরই নাকি ঝকঝকে সাইকেল আছে। সাইকেল চড়েই তাঁরা যাতায়াত করে থাকেন। কিন্তু ঠিক খুশি মনে নয়। জিজ্ঞেস করলে বলেন—'সাইকেল দিয়া কী করমু কর্তা, নৌকার লইগ্যা পরাণডা মোর কাইন্দা মরে।'

এই মেহনতি মানুষদের দর্শন না করলে আমাদের কুমায়ুন পরিক্রমা বিফল হবে। তাই কাল সকালে আমরা চলেছি রুদ্রপুরে। এখান থেকে ৫১ মাইল। উত্তরপ্রদেশ সরকার এখানে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করেছেন।

রুদ্রপুরের কথা থাক্। আপাতত নিজেদের কথায় ফিরে আসা যাক। পথকষ্টে ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চাইছে। সহযাত্রীরা অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে দেবকীদা, দাশু, অসিতবাবু, অমিতাভ ও মোহিত। ঘুম নেমে এসেছে আমার দু-চোখের পাতায়। কিন্তু ঘুমায় নি প্রাণেশ ও সুজল। ওরা দুজনে ডাইরী লিখতে বসেছে। এই কর্তব্যকর্মটি করতে কোনকালেই আমি তেমন উৎসাহ বোধ করিনে। অনিবার্য কারণে কখনও কখনও কলম নিয়ে বসতে বাধ্য হই। কিন্তু কোনমতে দায়সারা গোছের একটু নোট্‌স নিয়ে ডাইরী রেখে দিই। তারপর শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে ভাবতে থাকি—সারাদিনের কথা, সুদুর্গম যাত্রাপথের সুখ-দুঃখের কথা। যাত্রাশেষে ফিরে যাই ঘরে, জড়িয়ে পড়ি বাস্তব জীবনের জালে। কিন্তু দুর্গম পথের এই কান্না-হাসির দোল-দোলানো দিনগুলোর মধুর স্মৃতি মধুময় হয়ে থাকে আমার মনের মণিকোঠায়। এই অক্ষয় স্মৃতিই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়, আমার মানসলোকের পরম সম্পদ, আমার জীবনগঙ্গার গোমুখী।

॥ পাঁচ ॥

বিকেল সাড়ে চারটায় বাস ছাড়াল। আমরা নৈনিতাল ছাড়লাম। চললাম রানীক্ষেত—শৈলরানী রানীক্ষেত।

নৈনিতাল থেকে রানীক্ষেত ৩৭ মাইল। কেবল সরকারী বাস চলে এ পথে। দৈনিক চারখানি করে বাস যাতায়াত করে। সাড়ে তিন ঘণ্টার মত সময় লাগে।

রানীক্ষেত পৌঁছতে আমাদের সন্ধ্যে হয়ে যাবে। কি হেঁটে, কি বাসে, পাহাড়ী পথে সব সময়েই সকালের দিকে যাতায়াত করা উচিত। পরিশ্রম কম হয়, আবহাওয়া ভাল থাকে আর প্রাণভরে পথের নৈসর্গিক শোভা দর্শন করা যায়। সব জেনেশুনেও আমরা এত দেরিতে রওনা হয়েছি। কারণ রুদ্রপুর থেকে নৈনিতাল ফিরে আসতেই দুপুর গড়িয়ে গেছে।

গাছে ছাওয়া সবুজে ভরা পাহাড়ী পথ। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সিক্তপথে বাস চলেছে ছুটে। ছুটছে আমাদের মন। বাসের চেয়ে ক্ষিপ্রতর তার গতি, দেহের

চেয়ে তীব্রতর তার দাবী। তাই মানুষ দৈহিক দুঃখ-কষ্টকে উপেক্ষা করে দুর্গম পথে পাড়ি জমায়। মন মানুষের, কিন্তু মানুষ মনের দাস।

সাত মাইল এসে ভাওয়ালী। আমরা ৭৬০ ফুটে নেমে এসেছি, এখানকার উচ্চতা সমুদ্র-সমতা থেকে ৫৬০০ ফুট। ভাওয়ালী বাসপথের একটি বড় জংশন—পাঁচটি পথের সঙ্গম। একটি পথ গেছে জিউলিকোট হয়ে কাঠগুদাম, একটি নউকুচিয়া তাল—পথে পড়ে সাততাল ও ভীমতাল, একটি রামগড় হয়ে মুক্তেশ্বর আর একটি খয়রানা হয়ে রানীক্ষেত।

ভাওয়ালী থেকে কাঠগুদাম ২২ মাইল। যাঁরা কাঠগুদাম থেকে রানীক্ষেত বা আলমোরা যান, তাঁদের ভাওয়ালী দিয়ে যেতে হয়। ভাওয়ালী কেবল বাসপথের জংশন নয়, একটি রমণীয় স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস। এখান থেকে হিমালয়ের কয়েকটি তুষারাবৃত শৈলশিখর দর্শন করা যায়। চারিদিকের পাহাড়ে পাইন ওক আর সাইপ্রেস গাছের সমারোহ। উপত্যকায় আপেল নাসপাতি এ্যাপ্রিকট কুল আর পিচফল। ভাওয়ালী ফল রপ্তানির একটি প্রধান কেন্দ্র। বাজারটি ছোট হলেও পর্যটকদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবই পাওয়া যায়। কয়েকটি ভাল হোটেল ও ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে। আর আছে কটেজ ও বাংলো।

এখানকার জলবায়ু খুবই স্বাস্থ্যকর, তাই শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বাজার থেকে মাইলখানেক দূরে তৈরি হয়েছে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস—King Edward VII T. B. Sanatorium। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কিছুকাল এখানে ছিলেন।

সাধারণতঃ প্রয়োজন না পড়লে স্যানাটোরিয়ামের সামনে বাস দাঁড়ায় না। আমাদের ভাগ্য ভাল—কয়েকজন দর্শনার্থী ছিলেন বাসে। আমরাও নেমে পড়েছিলাম তাঁদের সঙ্গে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিলাম সেই পুণ্যতীর্থের দিকে, যেখানে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক তাঁর মহা-মূল্যবান জীবনের কয়েকটি দিন কাটিয়ে গেছেন।

এখান থেকেই অসুস্থ সুভাষচন্দ্র তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন—

ভাওয়ালী
১৯.১২.৩২

প্রিয় সত্যেনবাবু,

আশা করি আমার পূর্ব্বপত্র সময়মত পাইয়াছেন। আমি আগামী পরশু লক্ষ্ণৌ যাইতেছি। আমি এখনও জানি না, আমাকে কোথায় রাখা হইবে। লক্ষ্ণৌ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বরাবর আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

আমি জানিতে পারিলাম লক্ষ্ণৌ-এ একটি মেডিক্যাল বোর্ড দ্বারা আমি পরীক্ষিত হইব। সে কারণ আমি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছি যে, ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার এবং ডাক্তার স্যার সুনীল বসুকে যেন পুনর্নিয়োগ করা হয়। আমি আরও জানাইয়াছি যে তাঁহারা (গবর্ণমেণ্ট) যদি ঐ দুজন চিকিৎসককে পুনর্নিয়োগ করিতে না চান, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই তিনজনকে নিয়োগ করা।—(১) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, (২) ডাঃ অমূল্যচরণ উকীল, (৩) ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়। আমি তাঁহাদের দক্ষতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও জানাইয়াছি। এখন দেখা যাউক এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করেন। এই অবস্থায় আরও একটি মেডিক্যাল বোর্ড নিয়োগের জন্য গবর্ণমেণ্টের অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থায় আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।...

সেই সর্বত্যাগী সাধকের জাগ্রত-যৌবন ও মহান-আত্মদানের নানা কথা ও কাহিনী আমার

মনের দুয়ারে এসে বার বার আঘাত করছিল। মনে পড়ছিল—The individual must die, so that the nation may live. Today I must dic, so that India may live and win freedom and glory.

জন-গণ-মন-অধিনায়ক নেতাজী সুভাষ আজ কোথায় জানি না। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সত্য হয়েছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে। অথচ আজও তাঁর স্মৃতিধন্য এই স্বাস্থ্যাবাসের নাম—King Edward VII T. B. Sanatorium.

এই উপত্যকা ও চারিপাশের পর্বতমালার প্রাচীন নাম গর্গাচল। এরই কোথাও মহামুনি গর্গের আশ্রম ছিল। পঞ্চাশ বছর আগে ভাওয়ালী ছিল একটি গ্রাম—নৈনিতাল প্রবাসী বাঙ্গালীদের আকর্ষণ-স্থল। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ সোহং স্বামীর আশ্রয় ছিল এখানে। তিনিই বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ও ভারতীয় সার্কাসের জনক প্রফেসর ব্যানার্জি অর্থাৎ শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৮৫৮ সালে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন ও ঢাকা কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি শক্তিশালী ও কুস্তিগীর হিসেবে বিখ্যাত হন। শিক্ষাশেষে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইংরেজ সরকার তাঁর আবেদন না-মঞ্জুর করেন—কারণ তিনি বাঙ্গালী। এই সময় তাঁর বিয়ে হয়। তারপরে তিনি ত্রিপুরায় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পার্শ্বচর নিযুক্ত হন। কিন্তু দু'বছর বাদে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি বরিশাল জিলা স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষকের চাকরি নেন। এর পরই শুরু হয় তাঁর সার্কাস-জীবন। প্রথমে তিনি সুনামগঞ্জে (সিলেট) একটি বন্য চিতা কেনেন এবং গায়ের জোরেই তাকে বশ মানান। তারপরে ভাওয়ালের (ঢাকা) রাজা তাঁকে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার উপহার দেন। তিনি সাধারণতঃ বাঘের খেলা ও বুকের ওপর পাথর ভাঙা দেখাতেন। তিনি আট থেকে চোদ্দ মণ পর্যন্ত পাথর বুকে নিতেন। একবার দানাপুর ও আরার মধ্যে এক মেল ট্রেনে খালিহাতে তিনজন সশস্ত্র গোরা সৈন্যকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে এক মুন্সেফ-পত্নীর সতীত্ব রক্ষা করেন।

শ্যামাকান্ত সংসারী হয়েও সংসার-বিরাগী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর হৃদয়ে ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। পিতৃবিয়োগের পর তিনি তাঁর সব কিছু ভাইবোনদের বিলিয়ে দিয়ে সংসার ত্যাগ করেন। বিদায়বেলায় তাঁর ব্রাহ্ম পিতার শ্মশানভূমিতে পঞ্চরত্নমঠ নির্মাণ করিয়ে তার দেয়ালে উৎকীর্ণ করান—

'ধন মান যশ যত সকলই অসার
ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ নহে কার
নয়ন মুদিলে জগৎ সব অন্ধকার।'

সংসার ত্যাগের পর তিনি আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমা করে ১৯০৩ সালে ভাওয়ালীতে এসে স্থায়ী হন। এই পরিক্রমাকালে তিনি তিব্বতী বাবা বা সিলেটের নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন। তিব্বতী বাবার বয়স তখন প্রায় ১৬০ বছর। তিনি ৩২ বছর তিব্বতে, ৩০ বছর ব্রহ্মদেশে ও কয়েক বছর চীন ও শ্যামদেশে অতিবাহিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর কোন শিষ্য বা ভক্তই তিব্বতী বাবার এই সুদীর্ঘ প্রবাসবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী সঙ্কলিত করেন নি। করলে তা নিশ্চয়ই সোয়েন হেডিনয়ের ট্রান্স হিমালয়ার থেকে কম মূল্যবান বলে বিবেচিত হত না।

যাই হোক তিব্বতী বাবাই লখনউ-য়ে এক সাধু সম্মেলনে শ্যামাকান্তের নতুন নামকরণ করেন সোহং স্বামী। সন্ন্যাস নিলেও শ্যামাকান্ত ঠিক সাধারণ সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন

নির্ভীকহৃদয়, স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবাদী। স্বাধীনভাবে আত্মচিন্তার জন্যই তিনি হিমালয়ের এই অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে তাঁর যোগাশ্রম নির্মাণ করেছিলেন।

তাঁর এই আশ্রমটি ছিল অবিকল বাংলোর মত। সাহেবরা ডাকবাংলো ভেবে প্রায়ই তাঁর শান্তিভঙ্গ করতেন। বাধ্য হয়ে তিনি আশ্রমের সামনে বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লিখে দেন—The Hermitage। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত। 'সোহং তত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশ করে গেছেন। তিনি বলতেন, "আত্মার কোন আশ্রম নাই, উহা নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ, সদ্বস্তু। সুতরাং জাতিগত বর্ণগত এবং আশ্রমগত প্রভেদ নাই। আত্মজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অখাদ্য নাই, একই আত্মা জীবজন্তু সর্বদেহে বিভিন্নাকারে বিভিন্ন বস্তু ভোজন করিতেছে। সেই আত্মাকে অহং ইত্যাকার জ্ঞানে যে উপলব্ধি করিবে তাহার কিছুই খাদ্যাখাদ্য বিচার থাকিতে পারে না।"

সে-আমলে দি হারমিটেজের কাছেই একটি সরকারী তার্পিন তেলের কারখানা ছিল। কারখানার ম্যানেজার ছিলেন শ্রীরামপুরের তিনকড়ি লাহিড়ী। এই কারখানায় বছরে আট হাজার গ্যালন তার্পিন ও তিন হাজার ছ'শ মণ রজন তৈরি হত। বার্ষিক আয় ছিল তেত্রিশ হাজার টাকা।

নৈনিতাল জেলা ভারতের লেক ডিস্ট্রিক্ট। চৌদ্দটি হ্রদ আছে এই জেলায়। ভাওয়ালী এই জেলায় মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত। কুমায়ুনের কয়েকটি রমণীয় স্থান ভাওয়ালী থেকে খুবই কাছে। এদের মধ্যে প্রথম বলতে হয় ভীমতালের কথা। নৈনিতালের মতই পাহাড়ে ঘেরা কিন্তু তার চেয়ে বৃহত্তর একটি হ্রদ। তীরে সারি সারি ওক গাছ। পাহাড়ের ওপর থেকে ছবির মত দেখায়। বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময়। হ্রদে প্রচুর মাছ আছে।

মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেনের নামানুসারে এই হ্রদের নাম হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক জানি না, তবে নামকরণ থেকে অনুমান করা যায়, এই হ্রদ সুদূর অতীত থেকেই মানুষকে আকর্ষণ করেছে। নৈনিতাল আবিষ্কারের পূর্বে কুমায়ুনের অবসর বিনোদন কেন্দ্র ছিল ভীমতাল। নৈনিতালের আবিষ্কারক পি. ব্যারনও শিকার করতে করতে ভীমতালে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি নৈনিতালের কথা শোনেন। প্রাচীনত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হলেও ভীমতাল প্রতিযোগিতায় নৈনিতালের কাছে পরাজিত। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সুনজরে পড়ে, তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় নৈনিতাল আজ বিশ্বের একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত। আর ভীমতালের নাম প্রায় মুছে গেছে মানুষের মন থেকে।

অথচ এই বিস্মৃতির জন্য ভীমতালকে দায়ী করা চলে না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে ভীমতাল নৈনিতালের চেয়ে হেয় নয়। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? সৌন্দর্যের চুলচেরা বিচার করে কে কবে স্বাস্থ্যাবাসের মূল্য নিরূপণ করেছে ? কাশ্মীর তো ছিল সেই সৃষ্টির আদি প্রভাত থেকেই, কিন্তু কাশ্মীরের প্রতি ভারতবাসীর বিশেষ আকর্ষণের সঞ্চার হয় জাহাঙ্গীরের কাশ্মীর-প্রীতির কথা প্রচারিত হবার পরে। ইংরেজদের সুনজরে পড়ে নৈনিতাল উন্নত হয়েছে, আর তাঁদেরই অবহেলায় ভীমতাল তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্ধকারে।

তাহলেও এমন অনেক ভ্রমণরসিক আছেন, যাঁদের এখনও ভীমতালকে ভাল লাগে। নৈনিতালের থেকেও ভাল লাগে। তাঁদের মনে হয়, নৈনিতালে জীবনের স্রোত প্রখর। সেখানে জীবন বড়ই জটিল, অশান্ত আর বিলাসবহুল। কিন্তু ভীমতালে জীবনের স্রোত মন্থর। সেখানে জীবন বড়ই সরল, শান্ত আর বিলাসবর্জিত। তাই নৈনিতাল তাঁদের বলে, 'আমার সৌন্দর্যের পসরা ক্ষণস্থায়ী। তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও, নইলে ফুরিয়ে যাবে।' আর ভীমতাল

বলে, 'আমার সৌন্দর্য চিরস্থায়ী। এসো, আমার কাছে এসে বসো। দু'চোখ মেলে প্রাণভরে আমাকে দেখো, আমার সৌন্দর্যসুধা পান করো। জীবনের সকল অপচয়ের ক্ষতিপূরণ করে নাও।'

১৯১৫ সালের পূজোর সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সপরিবারে কুমায়ুন ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁরা কাঠগুদাম থেকে ডাণ্ডি ডুলি ও ঘোড়ায় চেপে ভীমতাল, রামগড় ও আলমোরা হয়ে মায়াবতী গিয়েছিলেন। তখন ভীমতাল খুবই জমজমাট। দশ-বারোখানা দোকান নিয়ে ব্যস্ত বাজার।

দেশবন্ধুর সহযাত্রী সুসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভীমতালের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—'দীর্ঘ প্রসারিত সুবিশাল হ্রদ আঁকিয়াবাঁকিয়া অগ্রসর হইয়াছে ; চতুষ্পার্শ্বে বিরাট পর্বত-শ্রেণীর গগণভেদী প্রাচীর ও হ্রদের ধার দিয়া চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া পরিচ্ছন্ন পথ ; পথের ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুদৃশ্য গৃহরাজি দেখিয়া মনে হইল সহসা যেন আমরা কোন সযত্ন-অঙ্কিত চিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছি।'

ভীমতাল ভাওয়ালী থেকে সাত ও কাঠগুদাম থেকে উনত্রিশ মাইল। সমুদ্রসমতা থেকে ৪৫০০ ফুট উঁচু, দৈর্ঘ্যে ৫৫৮০ ফুট ও প্রস্থে ১৪৯০ ফুট। নৈনিতালের চেয়ে প্রস্থে ২৮ ফুট ছোট হলেও দৈর্ঘ্যে ৮৭০ ফুট বড়। হ্রদের এক ফার্লং উত্তরে কর্কোটক শিখরে একটি নাগমন্দির ও দক্ষিণে কুমায়ুনের রাজা রাজবাহাদুর চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত তিনশ বছরের পুরানো ভীমেশ্বর শিবের মন্দির।

এই সরোবরের উত্তর দিকে বুয়োর যুদ্ধের (১৯০২ সাল) বন্দীদের জন্য শিবির তৈরি করা হয়েছিল।

নৌবিহার ও মৎস্য শিকারের আদর্শ সরোবর ভীমতাল। ফিশিং কমিটির অবৈতনিক সম্পাদকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। উত্তর-পশ্চিম অংশে তীর থেকে তিনশ ফুট দূরে ছোট্ট একটি দ্বীপ—চড়ুইভাতির চমৎকার জায়গা। চারিপাশের শৈলশিখরে কয়েকটি বাংলো ও কটেজ আছে। আছে একটি ইয়োরোপীয় হোটেল ও টুরিস্ট হোম, পোস্ট অফিস ও রোডওয়েজ সাব-স্টেশন। তাছাড়া এখানে একটি পশম চর্ম শিল্প-কেন্দ্র আছে। এখান থেকে দু মাইল পশ্চিমে নলদময়ন্তী তাল নামে আরও একটি হ্রদ আছে। এটি স্থানীয়দের কাছে অতি পবিত্র হ্রদ।

জল সঞ্চয়ের জন্য ভীমতালে ৫০০ ফুট লম্বা একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বাঁধের উপরিভাগ ১০ ফুট চওড়া। গ্রীষ্মকালে এই জল সেচকার্যে ব্যবহৃত হয়। গৌলা খাল দিয়ে ভীমতালের জল বয়ে যায় হলদোয়ানী—ছড়িয়ে পড়ে ভাবরের ক্ষেতে ক্ষেতে, নৈনিতাল জেলার নিম্ন পার্বত্যভূমিতে। উষরকে উর্বর করে।' ভীমতাল ভাবর অঞ্চলের অন্নপূর্ণা।

ভাওয়ালী থেকে নউকুচিয়া তালের বাসে আড়াই মাইল গিয়ে, সাড়ে তিন মাইল হেঁটে পৌঁছানো যায় সাততাল—একটি বড় ও ছটি ছোট ছোট হ্রদের সমষ্টি। বড় হ্রদটি দৈর্ঘ্যে ৩৩৫০ ফুট ও প্রস্থে ১০৫০ ফুট। অপূর্ব সুন্দর তাদের পরিবেশ। পাইন বনাচ্ছাদিত এই সপ্ত-সারোবর অবগাহন নৌবিহার ও মৎস্য শিকারের আদর্শ স্থান। বড় তিনটি হ্রদ কাছাকাছি অবস্থিত। এদের নাম রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। দুটি হ্রদ কেবল বর্ষাকালেই দেখা যায়।

কয়েকজন ট্রাস্টির অধীনে সাততাল একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বিশ্ববিশ্রুত ডাক্তার ই. স্ট্যানলী জোন্স এখানে একটি আশ্রম করেছেন।

প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে এখানে শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধন করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত

থেকে শিক্ষার্থীরা যোগদান করেন। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁদের নৈতিক ও দৈহিক মান উন্নয়ন করে।

এ অঞ্চলের সবচেয়ে রমণীয় স্থান কোহিনূর—সাততাল পোস্ট অফিস থেকে মাত্র মাইল তিনেক। লখনউ-য়ের কৃশ্চিয়ান কলেজ অভ ফিজিক্যাল এডুকেশনয়ের এটি গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাকেন্দ্র।

ভীমতালের পথে আরও আড়াই মাইল উত্তর-পূর্বে নওকুচিয়া তাল বা নয় বাহুবিশিষ্ট হ্রদ। এখানকার প্রধান আকর্ষণ মৎস্য ও হংস শিকার। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মৎস চাষ করা হয় এখানে। অন্যান্য হ্রদের মতই রমণীয় এর প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই হ্রদে অসংখ্য পদ্ম ফোটে।

ভাওয়ালী অঞ্চলের অপর দর্শনীয় স্থান রামগড় ও মুক্তেশ্বর। নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। বাসপথে রামগড় মাত্র ১০ মাইল। চেরী বৃক্ষে বোঝাই এই গ্রামটি ক্ষুদ্র হলেও একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ—আপেল উদ্যানের জন্য বিখ্যাত। উচ্চতম উদ্যান খাপ্‌রার প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু। এখান থেকে প্রচুর আপেল রপ্তানি হয়। এখানে একটি জ্যামের কারখানা আছে। পঞ্চাশ বছর আগে যখন মোটর পথ তৈরি হয় নি, তখন কাঠগুদাম থেকে আলমোরার যাত্রীরা রামগড়ে এসে রাত্রিযাপন করতেন।

রামগড় থেকে তুষারমৌলী হিমালয়ের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। তাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। এখান থেকে চৌবাতিয়া, বিন্‌সর ও মুক্তেশ্বরের মনোরম শোভা দর্শন করা যায়। দর্শকদের রাত্রিবাসের অসুবিধে নেই কোন, কারণ এখানে একটি পি. ডাবলু. ডি.-র ডাকবাংলো আছে।

রামগড় থেকে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে আরও প্রায় পনেরো মাইল উত্তরে মুক্তেশ্বর। কমনীয়া কুমায়ুনের একটি রণীয় স্থান—সমুদ্রসমতা থেকে ৭৬৯৬ ফুট উঁচু। হাঁটাপথে আলমোরা মাত্র ১৪ মাইল। সোমেশ্বর বাগেশ্বর জগেশ্বর ও রামেশ্বরের মতো কুমায়ুনের পুণ্যার্থীদেরও একটি মুক্তিতীর্থ। আট হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপর মুক্তেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির।

মুক্তেশ্বর কেবল সেকালের মুক্তিতীর্থই নয়, একালের একটি মুক্তিনিবাসও বটে। এটি একটি ছোট শৈলাবাস। চারিপাশে সবুজ উপত্যকা। সবুজের শেষে ধূসর পাহাড়—ধাপে ধাপে ওপরে উঠে আকাশ ছুঁয়েছে। আর সেই সঙ্গে নিজেদের রং পালটে নীল আকাশের কাছে পৌঁছে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের এই ধবল রূপ চিরস্থায়ী নয়। সূর্য আর চাঁদের আবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখে ওরাও অবিরত রূপ পরিবর্তন করছে।

এখানে একটি ডাকবাংলো ও একটি ইন্‌স্পেকশন বাংলো আছে। আর আছে পোস্ট অফিস ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ১৮৯৮ সালে চীর ও বংশবৃক্ষ পরিপূর্ণ তিন হাজার একর জমি নিয়ে ডক্টর লিন্‌গার্ডয়ের কর্তৃত্বাধীনে এই গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার পশুশালা ও ঋতুবেধশালার উচ্চতা যথাক্রমে ৬১০০ ও ৭৬০০ ফুট। এই কেন্দ্রের আধ মাইল উত্তরে হেনরী র‍্যামজে প্রতিষ্ঠিত বকবাগ—ফলের নার্সারী বাগান।

বাসের স্বল্প বিরতির অবসরে বাস থেকে নেমে চা খেয়ে খানিকক্ষণ ভাওয়ালীর পথে পায়চারি করে নেওয়া গেল। মেঘমুক্ত আকাশ। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। একটু শীত-শীত করছে। কিন্তু গরম জামা গায়ে দেবার দরকার নেই। চারদিকে মিঠে রোদ—বেশ আরাম

লাগছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফলওয়ালাদের চিৎকার শুনছিলাম। কিন্তু ড্রাইভার আর বেশীক্ষণ আমাদের আরাম করার সুযোগ দিলেন না। হর্নের তারস্বর শুনে ছুটে আসি বাসের কাছে। তাড়াহুড়ো করে যে যার আসনে বসে পড়ি। কণ্ডাক্টর দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে গাড়ী ছাড়ার নির্দেশ দেয়। বাসের ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাণেশ সহসা গর্জন করে ওঠে, "অসিতদা ?"

তাই তো ! অসিতবাবুর সীট খালি। কোথায় গেল ? একসঙ্গেই বাস থেকে নেমেছিলাম। কিছুক্ষণ সে ছিলও আমাদের সঙ্গে। তার পরে...... ?

"একে নিয়ে আর পারা গেল না।"

ইতিমধ্যে গাড়ী চলতে শুরু করেছে। আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। তাড়াতাড়ি দাশু ড্রাইভারকে গাড়ি রুখতে অনুরোধ করে। বিরক্ত ড্রাইভার গাড়ি থামায়। সুজল মোহিতকে বলে, "চল নেমে একবার খাবারের দোকান খুঁজে দেখা যাক।"

"চল।" বলে মোহিত উঠে দাঁড়ায়। ওরা দুজনে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু বাস থেকে নামতে হয় না।

একটা চিৎকার কানে ভেসে আসে, "ড্রাইভার সাব, রোক্‌কে রোক্‌কে।"

ঐ তো বগলে থলি নিয়ে অসিত এসে গেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে গাড়িতে উঠল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অসহায় ভাবখানি অক্লেশে মুছে ফেলে। গম্ভীর চালে গিয়ে সীটে বসে। নেতার মতই নির্দেশ দেয় ড্রাইভারকে, "ঠিক হ্যায়, ছোড়িয়ে।" তারপর আমাদের দিকে ফিরে নির্বিকার কণ্ঠে বলে, "আমার সঙ্গে চালাকি, যেন আনকোরা টুরিস্ট পেয়েছে ! তাই তো বাস ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হল। বাস ছাড়ার পরেই রেট কমে গেল।"

"তাই বলে তুমি বাস ফেল করবে ?" দেবকীদা ধমক দেন।

"ফেল করব কেন ? আপনারা তো রয়েছেন।"

"কিন্তু যাই বলুন, এই রিসক্ নেওয়াটা ঠিক হয় নি।" দাশু বলে।

"বেশ মেনে নিলাম অন্যায় হয়েছে। কিন্তু অন্যায়ের ভাগ কেউ পাবে না।"

"কিসের ভাগ অসিতদা ?" সুজল সবিশেষ উদ্বিগ্ন।

আসামী অসিতবাবু ফরিয়াদির চালে থলি থেকে একটি নধরকান্তি আপেল তুলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে মোহিত বলে ওঠে, "আমি কিন্তু আপনাকে কিছু বলি নি অসিতদা।"

অসিতবাবু কিছু বলার আগেই দেবকীদা আমাদের সকলের মুখপাত্ররূপে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন, "তা আগে বলবে তো যে আপেল কিনতে গেছ ?"

"তাহলে স্বীকার করছেন আমি ঠিকই করেছি।"

"নিশ্চয়ই !" আমরা সম্মিলিত কণ্ঠে বলে উঠি।

অসিতবাবু আপেল বণ্টন শুরু করে। পাহাড়ী-পথে বাস এগিয়ে চলেছে। পরমানন্দে পাহাড়ী ফল খেতে খেতে আমরা রানীক্ষেত চলেছি। নৈনিতালের মতই রানীক্ষেত আধুনিক যুগের অবদান। এর কোন সুপ্রাচীন ইতিহাস নেই, কিন্তু ইতিকথা আছে।

একদা গ্রীষ্মকালে দ্বারাহাটের রাজা সুধারদেবের (১৩১৮ সাল) রানী পদ্মিনী তাঁর সখী ও সান্ত্রীসহ শৈলবিহার করতে করতে, বর্তমান রানীক্ষেত ক্লাবের কাছে উপস্থিত হন। আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তিনি কিছুকাল সেখানে বিশ্রাম করেন। তাঁর সেই বিশ্রামক্ষেত্রের নাম হয় রানীক্ষেত। সেই নামেই সে আজ পরিচিত।

ইদানীং অবশ্য অনেকে প্রশ্ন করেন, রানীর শৈলবিহারভূমির নাম রানীশৈল বা শৈলরানী

না হয়ে রানীক্ষেত হল কেন ?

তাঁদের মতে—রানীক্ষেতের সঙ্গে কোন রানীর যোগাযোগ নেই। রানীক্ষেত নাম হয়েছে কুমায়ুনের এক কমিশনারের কন্যা এ্যানি কেট-য়ের (Annie Kate) নামানুসারে। কালের প্রভাবে এ্যানি কেট আনিক্ষেত হয়ে, শেষ পর্যন্ত রানীক্ষেত হয়েছে।

১৮১৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকরা কুমায়ুনের দিকে নজর দেন। সাম্রাজ্যবিস্তার ছাড়াও তাঁদের কুমায়ুনের প্রতি প্রলুব্ধ হবার আর একটি কারণ ছিল। তখন এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শন (hemp) উৎপন্ন হত। এই শন না হলে কোম্পানীর কাশীপুর কারখানা অচল হয়ে যেত। কারখানার সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর রাদারফোর্ড তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে বোঝালেন যে কুমায়ুন অধিকার করে নিয়ে নিজেরা শনের চাষ করতে পারলে কারখানার বেশী মুনাফা হবে। প্রস্তাবটা সম্প্রসারণবাদী হেস্টিংস-য়ের বড়ই পছন্দ হল। কুমায়ুনে তখন নেপালী শাসন চলেছে। হেস্টিংস ই. গার্ডনারকে পাঠালেন কুমায়ুনের নেপালী শাসক বাম শাহয়ের কাছে। কিন্তু নেপালীরা বিনা যুদ্ধে ইংরেজকে কুমায়ুন দান করতে স্বীকৃত হলেন না।

নভেম্বর মাসে হেস্টিংস নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ছ'শ মাইল জুড়ে চারটি রণাঙ্গনে ৩৪,০০০ হাজার সৈন্য নিয়োজিত হল। জেনারেল ডেভিড অক্টরলোনী লুধিয়ানা রণাঙ্গনের, জেনারেল গিলেস্‌পাই দেরাদুন রণাঙ্গনের, কর্নেল নিকলস্‌ কুমায়ুন রণাঙ্গনের পরিচালনা করতে থাকলেন। আর জেনারেল মার্টিনডেল সরাসরি কাটমাণ্ডু অভিমুখে অভিযান চালালেন। মাত্র ১২০০০ নেপালী সৈন্য বীরবিক্রমে বাধা দিলেন। কেবল অক্টরলোনী কোনমতে নিজের ঘাঁটি আঁকড়ে রইলেন। অন্যত্র ইংরেজরা পিছু হটতে থাকলেন। গিলেস্‌পাই মারা গেলেন। বাধ্য হয়ে হেস্টিংস সমস্ত ইংরেজ বাহিনীকে নেপালের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করলেন। অক্টরলোনী হলেন সর্বাধিনায়ক। প্রবল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর নেপালীদের প্রতিরক্ষা ব্যূহে ফাটল ধরল। লেঃ কর্নেল ডাবলু. এল. গার্ডনার তিন হাজার সৈন্য নিয়ে কোশী পর্যন্ত অগ্রসর হলেন এবং ক্যাপ্টেন এইচ. আই. হিয়ারসে দেড় হাজার সৈন্য নিয়ে টিম্‌লা গিরিবর্ত্ম দিয়ে আলমোরা আক্রমণ করলেন। কুমায়ুন ইংরেজের অধিকারে এল।

কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের মূলে সমরনীতি নয় রাজনীতি। নেপালীরা বাহুবলে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন দখল করে বাহুবলের সাহায্যেই রাজ্যশাসন করছিলেন। তাঁরা কোনদিনই স্থানীয় জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন পাবার চেষ্টা করেন নি। ফলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে একটা তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। সুচতুর ইংরেজরা এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা সরল পাহাড়ীদের বুঝিয়েছিলেন যে তাঁদের এই যুদ্ধ গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের মুক্তিযুদ্ধ। ফলে তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছিলেন। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের প্রাক্তন মন্ত্রী হরখ দেব জোশী এই যুদ্ধে ইংরেজের প্রধান সহায় হয়েছিলেন। না হলে হয়তো গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হত।

যেভাবেই হোক কুমায়ুন ইংরেজ অধিকারে এল। ১৮১৫ সালের ২৭শে এপ্রিল ই. গার্ডনার কুমায়ুনের প্রথম ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হলেন। তারপরে ডেপুটি কমিশনার হন জি. ডাবলু. ট্রেল—যাঁর নামানুসারে ট্রেল্‌স পাস বা ট্রেল্‌স গিরিবর্ত্মের (১৭,৬০০) নাম হয়েছে। তার পরে আসেন কর্নেল গোয়ান (১৮৩০), ল্যাশিংটন (১৮৩৯), ব্যাটেন (১৮৪৮) ও মেজর জেনারেল স্যার হেনরি র‍্যামজে। ব্যাটেন নৈনিতালের অন্যতম আবিষ্কর্তা আর র‍্যামজের শাসনকালে

কুমায়ুনের অনেক উন্নতি হয়েছে। এরই স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নৈনিতালের র‍্যামজে হস্‌পিট্যাল। ইদানীং অবশ্য এই হাসপাতালের নতুন নাম হয়েছে গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতাল।

আঁকাবাঁকা বনময় পাহাড়ী পথ। ছাড়িয়ে এলাম রতিঘাট। কিছুদূর এসে খয়রাণা—ভাওয়ালী থেকে ১২ মাইল। এখানে ডাকবাংলো ও রেস্ট হাউস আছে। আর আছে ছোট একটি বাজার ডাকঘর ও স্কুল। এখান থেকে নৈনিতাল যাবার একটি সংক্ষিপ্ত হাঁটাপথ আছে। কোশীর তীর ঘেঁষে পূর্ব দিকে চলে গেছে আলমোরার নতুন পথ। আগে কাঠগুদাম বা নৈনিতাল থেকে আলমোরা যেতে হলে রানীক্ষেত হয়ে যেতে হত। ইদানীং কুমায়ুন মোটর ওনার্স ইউনিয়ন এই নতুন পথটি তৈরি করেছেন। ফলে আলমোরার দূরত্ব গেছে কমে। কিন্তু এ পথে তাঁদের বাস ট্যাক্সি ও লরি ছাড়া অন্য কারও গাড়ি চলতে পারে না।

খয়রাণা ছাড়িয়ে বাস এসে থামল গরমপানীতে—কাঠগুদাম থেকে ৩৭ মাইল। রানীক্ষেত আরও ১৫ মাইল। রাস্তাটা এখানে বেশ চওড়া, খানচারেক বাস স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। ছোট বাজার আর কিছু বাড়িঘর গিয়ে গঞ্জের মত একটি জায়গা। স্থানীয়রা বলেন নদীর জলের চেয়ে এখানকার ঝরনার জল গরম বলেই এখানকার নাম গরমপানী। কিন্তু ঝরনার জল পরীক্ষ না করেও নামের সার্থকতা আস্বাদন করা যায়। এখানে সত্যই বেশ ভাল গরম পানী অর্থাৎ চা গ্রাম্ পাওয়া যায়। পাহাড়ীপথে বাস-যাত্রার ধকল থেকে সাময়িক নিস্কৃতি লাভ করে সেই আধুনিক অমৃত ওষ্ঠাধরে ঠেকালে গরমপানীর গরম আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতে হয়।

গরমপানীর পরেই আমরা পুল পেরিয়ে কোশীর উত্তর তীরে এলাম। এই পুলটি তৈরি হয়েছে ১৯২৩ সালে।

পাঁচ মাইল এসে রামশাওন। এখানে একটি রেস্ট হাউস আছে। রানীক্ষেত আরও দশ মাইল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। হেডলাইট জ্বালিয়ে বাস ছুটে চলেছে কোশীর কোল ঘেঁষে।

অবশেষে বাস এসে স্থির হল রানীক্ষেত টুরিস্ট অফিসের সামনে। যথারীতি কুলির দল ও হোটেলের প্রতিনিধিকুল আমাদের ঘেরাও করল। দেবকীদা সবিনয়ে নিবেদন করলেন—আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইউনিট, ওদের কোন সাহায্যেরই আমাদের প্রয়োজন নেই। ফল হল উল্টো। ইউনিট শুনে ওরা ইউনাইটেড হল—একযোগে আক্রমণ করল আমাদের। বাধ্য হয়ে অসিতকে আস্তিন গোটাতে হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈপ্সিত ফল ফলল।

নিজ নিজ রুকস্যাক পিঠে ও কিটব্যাগ কাঁধে নিয়ে, আইস-এক্স হাতে আমরা অমিতাভর প্রদর্শিত পথে নির্দিষ্ট হোটেলের উদ্দেশে এগিয়ে চলি। ইউরোপীয় ও ভারতীয় মিলে রানীক্ষেতে ডজন কয়েক ভাল হোটেল আছে। নৈনিতালের মতই বিচিত্র এদের নাম—স্নোভিউ হিমালয় এভারেস্ট, রোজমাউন্ট ওয়েস্টভিউ মুন, নর্টন ডিসেণ্ট গ্র্যাণ্ড। এসব হোটেলে যেমন থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে, তেমনি ইচ্ছে করলে কেবল ঘরভাড়াও পাওয়া যায়। হোটেল ছাড়াও রানীক্ষেত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাকবাংলো, পি. ডাবলু. ডি.-র ইন্সপেকশান হাউস, ফরেস্ট রেস্ট হাউস ও টুরিস্ট লজ আছে।

অমিতাভ আমাদের নিয়ে চলেছে তার পরিচিত হোটেলে। ওর আশা পুরনো পরিচয় ঝালিয়ে একটু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। আমি অবশ্য ওকে মনে করিয়ে দিয়েছি, সুবিধে কিছুই হবে না। তবু শেষ পর্যন্ত চলেছি সেখানে। কনসেশনের আশায় নয়, ক্রুশিফিকশন যাতে না হয় সেই ভরসায়।

কুয়াশায় ছাওয়া জনবিরল পথ। রানীক্ষেত নৈনিতালের মত জমজমাট নয়। তাই রাত নটা না বাজতেই তার দৈনন্দিন জীবনের যতি পড়ে। নৈনিতাল উচ্ছল, রানীক্ষেত উদাস, নৈনিতাল প্রাচুর্যপূর্ণ রানীক্ষেত আড়ম্বরশূন্য, নৈনিতাল আধুনিক রানীক্ষেত প্রাচীন। তাই তরুণরা নৈনিতালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, প্রবীণরা রানীক্ষেতের ধ্যানমগ্ন ভাবে বিভোর। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় শেষজীবনে অবসর পেলেই রানীক্ষেতে আসতেন।

হোটেলের দরজা ঠেলে আমরা একে একে ভেতরে প্রবেশ করি। বেশ বড় একখানি হলঘর। দোর পেরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গা, তারপরেই ম্যানেজারের কাউণ্টার। ফাঁকা জায়গার শেষে সারা ঘর জুড়ে চেয়ারে ঘেরা সারি সারি টেবিল। এটিই হোটেলের অফিস-কাম-রেস্তোরাঁ-কাম-ডাইনিং হল। তেমন ভিড় নেই। তবে একেবারে খালিও নয়।

আমাদের আকস্মিক অনুপ্রবেশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা কিট ও আইস-এক্সগুলো একপাশে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াই। অমিতাভ এগিয়ে যায় ম্যানেজারের কাছে। তার প্রশ্নের উত্তরে ম্যানেজার জানায়, "হ্যাঁ, ঘর খালি আছে। আপনারা কজন?"

"আটজন।"

"দুখানা ডাবল-বেড রুম দিতে হবে। ভাড়া ষোল টাকা। অতিরিক্ত চারখানা খাটিয়ার জন্যে দুটাকা, আর ঝাড়ুদার পঞ্চাশ পয়সা। সব মিলিয়ে দৈনিক সাড়ে আঠারো টাকা লাগবে।"

"আমাদের খাটিয়ার দরকার নেই আর একটা ঘরেই হয়ে যাবে।"

"আপনাদের হয়ে যাবে। কিন্তু আমার হবে না। আমি তো আট আদমীকে এক কামরায় থাকতে দিতে পারি না। এটা আমাদের রুল্‌স এ্যাণ্ড রেগুলেশনস্‌য়ের বাইরে।"

"আমি কিন্তু আপনাদের ওল্ড কাস্টোমার।" অমিতাভ টোপ ফেলে।

"তাই এত চেনা-চেনা লাগছে। কিন্তু স্যার, আমি হেল্পলেস। মালিকের নিয়ম, আপনাদের দুখানা ঘর নিতেই হবে।"

অমিতাভ আবার অনুরোধ করে। কিন্তু হোটেল ম্যানেজারের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয় না। ফলে আমাদের ম্যানেজার বিগড়ে যায়। বলে, "চল চল, অন্য কোথাও চেষ্টা করা যাক। রানীক্ষেতে হোটেলের আকাল পড়ে নি।"

অগত্যা আমরা আবার কিটব্যাগ কাঁধে নিই, আইস-এক্স হাতে নিই। ফিরে চলি দরজার দিকে। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠেন, "এই যে ইয়াং মাউণ্টেনিয়ার্সরা, আপনারা যাবেন না!"

পরিষ্কার বাংলা শুনে আমরা থমকে দাঁড়াই, পেছন ফিরি। ম্যানেজারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একজন প্রবীণ ভদ্রলোক। লম্বা-চওড়া চেহারা, এ বয়সে এমন বলশালী বাঙ্গালী বড় একটা দেখা যায় না। ইনিই বোধ হয় সামনের টেবিলটায় বসে গ্লাসে করে কি যেন খাচ্ছিলেন। সে যাই হোক, আমরা এগিয়ে আসি ভদ্রলোকের কাছে। তিনি একজন বেয়ারাকে হুকুম করেন, "সাবদের নিয়ে যাও কামরায়।" তারপর আমাদের বলেন, "আমি ম্যানেজারকে বলে দিয়েছি আপনাদের একটা ঘরেই থাকতে দেয়া হবে। আর কিটগুলো এখানে রেখে যান, বেয়ারারা পৌঁছে দেবে।"

"ধন্যবাদ, আমরা নিজেরাই নিয়ে যেতে পারবো।" তারপরে অসিত বেয়ারাকে বলে, "চল হে কোথায় যেতে হবে!"

ভদ্রলোক একটু হেসে অসিতবাবুকে বলেন, "আপনারা পাহাড়ে যাচ্ছেন। নিজের মাল

নিজে না বইতে পারলে যে পর্বতারোহী হওয়া যায় না, তা আমি জানি। কিন্তু সিঁড়িটা বড্ড সরু বলেই কিটগুলো রেখে যেতে বলছি।" ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে কি যেন মেশানো আছে। আমরা আর তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। কিটব্যাগ নামিয়ে রেখে বেয়ারার সঙ্গে ওপরে উঠে আসি।

ঘরখানা বেশ বড়। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দুখানি খাটিয়া একটা ড্রেসিং টেব্‌ল ও একটা দেয়াল-আলমারি। পিছনের বারান্দাটি অপূর্ব। কাল সকালে ওখানে দাঁড়িয়েই তুষারাবৃত হিমালয় দেখা যাবে—যার জন্যে রানীক্ষেতে আসা। এক কথায় আশ্রয়টি সস্তা এবং সুন্দর। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না নিয়মনিষ্ঠ ম্যানেজার কেন এই অনিয়মে রাজী হলেন ! আর ঐ ভদ্রলোকই বা কেন আমাদের হয়ে অমন ওকালতি করলেন ? শুধুই কি বাঙ্গালী ও পাহাড়ে যাচ্ছি বলে ? না তাঁর এই ভালমানুষীর পেছনে কোন কু-মতলব আছে ? কিছুই বলা যায় না, সাবধানে থাকতে হবে।

চারজন বেয়ারা আমাদের মালপত্র নিয়ে ভেতরে ঢোকে। তাদের পেছনে সেই ভদ্রলোক। তাঁর হাতেও একটা কিটব্যাগ। মোহিত ছুটে গিয়ে সেটি হাতে নেয়। অনুযোগ করে, "এ আপনার বড্ড অন্যায় দাদা ! আমাদের খালি হাতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মাল বইছেন।"

"তাতে কি হয়েছে ? বইবার সামর্থ্য এখনও আমার আছে। তাছাড়া তোমরা....."

"থামলেন কেন, বলুন না ?"

"সরি ভাই, তুমি বলে ফেললাম।"

"আমরা আপনার ছোট ভাইয়ের মত।"

"আমি আবার আর্মিতে চাকরি করে আর চিরকাল বিদেশে থেকে এই সব আজ্ঞে-আপনিগুলো প্রায় ভুলে গেছি।"

"বেশ করেছেন। আপনি আমাদের তুমি বলেই ডাকবেন। দুদিনের জন্য হলেও আমরা একটু স্নেহমধুর সম্বোধন শুনতে পাব।" দাশু বলে।

ভদ্রলোক বেয়ারাদের দিকে ফিরে বলেন, "ঠিক আছে, তোমরা এখন যেতে পার।"

ওরা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। কিন্তু ভদ্রলোক ওদের আবার ডাক দেন, "শোন হে, এই সাবদের জন্য একটু চায়ের বন্দোবস্ত করতে পার ?"

"এখন যে খানা পাকানো হচ্ছে মেজর সাব।" একজন বেয়ারা জবাব দেয়।

"হোক্ গে, ম্যানেজারকে বল—এদের চা চাই।"

ওরা সেলাম ঠুকে চলে যায়। ভদ্রলোক একখানি খাটিয়ায় বসে ইশারায় আমাদের বসতে বলেন। তারপর পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে, নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে, কেসটা দেবকীদার হাতে দিয়ে বলতে থাকে, "তোমরা দেশের গৌরব। সুখের সংসার আর স্বাচ্ছন্দ্যের শহর ছেড়ে দুর্গম পথ-পরিক্রমায় বেরিয়েছ। তোমাদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।"

সুজল কানে কানে বলে, "বুঁদ হয়ে আছে—আমি গন্ধ পেয়েছি। কিন্তু লোকটা কে ?"

কেমন করে বলব ? চুপ করে থাকি। সুজল আবার বলে, "কাল সকালে নেশা কেটে গেলে কিন্তু আর কর্তব্যের কথা মনে থাকবে না !"

সুজলের অনুমান মিথ্যে নয়। ভদ্রলোক সত্যই মদ খেয়েছেন, কিন্তু মোটেই মাতাল হন নি। অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলছেন, "বাংলাদেশ বহুকাল ছেড়েছি কিন্তু বাংলাটা এখনও ভুলি নি। আমি আর্মিতে মেজর ছিলাম। সারাজীবনই কেটেছে বাংলার বাইরে। ভেবেছিলাম

রিটায়ার করে ঘরে ফিরে যাবো। কিন্তু বিধি বাম। তা আর হয়ে উঠল না। জীবনটা পথে-পথেই কেটে গেল।"

"যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।" দাশু সবিনয়ে বলে।

"জিজ্ঞেস করতে পারো। তবে উত্তর দেব কিনা বলতে পারছি না।"

দাশু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তবু কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারে না, "কেন আপনার ঘরে ফিরে যাওয়া হল না, জানতে পারি কি ?"

"ঘর ভেঙ্গে গেল বলে। সে যাক গে।" মেজর সহসা নীরব হয়ে যান। আমরাও চুপ করে থাকি। একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া মূর্ত হয়ে ওঠে। এমন সময় চায়ের ট্রে হাতে দুজন বেয়ারা ঘরে ঢোকে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। মেজরের চমক ভাঙ্গে। তিনি মুহূর্তের মধ্যে স্বভাবসুলভ হাসি মুখে ফিরিয়ে এনে বলে ওঠেন, "এই যে, চা এসে গেছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। নৈলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

আমরাও অকারণ ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে আবহাওয়াটাকে হাল্কা করে তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু ঠিক সফল হই না। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে থাকি।

বেয়ারারা খালি কাপ ও পট নিয়ে চলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেজর উঠে দাঁড়ান। বলেন, "তোমরা একটু জিরিয়ে নাও। তারপর গোছগাছ করে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়। কাল সকালে আবার আসব।" আমাদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তিনি বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

আমরা উঠে দাঁড়াই। মেজর আবার ফিরে আসেন। দাশুকে লক্ষ্য করে বলেন, "যার জন্যে ঘরে ফিরবো ভাবছিলাম, সে-ই আমাকে ছেড়ে চলে গেল !"

"কোথায় ?"

"যেখান থেকে কেউ আর ফিরে আসে না।"

॥ ছয় ॥

কে যেন কড়া নাড়ছে দোরে। তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসি। কিন্তু মোহিত তার আগেই দরজা খুলে ফেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে মেজরের অট্টহাসিতে ঘরখানা কেঁপে ওঠে। সবারই ঘুম ভেঙ্গে যায়। হাসি থামিয়ে মেজর বলেন, "মাউণ্টেনিয়ার্স হয়ে তোমরা এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছ ! উষার প্রথম আলোয় যদি তুষারময় হিমালয় না দেখলে, তাহলে রানীক্ষেত এতে কেন ?"

আমরা লজ্জা পাই। মেজর আবার বলেন, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে চল বেরিয়ে পড়া যাক। চা বলে দিয়েছি। এসে যাবে এক্ষুনি।"

সুজনের অনুমান মিথ্যে। কাল রাতের নেশা নিশ্চয়ই কেটে গেছে আজ সকালে। তবু মেজর এসেছেন আমাদের ঘরে।

চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া গেল পথে। শৈলরানী রানীক্ষেতের পথে। এখনও এখানে রোদ এসে পৌঁছয় নি। কিন্তু রোদের রাঙা পরশ পেয়েছে ওই তুষারময় হিমালয়। সেখানে শুরু হয়েছে প্রকৃতির হোলিখেলা। একে একে তারা রাঙা রোদে রঞ্জিত হচ্ছে। আমাদের মনেও

রংয়ের নেশা দিচ্ছে ধরিয়ে।

এই দৃশ্যমান তুষারময় শৃঙ্গমালার দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল। এর মধ্যে আছে নন্দাদেবী, ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি, হাতি ও গৌরী পর্বত। নন্দাঘুন্টি (২০,৭০০´) অভিযান ভারতের প্রথম বে-সরকারী পর্বতাভিযান। ১৯৬০ সালের ২২শে অক্টোবর সুকুমার রায় ও দিলীপ ব্যানার্জি চারজন শেরপাসহ এই শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ভারতীয় অভিযাত্রীরা নন্দনকাননের নিকটবর্তী হাতি পর্বতে (২২,০৭০´) আরোহণ করেন ১৯৬৩ সালের ৬ই জুন। এভারেস্ট বিজয়ী সোনাম গিয়াত্‌সো এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

বহুকাল থেকেই হিমালয় অভিযানে রানীক্ষেত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এইচ. ডাবলু. টিলম্যানের যে নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫´) অভিযান। সহযাত্রী এন. ই. ওডেলের সঙ্গে ১৯৩৬ সালের ২৯শে আগস্ট তিনি সর্বপ্রথম এই গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করেন। তিনি রানীক্ষেতে বসেই তাঁর এই অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন।

মেজরের কথায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে, "এই অঞ্চলকে বলে আলমা ব্যারাক্‌স—উচ্চতা ৬,১৪০ ফুট। রানীক্ষেত তিনভাগে বিভক্ত। এটি হল একটি। অপর দুটি ভাগ দুলিক্ষেত ও চৌবাতিয়া—উচ্চতা ৫,৯৮৩ ও ৬,৯৪২ ফুট। রানীক্ষেতের আয়তন প্রায় সাড়ে আট বর্গ মাইল।"

মন্দ লাগছে না শুনতে। আমরা নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে চড়াইপথে হেঁটে চলেছি। মেজর বলে যাচ্ছেন, "গ্রীষ্মকালে এখানকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেমন ৩৩° সেণ্টিগ্রেডের ওপরে ওঠে না, তেমনি শীতকালেও মাইনাস ৩° সেণ্টিগ্রেডের নিচে নামে না।"

আমরা সকলেই সাধারণ গরম পোশাক পরেছি। বেশ আরামদায়ক আবহাওয়া। পাইনের ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। চড়াই পথটুকু শেষ করে আমরা ওপরে উঠে এলাম। এটি একটি পর্বতশিখর, প্রয়োজনে প্রায় সমতল করে ফেলা হয়েছে। পথের পাশে সেনানিবাস ও অফিস। রাস্তাটা বেশ চওড়া। আমরা দুখানা বেঞ্চিতে বসলাম সবাই। এখান থেকে তুষারমৌলি হিমালয়কে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

মেজর বলে চলেছেন, "রানীক্ষেত ইংরাজদের হাতে গড়া। ১৮৬৯ সালে তাঁরা এই শহরের পত্তন করেন। সে-বছরই এই ক্যাণ্টনমেণ্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। আগে এখানে সরনা, কোটলী ও তানা নামে তিনটি গণ্ডগ্রাম ছিল। প্রচুর অর্থব্যয় করে ইংরেজরা সেই অসমতল এলাকাকে সমতল করে বাড়ি ব্যারাক ও বাগান তৈরি করেন। জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত ও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে এই ক্যাণ্টনমেণ্টকে সেনাবাহিনীর রমণীয় নিবাসে পরিণত করা হয়। এখন রানীক্ষেত একটি বৃহৎ সেনানিবাস এবং কুমায়ুন রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর।

"বড়লাট লর্ড মেয়ো (১৮৬৮-৭২) কিছুকাল রানীক্ষেতে বাস করে এখানকার আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর গ্রীষ্মাবাস সিমলা থেকে এখানে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি রামনগর থেকে রানীক্ষেতে রেললাইন নিয়ে আসার জন্য জরীপকার্যের আদেশ দেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে এ প্রস্তাব আর কার্যকরী হয় নি।"

"আপনি কি সারা বছরই এখানে থাকেন ?" সহসা সুজল প্রশ্ন করে বসে মেজরকে। আমরা বিরক্ত হই না, কারণ মেজরের ব্যক্তিগত জীবনকে জানার কৌতূহল আমাদেরও যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু ভয় হচ্ছে মেজর না এড়িয়ে যান।

"না।" মেজর সুজনের দিকে তাকিয়ে জবাব দেন, "শীতের ক'মাস এখানে থাকি না। ডিসেম্বরে চলে যাই লখনউ, আর ফিরে আসি এপ্রিলে। ডিসেম্বরে এখানে প্রচণ্ড শীত, মাইনাস তিন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, তার ওপর জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে বর্ষা নামে। তুষারপাত তো রয়েছেই। সে আবহাওয়া অসহ্য।"

"এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আপনি কেবল এখানেই থাকেন, না কুমায়ুনের অন্যান্য অঞ্চলেও ঘুরে বেড়ান ?" দাশু জিজ্ঞেস করে।

আবার একটি সিগারেট ধরিয়ে মেজর বলেন, "এখন আর কোথাও যাই না। আগে ঘুরে বেড়াতাম, আর যাবই বা কোথায়, সবই তো মোটামুটি দেখে নিয়েছি।"

"আপনি রূপকুণ্ড পিণ্ডারী মুনাসিয়ারী—এসব দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ। আমি কৈলাস ও মানস-সরোবর পরিক্রমাও পূর্ণ করেছি।"

"তাহলে তো ভালই হল, আপনার কাছ থেকে অনেক খবরাখবর পাওয়া যাবে।" মোহিত উল্লসিত হয়।

"কিন্তু সে খবর তোমাদের কাজে লাগবে কি ? পাহাড়ী পথ সদা পরিবর্তনশীল। আমার পথের সঙ্গে হয়তো তেমন মিল পাবে না।"

"তা হোক গে। তবু একটি মোটামুটি বর্ণনা তো পাওয়া যাবে।" দাশু যোগ করে।

"মুখে মুখে কি আর তেমন বর্ণনা দিতে পারব ? তবে হ্যাঁ, আমার একখানা খাতা আছে। তাতে আমি এসব জায়গার কথা কিছু কিছু লিখে রেখেছি। তোমরা যদি চাও, তাহলে পড়ে শোনাতে পারি।"

"আপনার বুঝি লেখার অভ্যেস আছে ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ঠিক অভ্যেস নেই। তবে ঐ লিখে রাখার একটা বদ-খেয়াল আছে আর কি ?"

"বদখেয়াল বলছেন কেন ? যা দেখলাম শুনলাম আর উপলব্ধি করলাম, যা পেলাম নিলাম আর হারালাম—তার একটা হিসেব রাখা উচিত বৈকি।"

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠেন মেজর, "আরে আটটা বাজে দেখছি। আমি তো আর বসতে পারব না ভাই, একটা বিশেষ কাজে আমাকে বেরুতে হবে। তোমরা বরং একটু ঘুরেটুরে দেখে নাও। আবার সন্ধ্যের পরে দেখা হবে।" বলেই টুপিটা মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে উঠে দাঁড়ান। হন হন করে নিচে নামতে শুরু করেন।

আমি চেঁচিয়ে উঠি, "ডায়েরীটা বের করে রাখবেন কিন্তু, সন্ধ্যের পরে যাব।"

কোন জবাব না দিয়ে লাঠিসুদ্ধ হাতখানি একবার ওপরে তোলেন মেজর, তারপর অদৃশ্য হয়ে যান। দুর্বোধ্য চরিত্র। কেন তাঁর এই নিঃসঙ্গ প্রবাস বাস ? এই হাসিখুশী আমুদে রূপটি কি তাঁর প্রকৃত পরিচয় নয় ? তাঁর হাসির অন্তরালে কি কোনো কান্না লুকোনো আছে—আছে কোনো সকরুণ কাহিনী ?

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে থাকি। তারপর চমক ভাঙ্গে একে একে। সবার আগে কথা বলেন দেবকীদা, "এবারে ওঠা যাক। চল চৌবাতিয়া থেকে ঘুরে আসি।"

প্রস্তাবটা প্রত্যেকেরই পছন্দ হয়। সবাই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই। পাইন ওক দেওদার ও সাইপ্রেস গাছে ছাওয়া পথ বেয়ে আলমা ব্যারাক্‌স-য়ের পাশ দিয়ে আমরা নেমে চলি বাস-স্ট্যাণ্ডে। পথের দুধারে হলুদ লজ্জাবতী ও রাঙা রডোডেনড্রনের সমারোহ।

আলমা ব্যারাক্‌সই কুমায়ুন রেজিমেণ্টের প্রধান ঘাঁটি। এই রেজিমেণ্ট ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পদ। চীনা হানাদারির সময়, বিশেষ করে ১৯৬২ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে,

এই সেনাবাহিনী লাদাক ও নেফা সীমান্তে প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এদেরই একজন ছিলেন মেজর শয়তান সিং। সাম্রাজ্যবাদী চীনা কমিউনিস্ট সৈন্যের হাতে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু মাতৃভূমির এক ইঞ্চি ভূমিও ছেড়ে দেন নি। ভারত সরকার তাঁকে মরণোত্তর পরম বীরচক্র প্রদান করেছেন। আসুন, আমরাও সেই মহান বীরের অমর আত্মাকে প্রণাম করি। প্রণাম করি, তাঁরই মত যাঁরা নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দেশের মান বাঁচিয়ে গেলেন। প্রণাম করি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সকল সৈনিককে, যাঁরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য দুঃসহ শীত আর অসহ্য গ্রীষ্ম সহ্য করে তুষারাবৃত ও মরুপ্রান্তর সীমান্তে অতন্দ্র পাহারায় নিযুক্ত রয়েছেন।

বাস-স্ট্যাণ্ডে পৌঁছবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একখানা বাস পাওয়া গেল। কেবল সরকারী বাসই চৌবাতিয়া যায়—রানীক্ষেত থেকে সাড়ে ছ মাইল। পথে পড়ল ঝুলা দেবীর মন্দির। চৌবাতিয়া শব্দের অর্থ চারটি কানন। কুমায়ুন ইংরেজ অধিকৃত হবার পরে বৃটিশ সেনাবাহিনীর বহু সদস্য এখানে জমি কিনে বসতি স্থাপন করেন। ক্যাপ্টেন ট্রুপ নামে একজন সৈনিক তখন এই চৌবাতিয়ায় একটি চায়ের বাগান করেন। ১৮৯৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে সরকার সেই বাগানটি কিনে নিয়ে সেখানে ফলের চাষ শুরু করেন। এখন চৌবাতিয়ার প্রধান আকর্ষণ সেই সরকারী ফলের বাগান ও ফল গবেষণা কেন্দ্র। এখানে প্রায় একশ রকমের আপেল ফলে। ক্যাফেটারিয়াটিও দেখলাম বড় সুন্দর। দর্শকদের কলহাস্যে সদাই মুখরিত। ফলের রস ও ফলজাত খাদ্যের জন্য এটি বিখ্যাত।

স্থানীয়রা চৌবাতিয়া পাহাড়কে অতি পবিত্র বলে মনে করেন। দশেরা উৎববের সময় এই পাহাড়ে প্রথম বলিদান করা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে দশেরা অতি প্রিয় উৎসব। রানীক্ষেত কুমায়ুন রেজিমেন্টের সদর দপ্তর। কাজেই আলমা ব্যারাক্স-য়েও দশেরা উপলক্ষে খুব জাঁকজমক হয়ে থাকে। মহাষ্টমীর দিন মধ্যরাত্রি (কালরাত্রি) থেকে আরম্ভ হয় মহাশক্তির আরাধনা। সেনাবাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আগের থেকেই পূজো প্যাণ্ডেলে সাজিয়ে রাখা হয়। মহাষ্টমীতে একটি পাঁঠা ও একটি মোষ বলি দিয়ে তাদের রক্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয় অস্ত্রশস্ত্রে। তারপর প্রবীণতম সুবেদার মেজর পুরুতঠাকুর সেজে পূজোয় বসেন। তাঁর পূজো শেষ হলে সেনাবাহিনীর পুরোহিত শাস্ত্রমতে পূজো শুরু করেন। পূজোর পরে আরম্ভ হয় আনন্দের আসর—নাচ, গান ও হল্লা। অফিসারসহ সবাই যোগ দেন এই আসরে।

পরদিন অসংখ্য পাঁঠা বলি দেয়া হয়। বসে ভোজের আসর বা বড়াখানা। সেনাপতি থেকে সাধারণ সেনানী পর্যন্ত সকলেই একসঙ্গে বসে একই খানা খান।

তারপর শুরু হয় সপ্তাহব্যাপী রামলীলা। জওয়ানরাই এই অভিনয়ের অভিনেতা। সেনাবাহিনীর বাঙ্গালী অফিসাররাও পেছিয়ে থাকেন না। তাঁরা এই উপলক্ষে দূর্গাপূজো করেন। সপরিবারে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শহরবাসীরা দল বেঁধে রামলীলা ও বিচিত্রানুষ্ঠান দেখতে আসেন। দশেরা রানীক্ষেতের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসব।

দশেরা উপলক্ষে রানীক্ষেতে বেশ বড় মেলা হয়। এই মেলাকে বলে রামলীলার মেলা। মেলা কুমায়ুনের সমাজ-জীবনের এক পরম সম্পদ। প্রায় প্রত্যেক সমৃদ্ধ জনপদে বা তীর্থক্ষেত্রে বছরের কোনো না কোনো সময় মেলা বসে। এর মধ্যে বাগেশ্বরের উত্তরায়ণীর মেলা (জানুয়ারি), ভিকিয়াসেনের শিবরাত্রির মেলা (মার্চ), দ্বারাহাটের শালদেবীর মেলা (এপ্রিল) ও আলমোরার নন্দাদেবীর মেলা (সেপ্টেম্বর) বিশেষ বিখ্যাত।

চৌবাতিয়া থেকে মাত্র দেড় মাইল পাকদণ্ডী ভেঙ্গে পৌঁছনো যায় ভালুবাঁধ—একটি কৃত্রিম

হ্রদ। রানীক্ষেতের জলাধার। প্রচুর মাছ আছে এ হ্রদে। অনুমতি নিয়ে মাছ ধরা যায়।

খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমরা ভালুবাঁধে যেতে পারলাম না। অন্তত ঘণ্টা দেড়েক সময় দরকার। কিন্তু এখনই আমাদের বাস ছাড়বে। এ বাস ছেড়ে দিলে আমাদের রানীক্ষেত ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখনও স্নান-খাওয়া হয় নি। অতএব পেটের তাগিদে মনের দাবী নাকচ করে বাসে চেপে বসতে হল।

খেয়ে-দেয়ে খানিকক্ষণ গড়িয়ে নেয়া গেল। ইতিমধ্যে দাশু গিয়ে মেজরের খোঁজ নিয়ে এসেছে। তিনি এখনও নিখোঁজ। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক ? এদিকে বেলা পড়ে আসছে। ঘরে আর মন বসছে না। তাছাড়া সময়ও সংক্ষিপ্ত। কাল আমরা দ্বারাহাট যাচ্ছি। পরশু দুপুরে ফিরে এসে বিকেলে চলে যেতে চাই আলমোরায়।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি পথে। মেঘলা আকাশ, আবার বৃষ্টি না নেমে বসে। এখানে বেশ বৃষ্টি হয়—বছরে ৫০ থেকে ৫২ ইঞ্চি। কিন্তু নামলেই বা কি করব ? পথে যখন বেরিয়েছি, তখন তো ঝড়বাদলের ভয়ে ভীত হওয়া চলবে না, এগিয়ে যেতেই হবে।

রানীক্ষেত একটি পর্বতশীর্ষ। পাহাড়টি খুবই ধীরে ধীরে ঢালু হয়েছে। পাহাড়ের ওপরে ও গায়ে গড়ে উঠেছে আলমোরা জেলার এই মহকুমা শহর। জনবসতি মোটেই ঘন নয়। শহরের স্থায়ী জনসংখ্যা প্রায় ১০,৬১০। বাড়ি বাংলো ও হোটেলগুলো একে অন্যের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নেই। প্রায় প্রত্যেকটির সামনে প্রশস্ত মোটরপথ। ঝকঝকে দোকান ও বাজার, পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন পথ, চমৎকার জল নিস্কাশনের বন্দোবস্ত। রানীক্ষেত সত্যই শৈলরানী। কি শরতে কি বসন্তে, কি শীতে কি গ্রীষ্মে—সে সর্বদাই শৈলরানী।

যাঁরা অচল হিমালয়ের চঞ্চল রূপ দেখতে চান, তাদের কাছে শরতই শ্রেষ্ঠ সময়। বর্ষার শেষে সুনীল আকাশ আর শুচিশুভ্র হিমালয়। দুয়ের মাঝে আঁকাবাঁকা মেঘদল। সারাদিন ছুটোছুটি করে। কখনও দিগন্তের কাছে গিয়ে নীলাকাশকে চুম্বন করে, কখনও বা অমল হিমালয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে।

রানীক্ষেত শীতে উপেক্ষিতা কিন্তু রূপহীন নয়। সে তখন তুষারের পোশাকে অপরূপ হয়ে ওঠে। এখানকার তুষারপাত খুবই উপভোগ্য। তবে এই রমণীয় দৃশ্য দেখার জন্য ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে হয়। তুষারপাত শুরু হলে সবাই বেরিয়ে পড়ে পথে, বরফের বল বানিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করে দেয়।

বসন্ত ! সে তো ঋতুর রানী। তার আগমনে শৈলরানী সাজে অপরূপ বেশে। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় রঙ্গীন ফুল। দুঃসহ শীতে ওরা মায়ের কোলে ছিল লুকিয়ে। বাসন্তী সূর্যের উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। পাহাড়ী পাখীরা এসে বাসা বাঁধে প্রকৃতির এই মনোরম নিকেতনে। রানীক্ষেতের আকাশবাতাস উতলা হয়ে ওঠে কোকিল আর বুলবুলের গানে।

হিমালয় ব্যস্ত পথিকের জন্য নয়। তার সৌন্দর্য শুধু দর্শন করলেই হয় না, অনুভব করতে হয়। এই অনুভূতির জন্য চাই অবকাশ, চাই অবসর। আমরা অবকাশ যাপন করতে আসি নি রানীক্ষেতে, আমাদের নেই অবসর। তাই অনুভব করতে পারলাম না, শৈলরানীর শাশ্বত সৌন্দর্যের সত্তাকে।

কার্ট রোড ধরে বাজার ছাড়িয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলাম। বাস স্ট্যাণ্ডটি বেশ জমজমাট। এখান থেকে বাস যায় নৈনিতাল (৩৭ মাইল), আলমোরা (২৯ মাইল), দ্বারাহাট

(১৪ মাইল), কৌসানী (৪৮ মাইল), বাগেশ্বর (৭১ মাইল) ও রামনগর (৬১ মাইল)। যায় বেরিলী (১১৬ মাইল) ও মোরাদাবাদ (১২৭ মাইল)।

বাস স্ট্যাণ্ডে একাধিক ট্যাক্সির (জীপ) সাক্ষাৎ মিলল। এখানকার ট্যাক্সিচালকদের পুলিসভীতি তেমন নেই, কিন্তু কাঞ্চনপ্রীতি একটু বেশী। বিশেষ করে সওয়ার যদি টুরিস্ট হয়। আমরা দলে আটজন জেনেও ড্রাইভার আমাদের নিয়ে যেতে চাইলেন কো-অপারেটিভ ড্রাগ ফ্যাক্টরি ও তাড়িক্ষেতে। কিন্তু এত বেশী ভাড়া চেয়ে বসলেন, যাকে নিঃসন্দেহে জুলুম বলা চলে। অথচ আমাদের ম্যানেজার অবিচলিত—ইশারায় আমাদের সরে পড়তে বলে। আমরা তার নির্দেশ পালন করি।

ড্রাইভারের কাঁধে হাত দিয়ে অসিত কি যেন বলছে তাঁকে। কয়েক মিনিট কেটে যায়। তারপরে হঠাৎ পেছন ফিরে চেঁচিয়ে ওঠে অসিত, "আরে তোমরা সব কোথায় কেটে পড়লে ? তাড়াতাড়ি চলে এস। নইলে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

ড্রাইভারও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাগিদ দেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, জলদী কিজীয়েগা—লেট মত্ করিয়ে।"

"না না, লেট হবে না।" তাঁকে ভরসা দিয়েই আবার হাঁক ছাড়ে অসিত, "আরে এসো এসো, পা চালিয়ে এসো।"

আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসি ট্যাক্সির কাছে। ড্রাইভার নিজেই দরজা খুলে দেন। ভেতরে ঢুকে কোনমতে বসে পড়ি সবাই। ট্যাক্সি ছুটে চলে রানীক্ষেত-রামনগর পথে। আর আমরা ভেবে চলি ম্যানেজার কোন মন্ত্রবলে ড্রাইভারকে ম্যানেজ করল ? কিন্তু সেকথা এখন জানার উপায় নেই। সে গম্ভীর চালে ড্রাইভারের সঙ্গে মোটর পার্টসের দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে আলোচনা করছে।

এই পথই করবেট পার্কের পাশ দিয়ে রামনগর গিয়েছে। আমরা অতদূর যাব না। আমরা এখন চলেছি মাত্র মাইল দুয়েক দূরে—কো-অপারেটিভ ড্রাগ ফ্যাক্টরিতে।

পাহাড়ী লতাপাতা, শেকড় ও ছাল দিয়ে আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি হয় এখানে। এটি একটি গবেষণা কেন্দ্রও বটে। ইদানীং রানীক্ষেত ও হরিদ্বারে দুটি দেশী ওষুধের গুদাম স্থাপিত হয়েছে।

আরও তিন মাইল এগিয়ে পৌঁছলাম তাড়িক্ষেত। এখানেও ধীরে ধীরে একটি শৈলাবাস গড়ে উঠছে। ড্রাইভারের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা স্থানীয় দেবতা ভৈরব ও কলবিষ্টের পূজো দিলাম। তারপর দর্শন করলাম প্রেম বিদ্যালয় ও গান্ধী কুটির—মহাত্মাজী কিছুকাল এখানে বাস করেছিলেন।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফিরে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। আমরা ফিরে চলেছি। সূর্যাস্তের আগে পৌঁছতে হবে রানীক্ষেত ক্লাব প্রাঙ্গণে। ক্লাব এখানকার সমাজ-জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে। অন্যান্য ক্লাবের মধ্যে গল্‌ফ ক্লাব ও রোটারী ক্লাবের নাম উল্লেখযোগ্য। রানীক্ষেত ক্লাবটি ভারতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক সংস্থা—যেমন সুন্দর তেমনি ব্যবস্থা। সব রকম আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছে। আছে একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার আর পাঠাগার—বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ আসে। আছে গল্‌ফ, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, টেবল-টেনিস, বিলিয়ার্ড, ক্যারাম ও তাসের ব্যবস্থা। আছে একটি বার ও ক্যাণ্টিন। সন্ধ্যের পরে হয় সিনেমা, নয়তো নাচের আসর বসে।

গ্রীষ্মকালে ক্লাব কর্তৃপক্ষ কয়েকটি টুর্নামেণ্ট পরিচালনা করেন। আর শরৎ ও বসন্তে

আয়োজন করেন ফুলের মেলা ও চিত্র প্রদর্শনীর। রানীক্ষেতের স্থায়ী অধিবাসী না হয়েও পর্যটকরা সাময়িকভাবে এই ক্লাবের সদস্য হতে পারেন।

আমরা সদস্য হইনি। তবু ক্লাবের দুরবীনটি ব্যবহারের অনুমতি পেলাম। সতত পরিবর্তনশীল হিমালয়ের সহস্র রূপ দর্শনের সুযোগ পেলাম। শৈলরানীর কাছ থেকে দিবাকরের দৈনন্দিন বিদায় নেবার লগ্নটি হয়েছে সমাগত। সে পৌঁছে গেছে পশ্চিমাচলের প্রান্তে। এই মধুলগ্নে নীলাকাশ কেন লাল হল? তাহলে কি বিরহ-বিধুর শৈলরানী লাল একখানি ওড়না মাথায় দিল টেনে? কিন্তু ঐ শিখরমালার শিরে কে আগুন দিল ধরিয়ে?

আগুন লেগেছে আমাদের মনে। আমরাও তাই বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছি অস্তাচলের পানে। কিন্তু ওরা? রানীক্ষেতের অধিবাসীরা? ওরা কেন ভিড় করেছে বাড়ির বারান্দায় আর পথের প্রান্তে? ওরা তো জন্মাবধি দেখে আসছে এই আগুনের মেলা। তাহলে কি সুন্দরের শেষ নেই? সে কখনই পুরনো হয় না? ফুরিয়ে যায় না? নিত্য নতুন রূপে, নিত্য নতুন রসে, নিত্য নতুন ভাবে দেখা দেয় প্রেমিকের চোখে?

॥ সাত ॥

সন্ধ্যের পর ফিরে আসি হোটেলে। চা খেয়ে খবর নিই মেজরের। বেয়ারারা জানায়—তিনি তাঁর ঘরেই রয়েছেন। আমরা এসে দরজায় করাঘাত করি। "ইয়েস্। কাম ইন্ প্লীজ।"

আমরা ভেজানো দরজা ঠেলে একে একে প্রবেশ করি। ছোট ঘর—একপাশে খাটিয়া, আরেক পাশে সোফা-সেট, আলমারি ও আলনা। সেণ্টার-টেবিলের ওপর ফুলদানিতে কিছু ফুল, কাগজ-কলম ও একটা মদের বোতল। শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে মেজর বলেন, "পাঁচজন সোফায় বস, আর তিনজন এসো আমার পাশে এই খাটিয়ায়।"

মদের বোতল দেখে আমরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। ইতস্ততঃ করতে থাকি। আমাদের অবস্থা দেখে তিনি হেসে ফেলেন। তারপরে বলেন, "কি হে? লজ্জা পেলে নাকি? কিন্তু লজ্জা তো আমার পাওয়া উচিত। যাক গে। মাভৈঃ, মদ খেলেও মাতাল হই না আমি।"

"না না, ভয়ের কি আছে!" আমরা বোকার মত বলে ফেলি।

মেজর উঠে গিয়ে বোতল ও গ্লাসটা আলমারিতে তুলে রেখে আবার ফিরে আসেন নিজের জায়গায়। একটি সিগারেট ধরিয়ে বলতে থাকেন, "বন্ধুহীন মানুষের মদই পরম বন্ধু। মদ নিজেকে নিঃশেষ করে, মানুষের দুঃখ দূর করে। তাকে শান্তিদান করে।" মেজর চুপ করেন। কি যেন ভাবতে থাকেন। আমরাও চুপ করে থাকি। কিছুক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ হো-হো করে হেসে ওঠেন তিনি। হাসতে হাসতেই বলেন, "তোমরা বোধ হয় ভাবছ, আমি মাতলামি শুরু করে দিয়েছি!"

"না, না। এ আপনি কি বলছেন?" আমরা একযোগে প্রতিবাদ করে উঠি।

"সে যাক্ গে।" মেজর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন, "তারপর কি খবর বল? সব ঘুরেটুরে দেখলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। যতটা পারা গেল।" দাশরথি বলে।

"কাল কি করছ?"

"দ্বারাহাট যাবো।" দাশু উত্তর দেয়।

"ভাল, দেখে এসো। চমৎকার জায়গা। কাল রাতে নিশ্চয়ই সেখানে থাকছ, পরশু ফিরে আসছ রানীক্ষেতে?"

"না, বিকেলে আলমোরা চলে যাচ্ছি।" মোহিত বলে।

"সেখান থেকে?"

"রূপকুণ্ড। তার পরে পিণ্ডারী।" সুজল বলে।

"পিণ্ডারী যাচ্ছ? কবে কাপকোট পৌঁছবে?"

সুজল পকেট থেকে আমাদের ইটিনার‍্যারির একখানা কপি বের করে মেজরের হাতে দেয়। সেখানায় একবার নজর বুলিয়ে মেজর বলেন, "এটা আমার কাছে থাক্। পিণ্ডারী আমার বড় ভাল লাগে। দেখি যদি ম্যানেজ করতে পারি, তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে কাপকোটে গিয়ে জয়েন করব। আমাকে সঙ্গে নিতে তোমাদের আবার আপত্তি নেই তো?"

"না না, আপত্তি থাকবে কেন? বরং আমরা খুব খুশী হব।" অসিত বলে।

"কিন্তু তোমরা করবেট পার্কে যাচ্ছো না?" মেজরের কণ্ঠে বিস্ময়।

"না।" লজ্জিতভাবে অমিতাভ উত্তর দেয়।

"এইটে একটা মজার ব্যাপার। এত কাছে এসেও কেউ সেখানে যায় না। অথচ....." মেজর একটু থেমে সুর করে বলেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!"

"বলুন না সে-দেশের কথা।" মোহিত অনুরোধ করে।

"শুনবে?"

"নিশ্চয়ই।" আমরা সমস্বরে বলে উঠি।

মেজর আবার উঠে যান আলমারির কাছে। একখানি বাঁধানো খাতা নিয়ে ফিরে আসেন নিজের জায়গায়। আমরা নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসি। খাতা খুলতে খুলতে মেজর বলেন, "আগেই বলে নেওয়া ভাল, আমার পথ কিন্তু রানীক্ষেত থেকে নয়, রামনগর থেকে। আর.....আমার একটি শর্ত আছে......." মেজর একবার থামেন। তারপর কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলেন, "আমি যাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছি, তাঁর সম্পর্কে তোমরা আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না।"

বিচিত্র শর্ত! আমরা বিস্মিত হই। তবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে মেজর সেটাকে এ্যাশ্-ট্রেতে ফেলে দেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে খাতার দিকে নজর দেন। গম্ভীর স্বরে পড়তে শুরু করেন—

তুমি আর আমি মিলে জীবন। তোমাতে আর আমাতে মিলে সাহিত্য। তোমরা ও আমরা মিলে দেশ।

কিন্তু যে দেশে তুমি নেই, আমি নেই—আমরা নেই, তোমরা নেই, সে দেশে কি সাহিত্য নেই? জীবন নেই?

আছে। আর সে জীবন বড়ই বিচিত্র, বড়ই বর্ণাঢ্য, বড়ই ব্যঞ্জনাময়। সেই বর্ণ-গন্ধময় ব্যাঘ্র-বরাহপূর্ণ ভয়ঙ্কর সুন্দর দেশের কথাই আমি তোমাকে বলছি।

চমৎকার। খুব ভাল লাগছে। কিন্তু মেজর কাকে বলছেন? জিজ্ঞেস করলে শর্ত ভঙ্গ হবে। বাধ্য হয়ে নীরব থাকি। মেজর পড়ে চলেছেন—

সে দেশে কিন্তু মানুষ নেই। তবে জনহীন হলেও প্রাণহীন নয়। আর এই প্রাণীদের নিয়েই বিশ্ব-সাহিত্যের দুখানি শ্রেষ্ঠ সম্পদ রচিত হয়েছে—ম্যান ইটার্স অভ কুমায়ুন, দি ম্যান-ইটিং

লেপার্ড অভ রুদ্রপ্রয়াগ।

এই অমর সাহিত্যিকের নাম কর্নেল জিম করবেট। নামটি ইংরেজী হলেও তিনি অভারতীয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—যারা সে যুগে তো দূরের কথা, ভারত স্বাধীন হবার আঠারো বছর পরেও নিজেদের ইণ্ডিয়ান মনে করতে পারছেন না। করবেট এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের ব্যতিক্রম। ভারত ও ভারতীয়দের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও গভীর মমত্ববোধ। তাঁর 'মাই ইণ্ডিয়াতে' তিনি লিখেছেন, 'In my India, the India I know, there are four hundred million people, ninety percent of whom are simple, brave, loyal, hard-working souls····among whom I have lived and whom I love.'

১৮৭৫ সালে তিনি নৈনিতালে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁর শৈশব কাটে। তাঁর অষ্টম জন্মদিনে তিনি একটি বন্দুক উপহার পান। বন্দুকটি তাঁর জীবন-সঙ্গিনী হয়ে ছিল—তাঁর জীবনে আর কোনো 'তুমি' আসেনি।

প্রথম যৌবনের বিশ বছর তিনি রেলে চাকরি করেন। এই সময় বেশীর ভাগ তাঁর বাংলা দেশে কাটে। তারপরে করবেট প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি সেনাবাহিনীর জন্য পাঁচ হাজার কুমায়ুনী সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই সেনাবাহিনীর একাংশকে তিনি নিজেই ফরাসী রণক্ষেত্রে পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও করবেট সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। উপরন্তু তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়ে সৈন্যদের জঙ্গল-যুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এই কর্মময় জীবনের অবসরে তিনি এমন একটি কর্ম সম্পাদন করেছেন, যেটিকে কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন দপ্তর কোনমতেই সমাজসেবা বলবেন না। অথচ সে সময়ে এর চেয়ে বড় সমাজসেবা আর কিছুই হতে পারত না।

সেকালের কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের সমাজ-জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল নরখাদক বাঘ। প্রায় প্রতি বছর তারা গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়ে শত শত মানুষ মেরে ফেলত। পথে ও প্রান্তরে, ঘরে ও বাইরে মনুষ্যজীবনের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ রুদ্রপ্রয়াগের সেই চিতাবাঘটার কথা বলা যেতে পারে। দীর্ঘ আট বছর ধরে পাঁচশ বর্গমাইল জুড়ে সে মূর্তিমান্ যম হয়ে দেখা দিয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে অবসর পেলেই জিম করবেট ও চিতা—দুজনে দুজনকে খুঁজে বেরিয়েছেন। অন্তিম অধ্যায়ে একটানা দশ সপ্তাহ ধরে চলেছে এই লুকোচুরির পালা। অবশেষে জিম করবেটেরই জয় হয়েছে। আর এই জয় গাড়োয়ালীদের জীবনে নিরাপত্তা দিয়েছে এনে। তাই এখনও তিনি গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে দেবজ্ঞানে পূজিত। তাঁর নামে প্রতি বছর মেলা বসে রুদ্রপ্রয়াগে।

পার্থিব প্রয়োজনে তিনি নরখাদকদের হত্যা করেছেন। কিন্তু বন ও বন্যদের সঙ্গে তাঁর একটা গভীর একত্ববোধ ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতিবিদ্। পশুজীবনের প্রতি জিম করবেটের মমত্ববোধ প্রসঙ্গে তাঁর ভগ্নী ম্যাগী করবেট বলেছেন—শৈশব থেকেই পশুপক্ষীদের প্রতি জিম করবেটের প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। কখনও কোথাও কোন আহত পাখী পেলে তাকে নিয়ে আসতেন বাড়িতে। সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলতেন। তারপরে আবার তাকে ছেড়ে দিতেন বনের বুকে। বালক করবেট শীতের ছুটিতে কালাধুঙ্গীর পাহাড়তলীতে ঘুরে বেড়াতেন। সেকালে এই সব বনাঞ্চল হিংস্র ও সরীসৃপে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর এই বিপদসঙ্কুল বিচরণ কিন্তু উদ্দেশ্যহীন ছিল না। তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পশুপক্ষীদের লক্ষ্য করতেন, তাদের আচার-আচরণ অনুশীলন ও অনুকরণ করতেন। ফলে বালক করবেট অবিকল পশুপক্ষীদের মত ডাকতে শেখেন। তাঁর সেই ডাক শুনে বোঝার সাধ্য ছিল না যে তা পশুপক্ষীদের প্রকৃত

ডাক নয়।

পশুজীবনের প্রতি করবেটের এই মমত্ববোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পরবর্তীকালে তিনি অবসর পেলেই স্বাভাবিক বনজীবনের ছবি তুলতেন ও স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েদের এই সব চলচ্চিত্র দেখিয়ে তাদের বনজীবন সংরক্ষণে আগ্রহী করতেন। তাঁরই চেষ্টায় নৈনিতাল মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ১৯৩৩ সালে নৈনিতালকে একটি পক্ষীদের নিরাপদ বাসভূমিতে পরিণত করেন। নৈনিতালের স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের গুলতি ও এয়ার-গান ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে সেখানে পাখীর সংখ্যা বেড়ে যায়। ম্যাগী করবেট নৈনিতালে একশ চব্বিশ রকমের পাখী দেখেছেন।

পশুপক্ষীদের প্রতি এই মমত্ববোধ জিম করবেটের অন্তরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ভগ্নীর অনুরোধে শেষজীবনে তিনি কেনিয়ার (পূর্ব আফ্রিকা) নিয়েরীতে চলে যান এবং সেখানেই জীবনের শেষ আট বছর অতিবাহিত করেন। নিয়েরীতে গিয়েই তিনি তাঁর বাড়ির বাগানটিকে একটি পক্ষী সংরক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করেন। ক্রমে ক্রমে বহু রকমের পাখী এসে সেখানে বাসা বাঁধে। তাঁরা নির্ভয়ে করবেটের কাঁধে এসে বসতো, তাঁর হাত থেকে খাবার খেতো, তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান জুড়ে দিত। বিশ্বের নানা প্রান্তের পর্যটকরা প্রায়ই এসে তাঁর এই পক্ষী সংরক্ষণ কেন্দ্রের ছবি নিয়ে যেতেন।

করবেট তাঁর 'জাঙ্গল লোর' গ্রন্থে লিখেছেন, My happiness, I believe, resulted from the fact that all wild life is happy in its natural surroundings. In nature there is no sorrow, and no repining. A bird from a flock, or an animal from a herd, is taken by carnivorous beast and those that are left rejoice that their time had not come today, and have no thought of to-morrow.

তাই ম্যাগী করবেট ও ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজার্ভেশন সোসাইটি অভ ইণ্ডিয়া যৌথভাবে করবেট মেমোরিয়াল প্রাইজ নামে একটি বাৎসরিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পশু-সংরক্ষককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

তাঁর সাহিত্য-জীবন মাত্র দশ বছরের। জীবনের সায়াহ্নে এসে তিনি তাঁর রোমাঞ্চকর জীবনকাহিনী রচনায় মনোনিবেশ করেন। একাত্তর বছর বয়সের নবীন লেখকের রচনা বিশ্ব-সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অথচ এই সৃষ্টির পেছনে তাঁর কোন প্রস্তুতিই ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে অবসর বিনোদনের জন্যই তিনি একদিন কলম নিয়ে বসেছিলেন। আর তারই ফলে বিশ্ব-সাহিত্য এক নতুন সম্পদে সমৃদ্ধ হল। এই প্রসঙ্গে তার বন্ধু লর্ড ম্যালকম হেইলি বলেছেন—"He possessed the supreme art of narrative which owes nothing to conscious artistry.'

আশী বছর বয়সে ১৯৫৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে এই প্রকৃতিবিদ পরলোক গমন করেন।

যে বিচিত্র দেশের কথা আজ আমি তোমাকে বলতে বসেছি, সে দেশ জিম করবেটের মহান্ স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—করবেট ন্যাশনাল পার্ক।

১২৫ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত এই দেশ। উচ্চতা দেড় হাজার থেকে তিন হাজার ফুট। নৈনিতাল ও পাউরী—গাড়োয়াল জেলার কিয়দংশ নিয়ে এর অবস্থান। উচ্ছ্বসিত রামগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে আছে এই পাহাড়ে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর উপত্যকা—পাতলি দুন। উপত্যকার দক্ষিণে কিছুটা পাহাড়ী বনাঞ্চলও এই পার্কের অন্তর্ভুক্ত। এই অনিন্দ্যসুন্দর উপত্যকা ও

রমণীয় অসমতল বনাঞ্চল পশুদের সংরক্ষিত বাসভূমিতে পরিণত। প্রকৃতির প্রাণীরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জীবনধারণ করছে।

প্রাণীসম্পদের দিক থেকে ভারত অতিশয় সম্পদশালী। পাঁচ শতাধিক জাতির জন্তু এবং কয়েক হাজার জাতের পাখী, পোকামাকড়, সরীসৃপ ও মাছ আছে এদেশে। পশ্চিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পশুসম্পদ কচ্ছের বন্যগাধা ও গীর অরণ্যের সিংহ আর পূর্ব ভারতের হাতি, বাঘ, বুনো মোষ ও গণ্ডার। তাছাড়া ভারতের চিতল, হরিণ, সম্বর, ভালুক, ভেড়া ও পাহাড়ী ছাগলের খ্যাতিও যথেষ্ট। ভারতীয় পাখীর বিশ্ববন্দিত।

এই সব বিশ্ববিখ্যাত পশু-পক্ষীর সংখ্যা ভারতে ক্রমেই কমে আসছে। এখন গীর অরণ্যে কয়েকটি মাত্র সিংহ আছে। বন্যগাধা, মুখোশ হরিণ, তুষার চিতা, খুদে শূয়োর, সোনালী ঈগল ও গোলাপী হাঁস প্রভৃতির সংখ্যাও খুবই কম। সুন্দরবনের দু'শিঙা গণ্ডার আর নেই।

এই ক্ষীয়মাণ পশুসম্পদকে রক্ষা করার জন্য বৃটিশ সরকার ১৮৮৭ সালে ভারতে একটি আইন প্রণয়ন করেন। ১৯১২ সালে এই আইনকে আরো কঠোর করা হয়। ১৯৩৫ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাভাবিক পশুজীবনের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজনেই উত্তরপ্রদেশ সরকার ১৯৩৫ সালে এই পার্কের উদ্বোধন করেন। এটিই ভারতের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক। উত্তর প্রদেশের পূর্ববর্তী গভর্নর লর্ড হেইলির নামানুসারে এই পার্কের নাম হয় হেইলি ন্যাশনাল পার্ক। ১৯৫৪ সালে জাতীয় সরকার এই পার্কের নতুন নাম রাখেন ন্যাশনাল পার্ক। পরের বছরই জিম করবেট পরলোক গমন করেন। স্বভাবতই এই পার্ককে বনজীবনের পরম বন্ধু কুমায়ুনের সন্তান প্রকৃতিবিদ্ করবেটের মহান স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ১৯৫৭ সালে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আধুনিক যুগে পশুপক্ষী সংরক্ষণের জন্য প্রথম ন্যাশনাল পার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭২ সালে—ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক। এদের অনুকরণেই ইংরেজ সরকার এই পার্কের উদ্বোধন করেন। অথচ পশুপক্ষী সংরক্ষণের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সম্পর্ক অতি প্রাচীন। পুরাণে পশুপক্ষী সংরক্ষণের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে সেকালেও পশুপক্ষীর জন্য সংরক্ষিত এলাকা ছিল। এই সব এলাকায় পশুপক্ষী মারলে এমন কি ধরলে, অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। সম্রাট অশোকের (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) পঞ্চম স্তম্ভে খোদিত আছে যে—বন, পশুপক্ষী, মৎস্য সংরক্ষণ সমাজের অবশ্য কর্তব্য। মোগল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরও একই মত পোষণ করতেন। কিন্তু আমরা এই কর্তব্যচ্যুত হয়েছিলাম। ফলে ভারতের ন্যাশনাল পার্কের বয়স মোটে পঁয়ত্রিশ বছর।

এখন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই ন্যাশনাল পার্ক আছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে ন্যাশনাল পার্কের সংজ্ঞা বিভিন্ন। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার ন্যাশনাল পার্ক প্রাকৃতিক দৃশ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তবে ইংল্যাণ্ডের কোন কোন পার্কে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নিদর্শনসমূহকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে ন্যাশনাল পার্ক বনজীবন সংরক্ষণের আধার। আফ্রিকাতেও ন্যাশনাল পার্ক বনজীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এদের প্রকৃতি বিভিন্ন হলেও মূল উদ্দেশ্য এক—ক্ষীয়মাণকে অক্ষয় করা।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বন ও বনজীবন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে বন-জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এই আদর্শে

অনুপ্রাণিত হয়েই ১৯৫২ সালে এদেশে ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষৎ গঠিত হয়েছে। এখন আমাদের দেশে প্রতি বছর বন্যপ্রাণী সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। বিখ্যাত পর্বতারোহী শ্রীহরি দাংয়ের সম্পাদনায় 'চিতল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। বিলীয়মান পশুপক্ষীর নিধন ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। আশিটি বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বা স্যাঞ্চুয়ারীতে পরিণত করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পঁচিশটি ন্যাশনাল পার্ক তৈরি করেছেন। আসামের কাজিরাঙ্গা, মানস ও সোনারূপা, জলপাইগুড়ির জলদাপাড়া, হাজারীবাগের রাজদেওরা, মাদ্রাজের বেদান্থঙ্গল ও মুদুমালাই, মহীশূরের বন্দীপুর, ডাণ্ডেলী ও রঙ্গনথিট্টু, কেরালার পেরিয়ার, জব্বলপুরের কানহা, চান্দার তারোবা, গোয়ালিয়রের শিবপুরী, কাথিওয়ারের গির, রাজস্থানের সরিস্কা, ভরতপুর, ঢোলপুর ও বনবিহার, কাশ্মীরের দচিগাম, বারাণসীর চন্দ্রপ্রভা, দেরাদুনের রাজাজী ও কংসরাও, হরিদ্বারের চণ্ডীপাহার, ল্যান্সডাউনের মালান এবং করবেট ন্যাশনাল পার্ক।

করবেট ন্যাশনাল পার্কের নিকটতম রেল স্টেশন নৈনিতাল জেলার রামনগর। দিল্লী থেকে ১৪৮ মাইল। দিল্লী থেকে মোরাদাবাদ ও কাশীপুর হয়ে মোটরেও রামনগর যাওয়া যায়। এ পথের দূরত্ব ১২৩ মাইল। পথটি বড়ই সুন্দর। ভারতের পুণ্যতম প্রবাহ যমুনা ও গঙ্গা পেরিয়ে এই পথ।

হলদোয়ানী, নৈনিতাল ও রানীক্ষেত থেকেও মোটরে করবেট পার্কে যাওয়া যায়। হলদোয়ানী থেকে রামনগর ৩৩ মাইল।

কলকাতা থেকে রামনগর যাবার দুটি পথ। একটি মোরাদাবাদ ও কাশীপুর হয়ে, আরেকটি লখনউ ও হলদোয়ানী হয়ে। দ্বিতীয় পথটিই সুবিধাজনক। দূরত্ব ৮৮৩ মাইল। শনিবার সন্ধ্যায় অমৃতসর মেলে রওনা হয়ে সোমবার সকালে আমরা রামনগর পৌঁছব।

পুরাকালে রামনগর পাঞ্চাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউয়েনসাং (সপ্তম শতাব্দী) তাঁর বিবরণীতে কাশীপুরের উল্লেখ করেছেন। তখন পাঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান বেরিলী জেলার অহিছত্রে। পরে এই অঞ্চলের নাম হয় রোহিলখণ্ড ও মোরাদাবাদ জেলার সম্ভলে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কিছুকাল আগেও যখন কেদার-বদ্রীর পথে বাস চলাচল শুরু হয়নি, তখন মহাপ্রস্থানের যাত্রীরা রামনগর হয়েই যাওয়া-আসা করতেন।

বর্তমানে রামনগর নৈনিতাল জেলার মহকুমা শহর। বেশ বড় জায়গা। হলদোয়ানী ও রানীক্ষেত থেকে নিয়মিত বাস চলাচল করে। রানীক্ষেত ৬১ মাইল। করবেট পার্কের অধিকর্তা—ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন ওয়েস্টার্ন রিজন এখানেই বসেন। পার্কে দর্শকদের সাহায্য করা তঁর অন্যতম কর্তব্য। তাঁর কাছ থেকেই রেস্ট হাউসে থাকার অনুমতি পত্র নিতে হয়। অনুমতি পত্র ছাড়া পার্কে প্রবেশ নিষেধ।

রানীক্ষেত ও রামনগরে সাধারণতঃ পার্কে যাবার ট্যাক্সি ও জীপ পাওয়া যায়। পার্কের প্রধান প্রবেশদ্বার ধাঙ্গারী গেট রামনগর—রানীক্ষেত রোডের ওপরে। রানীক্ষেত থেকে ধাঙ্গারী ৫০ মাইল, রামনগর সেখান থেকে ১১ মাইল। বাসে ধাঙ্গারী পর্যন্ত যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে জীপ বা ট্যাক্সির কোন বন্দোবস্ত নেই। পার্কের প্রধান রেস্ট হাউস ধিকালা সেখান থেকেও ১৮ মাইল। কাজেই রামনগর অথবা রানীক্ষেত থেকে ট্যাক্সি বা জীপে করেই পার্কে যাওয়া উচিত হবে।

তবে নেহাৎ যদি আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হয়, রামনগরে জীপ বা ট্যাক্সির দর্শন না মেলে,

তাহলে তুমি যেন আবার কান্নাকাটি শুরু করো না। যাওয়ার আগ্রহ থাকলে বাহনের অভাব হয় না। পার্কের কাঠ আনতে যাওয়ার লরীতে নিশ্চয়ই আমাদের আশ্রয় মিলবে আর সে আশ্রয় কোনমতেই নিরানন্দের হবে না। মসৃণ পিচঢালা প্রায়-সমতল পথ ধরে ঝড়ের বেগে ছুটে চলবে লরী। ডানদিকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবে কোশী। এ কিন্তু বিহারের বীরপুরের বৃদ্ধ কোশী নয়। সে কোশীর আসল নাম সপ্তকোশী। ইন্দ্রাবতী, শুনকোশী, ভোটকোশী, লিখুখোলা, দুধকোশী, অরুণ ও তামুর—নেপালের এই সাতটি নদী মিলে বিহারের সপ্তকোশী। সে শীতে শীর্ণা, বর্ষায় বিপুলা। তাই সে আজ মানুষের হাতে বন্দী।

এ কোশী কুমায়ুনের মুক্তধারা—শীতে ও বর্ষায় সমান উচ্ছ্বসিতা। স্কন্দপুরাণের উদ্বেলিতা কৌশিকী। এসেছে সোমেশ্বরের ভটকোট পর্যত থেকে। রামপুরের কাছে গিয়ে রামগঙ্গায় মিশেছে।

রামনগর থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল গিয়ে ধিকালি একটি গ্রাম। অতি প্রাচীন গ্রাম। ১৮৮৫ সালের জুন মাসে যদুনাথ সর্বাধিকারী কেদার-বদ্রী দর্শন করে ফেরার পথে এইখানে এসে ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'পাহাড়ের মধ্য হইতে আট ক্রোশ আসিয়া টিকলি, এই স্থানে বাজার ও দোকান আছে, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। থাকিবার স্থান, ভাল ভাল ঘর দোকানদারদিগের আছে....এই অবধি পাহাড় ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাইবার গাড়ির রাস্তা পাওয়া হইল। এখানে ঝাপান ও পিঠু বিদায় করিয়া গাড়ি করা হইল।....এখান হইতে রামনগরের বাজার দুই ক্রোশ, পাহাড়ের উপর রেমাজ সাহেব বাজার বসায়। ঐ পাহাড়ে পল্টন ছিল, এক্ষণে অনেক সাহেবের বাঙলো আছে। অতি উত্তম স্থান, শহর-তুল্য, বাজারে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

ধিকালি থেকে দেড় মাইল এগিয়ে ধিমাল। এখানে একটি পুল পেরোতে হবে। দেড় মাইল পরে আবার একটি পুল। তারপর সোয়া দুই মাইল এগিয়ে এক সময় আমরা ধিঙ্গারী গেটের সামনে গিয়ে থামব। পথটি কিন্তু শেষ হবে না সেখানে। সেই পথই চলে গেছে রানীক্ষেত--আরও ৫০ মাইল। তবে এখানেই আমরা কোশীর সঙ্গে সংযোগ হারাব।

গেট পেরিয়ে গাড়ি ঢুকবে পার্কে। আঁকাবাঁকা বাঁধানো পথ ধরে চলবে এগিয়ে। পার্কের চারিদিকেই এমনি বাঁধানো পথ আছে। এ ছাড়া পার্কের ভেতরে এক রেস্ট হাউস থেকে আরেক রেস্ট হাউসের যাবার জন্য মোটর চলাচলের উপযোগী কাঁচা পথ তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে পার্কের মধ্যে পথের দৈর্ঘ্য ৭০ মাইল। পার্কের ভেতরে সাতটি ফরেস্ট হাউস আছে—সুলতান, সরাপদুলি, ধিকালা, বক্সার, পাতেরপানি, গউজপানি ও যমুনা গোয়ার।

আমাদের পথের বাঁদিকে প্রায়-সমতল দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর। মানুষসমান উঁচু ঘন ঘাসবনে বোঝাই—পাতলি দুন উপত্যকা। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল। মাতাল হাওয়ার দাপটে ঘাসের বনে ঢেউ উঠবে। মনে হবে যেন সীমাহীন সবুজ সাগর সৈকত দিয়ে চলেছি আমরা দুজনে।

প্রান্তরের মাঝে দু-একটা বড় বড় গাছ আমাদের চোখে পড়বে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাই বলে ভেবো না বড় গাছের ঘন জঙ্গল নেই করবেট পার্কে। প্রান্তরের শেষে দেখতে পাবে তাদের সমারোহ—শিশম, শাল, পলাশ, শিমূল, খয়ের ও বাঁশের বন।

লরী আবার অনেকটা গাধার মত। পিঠে পর্বতপ্রমাণ মাল না চাপালে বড়ই হেলেদুলে চলে। ফলে আমাদের গা হাত পা ব্যথা হয়ে যেতে চাইবে। তবে নৈসর্গিক শোভা এই দৈহিক কষ্টকে দূর করে দেবে।

গেট থেকে চার মাইল গিয়ে সুলতান রেস্ট হাউস। আমরা সেখানে একবার নামব।

একটু বিশ্রাম করে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেব। ইতিমধ্যে চৌকিদার চা নিয়ে হাজির হবে। সেদিনটা সেখানে কাটিয়ে যাবার জন্য আমাদের অনেক অনুনয়-বিনয় করবে। ওর বড়ই দুঃখ সবার সঙ্গেই ওর দেখা হয়, কিন্তু কেউ ওর অনুরোধে একদিনকা সুলতান হতে চায় না। যাতায়াতের পথের ধারে বাস করেও সে সঙ্গিহীন। সুলতান ধিকালা মেল লাইনের ফ্ল্যাগ স্টেশন। তাই কেবল ফ্ল্যাগ দেখিয়েই এখানকার চৌকিদারের জীবনটা কেটে যাচ্ছে।

সুতলান রেস্ট হাউস পেরিয়ে আমাদের সঙ্গে রামগঙ্গার সাক্ষাৎ হবে। গাড়োয়ালের লোহাবা থেকে সৃষ্ট হয়েছে এই অরণ্য-নির্ঝর। সুলতান থেকে বক্সার পর্যন্ত পার্কের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কুমায়ুনের এই প্রাণধারা রামগঙ্গা। গাড়োয়ালে কিন্তু রামগঙ্গা নয়। সেখানে সে লোহাবতী। মাসীর কাছে রামপাদুকা নামক জায়গায় এসে লোহাবতী হয়েছে রামগঙ্গা। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে এই জলধারার কি সম্পর্ক জানি না, তবে হনুমানগঙ্গা হতে পারলে রামগঙ্গা হবে না কেন?

পিথোরাগড় জেলাতেও রামগঙ্গা নামে একটি নদী আছে। নন্দাকোট পর্বত থেকে সৃষ্ট হয়ে সরযূতে হয়েছে। কিন্তু সেটি তেমন বিখ্যাত নয়। তাই রামগঙ্গা বলতে সাধারণতঃ করবেট পার্কের এই রামগঙ্গাকেই বোঝায়।

পথের ডানপাশে রামগঙ্গা। রামগঙ্গার ওপারে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ঘন শালবন। আর পথের বাঁপাশে চলবে তেমনি ঘন ঘাসবন। আরও মাইল ছয়েক এগিয়ে সরাপদুলি রেস্ট হাউস। অবস্থানটি বড়ই সুন্দর। একেবারে রামগঙ্গার তীরে। রামগঙ্গা এখানে একটি বাঁক নিয়েছে। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে হাতী ও হরিণের দেখা মেলে। বাঘ? বাঘ দেখবে বৈকি। বাঘ তো সুলতান রেস্ট হাউসের কাছেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। বিকেল হয়ে আসছে বলে আমরা কিন্তু সরাপদুলিতে থামব না।

পার্কের প্রতিটি রেস্ট হাউসই রমণীয়। অপূর্ব তাদের পরিবেশ। আধুনিক জীবনের সুখ-সুবিধা সম্বলিত। বাসনপত্র, আসবাবপত্র ও বৈদ্যুতিক আলো সবই তুমি পাবে। এই গহন-গিরির গভীরে, শহর থেকে দূরে, নিবিড় অরণ্যের মাঝে এমন স্বাচ্ছন্দ্যময় আবাস কল্পনাতীত। এদের মধ্যে আবার ধিকালার স্থান সবার ওপরে। কিন্তু ধিকালার কথা এখন থাক্।

নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত করবেট পার্ক দর্শনের মরসুম। তবে ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে এখানে খুবই শীত—তাপমাত্রা অনেক সময় হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায়। তাছাড়া এ সময়ে সকালের দিকে খুবই কুয়াশা হয়। ফলে সকালটাই মাটি। দেরিতে বেরিয়েও খুব যে একটা সুবিধা হয় তা নয়। কারণ এই সময় বন খুবই ঘন থাকে—কাজেই পশুপক্ষীর দর্শন পাওয়া যায়।

ফেব্রুয়ারিতে বন অনেক পাতলা হয়ে আসে। দিনের বেলা তখন বেশ আরামদায়ক, রাতে একটু শীত-শীত করে। মার্চ হচ্ছে করবেট পার্কে আসার সবচেয়ে ভাল সময়। দিন ও রাত দুইই তখন আরামদায়ক। এ সময় ঘাস মরে যায়। ফলে তুমি বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাবে। সব পশু-পক্ষীরই এ সময় দর্শন পাবে। এপ্রিল মাসও মন্দ নয়। তবে দিনের বেলা তখন একটু গরম লাগে এই যা। মে মাস হচ্ছে মৎস্য শিকারের আদর্শ সময়। সে সময় বেশ গরম পড়ে যায়। তবে পার্ক খোলা থাকে।

বর্ষার জন্য ১লা জুন থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত পার্ক বন্ধ থাকে। এখানকার বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১০০ ইঞ্চি। ফলে পার্কের পথ ও প্রান্তর তখন জলে-জঙ্গলে বোঝাই হয়ে যায়। ১লা নভেম্বর পার্ক উন্মুক্ত হবার পরে কর্তৃপক্ষ জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে হাত

দেন। রাস্তা পরিষ্কার ও মেরামত করতে অন্ততঃ মাস দেড়েক সময় লাগে। কাজেই জানুয়ারির আগে করবেট পার্কে যাওয়া বৃথা। কিন্তু আগেই বলেছি জানুয়ারিতে ভীষণ শীত।

তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, আমরা যাচ্ছি মার্চে, জানুয়ারির খবর দিয়ে আমাদের কি দরকার বাপু?

দরকার আছে বৈকি। কলকাতায় ফিরে এসে তুমি যখন এই ভয়ঙ্কর সুন্দর দেশের কাহিনী সবাইকে বলবে, তখন তাঁদের এসব খবর না দিলে চলবে কেমন করে?

সরাপদুলি রেস্ট হাউস পড়ে রইবে পথের ধারে। আমরা চলব এগিয়ে। হঠাৎ একপাল হরিণ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তুমি চিৎকার করে উঠবে। তারা হয়তো ঘাস খেতে ব্যস্ত ছিল। আমাদের গাড়ির শব্দ শুনে পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে থাকবে নিঃশব্দে। তাকিয়ে তাকিয়ে তোমাকে দেখবে। তুমিও তাদের দেখবে—প্রাণ ভরে বরণীয়া প্রকৃতির এই রমণীয় সম্পদ দর্শন করবে।

অবশেষে সন্ধ্যার একটু আগে আমরা পৌঁছব ধিকালা রেস্ট হাউসে—করবেট পার্কের সমৃদ্ধতম অঞ্চল।

রেস্ট হাউসটি দোতলা। আটটি গোল স্তম্ভযুক্ত বেশ বড় বাড়ি। এ ছাড়াও সেখানে রয়েছে টুরিস্ট হাটমেন্ট ও স্টুডেন্টস ডরমিটরি। উত্তরে ঘন সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশ ধুয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ছন্দময়ী রামগঙ্গা। তার নূপুরকলিত ছন্দের কলতানে তোমার কথা যাবে হারিয়ে। তুমি তখনই ছুটে যেতে চাইবে তার পাশে। আমি তোমাকে রাখব ধরে—আমার কাছে।

ধিকালা রেস্ট হাউস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় আধুনিক আবাস। ড্রয়িংরুম ডাইনিং রুম বেডরুম বাথরুম সবই আধুনিক আসবাবে সজ্জিত। আছে টেলিফোন আর রেডিও। আছে আলাদা রান্নাঘর ও একজন পাচক। তার ঘাড়ে রান্নার দায় চাপিয়ে অনায়াসে আমরা বনবিহার করতে পারব।

চৌকিদার এসে সেলাম ঠুকবে। ঘর পছন্দ করে আমরা বনবাসী হব।

ওরা মালপত্র বয়ে নিয়ে আসবে ঘরে। তারপর জিজ্ঞেস করবে—চা আনবে কিনা। চা খাওয়া হলে চৌকিদার জানাবে—বাথরুমে দিবারাত্র জল পাওয়া যায়। আমরা স্নান করে নিতে পারি। তুমি গুন গুন করতে করতে বাথরুমের দরজা খুলবে। তারপরেই গান থামিয়ে বলে উঠবে—আরে, এখানেও কলের জল?

বিস্ময়কর বৈকি।

খেতে বসে তুমি আরও খুশী। রান্নার তারিফ করবে মুক্তকণ্ঠে। খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধা নাই ধিকালায়। আমিষ-নিরামিষ, দেশী-বিদেশী, যে খাবার তোমার পছন্দ তাই তুমি পাবে। যাই হোক চৌকিদার ও পাচকের সেবা ও যত্নে আমাদের প্রথম রাত্রি বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হবে।

পরদিন সকালে চা ও জলখাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব পথে। রেস্ট হাউসের দক্ষিণে সেই সুবিশাল সমতল প্রান্তর—শুকনো ঘাসে বোঝাই। প্রান্তরের শেষে শাল ও শিশম বন, মাঝে মাঝে পলাশ শিমূল ও বহুনিয়া গাছ। তাদের ডালে ডালে লাল ও বেগুনি ফুল ফুটেছে। Flames of the forest—বনের বুকে আগুন লেগেছে।

কিন্তু কেবল পাহাড় আর নদী, শাল আর শিমূলকে নিয়েই করবেট পার্ক নয়। করবেট পার্কের প্রকৃত পরিচয় তার অধিবাসী আর পরিবেশে। আগেই বলেছি প্রকৃতির অপরূপ

রূপদর্শনের আদর্শ স্থান করবেট পার্ক। সেখানের আকাশে—কোয়েল, তোতা, বনমোরগ, ময়ূর, কালো তিতির ও সবুজ পায়রা। মাটিতে বাঘ ভালুক হায়না সম্বর শেয়াল বনবিড়াল বনকুকুর সজারু শূয়োর মাংসাশী বেজী পাহাড়ী ছাগল কৃষ্ণসার মৃগ ও নানা রংয়ের নানা জাতের হরিণ। জলে—কুমীর ও মহাশোল।

তোমার মন কিন্তু বনে না গিয়ে জলে যেতে চাইবে। আমরা যাব রামগঙ্গার তীরে আর সেখানে পৌঁছেই তুমি আনন্দে আকুল হয়ে উঠবে। রামগঙ্গার সৌন্দর্য দেখে নয়। তার স্বচ্ছ শীতল চঞ্চল জলের দিকে চেয়ে। সেই সেবারে ঋষিকেশে গঙ্গায় নেমে তুমি যেমন আকুল হয়েছিলে। অসংখ্য অতিকায় মহাশোল ভাসছে রামগঙ্গার জলে।

শুনে তুমি আশ্বস্ত হবে যে পার্কের কর্তৃপক্ষ ঋষিকেশের মত বৈষ্ণব নন। অনুমতি নিলে তাঁরা রামগঙ্গায় ছিপ অথবা জাল ফেলতে দেন। এবং ধিকালার ডাইনিং রুমে মহাশোলের ঝাল অথবা ঝোল খাওয়ার বারণ নেই কোন। কাজেই ঋষিকেশের মত কেবল দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করেই ক্ষ্যান্ত হতে হবে না, রসনাকেও পরিতৃপ্ত করতে পারবে। তারপরে যখন তুমি জানবে যে আমি আগের থেকেই চিঠি লিখে কালাগড়ের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের কাছ থেকে মাছ ধরার অনুমতি নিয়ে এসেছি, তখন তোমাকে আর পায় কে!

সরাপদুলি, ধিকালা ও বকসার এই তিনটি রেস্ট হাউসই রামগঙ্গার তীরে। তিন জায়গাতেই প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তবে মাছ ধরার সবচেয়ে ভাল জায়গা হল সরাপদুলির উত্তরপূর্বে, পার্কের বাইরে—মণ্ডল নদী ও রামগঙ্গার সঙ্গমে। রামগঙ্গার মহাশোল এক মণ পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে। অবশ্য মাছ ধরার সময় একটু সাবধানে থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের আবার কুমীর কিম্বা বাঘে ধরে নিয়ে যেতে পারে কিনা।

রোজই সকালে আমরা এমনি ঘাসবনের পাশ দিয়ে বহুদূরে বেড়াতে যাব। তারপর নদীর ধারে বসে মাছ ধরব আর কুমীর দেখব। বনপথে বেড়াবার সময় রঙ্গীন হরিণের দলকে দেখতে পাবে বৈকি। তাদের দেখে তুমি আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে ছোট্ট হরিণ শিশুটিকে ধরে ফেলতে চাইবে। কিন্তু সে ধরা দেবে না। সে তোমাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে মায়ের কাছে ছুটে পালাবে। তুমিও পালাতে চাইবে তার সঙ্গে। আমি তোমার একখানি হাত ধরে বলব—যেতে নাহি দিব! তুমি তখন দীপ্ত রৌদ্রে আবৃত যুগযুগান্তর-ক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিবে নিঃশ্বাস।

আফ্রিকার ট্রিটপের অনুকরণে আটটি ওয়াচ টাওয়ার আছে করবেট ন্যাশনাল পার্কে। আর আছে বড় বড় গাছের মাথায় বাঁধা বহু মাচান। ভয় পেও না—সিঁড়িগুলো এত ভাল যে তুমি অনায়াসে ওপরে উঠে যেতে পারবে। প্রতিটিরই অবস্থান চমৎকার. সেখানে বসে স্বাভাবিক বনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হবে।

ধিকালা রেস্ট হাউসে দুটি পোষা হাতী আছে। বিচিত্র তাদের নাম—মালন-কি-কলি ও চন্দের-কলি। একদিন এদের পিঠে সওয়ার হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব বনপথে। ঝরণা পেরিয়ে চড়াই ভেঙে শিশম বনের মধ্য দিয়ে অক্লেশে চন্দের-কলি চলবে হেলেদুলে। ঝোপেঝাড়ে ভরা সরু আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে আমরা গভীর থেকে গভীরতর বনে প্রবেশ করব। তারপরে চন্দের-কলি আমাদের নিয়ে যাবে রামগঙ্গার ওপারে। এগিয়ে চলব পশ্চিমে, পৌঁছব এক তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডে। দেখবে সেখানে নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে একপাল গরু। গলায় তাদের বিরাট বিরাট ঘণ্টা বাঁধা—বনের মধ্যে হারিয়ে গেলে যাতে ওদের খুঁজে পাওয়া যায়।

সঙ্গের বন্দুকধারী প্রহরী বলবে—আরেকটু ওপরে গেলেই বন্য হাতীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

তুমি তখন বায়নাকুলার চোখে লাগিয়ে চারিদিকে নজর দেবে। কিন্তু তাদের দেখতে পাবে না। নির্বিকার ভাবে চন্দের-কলি চলবে এগিয়ে। সহসা প্রহরী পথের পাশের ডালভাঙা গাছগুলো দেখিয়ে দেবে আমাদের। আমরা নরম মাটিতে হাতীর পায়ের ছাপও দেখতে পাব।

একটা জলহীন নালা পেরিয়ে আরেকটু এগিয়েই আমরা ওদের দর্শন পাব। বড় জোর গজ বিশেক দূরে কয়েকটি বন্য হাতী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। আমরাও ওদের দেখব। ভয় নেই ওরা আমাদের কাছে আসবে না। কিছু বলবে না। কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবে। শুভদৃষ্টি শেষে অদৃশ্য হয়ে যাবে গভীর জঙ্গলে।

ফেরার সময় আমরা 'শের বুরজি' বা বাঘের দুর্গের ভেতর দিয়ে আসব। এখানে রামগঙ্গা বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে নদীর ধারে খানিকটা তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরই হল শের বুরজি। প্রান্তরটি ক্রমে উঁচু হয়ে একটি প্রশস্ত উপত্যকায় মিশেছে। প্রান্তরের বুক চিরে আড়াআড়িভাবে দুটি পায়ে-চলা-পথ তৈরি করা হয়েছে। এই দুই পথের সঙ্গমে একটি চীবন্ত ছাগলকে বেঁধে রাখা হয়। পোষা হাতীদের পিঠে চড়ে দুদিক থেকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাঘদের তাড়িয়ে আনা হয় সেখানে। কাছেই একটি মাচান আছে। দর্শনার্থীরা বনের বাঘ দেখার লোভে সেখানে বসে থাকেন।

ধিকালাতে কুমীর দেখতে পাবে না তা নয়। তবে প্রাণভরে কুমীর দেখতে হলে আমাদের যেতে হবে আর সাত মাইল পশ্চিমে, বকসার রেস্ট হাউসে। রামগঙ্গা বকসারের ঠিক দক্ষিণেই, উপত্যকা পেরিয়ে গিরিখাতে প্রবেশ করেছে। সেখানে রামগঙ্গার বেলাভূমি বালুকা ও প্রস্তরময়। লম্বা নাকওয়ালা ঘরিয়াল কুমীর আর বেঁটে নাকওয়ালা মগর কুমীর সেই বেলাভূমিতে পাশাপাশি শুয়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করে।

বকসার থেকে একটি পথ চলে গেছে দক্ষিণে-পূর্বে। এই পথে মাইল চারেক গেলে দুই পাহাড়ের মাঝে পাতেরপানি রেস্ট হাউস। সেখানে বন বেশ গভীর। বাঘ হাতী ও বনমোরগ দেখতে পাওয়া যায়।

এই পথে আরও মাইল তিনেক গেলে একটি উপত্যকার মাঝে গউজপানি রেস্ট হাউস। সেখানে রঙ্গীন হরিণ, বন্য হাতী ও পাহাড়ী ছাগল দেখতে পাওয়া যায়।

গউজপানি তিনটি পথের সঙ্গমে অবস্থিত। উত্তরের পথটি গেছে ধিকালায়। দক্ষিণ-পশ্চিমেরটি গিয়ে মিশেছে কালাগড় যাবার সদর রাস্তায়। আর তৃতীয় পথটি গেছে পূবে—যমুনা গোয়ারে। সেখানেও অনেক বন-মোরগ আছে। ময়াল সাপও মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

করবেট পার্ক পশুপক্ষীদের সংরক্ষিত বাসভূমি। কাজেই সেখানে শিকার নিষিদ্ধ। পার্কের বাইরে চারিদিকের জঙ্গলে শিকার করা যায়। সব জঙ্গলেই ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে। জিম করবেট সে সব জঙ্গলে বহুকাল কাটিয়েছেন। নিকটবর্তী কালাধুঙ্গী জঙ্গলের কেন্দ্রস্থলে কালাধুঙ্গী গ্রামে তিনি একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। সেখানেই তিনি ছুটি কাটাতে আসতেন। উত্তরপ্রদেশ সরকার করবেট-এর স্মৃতিরক্ষার্থে এই বাড়িটির সংস্কার সাধন করে মিউজিয়ামের মর্যাদা দেবার কথা চিন্তা করছেন।

চন্দের-কলির পিঠে চেপে সন্ধ্যের আগেই আমরা ফিরে আসব ধিকালায়। হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পালটে দুজনে পাশাপাশি বসব বারান্দায়। খানসামা চা দিয়ে যাবে। আমরা দিনের স্মৃতির মালা গাঁথা শুরু করব। গল্পে আর হাসিতে সময় যাবে বয়ে।

হঠাৎ দেখতে পাব সন্ধ্যার শান্তি নেমে এসেছে মাটিতে। চারিপাশের জগতে রংবদলের পালা চলেছে। শাল-শিশমের ডালে, পলাশ-শিমূলের ফুলে আর ঘাসের বনে, আঁধার তার কালো তুলির পরশ দিয়েছে বুলিয়ে। পার্কের নীরবতা বাড়ছে, রামগঙ্গার মুখরতা বাড়ছে। সেই মুখরতা আমাদের মুখরতার অবসান ঘটাবে। আমরা কেবল দেখব আর দেখব। এ দেখার শেষ নেই।

নক্ষত্রখচিত আকাশের বুকে একসময় চাঁদ উঠবে—কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। পার্কের শ্যামল তৃণভূমি আর সবুজ বনভূমিকে সে তার স্নিগ্ধ আলোয় আলোকিত করবে, ফুলদলকে সুশোভিত করবে। তারপরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে ওপারের কৃষ্ণকালো পাহাড়ের বুকে। যাবার সময় একটু রুপোলী আভা মাখিয়ে যাবে রামগঙ্গার গায়ে, একমুঠো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাবে আমাদের বারান্দায়।

সেই স্বর্গধারায় স্নান করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠব আমরা। দুজনে হাত ধরে এগিয়ে যাব রেলিংয়ের ধারে। অপলক নয়নে চেয়ে রইব সেই স্বপ্নময় দেশের দিকে। আমরা স্বপ্ন দেখব—যৌবনের স্বপ্ন, জীবনের স্বপ্ন, সুন্দরের স্বপ্ন।

দূরে একটা হায়না উঠবে ডেকে। সুন্দরী প্রকৃতির সেই অসুন্দর প্রাণীর অভিনন্দনে অভিনন্দিত হবে আমাদের জীবন। সুন্দর ও অসুন্দর মিলেই এ জগৎ। আকাশের চাঁদ, বনের বাঘ, জলের কুমীর আর মাটির মানুষকে নিয়েই তো এই বসুন্ধরা। ওরা আছে বলে আমরা আছি, ওরা না থাকলে আমরাও থাকতাম না।

সহসা হিমালয়ের এক ঝলক হিমেল হাওয়া এসে আমাদের আনমনা করে তুলবে।

আমি নিজের অজান্তে গেয়ে উঠব—এমন দেশটি কোথাও......

তুমি আমার সঙ্গে গলা মেলাবে—খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

॥ আট ॥

সে এক সীমাহীন সমুদ্র। সদাই সে প্রলয় দোলায় দুলত আর অবিরত আকাশের সঙ্গে মিলিত হত। দিনরাত তার বুকে পবনের দুর্দম দাপট চলত। কিন্তু কোন তিমি কখনও দেখা যায়নি তার জলে। কারণ তিমিরা তখনও জন্মেনি জগতে। কোন সপ্তডিঙ্গা কখনও ভাসেনি সেই মহাসাগরে। কারণ সপ্তডিঙ্গা তখনও তৈরি হয়নি ভুবনে। কোন সাগরিকা সে সাগরজলে স্নান সেরে, সজল এলো চুলে, শিথিল পীতবাস পরে তার উপল-উপকূলে উপবেশন করেনি। কারণ সাগরিকারা তখনও আসেনি এই মর্ত্যলোকে।

প্রাণীজন্মের বহু পূর্বে, সৃষ্টির এক আদি প্রভাতে সহসা সেই মহাসমুদ্রের বুকে জাগল মহাউচ্ছ্বাস—দেখা দিল এক অভূতপূর্ব শিহরণ। অসীম সাগরের সেই সীমাহীন জলরাশি ভেদ করে জেগে উঠল বিশ্বের বৃহত্তম পর্বতশ্রেণী—তৃতীয় মেরু হিমালয়।

পৃথিবীর ভূ-প্রকৃতি পরিবর্তিত হল। হিমালয়ের পাদদেশে সুনীল জলধির জঠরে জন্ম নিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সুবিশাল দেশ—জগজ্জননী ভারতবর্ষ।

অবশেষে একদিন মানুষ এল। বহু বছরের সাধনায় তারা সভ্য হল। হিমালয়ের অপর পার থেকে দলে দলে নতুন মানুষ এল ভারত ভূমিতে। ভারতের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে

তাদের যুদ্ধ লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত নতুনদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে পুরনোরা অনেকে পালিয়ে গেলেন হিমালয়ে। কিন্তু অশান্তি কমল না। নতুনদের নজর পড়ল হিমালয়ের দিকে। আবার শুরু হল সংগ্রাম—দেবাসুরের সংগ্রাম। অমৃতময় হিমালয়কে করতলগত করার সংগ্রাম। সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হল কিন্তু জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হল না। বাধ্য হয়ে উভয়ে উভয়কে মেনে নিল আপন বলে। নতুন আর পুরনো মিলেমিশে এক হয়ে গেল। সৃষ্টি হল এক নতুনতর জাতির। সেই মহাজাতির জনকরা আর মহান দেশের মহাকবিরা—হিমালয়কে দেবালয়রূপে গড়ে তুললেন, তার গহন-গিরি-কন্দরে বসে মহাকাব্য রচনা করলেন। হিমালয় হল ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক, পরিণত হল মহাজাতিসদনে।

দেবতাত্মা হিমালয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় তীর্থ কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ। যুগাতীত কাল থেকে দলে দলে পুণ্যার্থী পাড়ি দিয়েছেন এই দুই মুক্তিতীর্থ-পথে। কেউ অসহ্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পরমাতীর্থ পরিক্রমা পূর্ণ করে ফিরে এসেছেন ঘরে, কেউবা আসা-যাওয়ার পথের ধারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন—মহাপ্রস্থানের পথ নাম সার্থক হয়েছে।

এ পথের আকর্ষণ ভারতবাসীর সহজাত। তবু সবাই সাহস পান নি এই দুর্গম পথ পাড়ি দিতে। তাঁরা দূর থেকে কেবল মানসতীর্থ দর্শনের কল্পনা করেছেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন। এদের দুঃখ দূর করার জন্যই বোধ করি নির্মিত হয়েছিল টিহরি ও দ্বারাহাটের কেদার-বদ্রীর মন্দির। আমরা আজ দ্বারাহাটে এসেছি সেই মন্দির দর্শন করতে। আওরঙ্গাবাদের বিবি কা মকবরা দেখলে যে তাজমহল দেখা হয় না তা জানি, কিন্তু আওরঙ্গাবাদে গিয়ে দাক্ষিণাত্যের তাজমহল না দেখা নিবুর্দ্ধিতা। তেমনি কুমায়ুন পরিক্রমায় বেরিয়ে দ্বারাহাটে না আসাও অন্যায়।

রানীক্ষেত থেকে দ্বারাহাট ১৪ মাইল। দৈনিক তিনখানি করে বাস যাতায়াত করে। আমরা প্রথম বাস ধরেছি। সকাল সওয়া নটায় রওনা হয়ে সাড়ে এগারোটায় দ্বারাহাট পৌঁচেছি। এখান থেকে আলমোরা ২৬ মাইল।

দ্বারাহাট একটি মালভূমি—সুবিস্তৃত ও সমতল, সুজলা ও সুফলা। উচ্চতা ৫০৩১ ফুট। চারিদিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। চমৎকার আবহাওয়া। তাই বোধহয় দশ শতাব্দীতে কাত্যুরী রাজারা এখানে পত্তন করেছিলেন এক নতুন নগরীর। সেই নগরীকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় দ্বারকায়। নাম দিয়েছিলেন দ্বারাহাট। দ্বারাহাট দ্বারকা হয়েছিল কিনা জানি না, তবে সে যে তৎকালীন কুমায়ুনের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক প্রগতির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, তাতে ঐতিহাসিকদের কোন সন্দেহ নেই।

অনেকের ধারণা দ্বারাহাট মহাভারতের যুগের জনপদ। অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবরা কিছুকাল এখানে বাস করেন ও কেদার-বদ্রীর মন্দির নির্মাণ করান। দ্বারাহাটের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য-পুঁথি পাওয়া যায় নি। পণ্ডিত রামদত্ত ত্রিপাঠি এখানকার ভগ্ন মন্দির ও শিলালিপি থেকে দ্বারাহাটের আনুমানিক ইতিহাস রচনা করেছেন।

দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত দ্বারাহাট লখনপুর ও ভাতকোটের কাত্যুরী রাজাদের রাজধানী ছিল। দ্বারাহাটের সমৃদ্ধিকাল দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এর মধ্যে আবার ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীই দ্বারাহাটের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। এই সময় গুর্জরদেব (১২৫৭ সাল), সুধারদেব (১৩১৬ সাল), মানদেব (১৩৩৭ সাল) ও সোমদেব (১৩৪৯ সাল) দ্বারাহাটে রাজত্ব করেন। সোমদেবের সময় দ্বারাহাট গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের শ্রেষ্ঠ মহানগরী।

কাত্যুরী রাজারা কোশী নদীকে সোমেশ্বর থেকে দ্বারাহাটে নিয়ে এসে রামগঙ্গার শাখানদী

ক্ষীরগঙ্গার সঙ্গে মিলিত করে সঙ্গম সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ক্ষীণকায়া ক্ষীরগঙ্গাই দ্বারাহাটের একমাত্র নদী। সেদিক থেকে কাত্যুরীদের অপর রাজধানী বৈজনাথের অবস্থান দ্বারাহাটের চেয়ে ভাল, কারণ বৈজনাথকে বিধৌত করেছে গোমতী—ক্ষীরগঙ্গার চেয়ে অনেক বড় নদী। দ্বারাহাট মালভূমি আর বৈজনাথ উপত্যকা। তাহলেও দ্বারাহাট বৈজনাথের থেকে অনুর্বর নয়। কারণ এখানে বেশী বৃষ্টি হয়। ফলে বছরে দুবার চাষ-আবাদ করা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে গৃহবিবাদের ফলে কাত্যুরী রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আলমোরার চাঁদ রাজা বাজাবাহাদুর (১৬৩৮-৭৮ সাল) দ্বারাহাট দখল করে কাত্যুরী রাজত্বের অবসান ঘটান। কিন্তু তাতে নগরীর কোন ক্ষতি হয় নি।

১৭৪৩-৪৪ সালে রোহিলাদের আক্রমণের ফলেই দ্বারাহাট ধ্বংস হয়ে যায়। তারপরে আর পুনর্নির্মিত হয় নি। আজ দ্বারাহাট একটি গণ্ডগ্রামে রূপান্তরিত। অথচ ভাবলেও অবাক হতে হয় এককালে এই দ্বারাহাট ছিল রাজধানী আর রানীক্ষেত ছিল বিলাসক্ষেত্র। আজ কেবল কয়েকটি ভগ্নমন্দির দ্বারাহাটের সেই গৌরবময় যুগের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। আর আমরা তাদেরই আকর্ষণে রানীক্ষেত থেকে এসেছি এখানে।

চিঠি লিখে আমরা ডাকবাংলায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছি। তবে এখানে একটি হোটেলও আছে। বাস থেকে নেমেই অসিতবাবু একজন স্থানীয় লোককে জুটিয়ে নিলো। তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে সব দেখিয়ে দেবেন। অর্থাৎ গাইডের কাজ করবেন। তাঁকে পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক দিতে হবে। লোকটির বয়স বছর চল্লিশেক। নাম পবন চৌধুরী। চেহারার মধ্যে নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে লোকটি খুবই ভদ্র ও অমায়িক। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাঁকে দরিদ্র বলে মনে হলেও, তাঁর কথাবার্তা ও চালচলনের মধ্যে যেন একটা আভিজাত্যের আভাস পাচ্ছি।

চৌধুরীজী আমাদের ডাকবাংলোয় নিয়ে এলেন। ডাকবাংলোটি মন্দ নয়। আমরা দুখানি ঘরই পেলাম। চৌধুরীজী চৌকিদারকে খুঁজে নিয়ে এলেন। সেও বেশ হাসিখুশী ও বিনয়ী। নাম মহাবীর। এরও চেহারাটিও মোটেই মহাবীরের মত নয়। কিন্তু নামে কি এসে যায়। তাছাড়া বীরত্ব নয়, প্রভুভক্তির জন্যই হনুমান আজও অমর হয়ে আছে। আর ট্যুরিস্ট ভক্তির জন্যও চৌকিদার মহাবীরের নামও আমাদের চিরদিন মনে থাকবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলল। তারপরেই লেগে গেল আমাদের জিনিসপত্র গোছগাছ করতে। আমরা খাওয়া-দাওয়ার দায়দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে চৌধুরীজীর সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়লাম দ্বারাহাটের পথে।

রোহিলা আক্রমণের পরে স্থানীয়দের উদাসীনতা ও রাজশক্তির অবহেলায় মন্দিরময় মহানগরী দ্বারাহাট পরিণত হয় গণ্ডগ্রামে। কিন্তু এখানকার দুটি মন্দির মানুষের মানসপট থেকে মুছে যায় না—বদ্রীনাথ ও মৃত্যুঞ্জয় মন্দির। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এই দুটি মন্দিরেই কেবল নিয়মিত পূজো-পার্বণ হত। অথচ দ্বারাহাটে এককালে মন্দির তথা অট্টালিকার সংখ্যা ছিল ৩৬৫টি। এর মধ্যে প্রায় তিরিশটি ছিল বড় বড় মন্দির। কালের করাল গ্রাসে কোনটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কোনটি বা আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল। ১৯১৮ সালে পুরাতত্ত্ব বিভাগ খননকার্য শুধু করে। কেদারনাথ, গুর্জরদেব, মানদেব ও রতনদেব প্রভৃতি মন্দির এবং নেপালী কাছারীর উদ্ধার ও সংস্কার সাধন করেন। পুরাতত্ত্ব

বিভাগই এখন এখানকার এই সব মন্দিরের রক্ষক।

চৌধুরীজীর সঙ্গে বাজার ছাড়িয়ে প্রথমেই এলাম গুর্জরদের মন্দিরে। স্থানীয়রা এই মন্দিরকে বলেন রণিবাস। শিল্পীর চোখে এটি দ্বারাহাটের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সত্যই অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকলামণ্ডিত। তৎকালীন দ্বারাহাটের সাংস্কৃতিক প্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। শিল্প-চাতুর্যের বিচারে এটি ভারতের একটি বিশিষ্ট মন্দির।

১২২৮ সালে কাত্যুরীরাজ গুর্জরদেব এই মন্দির নির্মাণ করান। কালের করাল গ্রাসে তিনটি বড় ও দুটি ছোট মন্দির এবং কয়েকটি অর্ধভগ্ন দেয়াল ছাড়া আর সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে, অনেক জায়গা জুড়ে এই মন্দিরের এলাকা ছিল। এবং চারিদিকে আরও অনেক মন্দির বা অট্টালিকা ছিল। বড় তিনটি মন্দিরের গড়ন অনেকটা উড়িষ্যার রেখ দেউলের মত। ওপরের অংশ কিছু কিছু ভেঙে গেছে। তবে নিচের অংশ প্রায় অক্ষতই রয়েছে। দেয়ালে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও অসংখ্য পাষাণপ্রতিমা।

ছোট মন্দিরচত্বরের তিন দিকে তিনটি মন্দির। মূল মন্দিরে কালিকা দেবীর মূর্তি। দেবীমূর্তির ওপরে অনন্ত পাল দেবের (১১২২ সাল) একখানি শিলালিপি আছে। কালিকা মূর্তির পাশে শীতলা দেবীর মূর্তি—এটি পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাছেই রয়েছে কুলদেবীর মন্দির। এই মন্দিরকে স্থানীয়রা কাংরী দেবীর মন্দির বলে থাকেন। এটি পরবর্তীকালে চৌধুরী রাজপুতবংশীয় রাজারা নির্মাণ করেছেন।

মন্দিরের অবস্থানটি বড়ই সুন্দর। জায়গাটা সমতল। মন্দির এলাকার মধ্যে কোন গাছপালা নেই। তবে পেছনে খানিক দূরে জঙ্গল শুরু হয়েছে। জঙ্গলের শেষে কয়েকটি ছোট ছোট সবুজ পাহাড়। তাদের পেছনে বড় পাহাড়ের ধূসর রেখা। ঐ পাহাড়ের পরপারেই বৈজনাথ—বর্তমান নাম গড়ুর উপত্যকা। এখান থেকে সোজাসুজি দূরত্ব মাত্র ৯-১০ মাইল। সেকালে নিশ্চয়ই কোন সংক্ষিপ্ত পথ ছিল। কিন্তু এখন তা কেউ জানে না। রানীক্ষেত ও আলমোরা হয়ে ৭৮ মাইল ঘুরে আমাদের ওখানে পৌঁছতে হবে।

গুর্জরদেব মন্দির দর্শন করে আমরা রতনদেব মন্দিরে এলাম। তিনটি ছোট ও চারটি বড় মন্দির নিয়ে এই মন্দির। গঠন-শৈলী মোটামুটি গুর্জরদেব মন্দিরেরই মত। মন্দির এলাকায় কিছু গাছপালা থাকলেও চারিদিকে বৃক্ষহীন প্রান্তর। দ্বারাহাটের ভূ-প্রকৃতি অনেকটা ছোটনাগপুরের মত।

রতনদেব মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। সম্ভবতঃ অপসৃত হয়েছে। দ্বারাহাটের অধিকাংশ মন্দিরই মূর্তিহীন। মনে হয় ইংরেজ সেনাবাহিনীর দুর্লভ শিল্পবস্তু সংগ্রাহকরা (Curio-hunters) এই সব মূর্তি নিয়ে গেছেন। কেউ কেউ বলেন, এই মন্দিরটি আসলে সেকালের সেনানিবাস ছিল। তাঁদের মতে গুর্জরদেব মন্দির ছিল খাজাঞ্চীখানা ও কাছারী মন্দিরটি ছিল আদালত। নির্মাতাদের স্মৃতিরক্ষার্থে এদের এমনি নামকরণ হয়েছে।

রতনদেব মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরে এলাম। এটি দ্বারাহাটের উচ্চতম ও বিশালতম মন্দির।

একটা নালা পেরিয়ে আমরা কেদারনাথ মন্দিরে এলাম। ভারী সুন্দর মন্দির। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম মন্দিরচত্বরে। ভেতরে প্রবেশ করে বিস্মিত হলাম। অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তির সঙ্গে পেতলের দুটি মহাবীর ও পার্শ্বনাথের মূর্তি রয়েছে। একাদশ কিম্বা দ্বাদশ শতাব্দীর মূর্তি। তাহলে কি মূল কেদারনাথ মন্দির এককালে যেমন বৌদ্ধতীর্থ ছিল, তেমনি দ্বারাহাটের এই কেদারনাথ মন্দিরও একদা জৈনতীর্থ ছিল?

কিন্তু তা কবে? কে জানে? হে নীরব কুমায়ুন, তুমি কথা কও।

এলাম বদ্রীনাথ মন্দিরে। ১২৯৭ সালে তৈরি হয়েছে এই মন্দির। দ্বারাহাটের সবচেয়ে সমাদৃত মন্দির। চিরকাল অগণিত ভক্তের পূজা পেয়েছে। ফলে কালের করাল ছায়া নামতে পারে নি। বিরাট বিরাট বৃক্ষের ছায়ায় সে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

পাথরের দো-চালা মন্দির। পাথরের টালির চাল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে, ছোট কাঠের দরজা পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। লক্ষ্মী নারায়ণ ও সূর্য সহ অনেক দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। পূজারী আমাদের চরণামৃত দান করলেন। পরম ভক্তিভরে বদ্রীনাথের চরণ-চর্চিত সেই অমৃত পান করে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

তারপরে মানদেব মন্দির দর্শন করলাম। এই মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারে একটি জৈনমূর্তি আছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠি। বেলা চারটে বাজে। ইচ্ছে ছিল একেবারে নেপালী কাছারী দেখে ডাকবাংলোয় ফিরব। কিন্তু পেটের তাগিদে ফিরে আসতে হল। আশ্চর্য, এতক্ষণ ঘড়ির কথা ছিলাম ভুলে আর ঘড়ি দেখার আগে খিদের জ্বালাও টের পাই নি। তাহলে মন ভরলে, পেট ভরে।

একঘণ্টা বাদে আবার আসবেন বলে চৌধুরীজী বিদায় চাইছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁকে যেতে দিলাম না। এতক্ষণ ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে সমানে চক্কর মেরেছেন। চৌকিদারের কৃপায় যা জোটে তাই ভাগ করে খাওয়া যাক, অনেক বলা-কওয়ার পরে চৌধুরীজী রাজী হলেন।

নাঃ, পাচক হিসেবে মহাবীর মোটেই মন্দ নয়। শবজীটা উপাদেয় হয়েছে। চাপাটিগুলিও বেশ নরম। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, আমাদের আকণ্ঠ ভোজনের পরেও মহাবীরের খাবারে টান পড়ল না।

খাওয়াদাওয়ার পরে চৌধুরীজী জানালেন—তিনি আধ ঘণ্টার ছুটি চান, একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসবেন। আমরা অনুমতি দিলাম। তবু তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বিস্মিত হয়ে মোহিত জিজ্ঞেস করে, "কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ...একটা কথা...।"

"বেশ তো বলুন।"

চৌধুরীজী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপরে লজ্জিত কণ্ঠে মোহিতকে বলে, "একবার বাইরে আসবেন?"

মোহিত বেরিয়ে গেল বারান্দায়। চৌধুরীজী তার অনুগমন করলেন। আমরা কৌতূহলী হয়ে মোহিতের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে মোহিত এল ফিরে। দাশু প্রশ্ন করল, 'টাকা চাইলেন তো?"

"হ্যাঁ, দুটো টাকার নাকি খুবই দরকার।"

"আরে কে আছে ওর?"

"সবাই। স্ত্রী, দুটি ছেলেমেয়ে আর মা।"

"ছেলে চাকরি করে?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

"না। তার বয়স মোটে আট। স্কুলে পড়ে। মেয়েটি বড়।"

"বিয়ে হয় নি?"

"না, ভাল সম্বন্ধ জোটাতে পারেন নি। একা মানুষ। দিনরাত পেটের চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে

হয়।

মনটা ভারী হয়ে ওঠে। কেমন করে বেঁচে আছে এরা? কী এদের ভবিষ্যৎ? কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে—এই তো আমার দেশের প্রকৃত রূপ। বেঁচে থাকাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। তবু ওঁরা আছেন, আমরা আছি। কিন্তু আর কতকাল এই দিনগত পাপক্ষয়? কে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে?

ঠিক আধ ঘণ্টা পরে চৌধুরীজী ফিরে এলেন। এসেই অমায়িক কণ্ঠে বললেন, "টুলক্কুরা দেখতে হলে আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।"

"টুলক্কুরা? সে আবার কি জিনিস?" মোহিত অবাক হয়, "আমরা নাকি ভূতিয়া মহল দেখতে যাব?"

"আজ্ঞে ভূতিয়া মহল তো সত্যিকারের নাম নয়। লোকে ঐ নাম দিয়েছে। আসল নাম টুলক্কুরা অর্থাৎ বড় বাড়ি।"

"কারা এই বাড়ি তৈরি করেছে জানেন কি?"

"জী হ্যাঁ। এখানকার জমিদার চৌধুরী সর্দাররা তৈরি করিয়েছিলেন এই প্রাসাদ।" তিনি একবার থামলেন। তারপর আবার বলতে থাকেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে একবার খুব আকাল হয় দ্বারাহাটে। চাষীরা বেকার হয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কর্মহীন চাষীদের অন্ন যোগাবার দায়িত্ব নেন চৌধুরী সর্দাররা। কিন্তু ভিক্ষার মাধ্যমে নয়, কর্মসংস্থান করে। তাদের দিয়ে চৌধুরীরা এই টুলক্কুরা তৈরি করান।"

সেকালের একটি সুন্দর সমাজ-চিত্র পেলাম। ধনী-দরিদ্র সেকালেও ছিল, কিন্তু দরিদ্রের দুর্দিনে ধনীরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেন না। আর 'ডোল' নয়, 'এমপ্লয়মেন্ট-ই রিহ্যাবিলিটেশনের' শ্রেষ্ঠ সমাধান।

বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথ মানে জনপথ নয়, ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথরেখা। দূরে ক্ষেত-খামার আর দু-একখানি বাড়ি-ঘর। মাঝে মাঝে খেজুর গাছ। এত উঁচুতে এর আগে আর কখনও খেজুর গাছ দেখি নি। চারিদিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের চিহ্ন, ভাঙা ইট-পাথরের স্তূপ, পোড়া মাটির বাসনপত্র আর বুজে যাওয়া নর্দমা। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আজকের এই পরিত্যক্ত প্রান্তর এককালে জনাকীর্ণ ছিল।

দুঃখ হচ্ছে সেই মহানগরীর কঙ্কাল দেখে। সকালে তবু যা হোক দু-চারজন পথচারী দেখেছি। এখন পথ একেবারেই জনশূন্য। বিকেলবেলাতেই বাসিন্দারা গৃহাভিমুখী হয়েছেন—তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

বাড়িটার সামনে এসে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। বিশাল প্রাসাদ। তেতলা। দোতলায় ও তেতলায় ঝোলানো বারান্দা। বাইরে তো বটেই, ভেতরেও আগাছা জন্মেছে বহু জায়গায়। অসংখ্য ছোট বড় কামরা। তবে স্যাঁতস্যাঁতে নোংরা ও অন্ধকার। সব ঘরে ঢুকতে সত্যই সাহস হল না। ভূতের ভয়ে নয়, সাপের ভয়ে। তবে স্থানীয়রা রাতে তো দূরের কথা, দিনেও এ বাড়ির কাছাকাছি আসেন না। বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে এ বাড়িকে কেন্দ্র করে।

টর্চ জ্বেলে যতটা সম্ভব ঘুরে বেড়াই ভেতরে ; দরজা ও দেয়ালে কাঠ ও পাথরের ওপরে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর চিত্র খোদিত রয়েছে। মহলের একাংশে মন্দির ও কুয়ো। সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা সমন্বিত বাসগৃহ আজ ভূতিয়া মহলে পরিণত।

জলঝড়ে মহলের কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে। তবে এখনও সংস্কার করলে বাসোপযোগী

হতে পারে। বেশ বোঝা যাচ্ছে বহু বছর এর গায়ে মানুষের হাত পড়ে নি। তবু কাঠামোটি মোটামুটি ঠিকই রয়েছে। ধন্য সেকালের গৃহনির্মাণ কৌশল। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই যাঁরা এই প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন, সেই বিশ্বকর্মাদের প্রণাম করি।

চৌধুরীজী বললেন, "দেয়ালগুলো লক্ষ্য করুন।"

আমরা এগিয়ে আসি দেওয়ালের কাছে। তিনি দেয়ালে হাত বুলিয়ে বলেন, "দেখুন কেমন শক্ত আস্তর। অথচ এর মধ্যে সিমেন্ট নেই। তাঁরা কি দিয়ে এই আস্তর করেছেন জানেন ?"

"কি দিয়ে ?"

"বিউলির ডালের গুঁড়োর সঙ্গে গুড় মিশিয়ে।"

আশ্চর্য হই না। বরং ভাবতে ভাল লাগে, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হবার বহু পূর্বেও আমাদের দেশে বিজ্ঞান ছিল, বৈজ্ঞানিক ছিলেন। নইলে এই প্রাসাদ নির্মিত হত না। আর এ তো সেদিনকার কথা। বিজ্ঞান না থাকলে যে অজন্তা ইলোরা আর নালন্দাই তৈরি হত না।

তবে একটা কথা ভেবে কিন্তু আশ্চর্য না হয়ে পারি না। এত বড় প্রাসাদ তৈরি করতে তাহলে কত ডাল আর কত গুড় লেগেছিল ? এবং দুর্ভিক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তখন দ্বারাহাটে অত ডাল এবং গুড় ছিল ? এই র‍্যাশনিংয়ের দিনে ভাবতেও ভাল লাগছে।

পরদিন সকালে। ঘুম ভাঙল চৌধুরীজীর ডাকে। তাঁকে বলেছিলাম ভোর ছটায় আসতে। কারণ আমরা সাড়ে দশটার বাসে রানীক্ষেত ফিরে যাব। সেখানে খাওয়া সেরে বিকেলের বাসেই চলে যাব আলমোরা। দ্বারাহাট থেকেও আলমোরায় বাস যায়। কিন্তু আমরা সুবিধের জন্য অধিকাংশ জিনিসপত্র রানীক্ষেতে রেখে এসেছি। তাই রানীক্ষেত হয়েই আমাদের আলমোরা যেতে হবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি চৌধুরীজী আমাদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই শীতে সাতসকালে ভদ্রলোককে না আসতে বললেই হত। আমরা ভেবেছিলাম ছটা বললে সাতটায় আসবেন। বুঝতেই পারি নি তিনি এমন সময় মেনে চলবেন। কিন্তু কাল সারাদিন সঙ্গে থেকে তাঁর মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় পেয়েছি তাতে বোঝা উচিত ছিল। যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। এবার উঠে পড়া যাক।

বিস্ময়ের পালা শেষ হয় নি। বারান্দায় এসে দেখি বালতি বোঝাই ধূমায়মান গরম জল। চৌধুরীজীর চেয়ে চৌকিদারজী কম যায় না দেখছি। ঘুম থেকে ওঠার আগেই মুখ ধোয়ার জল তৈরি। শুধু তাই নয়। মুখ ধুয়ে ঘরে এসেই চায়ের কাপ হাতে পেলাম। ধন্য এদের কর্তব্যজ্ঞান, ধন্য এদের আতিথেয়তা। দারিদ্র্য এদের অন্তরের ঐশ্বর্য নষ্ট করতে পারে নি।

বেরিয়ে পড়া গেল। কাল ভাল করে বাজারটা দেখতে পারি নি। আজ তাই বাজারে এসে চলা বন্ধ করলাম। খুবই ছোট বাজার, তাও ঠিকমত বসে নি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মোটামুটি পাওয়া যায়। প্রয়োজন জিনিসটা আপেক্ষিক। বর্তমান দ্বারাহাটের প্রয়োজনের সঙ্গে অতীতের দ্বারাহাটের কোন সম্পর্ক নেই। সেদিন হয়তো এ বাজারে মসলীন থেকে মুক্তো পর্যন্ত সবই কিনতে পাওয়া যেত। আর আজ ? তবে আজও সে মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে। দ্বারাহাটের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দ্বারাহাটের মানুষেরও প্রয়োজন সংকুচিত হয়েছে।

কিন্তু কাত্যুরী রাজত্বের অবসানের পরে, এমন কি গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও দ্বারাহাটের এই বাজার বোধ করি এমন জনবিরল ছিল না। তখন হয়তো মুক্তোর বদলে মানুষ বিক্রী হত এই বাজারে। সেটি গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের ঘোর দুর্দিন—নেপালী শাসনকাল।

চাঁদ রাজত্বের অবসান হয়েছে। দুর্বলচিত্ত শেষ চাঁদরাজা দীপচাঁদকে তাঁর সেনাপতি মোহন সিং শিরাকোট দুর্গে হত্যা করে (১৭৭৭ সাল) কুমায়ুনের রাজা হয়ে বসেন। তারপরেই গাড়োয়ালীরা কুমায়ুন আক্রমণ করেন। অরাজক অবস্থা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নামেমাত্র আলমোরার সিংহাসনে বসেন মোহন সিংয়ের পুত্র মহেন্দ্র সিং। মহেন্দ্রক্ষণ বুঝে হরখদেবের পরামর্শে নেপালী সেনাপতি রণবাহাদুর ১৭৯০ সালে কুমায়ুন দখল করে নেন। মাত্র পঁচিশ বছর নেপালীরা কুমায়ুনে রাজত্ব করেছেন। কিন্তু প্রজাপীড়নের জন্য এই কটি বছর কুমায়ুনের ইতিহাসে ঘোর দুর্দিন বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। নেপালীরা প্রকাশ্যে দাসব্যবসা শুরু করেন। তিন থেকে তিরিশ বছরের ছেলে-মেয়েদের দর ছিল দশ থেকে দেড়শ টাকা। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ চালান হয়ে গেল কুমায়ুন থেকে।

নেপালী রাজত্বকালে স্থানীয় নেপালী শাসক যে বাড়িটিতে বাস করতেন, ওঁরা তার নাম দিয়েছিলেন নেপালী কাছারী। আমরা এখন সেই কাছারী দেখতেই চলেছি। এটি বদ্রীনাথ মন্দিরের কিছু ওপরে অবস্থিত। কাল সময়াভাবে আমরা এদিকে আসতে পারি নি।

"নেপালী কাছারী কিন্তু নেপালীদের তৈরি নয়।" বলেন চৌধুরীজী, "এটি বর্তমান দ্বারাহাটের সবচেয়ে পুরনো বাড়ি। কে তৈরি করেছেন, ঠিক বলতে পারব না। তবে নেপালীরা ১৮০০ সালে এর সংস্কার সাধন করেন।"

হঠাৎ দাশু প্রশ্ন করে, "এই সব কবর কাদের ? এখানে কি মুসলমান বা খৃষ্টান আছেন নাকি ?"

"মুসলমান নেই। তবে খৃষ্টান আছেন কয়েক ঘর। কিন্তু এগুলো তাদের কবর নয়। এগুলো খসদের কবর। বাগেশ্বরেও আপনারা এমনি কবর দেখতে পাবেন। শুনেছি লাদাক চাম্বা কনৌজ ও কিন্নর দেশেও এই রকম কবর আছে।"

আমরা একটি কবরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। তারপরে এগিয়ে চলি চড়াইপথে।

নেপালী কাছারী বেশ বড়—তেতলা বাড়ি। কারুকার্যমণ্ডিত। পাথর ও কাঠের তৈরি। চারিপাশের চেয়ে উঁচুতে অবস্থিত। ফলে অবস্থানটি পর্যবেক্ষণের পক্ষে সুবিধাজনক। তাই বোধ হয় নেপালী শাসক এটিকে তাঁর বাসগৃহ ও দপ্তররূপে নির্বাচিত করেছিলেন।

যত্নের অভাবে বাড়িটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও সংস্কার করলে আরও অন্তত শ'দুয়েক বছর সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আশ্চর্য! এত বড় একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত কীর্তিস্তম্ভ আমাদের উদাসীনতায় ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।

চৌধুরীজী কারণটি বলেন, "মন্দির নয় বলে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এর দেখাশুনোর ভার নেন নি।"

বিস্মিত হই। কিন্তু নীরব থাকি। আইন অলঙ্ঘনীয়।

নেপালী কাছারীর পাশ দিয়ে আমরা একটি কালী মন্দিরের সামনে এলাম। এখানে কিছু ভগ্নমূর্তি রয়েছে। এ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য, বলির বেদীতে মহাবীর ও পার্শ্বনাথের তিনটি মূর্তি। হিংসা ও অহিংসার অপূর্ব সমন্বয়।

কালী মন্দিরের কাছেই জওহরলাল নেহরুর একান্ত সচিব শিবদত্ত উপাধ্যায়ের বাড়ি। কিছুদূর এগিয়েই খৃষ্টান-পল্লী। এখানে একটি মিশনারী স্কুলও আছে। এটি আলমোরা জেলার

প্রাচীনতম স্কুলগুলির অন্যতম।

হঠাৎ দুজন লোককে দেখে থমকে দাঁড়ান চৌধুরীজী। কানে কানে বলেন, "ঐ লোক দুটির মাথার দিকে লক্ষ্য করুন। দেখুন চুলগুলো কি রকম লাল !" একটু থেমে আবার বলেন, "এরা খস। এখনও এখানে কিছু অ-মিশ্রিত খস রয়েছেন।"

ভাল করে লক্ষ্য করি ওদের দুজনকে। কিন্তু চুল ছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ছে না।

পথে পড়ল আরও কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির। কিন্তু অধিকাংশ মন্দিরই মূর্তিশূন্য। যাও বা দুয়েকটিতে আছে তাও ভাঙা।

এই অঞ্চলে আরও দুটি দর্শনীয় স্থান আছে। একটি দ্বারাহাটের দক্ষিণে অবস্থিত স্কন্দপুরাণের মানসখণ্ডে বর্ণিত শ্রীবিভাণ্ডেশ্বর বা কুমায়ুনের কাশী। অতি রমণীয় স্থান। সুরভী ও নন্দিনী নামে দুটি ছোট নদী প্রবাহিত হয়েছে এই স্বর্গীয় সুন্দর উপত্যকার মধ্য দিয়ে। আর এই দুই জলধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীবিভাণ্ডেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। ৪৪৩ সালে তৈরি হয়েছিল এই মন্দির। পুণ্যার্থীরা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিলেন এই তীর্থ। কিন্তু বিশ্বনাথের বিচিত্র লীলা। ১৯৪৩ সালে ১০৮ মহাত্মা লক্ষ্মীনারায়ণ দাস তীর্থদর্শনমানসে গেলেন শ্রীবিভাণ্ডেশ্বরে। আর ফিরে আসতে পারলেন না। সেখানেই চিরস্থায়ী হয়ে গেলেন। নিজেকে বিশ্বনাথের চরণে সমর্পণ করে শ্রীবিভাণ্ডেশ্বরের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথমেই জরাজীর্ণ মন্দিরটির সংস্কার সাধন করালেন। তারপর একে একে তৈরি করলেন ধর্মশালা অতিথিশালা (রামকুঠি) যজ্ঞশালা বিদ্যালয় ত্রিবেণীদ্বার ও উত্তর সিংহদ্বার। এখন শ্রীবিভাণ্ডেশ্বর কেবল প্রাচীন তীর্থ নয়, একটি রমণীয় শৈলাবাসও বটে।

এ অঞ্চলের অপর দর্শনীয় স্থানটি হল নিকটবর্তী দুনাগিরি পাহাড়ে অবস্থিত বৈষ্ণবীদেবীর মন্দির। এই দুনাগিরি পাহাড় কিন্তু দুনাগিরি পর্বত নয়। দুনাগিরি পর্বত পিথোরাগড় জেলায় অবস্থিত ও ২৩,১৮৪ ফুট উঁচু। সেটি কুমায়ুনের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কটির অন্যতম। আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় সে শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারেন নি। ১৯৩৯ সালে আঁদ্রে রশ-য়ের নেতৃত্বে এক সুইস অভিযাত্রীদল সেই পর্বতশৃঙ্গে পদার্পণ করেন। ৫ই জুলাই তারিখে সহযাত্রী ফ্রিৎশ স্টিউরী ও ডেভিড জগ-য়ের সঙ্গে নেতা ঐ দুর্গম শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হন।

এই দুনাগিরি দ্বারাহাটের উত্তর প্রান্তের পাহাড়টি। এই পাহাড়ের ওপরেই গরুড় উপত্যকা। অনেকের মতে দ্বারাহাটের দুনাগিরিই মহাভারতের দ্রোণগিরি। সুধারদেব ১২৯৫ সালে এই পাহাড়ে বৈষ্ণবী মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরে এখনও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মূল বিগ্রহটি অক্ষত আছে। এখানে আরও কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির ও একটি ধর্মশালা আছে। আর আছে একটি আয়ুর্বেদিক ঔষধির সরকারী উদ্যান। এখানকার জলবায়ু কেবল স্বাস্থ্যকর নয়, সকলপ্রকার রোগমুক্ত।

দ্বারাহাট আলমোরা জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। রানীক্ষেত থেকে আসা বাস-পথটি চৌখুটিয়া হয়ে গণাই পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। চৌখুটিয়া থেকে একটি পথ গেছে ভিকিয়াসেন। ভিকিয়াসেন থেকে বাসে রানীক্ষেত ও রামনগর যাওয়া যায়। আর গণাই থেকে আদি বদ্রী হয়ে পৌঁছনো যায় কর্ণপ্রয়াগ। আগে কেদার-বদ্রী দর্শনশেষে বহু যাত্রী এই পথে ফিরে যেতেন ঘরে। তাঁরা অন্ততঃপক্ষে একটা দিন দ্বারাহাটে বিশ্রাম করতেন। স্বর্গ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে কিছু বাড়তি পুণ্যসঞ্চয় করে যেতেন এই দ্বিতীয় দ্বারকায়। দ্বিতীয়বার কেদার-বদ্রী দর্শন করতেন। এখন তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। একালের

পুণ্যার্থীদের অবসর কম। তাঁদের সর্বদাই সময় সংক্ষেপ করতে হয়। তাই তাঁরা সহজ পথে তীর্থ পরিক্রমা পূর্ণ করেন।

সেকালের সীমাহীন সাগর, একালের অন্তহীন পর্বতশ্রেণী—সে যুগের জনাকীর্ণ মহানগরী, এ যুগের জনবিরল গণ্ডগ্রাম। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিশ্বসৃষ্টির মুহূর্ত থেকে যে উত্থান ও পতনের পালা শুরু হয়েছে কোনকালে তার শেষ হবে না।

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন—হিমালয় বিশ্বের কনিষ্ঠতম পর্বতশ্রেণী। তার কেবল শৈশব চলেছে—সে এখনও বড় হচ্ছে। কিন্তু একদিন হিমালয়ের জীবনেও বার্ধক্য আসবে—তার মৃত্যু হবে। তাই বলে পৃথিবী হিমালয়হীন হবে না। আবার অন্য কোন সীমাহীন সাগরের অনন্ত জলধির জঠরে জন্ম নেবে নতুন এক হিমালয়।

আজ আমরা যে সব মহানগরীর গর্বে গর্ববোধ করছি, একদিন তাদেরও দ্বারাহাটের দশা হবে। কোন এক নতুন পর্যটক সেদিন এইসব মহানগরীর ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আমারই মত বিস্মিত হবে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। হয়তো বা রচনা করবে—নতুন এক গহন-গিরি-কন্দরের কাহিনী।

"একবার দয়া করতেই হবে। ঘণ্টাখানেকের বেশী আমি আপনাদের আটকে রাখব না।" চৌধুরীজীর কথায় আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। আমরা বাজারে ফিরে এসেছি। চৌধুরীজী আমাদের নিয়ে যেতে চাইছেন তাঁর বাড়িতে।

"কিন্তু বেলা দশটা বাজে। আমরা যে তা হলে সাড়ে দশটার বাস ধরতে পারব না।" অসিত আপত্তি জানায়।

"আজ্ঞে পৌনে তিনটার বাসে যাবেন।" চৌধুরীজী আবার অনুরোধ করেন।

"তা হলে যে রানীক্ষেত পৌঁছব সেই বিকেল পাঁচটায়। আজ আর আলমোরা যাওয়া হবে না। তা ছাড়া এখানে তো আজ রান্নার ব্যবস্থাও হয় নি। সারাদিন না খেয়ে থাকতে হবে।" অমিতাভ চিন্তিত। আর একা তার কথাই বা বলছি কেন ? আমরা সকলেই চিন্তিত।

কিন্তু বিস্মিত হই চৌধুরীজীর উত্তরে। তিনি বলেন, "অমন চিন্তাও করবেন না। আপনারা মেহমান, আপনাদের উপোসী রাখলে যে মহাপাতক হব। আজ আমার ওখানেই আপনাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। দয়া করে একবার গরীবের বাড়িতে পদধূলি দিতেই হবে।"

"এ হাঙ্গামা আবার....." চৌধুরীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ করতে পারি না। সবাই চুপ করে আছি। হয়ত একই কথা ভাবছি। ভাবছি তাঁর অবস্থার কথা। অতি দরিদ্র তিনি। নইলে পাঁচ টাকার জন্য কাল থেকে আমাদের সঙ্গে চক্কর মারতেন না। কাল দুটি টাকা চেয়ে নিয়েছেন। অথচ আজ আমাদের এতগুলো লোককে নেমন্তন্ন করে বাড়ি নিয়ে চলেছেন। কিন্তু তাঁর এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এতএব নীরবে চৌধুরীজীকে অনুসরণ করি।

ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা-পথ পেরিয়ে একখানি জরাজীর্ণ দ্বিতল বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। বাড়িটা কোনকালে বেশ ভালই ছিল, তবে বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। চারিদিকে আগাছা জন্মেছে। বাইরের দিকে কোথাও আস্তর নেই। লোকজনও খুব বেশী আছে বলে মনে হচ্ছে না। অন্ধকারে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি দোতলায়। আমাদের সাড়া পেয়ে কয়েকটা ইঁদুর ছুটে পালায়।

একখানি মাঝারি আকারের ঘরে চৌধুরীজী নিয়ে আসেন আমাদের। ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতা। আমরা বাইরে জুতো রেখে সেই মাদুরের ওপরে বসি। চৌধুরী চলে যান

ভেতরে। একটু বাদে একটি মেয়ে ও একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আবার ফিরে আসেন। আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে। ছেলেটি বাড়ি নেই, স্কুলে গেছে। স্ত্রীর মাথায় ঘোমটা। কাজেই মুখখানি খুব ভাল করে দেখতে পেলাম না। তবু মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলা সুন্দরী। বয়স চল্লিশের কোঠায়। গায়ের রং ফর্সা। তিনি হাত জোড় করে আমাদের নমস্কার করলেন। মায়ের দেখাদেখি মেয়েটিও হাত জোড় করে। ওর দিকে তাকাতেই সে মাথা নত করে। কচি-কোমল মুখখানির এই সলাজমধুর ভাবটি বড়ই ভাল লাগে। দুঃখ হচ্ছে ওকে দেখে। রাগ হচ্ছে ভগবানের ওপরে। এমন সুন্দর করেই যখন গড়লে, তখন কেন ওকে এই অসচ্ছল সংসারে পাঠালে?

একটু বাদে ওরা সবাই আবার চলে গেলেন ভেতরে। থালায় থালায় ডাল চাপাটি শবজী ও লাড্ডু নিয়ে এলেন সস্ত্রীক চৌধুরীজী। মেয়ে নিয়ে এল জলের লোটা। হাতে জল ঢেলে দিল সে। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসি আমরা। সামান্য আয়োজন কিন্তু এমন আন্তরিক আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ জীবনে বোধ করি এই প্রথম।

কথায় কথায় চৌধুরীজী বলেন, "বাবার আমলেই আমাদের অবস্থা পড়ে এসেছিল। কিন্তু তখনও দ্বারাহাটে কোন পরদেশী এলে আমাদের বাড়িতেই উঠতেন। তার আগের যুগের কথা আর কিই বা বলব? আমরাও ছোটবেলায় যা দেখেছি, তার কথা মনে হলেও দুচোখ জলে ভরে ওঠে। সে যাক গে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। আপনাদের আবার বাস ধরতে হবে।"

বুঝতে পারি তিনি অতীত প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তবু জিজ্ঞেস করি, "এই বাড়ি কবে তৈরি হয়েছে?"

"তিনপুরুষ আগে। আমার ঠাকুরদাদার আমলে।"

"তার পরে বোধ হয় আর মেরামত করা হয় নি?"

"বাবার আমলে বারদুয়েক হয়েছে। আমরা কিছুই করি নি। ভাগের বাড়ি কে মেরামত করবে বলুন!"

"তা ছাড়া যা বাজার পড়েছে। কেমন করেই বা করবেন?" দাশরথির কণ্ঠে সহানুভূতি।

"আমি বা আমরা যে ক-ঘর এখানে রয়েছি তাদের পক্ষে সম্ভব নয় সত্যি, কিন্তু আমাদের পরিবারের কয়েক সরিকের অবস্থা বেশ ভাল। তারা ইচ্ছে করলে পৈতৃক ভিটে মেরামত করতে পারে। কিন্তু কেন করবে? তারা তো বহুকাল দ্বারাহাট ছেড়ে চলে গেছে। যাদের যাবার জায়গা নেই, তারাই শুধু পিতৃপুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যেপ্রদীপ দিচ্ছি।"

"কিন্তু এভাবে থাকলে একদিন তো এ বাড়ি বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। তখন কি করবেন?"

"কি আর করব, পথে দাঁড়াব। সবই তো গেছে, এ বাড়ি গেলেও বেশী আর একটা কি ক্ষতি হবে! টুলকুরা যদি ভূতিয়া মহল হতে পেরে থাকে, এ বাড়ির জন্য মায়া করা বৃথা!"

চুপ করেন চৌধুরীজী। চুপ করে থাকি আমরা। তবে বিস্মিত হই তাঁর উক্তিতে। হঠাৎ ভূতিয়া মহলের কথা তুললে কেন? টুলকুরার নির্মাতারাও চৌধুরী। তবে কি চৌধুরীজী তাঁদেরই বংশধর? সেকালের চৌধুরী সর্দারদের জনৈক বংশধর আজ জীবনধারণের প্রয়োজনে দ্বারাহাটে পদ-প্রদর্শকের পেশা গ্রহণ করেছেন?

॥ নয় ॥

শিব তখন পার্বতীকে বললেন—'দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।' স্বর্গ চাইলে তোমার পরিশ্রম বৃথা হবে, কারণ তোমার পিত্রালয়ই দেবভূমি। 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয় নাম নগাধিরাজঃ।' হিমালয়ই দেবালয়। কিন্তু দেবতাত্মা হিমালয় বলতে আমরা সাধারণতঃ গাড়োয়াল-হিমালয়কেই বুঝে থাকি। এর কারণ যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী ও কেদার-বদ্রী—এই চারিধাম গাড়োয়ালে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র উত্তরাখণ্ড নিয়েই দেবতাত্মা হিমালয়—আর গাড়োয়াল ও কুমায়ুন নিয়েই এই উত্তরাখণ্ড।

কমনীয়া কুমায়ুনের চিরসবুজ গহন অরণ্য, চিরতুষারাবৃত গিরিশিখর রহস্যাবৃত কন্দর, স্মরণীয়া কুমায়ুনের কুসুমাচ্ছাদিত উপত্যকা, তৃণাচ্ছাদিত তরাই অঞ্চল, সদাচঞ্চল স্রোতস্বিনী, আর বরণীয়া কুমায়ুনের মন্দির ও মঠ দেবদেবীর সৌন্দর্যনিকেতন, অপ্সরাদের নৃত্যভূমি ও মুনি-মানস বিমোহন ক্ষেত্র।

কুমায়ুন হিমালয়ের কেন্দ্রভূমি আলমোরা। ১৫৬৩ সালে চাঁদরাজা ভীষ্মচন্দ্র (১৫৫৫-৬৩) চম্পাবত থেকে আলমোরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রায় সাতশ বছর ধরে চাঁদরাজারা কুমায়ুনে রাজত্ব করেছেন।

চাঁদরাজাদের অভ্যুত্থানের ইতিহাস অজ্ঞাত। প্রবাদ আছে যে সোমচন্দ্র নামে একজন ক্ষত্রিয় এই রাজবংশের আদিপুরুষ। তিনি এলাহাবাদের ঝুসি থেকে কুমায়ুনে আসেন ও কালী নদীর পশ্চিম তীরে বাস করতে থাকেন। আপন বুদ্ধি ও অধ্যবসায়বলে স্থানীয় কাত্যুরী সর্দার অপুত্রক ব্রহ্মদেবের প্রিয়পাত্র হন ও তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন। তিনি চম্পাবত দুর্গ নির্মাণ করেন। ৯৫৩ সালে ব্রহ্মদেবের মৃত্যুর পর তিনি চম্পাবত অঞ্চলের অধিপতি হন।

সোমচন্দ্রের পরে চাঁদরাজাদের চারশ বছরের ইতিহাস এখনও অনাবিষ্কৃত। ১৩৭৪ সালে গরুড় জ্ঞানচন্দ্র এই বংশের রাজা হন। তিনি দিল্লীর পাঠান সুলতানের কাছ থেকে তরাই অঞ্চলের কিছু সমতলভূমি জায়গীর নেন। জ্ঞানচন্দ্র ১৪১৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। জ্ঞানচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর পৌত্র উদ্যানচন্দ্র। তিনি মাত্র এক বছর রাজত্ব করেছেন। কিন্তু তারই মধ্যে রাজ্য বিস্তার করেন এবং বালেশ্বর-মন্দিরের সংস্কার শুরু করে যান। ১৪২৩ সালে এই কাজ শেষ করেন বিক্রমচন্দ্র। ১৪৩৭ সালে বিক্রমচন্দ্রের ভাইপো ভারতী খাসিয়াদের সাহায্যে তাঁর রাজ্যচ্যুত করেন।

ভারতী ও তাঁর বংশধরগণ ১২৩ বছর কুমায়ুনে রাজত্ব করেছেন। তাঁদের রাজত্বকালই চাঁদবংশের গৌরবময় যুগ। কারণ বিক্রমচন্দ্র পর্যন্ত চাঁদরাজারা প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ কুমায়ুনের ডোটি রাজাদের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। ডোটির রাজাদের উপাধি ছিল রায়ন-কা-রাজা। ভারতীচন্দ্র ডোটি রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করে নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলে ঘোষণা করলেন। যুদ্ধ লেগে গেল। বারো বছর ধরে যুদ্ধ চলল। শেষ পর্যন্ত বিজয়লক্ষ্মী তাঁরই কণ্ঠে বিজয়মাল্য দিলেন পরিয়ে। তিনি ডোটি লুণ্ঠন করে বহু ধনরত্ন লাভ করলেন। চম্পাবত এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হল। যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তাঁর দুর্বলচিত্ত পিতৃব্যকে গদিচ্যুত করেছিলেন তা সফল হল। তিনিও স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন

রাজকার্য থেকে। তাঁর ছেলে রতনচন্দ্র রাজা হলেন ১৪৫০ সালে। কিন্তু ভারতীচন্দ্র এর পরেও এগারো বছর জীবিত ছিলেন। শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় এমন ভাবে রাজসিংহাসন থেকে অবসর নেবার উদাহরণ খুব বেশী নেই এ দেশে।

রতনচন্দ্রও অযোগ্য ছিলেন না। তিনি আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। পিথোরাগড় জয় করে কিছুকাল অধিকার করে রাখেন। ফলে চম্পাবতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। কেবল বীর নয়, রতনচন্দ্র খুবই ধার্মিক ছিলেন। তিনি জাগেশ্বরের মন্দিরের জন্য অনেক সম্পত্তি দেবোত্তর করে যান। ১৪৮৮ সালে রতনচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে পুত্র কীর্তিচন্দ্র চম্পাবতের সিংহাসনে বসেন।

কীর্তিচন্দ্র চন্দ্রবংশের সবচেয়ে কীর্তিমান নরপতি। তিনি পাত্র পনেরো বছর রাজত্ব করেন। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই কাত্যুরীদের কাছ থেকে বিসোদ বা আলমোরা অঞ্চল এবং পালি বা দ্বারাহাট অঞ্চল দখল করে নেন। তিনি খাসিয়াদের পরাজিত করে নৈনিতালের পশ্চিমাংশ কোটা অঞ্চল এবং কাঠিরাজপুতদের হাত থেকে ফলদাকোট বা কোশী উপত্যকা ছিনিয়ে নিয়ে পশ্চিমে রামগঙ্গার তীর পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। পরবর্তী চাঁদরাজারা অবশ্য এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন না। এবং সম্ভবত কাত্যুরীরাজারা দ্বারাহাট পুনরায় দখল করে নেন। দ্বারাহাট স্থায়ীভাবে চাঁদরাজাদের অধিকারে আসে সপ্তদশ শতাব্দীতে, বাজবাহাদুরচন্দ্রের আমলে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

১৫০৩ সালে কীর্তিচন্দ্রের মৃত্যু হয়। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস এখনও বিশেষ জানা যায় না। তবে চাঁদরাজারা প্রবল প্রতাপের সঙ্গে চম্পাবতে রাজত্ব করেছেন। ১৫৫৫ সালে ভীষ্মচন্দ্র চম্পাবতের রাজা হন। তিনি বলবীর্যশালী বিচক্ষণ ও শান্তপ্রকৃতির নরপতি ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পূর্বে ডোটি ও পশ্চিমে পালি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিনি সে বিদ্রোহ দমন করেন এবং বুঝতে পারেন চম্পাবতে রাজধানী রেখে এত বড় রাজ্যকে শাসন করা সম্ভব নয়। তাই সুশাসনের প্রয়োজনে তিনি রাজ্যের কেন্দ্রস্থল আলমোরায় (কাত্যুরী রাজাদের প্রাক্তন দুর্গ খাগমারায়) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেই থেকে আলমোরা কুমায়ুনের প্রধান নগরী। ১৫৬০ সালে এই আলমোরাতেই রামগড়ের খাসিয়া সর্দার গাজোয়া নিদ্রিত অবস্থায় ভীষ্মদেবকে হত্যা করেন।

খাসিয়ারা আশা করেছিলেন পুত্রহীন রাজা ভীষ্মচন্দ্রকে হত্যা করতে পারলেই চাঁদরাজত্বে অরাজকতা দেখা দেবে। আর সেই সুযোগে তাঁরা কুমায়ুনে কায়েম হয়ে বসবেন। কিন্তু ভীষ্মচন্দ্রের সুযোগ্য পোষ্যপুত্র বাল কল্যাণচন্দ্র অনতিবিলম্বে গাজোয়াকে পরাজিত করে তার রক্তে পিতৃ-তর্পণ করলেন। খাসিয়াদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল।

কল্যাণচন্দ্র মাত্র পাঁচ বৎসর (১৫৬০-৬৫ সাল) রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে আলমোরার প্রভূত উন্নতি হয়। তিনি সরযূ ও রামগঙ্গার মধ্যবর্তী গঙ্গোলী অঞ্চল এবং খাসিয়া-অধ্যুষিত দানপুর জয় করেন। কল্যাণচন্দ্রের শ্যালক ডোটির রায়ান-কা-রাজার কাছ থেকে পুনরায় পিথোরাগড় (শোর) অঞ্চল অধিকার করে নেন।

কল্যাণচন্দ্রের বংশধরগণ প্রায় দেড়শ বছর ধরে কুমায়ুনে রাজত্ব করে গেছেন। তাঁর পুত্র রুদ্রচন্দ্র অতিশয় শক্তিশালী ও বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। তিনি বত্রিশ বছর (১৫৬৫-৯৭) রাজত্ব করেন এবং আলমোরার দুর্গ নির্মাণ করেন। রুদ্রচন্দ্র প্রথমেই সম্রাট আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর রাজ্যকে সম্ভাব্য মোগল আক্রমণ থেকে মুক্ত করেন। তারপরে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি তাঁর মাতুলের রাজ্য ডোটি (শিরা) আক্রমণ করেন। বহু বছর চেষ্টার

পরে তাঁর সেনাপতি, গঙ্গোলীর পুরুষোত্তম বা পরখু ১৫৮০ সালে শিরা দুর্গ অধিকার করতে সমর্থ হন। সেযুগে মধ্য হিমালয়ের প্রধান পাঁচটি রাজ্য ছিল—গাড়োয়াল, কুমায়ুন, ডোটি, শোর (পিথোরাগড়) ও আসকোট। এদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত।

শিরা দুর্গ জয়ের কৃতিত্বের মূল্যস্বরূপ রুদ্রচন্দ্র পরখুকে অনেক ভূমিদান করেন। এখনও গঙ্গোলীতে পরখুর বংশধরদের কাছে রুদ্রচন্দ্রের সেই তাম্রশাসন আছে।

তারপরে রুদ্রচন্দ্রের নজর পরে প্রতিবেশী রাজ্য গাড়োয়ালের দিকে। তিনি এক বিরাট সেনাবাহিনী দিয়ে পরখুকে বধান অঞ্চল জয় করতে পাঠান। তখন শুকপাল ছিলেন কাত্যুরীরাজা। পরখু যখন তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে গাড়োয়ালের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন শুকপাল গোয়ালদামে পরখুকে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করেন। রুদ্রচন্দ্র অবিলম্বে এই হত্যার প্রতিশোধ নেন। তিনি শুকপালকে নিহত করে তাঁর রাজ্যকে চাঁদসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

পূর্বপুরুষদের মত রুদ্রচন্দ্রও অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তিনি বালেশ্বর মন্দিরের অধিকারীকে অনেক ভূমি দান করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে (১৫৯৭ সাল) পুত্র লক্ষ্মীচন্দ্র সিংহাসনে বসেন।

লক্ষ্মীচন্দ্র চব্বিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনিও খুব ধার্মিক ছিলেন। তিনি বহু মন্দির নির্মাণ ও অনেক ভূমি দান করে গেছেন। লক্ষ্মীচন্দ্রের পরে চাঁদরাজাদের ষোল বছরের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৬৩৮ সালে তাঁর পৌত্র বাজবাহাদুরচন্দ্র আলমোরার সিংহাসনে বসেন।

বাজবাহাদুর আটত্রিশ বছর (১৬৩৮-৭৬) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল কুমায়ুনের বিশেষ বৈচিত্র্যময় যুগ। তিনি সাজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দুন উপত্যকা (গাড়োয়াল) অভিযানে মোগল সেনাপতি খলিলুল্লা খানের সহযোগিতা করেন। পুরস্কার স্বরূপ সাজাহান তাঁকে কুমায়ুন আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপরে বাজবাহাদুর নিজেই গাড়োয়াল আক্রমণ করে লোভার উত্তরে জুনিয়াগড় দুর্গ দখল করে নেন এবং সেখানকার মন্দির থেকে নন্দাদেবীর মূর্তি আলমোরায় নিয়ে আসেন। এই সময়ে হানরা প্রায়ই কুমায়ুনের পূর্বাঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করত। তাদের এই অত্যাচারের ফলে কৈলাস-মানসসরোবরে যাত্রীদের জীবন বিপন্ন ছিল। বাজবাহাদুর হানদের দমন করে কৈলাসযাত্রীদের জীবনে নিরাপত্তা এনে দেন। তিনি ভীমতালে মন্দির নির্মাণ করেন এবং বহু ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দান করেন। এই পুণ্যাত্মা মহাবীরের শেষ জীবনের দিন কটি কিন্তু বড়ই দুঃখের। শেষ জীবনে তিনি অতিশয় সন্দেহগ্রস্ত ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। নিঃসঙ্গ অবস্থায় একদিন সকলের অগোচরে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

বাজবাহাদুরের পুত্র উদ্যোগচন্দ্র ও পৌত্র জ্ঞানচন্দ্র পরবর্তী একত্রিশ বছর আলমোরায় রাজত্ব করেন। তারপরে ১৭০৭ সালে আলমোরার সিংহাসনে বসেন জগৎচন্দ্র। তিনিও অতিশয় শক্তিশালী নরপতী ছিলেন। তিনি গাড়োয়াল আক্রমণ করে কিছুকাল রাজধানী শ্রীনগর আপন অধিকারে রাখেন। তাঁর সুশাসনে কুমায়ুন একটি সমৃদ্ধশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি তেরো বছর রাজত্ব করেন।

পুত্র দেবীচন্দ্র কিন্তু মোটেই পিতার মত কুশলী নরপতী ছিলেন না। তাঁর অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে বিস্তবংশীয় কর্মচারিগণ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন ও প্রজাপীড়ন শুরু করেন। তাদের অত্যাচারে কুমায়ুনে কান্নার রোল পড়ে যায়। ছ' বছর রাজত্ব করার পর ১৭২৬ সালে

অপদার্থ রাজা দেবীচন্দ্র দেবীপুর প্রাসাদে এক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মূল চন্দ্রবংশের রাজত্বকাল শেষ হয়।

চন্দ্রবংশের রাজত্বকাল স্বাধীন কুমায়ুনের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। কালু তড়াগী চন্দ্রবংশীয় ছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে তিনি যে চম্পাবতে রাজত্ব করতেন, সেই চম্পাবত থেকেই চন্দ্রবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। পরবর্তীকালে তাঁদের রাজ্যই কুর্মাচল বা কুমায়ুঁ নামে অভিহিত হয়। চাঁদরাজাদের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কুমায়ুঁ নামও বিস্তৃত হয়। চন্দ্রবংশই কুমায়ুনের মূল রাজবংশ। চাঁদরাজারা প্রায় সকলেই শিবভক্ত ছিলেন। কুমায়ুনের অসংখ্য শিবমন্দিরের অধিকাংশই চাঁদরাজাদের নির্মিত।

দেবীচন্দ্রকে হত্যা করে বিস্তবংশীয় রাজকর্মচারীরা দেবীচন্দ্রেরই একজন দৌহিত্রকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে কুশাসন চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু যে কারণেই হোক কিছুকাল পরে রাজার সঙ্গে তাঁদের মনোমালিন্য হয় এবং তাঁরা রাজাকে হত্যা করেন। বিরোধীদল তখন আবার চন্দ্রদের শাখাবংশীয় কল্যাণ নামে এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। কল্যাণ রাজা হয়ে বিস্তদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন ও চন্দ্রবংশীয় পুরুষদের হত্যা কিম্বা চোখ নষ্ট করতে থাকলেন। ভয় পেয়ে চন্দ্রবংশীয় হিম্মত গোসাঁই দলবলসহ কুমায়ুন পরিত্যাগ করেন। পথে তিনি কাশীপুর আক্রমণ করে পরাজিত হন। বাধ্য হয়ে আওলায় রোহিলা সর্দার আলি মহম্মদ খাঁর শরণাপন্ন হন। কিন্তু কোন সাহায্য পাবার আগেই সেখানে কল্যাণের গুপ্তঘাতক তাঁহাকে হত্যা করে।

আলি মহম্মদ কিন্তু কল্যাণকে ক্ষমা করলেন না। ১৭৪৩ সালে দশ হাজার সৈন্য দিয়ে সেনাপতি রহমৎ খাঁকে কুমায়ুন আক্রমণ করতে পাঠালেন।

কল্যাণ কাশীপুরের শাসনকর্তা শিবদেব জোশীকে কোন সাহায্য পাঠানো তো দূরের কথা, এমন কি রাজধানী রক্ষার কোন ব্যবস্থা পর্যন্ত না করে গাড়োয়ালে পালিয়ে যান। রহমৎ রুদ্রপুর ও হলদোনীর যুদ্ধে শিবদেবকে পরাজিত করলেন। ভীমতালের বরখেরি দুর্গ জয় করে রামগড় ও পূরার পথে রহমৎ আলমোরা পৌঁছে বিনাযুদ্ধে রাজধানী অধিকার করে নেন। পরে তিনি দ্বারাহাট দখল করেন। তারপর শুরু হয় রোহিলাদের অমানুষিক অত্যাচার—লুণ্ঠন ও ধর্ষণ। তারা কুমায়ুনের অধিকাংশ মন্দির ও মঠ ধ্বংস করে দেয়। আমরা গত দু-দিন দ্বারাহাটে এই ধ্বংসলীলার কিছু কিছু চিহ্ন দেখে এসেছি।

শেষ পর্যন্ত গাড়োয়ালরাজের মধ্যস্থতায় রোহিলারা কুমায়ুন ছেড়ে চলে যায়। কল্যাণ তখন বাদশাহ মহম্মদ শার সঙ্গে দেখা করে সম্ভাব্য মোগল আক্রমণ থেকে কুমায়ুনকে মুক্ত করেন।

কল্যাণ নিষ্ঠুর হলেও অধার্মিক ছিলেন না। তিনি আলমোরার উত্তরে বিনসরের মন্দির নির্মাণ করান। অবসর পেলেই তিনি সেখানে গিয়ে বাস করতেন। কিন্তু তাঁর জীবন-দেবতা তাঁকে ক্ষমা করেন নি। আত্মীয়দের চোখ নষ্ট করার পাপে তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান। দুঃসহ দৈহিক কষ্ট সহ্য করার পরে ১৭৪৮ সালে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

কল্যাণের মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে দীপচন্দ্র রাজা হন। তিনি প্রায় তিরিশ বছর রাজত্ব করেন। মন্ত্রী শিবদেবের সুশাসনে তাঁর রাজত্বকালের প্রথম পনেরো বছর রাজ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করে। ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে দীপচন্দ্র অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও রোহিলা সর্দার নজীর খাঁর পক্ষ নিয়ে চার হাজার সৈন্য নিয়ে আহম্মদ শাহ আব্দালীকে সাহায্য করেন। ফলে আব্দালীর পক্ষে মারাঠা সেনাপতি সদাশিবরাও ভাওকে পরাজিত

করা সহজতর হয়। সেদিন যদি কল্যাণ এবং ভারতের অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিরা মারাঠাদের সাহায্য করতেন, তা হলে কেবল কুমায়ুন নয়, আজ ভারতের ইতিহাসই অন্য ভাবে লেখা হত। কারণ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের আশা চিরতরে শেষ হয়ে যায়। আর সেই সাম্রাজ্য গঠনের সুযোগ লাভ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা।

দীপচন্দ্রের অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে তাঁর কর্মচারীরা অত্যন্ত ক্ষমতাপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ফলে রাজ্যের প্রধান কর্মচারী শিবদেব ও হরিরামের মধ্যে বিবাদ বাধে এবং শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধে শিবদেব জয়ী হন। কিন্তু তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছিল। ১৭৬৪ সালে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি কাশীপুরে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন।

ক্ষমতালাভের লড়াই কিন্তু বন্ধ হয় না। শিবদেবের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র হরদেব জোশী বা বিখ্যাত হরখদেব পিতার পদ পেতে চান। ফলে রাওতালার সেনাপতি মোহন সিং-য়ের সঙ্গে তাঁর ক্ষমতার লড়াই লেগে যায়। মোহন সিং দীপচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আত্মকলহে কুমায়ুন বিপর্যস্ত হতে থাকে।

১৭৭৭ সালে মোহন সিং দীপচন্দ্র ও হরখদেবকে বন্দী করে আলমোরা অধিকার করেন। তারপরে শিরাকোট দুর্গে বন্দী দীপচন্দ্রকে হত্যা করে কুমায়ুনের রাজা হন। চন্দ্রবংশের শেষ শিখা নিভে যায়। সেই সঙ্গে স্বাধীন কুমায়ুনের ইতিহাসও শেষ হয়।

কিন্তু ইতিহাস তো কেবল স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় না। কাজেই দীপচন্দ্রের পরেও কুমায়ুনের ইতিহাস আছে। আর সে ইতিহাস যতই আত্মকলহে কলুষিত হোক, তারও নায়ক আছে।

এই ইতিহাসের প্রধান পুরুষ হরখদেব। সিংহাসনে বসেই মোহন সিং প্রতিপক্ষের উচ্ছেদসাধনে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হবার পূর্বেই ১৭৭৯ সালে গাড়োয়ালরাজ ললিত শাহ্ দ্বারাহাট আক্রমণ করে মোহন সিংকে পরাজিত করেন। প্রাণভয়ে মোহন সিং রামপুরে পালিয়ে যান। ললিত শাহ্ দ্বিতীয় পুত্র প্রদ্যুম্নকে কুমায়ুনের সিংহাসনে বসালেন।* হরখদেবকে মুক্ত করে তাঁকে প্রদ্যুম্নের মন্ত্রী নিযুক্ত করে নিজে ফিরে গেলেন শ্রীনগরে। ১৭৮৬ সালে ললিত শাহ্ মারা গেলে প্রথম পুত্র জয়কীরথ শ্রীনগরের সিংহাসনে বসলেন। তিনি কুমায়ুনের সিংহাসনের প্রতি প্রলুব্ধ হলেন। হরখদেবের পরামর্শে প্রদ্যুম্ন গাড়োয়াল আক্রমণ করলেন। জয়কীরথ পরাজিত হলেন। পরে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে প্রদ্যুম্ন আলমোরা থেকে শ্রীনগরে গিয়ে গাড়োয়ালের সিংহাসনে বসেন। গাড়োয়াল ও কুমায়ুন এক সাম্রাজ্যযুক্ত হয়। হরখদেব কুমায়ুন শাসন করতে থাকেন। কিন্তু বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারেন না। কারণ সেযুগে একজন রাজার পক্ষে এই দুই রাজ্যকে পদানত করে রাখা সম্ভব ছিল না। বিদ্রোহীদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে হরখদেব কুমায়ুন ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

মোহন সিং আবার আলমোরায় ফিরে আসেন। সৈন্য সংগ্রহের পরে ১৭৮৮ সালে হরখদেব কুমায়ুন আক্রমণ করে মোহন সিংকে হত্যা করেন। কিন্তু প্রদ্যুম্ন আর আলমোরায় ফিরে

---

* লেখকের 'পঞ্চ প্রয়াগ' দ্রষ্টব্য।

আসেন না। হরখদেবই কুমায়ুন শাসন করতে থাকেন। তবে তা মাত্র কয়েক মাসের জন্য। ঐ বছরই মোহন সিংয়ের ছেলে মহেন্দ্র সিংয়ের কাছে হরখদেব পুনরায় পরাজিত হন। মহেন্দ্র সিং কুমায়ুনের সিংহাসনে বসেন।

যে কারণেই হোক কুমায়ুন পুনরুদ্ধারে প্রদ্যুম্ন আর হরখদেবকে সাহায্য করেন না। ফলে হরখদেবের দুর্মতি হয়। তিনি গুর্খা সেনাপতি রণ বাহাদুরকে কুমায়ুন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সহায়তায় ১৭৯০ সালে রণবাহাদুর কুমায়ুন অধিকার করে নেন। মহেন্দ্র সিং পালিয়ে যান। হরখদেবকে রণবাহাদুর পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হরখদেব তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। নেপালীদের অত্যাচারে কুমায়ুনে হাহাকার পড়ে যায়। হরখদেব তখন প্রদ্যুম্নকে কুমায়ুন গুর্খামুক্ত করার অনুরোধ জানান। এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে ১৭৯৩ সালে নেপালীরা তাঁকে বন্দী করে নেপালে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু চতুর হরখদেব পথ থেকে পালিয়ে আসেন শ্রীনগরে। দশ বছর ধরে নানাভাবে নেপালীদের সাম্রাজ্যবিস্তারে বাধা দিতে থাকেন।

১৮০৩ সালে নেপালীরা গাড়োয়াল আক্রমণ করেন। প্রদ্যুম্ন শাহ্ হরখদেবকে পাঠালেন লখ্‌নউতে অযোধ্যার নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার কাছে—গুর্খাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করতে। কিন্তু সে সাহায্য আসার আগেই গুর্খারা গাড়োয়াল দখল করে নিলেন। ভাগ্যহীন প্রদ্যুম্ন পালিয়ে এলেন দেরাদুনে। সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। হরখদেব পালিয়ে আসেন কনখলে।

কুমায়ুন ও গাড়োয়াল নেপালীদের করতলগত হল। তাঁরা অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে দিলেন। প্রকাশ্য দাস-ব্যবসা শুরু হল। কেবল হরিদ্বার থেকেই বারো বছরে দু লক্ষ মানুষ বিক্রি হয়ে গেল।

হরখদেব বাইরের সাহায্য পাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে গুর্খাদের অত্যাচারের কথা বলে ওয়ারেন হেস্টিংসকে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল আক্রমণে প্ররোচিত করেন। ১৮১৫ সালে বিজয়ী বৃটিশ সেনাপতি এইচ. আর. হিয়ারসের সঙ্গে হরখদেব ফিরে আসেন আলমোরায়। ঐ বছরই ৬৯ বছর বয়সে আলমোরায় তাঁর বিচিত্র জীবন-লীলার অবসান ঘটে।

হরখদেবের মৃত্যুর পরে মহেন্দ্র সিং ও তাঁর পিতৃব্য লাল সিং হেস্টিংসের কাছে কুমায়ুনের সিংহাসন প্রার্থনা করেন। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। তবে হেস্টিংস তাঁদের সামান্য কিছু জমিদারি দান করে মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দেন। রাজা উপাধি নিয়ে মহেন্দ্র সিংয়ের বংশধরগণ আলমোরায় এবং লাল সিংয়ের বংশধররা কাশীপুরে বাস করতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে অবিবাহিত আলমোরার রাজার মৃত্যুর পরে কাশীপুরের রাজা দু জায়গারই রাজা হয়েছেন। তিনি এখন কুমায়ুনের প্রাক্তন স্বাধীন নরপতিদের বর্তমান প্রতিনিধি।

॥ দশ ॥

অবশেষে আজকের মত বাস-যাত্রার বিরতি হল। আমরা আলমোরা পৌঁছলাম।

কুমায়ুনের কেন্দ্রভূমি আলমোরা। ১৫৬০ সালে ভীষ্মচন্দ্র চম্পাবত থেকে আলমোরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর বিগত চারশ বছর ধরে আলমোরা মধ্য হিমালয়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মান নির্ধারণ করে আসছে। আলমোরার ইতিহাস মানে মধ্য হিমালয়ের ইতিহাস। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত সমস্ত কুমায়ুনই আলমোরা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলমোরা শহরই ছিল কুমায়ুন ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার এবং টিহরী গাড়োয়াল ও পাউরী গাড়োয়াল ছিল এই ডিভিশনের অংশ। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বর্তমানে সেই ডিভিশনকে ভেঙে কুমায়ুন ও উত্তরাখণ্ড দুটি ডিভিশন করা হয়েছে এবং আলমোরা জেলাকেও বিভক্ত করা হয়েছে। এখন কুমায়ুনের মধ্যাঞ্চলই কেবল আলমোরা জেলা। এই জেলার উত্তরে চামেলী, পূবে পিথোরাগড়, দক্ষিণে নৈনিতাল ও পশ্চিমে পাউরী গাড়োয়াল।

আলমোরা জেলার উত্তর-পূর্বাংশের পার্বত্যভূমি দানপুর পরগণাকে বাদ দিলে জেলার বাকি অংশ, রামগঙ্গা (লোহ্যবতী) থেকে সরযূ পর্যন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চল মোটামুটি উপত্যকাময়। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়ী জলধারা ও চারটি বড় নদী প্রবাহিত হয়েছে—কোশী গোমতী পনার ও লোবিয়া। ফলে এ জেলার উপত্যকাসমূহ অত্যন্ত উর্বর। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী।

দানপুর পরগণায় বহু উঁচু পাহাড় হিমবাহ গিরিবর্ত্ম গভীর বন ও তৃণময় প্রান্তর (বুগিয়াল) আছে। এই পরগণার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা পশুপালন, পশম বয়ন ও সেনাবাহিনীর চাকরি। এই অঞ্চলের প্রধান নদী পিণ্ডারী। পিণ্ডারী নদীর উৎস—পিণ্ডারী হিমবাবহ দর্শনের পরে আমাদের কুমায়ুন পরিক্রমা পূর্ণ হবে।

আলমোরা জেলার আয়তন ২,৭২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৬,৭৭,৯৪৯। রানীক্ষেত, চম্পাবত ও আলমোরা—তিনটি মহকুমা নিয়ে এই জেলা। পশ্চিমাঞ্চল রানীক্ষেত, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল চম্পাবত এবং মধ্য ও উত্তরাঞ্চল আলমোরা। আলমোরা এখনও কুমায়ুনের বৃহত্তম নগরী এবং ভারতের প্রাচীনতম শৈলাবাস। কাজেই রানীক্ষেত বা নৈনিতালের মত সুপরিকল্পিত নয়। শহরের আয়তন প্রায় পাঁচ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সতেরো হাজার। উচ্চতা ৫,৪৯৪ ফুট ও বৃষ্টিপাত ৩৭ ইঞ্চি—অন্যান্য শৈলাবাসের চেয়ে অল্প। এখানে কুয়াশাও কম। স্কুল কলেজ বাজার পোস্টঅফিস ইত্যাদি শহরের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর ছাড়া এখানে আছে চাঁদরাজাদের প্রাচীন দুর্গ, নরসিংহবাদী, বদ্রীনাথ, বদ্রীশ্বর, বলেশ্বর, রত্নেশ্বর, রঘুনাথ, মহাবীর, মূরলী মনোহর, ভৈরব, ত্রিপুরাসুন্দরী, পাতালদেবী, কাসারদেবী, সিয়াহীদেবী, উল্কাদেবী ও নন্দাদেবীর মন্দির। আছে শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির। আর আছে কৌশিকী দেবীর মন্দির। শহর থেকে আট মাইল দূরে কাষায় পাহাড়ে অবস্থিত। শুম্ভ নিশুম্ভকে নাশ করার জন্য পার্বতীর শরীর থেকে কৌশিকী দেবী আবির্ভূতা হন। চারিপাশের প্রত্যেকটি পাহাড়ের শীর্ষেই একটি করে মন্দির আছে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে আলমোরা থেকে ২৫০ মাইল বিস্তৃত তুষারাবৃত হিমালয়কে

দেখা যায়। এই তুষারময় শৃঙ্গমালার মধ্যে আছে—নন্দাঘুন্টি (২০,৭০০), ত্রিশূল (২৩,৪০৬), নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫), নন্দাকোট (২২,৫১০), কেদারনাথ (২২,৭৭০), চৌখাম্বা (২৩,৪২০), নীলকণ্ঠ (২১,৬৫০), কামেট (২৫,৪৪৭), গৌরীপর্বত (২২,০২৭), হাতিপর্বত (২২,৩৭০), নৌলফু (২১,৪৪৬), পঞ্চচুলী (২২,৬৫০) এবং নেপালের অপি (২৩,৩৯৯) ও নামপা (২২,১৬২)।

বেলা ন'টায় রানীক্ষেত থেকে আমাদের বাস ছেড়েছে। এখন বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। ২৯ মাইল আসতে আমাদের প্রায় তিন ঘণ্টা লেগেছে। পাহাড়ী পথে এটাই বাসের স্বাভাবিক গতিবেগ। দৈনিক ছ'খানি বাস যাতায়াত করে আলমোরা ও রানীক্ষেতের মধ্যে। রানীক্ষেত থেকে প্রথম বাস ছাড়ে সকাল সাড়ে সাতটায়। আমাদের ইচ্ছে ছিল সেই বাসেই রওনা হব। কিন্তু মেজর কিছুতেই ছাড়লেন না। কাল দ্বারাহাট থেকে ফিরে এসে আমরা তাঁর অতিথি হিসেবেই হোটেলে ছিলাম। আজও সকালে তিনি বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এসেছেন। বাস ছেড়ে দেবার পরে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছেন। মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোক সত্যই বড় স্নেহপ্রবণ। কিন্তু স্নেহের জন তাঁর নেই এ সংসারে।

বাসে বসে আজ কিন্তু আমরা ঝিমোবার চেষ্টা করি নি। মনে মনে কুমায়ুনের ইতিহাস পর্যালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল দিবালোকে দুচোখ ভরে দুপাশের দৃশ্য দেখেছি। দেখেছি উপত ও কালিকা এবং মাঝখালির রমণীয় সৌন্দর্য। আলমোরা বাসপথের ওপরে, রানীক্ষেত থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে উপত ও কালিকা। উপতের গলফ কোর্টটি দেখবার মত। রানীক্ষেত ক্লাব এটির মালিক। এখানে কয়েকটি ফুলের বাগান, একটি ফরেস্ট নাশরী ও কালীমন্দির আছে।

আরও সাড়ে চার মাইল এগিয়ে আমরা দেখেছি মাঝখালি—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেখান থেকে তুষারাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য সুন্দর। সেখানে কৃষি বিভাগের একটি খামার আছে।

আলমোরা বাস স্ট্যাণ্ডটিও নৈনিতালের মতই জমজমাট। এখান থেকে বাস যায় কাঠগুদাম, বেরিলী ও দিল্লী, নৈনিতাল, রানীক্ষেত, দ্বারাহাট, বিনসর ও পিথোরাগড়। যায় সোমেশ্বর ও কৌসানী হয়ে গড়ুর—বৈজনাথ। গড়ুর থেকে একটি বাসপথ গেছে বাগেশ্বর হয়ে কাপকোট ও সামাধুরা। আর একটি গোয়ালদাম—আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল।*

যথারীতি অসিতবাবু ও মোহিত মালপত্র বুঝে নিয়ে কুলি ঠিক করে ফেলেছে। আমরা ওদের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে চলি হোটেলের দিকে। আলমোরায় অনেক হোটেল আছে। এদের মধ্যে অ্যামব্যাসাডর, অশোকা, মানস-সরোবর, নিউ হিমালয় ও টুরিস্ট হোমের নাম উল্লেখযোগ্য। সব হোটেলেই থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। তবে অধিকাংশ হোটেলেই খাওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়। হোটেল ছাড়া জেলা পরিষদের ডাকবাংলো ও সার্কিট হাউস রয়েছে। ডাকবাংলোটির অবস্থান বড়ই সুন্দর। কয়েকটি ধর্মশালাও আছে। এদের মধ্যে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমের ধর্মশালাটি উল্লেখযোগ্য।

প্রধান পথটি অর্ধবৃত্তাকারে শহরকে বেষ্টন করেছে। পথের ওপরে ও নিচে কূর্মাকৃতি পাহাড়ের গায়ে গড়ে উঠেছে এই শৈলাবাস—কূর্মাচলের কেন্দ্রভূমি। গড়ার কাজ শুরু হয়েছে

---

* লেখকের 'গিরি-কান্তার' দ্রষ্টব্য।

সেই ষোড়শ শতাব্দীতে, আজও শেষ হয় নি। শহর এখনও বড় হচ্ছে। ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে চতুর্দিকে।

প্রধান পথ থেকে অসংখ্য ছোট বড় পথ ওপরে ও নিচে বিস্তৃত হয়েছে। পথের পাশে পাইন দেওদার ওক বৃক্ষের সমারোহ। তবে শহরের স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিজেদের আধিপত্য ফেলছে হারিয়ে। বনের সঙ্গে জনপদের সম্পর্ক কোন কালেই মধুর নয়।

আলমোরা প্রাচীন শহর। কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। ভারতের শৈলাবাসগুলির মধ্যে আলমোরায় শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশী। সেকালে যেমন আলমোরার চাঁদরাজারা কুমায়ুনকে শাসন করেছেন, একালেও তেমনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আলমোরায় জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে পরলোকগত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বিখ্যাত হিন্দী কবি সুমিত্রানন্দন পাণ্ডে ও কমিউনিস্ট নেতা পুরনচাঁদ জোশীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আরও একজনের নাম না করলে আলমোরার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি স্বামী প্রণবানন্দ। স্বামীজী আলমোরার লোক নন। এমন কি তিনি হিমালয়ের অধিবাসী পর্যন্ত নন। তাঁর আদিনিবাস হিমালয় থেকে বহু দূরে—অন্ধ্র রাজ্যে। ১৮৯৬ সালে পূর্ব গোদাবরী জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কণকদণ্ডী ভেঙ্কট সোময়াজুলু। ১৯১৯ সালে লাহোর ডি. এ. ভি. কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে অল্প কিছুদিন রেলওয়ে অ্যাকাউন্টসে কাজ করেন। কিন্তু দেশের ডাকে তাঁর পক্ষে বেশীদিন চাকরি করা সম্ভব হয় নি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিম গোদাবরী জেলার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। তারপরেই দেবতাত্মা হিমালয়ের আহ্বান তাঁকে আকুল করে তুলল। ঘর-সংসার ও রাজনীতি রইল পড়ে, তিনি চলে এলেন হিমালয়ে। আচার্য শ্রী ১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে কণকদণ্ডী হলেন প্রণবানন্দ। সেই থেকে তিনি আলমোরাবাসী।

কিন্তু প্রণবানন্দ সাধারণ সন্ন্যাসীদের মত এক জায়গায় বসে সাধনভজন করেই সময় কাটান না। হিমালয়ের মধ্যেই তিনি তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন। তাই এই সত্যশ্রয়ী সন্ন্যাসী গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে হিমালয়ের দুর্গমতম অঞ্চলে ভ্রমণ করে দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে চলেছেন। এই সব অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ আজ বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত।

কিন্তু এই সম্পদ আহরণের জন্য তাঁকে যে অমানুষিক দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ১৯২৮ সালে কাশ্মীরের লাদাক ও গার্তোক হয়ে তিনি প্রথম কৈলাস-মানসসরোবর দর্শন করেন। সেই থেকে চীনা আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই তিনি কৈলাস-মানসসরোবর পরিক্রমা করেছেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে যাঁরাই ভারত থেকে কৈলাসে গিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই হয় তাঁর সহযাত্রী হয়েছেন, নয় তাঁর কাছ থেকে যাত্রাপথের বিবরণ জেনে নিয়েছেন।

আগেই বলেছি আমার সহযাত্রীদের মধ্যে একমাত্র অমিতাভই কৈলাস-মানসসরোবর দর্শন করেছে।* তার সহযাত্রী ছিল সফল নন্দাঘুন্টি অভিযানের নেতা সুকুমার রায়। তারা প্রণবানন্দের সঙ্গে যায় নি কিন্তু পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেই বছরই (১৯৫৭) শ্রীবুদ্ধ

---

* লেখকের 'গিরি-কান্তার' দ্রষ্টব্য।

বসু ও সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল কৈলাস-মানসসরোবরে যান। তাঁদের সঙ্গেও পথে প্রণবানন্দের দেখা হয়েছিল।

প্রণবানন্দ ১৯৩৪-৩৫ সালে এক বছর গঙ্গোত্রীতে বাস করেছেন। তিনি ১৯৩৬-৩৭ সালে এক বছর ও ১৯৪৩-৪৪ সালে একসঙ্গে ষোল মাস থুগোলহো মঠে (মানসসরোবরের দক্ষিণ তীর) কাটিয়েছেন।

প্রণবানন্দ ঈশ্বর-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের এই সব দুর্গম অঞ্চলের ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক, প্রাণীতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও উদ্ভিদবিদ্যাবিষয়ক গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর রচিত 'একসপ্লোরেশন ইন টিবেট' গ্রন্থটি ১৯৪২ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের পাঠ্যপুস্তক। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত পুস্তক 'কৈলাস-মানসসরোবর'। এই বইখানি তিনি প্রথমে হিন্দী ও পরে ইংরেজীতে রচনা করেন।

প্রণবানন্দের কথা মনে হলেই কৈলাসের কথা মনে আসে। কৈলাস একটি লিঙ্গাকৃতি (tetrahedronal) তুষারময় পর্বতশিখর (২২,০২৮)। দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতে অবস্থিত। বর্তমান তিব্বতী নাম কাং-রিম-পোচে। তবে বিখ্যাত ভৌগোলিক শ্রীশরৎচন্দ্র দাশ* তাঁর তিব্বতী অভিধানে (Tibetan English Dictionary) এই পর্বতকে 'তিস্‌রে' নামে অভিহিত করেছেন। কৈলাস পর্বতমালা কাশ্মীর থেকে ভুটান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালা লাদাক পর্বতশ্রেণীর সমান্তরাল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। দুই পর্বতশ্রেণীর দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল।

সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ রাকাপোশী (২৫,৫৫০)। এই পর্বতমালার লাছু ও ঝণ্ডু পর্বতদ্বয় বেষ্টিত অংশকে কৈলাসপর্বত বলে। পর্বতের উত্তরাংশে কৈলাস শিখর—হর্ণব্লেন্ডিক (hornblendic) ও গ্র্যানাইট পাথরে গঠিত। ওপরে আর্কোজ (arkose), বালিপাথর ও পিণ্ডিভূত শিলার (conglomerate) ৬৫০০ ফুট পুরু আস্তরণ আছে। সমুদ্র থেকে উঠে আসার পরে (cretaceous period) এই আস্তরণ প্রায় দ্বিগুণ পুরু ছিল।

কৈলাসপর্বতের বয়স প্রায় ৫৫ লক্ষ বছর। পর্বতে ইয়োসিন (Eocene) যুগের পরবর্তীকালে কোন শিলা পাওয়া যায় না। কৈলাস পর্বতের প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণে রাক্ষস তাল (রাবণ হ্রদ) ও মানসসরোবর। মানসসরোবরের দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল ও পরিধি ১৩৩ বর্গমাইল আর রাক্ষস তালের দৈর্ঘ্য ১৯ মাইল ও পরিধি ১০০ বর্গমাইল। আয়তনের দিক থেকে তিব্বতীয় হ্রদগুলির মধ্যে এদের স্থান যথাক্রমে উনিশ ও একুশ।

আরও দক্ষিণে গুর্লা মান্ধাতা শৃঙ্গ (২৫,৩৫৫)। এই অঞ্চল বহু নদীর উৎস। এদের মধ্যে চারটি প্রধান নদী হচ্ছে, সিন্ধু বা সেঙ্গে, শতদ্রু বা লাংচেন, ব্রহ্মপুত্র বা সাংপো ও সরযূর অন্যতম উৎস কার্ণালী বা মাপচা। সিন্ধু বেরিয়েছে কৈলাস পর্বতের উত্তরে সেঙ্গে-খাম্বাব থেকে, শতদ্রু রাক্ষস তালের পশ্চিমে দর্ম গিরিবর্ত্ম থেকে, ব্রহ্মপুত্র মানসসরোবরের পূর্বে তামচোক-খাম্বাব-কাংরী থেকে, আর কর্ণালী বেরিয়েছে মানসসরোবরের দক্ষিণে লামপিয়া গিরিবর্ত্ম থেকে।

এই অঞ্চলের আবহাওয়া অত্যন্ত শীতল, শুষ্ক ও বায়ুপ্রবাহপূর্ণ। তাপমাত্রা—সর্ব্বোচ্চ ১৯·৪° (জুলাই) ও সর্বনিম্ন ১৬·৭° (ফেব্রুয়ারী) সেন্টিগ্রেড। দেরিতে শুরু হলেও প্রচুর বৃষ্টিপাত

---

* লেখকের 'গিরি-কান্তার' দ্রষ্টব্য।

হয়। ক্ষুদ্রাকার রঙিন ফুল, ধূপের গন্ধযুক্ত লতাগাছ ও ঘাস জন্মায়। সোনা, সোহাগা, লবণ, আর্সেনিক ও সোডা, ক্ষার, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

বেদ পুরাণ রামায়ণ ও মহাভারতে কৈলাসের অসংখ্যবার উল্লেখ আছে। মহাভারতে কৈলাস পর্বতকে হেমকূট বলা হয়েছে। মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে নানারত্নময় শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্বত শিবালয়। বিখ্যাদপুরাণ, বরাহপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কৈলাসমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই সব ধর্মগ্রন্থের মতে কৈলাস হর-পার্বতী যক্ষপতি কুবেরের বাসস্থান।

খৃষ্টপূর্ব ২৬৯ সালে কুমায়ুনের রাজা নন্দীদেব সম্রাট অশোকের আদেশে উন্টাধুরা গিরিবর্ত্ম দিয়ে পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করেন এবং কৈলাসসহ সমস্ত মানসসরোবর অঞ্চল দখল করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (৬৩৫ সাল) লিখেছেন যে, সে সময় কুমায়ুনের রাজারা পশ্চিম তিব্বতে রাজত্ব করতেন। পাণ্ডুকেশ্বরের তাম্রশাসন অনুসারে জোশীমঠের কাত্যুরীরাজা ললিত শূরদেব (৯৪৫-৯৬০ সাল) ও দেশত দেব হূনদেশ (মানসখণ্ড) দখল করেন।

আধুনিক যুগে (১৬২৬ সালে) পর্তুগীজ জেসুইট ফাদার অ্যান্টোনিও দ্য আন্দ্রাদে (Father Antonio de Andrade) শতদ্রু নদীর উৎসের কাছে ছাবরং-য়ে একটি গীর্জা তৈরি করেন। জেসুইটদের সাহায্যে ফরাসী ভৌগোলিক দ্য আনভিল (d'Anville) কৈলাসের প্রথম মানচিত্র অঙ্কন করেন। এই মানচিত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৩৫ সালে। তবে ১৮৬৬ সালে সর্বপ্রথম কৈলাসের সঠিক ভৌগোলিক বিবরণ রচনা করেন পণ্ডিত মৈন সিং।

পথপ্রদর্শক চেতনের সঙ্গে কর্নেল আর. জি. উইলসন ও সস্ত্রীক হিউ বাটলেজ ১৯২৬ সালে কৈলাস পরিক্রমা করেন। পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক পর্যবেক্ষণ করে উইলসন অভিমত দেন যে, পূর্ব গিরিশিরা ধরে কৈলাস শিখরে আরোহণ করা সম্ভব। অবশ্য এই পর্বতে কোন অভিযান পরিচালিত হয় নি। এমন কি কোন বিশদ সরকারী জরীপ পর্যন্ত হয় নি। তবে ইদানীং চীনারা কিছু করেছে কিনা তা জানি না। শুনেছি কৈলাস পর্বতের পাদদেশে সমতলভূমিতে চীনারা নাকি একটি নতুন শহরের পত্তন করেছে। এবং সিন্ধুর উৎসমুখের কাছে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে।

শিবালয় কৈলাস ভারতীয় হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং তিব্বতীদের পুণ্যতম পর্বতশিখর। ভারত থেকে কৈলাসে যাবার বারোটি পথ আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি পথ হল—

আলমোরা-পিথোরাগড়-গারবিয়াং-লিপুলেখ গিরিবর্ত্ম (১৬,৭৫০´)-তাকলা-কোট-মানস-সরোবর-তারছেন (কৈলাস)। ২৩৮ মাইল।

আলমোরা-সামাধুরা-মুনসিয়ারী-মিলাম-উন্টাধুরা (১৭,৯৫০´) জয়ন্তী (১৮,৫০০´)-কাংরী বিংরি (১৮,৩০০´)-গিরিবর্ত্ম-জ্ঞানিমামণ্ডি-তারছেন (কৈলাস)। ২০০ মাইল।

তারছেন গারবিয়াং থেকে ৯৩ মাইল ও মুনসিয়ারী থেকে ১৩৩ মাইল। কৈলাস পর্বত পরিক্রমা করতে হলে আরও ৩৩ মাইল হাঁটতে হয়।

শেষ পর্যন্ত একটি ফ্যামিলি সুট পাওয়া গেল। দুখানি বেডরুম ও বাথরুম নিয়ে সুট। বলতে গেলে এর পরেই আমাদের দুর্গম যাত্রা শুরু হবে। কাজেই শেষ তিনটি দিন একটু আরাম করে নেবার জন্যে ম্যানেজার খরচের রাশ কিছুটা আলগা করে দিয়েছে।

কিন্তু আরাম চাইলেই কি পাওয়া যায়? কোথায় নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় গা এলিয়ে

দিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেব তা নয়। হঠাৎ প্রাণেশ বিনীত কণ্ঠে বলে ওঠে, "বায়নোকুলারটা বাসে ফেলে এসেছি।"

"সে কি ? কেমন করে ?" সবাই আঁতকে উঠি।

"কাঁধ থেকে নামিয়ে সামনের সীটের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম। বাস থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছি।"

বিস্মিত হই। বায়নোকুলার হারানোটা কি আমাদের একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়াল ? আগের বায়নোকুলারটি গেছে সেবার বদ্রীনাথে ('পঞ্চপ্রয়াগ' দ্রষ্টব্য)। সেদিন ঈশীর প্রয়োজনের কথা ভেবে বায়নোকুলারের জন্যে তেমন দুঃখবোধ করি নি। কিন্তু আজ ? কিন্তু আজ যে একেবারেই অদানে অব্রাহ্মণে গেল জিনিসটা। কিন্তু কি বলব ? এমনিতেই প্রাণেশ বেচারা লজ্জায় আধমরা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হল, পাওয়া যাক কি না-যাক, একবার বাস স্ট্যাণ্ডে খোঁজ করা উচিত। প্রাণেশ ও দাশুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি ছুটে আসি বাস স্ট্যাণ্ডে।

কিন্তু বৃথা। আমরা যে বাসে এসেছি, সে বাস ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে রানীক্ষেত। কেউ কোন বায়নোকুলার জমা দেয় নি কর্তৃপক্ষের কাছে। কেনই বা দেবে ? অমন জিনিস হাতে পেলে কেউ কি ছেড়ে দেয় ? তবে আমাদের যে বড়ই অসুবিধে হবে। ঐটিই আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। কিন্তু কি করব ?

বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসি হোটেলে। মোহিত ও অমিতাভ ইতিমধ্যে সব গুছিয়ে নিয়েছে। আমরা আসতেই খাবারের ফরমাশ দেয়।

খেতে বসে খেয়াল হল—মেজরকে একটা ফোন করলে কেমন হয় ? সবাই সম্মতি জানায়। খাওয়ার পরে অসিতবাবু প্রাণেশ ও সুজলকে নিয়ে বেরিয়ে যায় পোস্ট অফিসে। এ হোটেলে ফোন নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা ফিরে এল। সৌভাগ্যবশত মেজরকে হোটেলেই পাওয়া গেছে। তিনি কথা দিয়েছেন খোঁজ করে দেখবেন। তবে পাবার সম্ভাবনা যে খুবই কম, সে কথাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

"যা যাবার তা গেছে। আর কতক্ষণ বসে থাকবে ? চল এবার বেরিয়ে পড়া যাক।" দাশরথির কথাটা সকলের মনঃপূত হয়। সাজো-সাজো রব পড়ে যায়।

আমরা বেরিয়ে পড়ি পথে—রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের প্রীতিধন্য আলমোরার পথে। তাঁরা আলমোরাকে আদর্শ সাধনভূমিরূপে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

পথের দুধারে হোটেল ও বড় বড় দোকান। কিছুদূর এসে মিউনিসিপ্যাল অফিস। পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠে এলাম ওপরে। এদিকটাই প্রাচীন শহর। বাড়িগুলো দোতলা থেকে চারতলা উঁচু। পাথর ও কাঠের তৈরি। নিচের তলায় দোকান, ওপরে বাসগৃহ। নিচু নিচু ঘর, ছোট ছোট দরজা। জানালার সংখ্যা খুবই কম। দরজায় নানারকমের কারুকার্য। পাথরে বাঁধানো রাস্তাগুলোও মোটামুটি সোজা।

পৌঁছলাম বাজারে। চারটি বাজার আছে আলমোরায়—লালবাজার কৃষ্ণবাজার মল্লীবাজার ও মলবাজার। আমরা বাজারে এসেছি দেখতে, কেনাকাটা করতে নয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। শেষ পর্যন্ত দোকানদারের তাগাদায় তিষ্ঠোতে না পেরে এগিয়ে চলি ব্রাইটন-এণ্ড-কর্ণারের দিকে। সেখান থেকে নন্দাদেবী নন্দাকোট পঞ্চচুলী ত্রিশূল ও চৌখাম্বা প্রভৃতি কয়েকটি শৈলশিখরকে বড়ই সুন্দর দেখায়। বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময়—প্রতি মুহূর্তে তারা নতুন

রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। আমরা সেই অপরূপ রূপ দেখতে চলেছি। আহা, যদি বায়নোকুলারটা থাকতো.....

॥ এগারো ॥

সকালের জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি পথে, চলেছি কাসারদেবীর মন্দির দর্শন করতে। আলমোরা থেকে হাঁটাপথে চার মাইল। তাই সকাল সকাল রওনা হয়েছি। নইলে রোদ চড়ে যাবে, ফিরে আসতে কষ্ট হবে। পথে পড়বে সিমতোলা ও কালিমঠ।

সিমতোলা এখান থেকে আড়াই মাইল—অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি চমৎকার চড়ুইভাতির জায়গা।

সিমতোলা থেকে আরও এক মাইল এগিয়ে কালিমঠ—কালো মাটির দেশ। মাটি কালো বলেই নাম হয়েছে কালিমঠ। আশেপাশে কোথাও কিন্তু এমন কালো মাটি নেই। এটিও চড়ুইভাতির একটি আদর্শ স্থান। এখান থেকে একদিকে দেখা যায় হিমালয়ের কয়েকটি তুষারাবৃত পর্বতশিখর, আর একদিকে শিখরনগরী আলমোরা।

কালিমঠ থেকে মাত্র আধ মাইল পাকদণ্ডী ভেঙে কাসারদেবী—কুমায়ুনের একটি বিখ্যাত মন্দির। পথটুকু সামান্য কিন্তু মোটেই সহজ নয়। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেশ চড়াই-পথ বেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় পুরনো মন্দির। এখান থেকেও হিমালয় ও আলমোরা শহরের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। এই দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েই বহু সন্ন্যাসী কাসারদেবীকে তাঁদের সাধনভূমি নির্বাচিত করেছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশী সাধকও আছেন। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার ডক্টর ইভান্স ওয়েণ্টেজ-য়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পাইন বনাবৃত দশ একর জমি কিনে একটি ছোট আশ্রম তৈরি করেছেন।

আরও একজন এই সৌন্দর্যনিকেতনকে তাঁর সাধনপীঠ রূপে নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি জগৎবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ভারত-গৌরব উদয়শঙ্কর। ১৯৩৮ সালে তিনি কাসারদেবীতেই তাঁর কলাকেন্দ্র 'Udayshankar India Culture Centre' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খাদ্যাভাব, যানবাহনের অসুবিধে ও অন্যান্য কারণে ১৯৪৩ সালে এই শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়।

এই জাতীয় কেন্দ্র ভারতে এই প্রথম। কারণ এটি কেবল নৃত্যকলা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের দৈহিক ও মানসিক মান উন্নয়নই ছিল এই কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই বহু ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এমন কি ব্যবসায়ী পর্যন্ত এখানে শিক্ষা-গ্রহণ করতে আসতেন। এঁদের অনেকেই এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুদীর্ঘ ৪৫ বছরের সাধনায় উদয়শঙ্কর এই দৈহিক ও মানসিক মান উন্নয়নের পদ্ধতিটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে মানুষ সহজেই আত্মোপলব্ধি করতে পারে। গৌরবের কথা পাশ্চাত্ত্য জগৎ বিশেষ করে আমেরিকা এই পদ্ধতিকে সার্থক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং সেখানে এর চর্চা চলেছে কিন্তু দুঃখের কথা শিল্পীর সেই সাধনপীঠ আজ শ্মশানে পরিণত।

কাসারদেবীর দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন মুক্তি-সন্ধানী বিবেকানন্দ। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ভারত পরিক্রমাকালে স্বামীজী পৌঁছলেন আলমোরা। বদ্রী শাহ-র আতিথ্য গ্রহণ

করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মনে তপস্যা করার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে একটি ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম ছাড়িয়ে এক নির্জন গুহায় গিয়ে পৌঁছলেন—দিবারাত্র তপস্যায় রত হলেন। গুহাটির প্রকৃত অবস্থান কারও সঠিক জানা নেই। তবে সম্ভবত এটি কাসারদেবীর কাছে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত, এই ধারণা থেকে একটি গুহার প্রবেশপথ বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্মবীর বিবেকানন্দের পরবর্তী জীবনে এই তপস্যা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, "Nothing in my whole life ever so filled me with the sense of work to be done. It was as if I were thrown out from that life of solitude, to wander to and fro in the plains below."

নাতিপ্রশস্ত জনবিরল পাহাড়ী পথ বেয়ে আমরা মনের আনন্দে চলেছি এগিয়ে। বাড়ি-ঘর এসেছে কমে। এদিকটাকে শহরতলী বলা যেতে পারে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। ভোরের মিঠে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে পথে আর পথের পাশের ঝোপঝাড়ে, পাইন ও দেওদার বনের আনাচে-কানাচে। ঝরণার কলতানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোয়েল বুলবুল তোতা আর ময়নার দল কাকলী দিয়েছে জুড়ে। পথের ধারে ছোট ছোট কুঁড়ে থেকে মোরগের ডাক আসছে ভেসে। আবার কখনও বা কাঠঠোকরার ঠকঠক শব্দ কিম্বা কাকের কর্কশ স্বর এসে আঘাত করছে কানে। পাখির গান আর ঝরণার কলতানের তাল যাচ্ছে কেটে। সঙ্গীতমুখর জগতের অস্তিত্ব ফেলছি হারিয়ে। কিন্তু বিরক্ত বোধ করছি না। কারণ মোরগ পেঁচা কাক আর কাঠঠোকরাই এখানকার স্থায়ী পাখী। কোয়েল বুলবুল তোতা আর ময়না 'বসন্তের কোকিল'। শীত শেষ হলে ওরা আসে আলমোরায়। আবার গ্রীষ্মের শেষে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কোন অজানা দেশে। এরা অসময়ের বন্ধু নয়।

মাঝে মাঝে ডালে ডালে বানর ঝুলছে। ঝোপের আড়ালে দু-একটি খরগোশও চোখে পড়ল। বানর খরগোশ গরু ভেড়া বাঘ ভালুক ও কাকরমৃগ আলমোরা জেলার স্থায়ী পশু। গ্রীষ্মকালে মাছির উপদ্রব হয়। আলমোরায় সাপও দেখা যায়।

পথ জনবিরল হলেও পথ জনহীন নয়। আর বিরল বলেই হয়তো ওদের এত ভাল লাগছে। ছোট ছোট দল বেঁধে পাহাড়ী মেয়েরা চলেছে বনে ; যাচ্ছে কাঠ কাটতে কিম্বা ঘাস আনতে। দিনের শেষে সূর্য যখন ঐ পশ্চিম দিগন্তের কোলে পড়বে ঢলে, তার সোনালী আভায় রাঙিয়ে দেবে শুভ্র মেঘদলকে আর শ্বেতশুভ্র হিমালয়কে, ওরা তখন কাঠ কিম্বা ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে ফিরবে ঘরে। কিন্তু তখনও ওদের পদসঞ্চারে নৃত্যের ছন্দ থাকবে, কণ্ঠে থাকবে গানের সুর। পর্বতপ্রমাণ বোঝা পিঠে নিয়ে ওরা এমনি কলহাস্যে ভরে তুলবে চারিদিক। দুঃখ ওদের নিত্যসঙ্গী বলেই ওরা দুঃখজয়ী, কান্না ওদের জীবন-সাথী বলেই ওরা হাস্যময়ী। হাসি ওদের জীবন-যুদ্ধের হাতিয়ার। সুরের পূজারী না হলে যে অ-সুরের সঙ্গে সংগ্রাম করা যায় না।

নাচ ও গান কুমায়ুনীদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তাই পূজোপার্বণে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ওরা নাচ-গানের আসর বসায়। এই আনন্দ-বাসর ওদের জীবন-পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। এই নৃত্য-গীতের মধ্য থেকে ওদের প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তি ও গভীর মানব-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ বছরে দু-তিনবার ওরা সামাজিক নৃত্য-গীতের আসর বসায়। এই সময় ওরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশা বিস্মৃত হয়ে, ছন্দে ও গানে জীবনকে মধুময় করে তোলে।

কুমায়ুনের সামাজিক জীবনে মেলাই শ্রেষ্ঠ আনন্দের আসর। আগেই বলেছি কুমায়ুনের প্রত্যেকটি বড় বড় জনপদে ও পুণ্যস্থানে বছরে অন্ততঃ একবার করে মেলা বসে। সবচেয়ে বড় হল বাগেশ্বরের * উত্তরায়ণীর মেলা। এটা মূলতঃ ধর্মীয় মহাসম্মেলন হলেও এর অর্থনৈতিক অবদান কম নয়। সে বিচারে একে 'ইণ্ডাস্ট্রিজ ফেয়ারও' বলা যেতে পারে। প্রতি বছর মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে সরযূ ও গোমতীর সঙ্গমে এই মেলা বসে। পশমজাত দ্রব্য, উল ফার (fur), মধু ও মৃগনাভি নিয়ে শত শত ব্যবসায়ী সমবেত হয়। আর দূরদূরান্তর থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসে পুণ্যস্নান করতে। আসে আশেপাশের গাঁয়ের লোক—তাদের রঙীন জমকালো পোশাক পরে।

উত্তরায়ণীর পরেই হল নন্দাদেবীর মেলা। নন্দাদেবীর মেলা একটি নয়—চারটি। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে নৈনিতাল ভাওয়ালী রানীক্ষেত ও আলমোরায় এই মেলা বসে, তবে আলমোরার মেলাই হল সবার সেরা।

নন্দাদেবীর পরেই থল মেলার স্থান। থল বাসপথে আলমোরা থেকে ১০৩ মাইল—বাগেশ্বর হয়ে যেতে হয়। কিন্তু হাঁটাপথে বেরিনাগ হয়ে মাত্র ৫১ মাইল। এটিও উত্তরায়ণীর মত ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক সম্মেলন। চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে এই মেলা বসে।

এই গেল বড় বড় মেলার কথা। এ ছাড়াও অসংখ্য ছোট মেলা বসে বিভিন্ন জায়গায়। তাদের উপলক্ষ ভিন্ন কিন্তু প্রকৃতি অভিন্ন। মেলা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, সেখানে পূজোপার্বণ হয়, কেনা-বেচা হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি জিনিস হয়—নাচ ও গান। পেশাদার শিল্পীদের নৃত্যনাট্য নয়, সাধারণ মানুষের আনন্দ-আসর। তারা তাদের রঙীন পোশাক পরে পণ্য কিংবা টাকা নিয়ে মেলায় আসে। কেনা-বেচার শেষে মেলার অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় গোল হয়ে হাত-ধরাধরি করে নাচগান শুরু করে দেয়। দূর থেকে মনে হয়—মনুষ্যদেহের একটি দুর্ভেদ্য ব্যূহ, ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে, শক্ত করে একে অন্যকে ধরে আছে। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায় ওরা স্বচ্ছন্দে অঙ্গ দুলিয়ে ঘুরে-ফিরে নাচ-গান করছে। সাধারণতঃ বড় বড় মেলার নাচে মেয়েরা অংশগ্রহণ করে না, তবে তারা কাছে দাঁড়িয়ে গান গায় ও তালে তালে হাততালি দেয়।

তাই বলে ওদের এই নৃত্যগীত যন্ত্র-সঙ্গীতহীন হয়। তিন-চারজন বাজনদার নৃত্যশিল্পীদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ঢোল (হুরকা) ও বাঁশী বাজায়। তারাই প্রকৃতপক্ষে এই নৃত্যনাট্যের পরিচালক। কিন্তু শ্রোতারাও নীরব দর্শক নয়। প্রথমে ছেলেরা চড়া গলায় একটি পদ গায়। তার পরে মেয়েরা খাদে নামিয়ে সেই পদটি আবার গায়। সাধারণতঃ এই সব গানের বিষয়বস্তু থাকে অতীতের কোন গৌরবময় বা বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী। মিলনের আনন্দ বা বিরহের ব্যথা মূর্ত হয়ে ওঠে তাদের নাচের ছন্দে ও গানের সুরে। এইভাবে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ধরে চলে নাচ-গান। কেউ শ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে সে ছুটি নেয়, অন্য কেউ তার শূন্যস্থান পূর্ণ করে। সাধারণতঃ শীতের সময় এই সব আসর বসে, তাই শরীরটাকে ও মনটিকে চাঙ্গা রাখার জন্য সমবায় ভিত্তিতে মদ মাংস ও রুটির ব্যবস্থা থাকে।

এছাড়াও আরেক রকমের নাচ আছে কুমায়ুনী সমাজে। এই নাচকে বলে ছোলিয়া। এই নাচ হয় বিবাহ উপলক্ষে। তবে সব বিয়েতে নয়—কেবল ঠাকুর রাজপুতদের বিয়েতে। কনে-

---

* লেখকের 'গিরি-কান্তার' দ্রষ্টব্য।

বাড়ি যাবার সময় বরযাত্রীদের পুরোভাগে থাকে এই নৃত্যশিল্পীর দল। থাকে যোদ্ধার বেশে। তাদের নাচ দেখে মনে হয় যেন সত্যি-সত্যিই যুদ্ধ লেগে গেছে এবং তারা জয় করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। যাবার সময় তাদের সঙ্গে থাকে লাল পতাকা—যুদ্ধের প্রতীক। কিন্তু ফেরার সময় সাদা পতাকা—শান্তির প্রতীক।

কেমন করে এই নাচ ওদের বিবাহ-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হয়ে গেল তা বলা শক্ত। তবে এই নাচ সে যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যে যুগে বসুন্ধরা ছিল বীরভোগ্যা। সেকালের ক্ষত্রিয়রা প্রয়োজনে যুদ্ধ করে প্রেয়সীকে জয় করে নিয়ে আসতেন। ক্ষাত্রযুগ বিগত হয়েছে, ক্ষাত্রতেজও আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু লোক-সংস্কৃতি আজও সযত্নে সেই স্মৃতিকে রক্ষা করে চলেছে।

এই সংস্কৃতি কুমায়ুনের অতি প্রাচীন সম্পদ। জাতি উপজাতি ও বর্ণ-বিভেদের মিলন সূত্র। সরল কুমায়ুনীদের ঈশ্বরভক্তির মূল উৎস।

হোটেলে পা দিয়েই সকলে বিস্ময়ে ও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠি, "আপনি ? কখন এলেন ?"

"তা প্রায় ঘণ্টাখানকে হল।" মেজর হোটেল ম্যানেজারের দিকে তাকান। তিনি মাথা নাড়েন।

"কিন্তু এখানে বসে আছেন কেন ?"

"কি করব ? ম্যানেজার তো আমাকে চেনেন না। তোমাদের ঘরে ঢুকতে দেবেন কেন ?"

তাও তো বটে। বড়ই লজ্জা পাই। ইচ্ছে করলে আমরা আরও আগে ফিরতে পারতাম। তবে বুঝব কেমন করে যে, বলা নেই কওয়া নেই তিনি এমনি হুট করে এসে পড়বেন।

মেজর আবার বলেন, "তবে তোমাদের লজ্জিত হবার কিছু নেই। ম্যানেজার ঘরে ঢুকতে দেন নি, কিন্তু খুব আদর-যত্ন করেছেন। চা খাইয়েছেন, আমার মালপত্র নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আরে। এই দেখ, আসল খবরটাই দেওয়া হল না।"

"কী খবর ?" আমরা কৌতূহলী।

"সুখবর। তোমাদের বায়নোকুলারটা পাওয়া গেছে। আর সেটা পৌঁছে দেবার জন্যই তো আসতে হল। কি করব ? চেনা-শোনা কাউকে পেলাম না। যার তার হাতে তো পাঠিয়ে দেওয়া যায় না। তোমরা যে আবার কালই বিনসর চলে যাবে। বায়নোকুলার না থাকলে তোমাদের অসুবিধে হবে।"

"না, কাল নয়। আমরা পরশু বিনসর যাচ্ছি।" অসিত বলে, "কিন্তু একটা টেলিগ্রাম করে দিলেই তো আমরা কেউ গিয়ে ওটা নিয়ে আসতে পারতাম। ছিঃ ছিঃ, বড্ডা লজ্জা দিলেন।"

"লজ্জা যদি পেয়েই থাকো, তাহলে সে লজ্জার কথা আর নির্লজ্জের মত প্রচার কোরো না। বরং লজ্জিত ভাবে আমাকে নিয়ে চল তোমাদের সজ্জিত ঘরে।"

মেজরের কথা ও ভঙ্গীতে আমরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি। তারপরে তাঁর হ্যাভারস্যাকটা নিয়ে ঘরে আসি। একটু বিশ্রাম করে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসি। চলে গাল-গল্প হাসি-ঠাট্টা। কে বলবে মেজর আমাদের সমবয়সী নন, কে বলবে সাত দিন আগেও তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না!

খাওয়া-দাওয়ার পরে শুয়ে শুয়ে আড্ডা শুরু হয়। হঠাৎ দাশরথি বলে উঠল মেজরকে,

"তা এসেই যখন পড়েছেন, তখন সহজে ছাড়ছি না। পরশু পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সমানে চক্কর মারতে হবে।"

"কিন্তু পরশু নাকি তোমরা বিনসর যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে?"

"আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন।"

"সে কী..." মেজর শেষ করতে পারেন না।

"আমাদের দাবী—"

"মানতে হবে।" দাশরথির সঙ্গে আমরাও গলা মেলাই।

"তা না হয় মানলাম। তবে বিনসর যে আমার দেখা।"

"আপনার তো একথা সাজে না।" দাশু বলে, "হিমালয় কি কখনও পুরনো হয়?"

"তা হয় না।" মেজর বলেন।

"অতএব আপনি আমাদের সঙ্গে বিনসর যাচ্ছেন।" অমিতাভ বলে।

মেজর চুপ করে আছেন। আমরা উৎসুক নয়নে তাঁর দিকে রয়েছি তাকিয়ে। তিনি একবার আমাদের সবাইকে দেখে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে রায় দেন, "সুতরাং যাব।"

"হাসি থামলে মেজর আবার বলেন, "ব্যাপারটা কি জান?"

"কী?"

"তোমরা কি ভেবেছ, আমি কেবল এই বায়নোকুলারটা দেবার জন্যই রানীক্ষেত থেকে এখানে এসেছি?"

"তাহলে? আপনার কোন কাজ আছে নাকি আলমোরায়?" মোহিত জিজ্ঞেস করে:

"হ্যাঁ।"

"কি কাজ?" সুজল বলে।

"তোমাদের সঙ্গে আড্ডা মারা।"

আমরা আবার হেসে উঠি। মেজর বলেন, "তোমরা চলে আসার পর কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হচ্ছিল। তাই বায়নোকুলারটা পেয়ে আর সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না।"

চারটে বাজতেই বেরিয়ে পড়া গেল। এবেলা আমরা নন্দাদেবীর মন্দির, কুন্দন হাউস ও শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির দেখতে যাচ্ছি। কাল সকালে রামকৃষ্ণ আশ্রম দেখে যাব হীরাদুংরী, চিতাই ও মাতেলায়।

হীরাদুংরীতে 'V'-আকৃতির একটি হ্রদ ও ছোট একটি পার্ক আছে। বাসে আলমোরা থেকে দু মাইল।

চিতাই এখান থেকে বাসপথে চার মাইল। সেখানকার মন্দিরটি বিখ্যাত। প্রাকৃতিক দৃশ্য যে সুন্দর তা বলাই বাহুল্য।

মোটরপথে মাতেলা আলমোরা থেকে ছ মাইল। চড়ুইভাতির একটি আদর্শ স্থান। সেখানকার পাম্পিং স্টেশনের সংলগ্ন সুসজ্জিত বাগানটি দেখার মত। কাছেই রয়েছে হাওয়ালবাগের বিখ্যাত ফলের বাগানগুলো। মাতেলা থেকে তুষারাবৃত ত্রিশূল শৃঙ্গকে বড়ই সুন্দর দেখায়। এখানে রাত্রিবাসের জন্য একটি কাঠের বাড়িও আছে। জনপ্রতি দৈনিক ভাড়া দু টাকা।

আগেই বলেছি আলমোরার প্রধান পথটি অর্ধবৃত্তাকারের শহরকে বেষ্টন করেছে। এই

পথ দিয়ে কেবল বাস যাতায়াত করে। এই পথের পাশেই অধিকাংশ সরকারী অফিস, বাস স্ট্যাণ্ড, হোটেল ও বড় বড় দোকান। শহরের বাকি অংশ পাহাড়ের শীর্ষদেশে। বাজার ও বাংলোতে বোঝাই সে অঞ্চল।

কাত্যুরী রাজাদের আমলে আলমোরা শহরের পত্তন হয়। তাঁরা প্রথমে এখানে খাগমারা নামে একটি দুর্গ তৈরি করেন। বর্তমান মিউনিসিপ্যাল অফিসের কাছে কোথাও সেই দুর্গ ছিল। এই দুর্গকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে উঠছিল। ১৫০০ সালে কাত্যুরীদের পরাজিত করে চাঁদরাজ কীর্তিচন্দ্র খাগমারা দুর্গ জয় করেন ও ১৫৬০ সালে ভীষ্মচন্দ্র চম্পাবত থেকে এখানে রাজধানী নিয়ে আসেন।

গতকালের মতো আজও আমরা মিউনিসিপ্যাল অফিসের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম সে-অঞ্চলে। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত বাঁধানো পথের দুপাশে বাজার। বাজারের উত্তর প্রান্তে চাঁদরাজাদের প্রাচীন দুর্গ। অবস্থানটি সে আমলের অন্যান্য দুর্গের মতই—এখান থেকে চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দুর্ভেদ্য দুর্গ এখন ধ্বংসস্তূপ—যুদ্ধ নয়, কালের কবলে পড়ে তার এই দশা। অক্ষত আছে কেবল দুর্গপ্রাকারের কিয়দংশ ও রামচন্দ্রের চরণ-মন্দির। এই মন্দিরটি কিন্তু চাঁদরাজাদের তৈরি নয়। এটি নির্মিত হয়েছে পরবর্তীকালে—প্রদ্যুম্ন শাহর আমলে। এ ছাড়া আর কিছুই নেই। যা ছিল, সবই গেছে হারিয়ে।

ধ্বংসস্তূপের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। এই দুর্গপ্রাকারের প্রতিটি পাথরে পাথরে জড়িয়ে আছে কত গৌরব-গাথা, কত হাসি আর কান্না। এরা যদি কথা কইতে পারত, তাহলে আজ কুমায়ুনের গহন-গিরি-কন্দরের কাহিনী শোনার জন্যে আমাকে এমন করে ছুটে বেড়াতে হত না। তবু আমি দাঁড়িয়ে থাকি সেই বিস্মৃত ইতিহাসের নীরব সাক্ষীর সামনে। হয়তো একদিন এই নীরবতার অবসান হবে। আমরা সেই বিস্মৃত ইতিহাস উদ্ধার করতে পারব। কুমায়ুন ! তুমি কথা কও।

আবার বাজারে এলাম। একটু এসেই একটি সরু গলি নেমে গেছে নিচে—নরসিংহ মন্দিরে।

আরও খানিকটা দক্ষিণে এগিয়ে মুরলী মনোহরের মন্দির। তার পরেই বাজার শেষ। শেষপ্রান্তে পুলিস লাইন।

আমরা মিউনিসিপ্যাল অফিসের পাশ দিয়ে আবার নেমে আসি বাস রাস্তায়। তারপরে সুসজ্জিত দোকানপাট ও ঘন বসতি পেরিয়ে এসে পৌঁছই কুমায়ুনের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়ের সামনে—নন্দাদেবীর মন্দিরে। নন্দাষ্টমীতে উৎসব হয় এখানে। মেলা বসে। মহাসমারোহে মহাশক্তির পূজো হয়। পাঁঠা ও মোষ বলি দেওয়া হয়।

নন্দাদেবী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী আদ্যাশক্তি—গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পরমারাধ্যা। গাড়োয়াল-কুমায়ুনের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ নন্দাদেবী। তার এক পাশে ত্রিশূল, অপর পাশে অন্নপূর্ণার প্রাসাদ নন্দাকোট। উদ্যত ত্রিশূল নন্দাকোটকে রক্ষা করছে।

সেই পরমারাধ্যা নন্দাদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মন্দির। মন্দিরের মূল বিগ্রহ নন্দাদেবীর মূর্তি ছিল পূর্ব গাড়োয়ালে। ছিল লোভার উত্তরে দেউলখালের কাছে জুনিয়াগড় দুর্গে। ১৬৩৪ সালে ত্রিমলচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বজবাহাদুরচন্দ্র কুমায়ুনের সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৬৭০ সালে জুনিয়াগড় অধিকার করেন। ফেরার সময় বিজয়ের স্মারক স্বরূপ এই দেবীমূর্তি নিয়ে আসেন আলমোরায়। পুরনারীরা বিচিত্র বেশে সুসজ্জিতা হয়ে ফুলের মালা গলায় দিয়ে শঙ্খধ্বনি করে দেবীকে আবাহন করলেন। মহা ধূমধামের মধ্যে পুরনো দুর্গের নতুন মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠাতা হলেন।

সেই থেকে প্রায় ষাট বছর দেবী ছিলেন সেখানে। ১৮১৫ সাল পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্যেও পরম সমাদরে পূজিতা হয়ে আসছিলেন পরমারাধ্যারূপে।

এই মন্দির নির্মিত হয়েছে বহু পরে—কুমায়ুনের দ্বিতীয় ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার জি. ডাব্লু. ট্রেল-য়ের আমলে। তিনি ১৮৩০ সালে নন্দাদেবী-পূর্ব ও নন্দাকোট শৃঙ্গদ্বয়ের রক্ষাপ্রাচীরের ওপর অবিস্থত গিরিবর্ত্মটি (ট্রেল্স পাস) অতিক্রম করেন। এই অভিযানকালে তিনি তুষার-অন্ধ হয়ে যান। তাঁর সহযাত্রীরা বলেন যে নন্দাদেবীর অভিশাপে তাঁর এই দশা। কারণ কুমায়ুন অধিকার করার পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নন্দাদেবী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে। ফলে পূজো বন্ধ হয়ে গেছে। তাই দেবী তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। সাহেব আলমোরায় ফিরে এসে দেবোত্তর সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন। ভক্তিসহকারে নন্দদেবীর পূজো করলেন। জাগ্রত দেবীর আশীর্বাদে তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন। বিধর্মী ভক্ত তখন তাঁর জীবনদাত্রীর জন্য নতুন মন্দির নির্মাণ করার ব্যবস্থা করে দেন। এই সেই মন্দির।*

"তোমরা দুজনে এমন আনমনা হয়ে পড়লে কেন?" মেজর প্রশ্ন করেন দাশু ও অমিতাভকে। সত্যই ওরা দুজনে এখানে পৌঁছে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। তাই মেজরের আকস্মিক প্রশ্নে ওরা বিচলিত হয়।

দাশু কোনমতে বলে, "এই মন্দিরের সঙ্গে একটি বড়ই করুণ স্মৃতি জড়িয়ে আছে।"

"কার সে স্মৃতি?"

"অণিমাদির।" অমিতাভ বলে।

ভারতের প্রথম পর্বতারোহিণী শহীদ অণিমা সেনগুপ্তা। ১৯৬৪ সালে কলকাতার হিমালয়ান এসোসিয়েশন ট্রেল্স পাস অতিক্রম করার জন্য যে অভিযাত্রী দল পাঠিয়েছিলেন, সে তাদেরই একজন। অসিতবাবু ছিল দলের ম্যানেজার আর দাশু তার সহকারী।

দাশু বলে চলে, "আমরা ১৪ই সেপ্টেম্বর আলমোরায় এলাম। রণেশদা এখানে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সেদিন বিকেলেই আমরা পূজো দিতে এলাম এই মন্দিরে। কিন্তু গেটের সামনে পৌঁছতেই অণিমাদি হঠাৎ বলে উঠলেন—আমি বহুবার পূজো দিয়েছি এ মন্দিরে। আজ আর মন্দিরে ঢুকবো না। তোমরা পূজো দিয়ে হোটেলে ফিরে যাও। আমরা দুজনে শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির থেকে একবার ঘুরে আসছি। বলেই তিনি কৃপাণবাবুকে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

"অণিমাদির আচরণে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ তিনিই প্রথম নন্দাদেবীর পূজো দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনিও বলতেন—নন্দাদেবী চিরজাগ্রতা। তাঁর আশীর্বাদ না পেলে কুমায়ুনের কোন অভিযান সফল হয় না। কিন্তু মন্দিরের সামনে এসে তাঁর কি হল কে জানে? কিছুতেই মন্দিরে গেলেন না।" দাশু একবার থামে, "আজ ভেবে অবাক হই—মনে

---

* পরবর্তীকালে অধ্যাপক গৌরাঙ্গপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক হিমালয় প্রেমিক আমাকে জানিয়েছেন, ট্রেল সাহেব নিজে কোনদিনই ঐ দুর্গম গিরিপথে যান নি। ১৮৩০ সালের জুন মাসে পঁয়ত্রিশজন কুমায়ুনী অনুচর সহ তিনি জনৈক মালক সিং বুধাকে ঐ গিরিপথ আবিস্কার করতে পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পিণ্ডারী উপত্যকার মূলাদানপুর এলাকার সঙ্গে গৌরীগঙ্গা উপত্যকার সমৃদ্ধ জনপদ জহরগ্রামের যোগাযোগ স্থাপন এবং তিব্বতের প্রাচীন পথের পুনরুদ্ধার। তিনি প্রমাণ স্বরূপ ট্রেল সাহেবের একখানি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। চিঠিখানি 'গিরি-কান্তার' বইতে ছাপা হল।

পড়ে সেই অভিশপ্ত ২রা অক্টোবরের কথা। ট্রেল্‌স পাস অভিযানে বিফল হয়ে আমরা ফিরে আসছিলাম ঘরে—বুগডিয়ার থেকে লিলামে। কেবল ওঁরা দুজনেই পড়লেন সেই ভয়ঙ্কর ধসের কবলে। কৃপাণবাবু আহত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু অণিমাদি....

"অথচ দেখুন, সেদিন আমরা যারা এই মন্দিরে এসে পূজো দিয়ে গিয়েছিলাম, তাদের গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি।

"নন্দাদেবীর আশীর্বাদ না নিয়ে গেলে যে কুমায়ুনের গহন-গিরি-কন্দর পরিক্রমা পূর্ণ করে ঘরে ফেরা যায় না, অণিমাদি নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন।"

॥ বারো ॥

নন্দাদেবীর মন্দির দর্শন করে এগিয়ে চলি কুন্দন হাউসের দিকে—বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানী শ্রীবশী সেনের বাসগৃহে।

আলমোরা কুমায়ুনের বৃহত্তম নগরী। তার শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। কিন্তু আলমোরার অর্থনৈতিক অবদান নেহাতই নগণ্য। কারণ কোন কলকারখানা এখনও গড়ে ওঠে নি এখানে। অথচ বনজ সম্পদের দিক থেকে কুমায়ুন খুবই সমৃদ্ধ। এখানে অনায়াসে পশম শিল্প, প্লাইউড আসবাবপত্র, কাগজ, ইউক্যালিপ্টাস তেল, তার্পিন তেল ও রজনের কারখানা গড়ে উঠতে পারে।

খনিজ সম্পদের দিক থেকেও আলমোরা অবহেলিত নয়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় ম্যাগনেসাইটের কথা। ডেড-বার্নট্‌ ম্যাগনেসাইট (dead-burnt magnesite) ইস্পাত-চুল্লীর অপরিহার্য অঙ্গ। এখন ভারতে বছরে ১,২০,০০০ টন ডেড-বার্নট্‌ ম্যাগনেসাইটের প্রয়োজন। অথচ আমাদের বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ৭৫,০০০ টন। ভারতে কেবল দু জায়গায় ম্যাগনেসাইট পাওয়া গেছে—সালেম (মাদ্রাজ) ও আলমোরায়। এখানকার ম্যাগনেসাইট সালেমের চেয়ে অনেক ভাল। তাই উত্তরপ্রদেশ স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আলমোরার এই কারখানায় বছরে ৩৬,০০০ টন ডেড-বার্নট্‌ ম্যাগনেসাইট তৈরি হবে। কুমায়ুনের শিল্পোন্নয়নের এই প্রথম প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। আশা করি ভাবীকালের সমৃদ্ধ কুমায়ুনের এটি পথিকৃৎ হয়ে থাকবে।

কুন্দন হাউসের সামনে এসে থমকে দাঁড়াই। এ কি বৈজ্ঞানিকের বাসগৃহ, না ঋষির আশ্রম। তবে শুনেছি, যে শ্রমশীল মানুষটি বিজ্ঞানের সাধনার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছেন, তাঁকে বৈজ্ঞানিক না বলে ঋষি বলাই উচিত। তিনি বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য সদানন্দের মন্ত্রশিষ্য। তাঁর গবেষণাগারের নাম বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরী। ভেবে আনন্দিত হচ্ছি, তাঁর ইংরেজ স্ত্রী গারটরুড ইমার্সনকে নিয়ে এখানে স্থায়ী হলেও তিনি বাঙালী। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র সুর ও ছন্দের সাধনায় যিনি সারাজীবন মগ্ন রইলেন, তাঁর কাছে ভৌগোলিক সংকীর্ণতা পাপ। তবু স্বাভাবিক ভাবে বাংলা ও বাঙালীর প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। তাই কোন বাঙালী এলে তিনি সহজে ছাড়তে চান না। আর দশজনের মতই বাংলার সুখ-দুঃখের গল্প জুড়ে দেন। কেউ বাংলায় গহন-গিরি কন্দরের কাহিনী লিখছেন শুনলে তিনি

ভারী আনন্দিত হন। কারণ তাঁর মতে—হিমালয়ের কথা যতই সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়বে, মানুষের মন ততই উন্নত হবে।

তাই তো ছুটে এসেছি এখানে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার—সস্ত্রীক শ্রীসেন গেছেন নৈনিতালে। কবে ফিরবেন কেউ বলতে পারলেন না।

গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা চললাম এগিয়ে। মনে মনে ভাবছি সেই সুমহান বিজ্ঞানীর কথা। যিনি সারা জীবনের সাধনায় গড়ে তুলেছিলেন যে গবেষণা কেন্দ্র, কিছুকাল আগে বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে তাকে তুলে দিয়েছেন সরকারের হাতে। এখন এটি ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ গবেষণা কেন্দ্র। আর ভাবি সেই মহীয়সী মহিলার কথা। যিনি একজন ভিনদেশী মানুষকে ভালবেসে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশ ছেড়ে এসেছেন আমাদের দেশে। নিষ্ঠাবতী হিন্দু সহধর্মিণীরূপে নিজেকে তুলেছেন গড়ে। সারাজীবন কর্মযোগী স্বামীর পাশে থেকে তাঁকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সাহায্য করেছেন। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই তাঁদের দুজনকে।

বাঁক ফিরতেই মেজরের দেখা হল তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম মদনচাঁদ ত্রিবেদী। স্থানীয় জরীপ বিভাগের কর্মচারী। মেজরকে দেখে তিনি প্রথমে বিস্মিত ও পরে খুশী হলেন। আমাদের সবাইকে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন কাল বিকেলে। আমরা সানন্দে তাঁর আন্তরিক আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

কথায় কথায় শ্রীত্রিবেদী বললেন, "এখন কুমায়ুন ও উত্তরাখণ্ড বিভাগের নতুন জরীপ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জমিদারী প্রথা বিলোপ করে, নতুন ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্যেই এই প্রচেষ্টা। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জেলাসমূহের উন্নতিসাধনের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।..."

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক অনেকটা এগিয়ে এসেছেন। আর তাঁকে টেনে নেওয়া উচিত হবে না। কাল বিকেলে তাঁর বাড়ীতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা বিদায় নিই শ্রীত্রিবেদীর কাছ থেকে। এগিয়ে চলি শ্রীরামকৃষ্ণ কুটিরের দিকে।

কুমায়ুনে রামকৃষ্ণ মিশনের চারটি প্রতিষ্ঠান আছে—প্রথমটি আলমোরায়, দ্বিতীয়টি শামলাতালে, তৃতীয়টি এখান থেকে ৯৫ মাইল দূরে তিব্বত সীমান্তে—ধরচুলায়, চতুর্থটি কালিকুমায়ুনে—স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম। আগে এখান থেকে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই আশ্রমটি হিমালয়ের একটি সুন্দরতম স্থানে অবস্থিত। উচ্চতা সমুদ্র-সমতা থেকে ৬৮০০ ফুট। আশ্রমের কাছেই নেপালী আমলের একটি দুর্গ আছে। মায়াবতী টনকপুর রেল স্টেশন থেকে ৩৭ মাইল উত্তরে ও আলমোরা থেকে প্রায় ৫০ মাইল পূবে অবস্থিত।

মায়াবতীর স্থানীয় নাম মায়াপট্। সে সত্যই মায়াময়ী। হিমালয়পথিক শিল্পাচার্য শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মায়াবতীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'পাহাড়ের তিনটি স্তর, এই তিনটি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের জন্য সুন্দর গৃহসকল নির্ম্মিত এবং পরিপাটিরূপে সজ্জিত আছে। প্রত্যেক গৃহই বিশিষ্ট কর্ম্মের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ আসবাবে পূর্ণ, কোথাও অতি প্রাচুর্য নাই, দৈন্যও নাই। স্বল্প এবং বিরল বসতি হইলেও গম্ভীর এবং সমৃদ্ধিশালী একটি গ্রাম, এই মায়াপট্ পর্ব্বত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্র আপেল নাসপাতি আখরোট খোবানীর গাছ। প্রথম স্তরে ফুল ও ফল, দ্বিতীয় স্তরে শাকসব্জী, তৃতীয় স্তরে ক্ষেত্র। সকল স্তরের রাস্তাগুলি পরিস্কার, সযত্ননির্ম্মিত সুসমতল এবং সুরক্ষিত। মায়াবতী বাস্তবিকই হিন্দু জাতির গৌরব।'

চারিদিকে পাহাড়ে-ঘেরা দেড় মাইল বিস্তৃত একটি শ্যামল পার্বত্য উপত্যকা। পাহাড়ের গায়ে দেওদার চির ও কেলু (fir & cedar) গাছের বন। ১৮৯৮ সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির অতিথিশালা ডাকঘর ও দাতব্য চিকিৎসালয় নিয়ে এই আশ্রম। প্রধান আশ্রমটি একটি পর্বতশীর্ষে অবস্থিত। স্বরূপানন্দ বিরজানন্দ ও ক্যাপ্টেন ও মিসেস্ সেভিয়ারের কর্মভূমি এই আশ্রম। তাঁরা স্বামীজীর কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

মায়াবতীর একটি ঝরনার জল হজমের মহৌষধ। এখনও সেখানে বন্য হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। আগে হিংস্র জন্তুর উৎপাত ছিল। কেবল সন্ন্যাসীদের নয়, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ও শিল্পীদেরও আদর্শ স্থান মায়াবতী।

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই দলে দলে যাত্রী দুর্গম পথ পেরিয়ে ছুটে গিয়েছেন এই সৌন্দর্য নিকেতনে। এদের মধ্যে আমাদের মত ভবঘুরে যেমন আছে, তেমনি বহু বিখ্যাত মনীষী ও জননেতাও আছেন। যাঁরাই সেখানে গেছেন, তাঁরাই মায়াবতীর স্বর্গীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। মুগ্ধ হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনি ১৯১৫ সালে মায়াবতী দর্শন করেন। তাঁর সহযাত্রী সুসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মায়াবতীর সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন, 'চতুর্দিকে মনোরম পুষ্পোদ্যান। সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত অপূর্ব দৃশ্য—এবং সেই অপরূপ দৃশ্যের পটভূমিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে সুনির্মল বিশাল চিরদেদীপ্যমান তুষারপর্বত। তখন অস্তরবির লোহিত কিরণজালে সমগ্র পর্বত গলিত স্বর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। আমরা নির্বাক হইয়া এই পরমাশ্চর্য ব্যাপার দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম, সার্থক হইয়াছে এই দুর্গম ও দুরারোহ পথের দশদিনের পথ-শ্রান্তি—সার্থক হইয়াছে এই দূর হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করা।'

আলমোরা চিরকালই সন্ন্যাসীদের প্রিয়ভূমি। তাঁদের আত্মবিশ্লেষণের আদর্শ ক্ষেত্ররূপে সমাদৃত। যুগে যুগে বহু বাঙালী সন্ন্যাসী আলমোরাকে তাদের সাধনপীঠরূপে নির্বাচন করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম মনে আসে 'আলমোরার স্বামীজী'র (Swami of Almora, The holy ascetic of Almora) কথা। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। ১৮৮২ সালের ২০শে জানুয়ারী থিওসফিস্ট পত্রিকায় অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে তাঁর একখানি জ্ঞানগর্ভ সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

তার পরেই আসে স্বামী অখণ্ডানন্দের (গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়) কথা। ১৮৮৬ সালে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পরে বরাহনগর মঠের শিষ্যরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য, কোন নিভৃত স্থান কিম্বা পুণ্যতীর্থে গিয়ে তপস্যা করা। অখণ্ডানন্দ গেলেন হিমালয়ে। তিন বছর ঘুরে বেড়ালেন গহন-গিরি-কন্দরে—গাড়োয়াল কুমায়ুন তিব্বত ও কাশ্মীরে। এই পরিক্রমাকালে তিনি এসেছিলেন আলমোরায়। উঠেছিলেন ধার্মিক ব্যবসায়ী লালা বদ্রী শাহ্-র বাড়িতে। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অখণ্ডানন্দই প্রথম আলমোরায় আসেন।

বিবেকানন্দ তিনবার আলমোরায় এসেছিলেন—১৮৯০, ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেই বিবেকানন্দ হিমালয়ের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তির জন্য তাঁকে তিন বছর হিমালয় ভ্রমণ স্থগিত রাখতে হয়। অবশেষে ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে হিমালয়ের পথে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে তাঁর গুরুভাইদের বলেন, 'I shall not return until I acquire such realisation that my very touch will transform a man.'

১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিবেকানন্দ আলমোরায় এলেন। বদ্রী শাহ্-র আতিথ্য

গ্রহণ করলেন। একদিন কাসারদেবীর সেই গুহায় গিয়ে তপস্যায় বসলেন। সিদ্ধিলাভের পরে বদ্রীনাথ যাত্রা করলেন। কিন্তু সেবার তাঁর বদ্রীনারায়ণ দর্শন হয় নি। দুজন সহযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায়, ১২০ মাইল পদযাত্রার পরে তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

স্বামীজী দ্বিতীরবার আলমোরায় আসেন ১৮৯৭ সালের মে মাসে—আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে ফিরে এসে। সেবারে তিনি আলমোরায় আসেন বিশ্রাম নিতে—ডাক্তারের নির্দেশে। বলা বাহুল্য বিশ্রাম তিনি নেন নি। যাই হোক, সেবারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর কয়েকজন গুরুভাই ও শিষ্য। গুডউইন ও মিস্ মূলার আগেই আলমোরা এসে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের আগমনে সেবারে কুমায়ুনে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়েছিল আলমোরা। বিরাট জনতা আলমোরার প্রবেশপথে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন তাঁকে। তাঁদের অনুরোধে একটি সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করতে হয়ছিল বিবেকানন্দকে। তারপরে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে নিয়ে আসা হয় শহরে। দীর্ঘ পথের দুপাশে, গৃহের অলিন্দে ও শীর্ষে দাঁড়িয়ে কুলবধূরা পুষ্প ও ধান্যবৃষ্টি করে আবাহন করেছিলেন সেই তরুণ সন্ন্যাসীকে। আঁধার নামে নি সেদিন আলমোরায়। সারা শহর সারারাত ধরে আলোর মালা গলায় পরে বিবেকানন্দর শুভাগমন ঘোষণা করেছিলেন। বদ্রী শাহ-র বাড়ির সামনে টাঙানো হয়েছিল বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রাতপ। আয়োজিত হয়েছিল এক মহতী জনসভার। তিন হাজার নরনারী বিবেকানন্দের বাণী শোনার জন্যে সেখানে প্রতীক্ষারত ছিলেন।

আলমোরার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সংস্কৃত ও ইংরাজীতে দুখানি মানপত্র দেওয়া হল বিবেকানন্দকে। সেই অভূতপূর্ব সম্বর্ধনার উত্তর দিতে গিয়ে সেদিন হিমালয় সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন, "the holy land where every ardent soul in India wants to come at the end of his life, to close the last chapter of his mortal career here... Himalayas stand for renunciation..... These mountains are associated with the best memories of our race. Here, therefore, must be one of those centres, not merely of activity, but more of calmness, of meditation, and of peace and I hope some day to realise it."

স্বামীজীর আশা পূর্ণ হয়েছে। তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন সহযোগী শিবানন্দ ও তুরীয়ানন্দ। ১৯১৮ সালে আলমোরায় শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সেকথা পরে হবে, এখন বিবেকানন্দর কথা বলে নিই।

সেবারে স্বামীজী আড়াই মাস আলমোরায় ছিলেন। তিনি জুলাই মাসে আলমোরা ত্যাগ করেন। কিন্তু পরের বছর (১৮৯৮) মে মাসে তিনি আবার আলমোরায় এলেন। সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, মিসেল্ ওল্ বুল, মিস্ ম্যাকলিয়ড ও কলকাতার আমেরিকান কনসালের পত্নী মিসেস্ প্যাটারসন। আর ছিলেন গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দ ও তুরীয়ানন্দ এবং শিষ্য সদানন্দ ও স্বরূপানন্দ। সস্ত্রীক ক্যাপ্টেন সেভিয়ার তখন আলমোরার ওক্‌লে হাউসে বাস করছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণের পরে স্বামীজী আসতেন ওকলে হাউসে। তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যা ও দেশীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারতের ইতিহাস পুরাণ দর্শন সংস্কৃতি ও সংস্কার নিয়ে নানা আলোচনা করতেন। এই সময় মিসেস্ এ্যানি বেসান্ট ও মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কথায় কথায় স্বামীজী এক দিন অশ্বিনীকুমারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনারা কি মনে করেন যে গুটিকয়েক প্রস্তাব পাস করলেই দেশের স্বাধীনতা আসবে? আমি কিন্তু তা বিশ্বাস করি না। আগে জনতার ঘুম ভাঙান, তাদের পেট ভরে খেতে দিন।

তারাই তাদের স্বাধীনতা আনবে।'

১৮ই জুন অমরনাথের পথে স্বামীজী আলমোরা ত্যাগ করেন। কিন্তু যাবার আগে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও সেখান থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশের সব ব্যবস্থা করে যান।

বিবেকানন্দ বিদায় নিলেন আলমোরা থেকে। কিন্তু আলমোরা রামকৃষ্ণভক্তদের পরমপ্রিয় সাধনক্ষেত্ররূপে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে রইল। যে গিরিশিরাটির ওপর আলমোরা শহর অবস্থিত, তারই পশ্চিম প্রান্তে গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির। আমরা এখন সেই পরমার্থ নিকেতনে চলেছি।

বিবেকানন্দ বলতেন—সমাজসেবায় ক্লান্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বিশ্রাম ও আত্মবিশ্লেষণের জন্য হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে একটি নিভৃত নীড় থাকা প্রয়োজন। স্বামীজীর এই অভিলাষ পূরণ করেন শিবানন্দ ও তুরীয়ানন্দ। আলমোরার উপকণ্ঠে শান্ত সুন্দর এই অঞ্চলটি তাঁরা নির্বাচিত করেন। প্রথমে ছোট্ট একটি মঠ নির্মিত হল। নাম দেওয়া হল শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে একটির পর একটি আবাস। এখন এখানে পঁচিশজন সন্ন্যাসী ও তিনটি পরিবারের বাসোপযোগী অতিথিশালা তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে প্রার্থনামন্দির ভোজনাগার গ্রন্থাগার। প্রায় পাঁচ হাজার বই আছে এখানে। কলের জল ও বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্তও হয়েছে। স্বামী অপর্ণানন্দ এখন এই আশ্রমের অধ্যক্ষ।

গিরিশিরার গা ঘেঁষে প্রশস্ত মোটর পথটি কুটিরের সামনে দিয়ে কাসারদেবী হয়ে চলে গেছে পিথোরাগড়। পথের বাঁ পাশে ছোট একটি টিলা, ডান দিকে আশ্রম। টিলাটির অবস্থান বড়ই সুন্দর। তাই তাকে একটি পার্কে পরিণত করা হয়েছে।

পাথরের তোরণ পেরিয়ে আমরা নেমে এলাম—শ্রীরামকৃষ্ণ কুটিরে প্রবেশ করলাম। অতিথিশালার সামনে এসে একটু থামলাম। এখান থেকে পায়ে-চলা-পথ প্রসারিত হয়েছে চতুর্দিকে। এই সব পথের ধারে একে অন্যের গা বাঁচিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট বড় কুটির—পাথর টালি ও টিনের তৈরি। অধিকাংশই একতলা, তবে দু-একটি দোতলাও আছে। প্রত্যেকটি কুটিরের চতুর্দিকেই বাগান—মাঝে মাঝে দু-একটি করে দেবদারু গাছ। এখান থেকে তুষারমৌলি হিমালয়কে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। নাগরিক সভ্যতার কোলাহলমুক্ত এই আশ্রম। ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের কোলে বসে অসীমের ধ্যানে বিভোর হবার আদর্শক্ষেত্র এই শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির।

এখানকার আকাশে ও বাতাসে তাই অবিরত ধ্বনিত হচ্ছে স্বামীজীর সেই আহ্বান—

'ওঠাও সন্ন্যাসী ওঠাও সে তান,
হিমাদ্রিশিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে,
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ,...
ওঠাও সন্ন্যাসী, ওঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান—'

॥ তেরো ॥

হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই কম্বল গায়ে দিয়ে বসলাম খাটিয়ায়। মেজর তাঁর ব্যাগ থেকে বোতল বের করে খানিকটা গলায় ঢেলে নিলেন। তারপরে এসে বসলেন আমাদের পাশে। মেজরের পান-পর্বটি এখন আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। মানুষ অভ্যাসের দাস।

চুরোটে আগুন ধরিয়ে মেজর অসিতকে বলেন, "তারপর ম্যানেজার, তোমার কালকের প্ল্যান এখনও টিঁকে আছে তো? না আবার কোন এ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে?"

"না না। ঠিকই আছে। সকালে রামকৃষ্ণ আশ্রম দেখে ফিরে আসছি হোটেলে। তারপরে ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা হচ্ছি হীরাদুঙ্গি চিতাই ও মাতেলায়।"

"রামকৃষ্ণ আশ্রম তো আমরা দেখে এলাম।" প্রাণেশ অবাক হয়।

"দেখে এলাম শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির। আর এ হল গিয়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম—এটি একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশনের অংশ নয়।" মেজর বলেন।

"কি আছে সেখানে?" প্রাণেশ বলে।

"আধুনিক উপায়ে গো-পালন, মৌমাছি-পালন ও গুটিপোকার চাষ হয় সেখানে। সত্যই দেখার মত।...."

"ওসব কাল হবে। আজ অন্য কথা হোক।" দাশরথি মেজরকে বাধা দেয়।

"কি সে কথা?"

"আপনার নিজের কথা।" দাশু আবার টোপ ফেলেছে!

আমাদের সবাইকে সচকিত করে হো হো করে হেসে উঠলেন মেজর। তারপরে বললেন, "আমি কি উপন্যাসের নায়ক, না সিনেমার হিরো যে আমার কথা শুনতে চাইছো? সংসারের আর দশজন যেমন চাকরি-বাকরি করে জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে অবসর নেয়, আমিও তাই নিয়েছি। আমার বৈচিত্র্যহীন জীবনের কথা শুনে কি লাভ হবে তোমাদের?"

"লাভ-লোকসানের হিসেব আমরা করব। আপনি বলুন আপনার জীবন-কাহিনী।" আমরা নাছোড়বান্দা।

মেজর মৌন। আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কিছুক্ষণ কেটে যায়। তারপরে গম্ভীর কণ্ঠে মেজর বলেন, "আমি জানি, তোমরা কি শুনতে চাইছো...তোমরা আমার কথা শুনতে চাও না, শুনতে চাও ওর কথা। কিন্তু.....সেকথা যে বলা যায় না ভাই। শুধু এটুকু জেনে রাখো—ঘর বাঁধার পরেই আমাদের ঘর গেছে ভেঙে।...যে ছিল আমার কল্প-লোকের সুপ্রিয়া, তবু সে এসেছিল আমার বাস্তবজীবনে। আর তাই নিয়তি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।"

"কেমন করে?"

"যৌবন ও জীবন দিয়ে স্বাধীনতার মূল্য দিতে হল তাকে।"

"স্বাধীনতার সংগ্রামে শহীদ হলেন?"

"না।" মেজর যেন গর্জে ওঠেন, "দেশবিভাগের দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের শিকার হয়েছে

সে। আমি ছিলাম দেরাদুনে আর সে ছিল দেশের বাড়িতে—নোয়াখালিতে।...কিন্তু না, আর তার কথা তোমরা শুনতে চেয়ো না।" মেজর যেন উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন। এই শীতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। তিনি কোনমতে বলেন, "তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।" তিনি আর কিছু বলতে পারেন না।

আমরা স্তম্ভিত, স্তব্ধ ও ক্ষুব্ধ। কথাটা না তুললেই ভাল হত। বুঝতে পারিনি যে আলোচনাটা এমন খাতে বইতে পারে।

সময় চলেছে বয়ে, আমি চলেছি ভেবে—হাসি-খুশী আমুদে রূপটি মেজরের প্রকৃত পরিচয় নয়। তাঁর হাসির অন্তরালে কান্না লুকোনো আছে—আছে একটি সকরুণ কাহিনী। কিন্তু সে-কাহিনী আমাদের অজানাই রয়ে গেল।

হঠাৎ মেজরের স্বাভাবিক স্বরে চমকে উঠি। তিনি বলছেন, "সে-সব কথা ভেবে এমন সুন্দর সান্ধ্য আসরটি মাটি না করে এসো গল্পের বৈঠক বসানো যাক।"

কথাটা ভাল লাগে সবার। আর কিছু না হোক, ঘরের গুমোট আবহাওয়াটা অন্তত কেটে যাবে। কাজেই উচ্চকণ্ঠে আমরা মেজরের প্রস্তাব সমর্থন করি। তিনি উঠে যান তাঁর ব্যাগের কাছে। খোঁজাখুজি করে সেই খাতাখানি নিয়ে এসে আবার বসেন নিজের জায়গায়। চুরোটে একটা টান মেরে মেজর বলতে থাকেন, "বছর কয়েক আগে আমার এক কলকাতাবাসী বন্ধুর সঙ্গে পিণ্ডারী হিমবাহ দেখতে গিয়েছিলাম। সেবারে আমাদের পদযাত্রার সঙ্গী হয়েছিল মহাদেব। তারই কাহিনী শোনাচ্ছি তোমাদের।" মেজর একবার থামেন। তারপরে একটু কেশে নিয়ে পড়তে শুরু করেন—

'ফের এখানে এসেছিস তুই?' বলেই লাঠিখানা হাতে নিয়ে তিনি তেড়ে আসেন তাকে। মহাদেব অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মেনকা দেবীর লাঠি সচল হয়। একবার দুবার তিনবার।

পার্বতী ছুটে এসে মাকে বাধা দেয়। মা অবাধ্য মেয়েকেও খাতির করেন না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পার্বতী। তবে মহাদেব মুক্তি পায়।

গোলমাল শুনে দু চারজন প্রতিবেশী ছুটে আসেন সেখানে। তাঁরাই মেনকা দেবীকে বাধা দেন। ক্রুদ্ধা জননী যষ্টি ছুঁড়ে ফেলে পার্বতী ও মহাদেবের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে গজরাতে গজরাতে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢোকেন।

স্লেটের টালি দিয়ে ছাওয়া, পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জানলাহীন অন্ধকার একখানি ঘর। কিন্তু কুঁড়েঘর বলতে যেমনটি বোঝায়, ঠিক তেমনটি নয়। পাহাড়ী দেশ কুমায়ুন। সমতলভূমির বড়ই অভাব এখানে। কেবল চির দেওদার ও শাল সমন্বিত অন্ধকার অরণ্য। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সাধারণতঃ দশ হাজার ফুট পর্যন্ত তাদের বিস্তার। তার ওপরে আরও হাজার দুয়েক ফুট জুড়ে ঘাস কাঁটাঝোপ ও অজস্র ফুল। এর ওপরে হিমবাহ অঞ্চল। সবার ওপরে আকাশছোঁয়া তুষারভরা অসংখ্য শুভ্র শিখরের মেলা।

কিছুকাল আগেও কুমায়ুনের এই গহন-গিরি-কন্দর হিংস্র আরণ্যক পরিপূর্ণ ছিল। জিম করবেটের 'ম্যান ঈটার্স অভ্ কুমায়ুন' ও 'দি টেম্প্ল টাইগার এন্ড মোর ম্যান-ঈটার্স অভ্ কুমায়ুন' সে সব দিনের প্রকৃত আলেখ্য। শেষ পর্যন্ত মেহনতী মানুষের কাছে হার মেনেছে অরণ্য ও আরণ্যকদের দল। যেখানেই মানুষ একটু সমতল পেয়েছে, সেখানেই বন কেটে বসত বসিয়েছে। গড়ে উঠেছে গ্রাম। কিন্তু মানুষের তো কেবল ঘর আর ঘরণী হলেই চলে না। তাকে পেটের জ্বালাও মেটাতে হয়। অবাধ্য প্রকৃতিকে বশে আনতে হয়—ফসল ফলাতে হয়। তারা তাই আলাদা আলাদা বাড়ি তৈরি করে সমতলভূমি নষ্ট করে নি।

সমতলভূমির এক প্রান্তে, নদী কিম্বা ঝরনার ধারে পাথর আর কাঠ দিয়ে লম্বা লম্বা ঘর তৈরি করেছে। মাঝখানে দেওয়াল দিয়ে তার এক-একটি অংশে একটি করে পরিবার বাস করছে। দরজা ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই সে-ঘরের। শীতের জন্য প্রায় সারা বছরই আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ধোঁয়ায় বোঝাই হয়ে থাকে। দু-দণ্ড বসলে চোখ জ্বালা করে। ভেবে অবাক হতে হয়, এই ঘরে কেমন করে মানুষ বাস করে ! কিন্তু ওরা পশু নয়, মানুষ। ওরা আনন্দে হাসে, দুঃখে কাঁদে। ওরা ভালবাসে। লাঠির ঘা-কে প্রেমের প্রতিদান বলে মেনে নেয়। মাথা ফাটলেও মুখ ফোটে না ওদের।

প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয় মহাদেবের আচরণে। কোন কথারই জবাব দিচ্ছে না সে। মহাদেব এই খাতি গ্রামের বাসিন্দা নয়। তার বাড়ি লোহারক্ষেতের কাছে চাওরা গ্রামে—এখান থেকে এগারো মাইল দক্ষিণে। কিন্তু এ গাঁয়ের সবাই ওকে চেনে। ষোলো বছর বয়স থেকে কুলির কাজ করে মহাদেব টুরিস্ট 'সাব'-দের বোঝা বয়। কাপকোট বাস স্ট্যান্ড থেকে তাঁদের নিয়ে যায় পিণ্ডারী হিমবাহে—পিণ্ডারী নদী বা কর্ণগঙ্গার উৎসে। আসা-যাওয়ার পথে রাত্রিবাস করতে হয় এই খাতি গাঁয়ে, এখানকার নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলোয়। প্রকৃতপক্ষে পিণ্ডারী পথের শেষ লোকালয় এই গ্রাম। ছোট ছোট দু-একটা গ্রাম অবশ্য এর পরেও আছে, কিন্তু তা রাস্তা থেকে অনেক নিচে। আর সে-সব গাঁয়ে কোন দোকান নেই। খাতি থেকেই রসদ সংগ্রহ করতে হয়। তাই খাতির দোকানদাররা খাতির করে তাকে। 'সাব'-দের সঙ্গে থাকে বলে সম্মানও করে কিছুটা। 'সাব'-রা সবাই দাওয়াই নিয়ে আসেন। গাঁয়ের কারও অসুখ হলে তাঁরা এসে মহাদেবকে ধরে। বলেকয়ে মহাদেব তার 'সাব'-দের নিয়ে যায় রোগীর বাড়িতে। ডাক্তার না হয়েও 'সাব'-রা তার অনুরোধে ডাক্তারী করেন। ভেবেচিন্তে দাওয়াই দেন। হাতুড়ে চিকিৎসা বিফল হয় না। অসুখ সেরে যায়। মহাদেবের মহত্ত্বে বিগলিত হয় তারা।

তবু আজ প্রতিবেশীরা বিরক্ত হল মহাদেবের আচরণে। জোয়ান মরদ কখনও এমন মার নীরবে হজম করে ? শুধু তাই নয়, শত প্রশ্নেও আসল ব্যাপারটা ভাঙছে না ওদের কাছে। কেবলই বলছে, 'কিছু হয় নি। তোমরা চলে যাও।'

আরে কিছু না হলে মেনকা দেবীই বা তার গায়ে হাত তুলবেন কেন, আর পার্বতীই বা মাকে বাধা দেবে কেন ?

মার খেয়ে মেয়েটাও নীরব। মা ঘরে চলে যাবার পর উঠে বসেছে। তবে চোখের জল থামে নি। কেবলই কাঁদছে। শব্দহীন অসহায় কান্না। মহাদেব অপলক নয়নে সেই কান্না দেখছে। আর কি যেন ভাবছে।

পার্বতীর চোখের জল আর মহাদেবের চোখের চাহনি দেখে প্রতিবেশীরা অবশ্য বুঝেছে, ব্যাপারটা দিল দেওয়া-নেওয়ার। আরে তা হতেই পারে। সুন্দরী সপ্তদশী মেয়ে। বাবা বেঁচে নেই বলে, নইলে কবে ওর বিয়ে হয়ে যেত।

মা কিন্তু নিশ্চেষ্ট নন। ইদানীং একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেছেন মেয়েকে পার করার জন্য। ওয়াছং গাঁয়ের রতনলাল সিং দু'শ টাকা দিতে রাজী হয়েছে। কিন্তু পার্বতী নাকি গররাজী। এই নিয়ে কিছুদিন ধরেই ঝগড়াঝাঁটি চলছিল মা ও মেয়েতে। প্রতিবেশীরা ভেবেছে দোজবরে বলেই রতনকে মনে ধরে নি পার্বতীর। এই গাঁয়েরই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল রতনলাল। কিন্তু সে বৌ মাত্র বছর দুয়েক ঘর করেছে তার। তারপর রতনলালের এক জ্ঞাতি-ভাইকে দিল দিয়ে ঘর ছেড়েছে।

স্বামী-বদলের চল আছে কুমায়ুনী সমাজে। কেউ তার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হলে তাকে শাসন করতে পারে না। বড় জোর পঞ্চায়েতের কাছে নালিশ জানাতে পারে। পঞ্চায়েতের সভাপতি বা সরপঞ্চ তখন স্বামী, স্ত্রী ও তার প্রেমিককে পঞ্চায়েতে ডাকেন। স্ত্রী যদি সে-সভায় বিবাহ বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে আর প্রেমিক যদি স্বামীকে তার স্ত্রীর খরিদ মূল্য প্রত্যর্পণ করে, তাহলে পঞ্চায়েত আগের বিয়ে নাকচ করে দিয়ে প্রেমিককে স্বামী বলে ঘোষণা করেন। ছেলে-মেয়েরা কে কার কাছে থাকবে, তাও পঞ্চায়েত সাব্যস্ত করে দেন। ফলে সমাজে প্রেমিক পায় 'হিরোর' আসন আর স্বামী হয় 'ভিলেন'। বিশেষ করে মেয়েরা তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, কেউ আর তার ঘরণী হতে চায় না।

স্বভাবতই প্রতিবেশীরা মা ও মেয়ের ঝগড়াঝাঁটির পেছনে অন্য কোন কারণ খুঁজতে চেষ্টা করে নি। ভেবেছে আগের বৌ ঘর ছেড়েছে বলেই রতনলালের ঘর করতে রাজী নয় পার্বতী।

পার্বতী উঠে দাঁড়ায়। চোখ মুছে এগিয়ে আসে মহাদেবের কাছে। মহাদেবের হাতখানি সরিয়ে দিয়ে তার মাথার কাটা জায়গাটা একবার দেখে। তারপর খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে মুখে পুরে ভাল করে চিবিয়ে নিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়। মহাদেব হাত দিয়ে চেপে ধরে। পার্বতী হাত সরিয়ে নেয়। আবার দুচোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। ভাবাবেগে সে পারিপার্শ্বিকতা বিস্মৃত হয়। রুদ্ধকণ্ঠে মহাদেবকে বলে, 'এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছিস। আরও মার খেতে চাস?'

মহাদেব তবু নীরব। শুধু সে করুণ চোখে পার্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

পার্বতী গর্জে ওঠে, 'তুই না মরদ? টাকা যখন যোগাড় করতে পারিস নি, তখন তো জানিস তুই আমাকে পাবি না। চলে যা এখান থেকে। আর কোনদিন আসিস না এখানে। ভুলে যা আমাকে।'

'না, না। সে আর পারব না পার্বতী।' এবারে মহাদেব কথা বলে।

'তাহলে যা। যেখান থেকে পারিস দু'শ টাকা যোগাড় করে নিয়ে আয়। মার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে নিয়ে চল্ তোর সঙ্গে।'

মর্মান্তিক দুঃখ পেলে মানুষের হাসি পায়। সেই হাসি হেসে মহাদেব শান্ত কণ্ঠে বলে, 'আপ্রাণ চেষ্টা করেও যে টাকা যোগাড় করতে পারি নি, সে তো তোর অজানা নয় পার্বতী। অথচ টাকা না দিতে পারলে যে তোর মা তোকে দেবে না, তাও আমি জানি। তাই তো বলতে এসেছিলাম, সেই যোগাড় করতে আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়? কবে?' পার্বতী আঁতকে ওঠে।

প্রতিবেশীরাও মহাদেবের দিকে তাকায়। হঠাৎ পিণ্ডারা নদীতে একটা প্রচণ্ড শব্দ জেগে ওঠে। পাশের পাহাড় থেকে একখানি পাথর গড়িয়ে পড়ল তার উদ্বেলিত বক্ষে। কিন্তু তাতে ওরা কেউ বিচলিত হয় না। এমন তো হামেশাই হচ্ছে। যেমন পাহাড়ী সমাজ থেকে এক-আধজন ছিটকে পালিয়ে যাচ্ছে শহরে। সমাজের তাতে কি যায় আসে!

মহাদেব আবার হাসে, বড়ই ম্লান সে হাসি। বলে, 'পরশু দিন বিকেলে কাপকোট পৌছব। পরদিন প্রথম বাসে রওনা হব বাগেশ্বর। সেখান থেকে কাঠগুদাম, যাব কলকাত্তায়—সে অনেক দূর।'

পার্বতীর মুখে কথা যোগায় না। সে চুপ করে থাকে, কি যেন ভাবে। মহাদেব মিনতিভরা স্বরে ডাকে, 'পার্বতী!'

'কী ?' সে সজল চোখে মহাদেবের দিকে তাকায়।

'আমি তোর জবান নিতে এসেছি পার্বতী।'

'কিসের জবান ?' পার্বতী কোনমতে জিজ্ঞেস করে।

'টাকা যোগাড় করেই আমি ফিরে আসব তোকে নিয়ে যেতে—চিরজীবনের মত। বল্ ততদিন তুই অপেক্ষা করবি আমার জন্য ?'

'করব।' পার্বতী স্থিরকণ্ঠে জবাব দেয়।

কিন্তু মহাদেবের সন্দেহ ঘোচে না। সে আবার বলে, 'ইতিমধ্যে যদি রতন সিং তোকে কিনে নেয় ?'

'তুই রতনের কাছ থেকে আবার কিনে নিবি আমাকে।' পার্বতী অবিচলিত।

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ।'

মহাদেবের চোখে মুখে আনন্দ উপচে পড়ে। প্রতিবেশীদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে সে পার্বতীর একখানি হাত নিজের মুঠোয় তুলে নেয়। একটি নীরবমধুর মুহূর্ত কেটে যায়। পার্বতী হাতখানি ছাড়িয়ে নেয়। মৃদু সংঘর্ষ হয়। তারপরে প্রতিবেশীদের দেখিয়ে পার্বতী তেমনি স্থিরকণ্ঠে বলে, 'এই তো এদের সাক্ষী রেখে জবান দিলাম—আমি তোর। চিরকাল তোর থাকব। যা এবারে মা-কালীর মন্দিরে প্রণাম করে রওনা দে। বেলা পড়ে এল। অনেকটা পথ যেতে হবে।'

দুদিকে দুসারি ঘর, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ চড়াই-পথ। সেই পথ বেয়ে মহাদেব উঠে আসে ওপরে। পার্বতী চেয়ে থাকে। মহাদেব পেছন ফেরে। পার্বতী হাত নাড়ে। মহাদেব এগিয়ে চলে। পার্বতী চোখ মোছে।

মহাদেব এসে দাঁড়ায় কালীমন্দিরের সামনে। পাথরের উপর পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে দেওয়াল। দেওয়ালের ওপর কাঠ সাজিয়ে তার ওপর স্লেটপাথর দিয়ে চাল। তিন দিকে দেওয়াল, এক দিকে খোলা। মেঝেটা মোটেই সমতল নয়। মন্দিরের ঠিক মাঝখানে একখানি পাথরের বেদী। এই বেদীকেই জগত্তারিণী মহামায়া কল্পনা করে কালীপূজো করা হয়। মহা ধূমধাম হয়। পাঁঠা ও মোষ বলি হয়। বলি দিয়ে মোষকে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে বিসর্জন দেওয়া হয় পিণ্ডারা নদীতে।

পিণ্ডারা নদী পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে সৃষ্ট হয়ে এ পর্যন্ত এসে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। চলে গেছে গাড়োয়ালে, কর্ণগঙ্গা নাম নিয়ে কর্ণপ্রয়াগে গিয়ে অলকানন্দায় মিশেছে।

মন্দিরের সামনে একফালি প্রাঙ্গণ—সমতল। মহাদেব এসে দাঁড়ায় মন্দির-প্রাঙ্গণে। পূজোর দিন সকাল থেকেই সবাই এসে ভিড় জমায় এখানে। শুধু এ গাঁয়ের লোক নয়, আশেপাশের গাঁ থেকেও বহুলোক আসে। গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে নাচ-গান করে। মেয়েরা সেদিন মাথায় ওড়না বাঁধে, গায়ে রূপোর গয়না পরে। পুরুষরাও পোশাক পালটায়। নাচগানের সঙ্গে ঢোল ও বাঁশী বাজাতে থাকে। সবাই এ উৎসবে যোগ দিতে পারে। এ বছর পূজোর দিন দুই বাঙালী 'সাব'কে নিয়ে মহাদেব এখানে এসেছিল। সবার সঙ্গে পার্বতীকে নাচতে দেখে ওর হৃদয়ও আনন্দে নেচে উঠেছিল। পার্বতীর পায়ে রূপোর মল, হাতে বালা, গলায় হাঁসুলী, কানে ঝুমকো, নাকে নাথলী। সুন্দর সবুজ ঘাঘরা ছিল তার পরনে। মাথায় বেঁধেছিল গোলাপী রঙের ওড়না। মুক্তবেণী ছড়িয়ে পড়েছিল তার পিঠে। নৃত্যের তালে তালে সেও সবার সঙ্গে গাইছিল :—

'মানীরৈ কী দেবী তু ভল কৈ জায়ে ভল
চিন্তা ম্যারা শৌরা তু বড় পকৈ দে বড়...'

সুযোগমত মহাদেব ওদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল। পার্বতীর পাণি-পীড়ন করে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে নেচেছিল এখানে। তারপরে পার্বতীকে ইশারা করে সকলের অলক্ষ্যে পালিয়ে গিয়েছিল এখান থেকে। ডাকবাংলোর বাগান ছাড়িয়ে ঝরনার ধারে একখানি পাথরের ওপর পাশাপাশি বসেছিল দুজনে। উৎসবের কোলাহল সেখানে পৌঁছায়নি। কত কথা সেদিন ওরা বলেছে দুজনে। আস্তে আস্তে আঁধারে ঢেকে গেছে সব—প্রাঙ্গণ পথ আর পাহাড়। সেই শব্দহীন গতিহীন অনন্ত আঁধারের মাঝে জেগে রয়েছে শব্দময়ী ঝরনা আর চিরচঞ্চলা পার্বতী। কথা ফুরোলে গান ধরেছে পার্বতী—

'হাথ পরা হাথ ডাবিয়া কমরা মেঁ নাতী কো রদা
জব ল্যালে সির বিন্দুলী তব কৌল ম্যরো মরদা...'

গান থেমেছে কিন্তু সুর রয়েছে। ঐ ঝরনার কলহাস্যের সঙ্গে মিশে সে চারপাশে মোহের মায়াজাল ছড়িয়েছে। ওরা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে।

দিনের শেষে রোজই সন্ধ্যা নামে। কিন্তু মহাদেবের জীবনে তেমন মিলনমধুর গোধূলি আর কি ফিরে আসবে কোনদিন ?

আসবে বৈকি। পার্বতী কথা দিয়েছে—সে তার, চিরকাল তারই থাকবে।

মন্দিরে প্রণাম করে মহাদেব উঠে আসে ডাকবাংলোর সীমানায়। ছোট্ট নালা কেটে ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসা হয়েছে ডাকবাংলোয়। এই জল শুধু ডাকবাংলোর সম্বল নয়, গ্রামবাসীরাও এই জল খেয়ে জীবনধারণ করে। জলের চাহিদা ওদের অবশ্য খুবই কম। স্নান ওদের করতেই হয় না, জামা-কাপড় কাচারও বালাই নেই। জলের প্রয়োজন শুধু রান্না ও খাওয়ার জন্য। কিছুদিনের মধ্যেই শীতের দাপটে এই ঝরনার জল শুকিয়ে যাবে। তখন ওদের নদীতে নেমেই জল তুলে আনতে হবে। সে বড় শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

মহাদেব আঁজলা করে জলপান করে। কোটপ্যান্ট থেকে রক্তের দাগগুলো ধুয়ে ফেলতে চায়—পারে না। সব দাগ ওঠে না, সব ক্ষত শুকোয় না।

চৌকিদার বসেছিল ডাকবাংলোর সামনে। দেখতে পেয়ে মহাদেবকে কাছে ডাকে। মহাদেব এসে তার পাশে বসে। চৌকিদার ওকে বড়ই ভালবাসে। কত সাবদের নিয়ে মহাদেব এখানে আসে। তাঁরা চৌকিদারকে বকশিশ দেন। মহাদেব তার হয়ে সাবদের কাছে ওকালতি করে, 'আপনারা তো আলমোরা হয়ে ফিরবেন ? একবার ইঞ্জিনীয়ার সাবকে যদি চৌকিদারের মাইনে বাড়ানোর কথা বলেন, বড়ই ভালো হয়। এদের কত কাজ। এত বড় বাগান, এত বড় বাড়ি। বাসনকোসন আসবাবপত্র—কত দায়িত্ব। অথচ মাইনে মোটে পনেরো টাকা।'

সাবরা কথা দেন, তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। চৌকিদার তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। মহাদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে ওঠে। সে আশায় দিন গুনতে থাকে। কিন্তু আশা আশাই থেকে যায়। তাই বলে মহাদেবের প্রতি প্রীতি কমে না তার।

আজ মহাদেবই প্রথম কথা বলে, 'আর কবে দেখা হয় বলতে পারি না চৌকিদার। কলকাত্তা চললাম।'

'শুনেছি। নোকরি পেয়েছিস বুঝি ? কে দিল রে ?'

'আরে সেই যে দুজন বাঙালী সাবকে নিয়ে এলাম না গত মাসে ! তাঁরাই টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। লিখেছেন নোকরি ঠিক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, নব্বুই টাকা মাইনে।'

'কি বলিস রে ? নব্বুই টাকা.... ?'

'জী। তাই তো লিখেছে। এই দেখ না চিঠি। ও, তুমি তো আবার ইংরেজী পড়তে পার না।' চিঠিখানা সযত্নে পকেটে রেখে দেয় মহাদেব।

'ভাল। খুব ভাল। আমার জন্য একটা খুঁজে-টুজে দেখিস না। তা আমি তো ইংরেজী পড়তে পারি না। একটু কম করেই বলিস—এই পঞ্চাশ-ষাট টাকা।'

'কিন্তু তোমার ক্ষেত-খামার, গরু-বাছুর, বাড়িঘর--এসব ফেলে কোথায় যাবে ?'

'আরে সে সব দেখবে তোর ভাবী। আমি নোক্‌রি করব, রুপিয়া ভেজবো।'

'আচ্ছা, সাবকে বলে দেখব। এবারে চলি তাহলে।' মহাদেব উঠে দাঁড়ায়।

'কিছু খেয়ে যাবি না ? সারাদিন তো খাওয়া হয় নি ?'

'তাতে কি হয়েছে ? একেবারে ঢাকুরি গিয়েই খেয়ে নেব। আর বসলে দেরি হয়ে যাবে।' মহাদেব চলতে শুরু করে।

চৌকিদারও তার সঙ্গে চলে। বলে, 'হ্যাঁরে, পার্বতীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলি ?'

'হ্যাঁ।' মহাদেব থমকে দাঁড়ায়।

'কি বলল ?'

'বলল—সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।' একটু থামে মহাদেব। বোধ হয় পরম তৃপ্তি সহকারে স্মৃতিটুকু রোমন্থন করে। তারপর অনুরোধ করে, 'তুমি ওর দিকে একটু নজর রেখো। তোমার চিঠির মধ্যে ওকে চিঠি দেব। ঠিকানা লেখা লেফাফা পাঠাব। দেখো যেন জানাজানি না হয়।'

চৌকিদার সানন্দে সম্মতি জানায়। মহাদেব মরসুমী ফুলেব বাগান পেরিয়ে, ডাকবাংলোর সীমানা ছাড়িয়ে, উঠে আসে বড় রাস্তায়।

এখান থেকে ডাকবাংলোকে বড়ই সুন্দর দেখায়। এ পথের সব ডাকবাংলোগুলোই ছবির মত। হয় কোন টিলার ওপর, নয় কোন নদীর বাঁকে, নিদেনপক্ষে কোন ঝরনার ধারে। যেমনি অবস্থান তেমনি সুবন্দোবস্ত। সামনের প্রশস্ত বারান্দা। বেশ বড় বড় দুখানি ঘর। কাচের দরজা-জানালা। মেঝেতে কার্পেট পাতা। প্রতি ঘরে ফায়ার-প্লেস টেবিল চেয়ার আলমারি আলনা আর দুখানি করে নেয়ারের খাটিয়া। লাগোয়া বাথরুম। বাইরে রান্নাঘর ও চৌকিদারের কোয়ার্টার। প্রয়োজন হলে বাসনপত্র ও তেলের খরচ দিলে টেবিল-ল্যাম্প পর্যন্ত পাওয়া যায়। আরও ওপরে অর্থাৎ দোয়ালি ও ফুরকিয়া ডাকবাংলোতে শীত বেশী বলে থুলমা (পশমী কম্বল) দেওয়া হয়। ভাড়া ঘর প্রতি দৈনিক দু টাকা মাত্র। আলমোরায় নির্মাণ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারকে তারিখ জানিয়ে চিঠি লিখে ডাকবাংলো রিজার্ভ করতে হয়।

পিণ্ডারী হিমবাহের যাত্রীরা এই খাতি গ্রামে এসেই প্রথম পিণ্ডারা নদীকে দর্শন করেন। এখান থেকে নদীর বাঁ-তীর দিয়ে পথ। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। মাইল চারেক পরে একটি পুল পেরিয়ে নদীর ডান তীরে যেতে হয়। কয়েক বছর আগে পুরনো পুলটি ভেঙে গিয়েছিল। নতুন পুল তৈরি হয়েছে। এই পুলের ওপর থেকে পিণ্ডারা নদীর দৃশ্য অপরূপ। ঘন সবুজ গাছে ছাওয়া পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে নদী। যেন পাহাড়ের পরপারে গহন আঁধারে বসে কেউ মুক্তা গলিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। সেই সফেন মুক্তধারা নৃত্যের তালে তালে সোপান বেয়ে আসছে নেমে। দু'কূল শিহরিত করে আকুল উচ্ছ্বাসে যাচ্ছে বয়ে।

নদী পেরিয়ে পথটি উঠে গেছে ওপরে। বেশ কষ্ট হয় কিন্তু তার পরে আর তেমন চড়াই

নেই। মাইল তিনেক হেঁটে একটা পুল পেরিয়ে দোয়ালি। ডাকবাংলোর ঠিক সামনেই কাফনি নদী এসে পিণ্ডারার সঙ্গে মিলেছে।

দোয়ালি থেকে কাফনি হিমবাহ আট মাইল। খুব সকালে রওনা হয়ে গেলে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসা যায়। তবে বেশ দুর্গম পথ।

দোয়ালি ডাকবাংলার দুদিকে তুষারাবৃত পাহাড়। দিনরাত সে পাহাড়ের চূড়ায় মেঘদলের লুকোচুরি খেলা চলেছে। কখনও আঁধার, কখনও আলো। কখনও আকাশ ভেঙে তুষার ঝরছে, কখনও সোনালী রোদে ঝিমমিল করছে।

দুই পাহাড়ের মাঝে, দুই নদীর সঙ্গমে সামান্য খানিকটা প্রায় সমতল ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ড। অধিকাংশ জায়গা জুড়েই ডাকবাংলো। ডাকবাংলোর সামনে সঙ্গমের দিকে একফালি উঠোন—কিছু মরসুমী ফুলের গাছ। পেছনে একটু উঁচুতে চৌকিদারের কোয়ার্টার ও রান্নাঘর। তারপরেই জঙ্গল শুরু; দোয়ালির উচ্চতা ৮৯৬৭ ফুট। স্বভাবতই বেজায় শীত। তবে কাঠের অভাব নেই। নদীর অবিরাম গর্জন শুনতে শুনতে মনের আনন্দে আগুন পোহানো যায়।

দোয়ালির পরে পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম। যেমনি চড়াই তেমনি উতরাই। কিন্তু ভারী সুন্দর পথ। বাঁদিকে পিণ্ডারা নদী, ডানদিকে সবুজ গাছে ছাওয়া পাহাড়। পথের পাশে ঘন ঘাস আর নানা রঙের পাহাড়ী ফুল। মাঝে মাঝেই ঝরনা। প্রতিটি ঝরনার ওপরেই পুল আছে। রাস্তা দুর্গম হলেও বিপজ্জনক নয়। নির্মাণ বিভাগের প্রশস্ত পাহাড়ী পথ। পিণ্ডারী পর্যন্ত ঘোড়া যায়। যাঁরা পদযাত্রার প্রত্যাশী অথচ পর্বতাভিযানে সাহসী নন, তাঁদের অবশ্যই আসা উচিত এ পথে। এমন দুর্গম অথচ সুব্যবস্থাসম্পন্ন, সুন্দর অথচ বিচিত্র পাহাড়ী পথ খুব বেশী নেই ভারতে।

দোয়ালি থেকে তিন মাইল হেঁটে জঙ্গলের সীমারেখা ছাড়িয়ে মাইলখানেক পরে ফুরকিয়া, এ পথের শেষ ডাকবাংলো—১০,৭০০ ফুট। ডাকবাংলোটি আগের ডাকবাংলোগুলোর মত সাজানো-গোছানো নয়। দুখানি ঘর। একটু উঁচুতে চৌকিদারের কোয়ার্টার ও রান্নাঘর। বহু নিচে পিণ্ডারা নদী। জলের অসুবিধা, কাঠও নেই। সারাদিন হাওয়া চলে। ফলে হাড়-কাঁপানো শীত। তা হলেও ফুরকিয়া পর্যটকদের বড়ই প্রিয়। ডাকবাংলোর লগবুক তাদের মননধর্মী রচনায় সমৃদ্ধ। এদের মধ্যে 'সমকালীন'-সম্পাদক শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্তের কবিতাটি উল্লেখযোগ্য—

'উঠিতে চড়াইগুলি, পিতৃনাম গেছি ভুলি,
কয়দিন জ্বলিয়াছে পিত্ত;
দেখিলাম গ্লেসিয়ার, মনে ক্ষোভ নাই আর,
আজ মোর ভরিয়াছে চিত্ত।'

ফুরকিয়া থেকে পিণ্ডারী হিমবাহের পদপ্রান্ত আরও পাঁচ মাইল। পথ তেমন কষ্টকর নয়। মাইলখানেক পরেই গ্রাবরেখা শুরু। নানা রঙের বিরাট বিরাট পাথরে বোঝাই বিস্তীর্ণ প্রান্তর। গ্রাবরেখার ওপরই পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে পথ—সামান্য চড়াই। পর্যটকরা বিস্মিত হন—এই পথের পাশে মেষপালকদের অস্থায়ী আশ্রয়। গ্রাবরেখার ওপরেও মানুষ ঘর বেঁধেছে, গুমফা গড়েছে।

বাঁদিকে তেমনি পিণ্ডারা নদী আর ডানদিকে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে প্রস্তরপ্রবাহ। শীতকালে এই পাথুরে প্রান্তর পেরিয়ে তুষারপ্রবাহ নেমে এসে ফুরকিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ছেয়ে ফেলে। কোন কোনবার অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই তুষারপাত

শুরু হয়ে যায়। ১৯৬১ সালে যেবার তোমাদের আনন্দদা ও মঞ্জু বৌদি পিণ্ডারী দেখতে এলেন আর শ্রীনীরোদ চৌধুরীর ছেলে পৃথ্বী নন্দাকোট শৃঙ্গে আরোহণ করল, সেবারেও তাই হয়েছিল। তাঁদের ফুরকিয়া থেকেই বরফ ভাঙতে হয়েছিল।

সেই পাথুরে প্রান্তরের ওপর দিয়ে মাইলতিনেক হেঁটে পিণ্ডারী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা। অনেকটা পাথরের দ্বীপের মত। আস্তে আস্তে উঁচুতে উঠে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়েছে। সেখানেই পদযাত্রার যতি। একখানা সাদা পাথরের ওপর কালো রঙে লেখা—

বাগেশ্বর—৫০

পিণ্ডারী—০

বাঁদিকটাই দেখার মত। একেবারে উন্মুক্ত কয়লাখাদ—তবে তার চেয়ে অনেক প্রশস্ত, অনেক গভীর, অনেক ভয়াবহ। নিচের দিকে তাকাতে ভয় করে। কিন্তু তাকাতে হয়। কারণ সেই খাদের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে পিণ্ডারা নদী।

সামনে দিগন্তপ্রসারী বিস্তীর্ণ হিমবাহ, বারো থেকে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। যেন আকাশ থেকে নেমে এসে অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেছে। সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে পিণ্ডারী হিমবাহ। হিমবাহের ডানদিকে তুষারাবৃত নন্দাকোট, বাঁদিকে নন্দাদেবী-পূর্বশৃঙ্গ। তার পেছনেই নন্দাদেবী। কিন্তু দেখা যায় না। সামনে আরেকটি পাহাড় নন্দাদেবীকে আড়াল করে রেখেছে। এই পাহাড়টির গা বেয়েই নেমে এসেছে পিণ্ডারী নদী—পাঁচ-ছ' হাজার ফুট দীর্ঘ একটি সচল সরল রেখা।

অদৃষ্ট ভাল না হলে এ দৃশ্য দেখা যায় না। ভাল আবহাওয়া পাওয়া ভাগ্যের কথা। বহু যাত্রী সেখানে গিয়ে পিণ্ডারীকে না দেখে ফিরে আসেন। মেঘের ঘোমটায় সে ঢেকে রাখে নিজেকে। তবে মে-জুন ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেকেই অবগুণ্ঠনহীনা পিণ্ডারীর অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করে মুগ্ধ হন।

বাঙালী সাবদেরও নসীব ভাল ছিল। পিণ্ডারী পৌঁছে আধঘণ্টা তাঁরা মেঘমুক্ত আকাশ পেয়েছিলেন। তারই মধ্যে ফোটো তোলা ও চা বানানো হয়ে গেল। মহাদেব চায়ের সরঞ্জাম, জল ও আলুসেদ্ধ নিয়ে গিয়েছিল। দুখানি আধপোড়া কাঠ পড়ে ছিল সেখানে। আগের যাত্রীরা ফেলে গিয়েছিলেন। হাওয়াকে ফাঁকি দিয়ে, পাথরের আড়ালে সেই কাঠ জ্বালিয়ে চা বানিয়েছিল মহাদেব। কিন্তু চা ও আলুসেদ্ধ খেতে খেতেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে এল। মুষলধারে তুষারপার শুরু হল। ওয়াটারপ্রুফ ছিল সঙ্গে। সাবদের কোন কষ্টই হয় নি। আর মহাদেবের কথা আলাদা। রোদ আর বরফ দুটোই সে সমান সহ্য করতে পারে। জুতো তার একজোড়া আছে, তবে সে-জোড়া সাধারণতঃ কাঁধে বয়েই বেড়ায়। ওই ঠাণ্ডায় নগ্নপায়ে তাকে পাথরের ওপর দিয়ে চলতে দেখে সাবরা বিস্মিত হয়। মহাদেব শুধু হাসে আর মনে মনে ভাবে...শরীরের নাম মহাশয়, তাকে যা সওয়ায় তাই সয়।

কুমায়ুনের অন্য যে কোন হিমবাহে যাওয়ার চেয়ে পিণ্ডারী যাওয়া সহজ। কিন্তু এই পিণ্ডারীর ওপর দিয়েই ট্রেল্‌স্ গিরিবর্ত্মের পথ। কুমায়ুন ডিভিশানের দ্বিতীয় বৃটিশ ডেপুটি কমিশনার মিঃ জি. ডাবলু. ট্রেল্ দানপুর পরগণার সুপি গাঁয়ের মালক সিং বুদার সঙ্গে কয়েকজন স্থানীয় কুলি নিয়ে ১৮৩০ সালে হিমালয়ের এই দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেছিলেন। নন্দাদেবী-পূর্ব পর্বতের রক্ষাপ্রাচীর (sanctuary wall) থেকে যে গিরিশিরাটি নন্দাকোট পর্বতের দিকে চলে গেছে, তারই ওপরে এই গিরিবর্ত্মটি অবস্থিত।

অতিক্রম করা তো দূরের কথা, একে খুঁজে বার করাই দুরূহ ব্যাপার। কারণ গিরিশিরাটির

সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে এই গিরিখাতটির উচ্চতা মোটে সাড়ে তিনশ ফুট কম। পিণ্ডারীর দিকে ঝুরো বরফ, মারাত্মক ফাটল ও খাড়া বরফের দেওয়াল, আর মিলামের দিকে পিচ্ছিল তুষারাবৃত বিশাল প্রান্তর। এর ওপর থেকে নন্দাকোট শৃঙ্গের পশ্চিমভাগ এবং নন্দাদেবীর দুটি শৃঙ্গই দেখা যায়। মিঃ ট্রেল্ পিণ্ডারীর দিক থেকে রওনা হয়ে এই ১৭,৭০০ ফুট উঁচু গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে গৌরীগঙ্গা উপত্যকার মাতোলি গ্রামে পৌঁছেছিলেন।

তারপর একশ চল্লিশ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে পর্বতারোহণের কত সাজসরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আজও এই গিরিবর্ত্ম দুরতিক্রম্য। সেদিনকার সেই আবিষ্কারের অনেকখানি কৃতিত্ব পথপ্রদর্শক মালক সিং বুদার। কিন্তু মিঃ ট্রেল্ নিজে পর্বতারোহী না হলে সেদিন এই দুর্গম গিরিবর্ত্ম আবিষ্কৃত হত না। তাই ক্লাইভের নাম কবে মুছে গেছে কলকাতার বুক থেকে কিন্তু এই গিরিবর্ত্ম আজও বৃটিশ শাসক জি. ডাবলু. ট্রেল্-য়ের নামকীর্তন করে চলেছে।

ট্রেল্স গিরিবর্ত্মের কথা নয়, মহাদেব ভেবে চলে পিণ্ডারীর কথা। সেদিন ওরা নির্বিঘ্নেই ফিরে এসেছিল দোয়ালি। আর সেই তুষারপাত মাথায় করেই মহাদেব প্রস্তাবটা পেশ করেছিল, 'সাব, আমাকে আপনাদের সঙ্গে কলকাত্তায় নিয়ে চলুন। আমি নোকরি করব।'

'কলকাতায় যে বড়ই গরম রে মহাদেব। তোরা শীতের দেশের লোক। পারবি কি সেখানে থাকতে ?'

'পারব সাব। পারতেই হবে আমাকে। আমার যে অনেক টাকার দরকার।'

'অনেক টাকা ? কি করবি ? জমি কিনবি বুঝি ?'

'না সাব...,' মহাদেব একসঙ্গে বলতে পারে নি কথাটা। একটু থেমেছিল।

'কি কিনবি তবে ?'

'আওরৎ কিনব সাব।'

তারপর মহাদেব সব কথা খুলে বলেছে সাবদের কাছে। একজন সাব জিজ্ঞেস করেছেন তাকে, 'দারোয়ানের কাজ করতে পারবি ?'

'পারব সাব।'

'নব্বই টাকা মাইনে পাবি।'

'আমি যাবো সাব।'

তাঁরা তার ব্যস্ততা দেখে হেসে দিয়েছেন। বলেছেন, 'এখনই যাবি কি রে ? আমরা ফিরে গিয়ে তোর চাকরি ঠিক করে চিঠি দেব। তারপর যাবি।'

তাঁরা তাঁদের কথা রেখেছেন। ফিরে গিয়েই তার চাকরির ব্যবস্থা করে চিঠি লিখেছেন—টাকা পাঠিয়েছেন। তাই আজ পার্বতীর কাছ থেকে বিদায় নিতে মহাদেব এসেছিল এখানে। মেনকা দেবীর নিষেধ না শুনে সে গিয়েছিল তাঁর বাড়িতে। আর তার ফলও পেয়েছে হাতেনাতে। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। তা করুক্ গে। আওরৎ নিয়ে রক্তপাত কিছু নতুন নয় ওদের সমাজে। তবে রক্তের বিনিময়ে মহাদেব তো পার্বতীকে পেয়েছে। পার্বতী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—সে প্রতীক্ষা করবে।

আনন্দিত মহাদেব এগিয়ে চলে। চৌকিদারকে নমস্কার করে উঠে আসে বড় রাস্তায়। চলতে থাকে ঢাকুরির পথে।

আর কুকুরটা ? সে আজও চলেছে তার সঙ্গে। চলবেই তো, ওরা যে পশু। টাকাটা পরিমাণে প্রীতির পরিমাপ করে না।

এই ভুটিয়া কুকুরটা খাতি ডাকবাংলোর স্থায়ী বাসিন্দা। যাঁরাই ডাকবাংলো ছেড়ে চলে যান, তাঁদের বহুদূর অবধি এগিয়ে দিয়ে আসে। সঙ্গে নিতে না চাইলেও সঙ্গ ছাড়ে না। আজও সে মহাদেবের সঙ্গে চলেছে। তেমনি আগে আগে ছুটছে আর কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মহাদেবকে দেখছে আর পথের গন্ধ শুঁকছে। মহাদেব এসে পৌঁছলে আবার ছুটতে শুরু করছে।

পথের ওপরে, পাহাড়ের গায়ে, বনের মধ্যে কাদের পায়ের শব্দ ! মহাদেব থমকে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, সে যা ভেবেছে তাই। গাঁয়ের মেয়েরা পাতা জড়ো করছে, ঘাস কাটছে, কাঠ কুড়োচ্ছে। শীত আসছে তাই ওরা জ্বালানী আর গরু-ভেড়ার রসদ সংগ্রহ করে রাখছে। কুমায়ুনের মেয়েরা শুধু সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী নয়, ওরা পরিশ্রমী। ওরা কাজ করে—গহন-গিরি-কন্দরে, ঘরে ও বাইরে।

এদের অনেকেই পার্বতীর সই। মহাদেব ওদের চেনে। ওরাও তাদের দুজনকে জানে। তাই তারা হাসিমুখে এগিয়ে আসে কাছে। কুশল জিজ্ঞেস করে। মহাদেব জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চায় তার মুখে। কিন্তু আজ আর হাসি আসে না। আজ যে পার্বতী নেই ওদের সঙ্গে। প্রতিবার পিণ্ডারী আসা-যাওয়ার পথের ধারে এমনি কোনখানে পার্বতীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। সাবদের এগিয়ে যেতে বলে মহাদেব দাঁড়িয়ে পড়েছে। পিঠ থেকে বোঝা নামিয়েছে। আনন্দে, আবেশে পার্বতী প্রথমে কথা বলতে পারে নি। সখীরা সুযোগ করে দিয়েছে, সরে গেছে দূরে। ওরা দুজনে বসেছে পথের ধারে। গল্প করেছে—কত গল্প, কত হাসি, আর কত স্বপ্ন।

তারপরে একসময় পার্বতী মনে করিয়ে দিয়েছে, 'আর দেরি করিস না। সাবরা না জানি কতদূর এগিয়ে গেলেন। চল, আমি তোকে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছি।'

'কিন্তু তুই একা ফিরবি কেমন করে ?' মহাদেব চিন্তিত হয়েছে।

'একা ফিরব কেন ? ঐ যে ও রয়েছে সঙ্গে।' পার্বতী কুকুরটাকে দেখিয়ে দিয়েছে।

মহাদেব তার বোঝার দিকে হাত বাড়িয়েছে। পার্বতী তার হাত দুখানি ফেলেছে। মহাদেব অবাক হয়েছে। পার্বতী আদেশ করেছে, 'বোঝাটা বেঁধে দে তো আমার পিঠে। তোকে একটু সাহায্য করি পথ চলায়।'

'কি দরকার ? এই তো সবে চলা শুরু করেছি। তাছাড়া তুই পারবি কি এই তিরিশ সের ওজন বইতে ?'

'বাজে কথা না বলে যা বলছি তাই কর। বোঝাটা বেঁধে দে আমার পিঠে।'

মহাদেব আর পার্বতীকে ঘাঁটাতে সাহস পায় নি। বিনা প্রতিবাদে তার আদেশ পালন করেছে। পার্বতী মহাদেবের একখানি হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে অক্লেশে পথ চলা শুরু করেছে। হাসতে হাসতে বলেছে, 'দ্যাখ পারি কিনা। কি ভেবেছিস আমাকে ? তোর সব বোঝা বইবার শক্তি আমার আছে।'

অভিভূত মহাদেব নিঃশব্দে পথ চলেছে। কামনা করেছে সে পথ যেন কোনোদিন না ফুরোয়।

কিন্তু মানুষের কামনা কি কখনও পূর্ণ হয়েছে বাস্তব জীবনে ? একসময় তাদের পথ ফুরিয়েছে। কুকুরটাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে খেয়াল হয়েছে ওদের, এবারে দুজনকে বিদায় নিতে হবে দুজনের কাছ থেকে। বোঝা বদল করেছে। দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। তারপর উভয়ে উভয়ের অধরে বিদায়ের স্মৃতিচিহ্ন দিয়েছে এঁকে।

কাঁদতে কাঁদতে পার্বতী ফিরে গেছে গাঁয়ের পথে। মহাদেব সজল চোখে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। কুকুরটাও পার্বতীর সঙ্গে গেছে। তার প্রতি মমতায় মহাদেবের অন্তর ভরে উঠেছে। সে যে তার প্রিয়ার পথ চলার সঙ্গী—তার পরম প্রিয়।

একসময়ে উতরাই পথে অদৃশ্য হয়েছে ওরা। অদূর ভবিষ্যতে আবার মিলিত হবার আশায় মহাদেব সেদিন পথ চলা শুরু করেছে। সে পথ আজও ফুরোয় নি।

আজও গাঁয়ের মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহাদেব এগিয়ে চলে। আজ পার্বতী নেই। কিন্তু পার্বতীর সাথী সেই কুকুরটা আজও তেমনি করে মহাদেবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আজ ওকে একা একা ফিরে আসতে হবে।

মহাদেব ভেবে চলে—আচ্ছা, যেদিন সে এই পথ দিয়ে পার্বতীকে নিয়ে যাবে চিরকালের মত, সেদিন ? সেদিনও কি কুকুরটা ওদের সঙ্গে আসবে ? তাহলে তো তাকে আজকের মতই একা ফিরে যেতে হবে। না, ওকে সেদিন ফিরে যেতে দেবে না মহাদেব। চৌকিদারের কাছ থেকে ওকেও সে চেয়ে নেবে চিরকালের মত। কিন্তু তাদের যে চলে যেতে হবে কলকাত্তায়। সেখানে নাকি প্রচণ্ড গরম। এ দেশের কুকুর কি বাঁচবে সে দেশে ?

পিণ্ডারী নদীর স্নিগ্ধ মধুর কলতান কখন মিলিয়ে গেছে। অদৃশ্য হয়েছে সবং আর ওয়াছং গ্রাম—রামদানা আর ভুট্টার ক্ষেত। চড়াই ভেঙে বনময় ঢাকুরির দিকে এগিয়ে চলেছে মহাদেব। বরফাবৃত পর্বতচূড়াগুলো ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে। সে ওপরে উঠছে, ক্লান্ত বোধ করছে। কেনই বা করবে না ? কম হলেও চড়াই পথ তো বটে। খাতি থেকে ঢাকুরি পাঁচ মাইল। প্রায় চোদ্দশ ফুট চড়াই ভাঙতে হয়। একটু জিরিয়ে নিলে হত। কিন্তু দিনের আলো মিলিয়ে যেতে আর বেশী দেরি নেই। সন্ধ্যার আগেই পৌছতে হবে ঢাকুরি ডাকবাংলোয়। রাতে তো বটেই, এমন কি দিনেও একা একা এ পথে চলা নিরাপদ নয়। বাঘ-ভালুক ও অন্য হিংস্র জন্তুর উপদ্রব আছে। মহাদেব পা চালিয়ে চলে।

তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর শেষ হল। কুকুরটা মহাদেবের দিকে একবার তাকিয়ে ফিরে গেল গাঁয়ের দিকে। ওর পথ ফুরিয়েছে। এবারে ঘন জঙ্গলে ঘেরা স্যাঁতস্যাঁতে পথ শুরু হল। পথের পাশে দুদিকেই ছোটবড় গাছ—চিড় আর দেওদারের বন। কাঁটা গাছ আর রং-বেরংয়ের ফুল। পাথরের গায়ে নানা রকমের 'মস'।

একটা ঝরনার ধারে এসে থামল মহাদেব। নেমে গিয়ে আঁজলা ভরে জল খেল। তৃষ্ণা মেটে কিন্তু মন শান্ত হয় না। পার্বতী এখন কি করছে ? কথাটা নিশ্চয়ই এতক্ষণ তার মায়ের কানে গেছে। মা বোধ হয় আবার মারধোর শুরু করেছে। মহাদেব ফিরে যাবে নাকি ? আজই ছিনিয়ে নিয়ে আসবে পার্বতীকে ? তারপর ? কেন, তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে কলকাত্তা। বাঙ্গালী সাব বিস্মিত হবেন না। তাঁদের কাছে তো মহাদেব বলেছেই পার্বতীর কথা। কিন্তু তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হলে যে আরও টাকা চাই—অনেক টাকা। বাস আর রেল-ভাড়াই চল্লিশ টাকার বেশী। তার ওপরে তিনদিনের পথখরচ। হায় ভগবান, সে এত গরীব কেন ? আর গরীবই যখন হল, তখন পার্বতীর সঙ্গে তার পরিচয় হল কেন ? তুমি তাদের প্রণয়াসক্ত করলে কেন ?

ঢাকুরি ডাকবাংলোর সামনে খোলা জায়গাটুকুতে আগুনের ধারে বসেছিল চৌকিদার ভরত সিং ও ডাকপিওন। চৌকিদার চায়ের আয়োজন করছিল আর ডাকপিওন তার হ্যাভারস্যাক খুলে অবশিষ্ট চিঠিগুলো বোধ হয় আরেকবার সাজিয়ে নিচ্ছিল। পিণ্ডারীর হাঁটাপথে একটি মাত্রই ডাকঘর আছে—লোহারক্ষেতে। সেখান থেকেই চিঠি নিয়ে আসতে হয় ডাকপিওনদের।

পাঁচ-সাত বর্গমাইল জায়গা জুড়ে এক-একজন ডাকপিওনের কর্মক্ষেত্র। তারা চড়াই-উতরাই ভেঙে ডাক বিলি করে। সপ্তাহে একবারের বেশী বিলি করা সম্ভব হয় না।

চৌকিদার মহাদেবকে বসতে বলে। আগুনটা খুব জোরে জ্বলছে। বেশ আরাম লাগে মহাদেবের। বড়ই শীত এখানে। উচ্চতা ৮৬০০ ফুট। তবে কেবল উচ্চতার জন্যই এত শীত নয়। দোয়ালি তো এখান থেকেও ৩৬৭ ফুট উঁচু। কিন্তু এখানে অনেক বেশী শীত। ফলে চার মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম নেই।

অদ্ভুত অবস্থান এই ঢাকুরির। সামনে আরকোট, নন্দাকোট, নন্দাখাত এবং আরও অনেক জানা-অজানা তুষারধবল শৃঙ্গ আর পেছনে ঘন সবুজ বন। বনের মধ্য দিয়ে দুটি পথ চলে গেছে দুদিকে। একটি গেছে সুন্দরঢুঙ্গা উপত্যকায়। সেই পরম রমণীয় উপত্যকার খানিকটা দেখা যায় ঢাকুরি থেকে। দেখা যায় সুন্দরঢুঙ্গা নদী। ঘন সবুজের মাঝে উজ্জ্বল সাদা একটি আঁকাবাঁকা রেখা। সেই রূপোলী রেখাই সুন্দরের পূজারীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় অনিন্দ্যসুন্দর সুন্দরঢুঙ্গায়। দেখা গেলেও ঢাকুরি থেকে সুন্দরঢুঙ্গা উপত্যকার দূরত্ব প্রায় বিশ মাইল। চড়াই-উৎরাই পথ। যেতে অন্তত দিন দুয়েক সময় লাগে। পথে পড়ে ওয়াছং আর জাতোলি গ্রাম। জাতোলি ঢাকুরি থেকে প্রায় বারো মাইল। এ পথের শেষ জনপদ। আর একটি পিণ্ডারী-কাপকোট পথ। সেই পথ থেকে এক মাইলে প্রায় হাজার ফুট নেমে এসে এই ঢাকুরি ডাকবাংলো। যতই শীত হোক, সাবরা কিন্তু বড়ই পছন্দ করেন এই মনোরম স্থানটিকে। তাঁরা ডাকবাংলোর শার্সি-ঘেরা বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে পাহাড়ের চূড়ায় সোনালী সূর্য আর রূপোলী মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখেন। কখনও বা বৃষ্টিভেজা ঝক্‌ঝকে রোদ এসে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঠের মেঝেতে বিছানো লাল কার্পেটের ওপরে। আবার অতর্কিতে তারা যায় মিলিয়ে। টিনের চালের ওপর টুপটাপ শব্দ হয়। বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ে। একটু বাদেই সে শব্দ যায় কমে, জল যায় জমে। শুরু হয় তুষারপাত। শীতকাতুরে সাবরা আর ঘেরা বারান্দায় বসে থাকতে সাহসী হন না। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দেন। ওভারকোট গায়ে দিয়ে ফায়ার-প্লেসের সামনে বসে শীত আর তুষারের গল্প শোনেন। মহাদেব বলে—নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত একটানা তুষারপাত হয় এখানে। ছ'সাত ফুট বরফ পড়ে। সমস্ত ডাকবাংলোটি তলিয়ে যায় তুষারের তলে। সেই শ্বেত-শ্মশানে শেষ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই ডাকবাংলোর চালাখানি থাকে জেগে। সাবরা বিস্মিত হন। জিজ্ঞেস করেন—চৌকিদার? মহাদেব উত্তর দেয়—চৌকিদার তার আগেই পালিয়ে যায় নিচে।

চৌকিদার একটা পেতলের গ্লাসে খানিকটা চা এগিয়ে ধরে মহাদেবের দিকে। মহাদেব বাস্তবে ফিরে আসে। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নেয় সে। চুমুক দেয়। পরম তৃপ্তি ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে।

কেটলিটা ভাল করে ধুয়ে নিয়ে চৌকিদার আবার জল চড়ায়। মহাদেব বলে, 'ফের চা বানাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। এক তপস্বিনী এসেছেন। তাঁরই জন্য শুদ্ধভাবে চা বানাচ্ছি।'

'তিনি ডাকবাংলোয় আছেন বুঝি?'

'না।' চৌকিদার দুঃখের সঙ্গে বলে, 'ডাকবাংলোর ভাড়া দেবার মত বাড়তি টাকা নাকি নেই তাঁর কাছে। আমি এমনি থাকতে বলেছিলাম। তাতেও রাজী হলেন না।'

'তাহলে তিনি কোথায় থাকবেন?'

'আমার ঘরে।'

'সে কী ? তোমার অতটুকু ঘরে কজন শুতে পারব ? আমাকে যে আজ থাকতে হবে এখানে ?' মহাদেব চিন্তিত হয়।

'কি করব। তুই আর ডাকপিওন ডাকবাংলোয় থাকবি।'

মহাদেব নিশ্চিন্ত হয়। ধীরেসুস্থে জিজ্ঞেস করে, 'সে তপস্বিনীর সঙ্গে আর কেউ নেই ?'

'আছে একজন কুলি। সেও ঘুমিয়ে পড়েছে আমার ঘরে। তোদেরই গাঁয়ের লোক। কি নাম যেন...' চৌকিদার একটু ভেবে নিয়ে বলে ওঠে, 'বচন সিং।'

'বচন সিং...তপস্বিনী....। আচ্ছা তিনি কোথা থেকে এসেছেন ?'

'থাকেন নাকি ল্যান্সডাউনে। এখন এসেছেন নৈনিতাল থেকে।'

'কত বয়স হবে ? কি রকম দেখতে ?'

'বছর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ। খুবই রোগা। দেখে দুর্বল মনে হয় কিন্তু দারুণ কষ্টসহিষ্ণু আর তেজস্বিনী। হিমালয়ের সব তীর্থ দর্শন করেছেন। এমন কি কাকভুষণ্ডী ঘুরে এসেছেন।'

'কিন্তু তিনি এখানে এসেছেন কেন ? এখানে তো কোন তীর্থ নেই ?'

'যাচ্ছেন সুন্দরঢুঙ্গার উপত্যকা দেখতে। প্রাণের পরোয়া করেন না। ব্রহ্মচারিণী তপস্বিনী।'

'কার সঙ্গে এসেছেন বললে ? বচন সিং...তপস্বিনী ?' মহাদেব একটু ভেবে নেয়। তারপর বলে ওঠে, 'তাঁকে তপস্বিনী কি বলছ ? তিনি তো আমাদের জোশী মেমসাব। ল্যান্সডাউন মেয়েদের কলেজের প্রফেসার।'

'তুই তাঁকে চিনিস নাকি ?'

'চিনি না ? তিনি আমাদের কাপকোট গান্ধী আশ্রমে কত থেকেছেন। যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।' মহাদেব উঠে দাঁড়ায়।

চৌকিদারের ঘর। ছোট ঘর। একপাশে আগুন জ্বলছে। আগুনের ধারে ঘুমিয়ে আছে বচন সিং। দেয়ালের ধারে একখানি কম্বল পেতে একটা ছোট থলি মাথায় দিয়ে শুয়ে আছেন স্নেহলতা। বই পড়ছেন। পরনে রঙীন খদ্দরের শাড়ী, গায়ে ফুলহাতা উলের জামা। পায়ে একজোড়া মোজা। কাপড়ের জুতো-জোড়া একপাশে খুলে রেখেছেন। দেহ অলঙ্কারশূন্য। তবে বাঁ হাতের মণিবন্ধে ঘড়িটি ঠিক বাঁধা আছে। থাকবেই তো, অন্য মেমসাবদের মত ওটা তো তাঁর অলঙ্কার নয়। সভ্য জগৎ থেকে বহুদূরে, গহন-গিরি-কন্দরে—হিংস্র শ্বাপদসংকুল অরণ্য, জনহীন উপত্যকা আর দুর্গম হিমবাহে যাঁকে প্রাণ হাতে করে ঘুরে বেড়াতে হয়, ঘড়ি তাঁর কাছে অপরিহার্য।

মহাদেব অনেক শুনেছে তাঁর কথা। কিন্তু কেন তিনি এরকম ঘুরে বেড়ান তা কেউ বলতে পারেন না। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—আমি কুমায়ুনের মেয়ে। আমি দেখবো না কুমায়ুনের বুকে কি লুকিয়ে আছে ?

মহাদেব তো সাবদের নিয়ে আসে এ পথে—পিণ্ডারী হিমবাহের সহজ সুগম পথে। তাঁদের সঙ্গে কত মেমসাবরাও আসেন। তাঁদের কত সব রকমারি পোশাকের বাহার। কত খাবারদাবার, ওষুধপত্র, সাজসরঞ্জাম তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন। আর এ মেমসাবের সঙ্গে দুখানি কম্বল, দু-একটা বাড়তি জামাকাপড়। সামান্য কিছু আটা আলু চা দুধ ও চিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ তিনি যাচ্ছেন অতি অপরিচিত দুর্গম অঞ্চলে। গতমাসে একজন পর্বতারোহী দলবল নিয়ে গিয়েছিলেন সুন্দরঢুঙ্গা। ছোটখাটো একটি পর্বতাভিযানের উপকরণ সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁরা। আর এই মহীয়সী মহিলা—একজন কুলির সঙ্গে এইভাবে চলেছেন

সেই দুর্গম অঞ্চলে। আশ্চর্য এঁর মনোবল, বিচিত্র এঁর সাধনা।

মহাদেব ঘরে ঢুকে ঢিপ করে প্রণাম করে মিস্ জোশীকে।

'কে ? ও তুই !' তিনি বইখানি পাশে রেখে উঠে বসেন। বলেন, 'কি ? তুই কোথা থেকে এলি ?'

'আজ্ঞে, খাতি গিয়েছিলাম। গাঁয়ে ফিরছি।'

'ভালই হল। বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে।' স্নেহলতা খুশী হন।

'আজ্ঞে....', মহাদেব শেষ করতে পারে না।

'কিরে, কি বলছিস ?'

'আজ্ঞে, আপনি ডাকবাংলোয় গিয়ে থাকুন। এখানে আপনার কষ্ট হবে, শরম লাগবে।'

'শরম লাগবে কেন রে ? চৌকিদার তো আমার চাচা, তোরা আমার ভাই। তোদের সঙ্গে থাকতে আমার শরম লাগবে ?'

'কিন্তু কেন আপনি ডাকবাংলোতে না থেকে এখানে রাত কাটাচ্ছেন মেমসাব ? ডাকবাংলোতে চলুন, বেশ আরামে থাকবেন। মহাদেব শেষ চেষ্টা করে।

'না রে। আরাম হারাম হ্যায়। মন চাইলে তোরা গিয়ে আরাম কর। আমি এ ঘরে থাকব।'

মহাদেব বুঝতে পারে মেমসাবের সঙ্গে আর তর্ক করা সমীচীন নয়। তা ছাড়া সে কিই বা বোঝে, কতটুকুই বা জানে এ জগতের ? সে শুধু জোশী মেমসাবের কথা ভেবে অবাক হয়। বড় ঘরের মেয়ে, কত লেখাপড়া জানেন। কোথায় ঘর-সংসার করবেন তা নয়, দুঃসহ দুঃখকষ্টের মধ্যে কিভাবে জীবন কাটাচ্ছেন। কিন্তু কেন তাঁর এই অন্তহীন দুর্গম পথ-পরিক্রমা ? যারা তাঁর পদযাত্রায় কুলি হয়েছে, তাদের কাছে মহাদেব শুনেছে, তিনি কোন তপস্যা করেন না। তবে কি কোন সমীক্ষা ? না, তাও নয়। পদযাত্রার কালে কেউ কোনদিন তাঁকে কিছু লিখতে দেখে নি। তিনি শুধুই অসীম অনন্তকে দর্শন করেন। কিন্তু কেন ? কে জানে ?

সকালে ঘুম ভাঙল ভরত সিংয়ের তিরস্কারে। উঠে বসেই লজ্জা পায় মহাদেব। সত্যই খুব দেরি হয়ে গেছে। সামনের তুষারাবৃত পর্বতমালার ওপরে সূর্য কখন তার সোনালী আলপনা আঁকা শেষ করেছে। প্রখর রোদে রাঙিয়ে দিয়েছে ডাকবাংলোর টিনের চাল আর আশেপাশের ছোট সমতল প্রান্তরটিকে। বনের সীমায় রোদ গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। দু'একটি নাম-না-জানা পাখী রোদ পোহাচ্ছে, ছুটোছুটি করছে, গান গাইছে।

'মেমসাব কি চলে গেছেন নাকি ?' মহাদেব ভরত সিংকে জিজ্ঞেস করে।

'তিনি কি তোর মত কুঁড়ের বাদশা যে এখনও ঘুমোবেন ?' ভরত সিং ঠাট্টা করে, 'তিনি এতক্ষণে দু-তিন মাইল এগিয়ে গেছেন।'

তাহলে তো আর দেরি করা উচিত নয়। মহাদেব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেয়। ভরত সিং বলে, 'চা হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়েই রওনা দে। যাবার আগে একটা দিনও যদি মার কাছে না থাকিস, তবে সে যে বড়ই দুঃখ পাবে।'

মহাদেব সে অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপরে সে চৌকিদারকে নমস্কার করে রওনা হয়। ভরত সিং ঝরনা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় তাকে। ঢাকুরীতে কোন নদী নেই। একটু দূরের এই ঝরনাই জলের একমাত্র উৎস। অবশ্যি সাবরা এখানে এসে জলের বড়

একটা ধার ধারেন না। ঢাকুরীর উচ্চতা ৮৬০০ ফুট। এর আগের ডাকবাংলো লোহারক্ষেত মোটে ৫৩৫০ ফুট উঁচু। কাজেই এখানে এসে তাঁরা সবাই শীতে কাতর হয়ে পড়েন। বড় রাস্তায় উঠে মাইলখানেক এগোলেই ঢাকুরীর উচ্চতম স্থান—৯৬০০ ফুট।

এখানে বসার জায়গা রয়েছে। যাত্রীরা যাবার সময় ক্রমাগত চড়াই ভেঙে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাই তাঁদের বিশ্রামের জন্য কর্তৃপক্ষের এই সামান্য আয়োজন। এ জায়গাটি বড়ই সুন্দর। গিরিশিরার প্রান্তসীমা, অনেকটা গিরিখাতের মত। যাবার পথে পাঁচ মাইল খাড়া চড়াই-পথের যতি এখানে, আর ফেরার পথে এখান থেকেই খাড়া উতরাই।

গিরিশিরার ওপর দিয়ে পাথর বাঁধানো পথ। তেমনি জঙ্গলাকীর্ণ, ছায়াঘন, স্যাঁতস্যাঁতে। ঝরা পাতার পচা গন্ধে ভরপুর। ভালুকের এলাকা। তাই কেউ একা চলে না এ পথে। মহাদেবও একা আসে নি কোনদিন। কেনই বা আসবে ? সে সাবদের নিয়ে যায় পিণ্ডারী। আর এবারে ? এবারে সে এসেছিল নিজের গরজে। পিণ্ডারী নয়—প্রিয়াদর্শনে। প্রিয়া তাকে কথা দিয়েছে—প্রতীক্ষা করবে। মহাদেব আবার আসবে এ পথে। হ্যাঁ, একাই আসবে, কিন্তু এমন একা একা ফিরে যাবে না। সঙ্গে থাকবে তার মানসী—প্রিয়া পার্বতী।

লাঠি ভর করে, পিচ্ছিল উতরাই পথ বেয়ে, মহাদেব সবেগে নেমে চলে। চলে নিচের সবুজ শ্যামল উপত্যকার দিকে। চলে গিরিশিরার পর গিরিশিরা বেয়ে, ঝরনার পর ঝরনা পেরিয়ে। তৃণাচ্ছাদিত ছোট ছোট উঁচুনিচু প্রান্তর ছাড়িয়ে। পথের দুধারে কাছে ও দূরের ছোট ছোট গ্রামকে পেছনে রেখে সে এগিয়ে চলে। চারিদিকের ধূসর-কালো পাহাড়গুলো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। না, মহাদেব আর যাবে না ওদের কাছে, পাহাড়ী মহাদেব পাহাড়কে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে—বহুদূরে। যেখানে তাকে উপোসী থাকতে হবে না, পেট পুরে চারটি খেতে পাবে, পার্বতীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারবে।

কাল বিকেলে বাড়ি পৌঁছে আজ দুপুর পর্যন্ত মায়ের কাছে কাটিয়েছে মহাদেব। দুপুরে সূর্য যখন ওদের চাওরা গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে ঢাকুরীর দিকে হেলেছে, তখন মহাদেব তার সেই কোট আর কম্বল কাঁধে করে রওনা হয়েছে কাপকোট। অসুস্থা মা গাঁয়ের পথটুকু পেরিয়ে বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়েছেন।

মহাদেবের বাবা নেই ? না, আছেন। তবে থেকেও নেই। তিনি থাকেন আলমোরায় তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে। দ্বিতীয় পক্ষ হলেও তিনি মহাদেবের বড়-মা। জ্যাঠামশাই মারা যাবার পরে তিনি মহাদেবের মা হয়েছেন। ওদের সমাজে যেমন বিধবা বিবাহের চলন আছে, তেমনি 'ভাবী'কে বিয়ে করাও অচল নয়। তিনি বয়সে বাবার চেয়ে কিছু বড়ই হবেন। তিনি থাকেন বাবার কাছে। আর মা মহাদেবকে নিয়ে রয়েছেন গাঁয়ের বাড়িতে। মহাদেব মা'র সঙ্গে কয়েকবার গেছে আলমোরায়—বাবার কাছে। তবে সে যাওয়া বেড়াতে যাওয়ার শামিল।

দিনমজুরী খেটে মা মহাদেবকে স্কুল পড়াতেন। তাঁর অনেক আশা ছিল, মহাদেব লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, তাঁর দুঃখ ঘোচাবে। মায়ের সে আশা পূর্ণ করতে পারে নি মহাদেব। বছর পাঁচেক আগে মায়ের শরীরটা ভেঙে পড়ে, প্রায়ই অসুখে ভুগতে থাকেন তিনি। বাধ্য হয়ে মহাদেবকে পড়াশুনা ছেড়ে কাপকোটে এক মহাজনের আড়তে মোট বইবার কাজ নিতে হয়। সেই তার কুলিগিরির হাতেখড়ি। জানতে পেরে বাবা তাদের পাঁচ টাকা মাসিক ভাতাও বন্ধ করে দিয়েছেন। মহাদেবের মা কোন অনুযোগ করেন নি। দারিদ্র্যে অধীর না হওয়ার শিক্ষাই মা তাকে দিয়ে এসেছেন চিরকাল।

তারপরে মহাদেব বৃত্তি বদলেছে। মহাজনের মোট ছেড়ে পর্যটকদের বোঝা পিঠে নিয়েছেন। কিন্তু তাতেও তার অবস্থা ফেরে নি। বড়জোর মা ও ছেলের কোনমতে পেট চলে। মা'র চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় নি তার পক্ষে। ফলে মায়ের শরীর দিন দিন আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। এখন তাঁকে প্রায় সব সময়েই শুয়ে থাকতে হয়। অসহায় মহাদেব শুধু নিজে নিজেই জ্বলেপুড়ে অস্থির হয়েছে। সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে নি।

সেই অসুস্থা মাকে ফেলে আজ মহাদেবকে চলে যেতে হচ্ছে। যেতে হচ্ছে গাঁ ছেড়ে, পিণ্ডারীকে ছেড়ে, পার্বতীকে ছেড়ে। কয়েক মাস বাদে এসে মহাদেব নিয়ে যাবে পার্বতীকে, সেই সঙ্গে তার মাকেও। মহাদেব যা পারে নি, পার্বতী তা পারবে। পার্বতীর সেবা ও যত্নে মা ভাল হয়ে উঠবেন। ছোট্ট একটি শান্তির সংসার গড়ে তুলবে মহাদেব। মায়ের সকল আশা পূর্ণ হবে।

সেই কথা বলেই মহাদেব আজ মায়ের অনুমতি পেয়েছে। মহাদেবের সুখশান্তির কথা ভেবেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাকে দেশত্যাগী হতে বলেছেন। অসুস্থ শরীরে বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে গেছেন। অবাধ্য অশ্রুরাশি মায়ের দু'চোখের কোল বেয়ে নেমে এসেছে। মহাদেব সান্ত্বনা দিয়েছে। কিন্তু সে অশ্রুধারা সংযত হয় নি। মহাদেবও আর না কেঁদে থাকতে পারে নি। প্রতিবেশীরা দুজনকেই সান্ত্বনা দিয়েছে। মহাদেবকে কথা দিয়েছে—তার অবর্তমানে তারা তার মাকে দেখাশুনো করবে। মহাদেব কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়েই মাকে প্রণাম করে প্রায় ছুটে চলে এসেছে।

মহাদেব নেমে চলেছে খাড়া উতরাই বেয়ে। একটা ঝরনার ধারে এসে থামল সে। জিনিসপত্র পথের পাশে রেখে ঝরনার পারে গিয়ে বসল। চোখেমুখে জল দিয়ে একটু জল খেল। তারপর উঠে গিয়ে পথের পাশের বেঞ্চিখানির ওপর বসল। এ পথে মাঝে-মাঝেই এমনি বিশ্রামের জায়গা আছে। সা'বরা আসা-যাওয়ার পথে এ-সব জায়গায় বসে বিশ্রাম করেন, ছবি তোলেন, আর তাকিয়ে থাকেন দূরে—ঐ মিলামের পথে লাহুল গাঁয়ের দিকে। কমনীয়া কুমায়ুনের অপরূপ রূপলাবণ্যের ছটায় তাঁদের প্রাণ-মন আনন্দে ও আবেশে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কুমায়ুনের মানুষ মহাদেব। কমনীয়া কুমায়ুনের রূপলাবণ্য তার মনে আনন্দের দোলা দেয় না। সে উঠে দাঁড়ায়, আবার এগিয়ে চলে। সে চলেছে সাবদের দেশে। চলেছে পেটের তাগিদে। সে দেশত্যাগী হয়েছে।

এখান থেকে লোহারক্ষেত বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। ডাকবাংলোটি যেন ছোটদের খেলাঘর। পাহাড়ের গায়ে ক্ষেতগুলো প্রকৃতির আলপনা। আর সরযূর ঐ অবিশ্রান্ত কুলুকুলু ধ্বনি নির্জন প্রকৃতির একমাত্র মহাসঙ্গীত।

এই সেই সরযূ। রামায়ণের সরযূ। তাই বলে অযোধ্যার সরযূর সঙ্গে এর কোন মিল নেই। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে দু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা যৌবনচঞ্চল এই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনীটি আর বিশাল বালুময় প্রান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা সেই বিগতাযৌবনা কচ্ছপ পরিপূর্ণ নদীটি—একই জলধারার দুই রূপ। একটি প্রাণোচ্ছল শিশু ও আর একটি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা। বিপরীতধর্মী বিভিন্নতাই সৃষ্টির নিয়ম। মানুষ ও প্রকৃতি—প্রত্যেকের বেলাতেই এই নিয়ম কঠোর সত্য।

মহাদেব নেমে এসেছে খাড়া উতরাই বেয়ে। এ পথের সবচেয়ে খাড়া পথ। লোহারক্ষেত ডাকবাংলোর পেছনেই পাহাড়। সেই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠানামা করতে হয় যাত্রীদের।

যে সব যাত্রীরা প্রথম আসেন পাহাড়ী পথে, তাঁরা পিণ্ডারী হিমবাহে যাবার পথে লোহারক্ষেত ডাকবাংলো থেকে এই পথের চেহারা দেখে ভয় পান। তবে পথটি কিন্তু মোটেই বিপজ্জনক নয়। পাথর বসানো বেশ প্রশস্ত পথ। শুধু একটির পর একটি গিরিশিরা বেয়ে ওপরে উঠে যেতে হয়। ফেরার পথে আবার এমনি উতরাই ভেঙে নিচে নামতে হয়। তাই ফেরার পথে এখানে এসে লোহারক্ষেত ডাকবাংলো দেখতে পেয়ে আনন্দে তাদের মন নেচে ওঠে।

উঁচুনিচু মাঝারি আকারের একটি উপত্যকা। এক পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরযূ। একটি ঝরনা এসে মিলেছে সরযূর সঙ্গে। সঙ্গমের ওপরে সুন্দর একটি ডাকবাংলো—হালে তৈরি। কয়েক বছর আগে ডাকবাংলোটি ভেঙে যায়। তখন যাত্রীদের এখানে এসে তাঁবুতে থাকতে হত।

সরযূর একদিকে উপত্যকা, আর একদিকে পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা দিয়ে মিলামের পথ—কৈলাস ও মানস-সরোবরের পথ। সে পাহাড়ের গায়েও গড়ে উঠেছে এমনি ছোট ছোট গ্রাম—এখান থেকে খেলাঘরের মত দেখায়। খেলাঘরই তো বটে। জগতের খেলার মাঠে মানুষ আসে—হাসে কাঁদে ভালবাসে, ঘর বাঁধে, ঘর ভাঙে। খেলাশেষে বিদায় নেয় এ জগৎ থেকে।

লোহারক্ষেত খুব বড় গ্রাম নয়। কিছু চাষের জমি আছে। কয়েক ঘর গৃহস্থের বাস। তবে আশেপাশের সকল গাঁয়ের মধ্যমণি এই লোহারক্ষেত। ডাকবাংলোর কাছেই কয়েকটি দোকান ও ডাকঘর—এ পথের একমাত্র ডাকঘর।

লোহারক্ষেত থেকেই 'ইনার লাইন' বা পরদেশী পর্যটকদের নিষিদ্ধ এলাকা শুরু। লোহারক্ষেত পেরুতে হলে তাদের 'পারমিট' নিতে হয়। ভারতীয়দের অবশ্য কোন অনুমতি প্রয়োজন হয় না। তবে এই তদারকির জন্য কর্তৃপক্ষ ইংরেজী অক্ষরজ্ঞানশূন্য যে প্রহরীটিকে এখানে মোতায়েন করেছেন সে কাউকে সহজে রেহাই দেয় না। যাত্রীরা লোহারক্ষেত ডাকবাংলোয় এসে উঠলেই সে এসে চড়াও হয়। প্রথম প্রশ্ন করে, 'আপলোগ আমরিকান হ্যায় ?'

বিস্মিত যাত্রীরা নিজেদের কৃষ্ণাঙ্গের দিকে নজর বুলিয়ে হেসে উত্তর দেন, 'না। আমরা আপনারই মত ভারতীয়।'

কিন্তু কাকে এসব বলা ? সরকারের প্রতিনিধি গম্ভীর স্বরে দাবী করে, 'ফটো পাস দেখাইয়ে।'

অনেকেই তার দাবীর মর্মার্থ বুঝতে পারেন না। ফলে কিছুক্ষণ বচসা চলে। তারপরে বুঝতে পেরে তাঁরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ভারতীয় নাগরিকদের পাসপোর্ট থাকার কোন কারণ নেই। আবার বচসা জোরালো হয়। অবশেষে পুলিস সাহেব (এই নামেই স্থানীয়রা তাকে ডাকে) পরবর্তী দাবীর ফিরিস্তি পেশ করেন, 'অব্ আপ কাগজমে লিখিয়ে—আপকা নাম, আপকা পিতাজীকা নাম, আপকা ঘরকা পাত্তা, নোকরীকা পাত্তা, কিধরসে আয়ে, কিধর জানা হ্যায়', একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'আউর লিখিয়ে, ক্যামেরা নম্বর, কাঁহা বনা হুয়া। ঠিকসে লিখিয়ে। আংরেজীমে লিখিয়ে। হ্যাম অ্যাংরেজী নেহি জানতা।'

যাত্রীদের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তাহলেও পিণ্ডারী দর্শনের প্রয়োজনে তাঁদের বিনা প্রতিবাদে পুলিস সাহেবের হুকুম তালিম করতে হয়। সত্যই বিচিত্র এই দেশ....

ইদানীংকালে এদেশের জনসাধারণের ওপর যতগুলি অর্থহীন সরকারী বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, 'ইনার লাইন পারমিট' তার মধ্যে একটি। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে

১৯৬২ সাল থেকে এই পারমিটের প্রচলন হয়েছে। ভারতীয় যাত্রীদের সীমান্ত অঞ্চলের দর্শনীয় স্থানসমূহে কিম্বা কোন পর্বতশৃঙ্গে যেতে হলে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই পারমিট নিতে হয়। আর বিদেশী যাত্রীদের অনুমতি নিতে হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে।

জাতীয় সরকার অবশ্যই দেশের নিরাপত্তার দিকে নজর দেবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে হবে নিরাপত্তার নামে কোন নিয়ন্ত্রণ প্রহসনে পরিণত না হয়, আইনের নাম নিয়ে কোন অসাধু ব্যক্তি বে-আইনী না করতে পারে এবং সর্বোপরি দেশের নাগরিকবৃন্দ তাদের কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।

দুঃখের কথা সীমান্তরক্ষার নামে এমন বহু অঞ্চলকে 'ইনার লাইনের' আওতায় আনা হয়েছে, যেগুলির সঙ্গে সীমান্তের সম্পর্ক নেই। উপরন্তু এমন সমস্ত অযোগ্য ও স্বার্থপর সরকারী কর্মচারীদের ওপর এই অনুপতিপত্র দেবার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, যাদের অনেকেরই অন্তরে দেশপ্রেম বস্তুটির একান্ত অভাব। জানি না কবে এদের হাত থেকে মুক্তি পাব। আর সীমান্তের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই সব অঞ্চল 'ইনার লাইন' মুক্ত হবে!

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম। ডাকবাংলোয় না উঠে মহাদেব বড় রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে। ডাকবাংলোয় গেলেই দেখা হয়ে যাবে অনেকের সঙ্গে। আবার নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তা ছাড়া সময়ও নেই হাতে। এখনও কাপকোট বাস স্ট্যাণ্ড প্রায় ন মাইল।

মহাদেব পুল পেরিয়ে ঝরনার অপর পারে আসে। নামতে থাকে উতরাই বেয়ে। উতরাই প্রায় ফুরিয়ে এল। আর মাইল দুয়েক বাদেই শুরু হবে প্রায় সমতল পথ। অবশ্য এক মাইলে বেশ কিছুটা নেমে যেতে হবে। লোহারক্ষেতের উচ্চতা ৫৬০০ ফুট, কিন্তু ডাকবাংলোটি ৫৩৫০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। কাপকোট ডাকবাংলোর উচ্চতা ৩৭৫০ ফুট।

সুলিয়াঠগ গ্রাম শেষ হয়ে গেল। মহাদেব আরও প্রায় পাঁচশ ফুট নেমে এসেছে, পেরিয়ে এসেছে আর একটি ঝরনা। সে চলেছে সরযূর ডান তীর দিয়ে। সরযূর দু তীরেই ধাপে ধাপে ক্ষেত। গাঁয়ের মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করছে। এখনও বেশ রোদ আছে। নীলাকাশে দু-একখানি ছেঁড়া মেঘ আসাযাওয়া করছে। পথের দুধারে ঝোপঝাড়ের মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল গান ধরেছে। আর গান গাইছে সরযূ—বিরামহীন সঙ্গীত। মহাদেবের পথ চলতে বেশ লাগছে।

সালিং গাঁয়ের মহাজন ভওয়ান সিংয়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে মহাদেব। ভওয়ান সিংকে ওরা সবাই শেঠজী বলে ডাকে। বেশ অবস্থাপন্ন লোক। অনেক জায়গা-জমি ও দুখানি দোকানের মালিক তিনি। ছেলেরা বড় বড় চাকরি করে শহরে। অশীতিপর বৃদ্ধ শেঠজী এখনও বেশ শক্তসমর্থ। একাই চলাফেরা করেন। দরকার হলে হেঁটেই কাপকোট যান।

তাঁর ফলের বাগানটি দেখার মত। কমলালেবু থেকে শুরু করে যাবতীয় পাহাড়ী ফলের বাগান। শেঠজী কিন্তু তাই বলে ফলের ব্যবসা করেন না! নিজেরা খান ও বিলিয়ে দেন। যাত্রী পেলেই বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসেন। তাঁদের দাওয়ায় বসিয়ে নিজ হাতে ফল কেটে দেন। বিদায়কালে ঝোলাভর্তি ফল উপহার দেন। সরস সুস্বাদু ফল চড়াই উতরাই পথে যাত্রীদের শ্রান্তি দূর করে।

মহাদেবকে বড়ই ভালোবাসেন তিনি। তাই মহাদেব তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবে। সে পথ থেকে নেমে আসে দোকানের দাওয়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য মহাদেবের। শেঠজীর সঙ্গে দেখা হল না তার। ব্যবসার কাজে শেঠজী আজ সকালে আলমোরা চলে গেছেন।

দুঃখিত অন্তরে মহাদেব আবার উঠে আসে পথে। সে এগিয়ে চলে। তাকে চলতে হবে। কেবল কাপকোটের পথে নয়, জীবনের পথে—উন্নতির পথে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হবে। মা ও পার্বতীকে সুখী করতে হবে। তাকে সুখী হতে হবে।

সরযূর ডান তীর দিয়ে পথ। অপর তীরে কাফলানী গ্রাম। বিকেল হয়ে গেছে। মহাদেব পা চালিয়ে চলেছে।

যথারীতি চায়ের দোকানের সামনে এসে বসে পড়ে মহাদেব। কাপকোটপিণ্ডারী পথের এটি একটি কম্পালসারী স্টপ—শ্রান্ত পথযাত্রীদের বিশ্রামস্থল। তবে দোকানটির প্রধান আকর্ষণ চা হলেও এটি কেবল চায়ের দোকান নয়। প্রয়োজনীয় মুদি ও মনোহারী জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

চা খেয়ে নিয়েই মহাদেব আবার চলতে শুরু করে। মোটামুটি সহজ পথ। চড়াই উতরাই নেই বললেই চলে। সে জোরে জোরে পা ফেলে। এখন সে সরযূর বাঁ তীর দিয়ে চলেছে। ওপারে পাহাড়ের গা দিয়ে জলের পাইপ নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাপকোটে। ওপরের ঝরনা থেকে পানীয় জল নিয়ে আসা হয়েছে।

মহাদেবকে এবারে পুল পেরিয়ে যেতে হয় ওপারে। তারপরে আবার আসতে হবে এপারে। একেবারে সামাধূরার বাসপথের সঙ্গে গিয়ে মিশবে পিণ্ডারীর এই পথ। কাপকোট থেকে সামাধূরা পর্যন্ত বাস যাতায়াত করছে আজকাল। সেখান থেকে যাওয়া যায় তেজাম গিরগাঁও মুনসিয়ারী ও মার্তোলী গ্রামে। যাঁরা মিলামের দিক থেকে ট্রেল্‌স্‌ পাস অতিক্রম করতে চান, তাঁরা সামাধূরা থেকে পদযাত্রা শুরু করেন। তারপর ট্রেল্‌স্‌ পাস অতিক্রম করে ফুরকিয়া হয়ে এই পথে ফিরে আসেন কাপকোট।

সূর্য যখন অদৃশ্য হল দূরে ঐ পর্বতমালার পেছনে, দিনের শেষ আলোটুকু বিদায় নিল সরযূর বুকে আর হ্যারিকেনের আলো এসে আছাড় খেয়ে পড়ল পাথুরে পথের ওপরে—মহাদেব তখন এসে পৌঁছল কাপকোট। কাপকোট একটি জমজমাট পাহাড়ী গ্রাম। গঞ্জ বললেও বোধ করি ঠিক বলা হয়। সব মিলিয়ে খানদশেক দোকান। মুদি মনোহারি, কাপড় কম্বল, দর্জি ও খাবারের দোকান। কয়েকটি মহাজনী আড়ৎও আছে। শহর এবং গ্রামের যোগসূত্র এই কাপকোট। গ্রামের জিনিস এখান থেকে শহরের বাসে ওঠে। আর শহরের জিনিস গ্রামের পথে এখানে বাস থেকে নামে। গ্রামের জিনিস যারা উৎপাদন করে তারা কুমায়ুনী, শহরের জিনিস যারা খরিদ করে তারাও কুমায়ুনী। কিন্তু আড়তদারেরা অধিকাংশই মাড়োয়ারী ও পাঞ্জাবী। ব্যবসাবুদ্ধির লড়াইয়ে কুমায়ুনীরা পরাজিত। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'—কথাটা লেখা নেই ওদের ললাটে। ওরা লক্ষ্মীছাড়া। ওরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে, ভেড়া পালে, মোট বয় আর উপোস করে।

এপারে বাস স্ট্যাণ্ড, ওপারে গ্রাম, মাঝখানে সরযূ। এপারটি উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। ওপারটা অনেক নিচু, প্রায় সমতল। একটা পুল পেরিয়ে ওপারে যেতে হয়। গান্ধীআশ্রম বাজার ডাকঘর আর ডাকবাংলো সবই ওপারে। সরযূর তীর দিয়ে আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পাহাড়ী পথ। মাইলখানেক বাদে পাহাড়ী পথের মতই একটি বাঁক নিয়েছে সরযূ। এই বাঁকের মুখেই ডাকবাংলো। সামনে ছায়াশীতল দূর্বা-ছাওয়া সমতল প্রান্তর। আর মরসুমী ফুলের বাগান।

একজন স্থানীয় বৃদ্ধ এই ডাকবাংলোর চৌকিদার। সাহেবদের আমল থেকে কাজ করছে। সেকালে এটি ছিল এ পথের একমাত্র ডাকবাংলো। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে তাঁবু ও লোকজন সঙ্গে নিয়ে সাবরা আসতেন—পাড়ি জমাতেন কমনীয়া কুমায়ুনের গভীর বন, গহন উপত্যকা,

দুর্গম হিমবাহ ও শৃঙ্গরাজির দিকে। চৌকিদারের সেবা ও যত্নে খুশী হতেন তাঁরা—বখশিশ আর কত রকমের উপহার দিতেন। এমন কি লাইসেন্সসহ বন্দুক পর্যন্ত উপহার দিয়েছেন তাকে। তখনকার দিনে এখানে বন্দুকের বড়ই প্রয়োজন ছিল। দিনের বেলাতেও বাঘের উপদ্রব হত। আর এখন রাতেও বাঘের দেখা মেলে না।

স্বাধীন ভারতে পথের উন্নতি হয়েছে তবে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ে নি। তুলনায় কলকাতার লোকই বেশী আসেন এখানে। তাঁদের বড়ই পেয়ার করে চৌকিদার। কলকাতার কাছে তার ঋণের শেষ নাই। কলকাতার একজন যাত্রী তার ছেলেকে চাকরি করে দিয়েছেন।

'শ্রমিক সহকারী সমিতির' অফিস ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে মহাদেব। বোঁচকাটা মাটিতে রেখে দেশলাই ধরায়, ঘরের কোণে রাখা কেরোসিনের কুপিটা জ্বালে। ঘরের আঁধার ঘুচে যায়। মহাদেব বোঁচকাটাকে খাটিয়ার ওপর রাখে। এ খাটিয়ার মালিক সমিতির সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মণ সিং। যাত্রাকাল শেষ হয়ে গেছে। তিনিও ঘরে ফিরে গেছেন। কিন্তু খাটিয়াটা আছে পড়ে। মহাদেব বেশ আরাম করে খাটিয়ার ওপর বসে পড়ে। এ ঘরে প্রবেশের অধিকার তার আছে। যাত্রার সময় হামেশাই তারা এ ঘরে রাত কাটায়। কিন্তু এ খাটিয়ায় বসার অধিকার পায় না। আজ সম্পাদক নেই, অন্য কোন কুলিও নেই। আজ সে-ই এ ঘরের একচ্ছত্র অধিপতি।

বোঁচকা খুলে মহাদেব মায়ের দেয়া খাবারের পুঁটলিটা বার করে। মা অসুস্থ শরীর নিয়েও তাকে এই খাবার তৈরি করে দিয়েছেন। দুখানি রুটি ও একটি রামদানার লাড্ডু খেয়ে নিয়ে আবার পুঁটলিটা বেঁধে ফেলে। তারপরে বোঁচকাটাকে মাথায় দিয়ে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ে। এই রে, ভুল হয়ে গেল—দরজাটা তো বন্ধ করা হল না। থাক্‌গে, তেল ফুরোলে কুপিটা যাবে নিভে। তখন দরজা দিয়ে চাঁদের আলো আসবে ঘরে।

নির্মল মেঘমুক্ত আকাশে কৃষ্ণাচতুর্থীর চাঁদ উঠেছে। স্নিগ্ধ আলোয় আলোময় করে তুলেছে দূরের ওই ধূসর পাহাড়, কাছের এই রূপোলী সরযূ আর পাশের এই পাথুরে পথ। পাহাড় পড়েছে ঘুমিয়ে, পথ পড়েছে ঘুমিয়ে, কিন্তু সরযূ রয়েছে জেগে। তার চোখে ঘুম নেই। তাকে সদাই থাকতে হয় জেগে। সে ঘুমোলে কুমায়ুনের তন্দ্রা যাবে টুটে। সৃষ্টি যাবে রসাতলে।

চাঁদ গেছে অস্তাচলে। প্রভাতী রোদ তার মায়াময় পরশ বুলিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর আকাশে বাতাসে আর ধূলিতে। পাখীর কলকাকলী আসছে ভেসে। শহর কলকাতার ছোট্ট ঘরে মহাদেব রয়েছে শুয়ে। মা তাকে ডাকছেন। মহাদেব চুপ করে থাকে। মার সেই সাত-সকালে ওঠার বাতিকটা এখনও রয়ে গেছে। আরে, এ তো আর দেশের বাড়ি নয় যে জল আনতে ঝরনায় ছুটতে হবে, গরু দুইতে হবে, ক্ষেতে যেতে হবে। এখানে ঘরে বসেই নলের জল পাওয়া যায়। দোরগোড়াতে বোতলের দুধ দিয়ে যায়। আর ক্ষেত? শহরে কি ক্ষেত থাকে? কি দরকার অত সকালে ঘুম থেকে ওঠার? গুদাম তো খুলতে হবে সেই বেলা দশটায়। কিই বা কাজ? টুল পেতে ফটকের সামনে বসে থাকো আর বিড়ি ফোঁকো। সাবরা এলে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠোকো। মোট বইবার কষ্ট নেই, চড়াই উতরাই পেরোবার পরিশ্রম নেই। দশটা-পাঁচটা ডিউটি কর। ব্যস, মাসের শেষে করকরে একতাড়া নোট। বড়ই সুখে আছে মহাদেব।

কিন্তু সুখে থাকার কি জো আছে? মার কাছ থেকে যদিও বা নিস্তার পাওয়া যায়,

পার্বতীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। মহাদেবকে সুখে থাকতে দেখলেই ওকে ভূতে কিলোয়। কিছুতেই সে মহাদেবের মৌ-ঘুমটা পুরিয়ে নিতে দেবে না। এতক্ষণ গলাবাজি করেছে, এবারে ঠেলাঠেলি শুরু করেছে। কিন্তু কেন? ওকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে ওর কি লাভ? চা হয়ে গেছে? হক্ না। না হয় চা-টা আর একবার গরম করে দেবে। বাজারে যেতে হবে? ঘরে তো সবই আছে—চাল ডাল তেল নুন। শুধু কাঁচা বাজার করতে হবে? সে আর কতক্ষণের ব্যাপার। এই তো কাছেই বাজার, কিন্তু কাকে এসব বলা? পার্বতীর ধাক্কায় বাধ্য হয়ে মহাদেবকে চোখ মেলতে হয়।

কিন্তু এ কি? এ সে কোথায়? এ তো কলকাত্তা নয়। এ যে কাপকোট—শ্রমিক সহকারী সমিতির অফিস ঘর। ওঃ মনে পড়েছে, হ্যাঁ, আজই তো প্রথম বাসে তার কলকাতা যাবার কথা। তাহলে সে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু....তার পাশে কে বসে রয়েছে? পার্বতী?

মহাদেব ভাল করে চোখ রগড়ে নেয়। না, পার্বতী তো স্বপ্ন নয়, পার্বতী সত্য। এই ঝলমলে প্রভাতের মতো, সরযূর ঐ উচ্ছল পদধ্বনির মতো পার্বতী সত্য। পার্বতী বসে রয়েছে তার সামনে। সে উঠে বসে। বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত মহাদেব কথা বলতে পারে না। সে চুপ করে থাকে। শুধু পার্বতীকে দেখে আর দেখে। এ দেখার বুঝিবা শেষ হবে না কোনদিন।

হঠাৎ পার্বতী বলে ওঠে, 'আমি অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না।'

'পারবি না?' মহাদেব আঁতকে ওঠে।

'না, তাই আমি পালিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে।'

'পালিয়ে এসেছিস?'

'হ্যাঁ, আমি তোর সঙ্গে কলকাত্তা যাব। তোর কাছে থাকব।'

'কিন্তু তোর মা? সে যে এতক্ষণে সোরগোল বাধিয়ে বসে আছে।' মহাদেব চিন্তিত হয়ে ওঠে।

পার্বতী তবু নির্বিকার। বলে, 'বাধালে বাধাক। তাতে আমাদের কি এসে যাবে? সে এ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই আমরা কলকাত্তা পৌঁছে যাব। তাছাড়া সে এখানে আসবেই বা কেন?'

'তোকে খুঁজতে আসবে। তোকে না পেয়েই বুঝতে পারবে আমার সঙ্গে পালিয়েছিস!'

'না, বুঝতে পারবে না!' পার্বতী স্থির কণ্ঠে বলে, 'রোজকার মতই কাল সকালে সবার সঙ্গে কাঠ কাটতে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। সুবিধে বুঝে গা-ঢাকা দিয়েছি। ওরা ভাববে আমাকে বাঘে নিয়ে গেছে। গাঁয়ের সবাই নিশ্চয়ই এতক্ষণে জঙ্গল তোলপাড় করছে।' পার্বতী খিলখিল করে হাসতে থাকে:

মহাদেবের মুখেও হাসি ফোটে। সে খানিকটা আশ্বস্ত হয়। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। প্রশ্ন করে, 'কাল খাতি থেকে রওনা হয়ে এখন তুই কাপকোট এলি কেমন করে?'

'এলাম হেঁটে। সেই থেকেই তো হাঁটছি। বসি নি কোথাও।'

'রাতে?' মহাদেব উৎকণ্ঠিত।

'হেঁটেছি। না হাঁটলে যে তোকে পেতাম না। সন্ধ্যের পরে এসেছি লোহারক্ষেত। একটা দোকানে চা ও ভাজি খেয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছি। সারারাত ধরে হেঁটেছি।'

'রাতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একা একা এসেছিস? তোর কি ভয়ডর নেই? তুই কি মানুষ?'

'মানুষ না হলে কি আর ছুটে আসতাম? মানুষ বলেই তো ভয়ডর ভুলে তোর কাছে

ছুটে এসেছি।'

মহাদেব পার্বতীর মুখের দিকে তাকায়। চুপ করে থাকে। দুজনে চোখাচোখি হয়। তারপর পার্বতী চোখ নামিয়ে বলে, 'যাক্‌গে আর কথা নয়। বড্ড খিদে পেয়েছে। দোকান খুলেছে। যা, চা আর খাবার নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিই।' সে মহাদেবকে একরকম ঠেলে তুলে দিয়ে ধুপ করে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ে। মহাদেবের কম্বলখানি গায়ে দিয়ে চোখ বোজে।

একটু মুচকি হেসে মহাদেব ঘর থেকে বের হয়। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে দোকানের দিকে এগিয়ে চলে। খাবার যা রয়েছে, তাতেই চলে যাবে। কেবল চা আনা দরকার। বিস্ময়ে আর আনন্দে মহাদেব বিহ্বল হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে হাঁটে আর ভাবে—পার্বতী তাকে এত ভালবাসে ? মা-র কাছ থেকে পালিয়ে সে এসেছে তার কাছে, তার দুঃখের অংশীদার হতে ? এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে মহাদেবের। এতবড় সৌভাগ্য তার মতো হতভাগ্যের জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে ? তবে ব্যাপারটা যতই বিস্ময়কর হোক, সত্যই পার্বতী চলেছে তার সঙ্গে। তারা চলেছে নবজীবনের যাত্রাপথে। কিন্তু সে যে বড়ই দীর্ঘপথ। অনেক পাথেয়র প্রয়োজন। হে ভগবান ! এতই যদি দিলে তবে এটুকু থেকে বঞ্চিত করলে কেন ?

কাপকোটের অনেকেই তাকে চেনে। কিন্তু তারা সবাই যে তারই মতো নিঃস্ব। তারা তাকে টাকা ধার দেবে কোথা থেকে ? অথচ টাকা না পেলে সে যাবে কেমন করে ? পার্বতীর বাস ও রেল ভাড়া যে নেই তার কাছে। তাহলে কি মহাদেব তার পুরনো মালিক আড়তদারের কাছে টাকা চাইবে ? তিনি বিশ্বাস করে টাকা দেবেন তাকে ? কিন্তু তিনি তো আড়তে আসবেন সেই ভরদুপুরে। অতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা উচিত হবে না তাদের। পার্বতী যাই বলুক, তার মাকে মহাদেব ভালভাবেই চেনে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিনি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা। লোকজন নিয়ে রওনা হয়েছেন কাপকোট। ছুটে আসছেন তাদের ধরতে। ধরতে পারলে আর রক্ষা রাখবেন না। মহাদেবকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়বেন।

দুশ্চিন্তার ভারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মহাদেব। তবু মাথা ঠাণ্ডা রেখে চা কিনে ফিরে আসে সমিতির ঘরে। পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছে। আহাঃ ! বেচারী বড়ই পরিশ্রান্ত। কাল থেকে একরকম উপবাসী। তার ওপর প্রাণ হাতে করে এই বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথ পেরিয়ে ছুটে এসেছে। দুদিনের পথ একদিনে এসেছে। কিন্তু এদিকে যে চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, সময়ও বেশী নেই। মহাদেবকে যেতে হবে আড়তদারের বাড়ি, যে করেই হোক টাকা যোগাড় করে প্রথম বাস ধরতে হবে।

মহাদেব পার্বতীকে ডাক দেয়। পার্বতী ধড়মড় করে উঠে বসে। চা ও খাবার দেখে তার চোখ দুটি আনন্দে জ্বলে ওঠে। সে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে। মহাদেব শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। তার চোখের কোল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু পড়ে গড়িয়ে।

খাওয়া শেষে ঢেঁকুর তুলে ধীরেসুস্থে পার্বতী বলে, 'বাসের টিকিট কখন দেবে রে ? খেয়াল রাখিস প্রথম বাসই ধরতে হবে।'

'হ্যাঁ...কিন্তু...' মহাদেব শেষ করতে পারে না।

'কী ?' পার্বতী তার মুখের দিকে তাকায়।

'না, টাকার যোগাড় করতে হবে তো ; আমি যাচ্ছি।' মহাদেব সামলে নেয়।

'কিসের টাকা ? কোথায় যাচ্ছিস ?' পার্বতী বিস্মিত।

'না মানে, আমার কাছে যে টাকা আছে তাতে দুজনের ভাড়া হবে না।'

'সে আমি জানি।' একটু থামে পার্বতী, 'ওঃ, তুই আমার ভাড়ার কথা ভাবছিস ? আরে বোকা, আমি কি তোর ভরসায় এসেছি ? এই নে টাকা।' বলে কোমর থেকে একটা বটুয়া বের করে মহাদেবের দিকে ছুঁড়ে দেয়, 'ষাট টাকা আছে। হবে না ?'

মহাদেবের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তার দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে যায়। মনে মনে ভগবানকে প্রণাম জানায় আর ভাবে—মা ঠিকই বলেন, ভগবান আছেন।

বটুয়াটা কুড়িয়ে নিয়ে উচ্ছল কণ্ঠে মহাদেব জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় পেলি এত টাকা ?'

'পাব আবার কোথায় ? আমার টাকা। আমি জমিয়েছি। সাবদের কাছে কাঠ বেচে যা পেয়েছি, মা যা দিয়েছে, তুই যা দিয়েছিস—সব আছে ওর মধ্যে। আমি কিছুই খরচ করি নি।'

মিতব্যয়ী পার্বতী, বুদ্ধিমতী পার্বতী, প্রেমময়ী পার্বতী। কৃতজ্ঞতায় ও ভালবাসায় মহাদেবের মন কানায় কানায় ভরে ওঠে। সে টিকিটঘরের দিকে পা বাড়ায়।

অবশেষে সকল দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার অবসান হল। পরিচিতদের প্রশ্নবাণের কবল থেকে পরিত্রাণ পেল মহাদেব। যা হোক কিছু বলে তাদের নিবৃত্ত করতে হয়েছে। তবে ইয়ার-দোস্তদের কাছে সব খুলে বলেছে সে। শুধু তাই নয়, তারা যাতে পার্বতীর মাকে একটা খবর দেয়, সে ব্যবস্থাও করেছে।

বাসের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ইয়ার-দোস্তরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে হাসিমুখে তাদের বিদায় জানাল। হাসল মহাদেব। পার্বতীও একটু মুচকি হাসে। দুজনে আর একটু ঘন হয়ে বসে।

বাস চলতে শুরু করল। পরিচিতরা রইল দাঁড়িয়ে। তারা চলল এগিয়ে। চলল কুমায়ুনের গহন-গিরি-কন্দর ছেড়ে।

কুমায়ুনের জন্যই আজ সবচেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে পার্বতীর। অদূর ভবিষ্যতে মহাদেব আবার কাপকোট আসবে। সরযূর তীর-ছোঁয়া আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে গাঁয়ে যাবে। তার মমতাময়ী মাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরবে। কিন্তু পার্বতী ?

তার কি আর কখনও দেখা হবে মায়ের সঙ্গে, সে কি আর কোনদিন যেতে পারবে নিজের গাঁয়ে ? যে মা তাকে মানুষ করেছে, যে গাঁয়ের গহন-গিরি-কন্দরে সে এত বড় হয়েছে ?

না পারুক। তবু তো কুমায়ুনের সঙ্গে কখনও বিচ্ছেদ ঘটবে না পার্বতীর। কুমায়ুনের মহাদেব যে থাকবে তার পাশে। মহাদেবের মাঝেই কুমায়ুন সত্য ও সুন্দর হয়ে উঠবে পার্বতীর জীবনে।

কমনীয়া কুমায়ুন, বরণীয়া কুমায়ুন, স্মরণীয়া কুমায়ুন—তুমি পার্বতীকে আশীর্বাদ কর। সে যেন সুখী হয়। ওদের মিলিত জীবন যেন শান্তিময় হয়।

গিরি-কান্তার

(কৈলাস-মানস সরোবর, কৌশানী, ট্রেলস্ গিরিবর্ত্ম, পিথোরাগড়,
বৈজনাথ, মায়াবতী এবং রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ড)

উৎসর্গ

দাদা

শ্রীঅমলচন্দ্র গুহ

দিদি

ডাক্তার পরী বসু

ও

বোন

শ্রীমতী গৌরী ঘোষ-কে

পুরাণ নয়, দর্শন নয়, কাব্য নয়।

উপন্যাস নয়, গল্প নয়, প্রবন্ধ নয়।

হিমালয়।

কিন্তু হিমালয় কি নয়?

যুগ-যুগান্ত ধরে ভারতের ধর্ম ও ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সযত্নে লালন-পালন করে আসছে হিমালয়। হিমালয়ের কাহিনী মানে ভারতের মর্মবাণী।

ভৌগোলিক বিচারে ভারতীয় হিমালয় ছয় ভাগে বিভক্ত—আসাম (নেফা), সিকিম, হিমাচল, গাড়োয়াল, কাশ্মীর ও কুমায়ুন হিমালয়।

উত্তরে শতদ্রু, পূবে কালী ও পশ্চিমে পিণ্ডারী বিধৌত পার্বত্য প্রদেশ কুমায়ুঁ বা কুমায়ুন হিমালয়।

কমনীয়া কুমায়ুনের কেন্দ্রভূমি আলমোরা। আলমোরা থেকেই আজ অমাদের যাত্রা হল শুরু। আমরা যাত্রা করেছি কুমায়ুনের দুর্গম গিরি-কান্তারে—রূপকুণ্ডে।

আমাদের কুমায়ুন পরিক্রমা শুরু হয়েছে দিন দশেক আগে। কাঠগুদাম থেকে নৈনিতাল, ভাওয়ালী, রাণীক্ষেত, দ্বারাহাট, আলমোরা ও বিনসর হয়ে এবারে চলেছি গোয়ালদাম।

ভৌগোলিক দিক থেকে আলমোরা কুমায়ুনের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাই ১৫৬০ সালে চাঁদ রাজা ভীষ্মচন্দ্র তাঁর রাজধানী চম্পাবত থেকে আলমোরায় স্থানান্তরিত করেন। ১৮১৫ সালে কুমায়ুন বৃটিশ অধিকারে আসে। তাঁরাও কুমায়ুন শাসনে আলমোরার উপযোগিতা উপলব্ধি করেন। ফলে আলমোরা কুমায়ুনের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীরূপে গড়ে ওঠে।

আলমোরা থেকে বাস যায় দিল্লী ও বেরিলী। যায় কুমায়ুনের সর্বত্র—কাঠগুদাম, নৈনিতাল, রানীক্ষেত, বাগেশ্বর, গোয়ালদাম, পিথোরাগড় ও বিনসর।

বাস চলেছে ছুটে। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। ড্রাইভার রতন সিং স্ফূর্তিবাজ লোক। যেমন জোরে গাড়ি চালাচ্ছে, তেমনি জোরে কথা বলছে। সব কথা বুঝতে পারছি না। তবে তার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি নেই। আর এই চেষ্টার ফলেই যত বিভ্রাট। তার ধারণা আমরা তার মাতৃভাষা বুঝতে পারব না। ফলে সে মাঝে মাঝেই ইংরেজী বলছে। সে ইংরেজী তার মাতৃভাষার চেয়ে অনেক বেশী দুর্বোধ্য। তবে তার উদ্দেশ্য মহৎ। সে আমাদের মঙ্গলার্থেই গলাবাজি করছে। আমরা তার দেশ দেখতে এসেছি। আমাদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাই সে যথাসাধ্য তার দেশের খবরাখবর দিচ্ছে।

আলমোরা শহরের প্রায় প্রান্তে এসে পৌঁচেছি। এখান থেকে শহর বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। আলমোরা শুধু কুমায়ুনের কেন্দ্রভূমি নয়—ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ শৈলাবাস। সে অপরূপ রূপলাবণ্যের পসরা সাজিয়ে পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানায়। তার রূপের আকর্ষণে যুগে যুগে মানুষ ছুটে এসেছে এখানে। এসেছেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী। এসেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জওহরলাল নেহরু ও বিধানচন্দ্র রায়।

স্ত্রী কমলা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলেন। তাঁকে নিয়ে আসা হল ভাওয়ালীর স্বাস্থ্যনিবাসে। জওহরলাল তখন নৈনী জেলে। তাঁর অনুরোধে কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্থানান্তরিত করলেন আলমোরা জেলে। স্ত্রীর জন্য তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কিন্তু হিমালয়ের কাছে তিনি

অভয় পেলেন। আলমোরার শীতল সমীরে তাঁর দেহমন স্নিগ্ধ ও শান্ত হয়ে উঠল। নেহরু দর্শন করলেন বনাবৃত পর্বতমালার ওপরে তুষারাবৃত হিমালয়ের চির উন্নত শির—ধ্যান-গম্ভীর, যুগ-যুগান্তরে সদা-জাগ্রত প্রহরী। এদের দেখে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হল, মন শান্ত হল। তিনি অনুভব করলেন—সমতলের সংঘাত ও ষড়যন্ত্র, কামনা ও বাসনা, লোভ ও কপটতা—এই অনন্তের সামনে নেহাৎ নগণ্য।

এই হল আলমোরা। এই আলমোরা ছেড়ে চলেছি এগিয়ে, লোকালয় ছাড়িয়ে—দুর্গম গিরি-কান্তারে। চলেছি গোয়ালদামে—কমনীয়া কুমায়ুনের কোলে। সেখান থেকেই শুরু হবে আমাদের প্রকৃত যাত্রা—পদযাত্রা। সে যাত্রায় বিপদকে পাশে নিয়ে পথ চলতে হবে। শারীরিক সামর্থ্য মানসিক সবলতা সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। শক্তিমান না হলে, নির্ভীক না হলে এ পথের পথিক হওয়া যায় না। দুর্বলের প্রতি হিমালয়ের কোন দুর্বলতা নেই। যারা তার সকল বিপদ তুচ্ছ করে দুর্বার বেগে এগিয়ে যেতে পারে, তাদের সামনে দেবতাত্মা হিমালয় আপন স্বরূপ প্রকাশ করে। তাদের কণ্ঠেই হিমালয় জয়মাল্য দেয় পরিয়ে। সর্বদুঃখব্যথাহর না হলে অনন্ত-সুন্দরের সঙ্গলাভ করা যায় না।

স্বভাবতই সংশয়ের দোলায় দুলছে আমাদের মন—আমরা কি পৌঁছতে পারব?

নিশ্চয়ই পারব। দুর্গম হিমালয়ের আবহাওয়ায় একটা প্রচণ্ড প্রাণশক্তি লুকনো আছে। এই শক্তি অন্ধকে দৃষ্টিদান করে, খঞ্জকে বেগবান করে, রুগ্নকে রোগমুক্ত করে। কয়েক মিনিট বিশ্রাম করলে, কয়েক ঘণ্টা পথ চলার ক্লান্তি দূর হয়। এই প্রাণশক্তি পথ চলার পাথেয় যোগায় হিমালয় পথযাত্রীকে, তাকে আকর্ষণ করে দুর্গম পথে। সে জীবন তুচ্ছ করে ছুটে আসে তার কাছে।

আলমোরা থেকে একটি পথ চলে গেছে উত্তর-পূবে বেরিনাগ, আসকোট ও পাঙ্গু হয়ে গারবিয়াং—নেপাল-তিব্বত সীমান্তের শেষ ভারতীয় গ্রাম। বেরিনাগ থেকে একটি পথ গেছে পিথোরাগড়—জেলা সদর। আগে পিথোরাগড় আলমোরা জেলারই একটি মহকুমা সদর ছিল। ১৯৬০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী আলমোরা জেলার উত্তর-পূর্ব অংশের ২৭৮৯ বর্গমাইল নিয়ে একটি পৃথক জেলা তৈরি করা হয়েছে। লোকসংখ্যা মাত্র লাখ তিনেকের মতো। চারটি মহকুমা নিয়ে এই জেলা—দক্ষিণাঞ্চল পিথোরাগড়, মধ্যাঞ্চল দিদিহাট, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ধারচুলা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মুনসিয়ারী।

পিথোরাগড় জেলা কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম অংশ। ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাদেবী-পূর্ব, নন্দাকোট, নন্দাখাত, ত্রিশূলী (অনেকের মতে তীরশূলী) ও পঞ্চচুলি প্রভৃতি হিমালয়ের কয়েকটি বিখ্যাত শৃঙ্গ এই জেলায় অথবা কাছাকাছি অবস্থিত। পিথোরাগড় জেলা নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সীমারেখা রচনা করেছে। কৈলাস ও মানস-সরোবর পরিক্রমার সব চেয়ে জনপ্রিয় পথ দুটি এই জেলা দিয়ে। কিন্তু প্রচারের অভাবে এ অঞ্চল এখনও হিমালয়-প্রেমিকদের কাছে তেমন প্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি।

জেলা সদর পিথোরাগড় যাবার দুটি পথ। একটি আলমোরা থেকে, অপরটি টনকপুর রেল স্টেশন থেকে। আলমোরা থেকে পিথোরাগড় ৬৯ মাইল। নিয়মিত বাস চলাচল করে।

একালের পিথোরাগড় সেকালের উদয়পুর। একালে পিথোরাগড় পরিণত হয়েছে সমৃদ্ধ জনপদে, কিন্তু সেকালের উদয়পুরও অবহেলিত ছিল না। তাই সামন্ত রাজারা তৈরি করেছিলেন বিলকিগড়, আজও তার ভগ্নাবশেষ আছে। তারপরে এসেছে ইংরেজ। গড়েছে নতুন কেল্লা—ফোর্ট লণ্ডন। পিথোরাগড় নেপাল সীমান্ত ঝুলাঘাট থেকে মাত্র ১৪ মাইল দূরে।

এখানে আমেরিকান মিশনারীদের একটি কেন্দ্র আছে। তাঁরা স্কুল, হাসপাতাল ও কুষ্ঠাশ্রম তৈরি করেছেন।

আলমোরা থেকে কৈলাস যেতে হলে পিথোরাগড় আসার কোন দরকার নেই। যাত্রীরা বেরিনাগ থেকে থল আসকোট ধারচুলা হয়ে গারবিয়াং পৌঁছতে পারেন।

পিথোরাগড় থেকে তিনটি পথ গেছে তিন দিকে—আলমোরা গারবিয়াং ও টনকপুর। টনকপুরের পথে লোহাঘাট ও চম্পাবত। লোহাবতী নদীর তীরে নেপাল সীমান্ত থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত লোহাঘাট। একটি মহকুমা সদর। পিথোরাগড় থেকে ৬ মাইল ও আলমোরা থেকে ৭৫ মাইল। তৃণময় উঁচু-নিচু সবুজ প্রান্তর ও দেওদার বনের নৈসর্গিক শোভার জন্য লোহাঘাট বিখ্যাত। এখানে লোহা ও তামা পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মায়াবতী আশ্রম এখান থেকে হাঁটাপথে তিন মাইল। মায়াবতী ছাড়াও চারিপাশে অনেক দর্শনীয় স্থান আছে।

জিম করবেটের 'ম্যান ঈটারস অব্ কুমায়ুন' গ্রন্থে চম্পাবত (৫৫৪৬) নামটি অমর হয়ে আছে। এই বিশ্ববিখ্যাত শিকার কাহিনীর প্রথম কাহিনীটি গড়ে উঠেছে চম্পাবতের এক মানুষখেকোকে নিয়ে। নেপালে দুশো মানুষ সাবাড় করে সে এসেছিল কুমায়ুনে। চম্পাবতের আশেপাশে চার বছরে সে আরও দুশো চৌত্রিশজন লোককে ঘায়েল করেছিল। গ্রামবাসীরা এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন যে করবেট অকুস্থলে গিয়ে শুনলেন পাঁচ দিনের মধ্যে কেউ বাড়ির বাইরে আসেন নি। ভাঙ্গা বন্দুক দিয়ে করবেট এই বাঘিনীকে মেরে চম্পাবতের জনজীবনকে নির্বিঘ্ন করেছিলেন।

নরখাদক বাঘিনীর জন্য যে চম্পাবত আজ বিশ্ববিখ্যাত, সে কিন্তু কুমায়ুনী সভ্যতার সূতিকাগার। এই চম্পাবত থেকেই চাঁদরাজাদের অভ্যুত্থান। আর তাঁদের রাজ্যই পরবর্তীকালে কূর্মাচল তথা কুমায়ুঁ বা কুমায়ুন নামে পরিচিত হয়েছে।

গারবিয়াং ১০৩২০ ফুট উঁচু একটি বিশিষ্ট ভুটিয়া জনপদ—তিব্বত সীমান্তের শেষ ভারতীয় গ্রাম। আলমোরা ও পিথোরাগড় থেকে এখন নিয়মিত বাস চলাচল করে। তবে এই মোটরপথ তৈরি হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। অতীতে এ পথ বড়ই কষ্টকর ছিল—বিশেষ করে পাঙ্গুর আগে। কিন্তু সেই অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেও শত শত তীর্থযাত্রী প্রতি বছর এই পথে পাড়ি দিতেন—কৈলাস-মানস পরিক্রমায় আসতেন। আজকাল পথকষ্ট দূর হয়েছে কিন্তু তাঁরা আর গারবিয়াং আসেন না। মানস-তীর্থের পথ আজ প্রায় রুদ্ধ। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস!

চারিদিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা। তাদের মাঝে ঝাউ আর দেওদারে ছাওয়া একটি উপত্যকা—গারবিয়াং। নানা ধরনের লতাপাতা আর নানা রঙের ফুল-ফলে ঢাকা। গারবিয়াং থেকেই ব্যাস ক্ষেত্রে আরম্ভ। তাই এখানকার অধিবাসীদের বলে ব্যাসী। এঁরা বড়ই অতিথিবৎসল। এঁরা কৈলাসযাত্রীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। শিল্পাচার্য শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১৮ সালে কৈলাসের পথে গারবিয়াং গিয়েছিলেন। তাঁর 'হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস-সরোবর' গ্রন্থে গারবিয়াং সম্পর্কে লিখেছেন : 'এরূপ সুন্দর স্থান জীবনে পূর্বে কখনও উপভোগ করি নাই। .....এমন পার্বত্য সৌন্দর্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। হিমালয়ের সকল প্রসিদ্ধ স্থানের.... যে কোনও এক দিকের দৃশ্যই মনোরম। বড় জোর দুই দিকে হইতে সুন্দর। কিন্তু এই গারবিয়াং-এর চারদিকের দৃশ্যই মধুর, অপূর্ব এবং যথার্থই মনোহর। ইহার চারিদিকের সেই দৃশ্যগুলি অবলম্বন করিয়া চারিখানি জগদ্বিখ্যাত

নৈসর্গিক চিত্র আঁকা যায়। অতীব সুন্দর বিশাল এবং সুধামাখা এই দৃশ্য। গারবিয়াং-এর সম্মুখে ও পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণে চিরতুষারাবৃত শৈলশিখর, বিচিত্র তাহার রেখায়তনভঙ্গী, আর কোথাও এমনটি নাই। গারবিয়াং গ্রামের পশ্চাতে ও এক পার্শ্বে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমে, অতীব বিশাল, তৃণলতা-বৃক্ষাদির চিহ্ন-বিবর্জিত শ্রেণীবদ্ধ অভ্রভেদী, তাহার বিশালতা অনুভবের বিষয়। দূর হইতে মনে হয় একেবারেই খাড়া, যদিও ঠিক তাহা নয়, তথাপি উহার ঋজুতা দূরতিক্রম্য। উহাতে আরোহণ কল্পনাও সম্ভব নয়। মধ্যে মধ্যে বহুতর গভীর রেখা, উর্ধ্বঅধঃ বহুদূর বিস্তৃত। সে দৃশ্য বড়ই অদ্ভুত, বড়ই গম্ভীর।'

এপারে গারবিয়াং, ওপারে তাকলাকোট—ভারত-তিব্বত যোগাযোগের সেতু। যোগাযোগটা আপাতদৃষ্টিতে ছিল ব্যবসাভিত্তিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সামাজিক। দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক মিলিত দেশ, মিলিত ভাষা ও মিলিত সমাজ। সওদাগরি ওঁদের কেবল পেশা ছিল না, ছিল নেশা। সীমান্তের হিমালয়ে হিম গলতে শুরু হলেই ওঁদের শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল দ্রুততর হত। সূর্য যখন পাটে নামে, তখন গাঁয়ের বধূরা যেমন জলকে চলে, ওঁরাও তেমনি বাণিজ্যে বের হতেন। বধূরা যেমন জল থাকলে, জল ফেলে কলসী কাঁখে ঘাটে আসে, তাঁরাও তেমনি লাভ-লোকসান, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা না ভেবে, বাণিজ্যযাত্রা করতেন। এঁরা যেতেন ওধারে, ওঁরা আসতেন এধারে— এ তো বাণিজ্য-যাত্রা নয়, এ যে ছিল তীর্থযাত্রা।

এ যাত্রা দু দেশের রাজনৈতিক জীবনকে বিপন্ন করে নি, বরং অর্থনৈতিক জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। একই মুদ্রা ও ডাকটিকিট ছিল দুই দেশের। ভারতীয় পুলিসরাই তিব্বতের শান্তিরক্ষক ছিল। আর সীমান্ত নিয়ে বিরোধ না থাকায়, সীমান্তরক্ষী রাখার প্রয়োজন পড়ে নি। ফলে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় হয় নি। এই অপব্যয়ের সূত্রপাত করেছে চীন, অথচ চীনের এটি অনধিকার চর্চা। কারণ তিব্বতের ওপরে চীনের চেয়ে ভারতের অধিকার অনেক বেশি।

এ অধিকার ভারত অর্জন করেছে দু হাজার বছরের প্রেম ও প্রীতির বিনিময়ে। যুগে যুগে ভারতের সাধক ও পর্যটকের দল প্রেমের বাণী বহন করে তিব্বতে গেছেন—তিব্বতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষায় নিজেদের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিব্বতীয় পুণ্যার্থীরাও ভারতে এসেছেন। ওঁদের ভাল আমাদের দিয়ে, আমাদের ভাল নিয়ে স্বদেশে ফিরেছেন। এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছিল এক প্রেমময় মহাদেশ।

সেই প্রেমময় মহাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি থাকতে পারে? অথচ আমরা সজ্ঞানে এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি। আমরা কেবল ইতিহাসের নীরব দর্শক।

কিন্তু ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে কি?

আর হিমালয়—যে আমাদের কাছে পুরাণের চেয়ে পবিত্র, দর্শনের চেয়ে সত্য, কাব্যের চেয়ে সঙ্গীতময়! হিমালয় কি কোনোদিন আমাদের এই অযোগ্যতাকে মেনে নিতে পারবে? আমাদের কি ক্ষমা করবে হিমালয়?

॥ দুই ॥

হঠাৎ অসিত বলে ওঠে, "কি, বড় যে চুপচাপ?"

দেবকীদা বলেন, "আরে তাই তো, তুমি যে একেবারে মৌনীবাবা হয়ে বসে রইলে।"

অমিতাভ বলে, "তুমি নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছ।"

সুজল বলে, "আপনি ঠিকই বলেছেন শম্ভুদা।" অমিতাভর ডাকনাম শম্ভু।

মোহিত বলে, "আমিও সুজলের সঙ্গে একমত। মহারাজ নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছেন।"

প্রাণেশ বলে, "কিন্তু কি ভাবছেন এতক্ষণ বসে। আলমোরা থেকে বাস ছেড়েছে আধঘণ্টার ওপরে।" সে ঘড়ি দেখে।

দাশু বলে, "সেই থেকে আমরা কত কথা বলে ফেললাম, আর আপনি নিঃশব্দে কেবল ভেবেই চলেছেন। ভুলে যাবেন না, আমরা আপনার সহযাত্রী, আপনার ভাবনার অংশীদার।"

অতএব আর চুপ করে থাকা যায় না। "ভাবছিলাম—" জবাব দিই। ওরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আমি বলি, "ভাবছিলাম কুমায়ুনের কথা।"

বোধ করি ওরা সকলেই নিরাশ হয় আমার উত্তরে। তবে সেকথা প্রকাশ করে কেবল অসিত, "কুমায়ুনের ভাবনা তো ভাবছি এই যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করার সময় থেকে। কিন্তু তাই বলে এমন জমাট আড্ডায় অংশ না নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হবে!"

"না মহারাজ, বলুন আপনি কি ভাবছেন?" দাশু আবার অনুরোধ করে।

"আমি ঠিকই বলেছি ভাই! সত্যি আমি কুমায়ুনের কথা ভাবছিলাম। তবে আমরা যেখানে চলেছি সেখানকার কথা নয়, আমি ভাবছিলাম জাগেশ্বর, বেরীনাগ, পিথোরাগড়, আসকোট, গারবিয়াং ও কৈলাসের কথা।"

"কি আর হবে সেই নিষিদ্ধ তীর্থের কথা ভেবে। তার চেয়ে এসো, যে পথে চলেছি, সে পথের কথা ভাবা যাক। ভাবা যাক সোমেশ্বর কৌশানী ও বৈজনাথের কথা।"

"তোমার তো তবু মস্ত সান্ত্বনা দর্শন করে এসেছ সেই পরমতীর্থ। আমাদের জীবনে তো আর তা হবার উপায় নেই, তাই কল্পনায় কৈলাস পরিক্রমা করতে চাইছিলাম। গারবিয়াং পৌঁছতেই তোমরা আমার পথ আগলে দাঁড়ালে। আমার আর কৈলাস দর্শন হয়ে উঠল না।"

অমিতাভ লজ্জা পায়। চুপ করে থাকে। কেন যেন সবাই চুপচাপ। আমিও কোন কথা বলি না। কেবল কর্কশ স্বরে অবিরত কথা বলছে টাটা-মার্সেডিজের ইঞ্জিনটা। আমাদের নীরব হতে দেখে সে যেন আরও বেশি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরে সহসা সুজল জিজ্ঞেস করে অমিতাভকে, "আপনি কোন্ সালে গিয়েছিলেন?"

"১৯৫৮ সালে।"

"একা ?" মোহিত প্রশ্ন করে।

"একা কি ঐ দীর্ঘ ও দুর্গম পথে যাওয়া যায়, না যাওয়া উচিত !" অমিতাভ মৃদু হেসে মোহিতকে জিজ্ঞেস করে।

মোহিত কিছু বলার আগেই আমি বলি, "যাওয়া উচিত কিনা জানি না, তবে যাওয়া যায়।"

"কেউ গিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কোন সাধু—সন্ন্যাসী ?"

"না, একজন সংসার আশ্রমের অধিবাসী।"

"কে ?"

"আমাদের করুণা—করুণাময় দাস।"

"অনিমাদির বন্ধু ?" দাশু জিজ্ঞেস করে।

"যিনি গত বছর দার্জিলিং থেকে মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট ট্রেনিং নিয়ে এলেন ?" প্রাণেশ বোধ হয় দল ভারী করতে চায়।

"হ্যাঁ।"

"তিনি কৈলাস গিয়েছিলেন জানি, কিন্তু একা গেছেন বলে তো শুনি নি কখনও।" অসিত বলে।

"হ্যাঁ, একা-একাই সে মানস-কৈলাস পরিক্রমা পূর্ণ করেছে। তবে সে গিয়েছিল একটা গভীর আত্মবিশ্বাসে তাড়িত হয়ে।"

"আচ্ছা ওঁর কতদিন সময় লেগেছিল ?" আমি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ বলে ওঠে।

"আলমোরা থেকে যাত্রা শুরু করে আলমোরায় ফিরে আসতে বাহান্ন দিন লেগেছিল।"

"আপনাদের ?" মোহিত জিজ্ঞেস করে অমিতাভকে।

"পঞ্চাশ দিন।" অমিতাভ উত্তর দেয়।

"রণেশদাদের ?" সুজন প্রশ্ন করে।

"দু মাস।" আমি উত্তর দিই।

"বেশি লাগল কেন ?"

"ওরা যে যাবার সময় মুনসিয়ারী মিলাম উন্টাধূরা দিয়ে গিয়েছিলেন।' আমি বলি।

"আসার সময় ?" মোহিত জিজ্ঞেস করে।

"লিপুলেক দিয়ে ফিরে এসেছেন। রণেশদাদের পথ দীর্ঘতর ছিল।"

"এবার আপনার পরিক্রমার কথা বলুন অমিতাভদা।" প্রাণেশ আসল কথায় ফিরে আসে।

"তোমরা তো একাধিক বইতে এই পরিক্রমার কথা পড়েছো ! আবার সে কথা কেন ?" অমিতাভ রেহাই পেতে চায়।

"হিমালয় এক, কিন্তু বিভিন্ন দর্শনার্থীর চোখে সে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। তাই তাদের কাহিনীতে হিমালয় নতুন ভাবে বিবৃত হয়, নবরূপে প্রকাশিত হয়। আপনি আপনার কাহিনী বলুন।" ওরা নাছোড়বান্দা।

আর কোন আপত্তির পথ পায় না অমিতাভ। আমরা চুপ করি। একবার কেশে নিয়ে

অমিতাভ শুরু করতে চায়। কিন্তু ভগবান ওর সহায়। ভগবান নয় ড্রাইভার। সহসা সে বলে ওঠে, "ইধর গাড়ি আধা ঘণ্টা রোকেগী।"

"তুরন্ত উতরে যাইয়ে। মন্দির দরশন করকে চায় পী লিজীয়ে।" কন্‌ডাকটর নির্দেশ জারী করে।

খেয়াল হতে দেখি বাস দাঁড়িয়ে আছে একটি জনবহুল বাজারে। আমরা পৌঁছে গেছি সোমেশ্বর।

অমিতাভ উঠে দাঁড়ায়। হেসে বলে, "আগে সোমেশ্বরটা দর্শন করে নেওয়া যাক। কৈলাসের কথা এখন মুলতুবী থাক।"

ড্রাইভার মাত্র আধঘণ্টা সময় মঞ্জুর করেছেন। কাজেই দেরি করা ঠিক হবে না।

অমিতাভকে অনুসরণ করি। বাস থেকে নেমে আসি।

শিবক্ষেত্র সোমেশ্বর। কমনীয়া কুমায়ুনের একটি রমণীয় উপত্যকা। পর্বত ও সমতলের মিলনভূমি সোমেশ্বর। উপত্যকার উচ্চতা ৪৭৫২ ফুট। অবস্থান ১৯°, ৪৬'৪০" উঃ অক্ষাংশ ও ৭৯°৩৮'৫৫" পূঃ দ্রাঘিমা। আলমোরা থেকে সোমেশ্বর ২৬ মাইল।

দূরে আকাশ-ছোঁওয়া সাদা হিমালয়, কাছে চীর আর দেওদারে ভরা সবুজ হিমালয় আর শ্যামল সমতল। সমতল উপত্যকার বুক চিড়ে একটি আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখা—কুমায়ুনের প্রাণধারা প্রাণময়ী কোশী। কোশীর দুই তীরে সোনালী ক্ষেত। খুবই উর্বর এই সোমেশ্বর উপত্যকা। তাই চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে ঘন বসতি। কোশীর তীরে তীরে আর ক্ষেতের ধারে ধারে পায়ে-চলা-পথ। পথ গিয়ে পাহাড়ে মিশেছে। তারপরে গহন বনের ভেতরে গেছে হারিয়ে।

বাস স্ট্যাণ্ডটি বেশ জমজমাট। রাস্তাটা এখানে প্রশস্ততর। প্রশস্ত পথের দুদিকে সারি সারি দোকান। এখানে ডাক ও তারঘর, গান্ধী-আশ্রম আর নিখিল-ভারত তন্তুবায় সমিতির শিল্পকেন্দ্র রয়েছে। রয়েছে ডাকবাংলো ও হাইস্কুল। আর সোমেশ্বর মন্দির। সেই মন্দির দর্শন করতেই চলেছি আমরা।

দুটি মোটর পথ এসে মিলিত হয়েছে এখানে। একটি আমাদের পথ—আলমোরা থেকে তাকুলা, গণনাথ ও কৌশানী হয়ে গরুড়। আর একটি এখান থেকে বাসুরীক্ষেত ও মাঝখালি হয়ে দ্বারাহাট—৫০৩১ ফুট উঁচু একটি মালভূমি। দশম শতাব্দীতে কাত্যুরী রাজবংশের এক শাখা সেখানে পত্তন করেছিলেন এক নতুন রাজধানী। তাঁরা সেই নগরীকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় দ্বারকায়। তাই নাম দিয়েছিল দ্বারাহাট।

গণনাথ যাবার আরও একটি পথ আছে এখান থেকে। হাঁটা-পথ, দূরত্ব মাইল ছয়েক। খুব কঠিন নয়—সামান্য চড়াই উৎরাই পাহাড়ী পথ। গণনাথে আছে একটি প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহটি বৈজনাথ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। বিগ্রহ অপহরণ বা অধিকার করার কাহিনী গাড়োয়াল কুমায়ুন ও হিমাচলের খুবই সাধারণ ঘটনা মাত্র। বলশালী হলে তাঁরা পররাজ্য আক্রমণ করে বলপূর্বক বিগ্রহ অধিকার করে নিয়ে যেতেন আর দুর্বল হলে কৌশল করে বিগ্রহ অপহরণ করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল আরাধ্য দেবতার বিগ্রহই রাজ্যের সকল শক্তির উৎস। কাজেই বিগ্রহটি নিয়ে আসতে পারলেই তাঁরা শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। বিগ্রহ সেকালে বিজয়ের শ্রেষ্ঠ স্মারক বলে বিবেচিত হত। কুমায়ুনের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়

আলমোরার নন্দাদেবী মন্দিরের মূল বিগ্রহটিও এককালে গাড়োয়ালে ছিল। ছিল জুনিয়াগড় দুর্গে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে চাঁদা রাজা বাজবাহাদুর চন্দ্র জুনিয়াগড় জয় করে বিজয়ের স্মারক স্বরূপ সেখানকার বিগ্রহটিকে আলমোরায় নিয়ে এসে নন্দাদেবীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গুহাসমূহ আর শিবমন্দিরের মত গণনাথের মেলাও বিখ্যাত। কার্তিক চতুর্দশী ও দোল চতুর্দশীতে এই মেলা হয়। গণনাথের উচ্চতা ৬৯৪৭ ফুট কিন্তু সেখানে রাত্রিবাসের কোনো অসুবিধে নেই। বন বিভাগের ডাকবাংলো আছে। আলমোরা থেকে গণনাথ যেতে হলে ২৩ মাইল বাসে গিয়ে তারপরে ছ মাইল বনপথ পেরোতে হয়। তবে গণনাথের কথা থাক, এখন সোমেশ্বরের কথা হোক।

সোমেশ্বর সুপ্রাচীন জনপদ। সেকালে সোমেশ্বর সমৃদ্ধশালী শহর ছিল। এই উপত্যকায় বহু ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে। কুমায়ুনের গীতিকাব্যে সোমেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাছেই লোধ নামে একটি চা-বাগান। লোধের পথে কয়েকটি নিরেট পাথরের শিবলিঙ্গ আছে। এর একটিতে চন্দ্র ও আর একটিতে সূর্য মূর্তি খোদিত। সোমেশ্বর থেকে ১৩ মাইল দূরে সুখাতাল—স্বাদু জলের একটি সুন্দর হ্রদ।

কিন্তু সেখানে যাবার অবকাশ নেই আমাদের। আধঘন্টার মিনিট পাঁচেক ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি পায়ে চলা পথ ধরে ঝোপঝাড়ের পাশ কাটিয়ে সোমেশ্বর মন্দিরের দিকে ছুটে চলি।

সুপ্রাচীন শিবালয়। পাথরের মন্দির। এখানে ওখানে ভাঙ্গা, দেয়ালে জমে উঠেছে শেওলা। চারিদিকে দেওদার বন। একে অনায়াসে বনমন্দির বলা যেতে পারে। সংস্কারের অভাবে মন্দিরটির চেহারা দরিদ্র হলেও সোমেশ্বর মন্দির মোটেই অবহেলিত নয়। স্থানীয়রা বিশেষ করে কুমারী মেয়েরা প্রায়ই পূজো দিতে আসে। থালায় থালায় নিয়ে আসে নানা রকমের ফল ফুল ও মালা। সযত্নে সেই উপচার সোমেশ্বরকে অঞ্জলি দিয়ে তারা মনের মানুষ কামনা করে। পায় কিনা জানি না। আর পেলেও যে তাদের মন ভরে তাই বা কে জোর করে বলতে পারে! 'যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা চাই তাহা পাই না'—কথাটা তো কেবল একালের বঙ্গ-ললনাদের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, সকল দেশের সকল কালের কুমারীদের কাছেই চরম সত্য।

কুমায়ুনী কুমারীদের দ্বারা পূজিত হলেও সোমেশ্বর ঐশ্বর্যবান নন। দূরাগত তীর্থযাত্রী না এলে দেবতা ঐশ্বর্যশালী হন না। তবে তাঁরা দেবতাকে যে ডালি দেন, তা দেবতার কোন কাজে লাগে না। দেবতা ঐশ্বর্যের মুখাপেক্ষী নন। ভক্তের অন্তরের ঐশ্বর্যই দেবতাকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলে। সেই অতুল ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান সোমেশ্বর।

সশ্রদ্ধ অন্তরে সোমেশ্বরকে প্রণাম করি। শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রদক্ষিণ করি মন্দিরকে। তারপরে ত্বরিত পদক্ষেপে ফিরে আসি বাস স্ট্যাণ্ডে। ড্রাইভার আমাদের দেরি দেখে সজোরে হর্ন বাজাতে শুরু করেছে।

তাড়াতাড়ি বাসে উঠে আসি। বাস এগিয়ে চলে কৌশানীর পথে।

কথাটা ভুলে বসেছিলাম আমরা। কিন্তু ভোলে নি মোহিত। মোহিত শান্ত ও ধীর। সব সময় চুপচাপ থাকে। কিন্তু সব দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ওর। তাই বোধ হয় তারই প্রথম মনে পড়ে কথাটা। সে অমিতাভকে বলে, "এবার তা হলে আপনার কৈলাস-কাহিনী শুরু করুন।"

অমিতাভ প্রমাদ গনে। কিন্তু বৃথাই দ্বিধা। দাশু বলে ওঠে, "দেরি করে কোন লাভ নেই,

কেবল অযথা সময় নষ্ট হবে। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি শুরু করে দিন।”

“কিন্তু... ” অমিতাভ কি যেন বলতে চায়।

অসিত বাধা দেয় তাকে, “না না, কোন কিন্তু-টিন্তু নয়, আপনি আরম্ভ করুন।”

অগত্যা অমিতাভ আরম্ভ করে—

“আমরা গিয়েছিলাম টনকপুর ও পিথোরাগড় হয়ে। পিথোরাগড় থেকেই শুরু হয়েছিল আমাদের পদযাত্রা।

১৯৫৭ সালের ৩রা জুন আমরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম। কথা ছিল প্রবোধদা (হিমালয়-প্রেমিক সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল) আমাদের সঙ্গে গারবিয়াঙে মিলিত হবেন। আমরা পথের খাবার ও কুলির ব্যবস্থা করে এগিয়ে যাব। কিন্তু ঘটনাচক্রে ফ্লুর আক্রমণে পিথোরাগড়ের এক অখ্যাত হোটেলে পাঁচ দিন শুয়ে থাকতে হয় আমাকে। প্রবোধদার সঙ্গে আমরা পিথোরাগড়েই মিলিত হয়ে ১২ই জুলাই শুরু করি পদযাত্রা। এই ভাবেই আমরা ধারচুলার পথে গারবিয়াং পার হয়ে ভারতের শেষ চেক্‌-পোস্ট কালাপানির দিকে এগিয়ে যাই। ভারত-সীমান্ত থেকেই আমার কাহিনী শুরু করছি।

“যতদূর মনে পড়ে তারিখটা ২৬শে জুন। সকালে রওনা হয়েছিলাম গারবিয়াং থেকে। কালী নদী আর টিংকার নদীর সঙ্গম পার হয়ে নেপালে ঢুকে গভীর জঙ্গলের পথ নিয়েছিলাম। বেশ কিছুদূর এসে কালী নদীর কালো জল আবার পার হতে হল। কালীর রূপ ক্রমশই কালো আর দুরন্ত হয়ে উঠছে।

কালীর তীরে তীরে ১১মাইল পথ যেন স্বপ্নের মধ্যে পার হয়ে এসেছি। পৌঁচেছি কালাপানি—পাশে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে কালী নদী। মাঝে মাঝে আওয়াজ আসছে গুম্‌ গুম্‌ করে।

কয়েকটি তাঁবু নিয়ে এই শেষ চেক্‌-পোস্ট। গুটিকয়েক রাইফেল আর একটি ট্রান্সমিটার এঁদের সম্বল। প্রকৃত সীমান্ত এখান থেকে কিছু দূরে। আগামীকাল আমরা সেখানে পৌঁছে যাব।

কয়েকজন পুলিস হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। পাণ্ডববর্জিত দেশে মানুষের মুখ দেখলেই এঁদের আনন্দ। প্রথমেই ছোট একটি চায়ের দোকান। পরিষ্কার চায়ের কাপ—দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম। চা প্রতি কাপের দাম চার আনা হলেও আট আনা দিতে রাজী ছিলাম। ধূমায়িত কাপটি হাতে নিয়ে চারদিক দেখে নিলাম। ছোট সমতল একটি মাঠ। পাশ দিয়ে পরিষ্কার জলের একটি ধারা পাশের পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে। শুনলাম এটিই নাকি কালী নদীর একটি উৎস। এক ধারে এক সারিতে কয়েকটি তাঁবু। মাঝখানে খুঁটিতে একটি জাতীয় পতাকা। চেক্‌-পোস্ট অফিসার মিঃ নাথানী চমৎকার লোক। আমাদের কিছুক্ষণ পরে প্রবোধদা আর তাঁর বন্ধু সটাইবাবু এসে পৌঁছলেন। তাঁদের হাতে চায়ের কাপ দিয়ে অভ্যর্থনা করলাম। প্রবোধদা বললেন—ব্যাপার কি হে, একেবারে চক্‌চকে কাপপ্লেট দেখছি যে, গ্র্যাণ্ড হোটেল নাকি?

মিঃ নাথানীর কাছে প্রবোধদার পরিচয় দিলাম। তিনি মহাপ্রস্থানের পথে-র হিন্দী চলচ্চিত্র দেখেছেন। এগিয়ে এসে প্রবোধদাকে স্বাগত জানালেন।

পরদিন ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায়। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। পরিষ্কার আকাশ। একটু বেলাতেই বেরুনো হল। নাম-ধাম লিখিয়ে চেক্‌-পোস্টের সবার কাছে বিদায় নিয়ে বেরুতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগল। গাইড রতন সিং কেবল তাড়া দিচ্ছে।

কিছুদূরে পুল পেরিয়েই দুরন্ত চড়াই। মাথার উপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। চারিদিকে বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়াগুলি রোদে ঝলমল করছে। চোখ ফেরানো যায় না। আবার তাকিয়ে থাকলেও চোখ ঝলসে যায়। ধীরে ধীরে পথ চলছি। মাত্র ৬ মাইল যেতে হবে। তাড়া নেই। কালী নদীও ক্রমশঃ উঠে আসছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। চারিদিক থেকে নেমে এসেছে হিমবাহ। একেবারে বরফের রাজ্যে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের পথ বেঁকে গেল বাঁদিকে। কালী নদী আমাদের সঙ্গে থাকলেও বরফের নিচে হারিয়ে গিয়েছে। ওপারে একটি বিরাট উপত্যকা দিয়ে বিপুল এক হিমবাহ নেমে এসেছে। এত বড় আর এত সুন্দর হিমবাহ এই প্রথম আমার চোখে পড়ল। চারিদিকেই সাদা। বরফের পাহাড় মাথা উচুঁ করে আছে। খালি চোখে আর তাকানো যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে রঙীন চশমা পরে নিলাম। প্রবল বেগে কন্‌কনে হাওয়া বইছে। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছে। বহুদূরে আর নিচে বাঁকের মাথায়—ছোট কতগুলো বিন্দু উঠে আসছে। প্রবোধদারা আসছেন। সঙ্গে এলাহাবাদের মিলিটারী ডাক্তার মেজর মিশ্রও আছেন মনে হল। মাঝে মাঝে প্রবল জলস্রোত পার হতে হচ্ছে। বেলা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জল বেড়ে যায়। কোন রকমে পাথর গড়িয়ে পথ করে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে নরম বরফ। চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

সামনের উপত্যকা ডানদিকে মোড় নিয়েছে। এবার শুধু বরফের উপর চলেছি। ডানদিকে বেঁকে কিছুদূরে একটা কালো পাথরের উঁচু ঢিবি দেখা গেল। শুনলাম ওটাই নাম্নি সংচাম। পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। কুলিরা অনেক নিচে থাকায় অপেক্ষা করতে হল। বেলা তিনটার মধ্যেই সেদিনের মতো যাত্রা শেষ। তাঁবু খাটিয়ে সবাই ঢুকে পড়লাম চায়ের আশায়। বিশ্রাম রাত দুটো পর্যন্ত। বরফ একটু শক্ত হলে আবার চলা শুরু হবে।

রাত দশটার পর শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। তারপর তুষারপাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল এই তুষারপাত। তাঁবুতে জ্বালানীও শেষ। শ্রেষ্ঠ গাইড কিচ্‌ খাম্‌পা আমাদের সঙ্গেই আছে। প্রবোধদা তার সঙ্গে আমাদের এগিয়ে যেতে বললেন।

অন্ধকারের মধ্যেই টর্চ আর হ্যারিকেন নিয়ে যখন বেরিয়েছি, তখন রাত পৌনে চারটা। বরফ পড়া তখনও শেষ হয় নি। কিছুদূর গিয়েই বিপদ হল। নরম বরফে আমাদের দলের সবাই ডুবতে শুরু করে দিলেন। কুলিরা ভারী মাল নিয়ে আরও অসুবিধায় পড়ল। পথের চিহ্ন কোথাও নেই। পায়ের নিচে নদীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। চলার গতি ক্রমশই কমে আসছে।

ভোরের আলো ফুটে ওঠাতে চলার একটু সুবিধা হল। অতিকষ্টে আমরা শেষ পর্যন্ত লিপুলেখ গিরিবর্ত্মের ওপরে এসে দাঁড়ালাম। একদিক খাড়া নেমে গেছে তিব্বতে। আর একদিকে নেপালের পাহাড়। চারদিকে শুধু সাদা বরফ। খাড়া দেওয়ালের মতো পথ। বসে ঘষে ঘষে নামতে হচ্ছে। সারে চার মাইল পথ কি ভাবে এসেছিলাম মনে নেই। লিপুর নিচে পৌঁছবার পরেই শুরু হয়েছে প্রবল তুষারঝড়। ডাঃ মিশ্র আর স্বামীজীর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। বরফ আবার শেষ হয়ে গিয়েছে। একটা ছোট নদী পার হয়ে প্রায়-সমতল পথ চলে গেছে নদীর ধার ঘেঁষে।

কতক্ষণ চলেছি জানি না—নদী পার হয়ে এক খাড়াপথ পার হয়ে তাকলাকোট পৌঁচেছি। মণ্ডিতে এসেই মোহন সিং গারবিয়ালের ছেলের সঙ্গে দেখা করে একটা অপরিসর ছোট ঘর দখল করা হল। চারিদিকে পাথরের দেয়াল আর ওপরে তাঁবু বিছানো। কয়েকজন চীনা সৈন্য দেখা গেল।

পরদিন। সারাদিন জল্পনা-কল্পনা করে কাটাবার পর সন্ধ্যায় হরি সিং এসে হাজির হল।

মোহন সিং-এর ছেলে ঈশ্বর সিং সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। কিছু জিনিসপত্র ফেরত পাঠানো হল। আর কিছু তাকলাকোটে রেখে যাবার ব্যবস্থা করা হল। অতিরিক্ত বরফ পড়ার জন্য তীর্থপুরী যাওয়া সম্ভব হল না। চাইনীজ অফিসাররা আমাদের তাঁবুতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেল। স্বামীজী আর ডাঃ মিশ্র অনেকটা সুস্থ হয়েছেন।

আমরা সিমবিলিং গুম্ফা দর্শন করলাম। মন্ডির পেছন থেকেই উঠে গিয়েছে খাড়া পিচ্ছিল পথ। গুম্ফাটি বড়। বুদ্ধদেবের মূর্তিটিও বেশ সুন্দর আর বড়। আজ বাৎসরিক ফসলের উৎসব। গুম্ফার উপর দাঁড়িয়েই আমরা দূরে গ্রামের পথে মিছিল দেখেছি। দর্শনী দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে নেমে এসে শুনলাম—কুলির বদলে খচ্চর আর গাধা আমাদের মাল নিয়ে যাবে। আগাম দেওয়া হয়ে গিয়েছে। স্বামীজীর জন্য একটি ঘোড়া পাওয়া গিয়েছে।

তিনটি ঘোড়া আর একটি খচ্চর নিয়ে দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম পরদিন সকালে। আমাদের যাত্রার শেষ পর্ব শুরু হল। মন্ডির প্রায় সমস্ত খালি ঘর পেরিয়ে পথ বেয়ে উঠেছে শুধু বালি আর পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে। কিছুদূর গিয়ে নেমেছে নিচে—গুকুং গ্রামে। গ্রামটি যেন পাহাড়ের গুহার গায়ে সাজানো। বাড়িগুলি যেন পাখীর বাসা। বেশ একটা নূতনত্ব আছে। ভিতরে গুহা, বাইরে বারান্দা দরজা জানালা ইত্যাদি। নদী পার হতে হল। তারপর চীনাদের তাঁবু—অফিস ইত্যাদি। গ্রামের শেষ প্রান্তে গভর্নর বা জংপন-এর সঙ্গে দেখা করলাম। বৃদ্ধ তিব্বতী ভদ্রলোক। দেশীয় প্রথায় শুকনো ফল আর মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর শুভকামনা জানিয়ে আমাদের বিদায় জানালেন। বিশেষ করে বলে দিলেন, ফিরবার পথে যেন আমরা সবাই কুশলে আছি, একথা জানিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে যাই।

মরুপথে মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ নিয়ে পথ চলতে বেশ লাগছিল। বালি আর কাকড়ের পাহাড়। বাঁদিকে হিমালয়ের চিরতুষার শৃঙ্গগুলি রোদে চিক্‌চিক্ করছে, ডানদিকে বিশাল গুরলা মান্ধাতা—তার বরফের মাথা উঁচিয়ে আছে। টোয়ো গ্রামে জারোভার সিং-এর সমাধি দেখে আবার পথ চলা শুরু হল। একঘেয়ে পথ। স্বামীজী চলেছেন ঘোড়ায়। মাইলের পর মাইল পার হয়ে দূরে একটি ছোট তাঁবু দেখতে পেলাম। শুনলাম এই বুংগুং। ডাঃ মিশ্রের তাঁবুতে পৌঁছতেই, বসিয়ে একেবারে চা খাইয়ে তবে ছাড়লেন। তিনি বার বার গুরলা গিরিপথ হয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

খুব ভোরেই বেরিয়েছি ২রা জুলাই আমাদের সেখাং ক্যাম্প থেকে। ডাঃ মিশ্র মনের দুঃখ চেপে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেলেন ডানদিকে গুরলা গিরিপথের দিকে। আমরা ধরেছি রাক্ষসতালের পথ।

সামনে যেন একেবারে মরুভূমি। মরুপ্রান্তরে সবাই চলেছি নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে নিজেই চমকে উঠছি—যেন ঘুমিয়ে পথ চলছি। প্রবল বাতাসের বেগে এগিয়ে চলা বেশ মুশকিল হয়ে পড়েছে। ঘননীল আকাশে শরতের মেঘ ভেসে চলেছে উত্তর মুখে—কৈলাসের দিকে। সন্ধ্যার দিকে একটি প্রায় শুকিয়ে যাওয়া নদীর ধারে ক্যাম্প করা হল। একেবারে নির্জন জায়গা। আশেপাশে বহু মাইলের মধ্যে জনপ্রাণী খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুনেছি এখানে নাকি খুব ডাকাতি হয়।

পথ গুরলা-লার দিকে বাঁক নিয়েছে। পাহাড় আর চড়াই শুরু হয়েছে। চড়াই বাঁকের পর বাঁক নিয়েছে। মান্ধাতাও যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। আচ্ছন্নের মতো চলেছি সবাই। হঠাৎ একটা বাঁক পেরিয়েই দূরে অনেক উঁচুতে তিব্বতী পতাকা দেখা গেল। ছুটতে শুরু

করলাম। বেশি দেরি হল না পৌঁছাতে। দেখলাম সামনে বিশাল নীল হ্রদের একাংশ—রাক্ষসতাল। দূরে মেঘের আড়ালে কৈলাস। সমস্ত পরিশ্রম সার্থক। আজ ৩রা জুলাই, ১৯৫৭। একমুহূর্তে শরীরের সব গ্লানি দূর হয়ে গেল। পাগলের মতো পাথুরে পথে ছুটে নেমে গেলাম হ্রদের পবিত্র জল স্পর্শ করে নিজেদের শ্রমমুক্ত করতে, ধন্য হতে।

সমস্ত দলটাই নেমে এল জলের ধারে। রাক্ষসতালের জলে পিপাসা মিটিয়ে নিল সবাই। তারপর পূর্বতীর ধরে চলা শুরু হল উত্তরমুখে। পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল জল। প্রায় ১৫/১৬ ফুট নিচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দূরে দুটি দ্বীপ থাকাতে আরও সুন্দর লাগছে দেখতে। জলজ উদ্ভিদের একটি চওড়া জমানো বেল্ট অজগর সাপের মতো ধার দিয়ে চলে গিয়েছে। জিনিসটা নরম হওয়াতে তার উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ মজা লাগছে। বেশ কিছুদূর যাবার পর বিশ্রাম আর চায়ের জন্য এক জায়গায় বসা হল। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হবে। নিম্‌কিন চা মানে নুন দেওয়া চা তৈরি হতে বিশেষ দেরি হল না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ছুট্‌কার ওপর পা ছড়িয়ে বসে হ্রদের শোভা দেখছি। হঠাৎ একটা সাঁই সাঁই শব্দ শোনা গেল। জলের উপর প্রবল বেগে বাতাস বয়ে যাচ্ছে দেখলাম। জলে ছোট ছোট ঢেউগুলি ক্রমশঃ বড় বড় ঢেউয়ে পরিণত হল। অশান্ত রাক্ষসতালকে সমুদ্র বলে মনে হচ্ছিল। এর মাঝে আর একটি জিনিস যা দেখলাম তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। হ্রদের জলে নানারকম রঙের খেলা। এ দৃশ্য নাকি খুব কম লোকই দেখতে পায় শুনেছি। হ্রদের উত্তর পারে আমাদের তাঁবু ফেলা হয়েছে। পথে রাজহাঁস দেখলাম হ্রদের জলে। সন্ধ্যায় রাক্ষসতালের উপর সূর্যাস্ত দেখে মনটা সত্যই ভরে গেল। প্রবল বাতাসে তাঁবু ছিঁড়ে যেতে চাইছে। মাঝের খুঁটি ভেঙ্গে যাওয়াতে লাঠি দিয়ে কোনরকমে ভাঙ্গা খুঁটি জোড়া দেওয়া হয়েছে। রাত দুটোর পর হাওয়া থামল। চারিদিক শান্ত আর নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে ঘোড়াদের ঘণ্টার আওয়াজ আসছে।

৪ঠা জুলাই। চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম উত্তরমুখে। শুরু হল প্রাণান্তকর চড়াই। খুব বেশি উঠতে হল না। এক জায়গায় এসে ডানদিকে দেখতে পেলাম বিশাল মানস-সরোবরের দৃশ্য। উত্তরমুখ করে দাঁড়ালে সামনে কৈলাস, পেছনে মান্ধাতা, বাঁদিকে রাক্ষসতাল আর ডানদিকে মানসসরোবর দেখা যায়। হ্রদদুটি কত বড় তা এখান থেকে বেশ বোঝা যায়। পাহাড় পার হয়ে নামা শুরু হল। দুই পাহাড়ের মাঝে পথ নেমে গিয়েছে। এক বিরাট সমতলের শেষে কৈলাস পর্বতশ্রেণী। কাছাকাছি একটি স্বর্ণখনি আছে। গঙ্গা-ছু পার হতে হল। গঙ্গা-ছু মানস ও রাক্ষসের যোগাযোগ রক্ষা করেছে। জল বেশি নেই। বিস্বাদ জল। বরখার সমতল পেরিয়ে জলাভূমি, মরুভূমি, আর কাঁটাঝোপের জঙ্গল পার হতে হল। বেলা দুটোর কাছাকাছি তারছেন থেকে তিন মাইল দূরে একটি নদী পার হতে না পেরে সেইখানেই তাঁবু ফেলতে বাধ্য হলাম। বেলা বাড়লেই জল বাড়ে। চমৎকার পরিষ্কার দিন। তাঁবুতে শুয়েই কৈলাস দেখা যাচ্ছে। স্বামীজী খুব খুশি। বলছেন—আমার শরীর ভাল হয়ে গিয়েছে। তোমাদের উৎসাহেই আমার কৈলাস দর্শন হল। তিনি পুজো নিয়ে বসেছেন। সারারাত পুজো করেছেন। আমাদের ঘোড়াওয়ালা আর গাধাওয়ালা কর্মা ও ফুটে পুজো নিয়ে বসেছে। কৈলাস ওদের বড় তীর্থ। কর্মা আমাকে বড়লামা বলে ডাকে। ভারতের অনেক তীর্থ (বৌদ্ধ) ওর দর্শন হয়েছে। হিন্দী বলতে পারে একটু একটু। ফুটে তিব্বতী ছাড়া অন্য কোন ভাষা একেবারেই বোঝে না।

পরদিন তিন মাইল বেশি ঘুরতে হল নদী পার হবার জন্য। তারছেন পৌঁছলাম সকাল নটায়। তারছেনে মাণ্ডি (বাজার) জমে নি, কয়েকটি মাত্র দোকান। চমরীর লেজ খোঁজা

হল। একটামাত্র ভাল পাওয়া গেল। একজন লোক এসে ভাঙ্গা হিন্দীতে আলাপ শুরু করাতে শুনলাম নেপালী জানে—দার্জিলিং গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। নেপালীতে কথা বলাতে মহাখুশী। জোর করে আমাদের ওর তাঁবুতে নিয়ে গেল। চা খাওয়াবেই। পচে যাওয়া মাখন দিয়ে তিব্বতী চায়ের ব্যবস্থা দেখে পরিক্রমার নাম করে বেরিয়ে পড়লাম। বললাম পরিক্রমা শেষ করে যাবার সময় নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যাব।

৩২ মাইল পরিক্রমা শেষ হবে। পৌনে চার মাইল দূরে সেরসুং পৌঁছতে বেশি দেরি হল না।

ঝাণ্ডা স্পর্শ করে ডানদিকের পথ নিলাম আমরা। এক জায়গায় লা-ছু পার হলাম। কনকনে ঠাণ্ডা জল। খালি পায়ে পার হতে হল। সুকুমার রায় প্রত্যেকবারই রতন সিংয়ের পিঠে পার হয়েছে। লা-ছুর পশ্চিম পার দিয়ে কিছুদূর যাবার পর নিয়াঁরী গুম্ফা। কৈলাস পরিক্রমায় চারিদিকে চারটি গুম্ফা আছে। দক্ষিণে তারছেন, উত্তরে ধীরাফুক, পুবে জুথুল-ফুক, আর পশ্চিমে এই নিয়াঁরী। তীর্থপুরী ঘুরে এলে পথ এখানেই এসে মিশেছে। তীর্থপুরী থেকে কৈলাস মাত্র ২৮ মাইল। লিপুলেখ থেকে কৈলাসের দূরত্ব ৭২ মাইল, জোশীমঠ থেকে ২০০ মাইল (নিতি গিরিবর্ত্ম হয়ে), লাসা থেকে ৮০০ মাইল, শ্রীনগর (কাশ্মীর) থেকে লাদাক হয়ে ৬০০ মাইল আর পশুপতিনাথ (নেপাল) থেকে মুক্তিনাথ আর খোচরনাথ হয়ে ৫২৫ মাইল।

এ যাত্রায় আমাদের আর তীর্থপুরী দেখা হল না। তীর্থপুরী তাকলাকোট থেকে জ্ঞানিমা মণ্ডি হয়ে অথবা সোজাপথে টিপ্‌রালা হয়ে ৫/৬ দিনের পথ। তীর্থপুরীর গুম্ফা বিখ্যাত। উষ্ণ প্রস্রবণ আছে যাতে ক্যালসিয়াম কারবনেট আর সালফেট প্রচুর পাওয়া যায়। যাত্রীরা তাই বিভূতি বলে সংগ্রহ করেন। ভস্মাসুরের ভস্ম বলেও হিন্দুরা বিশ্বাস করেন।

মোহন সিং গারবিয়ালের ভাঙ্গা ঘরে বসেই আমাদের তীর্থপুরীর প্রোগ্রাম করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত বরফের জন্য সবাই বারণ করে যেতে। মোহন সিং গারবিয়ালের ভাঙ্গাঘর আর একটি কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ঘরেই প্রবোধদার কাছে আমি হিমালয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব করি। সুকুমার তখন বাইরে ছিল কাজে। সুকুমার ফিরে এলে প্রবোধদা বললেন—শম্ভু একটা ভাল প্রস্তাব দিয়েছে হে! একটা ক্লাব করা হবে হিমালয় অনুরাগীদের জন্য। সাধু প্রস্তাব সন্দেহ নেই।

—কিন্তু আগে তো প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরি, তারপর ক্লাবের কথা চিন্তা করা যাবে। সুকুমার বলেছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে সুকুমারই হিমালয়ান এসোসিয়েশনের আয়োজিত নন্দাঘুন্টি পর্বতাভিযানের নেতৃত্ব করেছিল।

চিন্তার মধ্যে ডুবে এগিয়ে চলেছি আচ্ছন্নের মতো। হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলাম। পথটা খাড়া নামতে শুরু করেছে নদীর ধারে। নদীর জল অনেকটা বেড়েছে। শুধু সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে। কৈলাসের অন্যরকম রূপ দেখতে পাচ্ছি সামনে। মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। এখান থেকে কৈলাসকে অনেকটা মন্দিরের মতো দেখায়, অদ্ভুত আকার। বাঁদিকে পর্বতটির নাম 'গোম্‌বোপাং' অথবা রাবণ পর্বত। রাবণ নাকি মহাদেবের কৃপালাভের জন্য অনেক তপস্যা করেছিলেন এ পর্বতে। তিনি কৈলাস সহ মহাদেবকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন লঙ্কায়। কিন্তু সম্ভব হয় নি শেষ পর্যন্ত। আশেপাশের পর্বতের সঙ্গে কৈলাসের পার্থক্য বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে। কৈলাসের সৌন্দর্যের বর্ণনা করা কঠিন। চারদিক থেকে কৈলাসের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।

মনের আনন্দে এগিয়ে চলেছি—কৈলাসের দর্শন পেয়েছি, একেবারে কাছে পৌঁছে গেছি। পথে ৪/৫টি কস্তুরী মৃগ দেখা গেল। ধীরাফুক আর বেশি দূর নেই। দুটি নদী পার হতে হল। জলের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শুধু সাদা ফেনা। বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে জলও বেড়ে যাচ্ছে। রতনসিং সুকুমারকে পিঠে নিয়ে পার হয়ে গেল। হরিসিং রতনসিং-এর তুলনায় একটু দুর্বল। আমাকে পিঠে নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। দুইজনে হাত ধরে নেমে পড়লাম। প্রথম নদী পার হলাম অতিকষ্টে। ঠাণ্ডা জল আর প্রবল স্রোতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। দ্বিতীয় নদীর জল আরও বেশি। হরিসিং প্রায় হাত ছেড়ে দেয় আর কি। তার ওপর জলের নিচে পাথর গড়িয়ে যাচ্ছে। একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল হঠাৎ। আর তখনই একটা গড়ানো পাথর পড়ল আমার পায়ের আঙ্গুলের ঠিক ওপরে। প্রায় ডুবে যাবার অবস্থা। কোমর পর্যন্ত ঠাণ্ডাজলে ভিজিয়ে উঠে এলাম কোন রকমে। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। পায়ের পাতা ফেলার মতো অবস্থা আর নেই। রতনসিং-য়ের ঘাড়ে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ ডানদিকে দৃষ্টি পড়াতে সব ভুলে গেলাম। সামনেই বিশাল কৈলাসের নিচ থেকে চূড়া পর্যন্ত সবটাই দেখা যাচ্ছে। অপূর্ব সুন্দর। বর্ণনা করা কঠিন। ধীরাফুক গুম্ফার দিকে ছুটতে শুরু করলাম আরও ভাল করে দেখার জন্য। ছবি তোলা শেষ করে গুম্ফার ভিতরে গিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে আগুনের ধারে গিয়ে বসলাম। মনের আনন্দ তখন চেপে রাখা কঠিন। ঘরের মধ্যে কয়েকজন তীর্থযাত্রীর ভিড়। কয়েকজন সাধুও আছেন। আমাদের তাঁবু নদীর ওপারে এসে গিয়েছে। আবার নদী পেরিয়ে তাঁবুতে পৌঁছতে হল। নদী পার হওয়াটা চিরদিন মনে থাকবে।

রাতে ছিল খিচুড়ীর ব্যবস্থা। স্বামীজীর শরীর আবার খারাপ হয়েছে। সুকুমারও শুয়ে পড়েছে। ফুটে কর্মা রতনসিং আর হরিসিং রান্না নিয়ে ব্যস্ত। ওভারকোট চাপিয়ে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারে। প্রায় আধ মাইল পথ চলে গেলাম, যেখান থেকে কৈলাস সম্পূর্ণ দেখা যায়। একটা বড় পাথরে বসলাম। ধীরাফুক গুম্ফা থেকে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রায় দেড়ঘণ্টা একভাবে বসে থাকার পর চাঁদের আলোতে ধীরে ধীরে কৈলাস পর্বত সম্পূর্ণ দেখতে পেলাম। সে দৃশ্য আর সে অনুভূতি বলে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রাণ মন ভরে উপভোগ করার পর দু'ঘণ্টা বাদে আবার ফিরে চললাম তাঁবুর দিকে। ঠাণ্ডায় হাত পা প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছে কিন্তু হৃদয় ভরে উঠেছে এক অপরূপ অপার্থিব আনন্দে। জীবন সার্থক হল।

কৈলাস সম্বন্ধে জানতে হলে স্বামী প্রণবানন্দের 'Kailas-Mansarvar' বইখানি পড়তে হবে। পশ্চিম তিব্বত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অপরিসীম। এই সন্ন্যাসী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আবিষ্কারের নেশায় হিমালয়ের দুর্গম পথে ঘুরেছেন। ছোটখাটো সাধারণ মানুষটিকে দেখলে বোঝাই যায় না যে তাঁর মধ্যে এত বড় প্রতিভা লুকিয়ে আছে। চীনা-সরকার এখন আর স্বামীজীকে তিব্বতে প্রবেশ করতে দেয় না। মানব-সরোবর আর গৌরীকুণ্ডের গভীরতা মাপার জন্য স্বামীজীই প্রথম নৌকা ভাসিয়েছিলেন। রাক্ষসতালের গভীরতা মাপা আর শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি চীনাদের জন্য।

৬ই জুলাই সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম ডোল্মা গিরিপথের দিকে। বরফ ঢাকা নদী। কাচের মত স্বচ্ছ বরফ। খুব সাবধানে পার হতে হল। ডানদিকে কৈলাস—দেয়ালের মতো খাড়া। অবশেষে এসে দাঁড়ালাম একটা পাহাড়ের গায়ে। আবার তেমনি কঠিন বরফ। আবার তেমনি পা পিছলে যাচ্ছে। আমার লাঠির লোহার নালটা ভেঙ্গে গেল। কাজেই হামাগুড়ি দিয়ে ও বুকে হেঁটে এগোতে থাকি। ভাগ্য ভাল। একটু নরম বরফে এসে পৌঁছলাম। তবে

এখানে ঘোড়াগুলিকে পার করা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিল। অনেক কষ্টে তাদের টেনে তোলা হল। বরফ ক্রমেই কোমলতর হচ্ছে। আমরা নরম তুষারে তলিয়ে যেতে থাকলাম। তুষারের তলায় লুকিয়ে থাকা পাথরের ঘষা লেগে কয়েকটি ঘোড়া ও দুটি গাধা আহত হল। সারা পথটাই সংগ্রাম করে এগোতে হল আমাদের। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় ১৮,৪০০ ফুট উঁচু ডোল্‌মা গিরিপথের ওপরে পৌঁছলাম।

গিরিবর্ত্মের নিচেই গৌরীকুণ্ড -ছোট একটি হ্রদ—তুষারাবৃত। গোরীকুণ্ড ঠিক কৈলাসের পাদদেশে অবস্থিত। বরফ খুঁড়ে জল পাওয়া গেল। প্রাণভরে পান করলাম। ওয়াটার বটলে ভরে নিলাম পথের জন্য। তারপরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নামতে শুরু করলাম। খাড়া উৎরাই। খুব সাবধা'ন নামতে হচ্ছে। নেমে এলাম একটা বরফে ঢাকা নদীর ওপরে। বসে পড়লাম সকলে। প্রখর রোদে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমরা চোখ বুজে বিশ্রাম করি।

কিছুক্ষণ পরে আবার চলতে শুরু করি। তবে বেশি দূর এগোতে পারি না। আমরা জুথুলফুক্‌ গুম্ফার কাছে ক্যাম্প করি।

পরদিন। তাঁবু গুটিয়ে আবার চলা শুরু করি জুথুলফুক্‌ গুম্ফা দর্শন করে। এগিয়ে চলি তারছেনের দিকে। পথে পড়ল 'জংছু' নদী। নদী পার হবার পরে পরখার সমতলভূমি দেখতে পেলাম। আমরা পশ্চিমের পথ ধরলাম। কিছুক্ষণ পরে শুরু হল মরুভূমি। কেবল বালি আর বালি। শেষ পর্যন্ত ডাম্‌জুর ধারে গিয়ে একটা ছোট জলাভূমি পাওয়া গেল। সেখানেই তাঁবু ফেললাম আমরা।

পরদিন ৮ই জুলাই। কিছুক্ষণ চলার পর আবার সেই মরুপথ। কোথাও জল নেই। প্রবল বাতাসের বিপক্ষে পথ চলেছি। অবশেষে ক্লান্ত দেহে জিউ গুম্ফাতে পৌঁছলাম। একটু বিশ্রামের পরে গুম্ফা দর্শন করলাম। অসংখ্য গুম্ফা আছে এ অঞ্চলে। ৬৮ মাইল হেঁটে মানস-সরোবর পরিক্রমা করতে হয়। পরিক্রমার পথে আটটি গুম্ফা পড়ে। ৭৬ মাইল হেঁটে রাক্ষসতাল পরিক্রমা করতে হয়। যাক্‌গে, গুম্ফা দর্শনের পরে আমরা নেমে চললাম মানস-সরোবরের দিকে। তাড়াতাড়ি চলেছি। আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়বার আগেই স্নান সেরে নিতে হবে। মেঘের ছায়া পড়লেই উত্তাপ দশ ডিগ্রী কমে যায়।

সরোবরের তীরে পৌছে সবাই স্নান করে নিলাম। জল খুবই ঠাণ্ডা। তবুও তিনটি ডুব দেবার পরেই দেহের সকল অবসাদ দূর হয়ে গেল। মন ভরে উঠল এক স্বর্গীয় সুষমায়। পুণ্যস্নান শেষে পুণ্যসরোবরের তীরে এলাম সকলে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে অশান্ত পবন এলো ছুটে। ঝাঁপিয়ে পড়ল মানসের বুকে। শান্ত সরোবরে তুফান উঠল।

মানসের তীর থেকে শুরু হল প্রত্যাবর্তন। স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে মর্ত্যের পথে এগিয়ে চলি আমরা। একই পথ, একই সহযাত্রী। কিন্তু যে মন যাবার পথে আমার সঙ্গী ছিল, আজ আর সে নেই সঙ্গে। তবু আমি চলেছি ফিরে। কিছুই ভাল লাগছে না। কাউকে ভাল লাগছে না। তাই একা একা পথ চলেছি। কালও এমনি চলেছি। আজও তাই। সহযাত্রীরা পড়ে আছে পেছনে। আমি এসেছি এগিয়ে। পথ জনমানবশূন্য। আমি একা।

একজন ঘোড়সওয়ার আসছে বিপরীত দিক থেকে। অভিবাদন করে সে অবতরণ করে আমার সামনে। আমি অবাক হই। সে বলে—তোমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি। তোমাদের সঙ্গী মিস্টার সান্যাল আসছেন পেছনে। তিনি আজ বরফুতে তাঁবু ফেলবেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটতে শুরু করলাম। প্রায় পাঁচ মাইল ছুটে যখন বরফু পৌঁছলাম, প্রবোধদা তখনও সেখানে আসেন নি। চা তৈরি করে তাঁদের প্রতীক্ষায় রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক

পরে তিনি এলেন। আমাদের দেখে তিনিও আমাদেরই মতো আনন্দিত হয়ে উঠলেন। হাসি আর গল্পের মধ্য দিয়ে একসময় সন্ধ্যা হল। সবাই একসঙ্গে খেতে বসা গেল। পরোটা ও স্পেশাল আলুর দম দিয়ে তিব্বতের মাটিতে মিলনোৎসব পালন করলাম আমরা।

১১ই জুলাই, আষাঢ়ে পূর্ণিমার পুণ্য প্রভাতে আমরা তাকলাকোট থেকে ১২ মাইল দূরে খোচরনাথের গুম্ফা দর্শন করলাম। পথের তেমন কোন নতুনত্ব নেই। তবে বেশ কষ্ট করে চারটি বড় বড় নদী পেরোতে হল। কর্ণালী নদীর তীর ঘেঁষে আমাদের পথ। নদীর ওপারে নেপাল-হিমালয়। গুকুং গ্রাম থেকে তিব্বতী জীবনধারার কিছু পরিচয় পেলাম।

খোচরনাথ কর্ণালী নদীর তীরে একটি প্রশস্ত উপত্যকা। গ্রামের চারিদিকে চাষাবাদ আর মধ্যস্থলে গুম্ফা। মূল-মন্দিরের তিনটে মূর্তি দর্শনীয়। অনেকের ধারণা এ তিনটি রাম লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি। কিন্তু সেটি সত্য নয়। পাশের মন্দিরে মহাকালী, মহাকাল, মৈত্রেয়, সপ্তবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি আছে। খোচরনাথ সম্পর্কে বহু গল্প প্রচলিত আছে। এমন গুম্ফা আমরা ইতিপূর্বে আর দর্শন করি নি। খোচরনাথ থেকে হাঁটাপথে নেপালের প্রসিদ্ধ তীর্থ মুক্তিনাথ হয়ে পশুপতিনাথ যাওয়া যায়।

পরের কাহিনী কেবলই প্রত্যাবর্তনের। ১৩ই জুলাই লিপুলেখ পেরিয়ে ভারতের মাটিতে ফিরে এলাম। তখনও জানতাম না যে কালাপানিতে আমাদের জন্য বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু সেকথা শুনে তোমাদের কোন লাভ নেই। আমার কৈলাস কাহিনী এখানেই শেষ হল।"

॥ তিন ॥

'In these hills, Nature's hospitality eclipses all men can ever do. The enchanting beauty of the Himalayas, their bracing climate and soothing green that envelops you, leaves nothing to be desired. I wonder whether the scenery of these hills and the climate are to be surpassed or equalled by any of the beauty spots of the world. After having been nearly three weeks in kumaon Hills, I am more than ever amazed why our people need go to Europe in search of health' .....বলেছেন গান্ধীজী। বলেছেন কৌশানী সম্পর্কে। তিনি কৌশানীর নাম দিয়েছিলেন—সুইজারল্যাণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

সেই সীমাহীন সৌন্দর্যের আধার, অতুলনীয় স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস, কৌশানীতে এসে থেমেছে আমাদের বাস।

ড্রাইভারের অনুমতি নিয়ে আমরা নেমে পড়ি পথে। বেশ শীত-শীত করছে। বাস-স্ট্যাণ্ডের উচ্চতা ৬২০০ ফুট। আলমোরা থেকে ৩২ মাইল। দু'শ দশ মাইল বিস্তৃত হিমালয়ের যে তুষারধবল শৃঙ্গমালাকে রাণীক্ষেত থেকে দেখা যায় দিগন্তের প্রান্তে, তাকে এখান থেকে মনে হয় নাগালের মধ্যে। এই সুবিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর পূব থেকে পশ্চিমে রয়েছে —নামপা (২২,১৬২), আপি (২৩,৩৯৯), পঞ্চচুলি (২০,৮৫৫´; ২২,৬৫০´; ২০,১৩০´; ২০,৭৮০´ ও ২১,১২০´), নউলফু (২১,৪৪৬), রালাম গিরিবর্ত্ম (১৮,০৪০´), নন্দাকোট (২২,৫১০´), পিণ্ডারী হিমবাহ (১২-১৩০০০´), ট্রেল্‌স গিরিবর্ত্ম (১৭,৭০০´), নন্দাদেবী পূর্ব (২৪,৩৯১´), নন্দাদেবী

(২৫,৬৪৫´), ত্রিশূল (২৩,৪০৬´; ২২,৪৯০´; ২২,৩৬০´), নন্দাঘুণ্টি (২০,৭০০´), হাতি পর্বত (২২,৩৭০´), ঘোড়ী পর্বত (২২,০১০´), কামেট (২৫,৪৪৭´), নীলকণ্ঠ (২১,৬৫০´), চৌখাম্বা (২৩,৪২০´), কর্চাকুণ্ড (২১,৬৯৫´), কেদারনাথ (২২,৭৭০´) ও পোরবন্দী (২১,৭৬০´)।

পশ্চিম দিক থেকে একটি প্রশস্ত পথ এসে মিশেছে বাসপথে। দুটি পথের সংযোগস্থলে বাস-স্ট্যাণ্ড। রাস্তার ধারে কয়েকটি দোকান। বাজার বলতে যা বোঝায় তা নেই কৌশানীতে। তবে গ্রামবাসীরা তরি-তরকারী, দুধ ডিম ও মাছ নিয়ে সকাল-বিকেল বসে এখানে। কিন্তু বাজারের কথা থাক।

তার চেয়ে কৌশানীকে দেখে নিই প্রাণভরে। স্বর্গকে না দেখতে পারলে যে মরেও মনে শান্তি পাব না। মৃত্যুর পরে স্বর্গে ঠাঁই হবে, সে কথা কে জোর করে বলতে পারে?

কৌশানী মোটেই প্রাচীন জনপদ নয়। বিখ্যাত উত্তরাখণ্ড বিশারদ এডউইন টি. এ্যাট্‌কিন্‌সন যখন কুমায়ুন পরিক্রমা করেন (১৮৮২-৮৪ খৃঃ), তখনও কৌশানীতে কোন জনপদ গড়ে ওঠে নি কারণ তিনি কৌশানীর কোন উল্লেখ করেন নি। জেনারেল চার্লস জি. ব্রুস ১৯০৭ সালে কৌশানী এসেছিলেন। তখন কিন্তু কৌশানীতে জনপদ গড়ে উঠেছে। ব্রুস তাঁর "Twenty years in the Himalayas" গ্রন্থে লিখেছেন—"Most delightfully were we entertained on our way, and myself more than once by Mr. Norman Troup and Capt. Troup at their estate at Kausanie, Mr. Troup probably knows more of Garhwal shikar valleys than any other sportsman of present time."

একই সঙ্গে এসেছিলেন এ. এল. মাম্‌। তিনিও তাঁর 'Five months in the Himalayas' বইয়ে ট্রুপ ভ্রাতৃদ্বয়ের আতিথেয়তার উল্লেখ করেছেন।

কাজেই মনে হয় নর্মান ট্রুপই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই এই জনপদ গড়ে উঠেছিল। কৌশানী বিংশ শতাব্দীর জনপদ। তবে জনপদ হিসেবে কৌশানী আজও ক্ষুদ্র। কাছাকাছি কয়েকটি চা-বাগান আছে। তবু কৌশানী রূপান্তরিত হয় নি জনবহুল শহরে। ভালই হয়েছে। নইলে হয়তো স্বাস্থ্যান্বেষী ও দর্শনার্থীরা প্রতি বছর পাড়ি জমাতেন না এখানে। প্রকৃতি-প্রেমিকদের আদর্শক্ষেত্র কৌশানী। এখান থেকে দূর দুর্গম হিমালয়ের গিরি-কান্তার ও গহন-গিরি-কন্দরের রূপ অপূর্ব। এখানকার বন, এখানকার ঝরণা, এখানকার মেঘ আর আকাশ অতুলনীয়।

তিনটি ডাকবাংলো আছে কৌশানীতে—অন্তরীম জিলা পরিষদের ডাকবাংলো, নির্মাণ বিভাগের ইন্‌সপেকশান হাউস এবং স্টেট-বাংলো। প্রথমটিতে বাস করবার জন্য কোন পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয় না। যিনি আগে আসবেন, তিনিই আশ্রয় পাবেন। অপর দুটির জন্য আলমোরার নির্মাণ বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়।

নৈনিতাল ছাড়া কুমায়ুনের সমস্ত শৈলাবাসই অবহেলিত, তবু সৌন্দর্য-পিপাসু স্বাস্থ্যান্বেষীরা দলে দলে কৌশানীতে আসেন। আগন্তুকদের তুলনায় এ তিনটি ডাকবাংলো নিতান্তই নগণ্য। ফলে গ্রীষ্মকালে কৌশানীতে স্থানাভাব দেখা দেয়।

জনসমাগমের বিচারে জিলা-পরিষদের ডাকবাংলোটি প্রথম। বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে পশ্চিমের পথটিতে কয়েক পা এসেই ডানদিকে ডাকবাংলোর সিঁড়ি। বেশ খাঁড়া সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি ভেঙ্গে ডাকবাংলোয় উঠে আসি। এখানকার উচ্চতা ৭০০০ ফুট। বহু মনীষীর পদধূলিধন্য এই ডাকবাংলো। বহু লেখক তাঁদের রচনায় এই আবাসের উল্লেখ করেছেন। কাজেই আজ

এখানে আমি প্রথম পদার্পণ করলেও এই কোমল শ্যামল দূর্বা ছাওয়া, নানা রঙের ফুলে ভরা রমণীয় আবাসটি আমার বহুকালের চেনা। চীর আর দেওদারে ঘেরা শান্ত সুন্দর কৌশানীও তাই আমার অপরিচিত নয়।

এখানকার অপার সৌন্দর্য আর অসীম শান্তি একদা আকর্ষণ করেছিল গান্ধীজীকে। তিনি তিন সপ্তাহ বাস করেছিলেন এখানে। গিরি-কান্তারের ধ্যানগম্ভীর রূপ তাঁকে 'অনাসক্তি যোগ' রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল।

আর তাই বোধ হয় গান্ধী-শিষ্যা শ্রীমতী সরলা বেন এখানে এসে আর ফিরে যেতে পারেন নি। আমেরিকার মেয়ে মিস ক্যাথরিণ মেরী হেইলিমেন গান্ধী-দর্শনে আকৃষ্টা হয়ে এসেছিলেন এদেশে। গান্ধীজীর সান্নিধ্যে এসে নবজন্ম লাভ করলেন। গুরুদেব শিষ্যার নতুন নাম দিলেন সরলা—ভারতভগিনী সরলা বেন। কৌশানীর প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রভাবিতা হয়ে তিনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন লক্ষ্মী আশ্রম। আজও সে আশ্রম আধুনিক জীবনের ক্লেদমুক্ত কৌশানীর শিশু ও মেয়েদের মুক্তিতীর্থ। আশ্রমটি এখান থেকে একটু দূরে। তাই আজ আর দর্শন করার সৌভাগ্য হবে না আমাদের।

দুখানি করে ঘরের চারটি করে স্যুট নিয়ে জিলা পরিষদের এই ডাকবাংলো। রান্নঘরগুলি সব একসঙ্গে, একটু দূরে। তবে প্রত্যেক স্যুটের জন্য একটি করে আলাদা রান্নাঘর আছে। নিজেরা রান্না না করতে পারলেও এখানে অসুবিধে নেই কোন। চৌকিদার রান্না করে দেয়। আর বাস-স্ট্যাণ্ডে আছে খাবার ও কয়েকটি চায়ের দোকান। গরম গরম পকোড়া পাওয়া যায়।

ইন্‌সপেক্‌শান বাংলোটি জিলা পরিষদের ডাকবাংলোর কাছেই অবস্থিত। দুটি স্যুট আছে। সেটিও খুব সাজানো-গোছানো এবং সুন্দর। সেখানেও ফুলবাগান আছে।

তবে ফুল দেখতে হলে যেতে হবে স্টেট-বাংলোতে। নিচের রাস্তা দিয়ে কিছুদূর পশ্চিমে গেলে পাহাড়ের ওপরে একটি উপত্যকার ধারে অবস্থিত। ঐ উপত্যকায় চা-বাগান করতে চেয়েছিলেন নর্মান ট্রুপ। তাই নির্মাণ করেছিলেন একটি ভিলা। তাঁর চা-বাগানের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় নি। কিন্তু লংস্টাফ, ব্রুস, মাম ও স্মাইথ প্রভৃতি সেকালের প্রখ্যাত পর্বতারোহীরা হিমালয়ের পথে বাস করে গেছেন এই ভিলাতে। ট্রুপ আজ আর নেই। কিন্তু আছে তাঁর ভিলাটি। সেই ভিলাই এখন স্টেট-বাংলো—কৌশানীর ভি. আই. পি. নিবাস। যেমন গড়ন, তেমনি অবস্থান। বাগানটিও দেখবার মতো—ফুলে ফুলে বোঝাই হয়ে থাকে। তাছাড়া আবাসটিকে মনোরম করে তুলবার জন্য সথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কর্তৃপক্ষ, সফলও হয়েছেন।

তিনটি দু-ঘরের স্যুট নিয়ে স্টেট-বাংলো। ঘরের মেঝেতে গালিচা পাতা, লাগোয়া বাথরুম। প্রশস্ত বারান্দা আর বিশাল ডাইনিং হল। ভাড়া খুবই সামান্য—স্যুট প্রতি দৈনিক দু টাকা। তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেউ থাকতে পারে না সেখানে, আর এই অনুমতি সংগ্রহের ব্যাপারটা মোটেই সহজসাধ্য নয়।

কাজেই সে ভি. আই. পি. নিবাসের কথা ভেবে কি হবে, তার চেয়ে সর্বসাধারণের আশ্রয় এই জিলা পরিষদের ডাকবাংলোর কথাই ভাবা যাক। হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকা যায় এখানে। সকাল দুপুর সন্ধ্যা ও রাতে, শরৎ গ্রীষ্ম শীত ও বসন্তে—সর্বদাই সৌন্দর্য-পিপাসুর তৃষ্ণা মেটে। সদাই অপরূপা প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের পালা দেখা যায়, শোনা যায় পাখিদের কাকলি আর বনের মর্মর। এখানকার শীতল সমীর গ্রীষ্মবিদগ্ধ সমতলের

জীবনকে দেয় ভুলিয়ে, দেহে ও মনে শান্তির প্রলেপ দেয় বুলিয়ে।

কৌশানীর শীত কিন্তু মোটেই উপেক্ষা করবার মত নয়। অথচ কৌশানীকে দেখতে হলে শীতকে উপেক্ষা না করে উপায় নেই। উষার আগমনে শয্যা ত্যাগ করতে হবে এখানে। মাটির বুকে দিনের আলো আসার আগে, যখন কেবল ভোরের আকাশ ছেয়ে যায় সোনালী রোদে, তখন এই ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে দেখতে হয় তুষারমৌলী হিমালয়কে। সে যে তখন হোলীর পোশাক পরে দাঁড়ায় সেখানে। তখন তাকে দেখতে না পারলে কৌশানী দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আমাদেরও তাই রয়ে গেলো। কারণ সেই বিচিত্র বর্ণের বহুরূপী হিমালয়কে এখান থেকে দর্শন করার সুযোগ নেই আমাদের। এখুনি নেমে যেতে হবে নিচে। নইলে ড্রাইভার আমাদের ফেলে রেখেই বাস নিয়ে চলে যাবে গরুড়। ছুটতে ছুটতে নেমে আসি নিচে। ড্রাইভার হর্ণ বাজিয়ে চলেছে। আমাদের দেখে ড্রাইভার হর্ণের গর্জন বন্ধ করে। কিন্তু কণ্ডাকটারের গর্জন আরম্ভ হয়। আমরা তার ধমককে নীরবে হজম করে সুবোধ বালকের মত বাসে উঠে নিজ নিজ আসনে বসে পড়ি।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেয়। সহসা মোহিত এগিয়ে যায় তার কাছে। করুণ কণ্ঠে বলে, "ড্রাইভার সাব, এতগুলো চায়ের দোকান, অনেকক্ষণ চা খাই নি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যদি মিনিট দুয়েক....."

"নহী হোগা, টেম্ খতম। গাড়ি ছোড়।" ড্রাইভার কিছু বলার আগেই নির্দয় কণ্ডাকটার গর্জে ওঠে।

মোহিত নতমস্তকে নিজের জায়গায় এসে বসে। কিন্তু ড্রাইভার সহসা ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়। কণ্ডাকটার ও আমাদের বিস্মিত করে সে মোহিতকে বলে, "যাইয়ে, জলদি চায় পী লিজিয়ে!"

হৈ হৈ করে বাস থেকে নেমে আসি। কণ্ডাকটার মুখখানি গোমরা করে বসে থাকে তার জায়গায়।

চা ও পকোরা খেয়ে আবার বাসে এসে উঠি। মোহিত হাতের ঠোঙ্গাটা কণ্ডাকটারকে দিয়ে বলে, "তুমি আর ড্রাইভার ভাগ করে খেয়ে নাও।"

অসিত তার চিবুক ধরে আদর করে, "একটু হাসো তো খোকা। একটু হ্যাঁ, অল্প একটু।"

কণ্ডাকটার হেসে ফেলে। তাকে হাসতে দেখে হাসতে হাসতে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়। আমরা এগিয়ে চলি গরুড়ের দিকে।

কাঠগুদাম থেকে আলমোরা ও কৌশানী হয়ে গরুড়, বাগেশ্বর ও কাপকোট পর্যন্ত দৈনিক বাস সার্ভিস আছে। তা ছাড়া আলমোরা ও রাণীক্ষেত থেকেও দৈনিক কয়েকখানি করে বাস কৌশানী হয়ে গরুড় গোয়ালদাম অথবা বাগেশ্বর যাতায়াত করে। কাজেই কৌশানী আসা যাওয়ার অসুবিধে নেই কোন।

কৌশানী থেকে গরুড় ২০ মাইল। পথে পড়ে ভনপাদিয়ার, লোবাং, ভোজগণ, ভেতা (৪২০৪) ও দর্শনী গ্রাম।

উৎরাই অথবা সমতল পথে বাস চলেছে ছুটে। চড়াই পথ আর পড়ছে না চোখে। আমরা চলেছি নেমে। যাচ্ছি বিখ্যাত বৈজনাথ উপত্যকায়। আজ গরুড়েই আমরা রাত্রিবাস করব। কাল সকালে বৈজনাথ দর্শন করে চলে যাব গোয়ালদাম—বাসপথের প্রান্তসীমা। সেখান থেকে শুরু হবে পদযাত্রা—দুর্গম গিরি-কান্তার পরিক্রমা।

॥ চার ॥

যতদূর দৃষ্টি চলে, সবুজ মাঠ আর সোনালী ক্ষেত। তারই মাঝে শুয়ে আছে কালো একটি পথ। পথের পাশে ক্ষেত। ক্ষেতের ধার দিয়ে ছুটে চলেছে সদাচঞ্চলা একটি সংকীর্ণা স্রোতস্বিনী—গোমতী। পথটি বাঁক ফিরেছে। একটু বাদে গোমতীর ওপরে একটি পুল। তারপরে ওপারে পৌঁছে খানিকটা সোজা এগিয়ে পথ গেছে হারিয়ে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, সেখানেও পথের পাশে পাশে সবুজ মাঠ কিংবা সোনালী ক্ষেত আছে।

দুর্গম হিমালয়ের অভ্যন্তরে এমন সীমাহীন সমতল বড় একটা দেখা যায় না। আমরা প্রত্যেকেই সাধ্যমত হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। আকাশচুম্বী তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা থেকে তরাই অঞ্চল পর্যন্ত হিমালয়ের বহু বিচিত্র রূপ দর্শন করেছি। অনেক উপত্যকা দেখেছি, কিন্তু গিরি-কান্তারের অন্তরে এমন অসীম সমতল খুব কমই দেখেছি। বাস্তবিকই বিচিত্র সুন্দর এবং বিস্ময়কর এই সুবিরাট উপত্যকা।

কিছুক্ষণ আগে আমরা গরুড় এসেছি। সুজল, দাশু ও প্রাণেশের সঙ্গে একটু পায়চারি করছি পথে। কথায় কথায় ওদের বলেছি, "এই উপত্যকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেকালের কাত্যুরী রাজারা। তাঁরা এখানে গড়ে তুলেছিলেন একটি সমৃদ্ধ জনপদ—বৈজনাথ। তখন এ উপত্যকার নাম ছিল বৈজনাথ বা কাত্যুরী উপত্যকা।

কাত্যুরী রাজবংশের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের কুমায়ুনের প্রাচীন ইতিহাসকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে হবে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ইতিহাস। আর্যরা তখন আর্যাবর্তে অনার্য বিতাড়নে ব্যস্ত। হিমালয়ের দিকে নজর দেবার অবসর নেই তাদের। এই সময় আর্যদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় লুব্ধ হয়ে মধ্য এশিয়ার কাশগড় (খসগিরি) ও খোতান থেকে আর্যদের প্রতিবেশী খস বা শকরা ভিন্নপথে কুমায়ুনে প্রবেশ করলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা আদি অধিবাসী কিরাতদের পরাজিত করে কুমায়ুনে কায়েম হয়ে বসলেন। কিন্তু কিরাতদের সঙ্গে তাঁদের শত্রুতা দীর্ঘস্থায়ী হল না। উভয় জাতির মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। তাঁরা মিলেমিশে বাস করতে থাকলেন।

বহু শতাব্দী পরে আর্যাবর্ত সম্পূর্ণরূপে আর্যদের করতলগত হল। আর্যদের নজর পড়ল হিমালয়ের দিকে। মহাভারতের যুগে তাঁরা পাঞ্চাল (রোহিলখণ্ড) থেকে কুমায়ুনে প্রবেশ করলেন। খসরা কিন্তু কোন বাধা দিলেন না। বরং সানন্দে তাঁদের বরণ করলেন। বিনাযুদ্ধে আর্যরা কুমায়ুন অধিকার করে নিলেন। কিন্তু তাঁরাও খসদের বিতাড়িত করলেন না। একসঙ্গে বসবাস করতে থাকলেন। উভয়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকল। কিছুকাল পরে আর দু'জাতির পৃথক সত্তা অবশিষ্ট রইল না। উভয়ে মিলেমিশে এক হয়ে গেলেন। সৃষ্ট হল এক নতুন জাতি। এই জাতির বর্তমান নাম কুমায়নী।

দুর্ধর্ষ কুমায়ুনীরা কিছুকাল পরে গাড়োয়ালের কিয়দংশ অধিকার করে নিলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন সুবিশাল স্বাধীন ব্রহ্মপুর রাজ্য। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৬৬০ মাইল বিস্তৃত ছিল ব্রহ্মপুর। কৈলাস মানস-সরোবর ও রাবণ হ্রদ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের রাজা মোং-চন-গামফো ব্রহ্মপুর আক্রমণ করে রাজ্যের উত্তরাংশ

অধিকার করে নেন। সেই থেকে দু'শ বছর ধরে তিব্বতীরা কুমায়ুনে রাজত্ব করেছেন। ৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মগধরাজ দেবপাল ও কনৌজরাজ প্রথম ভোজ কুমায়ুন আক্রমণ করে তিব্বতীদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁরা লিপুলেখ গিরিবর্ত্মের ওপারে নিজেদের অধিকার বিস্তার করলেন না। ফলে শিবালয় কৈলাস তিব্বতেই রয়ে গেল।

দেবপাল ও প্রথম ভোজের সম্মিলিত আক্রমণে কুমায়ুন তিব্বতী শাসনমুক্ত হলেও কুমায়ুন কনৌজের অধিকারে এল। তবে প্রথম ভোজ একজন কুমায়ুনী প্রতিনিধির হাতেই কুমায়ুনের শাসনভার অর্পণ করলেন। এই প্রতিনিধির নাম বসন্তন দেব। তাঁর স্ত্রীর নাম সজ্জনরা দেবী। বসন্তন দেব ৮৫০ খৃষ্টাব্দে উত্তরাখণ্ডের শাসক নিযুক্ত হন। তিনিই কাত্যুরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তখন কার্তিকেয়পুর (জোশীমঠ) রাজ্যের রাজধানী ছিল। তবে বৈজনাথ রাজ্যের পশ্চিমাংশের আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ছিল। সেখানকার শাসনকর্তাকে বলা হত উপরিক। কনৌজ রাজের প্রতিনিধি হলেও বসন্তন দেব স্বাধীন নরপতির মতই ছিলেন। তাই স্থানীয় জনসাধারণ তাঁকে রাজা বলেই অভিহিত করতেন। তবে তিনি এবং তাঁর পরবর্তী সাতজন রাজা কনৌজরাজকে মান্য করে চলেছেন।

বসন্তন দেব বিশ বছর রাজ্যশাসন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ৮৭০ খৃষ্টাব্দে পৌত্র খরপর দেব পিতামহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার সম্পর্কে ইতিহাস এখনও নীরব। খরপর সম্ভবতঃ সতেরো বছর কুমায়ুন শাসন করেছেন। ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে খরপরের পুত্র অধিধ্বজ দেব পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লৌদধা দেবী। তিনি আট বছর রাজ্যশাসন করেছেন। পুত্র ত্রিভুবনরাজ দেব মাত্র কয়েকমাস রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু তিনিই সম্ভবতঃ রাজধানী জোশীমঠ (কার্তিকেয়পুর) থেকে বৈজনাথে স্থানান্তরিত করেন। তবে তাঁর পরবর্তী কয়েকজন রাজা কার্তিকেয়পুরকেই প্রধান কর্মস্থল করে রাজত্ব চালান। স্থায়ীভাবে বৈজনাথে রাজধানী আসে সুভিক্ষরাজের রাজত্বকালে। কিন্তু সে কথা পরে হবে। যে কারণেই হোক ঐ একই বছরে (৮৯৫ খৃঃ) শাসনকার্য গ্রহণ করেন ত্রিভুবনরাজের পুত্র নিংবর্ত দেব। তিনি বিশ বছর রাজ্যশাসন করেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল নাশূ দেবী ও পুত্রের নাম বানাশূ। বানাশূ শাসনকার্য গ্রহণ করেন ৯১৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি পনেরো বছর রাজ্যশাসন করেছেন। বানাশূ দেবের পর রাজ্যের শাসক হন তাঁর পুত্র ইষ্টগণ দেব (৯৩০ খৃঃ)। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল বেগ দেবী। তিনিও পনেরো বছর রাজ্যশাসন করেছেন। পুত্র ললিতসুর দেব ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কুমায়ুনের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। শুরু হয় স্বাধীন কাত্যুরী রাজবংশের ইতিহাস। কুমায়ুনের স্বর্ণযুগের সূচনা হল।

পাণ্ডুকেশ্বরের যোগবদ্রী ও ধ্যানবদ্রী মন্দিরে প্রাপ্ত চারখানি তাম্রলিপি ও বাগেশ্বরে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি থেকেই কাত্যুরী রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস অর্থাৎ তৎকালীন গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। পাণ্ডুকেশ্বরের চারখানি তাম্রলিপির একখানি হারিয়ে গেছে। বাকী তিনখানি সযত্নে রক্ষিত আছে জোশীমঠে—বদ্রীনাথ মন্দির সমিতির কার্যালয়ে। বাগেশ্বরের শিলালিপিখানিও বর্তমানে নিখোঁজ। তবে এ্যাটকিন্‌সন্ যখন বাগেশ্বর আসেন তখন এই শিলালিপিটি ছিল। এ্যাটকিন্‌সন্ সেটির একখানি নকল করে নিয়েছিলেন। এখন নকলই আসলের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পরিব্রাজক এ্যাটকিন্‌সনের কথা। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক এ্যাটকিন্‌সন্। পাশ্চাত্ত্য আমাদের থেকে নিয়েছে অনেক, আবার দিয়েছেও দু হাত ভরে। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যের অবদানের কথা আমাদের চিরকাল

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। পর্বতারোহণও পাশ্চাত্যের অবদান। ইউরোপীয়রা হিমালয়কে নবরূপে প্রকাশ করেছে। পশ্চিমী পর্যটকরাই হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। এজন্য তাঁরা হাসিমুখে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছেন। সমাজ ও সংসার ফেলে দুঃসহ দুঃখ সহ্য করে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন। শুধু শৃঙ্গারোহণেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, দুর্গম হিমালয়ের জরিপ করে মানচিত্র প্রণয়ন করেছেন। হিমালয়ের মানুষদের সঙ্গে মিশে তাঁদের সমাজ ও জীবনকে জেনেছেন। প্রাচীন মন্দির ও নগরী থেকে হিমালয়ের ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। হিমালয়ের ভূগোল ও ভূতত্ত্বকে নিরূপণ করেছেন।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার বলে আজ আমরা হিমালয়কে জানতে পেরেছি, এ্যাটকিন্‌সনের স্থান তাঁদের প্রথম সারিতে। তিনি ১৮৮২ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত দু বছরের অধিককাল গাড়োয়াল ও কুমায়ুন সহ সমস্ত উত্তর প্রদেশ পর্যটন করেছেন। তিনি বহু মন্দির দর্শন করেছেন। অসংখ্য শিলালিপি, তাম্রলিপি ও প্রতিমূর্তি নিয়ে গবেষণা করে খসজাতির এবং কাত্যুরী ও চন্দ্রবংশের ইতিহাস রচনা করেছেন। গ্রাম্যগাঁথার মাধ্যমে সেকালের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর সেই আরব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'The Himalayan Districts of the North Western Provinces of India (1882 – 1884) নামক গ্রন্থে তিন খণ্ডে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থ আজও অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। হিমালয়পথিক ভারতবন্ধু এ্যাটকিন্‌সন্‌কে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এবারে এসো আবার ললিতসুরের কথায় ফিরে আসি। কল্পনা করি সেই রাজকীয় নাটকের। যে নাটক সেদিন অভিনীত হয়েছিল কনৌজরাজ প্রথম মহীপালের রাজসভায়।

একদিন অপরাহ্নে অমাত্যগণ পরিবৃত হয়ে মহারাজ মহীপাল রাজকার্যে ব্যস্ত রয়েছেন। এমন সময় দ্বার-রক্ষক এসে মহারাজকে কুর্নিশ করল। বিনীত কণ্ঠে বলল—কার্তিকেয়পুর থেকে একজন দূত এসেছে। সে মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

বহুকাল কার্তিকেয়পুরের কোন সংবাদ পান না মহীপাল। তিনি খুশি হলেন। আগন্তুককে নিয়ে আসতে বললেন। অনতিকাল পরে দূত এসে অভিবাদন করে মহীপালকে। তাঁর হাতে একখানা পত্র দিয়ে বলে—আমি কার্তিকেয়পুরের অধিপতি মহারাজাধিরাজ ললিতসুর দেবের রাজদূত।

—রাজদূত, মহারাজাধিরাজ ! চীৎকার করে ওঠেন মহীপাল। বল, সম্রাট মহীপালের দাসানুদাস সর্দার ললিতসুরের পত্রবাহক।

—না, মহারাজ আমি ঠিকই বলেছি। আর সেই কথাই লেখা আছে ঐ লিপিতে।

—মন্ত্রী ?

—সম্রাট !

পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে মহীপাল বলেন—পাঠ করুন।

পত্র পড়ে মন্ত্রী বলেন—কার্তিকেয়পুরের প্রাক্তন শাসক ইষ্টগণ ইহলোক ত্যাগ করেছে। তার পুত্র ললিতসুর পিতার আসনে বসেছে। সে আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত। নিজেকে স্বাধীন নরপতি রূপে ঘোষণা করে সে আপনার সখ্যতা কামনা করেছে।

—সখ্যতা ! সেনাপতি ? গর্জে উঠলেন মহীপাল।

—মহারাজ !

—অবিলম্বে সসৈন্য যাত্রা করুন। কার্তিকেয়পুর অবরোধ করে সেই অর্বাচীনকে অবাধ্যতার

উপযুক্ত শাস্তি দিন।

সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের আদেশের কোন উত্তর দেন না। তিনি আগন্তুকের দিকে তাকান।

উত্তেজিত মহীপাল নিজের ভুল বুঝতে পারেন। অপেক্ষাকৃত শান্ত কিন্তু গম্ভীর স্বরে ললিতসুরের পত্রবাহককে বলেন—তুমি এবারে আসতে পার !

—আমার পত্রের উত্তর ? দূত প্রশ্ন করে।

—পত্রলেখককে বলো, যুদ্ধক্ষেত্রেই সে তার পত্রের উত্তর পাবে।

"তার পরে ?" আমাকে থামতে দেখে সুজল বলে ওঠে।

আমি চুপ করে থাকি।

"থামলেন কেন ? বলুন না, তার পরে ?" দাশু বোধ করি বিরক্ত হয় আমার আচরণে।

"কিন্তু আমরা যে পায়চারি করতে করতে গরুড় বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বহুদূর এসে পড়েছি, তা বোধ হয় খেয়াল কর নি।"

"তাই তো। বাজারের আলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।" প্রাণেশ বিচলিত হয়।

"অসিতদা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছেন। একটু ঘুরে আসছি বলে এতদূর চলে আসা ঠিক হয় নি।" সুজল সবিশেষ ভীত।

"তা হলে চলুন ফেরা যাক। সেই সঙ্গে বলতে থাকুন তারপরে কি হল ?" দাশু ভুলবার নয়।

অতএব আমি আবার শুরু করি, "বৃদ্ধ মহীপাল ললিতসুরের সে পত্রের উত্তর দিতে পারেন নি। একে তো কনৌজ তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার ওপরে কুমায়নের মত দুর্গমস্থানে সৈন্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টকর। কাজেই বৃদ্ধ মহীপাল নীরবেই ললিতসুরের অবাধ্যতা মেনে নিয়েছিলেন। তবে তিনি আর বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না। মনে হয় কার্তিকেয়পুরের স্বাধীনতা ঘোষণা তাঁর মৃত্যুকালকে নিকটতর করেছিল।

মহীপালের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাল কনৌজের সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করতে পেরেছেন। দুর্বল রাজা সে তিন বছর নিজের রাজ্য রক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কাছে কার্তিকেয়পুর আক্রমণ করা কল্পনাতীত ছিল।"

"বিনা যুদ্ধেই ললিতসুর কাত্যুরী রাজ্যকে কনৌজের শাসনমুক্ত করলেন ?" দাশু প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, তিনি যেমন শক্তিশালী, তেমনি কুশলী নরপতি ছিলেন। তিনি পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন। পাণ্ডুকেশ্বরে প্রাপ্ত চারখানি তাম্রলিপির দুখানি ললিতসুরের আমলের। এই দুখানিই কাত্যুরী রাজবংশের প্রাচীনতম লিপি। এ থেকে কাত্যুরী রাজাদের বাহুবল, তাঁদের রাজ্যের আয়তন ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অনেক কথা জানা যায়।

প্রথম তাম্রলিপিখানি থেকে জানা যায় যে, ললিতসুরের হাতি, ঘোড়া ও উট বাহিনী ছিল। তাঁর রাজ্যে বনরক্ষক ও গরু-মহিষ অধিকারীগণ ছিল। বণিক শ্রেষ্ঠী ও প্রজাগণ জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে তাঁর রাজসভায় যোগদান করতেন। খস, কিরাত, গৌড়, হুন, কলিঙ্গ, মেদ, চণ্ডাল, দ্রাবিড় ও অন্ধ্রদেশীয় প্রজাগণ তাঁর রাজ্যে বাস করতেন। রাজসভায় মাঝে মাঝে নৃত্যগীত ও বাদ্যের আসর বসত।

ললিতসুর অতিশয় ধার্মিক ও দানশীল ছিলেন। তখন অলকানন্দার উত্তরতীরের দুটি 'বিষয়ের' (পরগণার) নাম ছিল তঙ্গনপুর ও অন্তরঙ্গ। এই দুটি বিষয়ের কিয়দংশ তিনি বদ্রীনাথের ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন।

দ্বিতীয় তাম্রলিপিটিতে দুটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়... বৃদ্ধাচল ও কাকাস্থল। এ্যাটকিন্‌সনের মতে কাকাস্থল ও কেদারখণ্ডে উল্লেখিত কাকাচল বর্তমান দেবপ্রয়াগের পূর্ব নাম। তার মানে দেবপ্রয়াগ থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত গাড়োয়ালের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সেকালে কাত্যুরী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই আয়তন আরও বিস্তৃত হয়েছিল। হিমাচলে শতদ্রুর তীরে নিরতের সূর্য-মন্দিরে পাদুকা পরিহিত একটি সূর্যমূর্তি আছে। এ ধরনের মূর্তি কেবল কাত্যুরী আমলেই নির্মিত হয়েছে। কাজেই মনে হয় বর্তমান হিমাচলের কিয়দাংশও কোন সময়ে কাত্যুরী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ললিতসুরের তাম্রলিপিতে একটি বৃষমূর্তি অঙ্কিত আছে। কুষাণরাজ বাসুদেবের মুদ্রায় এই ধরনের বৃষমূর্তি পাওয়া গেছে।"

"বাগেশ্বরের শিলালিপিটি কার আমলের ?" সুজল প্রশ্ন করে।

আমরা গরুড় বাজারে পৌঁছে গেছি। আমাদের বাস দেখা যাচ্ছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওঁরা নিশ্চয়ই আমাদের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ওঁরা মালপত্র পাহারা দিচ্ছেন আর আমরা ঘুরতে বেরিয়েছি। কাজটা ঠিক হয় নি। তবু সুজলের প্রশ্নের উত্তর দিই, "সময়ের বিচারে ললিতসুরের তাম্রলিপির পরেই সেই শিলালিপি। এটি তাঁর পুত্র ভূদেব কর্তৃক নির্মিত। ভূদেব ৯৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি বিশ বছর রাজত্ব করেছেন। ভূদেবের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি সিংহাসন আরোহণের চতুর্থ বর্ষে অনেক দান করেছেন।

পাণ্ডুকেশ্বরের তৃতীয় তাম্রলিপিটি কাত্যুরী বংশের ত্রয়োদশ রাজা পদ্মট দেবের। তিনি ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল ঈশাল দেবী। পদ্মট পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন। এই তাম্রলিপি থেকে জানা যায় মহারাজ পদ্মট দেব অনেক গ্রামদান করেছিলেন। যথারীতি এর মধ্যেও বংশতালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকা থেকে আমরা ভূদেবের পরবর্তী কাত্যুরী রাজা-রাণীদের নাম জানতে পারি।"

"যেমন ?" দাশু প্রশ্ন করে।

"ভূদেবের পরে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন তাঁর পুত্র সলোনাদিত্য দেব। তিনিও বিশ বছর রাজত্ব করেছেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল সিংহবলী দেবী। তাঁর পুত্র ইচ্ছট দেব সিংহাসনে বসেন ১০০০ খৃষ্টাব্দে। তিনি পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন। তাঁর রাণীর নাম সিন্ধুবলী। ১০১৫ খৃষ্টাব্দে পুত্র দেশট দেব রাজা হন। তাঁরা মহিষীর নাম পদমল্ল দেবী।"

"তিনিও তাহলে পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন ?" দাশু হঠাৎ বলে ওঠে।

"হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তাঁর পুত্র পদ্মট দেব এবং পৌত্র সুভিক্ষরাজ দেবও পনেরো বছর রাজত্ব করেছেন।"

"কারণ কি ? আপনি চোদ্দ জন রাজার কথা বললেন, তাঁদের আটজনই ঠিক পনেরো বছর করে রাজত্ব করেছেন এবং কেউ বিশ বছরের বেশি রাজত্ব করেন নি। পনেরো থেকে বিশ বছর রাজত্ব করার পরে তাঁর প্রত্যেকে ইহলোক ত্যাগ করেছেন কথাটা অবিশ্বাস্য। কাজেই মনে হয় তাঁরা রাজত্বকালের একটা সময়সীমা ঠিক করে নিয়েছিলেন। সময় পূর্ণ হবার পরে স্বেচ্ছায় রাজকার্য থেকে অবসর নিয়েছেন।"

"তুমি ঠিকই বলেছ দাশু", আমি তাকে সমর্থন করি, "স্বেচ্ছায় তাঁরা রাজ্যভার পুত্রদের হাতে দিয়ে ধর্মে মন দিয়েছেন, হয়তো বা বাণপ্রস্থে গমন করেছেন। এ থেকে আমরা সেকালের শাসনব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র পাই। রাজকার্যের সঙ্গে কর্মদক্ষতার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আর এই সম্পর্কটিকে কাত্যুরী রাজারা যেমন অস্বীকার করেন নি, আমাদেরও তেমনি

স্বীকার করে নেওয়া উচিত।"

"কিন্তু এটাই কি উচিত হচ্ছে, আমাদের এখানে বসিয়ে রেখে নিজেরা টহল মারতে বেরিয়েছ!" অসিতের ক্রুদ্ধ প্রশ্ন কানে আসে। আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে এসে গেছি। বাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মোহিত। দেবকীদা ও অমিতাভকে তো দেখছি না। না, বাসের ভেতরেও নেই। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারার আগেই অসিত সুজলের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, "ঘুরে বেড়ালেই চলবে, না কাজকর্ম কিছু করতে হবে?"

সুবোধ বালকটির মত সুজল উত্তর দেয়, "কাজ করতে হবে বৈকি, কাজকর্ম না করলে চলবে কেমন করে? বল না, কি করতে হবে?"

"কি করতে হবে? পাহাড়ে আর কখনও আসিস না, কিছুই জানিস না। সব কাজ রইল পড়ে আর জিজ্ঞেস করছিস, কি করতে হবে?"

"কোন্‌টা আগে করব?" সুজল প্রশ্নের ধরন পালটায়।

আশানুরূপ ফল ফলে। অসিতের কণ্ঠস্বর শান্ত হয়। বলে, "আগে খাবারের এক নম্বর কিট্‌টা আর বিছানা দুটো গাড়ির ছাদ থেকে নামা।"

দাশু আর প্রাণেশ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ছাদে ওঠে। সুজল ও মোহিত এগিয়ে যায় বাসের ধারে নিচ থেকে মালপত্র ধরার জন্য।

অসিত বলে, "একজন দোকানদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, সে তার দাওয়া ও দোকানঘরের খানিকটা ছেড়ে দিয়েছে আমাদের। দাওয়াতে উনোন আছে, সেখানেই রান্না হবে। দোকানী জ্বালানী ও জল রেখে দিয়েছে।"

কথাটি সুজলের কানে যায়। সে চেঁচিয়ে ওঠে, "হুর্‌রে! এই না হলে ম্যানেজার? আমরা কিনা ওদিকে ভেবে ভেবে সারা, কোথায় থাকব, কি খাবো? আর তুমি এদিকে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছো। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, বাসে বাসে আর রাতটা কাটাতে হবে না।"

"আলবাত হবে। তোকে বাসেই থাকতে হবে।"

সুজল শব্দহীন। মোহিত মৃদু হেসে ওপর থেকে দাশুর ঝুলিয়ে দেওয়া কিট্‌টা হাতে ধরে। সুজল নিঃশব্দে প্রাণেশের হাত থেকে বিছানাটা হাতে নেয়। দ্বিতীয় বিছানাটা নামিয়ে দিয়ে দাশু আর প্রাণেশ ছাদ থেকে নেমে আসে। ধরাধরি করে কিট্ ও বিছানা নিয়ে আসি দোকানে। মোহিত দাঁড়িয়ে থাকে বাসের কাছে। মালপত্র পাহারা দেয়।

দোকানঘরটা বেশ ভাল। দেখে লোভ হয় সুজলের। সে আস্তে আস্তে বলে, "এখানে তো আমরা সবাই থাকতে পারি অসিতদা।"

"না, পারি না। এটুকু জায়গাতে সবার হবে কেমন করে? তাছাড়া বাসের মালপত্র পাহারা দিতে হবে না?"

"কণ্ডাকটার বাসে থাকবে না?"

"থাকবে।"

"তা হলে আর আমাদের বাসে থাকার কি দরকার?"

"তা তো বটেই। কণ্ডাকটারের আর কাজ নেই। সে রাত জেগে আমাদের মালপত্র পাহারা দেবে!"

"কে কে তাহলে বাসে থাকবে?"

"প্রাণেশ, দাশু আর তুই।"

"ভালই হবে। বেশ হৈ-হৈ করে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে, কি বলিস দাশু?" নিরুপায় সুজল মন্দের ভালতে আনন্দিত হয়ে উঠতে চায়।

কিন্তু পারে না। অসিত দুম্ করে বলে বসে, "তোদের সঙ্গে আমিও থাকব।"

"তুমি থাকবে?" সুজল আঁতকে ওঠে।

"হ্যাঁ, নইলে তোদের যা ঘুম। সব নিয়ে চলে গেলেও টের পাবি না। চাই কি তোকেও নিয়ে যেতে পারে। তা হলে যে আমাদের একজন মেম্বার কমে যাবে।"

সুজল আর কিছু বলে না। দাশু ও প্রাণেশ কিট্ খুলেছে। আমিও কি বলব বুঝতে পারি না। তবু জিজ্ঞেস করি, "দেবকীদা আর অমিতাভ কোথায়?"

"ওঁরা গেছেন স্বামীজীর কাছে।"

"স্বামীজী?" বুঝতে পারি না।

"স্বামী প্রণবানন্দ।" অসিত উত্তর দেয়।

"তিনি এখানে....."

"হ্যাঁ, দোকানী খবর দিল, আজই গোয়ালদাম থেকে এখানে এসেছেন। কি জরুরী কাজে তাঁকে হঠাৎ আলমোরা চলে যেতে হচ্ছে।"

হিমালয়-প্রেমিক প্রণবানন্দ এই পদযাত্রায় আমাদের প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর স্থায়ী নিবাস আলমোরা। তবে এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি সাধারণত হিমালয়ের পথে পথেই থাকেন। আমরা আলমোরাতে শুনে এসেছি, তিনি আমাদের জন্য গোয়ালদামে অপেক্ষা করবেন। কাজেই এখানে তিনি অপ্রত্যাশিত। আমরা ভাগ্যবান, একদিন আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ইতিমধ্যে দাশু ও প্রাণেশ প্রয়োজনীয় মালপত্র নামিয়ে ফেলেছে। কণ্ডাকটার চা খেতে গিয়েছিল, সে বাসে ফিরে এসেছে বলে মোহিতও চলে এসেছে এখানে। দাশু উনোন ধরাতে লেগে গেল। সুজল ও প্রাণেশ পয়সা নিয়ে বাজারে চলে যায়। দাশুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমি আর অসিত ফিরে আসি বাসে।

দাশু তথা দাশরথি সরকার ধৈর্যশীল কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। ছোটখাটো মানুষটি। দাশু হিমালয়ে অনেক ঘুরেছে। ১৯৬৪ সালের ট্রেল্স্ গিরিবর্ত্ম অভিযানেও দাশু ম্যানেজারের কঠিন দায়িত্ব পালন করেছিল।

মোহিতের পুরো নাম মোহিতলাল দত্ত। তার চেহারাটি দাশুর ঠিক বিপরীত—বলিষ্ঠ দেহ। শুধু স্বাস্থ্যবান নয়, সুপুরুষ। অতিশয় ধীর ও স্থির, শান্ত ও কর্মঠ। নীরব কর্মী। সেও হিমালয়ে অনেক ঘুরেছে।

সুজল বা সুজলকুমার মুখোপাধ্যায় একজন পর্বতারোহী। সে দার্জিলিং থেকে বেসিক ও এ্যাডভান্স ট্রেনিং নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী। সুন্দর চেহারা এবং চটপটে। যথেষ্ট কর্মঠ কিন্তু সুযোগ পেলেই ঘুরে বেড়ায়, আর তাতেই অসিত ওর ওপর রেগে যায়। তবে তাঁকে এক নিমেষে ঠাণ্ডা করার কায়দাটাও সুজলের বেশ ভাল জানা আছে। কাজেই

কোন বিপত্তি ঘটে না।

প্রাণেশ চক্রবর্তী আমাদের দলের কনিষ্ঠতম সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী। সে দার্জিলিং থেকে বেসিক ও এ্যাডভান্স ট্রেনিং নিয়েছে।

কিন্তু যতই ট্রেনিং নিক, অসিত বসুর কাছে ছাড়াছাড়ি নেই। সবাইকে পুরো কাজটা করতে হবে। সে আমার সমবয়সী। কিন্তু চেহারা, বিশেষ করে মাথার টাকটি দেখলে, তা বোঝার উপায় নেই। ঘোর সংসারী—তিন পুত্রের জনক। কিন্তু এ বয়সেও তার উৎসাহে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি। সেও দার্জিলিং থেকে মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

কথাটা বলতেই রাজী হয়ে যায় অসিত। আমরা বাস থেকে নেমে আসি। পাশের চায়ের দোকানে ঢুকি। দুজনে দু গ্লাস চা নিয়ে দাশুদের জন্য চা পাঠিয়ে দিই। চা খেতে খেতে অসিত আগামীকালের কর্মসূচী আলোচনা করে—কাল খুব সকালে আমরা পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়ব বৈজনাথ দর্শন করতে। দশটার মধ্যে দর্শন শেষ করে যেতে হবে বৈজনাথ বাজারে। ড্রাইভারের সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে, সে আমাদের তুলে নেবে সেখান থেকে। এগারোটার সময় আমরা পৌঁছে যাব গোয়ালদাম।

সেকালে নাম ছিল বৈজনাথ উপত্যকা, তারপরে নাম হয় কাত্যুরী উপত্যকা, এখন গরুড় উপত্যকা। সেকালে গরুড় ছিল বৈজনাথ মহানগরীর উপকণ্ঠ। এখন গরুড় সারা উপত্যকার কেন্দ্রভূমি। বৈজনাথ এখন কেবল ঐতিহাসিকদের গবেষণাক্ষেত্র।

মানসখণ্ডে হর-পার্বতীর বিবাহবাসরকে বলা হয়েছে বৈজনাথ। দ্রোণ কৌশিক সত্যব্রত গর্গ মার্কণ্ডেয় এবং সুতপব্রহ্মা নাকি তপস্যা করেছিলেন এখানে।

গরুড় আলমোরা জেলার একটি বিখ্যাত বাস স্ট্যাণ্ড। এখান থেকে বাস যায় আলমোরা রাণীক্ষেত কাঠগুদাম, গোয়ালদাম বাগেশ্বর, কাপকোট ও নন্দপ্রয়াগ। চারিপাশের উপত্যকাসমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই উপত্যকা। এখান থেকে সোমেশ্বর সাড়ে বারো মাইল, বাগেশ্বর বারো মাইল ও নন্দপ্রয়াগের নিকটবর্তী জোলাবাগার সাড়ে বারো মাইল। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, উচ্চতা মোটে ৩৫৪৫ ফুট। ২৯°.৫৪.২৪" উত্তর ও ৭১°.৩৭ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

এখান থেকে দ্বারাহাটও খুবই কাছে। উপত্যকার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দুনাগিরি (২৩,১৮৪ ফুট উঁচু দুনাগিরি পর্বত নয়) বা মহাভারতের দ্রোণগিরি নামক ছোট পাহাড়টির পরপারেই দ্বারাহাট।

উপত্যকার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে গোমতী ও তার কয়েকটি শাখানদীর মিলিত ধারা। এই ধারা গোমতী নাম নিয়েই আরও ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বাগেশ্বরে পৌঁছে মিলিত হয়েছে সরযূর সঙ্গে। উপত্যকাকে করে তুলেছে সুজলা ও সুফলা। জনপদ উঠবার প্রভূত উপকরণ রয়েছে এখানে। রাজধানী নির্বাচনের আর্দশ স্থান বৈজনাথ উপত্যকা।

তাই ত্রিভুবনরাজ (৮৯৫ খৃঃ) কার্তিকেয়পুর থেকে রাজধানী নিয়ে আসেন এখানে। সেই থেকে কাত্যুরী রাজত্বের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ নবম শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বৈজনাথ কাত্যুরী রাজত্বের রাজধানী ছিল। যদিও স্থায়ীভাবে এখানে রাজধানী আসে একাদশ শতাব্দীতে—সুভিক্ষরাজের আমলে।

সুভিক্ষরাজের পরে বৈজনাথের সিংহাসনে বসেন ইন্দ্রপাল দেব। তাঁর সিংহাসন আরোহণের সাল জানা যায় নি। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে পুত্র লক্ষ্মণপাল দেব রাজা হন। তিনি বৈজনাথের বিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি নির্মাণ করান। এই মন্দিরের

মূল বিগ্রহটিই গণনাথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর আমলের একখানি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে বৈজনাথকে বলা হয়েছে বৈজনাথ-কার্তিকেয়পুর। তিনি বহুকাল রাজত্ব করেছেন।

লক্ষ্মণপাল দেবের পরে ১১৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা হন উদয়পাল দেব। তাঁর পরে বৈজনাথের সিংহাসনে বসেন বসন্তপাল দেব ও বলীনকুলপাল দেব। তাঁদের সিংহাসন আরোহণের সাল জানা যায় নি।

১২০৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়পাল দেব বৈজনাথের রাজা হন। তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করান।

পরবর্তী কাত্যুরী রাজাদের ইতিহাস আজও খুব সুস্পষ্ট নয়। তবে তাঁরা সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত বৈজনাথে রাজত্ব করেছেন এবং প্রত্যেকেই মন্দির ও অট্টালিকা নির্মাণ করে বৈজনাথকে মহানগরীতে পরিণত করেন। এই বংশের শেষ রাজা সুখল দেব। তিনি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে বৈজনাথের সিংহাসনে বসেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে কাত্যুরী রাজবংশে গৃহবিবাদ শুরু হয়। ফলে কাত্যুরী রাজারা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন। আর চন্দ্রবংশীয় (আলমোরা) রাজারা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চাঁদরাজারা বার বার বৈজনাথ আক্রমণ করেছেন। কিন্তু তাতে মহানগরীর কোন ক্ষতি হয় নি। এটি কেবল বৈজনাথ বা কুমায়ুনে সত্য নয়, ইতিহাসের চরম সত্য যে, মুসলমান ছাড়া অন্য কোন আক্রমণকারী কখনই সভ্যতা সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে নি। শিবাজী কোন মসজিদ অপবিত্র করেন নি, রণজিৎ সিং কোন পুরনারীকে হরণ করেন নি, ইংরেজরা তাজমহল ভেঙ্গে ফেলেন নি।

কুমায়ুনেও তাই হয়েছে। চাঁদরাজাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও বৈজনাথ নিস্তার পায় নি রোহিলাদের কাছে। ১৭৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে রোহিলারা দ্বারাহাট আক্রমণ করে। দ্বারাহাট ধ্বংস করে তারা আসে বৈজনাথ। মন্দিরময় মহানগরী মহাশ্মশানে পরিণত হয়।

"সাবরা কোথা থেকে আসছেন ?" আকস্মিক প্রশ্নে চমকে উঠি। আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। দেখি আমাদের পাশেই বসে আছে একজন স্থানীয় যুবক। চা খাচ্ছে। সে-ই প্রশ্ন করেছে আমাদের।

"কলকাতা থেকে।"

"কোথায় যাচ্ছেন ?" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে।

"রূপকুণ্ডে।"

সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ছোঁয়ায় ছেলেটি—রূপকুণ্ডের উদ্দেশে প্রণাম জানায়। তারপরে পাশে বসে থাকা মেয়েটিকে বলে, "দেখলি, গতবার তুই আমাকে যাত্রায় যেতে দিলি না, আর এই সাবরা কতদূর থেকে এসেছেন এখানে। যাচ্ছেন রূপকুণ্ডে।"

মেয়েটি চুপচাপ চা খেয়ে চলে। বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করি, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?"

"আমরা গাঁয়ে ফিরছি।"

"কোথায় তোমাদের গ্রাম ?"

"কাছেই। তেলীহাট। সেখানে মন্দির আছে, রাজবাড়ি আছে। কাল সকালে আসবেন দেখতে। সবাই আসে।"

"আচ্ছা আসব।"

"আমি সব দেখিয়ে দেব।"

"খুব ভাল হবে।" আমি খুশি হই। "কিন্তু তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?"

একটি ঢোক গেলে ছেলেটি। মেয়েটির মুখের দিকে তাকায় সে। মেয়েটি মুচকি হাসে। মুখখানি ঘুরিয়ে নিয়ে চায়ে চুমুক দেয়। ছেলেটি লজ্জিত কণ্ঠে বলে, "ডাক্তারখানায়!"

এতে এত লজ্জা পাবার কি আছে? আমি ওর আচরণে অবাক হই। বলি, "কার অসুখ?"

ছেলেটি ইশারায় মেয়েটিকে দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটির দিকে তাকাই। না, ওকে দেখে তো মোটেই অসুস্থা মনে হচ্ছে না। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণী। জিজ্ঞেস করি, "কি অসুখ?"

ঢোক গেলে সে। তারপরে কোনমতে বলে, "অসুখ মানে.... ঠিক অসুস্থ নয়। আমরা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়েছিলাম।"

এবারে আমার লজ্জা পাবার পালা। কাজেই কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারি না। অসিতও চুপ করে আছে। কিন্তু আমাদের অবস্থাটি বিবেচনা করেই বোধ হয় ছেলেটি বলে, "না গিয়ে কি করব বলুন। সাড়ে তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে আমাদের। এরই মধ্যে দুটি ছেলে-মেয়ে। ছেলের বয়স দু বছর, মেয়ের ছ মাস। আমরা চার ভাই। বাবার যা জমি ছিল তার এক চতুর্থাংশ আমার ভাগে পড়েছে। যা ফসল হয়, তাতে এখনই সংসার চলতে চায় না। আরও ছেলেপুলে হলে কি বিপদ বলুন তো। আর ওরাই বা বড় হলে সংসার চালাবে কেমন করে! তাই গিয়েছিলাম পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে।"

"ভালই করেছিলে।" অসিত মন্তব্য করে।

ওরা উঠে দাঁড়ায়। ছেলেটি নমস্কার করে আমাদের। মেয়েটিও হাত জোড় করে বলে, "কাল সকালে আসবেন আমাদের গাঁয়ে। আমরা খুব খুশি হব।"

"আসব বৈকি, নিশ্চয়ই আসব। খোঁজ করব তোমাদের। তোমার নাম?"

"রতনলাল সিং।" বলে মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটি এগিয়ে চলে গাঁয়ের পথে।

আমরা তাকিয়ে থাকি ওদের দিকে। ধন্যবাদ দিই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। নিরক্ষর জনসাধারণকে দেশের জটিলতম সমস্যা সম্পর্কে কেমন সুন্দর সজাগ করে তুলেছেন। তবে আর কয়েক বছর আগের থেকে এই প্রচেষ্টাটা চালালে হয়ত বিশ্ব আজ আর ভারতকে দুর্ভিক্ষের দেশ বলতে পারত না। কিন্তু যা করা হয় নি, তার জন্য আপসোস করে কি লাভ? তার চেয়ে এখন কতটা কার্যকরী করা যায় সেদিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত হবে। 'বেটার লেন দ্যান নেভার।'

আমরাও বেরিয়ে আসি দোকান থেকে। ইতিমধ্যে দিনের আলো গেছে ফুরিয়ে। আঁধার নেমে এসেছে গরুড়ের পথে ও প্রান্তে। তাহলেও আঁধার ঘনাতে পারে নি এখানে। দোকানে দোকানে হ্যারিকেন ও ডে-লাইটের আলো। তারা আঁধারকে তাড়িয়ে দিয়েছে দূরে—বাজারের বাইরে ঐ জনবসতির ধারে।

দোকানে দোকানে কেনা-বেচা চলেছে। চলেছে পান ও ভোজন। কাজেই শহরের অতি পরিচিত রূপটিকে আমরা পেয়েছি এখানে। কিন্তু রাতের এমন আলোঝলমল রূপদর্শন আজই শেষ। কাল থেকে বেশ কিছুদিন আমাদের আর এমন রাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। কিন্তু সেজন্য কোন ব্যথাবোধ করছি না। নাগরিক জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া তো আমাদের হিমালয় যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই পরিবেশ থেকে সাময়িক মুক্তি নিয়ে

দৈনন্দিন জীবনের জটিলতার উর্ধ্বে উঠে আমরা সুন্দরকে দর্শন করতে চাই—আমরা শান্তি চাই। তাই তো মানুষের সমাজ থেকে বহুদূরে হিমালয়ের দুর্গম গিরি-কান্তারে আমাদের এই পদযাত্রা।

বাসে উঁকি দিয়ে দেখি কণ্ডাকটার বিড়ি খাচ্ছে। সে আশ্বাস দেয় আমাদের, "মালপত্র সব ঠিক থাকবে। আপনারা অনায়াসে ঘুরে আসতে পারেন।"

আমরা দোকানে আসি। না, ছেলেগুলো খুবই কাজের বলতে হবে। রান্না প্রায় শেষ করে এনেছে। অসিত বলেই ফেলে কথাটা, "সে কি রে, এরই মধ্যে তোদের রান্না হয়ে গেল ?"

"এরই মধ্যে কি বলছেন, কটা বাজে খেয়াল আছে ?"

"কটা ?" হাতঘড়ি দেখে অসিত। তারপরেই বলে ওঠে, "সে কি, নটা বাজে ? দেবকীদারা যে এখনও এলেন না।"

তাই তো, আমাদেরও খেয়াল হয়। অচেনা জায়গা। না, চিন্তায় পড়া গেল দেখছি। "একটু এগিয়ে দেখলে কেমন হয় ?"

"তাই দেখতে হবে।" অসিত সমর্থন করে আমাকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুজল দাশু প্রাণেশ ও মোহিত জিজ্ঞেস করে অসিতকে, "যেতে হবে নাকি ?"

অসিত মাথা নেড়ে নিষেধ করে। বলে, "না। তোরা এখানেই থাক। আমি আর মহারাজ ওদের দেখছি।"

দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই হাত-পা নেড়ে নিজের ভাষায় যথাসাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করেন আমাদের। আমরা তাঁর নির্দেশনামা ঠিকমত অনুধাবন করতে পারি না। শুধু বুঝতে পারি, বড় রাস্তা দিয়ে প্রায় মাইল খানেক চলার পরে ডানদিকে একটি পাকা বাড়িতে স্বামীজী আছেন। কোন অসুবিধে হবে না, জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে দেবে।

একটি টর্চ নিয়ে আমরা অজানা যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি। উচ্চতা যাইহোক, চারিদিকে পর্বতশ্রেণী। কাজেই একটু শীত-শীত করছে। আমরা জোরে জোরে পথ চলতে শুরু করি। পথ প্রায় জনমানবশূন্য। এমন পথে অনেক দিন চলাফেরা করি না। কাজেই একটা উত্তেজনার আমেজে মনটা ভরে উঠতে চাইছে। ভালই লাগছে। অসিত গুনগুন করে গান গাইছে—রবীন্দ্রসঙ্গীত। মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে শেয়াল ডেকে উঠছে। তখন অসিতের গান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কোথা থেকে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এসে আমাদের গায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে। একটা রোমাঞ্চকর আস্বাদে বিহ্বল হয়ে উঠি।

কিন্তু আমাদের এই আঁধারে অভিযান বুঝি বেশিক্ষণ চালানো গেল না। দূরে পথের বাঁকে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। এক, দুই, তিন—হ্যাঁ, তিনজন মানুষ এদিকে আসছে। ওরাই হবে। স্বামীজী নিশ্চয়ই কাউকে আলো দিয়ে ওদের পৌঁছে দিতে বলেছেন। তবু আমরা এগিয়ে চলি। আমরা নিকটতর হচ্ছি। ক্রমেই কাছে—আরও কাছে।

না, এ তো দেবকীদা ও অমিতাভ নয়। এরা কারা ? একজনের হাতে আলো, আর একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সে লোকটি টলতে টলতে চলছে। ওরা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এবার বুঝতে পারি ব্যাপারটা। ঘরের কথা ভুলে দেশী আড্ডায় বেহুঁশ হয়েছিল। আপনজনেরা তাই তাকে ঘরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ের মানুষ মদকে হিমালয়ের মতই ভালোবাসে। হিমালয়ের এমন অনেক উপত্যকা আছে যেখানকার

অধিবাসীরা জলের বদলে মদ খায়। এর জন্য যেমন দায়ী প্রাকৃতিক অবস্থা, তেমনি দায়ী এদের সামাজিক ব্যবস্থা। প্রথমটিকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয়টির সংস্কার প্রয়োজন। কয়েকটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান অবশ্য এজন্য বহুদিন থেকেই আন্দোলন শুরু করেছেন। কতটা সফল হয়েছেন বলতে পারব না।

ওরা কাছে থাকতে ওদের অভাব বুঝি নি, কিন্তু চলে যাবার পরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। হোক্ গে মাতাল, মানুষ তো। জনহীন পথে মানুষ পেলে কার না আনন্দ হয়? সেজন আপনজন না হলেও কিছু যায় আসে না।

সাড়ে নটা বাজে। এখনও ওদের সঙ্গে দেখা হল না। তা হলে কি ওরা অন্য পথে ফিরে গেছে? কিন্তু দোকানী যে বলেছে আর কোন পথ নেই। তবে এখনও দেখা হচ্ছে না কেন? হয় নি, হবে। আচ্ছা, আমরা কি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি?

পথের ধারে কয়েকখানি বাড়ি-ঘর। হ্যাঁ, একখানি বাড়ির সঙ্গে দোকানীর বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। ভুল হয় নি। বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। কয়েকজন লোক বসে আছেন। দেবকীদা ও অমিতাভকেও দেখতে পাচ্ছি। স্বামীজী? ঐ তো ওপাশে বসে রয়েছেন। শ্মশ্রুগুম্ফধারী সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী সাধক, হিমালয়-প্রেমিক প্রণবানন্দ।

আমরা বারান্দায় উঠে এলাম। প্রণাম করলাম প্রণবানন্দকে—ভারত আত্মার মহান প্রতীককে। তিনি আমাদের বসতে বললেন। আমরা তাঁর কাছে বসলাম।

সন্ন্যাসী বলতে আমরা যাঁদের বুঝি প্রণবানন্দ ঠিক তাঁদের মতো নন। তিনি শিক্ষা শেষ করে সরকারী চাকুরি নিয়েছিলেন। তারপরে দেশের ডাকে চাকরি ছাড়েন। কিছুদিন পরে হিমালয়ের ডাকে রাজনীতি ছাড়েন। স্বামীজী সেই থেকে হিমালয় পরিক্রমা করে চলেছেন। হিমালয়ের মধ্যেই তিনি তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন। সে হিমালয় শুধু ধ্যানের নয়, জ্ঞানের। সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী বিগত চল্লিশ বছর ধরে হিমালয়ের দুর্গমতম অঞ্চলসমূহ পরিক্রমা করে গিরিরাজের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে চলেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থরাজি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

আমাদের পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম আমরা। এ তো কেবল পরিচয় নয়, মহামানব দর্শন। সত্তর বছর বয়স। কাজেই বৃদ্ধ। কিন্তু এখনও তিনি যা পরিশ্রম করে থাকেন, তা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকালে আপনা থেকে মাথা নত হয়ে আসে, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির মধ্যে মধুর মনের প্রকাশ দেখতে পেলাম। কোমল কণ্ঠস্বরে স্নেহের পরশ অনুভব করলাম।

স্বামীজী বললেন—কাল সকালে তিনি বাস স্ট্যাণ্ডে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তারপরে আমাদের নিয়ে যাবেন বৈজনাথ। তাঁকে বিশেষ কাজে আলমোরা চলে যেতে হচ্ছে বলে তিনি দুঃখ করলেন। নইলে তিনি আমাদের সঙ্গে রূপকুণ্ডে যেতেন। স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন বীরেন সরকারের কথা। জিজ্ঞেস করলেন তার বইয়ের কথা।

বললাম—বইখানা চলছে। বীরেন ভালই আছে। বিয়ে করেছে।

"তাই নাকি?" হাসতে হাসতে স্বামীজী বলেন, "এবার তা হলে পাহাড়ের নেশাটা একটু কেটেছে।"

"না, বিয়ের পরে দার্জিলিং থেকে মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। আজকাল তো একস্‌পিডিশানে যাচ্ছে।"

"ভাল। ভারী খুশী হচ্ছি তোমাদের হিমালয়প্রীতি দেখে।"

আমরাও খুশী হলাম আমাদের প্রতি স্বামীজীর প্রগাঢ় ভালবাসা দেখে। ধন্যবাদ দিই বীরেনকে—আজকের পর্বতারোহী বীরেনকে নয়, ১৯৬০ সালের অনভিজ্ঞ হিমালয়-পাগল তরুণকে। প্রণবানন্দের প্রবন্ধ পাঠ করে সাব্যস্ত করেছিল রূপকুণ্ডে যাবে। যেতে হবে বলে একদিন বন্ধু রথীনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল পথে। না ছিল অর্থ, না ছিল প্রস্তুতি, না ছিল অভিজ্ঞতা। ছিল কেবল গভীর আত্মবিশ্বাস আর অদম্য কৌতূহল। তবু তারা গিয়েছিল রহস্যময় রূপকুণ্ডে। শুধু যায় নি, পরে সেই দুর্গম পথের অনবদ্য কাহিনী সে শুনিয়েছে বাংলাদেশের অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে। তার সেই 'রহস্যময় রূপকুণ্ড' বাঙ্গালীকে রূপকুণ্ডের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। অসংখ্য বাঙ্গালীকে নিয়ে গেছে এই মরণ-হ্রদের তীরে,আমাদের নিয়ে চলেছে ঐ অপরূপ রহস্যালোকে।

॥ ছয় ॥

অসিতের বন্দোবস্ত শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। কাল রাত একটায় আমাদের ডিনার শেষ হয়েছিল। সে সিনিয়রদের জন্য ঠিক করেছিল, দোকানঘর, আর জুনিয়রদের জন্য মোটরবাস। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল সিনিয়ররা দোকানের চেয়ে বাসকে বেশি পছন্দ করছে। তাই নেতাকে নতুন ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আর সেই ব্যবস্থাপনার সময়ে সুজল নিজের ব্যবস্থাটি পাকা করে নিয়েছিল। প্রাণেশ ও দাশুকে নিয়ে চলে গিয়েছিল দোকানে। আজ সকালে স্বামীজী আসার পরে আমি গিয়ে ওদের ঘুম ভাঙ্গিয়েছি। ওদের দেখে নিজেদের জন্য দুঃখ করেছি। কারণ আমরা বাসে একদম ঘুমোতে পারি না। বলতে গেলে সারারাত জেগে কাটিয়েছি। আর ওরা কিনা নাক ডাকিয়ে রাত কাবার করেছে। অথচ সুজল স্বীকার করল না সে কথা। বিস্মিত ভাবে বলল, "ঘুমিয়েছি, কি বলছেন ! একদম ঘুমোতে পারি নি, যা ছারপোকা।"

মালপত্র বেঁধে বাসে চাপিয়ে দিলাম। তারপরে চা খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে—বৈজনাথের পথে। সকাল আটটা বাজে। আমাদের হাতে মোটে ঘণ্টা দুয়েক সময়। স্বামীজী অবশ্য বললেন—এরই মধ্যে মোটামুটি সব দেখিয়ে দিতে পারবেন।

বৈজনাথ বহুবিস্তৃত উপত্যকা। হিমালয় এখান থেকে বহুদূরে। তবু হিমালয়কে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। উত্তরে তুষারাচ্ছাদিত ধবল হিমালয় আর দক্ষিণে বৃক্ষাচ্ছাদিত শ্যামল হিমালয়। উত্তরে ত্রিশূল ও নন্দাঘুণ্টি—আমরা যাচ্ছি ওখানে। আর দক্ষিণে কৌশানী—আমরা এসেছি ওখান থেকে। সাদা আর সবুজ দুয়ের মাঝে সোনালী সমতল—বৈজনাথ।

বৈজনাথের অপর নাম বৈদ্যনাথ। এ অঞ্চল আলমোরা জেলার দানপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত। পুরাকালে নাকি দানবরা বাস করতেন এখানে। তাই এ পরগণার নাম দানপুর। কয়েকজন দানবের নামে এখনও কয়েকটি গ্রাম আছে ও পরগণায়।

আগেই বলেছি বর্তমানে বৈজনাথ উপত্যকার কেন্দ্রভূমি গরুড়। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে স্কুল পর্যন্ত সবই গরুড়ে। কিন্তু ডাকবাংলোটি বৈজনাথে। কর্তৃপক্ষ ডাকবাংলো নির্মাণের সময় অবস্থাটিকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন। বৈজনাথ বাংলোর অবস্থান বড়ই সুন্দর। তবে মৎস্যাশী মানুষদের সে ডাকবাংলোয় বাস করার কিছু অসুবিধে আছে। কারণ বৈজনাথে মাছ-ধরা

নিষেধ। যদিও ওপরে কিংবা নিচে গিয়ে মাছ ধরায় বাধা নেই কোন। মাছ না পেলেও প্রাণভরে লাউ খেতে পারবেন পর্যটকরা। বৈজনাথে খুব লাউ হয়।

এখন কেবল গোমতী তীরের, সেখানে মূল মন্দির ও মিউজিয়াম, কিয়দাংশকেই সরকারী ভাবে বৈজনাথ বলা হয়ে থাকে। আর সমস্ত উপত্যকাটিকেই বলা হয় গরুড়। গরুড় বাজার থেকে বর্তমান বৈজনাথ প্রায় দু মাইল। বৈজনাথেও একটি ছোট বাজার আছে। সেখানে বাস থামে।

সেকালে গোমতীর দু তীরেই শহর ছিল। এখন এক তীরে গরুড় আর এক তীরে সোনালী ক্ষেত। মাঝে মাঝে ভগ্ন মন্দির ও গ্রাম। এরই একটি গ্রামের নাম তেলীহাট। সম্ভবতঃ এই তেলীহাট গ্রামেই কাত্যুরী রাজাদের প্রাসাদ ছিল। রাজাদের চৌপড় খেলার মাঠ আর রাণীদের মন্দিরও সেখানে ছিল। খেলার মাঠকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অবশিষ্ট আছে। আমরা সেই ভগ্নমন্দির দর্শন করতেই পথে বেরিয়েছি।

দূরে একটি ছোট পাহাড় দেখে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করি, "ওটা কি?"

"রণচুলকোট দুর্গ।" স্বামীজী বলেন, "সেকালে ওখানেই কাত্যুরী রাজাদের সেনানিবাস ছিল। ঐ দুর্গের ভেতরে একটি কালীমন্দির আছে। স্থানীয়দের কাছে সেটি পরম পবিত্র পীঠস্থান। তারা নিয়মিত পুজো দেয় ঐ মন্দিরে। অনেকের ধারণা ঐ দুর্গের অভ্যন্তরে মাটির নিচে কাত্যুরী রাজাদের বহু কীর্তি আছে লুকিয়ে। খনন করলে নীরব ইতিহাসের অনেক মূল্যবান অধ্যায় আবিষ্কৃত হতে পারে।"

একবার ভাবি জিজ্ঞেস করি—কেন খনন করা হয় নি। তারপরেই মনে হয়—কি হবে জিজ্ঞেস করে? হয় ঐতিহাসিকদের, না হয় কর্তৃপক্ষের অবহেলা। আসল কারণ আমাদের দেশে এখনও এ্যাটকিন্‌সন জন্মগ্রহণ করেন নি। এখনও আমরা অন্যান্য স্বাধীন দেশের মতো স্বদেশের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতে শিখি নি। তাই কাত্যুরী রাজত্বের ইতিহাস এখনও নীরব। কুমায়ুন আজও কথা কইতে পারছে না।

গরুড় বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। লোকালয় শেষ হয়ে গেল। পথটি বাঁয়ে বাঁক নিল। গোমতী দেখা গেল। ছোট একটি টিলার গা ঘেঁষে ঘুরে গেছে আমাদের পথ। গরুড় গঙ্গার ছোট পুল পেরিয়ে টিট টপ্পর গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি বৈজনাথের দিকে। গোমতী ক্রমেই কাছে আসছে। সেও বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে মন্দির ও মিউজিয়াম। আমরা পুল পেরিয়ে রাস্তা থেকে নেমে এলাম নিচে। গোমতীর তীর দিয়ে চললাম এগিয়ে। বাঁকের মুখে গোমতী প্রশস্তভরা। তবু সে শীর্ণকায়া। কিন্তু খরস্রোতা নয়। গোমতী পাহাড়ী নদী, কিন্তু গোমতী শান্ত। পাহাড়ী নদী সাধারণতঃ এমন শান্ত হয় না। গোমতী শান্ত। কারণ গিরি-কান্তারের অন্তরে অবস্থিত হলেও বৈজনাথ সমতল।

অনেকে বলেন বকবেশী ধর্মরাজ এখানেই যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেছিলেন। তখন কিন্তু এখানে কোন উপত্যকা ছিল না। ছিল সুবিশাল সরোবর। সরোবর শুকিয়ে সমতল হয়েছে কী?

আমরা মন্দির দর্শনে বেরিয়েছি। কাজেই সমতল নয়, মন্দিরের কথায় ফিরে আসা যাক। বৈজনাথের ভগ্ন মন্দিরসমূহ আদিবদ্রী ও জোশীমঠের মন্দিরসমূহের সমসাময়িক। অর্থাৎ এখানকার অধিকাংশ মন্দিরই গুপ্তযুগের শেষভাগে (ত্রয়োদশ শতাব্দী) নির্মিত। তবে তার আগের যুগেরও কয়েকটি মন্দির এখানে আছে। সেগুলো সম্ভবতঃ প্রতিহার যুগে (নবম শতাব্দী) নির্মিত। যে যুগেই নির্মিত হোক, ১৩০২ খৃষ্টাব্দে এখানকার মূল-মন্দিরটি অক্ষত

ছিল। কারণ ঐ বছর গঙ্গোলীর রাজা হামিরদেব মূল-মন্দিরশীর্ষে একটি সুবর্ণ কলস প্রতিষ্ঠা করেন।

অনেকে অনুমান করেন তিব্বতী শাসনকালে স্বাভাবিক ভাবেই বৈজনাথ উপত্যকা বৌদ্ধ-প্রভাবিত হয়েছিল। কাত্যুরী আমলে এখানকার জনসাধারণ সে প্রভাবমুক্ত হন। কারণ কাত্যুরী রাজারা শঙ্করাচার্যের ভক্ত ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনেন। তাই এখানকার মন্দিরস্থাপত্যে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব সুস্পষ্ট।

চারিদিক দেখতে দেখতে দল বেঁধে এগিয়ে চলেছি আমরা। স্বামীজী বলছেন বৈজনাথের কথা—এখানকার সব মন্দিরই ভগ্ন। তবু তারা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। ভগ্নপ্রায় মন্দিরসমূহের মধ্যে বৈজনাথ মন্দির, কেদারনাথ মন্দির ও বামনী দেবল বিশেষ বিখ্যাত। অনেকে বলেন, বৈজনাথ মন্দির কোন কাত্যুরী রাণী এবং বামনী দেবল জনৈক বিধবা ব্রাহ্মণী নির্মাণ করেছেন। বামনী দেবল শিবমন্দির। তবে আরও কয়েকটি দর্শনীয় মন্দির ও মূর্তি আছে এখানে। স্থাপত্যশিল্পের বিচারে বৈজনাথ মন্দিরের বাইরে পড়ে থাকা পূর্ণাকৃতি পার্বতীর মূর্তিটি সর্বশ্রেষ্ঠ।

তেলীহাটেও সমসাময়িক যুগের কয়েকটি দর্শনীয় মন্দির ও মূর্তি আছে—লক্ষ্মীনারায়ণ ও সত্যনারায়ণের মন্দির এবং রাক্ষস দেবল। সত্যনারায়ণের মূর্তিটি বড়ই সুন্দর। রণচুলকোট তেলীহাট থেকে প্রায় দেড় মাইল। সেখান থেকে আধমাইল দূরে নাগনাথ মন্দির।

দাশরথির প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বললেন,—কাত্যুরী উপত্যকা আলমোরা জেলার দ্বিতীয় রমণীয় উপত্যকা। এই উপত্যকা হিমালয়-পথিকদের কাশ্মীরের লোলাব উপত্যকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাগেশ্বরের মত এখানেও খুব ভাল ধান হয়।

ছোট বড় গুটি বারো মন্দির। সবই পাথরের। সবই ভগ্ন। তবে ছটি মন্দিরের অবস্থা একটু ভাল। গড়ন উড়িয়্যার রেখ-দেউলের মত। মূল-মন্দিরের উপরিভাগ আক্রমণকারীরা ধ্বংস করে ফেলেছিল। এখন টিনের চাল করে দেওয়া হয়েছে। সেই বিখ্যাত পূর্ণাবয়বা মূর্তিটি মূল-মন্দিরের বাইরে পড়ে আছে—বৃষ্টিতে ভিজছে, রোদে শুকোচ্ছে। কেন একে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়নি, জানি না। তবে বৈজনাথ মন্দিরের দরজা যদি পার্বতীর কাছে রুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে পার্বতীকে তো অন্তত মিউজিয়ামেও একটুও জায়গা দেওয়া যেতে পারে।

মন্দির মোটেই সুসংরক্ষিত নয়। এখানে ওখানে কাটা গাছ ও ঝোপঝাড় জন্মেছে। আমরা তারই পাশ দিয়ে এসে মন্দিরে প্রবেশ করি। কাত্যুরী আমলে শৈব মতাবলম্বী লকুলীশ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মূল-মন্দিরের পৌরহিত্য করতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নেপালীরা কুমায়ুন অধিকার করে হরিদ্বার থেকে শঙ্কর গিরিকে ডেকে এনে এখানকার প্রধান পুরোহিত-পদে অধিষ্ঠিত করেন। বর্তমান প্রধান পুরোহিত শ্যাম গিরি এখানকার পঞ্চম মহান্ত।

আমরা মন্দিরে এসে ঘণ্টা বাজাই, বিগ্রহকে প্রণাম করি, ছবি নিই। মহান্তজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের প্রসাদ দেন। তারপরে ছোট মন্দিরসমূহ দর্শন করে চলে আসি মিউজিয়ামে।

২৯টি মূর্তি ও কয়েকটি শিলা সংরক্ষিত আছে। ছোট বড় নানা ধরনের পাথরের মূর্তি। অধিকাংশই পাদুকা পরিহিত সূর্যমূর্তি। এটি কাত্যুরী যুগের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। তবে সূর্যমূর্তি ছাড়াও অন্যান্য বহু দেব-দেবীর মূর্তি রয়েছে। তাঁদের মধ্যে গণেশ, কুবের, কার্তিক, কাকভূষণ্ডী, মহিষমর্দিনী, ভগবতী, হর-গৌরী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চামুণ্ডা, গরুড়, ইন্দ্রাণী ও হরিহর

মূর্তিসমূহ বিশেষ উলেখযোগ্য। এর কিছু মূর্তি প্রণবানন্দের ব্যক্তিগত সংগ্রহ। তিনি সেগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেন আমাদের। তারপরে আমরা চলি তেলীহাটের দিকে।

তেলীহাটের মন্দিরের গড়নও একই রকম। তবে বড় মন্দির দুটি আকৃতিতে বৃহত্তর। মূর্তিগুলি খুবই সুন্দর। কিন্তু বড়ই অনাদৃত। ভাঙ্গা মন্দির আরও ভেঙ্গে যাচ্ছে। মূর্তিগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। এভাবে চলতে থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা কাত্যুরী যুগকে হারিয়ে ফেলতে পারব। যদিও এটি কেবল বৈজনাথের বৈশিষ্ট্য নয়। এমন দৃশ্য দেখা যাবে ভারতের যে কোন প্রাচীন নগরে। এখানকার বহু গৃহের দেওয়ালে, এমন কি ১৯২৪ সালে নির্মিত গোমতীর পুলে, দেখলাম সেকালের কারুকার্যময় পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। গৃহস্বামী ও কর্তৃপক্ষদের জানা নেই যে ঐ পাথরখানি কেবল পাথর নয়, সে বিস্মৃত ইতিহাসের একটি অধ্যায়, সে অতীত স্থাপত্যের সাক্ষী, সে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক।

সাক্ষাৎ হল রতনলাল ও তার স্ত্রীর সঙ্গে। তারা আমাদের নিয়ে যেতে চাইল বাড়িতে। সময় নেই বলে অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলাম। বড় ভাল লাগল তাদের। ভালোবাসা ঐশ্বর্যের অপেক্ষা রাখে না। ভদ্রতা শিক্ষার মুখাপেক্ষী নয়।

ঠিক দশটার সময় আমরা বৈজনাথ বাজারে এলাম। একে বাজার বলতে অনেকেরই আপত্তি হবে। গুটিকয়েক ছোট ছোট দোকানের সমষ্টি। দেখে দুঃখ হয়। কালের করাল গ্রাসে সেদিনকার মহানগরী আজ গণ্ডগ্রামে রূপান্তরিত। অথচ বৈজনাথের প্রকৃতি আজও তেমনি উদার। আজও সে দুহাতে ঐশ্বর্য বিতরণ করছে এই উপত্যকাকে। কেবল মানুষ ভুলে গেছে বৈজনাথকে। আর তাই সে আজ অবহেলিত। তাই তার এমন দুরবস্থা। তাই সে এত দরিদ্র। তবে এই বিস্মৃতি যুগের ধর্ম, যে-যুগ যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা ভাবার আর অবসর নেই। আমাদের বাস এসে গেছে গরুড় থেকে। বাস আসতেই আমাদের নজর পড়ে প্রাণেশের দিকে। আমাদের দলের কনিষ্ঠতম সদস্য। আমরা এগিয়ে এসে একে একে ওর সঙ্গে আলিঙ্গন করি। একসঙ্গে এসেছিলাম কুমায়ুন পরিক্রমায়, কিন্তু আজ ওর কাছ থেকে আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে। মেজরের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণেশ রূপকুণ্ড যেতে পারছে না। সে আজ এখানেই থাকবে। কাল মেজর আসবেন রানীক্ষেত থেকে। প্রাণেশ তাঁকে নিয়ে মুনসিয়ারী যাবে। ফিরে এসে ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে কাপকোটে। আমরা রূপকুণ্ড থেকে ফিরে কাপকোটে যাব। দেখা হবে ওদের সঙ্গে। সবাই একসঙ্গে পিণ্ডারী হিমবাহ দর্শন করব।*

প্রাণেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করি। তিনি অভয় দেন—কোন চিন্তা করো না। বহাল তবিয়তে ঘুরে আসবে রূপকুণ্ড থেকে। নন্দাদেবী তোমাদের সহায় থাকবেন। কোন অসুবিধে হবে না। আমি আজ সকালের বাসে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি শাদীলালকে। বীর সিং ও রামচাঁদ এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছে। তারা বাস স্ট্যাণ্ডে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাত্রার সব ব্যবস্থা করে নেবে।

নতমস্তকে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করে সকৃতজ্ঞ অন্তরে একে একে উঠে আসি বাসে। প্রাণেশ সজল চোখে হাত নাড়ে। স্বামীজীও হাত উঁচু করে আবার আশীর্বাদ করেন। তাঁর আশীর্বাদই

---

* লেখকের 'গহন-গিরি-কন্দরে' দ্রষ্টব্য।

আমাদের দুর্গম যাত্রাপথের প্রধান পাথেয়।

ড্রাইভার বাস ছাড়ে। বাস এগিয়ে চলে। পেছনে পড়ে থাকে বিগতকালের এক মহানগরী আর একালের এক মহামানব। উভয়েই হিমালয় পথিকদের পরম বিস্ময়।

কাল কৌশানীর পরে আর চড়াই চোখে পড়ে নি, আজ আবার উৎরাই চোখে পড়ছে না। চড়াই আর চড়াই, ক্রমাগত চড়াই। আমরা উপরে উঠছি। প্রথম দিকে মাইলখানেক পথ অবশ্য মোটামুটি সমতল ছিল। আমরা উপত্যকার মধ্য দিয়ে দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে পৌঁছেছি। আবার এসেছি নদীর ধারে। একটি পথ চলে গেছে পুল পেরিয়ে ওপারে। আর একটি নদীর এপার দিয়ে। একটি আমাদের বর্তমান পথ আর একটি ভবিষ্যতের। একটি গোয়ালদাম আর একটি বাগেশ্বরের। আমরা রূপকুণ্ড থেকে ফিরে বাগেশ্বর যাব। বাগেশ্বর থেকে কাপকোট। দেখা হবে প্রাণেশের সঙ্গে।

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা এখন থাক। এখন বর্তমানের কথায় আসা যাক। সেই মোড় পেরোবার পর থেকেই শুরু হয়েছে চড়াই। আমরা চড়াই ভেঙ্গে ওপরে উঠছি। বলমলি ও ভগবতী কোট গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম থান ডাঙ্গোলী (৪০৩৮´) গ্রামে। গ্রামটি সুন্দর। একটি ডাকবাংলো আছে। শুরু হল খাড়া চড়াই। একে একে পেরিয়ে এলাম পাজেনা, গোয়ার, উচক্ষেত, পারেনা, বনজপানি, মঙ্গলতা, জাবরী, পারকোটি, কিমোলী, পাথরখানি ও জৌলচৌড়া গ্রাম। পৌঁছলাম ৬৩৪৪ ফুট উঁচু বিনায়ক গিরিবর্ত্মে। দেখতে পেলাম গোয়ালদাম—দুর্গম গিরি-কান্তারের প্রবেশ তোরণ।

॥ সাত ॥

ঘণ্টাখানেক পরে। একটি ছোট পাহাড়কে প্রায় প্রদক্ষিণ করে বাস এসে থামল। এই গোয়ালদাম।

গোয়ালদাম উপত্যকা নয়, পাহাড়ের পাদদেশ নয়, উপরিভাগ। চারদিকে পথ, মাঝখানে পর্বতশীর্ষ। ধবল নয়, শ্যামল হিমালয়। পথের পাশে অজস্র বনফুল আর ফার্ন। পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি দোকান, কিছু বাড়ি আর বাস স্ট্যাণ্ড। বাসপথ থেকে মোটরপথ উঠে গেছে শীর্ষে। সেখানে নির্মাণবিভাগের চমৎকার ডাকবাংলো—দূর থেকে দেখেছি। এবারে কাছে যাব। আমরা সেখানেই উঠব। এখানে বনবিভাগের বিশ্রামভবনও রয়েছে।

গোয়ালদাম কাঠগুদাম থেকে ১৪০ মাইল, আলমোরা থেকে ৫৮ মাইল। গোয়ালদাম কেবল রূপকুণ্ড যাত্রীদের বাসপথের প্রান্তসীমা নয়, একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস। বহু স্বাস্থ্যান্বেষী ও হিমালয়-প্রেমিক এখানে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যান—মধুচন্দ্রিমা যাপনের আদর্শ স্থান গোয়ালদাম।

গোয়ালদাম এসেছি রূপকুণ্ডে যাব বলে। রূপকুণ্ড কুমায়ুনে। কাজেই কুমায়ুনের কাহিনীতে রূপকুণ্ডের কথা বলছি। কিন্তু গোয়ালদাম কুমায়ুনে নয়, গাড়োয়ালে। গোয়ালদাম থেকেই গাড়োয়াল শুরু। ভ্রমণে, বিশেষ করে হিমালয় ভ্রমণে, শাসনতান্ত্রিক বিভাগের চাইতে ভৌগোলিক বিভাগটার মূল্য অনেক বেশি। এই ভৌগোলিক বিভাগ যেমন অধিবাসীদের

চরিত্র গঠন করে, তেমনি তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। গোয়ালদামের সঙ্গে তাই কুমায়ুন ও কুমায়ুনীদের সম্পর্ক অতি নিকট। গোয়ালদাম গাড়োয়ালে হলেও কুমায়ুন দিয়েই তার যাতায়াতের প্রধান পথ। সেই পথেই আমরা এসেছি এখানে। তবে নন্দপ্রয়াগ থেকে ঘাট ও থরালী হয়ে একটি পথ এসেছে এখানে। খুব কঠিন পথ নয়, দিন দুয়েক সময় লাগে। গোয়ালদামের আর একটি পথ হিমালয় অভিযাত্রীদের জন্য। রূপকুণ্ডের পথে ওয়ান পর্যন্ত নিয়ে বামণী ও কুয়ারি গিরিবর্ত্ম (১২,১৪০) হয়ে জোশীমঠ। অপূর্ব সুন্দর এই পথ। বিরহী গঙ্গার উৎস রমণীয় গোণাতাল দর্শন করে যাওয়া যায় জোশীমঠ। কুয়ারি গিরিবর্ত্মের ওপর থেকে নন্দাঘুন্টির দৃশ্য অবর্ণনীয়।

গোয়ালদাম বাসপথের প্রান্তসীমা। কাজেই বাস স্ট্যাণ্ডটি বেশ জমজমাট। এখানেই বাজার, এখানেই হোটেল, এখানেই শহর। বাস স্ট্যাণ্ডই গোয়ালদামের হৃদ্‌পিণ্ড।

আমরা বাস থেকে নামতেই একজন যুবক এসে আমাদের সেলাম জানায়। আমরা প্রতি-নমস্কার করি। লোকটি জিজ্ঞেস করে, "আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন ?"

"হ্যাঁ।" অসিত এগিয়ে যায় তার দিকে।

"আপনারা রূপকুণ্ডে যাবেন ?"

"হ্যাঁ। তুমি ?"

"বীর সিং।" সে উত্তর দেয়।

আমরা ওর দিকে তাকাই। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। আমাদেরই মতো লম্বা। ফর্সা—সুন্দর চেহারা। ধীর স্থির ও বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। পরনে দেশী পোশাক—সরু পায়জামা ও গলাবন্ধ কোট। পায়ে হান্টার সু। মাথায় পাহাড়ী টুপি। গাড়োয়াল হিমালয়ের বহু দুর্গম পথ তার নখদর্পণে। গঙ্গোত্রী ও চতুরঙ্গী হিমবাহ এবং কালিন্দী খাল (১৯,৫১০) হয়ে গোমুখী থেকে বদ্রীনাথ পথের সে একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক। তবে রূপকুণ্ডের পথও তার একেবারে অপরিচিত নয়। সে ইতিপূর্বে বারকয়েক গেছে এ-পথে। কিন্তু পথপ্রদর্শক হিসেবে আমরা তাকে সঙ্গে নিচ্ছি না। সে আমাদের সঙ্গে যাবে সাহায্যকারী হিসেবে। এ যাত্রায় পথপ্রদর্শক হিসেবে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে রামচাঁদ। রামচাঁদ এ পথের অভিজ্ঞতম পথপ্রদর্শক। প্রণবানন্দের বিশেষ পরিচিত। কিন্তু তারও যে কথা ছিল বাস স্ট্যাণ্ডে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। তাকে তো দেখছি না। কথাটা জিজ্ঞেস করি বীর সিংকে। সে বলে, "রামচাঁদ এখানে নেই। তবে আজ সকালে স্বামীজীর চিঠি পাবার পর শাদীলালজী লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন তার কাছে। সে এসে যাবে, আর যদি না আসতে পারে, আমি নিয়ে যাব আপনাদের।"

রামচাঁদকে আমরা জিনিসপত্র কিনে রাখতে বলেছিলাম, তারই কুলি ঠিক করার কথা ছিল। কুলি সংগ্রহ হিমালয় পথের সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। চিন্তিত না হয়ে পারি না। তবে সে চিন্তায় সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই কি ভাবে সমাধান হতে পারে তাই ভাবা যাক। বীর সিংকে বলি, "কুলির কি ব্যবস্থা করবে ?"

"কুলি নয়, ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলে রেখেছি। আপনারা এসে গেছেন। এবারে তাকে খবর দিতে হবে।"

"হ্যাঁ, কাল সকালেই যাতে রওনা হওয়া যায়, সেইভাবে বন্দোবস্ত কর।"

"তাই হবে। আপনারা এবারে ডাকবাংলোর দিকে এগোন। মালপত্র দেখিয়ে দিন আমাকে। আমি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।"

মোহিত সব বুঝিয়ে দেয় ওকে। আমরা চড়াইপথ ধরে ওপরে উঠতে থাকি। পাহাড়

কেটে মোটরপথ নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওপরে। নিজেদের গাড়িতে এলে একেবারে ডাকবাংলো পর্যন্ত পৌঁছনো যায়।

চড়াইশেষে সমতলভূমি। শিখরটি সমতল করে ফেলা হয়েছে। এখন সেখানে সবুজ আঙ্গিনা, রঙ্গীন কানন আর মনোরম বিশ্রামনিকেতন। চারখানি বড় বড় ঘর আর দুটি বাথরুম। সামনে ও পেছনে প্রশস্ত বারান্দা। একটু দূরে রান্নাঘর ও চৌকিদারের বাসগৃহ। ডাকবাংলোর পেছনে দেওদার বন ও বন-বিভাগের রজন গুদাম। রজন গোয়ালদামের প্রধান রপ্তানি।

বেশ বড় ডাকবাংলো। চমৎকার পরিবেশ আর অপূর্বসুন্দর অবস্থান। চারিদিক খোলা। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি, ত্রিভুবনরক্ষী ত্রিশূল আর আনন্দময়ী নন্দদেবীকে। বাঁয়ে নন্দাঘুণ্টি, ডাইনে নন্দাদেবী। দুয়ের মাঝে ত্রিশূল। ত্রিশূল থেকে শুরু হয়েছে ভারতীয় পর্বতাভিযান। বাংলার পর্বতাভিযান আরম্ভ হয়েছে নন্দাঘুটি থেকে। আর নন্দাদেবী গাড়োয়াল কুমায়ুনের পরমারাধ্যা। নন্দাদেবী ভারতের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ।

চোখ ফেরাতে পারি না। বার বার ওদের দেখি। রাণীক্ষেত থেকে ওদের দেখেছি। দেখেছি বিনসর ও কৌশানী থেকে। কিন্তু এ দেখার সঙ্গে সে দেখার তুলনা হয় না। এ তো শুধু দেখা নয়, পরমপ্রিয়কে পাওয়া। মনে হচ্ছে আমরা ওদের পেয়ে গেছি নাগালের মধ্যে। বিশেষ করে ত্রিশূল। আমরা যেন বসে আছি তার পায়ের কাছে। অথচ জানি সে এখনও দূরে, বহুদূরে। ওর পদপ্রান্তে পৌঁছে প্রণতি জানাবার জন্যই তো আমাদের এই পদযাত্রা, সে যাত্রা আরম্ভ হয় নি এখনও।

মোহিত আমার কাছ থেকে দূরবীনটা নিয়ে কি যেন দেখছে। বোধ হয় দেখতে চাইছে সেই রহস্যময় হ্রদকে—আমাদের গন্তব্যস্থলকে । দেখুক্ গে। আমি কেবল তাকিয়ে থাকি ত্রিশূলের দিকে। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের আয়ুধ ত্রিশূল—তিনটি শিখরের পর্বতমালা। কে যেন একখানি জ্বলন্ত রুপোর পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে তাকে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে সে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি ছুটে যাই কাছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরি ওকে। যুগযুগান্ত ধরে এমনি করেই সে আকর্ষণ করেছে মর্ত্যের মানুষকে। আত্মবিস্মৃত মানুষ ছুটে গেছে কাছে। কেউ ফিরে এসেছে, কেউ আসে নি। যারা আসতে পারে নি, তাদেরই কয়েকজনের মরদেহ রূপকুণ্ডকে মরণহ্রদে করেছে রূপান্তরিত। কিন্তু মরণজয়ী মানুষ তাতে হার মানে নি। তারা আজও হিমালয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলেছে। তাই আমার এসেছি এখানে, চলেছি ঐ রূপময় রূপকুণ্ডের তীরে।

গোয়ালদাম আর তার এই ডাকবাংলোর গল্প শুনেছি অনেক। আজ বুঝতে পারছি, তাদের সে সব কথা গল্প হলেও সত্যি। সত্যই সুন্দর এই ডাকবাংলো আর তার পরিবেশ।

চুপ করে কেবল চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। চকচকে রোদ। উচ্চতা সাড়ে ছ হাজার ফুট হলেও আমাদের মোটেই শীত করছে না। মোহিত এতক্ষণ নীরব ছিল। এবারে কথা বলল, "নোংরা জামাকাপড়গুলো কেচে নিলে কেমন হয়?"

ভালই হয়। সবারই পছন্দ হয় প্রস্তাবটা। সাব্যস্ত হয় জলযোগ সেরে কাচাকাচি শুরু করতে হবে। দাশু রুক্‌স্যাক থেকে খাবার বের করে ফেলে। সুজল সাহায্য করে তাকে। অমিতাভ ও অসিত ক্যামেরা বের করে ত্রিশূলের ছবি তোলে। ইতিমধ্যে মালপত্র এসে যায়। বীর সিং আসে কুলিদের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করে, "আপনারা কি রান্না করবেন, না দোকানে গিয়ে খেয়ে আসবেন?"

"দোকানে খাবার পাওয়া যায় নাকি?" অসিত বলে।

"জী সাব। কিন্তু এখন তো স্পেশাল কিছু পাবেন না।"

"অর্ডিনারী কি পাওয়া যাবে?"

"আজ খিচুড়ী আর ভাজি করেছে।"

"গরম হবে?"

"জরুর সাব। এখানে খাবার সব সময় গরম হয়।"

"তা হলে মন্দ কি, কি বলেন?" অসিত আমাদের দিকে তাকায়।

"হ্যাঁ, অর্ডার দিয়ে দাও।" দেবকীদা অনুমতি দেন।

অসিত বীর সিংকে বলে, "তুমি একটা খবর পাঠাও। আমরা আজ দোকানেই খাব।"

বীর সিং একজন কুলিকে নির্দেশ দেয়। সে সংবাদ দিতে চলে যায় নিচে। বীর সিং বলে, "মালপত্রগুলো খুলে একটু রোদে দিয়ে নিলে ভাল হয়। এমন রোদ আর পাবেন না পথে। তা ছাড়া তাঁবু ও স্লিপিং ব্যাগগুলো একবার দেখেশুনে নেওয়া দরকার।"

ঠিকই বলেছে বীর সিং। আমরা মালপত্র সব খুলে ফেলি একে একে। মোহিত নোংরা জামাকাপড় সব আলাদা করে নেয়। তারপরে সুজলকে বলে, "চল আমরা গিয়ে শুরু করি।"

"চল।" বলে সুজল এগিয়ে যায় মোহিতের সঙ্গে।

অসিত সুজলকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে, "তাড়াতাড়ি করিস। তোদের পরে আমরা যাব। সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে।"

"কেন?"

"তোর সবতাতেই কেন? খেয়ে নিয়ে কাজে বসতে হবে না?" অসিত বলে।

"কি কাজ? মালপত্র তো রোদে দিয়েই দিচ্ছ।"

"রোদে দিলেই হল, ঘোড়া অথবা কুলির উপযোগী করে রি-প্যাকিং করতে হবে না?" অসিতের কণ্ঠে বিরক্তি।

"খেয়ে উঠেই প্যাকিং?" সুজল নারাজ।

"না করলে চলবে কেমন করে? কাল সকালে রওনা হতে চাই। সময় কোথায়?"

"তার মানে, তুমি আজ আর আমাদের বিশ্রাম করতে দেবে না, এই তো!"

"কেবল আজ নয় রে, আগামী একুশ দিনে দেব না। হিমালয়ে এসে বিশ্রাম? ওরে হিমালয়ের পথ যে আরামের নয়, তা কি আজও বলতে হবে তোকে?"

আর কথা না বাড়িয়ে সুজল চলে যায় মোহিতের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ শেষ হয় আমাদের। বীর সিং চলে যায় নিচে। বলে, "ঘোড়াওয়ালাকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় আবার আসব।"

আমরা তেলের শিশি নিয়ে রোদে বসি। ভাল করে স্নান করে নিতে হবে। হিমালয়পথের প্রধান নিয়ম শরীরটাকে সচল রাখা। বাঙ্গালী মাত্রই তেল-জলে মানুষ। কাজেই সুযোগ পেলেই স্নান করে নাও।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে ডাকবাংলোয় ফিরতে দুটো বেজে গেল। সুজল মোহিত আর দাশুকে নিয়ে অসিত বসল মালপত্র রি-প্যাকিং করতে।

অমিতাভ ও দেবকীদার সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়ি পথে। ডাকবাংলো থেকে নেমে আসি নিচে। বাস স্ট্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলি তিনজনে। আমি মনে মনে ভেবে চলি দেবকীদার কথা। পুরো নাম দেবকীনন্দন দে। বয়সে আমাদের থেকে অনেক বড়। তবে

চেহারা দেখে দেবকীদার বয়স বোঝা কষ্টকর। কালো ছিপছিপে মানুষটি উৎসাহী ও কর্মঠ। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে। ফলে সংসারী হবার সুযোগ পান নি। দেবকীদার জীবনে দুটি মাত্র বিলাসিতা—ধূমপান ও হিমালয় ভ্রমণ।

অমিতাভ তথা অমিতাভ দাশগুপ্ত বয়সে আমাদের সমবয়সী হলেও তার হিমালয়পথের অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে বেশি। সে খুব অল্প বয়সেই হিমালয়ের প্রেমে পড়েছে। কৈলাসসহ হিমালয়ের প্রায় তাবৎ তীর্থ পরিক্রমা পূর্ণ করেছে যৌবনের প্রারম্ভে। তার বাড়ির নাম 'অলকানন্দা', ছেলের নাম 'মানস'। হোমিওপ্যাথি ও ফটোগ্রাফিতে সমান পারদর্শী। দুটোই শিখেছে হিমালয়ের প্রয়োজনে।

উৎরাই পথটুকু পেরিয়ে আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম। পথের একপাশে ডাকবাংলো আর একপাশে একটু উঁচুতে কয়েকটি দোকান। সব চেয়ে পুরোনো ও সব চেয়ে বড় দোকানটি শাদীলালজীর। গোয়ালদামের অতিশয় সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি শাদীলালজী। অথচ মানুষটি যেমনি বিনয়ী, তেমনি ভদ্র। অমোদের দেখতে পেয়েই নমস্কার করেন। প্রতি-নমস্কার করে বলি, 'লালাজী, আমাদের যে কিছু চাল ডাল আটা আলু আর এক টিন কেরোসিন তেল চাই।"

সহাস্যে বলেন, "পেয়ে যাবেন। সন্ধ্যার আগেই পাঠিয়ে দেব ডাকবাংলোয়। কতটা করে পাঠাব, বলে যান।"

অসিতের দেওয়া ফর্দখানা তাঁর হাতে দিয়ে বলি, "কিন্তু লালাজী রামচাঁদের জন্য বড়ই চিন্তায় আছি। কাল সকালে আমরা রওনা হতে চাই, সে যে এখনও এল না।"

"চিন্তা করবেন না সাব, স্বামীজী মহারাজের চিঠি পেয়েই আমি খবর পাঠিয়েছি তাকে, সে এসে যাবে। আর যদি একান্তই না আসে, বীর সিং আপনাদের নিয়ে যাবে। কোন অসুবিধে হবে না।"

তাঁর আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে আমরা এগিয়ে চলি বনবিশ্রাম ভবনের দিকে। দশ মিনিটের মধ্যেই বিশ্রামভবনের সামনে এলাম। সুপ্রাচীন ও সুবিশাল একটি একতলা অট্টালিকা। দেড় থেকে দু ফুট চওড়া দেওয়াল। বড় বড় কামরা আর বারান্দা। দেখলেই বোঝা যায় ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। সে নীরবতার অবসানের জন্য কেউ কোন চেষ্টা করেছেন কিনা জানি না। শুধু জানি, এটি একদা নীলকর ন্যাশ সাহেবের কুঠি ছিল। তিনিই নির্মাণ করেছিলেন এই ভবন। নীলকরের নিবাস আজ বিশ্রামভবনে পরিণত।

বর্তমান বাসিন্দাদের মধ্যে একটি বাঙ্গালী পরিবার রয়েছেন। ভদ্রলোকের নাম শ্রীনির্মলচন্দ্র মৈত্র। প্রথম জীবনে অধ্যাপনা ও পরবর্তী জীবনে সরকারী চাকরি করেছেন। কিন্তু সারাজীবনই হিমালয়ের পথে পথে ঘুরেছেন। ইদানীং চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু অবসর নেন নি হিমালয়ের কাছ থেকে। পরিচিত মহলে পণ্ডিত বলে খ্যাতি আছে তাঁর। তিনি আজই বিকেলে এসেছেন এখানে। এসেছেন কুয়ারি হয়ে গোণাতাল যাবেন বলে। দিন দুই বিশ্রাম নেবেন এখানে। সেই সঙ্গে যতটা সম্ভব দেখে নেবেন চারিদিক। আমাদের পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। বিশ্রামভবন দেখিয়ে নিয়ে এলেন নিজেদের ঘরে। বসালেন সযত্নে। তারপরে গল্প জুড়ে দিলেন।

মৈত্রমশায়ের এখানেই আলাপ হল একজন স্থানীয় প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে। কথায় কথায় তিনি আমাদের বললেন এক ঐতিহাসিক কাহিনী। সে প্রায় শ'দুয়েক বছর আগের কথা। গাড়োয়াল ও কুমায়ুন তখন নেপালীদের অধীন। এখানেও একজন নেপালী শাসক বাস

করত। বড়ই অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিল সে। তার অত্যাচারে অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি সর্বদাই বিপন্ন ছিল। সুযোগ পেলেই সে লুটপাট করত। লুটপাটের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রজাদের নিয়মিত ভেট দিতে হত তাকে—টাকা থেকে দুধ পর্যন্ত সবই পাঠাতে হত সর্দারকে। একদিন এক গৃহস্থের গরুর সব দুধ বাছুরে খেয়ে ফেলল। গৃহস্থ পড়ল বিপদে। সর্দারকে দুধ পাঠাতে হবে। না পাঠালে নিশ্চিত মৃত্যু। অথচ ঘরে দুধ কিংবা পয়সা কোনটাই নেই। উপায়ান্তর না দেখে গৃহস্থ তার স্ত্রীর স্তনদুগ্ধ ভেট দিল নেপালী শাসককে। সে দুধ খেয়ে সর্দার তো ভারী খুশি। এমন মিষ্টি দুধ তাকে আর কেউ কখনও পাঠায় নি। তাই পরদিন সেই গৃহস্থ গরুর দুধ নিয়ে এলে, সে সানন্দে তখুনি সেই দুধে চুমুক দিল। আর তাতেই বাধল গোল। সে গেল খেপে—আজকের দুধ কালকের মত মিঠে নয় কেন? কাল যে গরুর দুধ দিয়েছিলে, আমি সেই গরুর দুধ চাই।

আবার বিপদে পড়ল গহস্থ। অবশেষে বাধ্য হয়ে সে কথাটা বলল নেপালী সর্দারকে। শুনে সে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপরে সৈন্যদের আদেশ করল—রাজ্যের সব স্তন্যপায়ী শিশুকে হত্যা করে তাদের জননীদের স্তনদুগ্ধ নিয়ে এসো আমার জন্য। প্রতিদিন আমি স্তনদুগ্ধ চাই।

নিষ্ঠুর শাসকের সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করতে থাকল। তারা আছাড় দিয়ে শিশুদের হত্যা করতে শুরু করল। জননীরা কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের স্তনদুগ্ধ ভেট দিল শিশুহত্যাকারীদের। সন্তানহারা জননীদের আকুল ক্রন্দনে গোয়ালদামের আকাশ বাতাস উতলা হল। কিন্তু স্তন্যপায়ী সর্দার তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না।

তরুণরা মেনে নিল এই অন্যায়, যুবকরা মুখ বুজে সহ্য করল এই অমানুষিক অত্যাচার। কিন্তু নীরব থাকতে পারলেন না চারজন বৃদ্ধ। তাঁদের দুজন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একটা পালকিতে আরোহণ করলেন। অপর দুজন পালকি বয়ে নিয়ে চললেন। বদ্ধ পালকি চলল সর্দারের কুঠির দিকে।

ধীরে ধীরে চলেছে পালকি। পথচারীদের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ বেয়ারারা বলছেন—এক ধনী গৃহস্থ সপরিবারে তীর্থযাত্রায় যাচ্ছেন। একে তো তীর্থযাত্রীরা যথাসাধ্য অর্থ সঙ্গে নিয়ে যায়, তার ওপর ধনী। চলেছে বদ্ধ পালকিতে। কথাটা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই সর্দার আকৃষ্ট হয়। লুব্ধ শাসক ভাবে, না জানি কত টাকাপয়সা নিয়ে যাচ্ছে পালকিতে করে। সৈন্যদের সঙ্গে সে এসে পালকির পথরোধ করে। নিজ হাতে পালকির দরজা খোলে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের বৃদ্ধরা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন তার ওপরে। নিজেরা মৃত্যুবরণ করার আগেই তাঁরা হত্যা করেন অত্যাচারী শাসককে। অত্যাচারমুক্ত হল গোয়ালদাম। চারজন বৃদ্ধের জীবনের বিনিময়ে মায়েদের মুখে হাসি ফুটল। মুক্তি পেল গোয়ালদামের মানুষ।

গল্প-শেষে বিদায় নিই বিশ্রামভবন থেকে। বেরিয়ে আসি পথে। যেমন পথ, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশ আর আবহাওয়া।

ঘণ্টাখানেক গোয়ালদামের চড়াই-উৎরাই পথে পদচারণা করে ফিরে চলি ডাকবাংলোয়। মন ফিরতে চায় না। এমন সুন্দর পথ আর পরিবেশ। তবু নিঃশব্দে এগিয়ে চলি। সহসা অমিতাভ কথা বলে, "একটু বসা যাক এখানে।" সে পথের পাশে একখানি পাথর দেখিয়ে দেয়।

তিনজনে এসে বসি পাথরখানার ওপরে। কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। তারপরে দেবকীদা বলেন, "কত সুন্দর এই হিমালয়, অথচ তাকে নিয়ে কতটুকু লেখা হল বাংলা

সাহিত্যে ! এ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?"

প্রশ্নটাকে একটু খাপছাড়া বলে মনে হয়। বলি, "এখানে এসময় হঠাৎ এ প্রশ্ন করলেন ?"

"না, অনেকদিন থেকেই তোমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করব ভেবে রেখেছি, আজ হঠাৎ মনে পড়ল।"

"হিমালয় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি, সমাজ ও শিল্পের ধারক। সে ভারতীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী। তিন হাজার বছর আগে হিমালয় সগৌরবে ভারতীয় সাহিত্যে তার স্থান সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছে। বিশ্বসাহিত্যেও হিমালয় অবহেলিত নয়—ইংরেজী ফরাসী ইতালীয় ও জার্মান সাহিত্যের কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে হিমালয়কে নিয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তবে হিমালয়ের পথে বাঙ্গালী যাত্রীরা যেমন এগিয়ে চলেছেন, বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা তেমন এগোতে পারছেন না। আজও হিমালয় সম্পর্কে কোন খোঁজখবর পেতে হলে আমাদের সম্পূর্ণরূপে বিদেশী সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সেজন্য নিরাশ হবার কিছু নেই। বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের যখন নজর পড়েছে হিমালয়ের দিকে, তখন অদূর ভবিষ্যতে হিমালয়কে নিয়ে নিশ্চয়ই ভাল ভাল বই লেখা হবে আমাদের সাহিত্যে।"

"আচ্ছা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম হিমালয় ভ্রমণকাহিনী কি ?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

একটু ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করি, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম হিমালয়-ভ্রমণকাহিনী কী, তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সম্ভবতঃ রাজেন্দ্রমোহন বসুর 'কাশ্মীর কুসুম' বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ভ্রমণকাহিনী। ১৮৭৫ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ১৮৬৯ সালে কাশ্মীরভ্রমণে গিয়েছিলেন। এর পরেই প্রকাশিত হয় রায়বাহাদুর জলধর সেনের 'হিমালয়'। এই অপূর্ব গ্রন্থখানির প্রকৃত রচয়িতা কে, তা নিয়ে এখনও অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু সে বিতর্ক এখানে অবান্তর। ১৯০০ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ১৮৯০ সালে বদ্রীনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন।

'কাশ্মীর কুসুম' প্রথম প্রকাশিত হিমালয়-ভ্রমণকাহিনী হলেও প্রাচীনতম ভ্রমণবিবরণ নয়। পরে প্রকাশিত হলেও প্রথম ভ্রমণকাহিনী রচনা শুরু হয় তার বাইশ বছর আগে। লেখক যদুনাথ সর্বাধিকারী ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই চার বছর, গরুর গাড়ি, ঘোড়া ও ডাণ্ডী চেপে এবং পায়ে হেঁটে কেদারবদ্রীসহ সারা উত্তর-ভারত ভ্রমণ করেন। পরিক্রমাকালে তিনি নিয়মিত রোজনামচা লিখতেন। যদুনাথের বংশধরগণ তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে ১৯১৫ সালে 'তীর্থভ্রমণ' নাম দিয়ে সেই রোজনামচাখানি প্রকাশ করেন। সাত শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম হিমালয় ভ্রমণবিবরণ।

তারপর থেকে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা সাহিত্যে হিমালয়ের পরিধি প্রসারিত হয়েছে। এখন হিমালয় নিয়ে প্রায় শ'দুয়েক বাংলা বই আছে এবং এর প্রায় অর্ধেক কেদার-বদ্রীকে কেন্দ্র করে। দুটি মাত্র তীর্থক্ষেত্র বা দর্শনীয় স্থানকে অবলম্বন করে পৃথিবীর খুব কম সাহিত্যেই এত অধিকসংখ্যক পুস্তক প্রণীত হয়েছে।

হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চল, যথা গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, নন্দনকানন, রূপকুণ্ড, কাশ্মীর, কুমায়ুন, কৈলাস, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ, এমন কি নেপাল সিকিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থান নিয়েও বহু বাংলা ভ্রমণকাহিনী রচিত হয়েছে। অধিকাংশই গড়ে উঠেছে তীর্থ-পরিক্রমা কিংবা হিমালয়ের অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শনের বর্ণনাকে কেন্দ্র করে।

কয়েকখানি গ্রন্থে অবশ্য হিমালয়ের অংশবিশেষের ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পর্বতাভিযান ও পর্বতারোহণ শিক্ষাক্রমের ওপরেও কয়েকখানি বই লেখা হয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

হিমালয়ের ঐশ্বর্য আহরণ, তার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ভারতকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনে আজ হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের সুপরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই পরিচয় কেবল তীর্থ-পরিক্রমার মধ্যে থেকেই হবে না, এই পরিচয়ের জন্য নব নব অভিযান ও গবেষণার আয়োজন করতে হবে হিমালয়ের প্রতিটি গিরিশৃঙ্গে, প্রতিটি গিরিবর্ত্মে, প্রতিটি গ্রাবরেখায়। দেবতাত্মা হিমালয়ের অনন্ত রহস্যকে আবিষ্কার করতে হবে। সেই আবিষ্কারের কথা ও কাহিনীকে সাহিত্যের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে সকলের কাছে। কারণ আমি জানি হিমালয় শুধু সীমাহীন সৌন্দর্যের আধার নয়, অনন্ত সম্পদের ভাণ্ডার। আমি বিশ্বাস করি সেই সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে ভারতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

॥ আট ॥

দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে হিমেল হাওয়া এলো ছুটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দিনের উত্তাপটুকু তাড়িয়ে দিল। বারান্দায় বসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠল। আমরা ঘরে এসে বিছানার ওপরে বসলাম। স্লিপিং ব্যাগটা পায়ের ওপর টেনে নিলাম। মোহিত গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

একটু আগে শাদীলালজী জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আমরা উপেনবাবুর কথা বলেছি। কথা ছিল, উপেনবাবু আজ বিকেলে এখানে আসবেন। কিন্তু তিনি আসেননি। কোন কারণে এসে পৌঁছতে পারলেন না। তাই শাদীলালজীকে বলে রাখলাম তাঁর কথা। তিনি এলে শাদীলালজী তাঁর যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা ওখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করব।

উপেনবাবু তথা বটানিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ডক্টর উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের দলের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। পথের গাছপালা ও বুগিয়াল বা তৃণভূমির সমীক্ষা করবার জন্য তিনি সরকারী ভাবে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে আর কখনও রূপকুণ্ড পথের উদ্ভিদ-সমীক্ষা হয়নি। উপেনবাবু আমার পূর্বে পরিচিত। তিনি ১৯৬২ সালে নীলগিরি পর্বত অভিযানের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ছিলেন। সেবার তিনি লোকপাল হেমকুণ্ড ও নন্দনকাননের উদ্ভিদ সমীক্ষা করেছেন।

একটু আগে চৌকিদার এসেছিল। সে আমাদের চা খাইয়ে গেছে। তারপরে এসেছে বীর সিং। সে ঘোড়াওয়ালাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ঘোড়াওয়ালা জাতিতে ভোট। ভোট ভারত-তিব্বত সীমান্তের মিশ্রজাতি। ওরা ইতিপূর্বে দু-দেশেরই নাগরিক ছিল। চীনারা তিব্বত দখল করার পর থেকে ওরা স্থায়ীভাবে ভারতে বাস করছে। এখানেও বাস স্ট্যাণ্ডের নিচে একটি বেশ বড় ভোটবস্তী আছে। আমাদের ঘোড়াওয়ালাটি স্বাস্থ্যবান। তার গায়ের রং ঈষৎ তামাটে। তবে পোশাক পাঞ্জাবীদের মতো। ভোটিয়ারা চুল রাখে আর নিয়মিত

বেণী বাঁধে। বেণীটি অবশ্য পাগড়ীর তলায় ঢাকা থাকে।

চারটি ঘোড়া ঠিক হয়েছে। সস্ত্রীক ঘোড়াওয়ালা যাবে আমাদের সঙ্গে। প্রতি ঘোড়া দু মণ মাল বইবে। দৈনিক ভাড়া আট টাকা।

সবই হয়ে গেছে। সবাই এসেছে। কিন্তু যাকে গোয়ালদাম আসার পর থেকে প্রতিক্ষণে আশা করছি, সে আসে নি এখন পর্যন্ত। আসে নি আমাদের পথপ্রদর্শক রামচাঁদ। শাদীলালজী ও বীর সিং যাই বলুক, তাকে সঙ্গে না নিয়ে দুর্গম পথে আমাদের রওনা হওয়া উচিত নয়। তাই মনে হচ্ছে সব হয়েও কিছুই যেন হয় নি।

রাতের সঙ্গে শীত বাড়ছে। আমরা একটু একটু করে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকছি। একসময় দেখি আমাদের সারা শরীরটাই স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। আমরা সবাই শয্যাশায়ী। শুধু তাই নয়, দু-একজনের নাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎ নেতা বলে ওঠে, "নটা বাজে। এবারে চলো, খেয়ে আসা যাক।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, অসিত ঠিকই বলেছে। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্লিপিং ব্যাগের মায়া পরিত্যাগ করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। অমিতাভ মোহিত দাশু ও দেবকীদা বিনা বাক্যব্যয়ে তৈরি হয়ে নেন। কিন্তু অসিত মুশকিলে পড়ে সুজলকে নিয়ে। উঠি উঠি করেও সে বিছানা ছাড়ছে না। অসিত তাকে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে চলে। কিন্তু কোন ফল হয় না। অবশেষে দেবকীদার চেষ্টায় সুজল গাত্রোত্থান করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে সঙ্গে চলে আমাদের। বার বার বলতে থাকে, "আমার একদম খিদে নেই, তবু তোমরা আমাকে জোর করে নিয়ে চললে। তোমরা জানো না, পদযাত্রার আগের রাতে উপোস দিলে শরীরটা ঝরঝরে হয়।"

শাদীলালজী এখনো দোকানে রয়েছেন। আমাদের চিঠিগুলি তাঁর হাতে দিই। এখানে কোনো পোস্ট অফিস নেই। শাদীলালই গোয়ালদামের অনারারী পোস্ট মাস্টার। তাঁর দোকানেই খাম পোস্টকার্ড কিনতে পাওয়া যায়। তাঁর কাছেই সবার চিঠি আসে। তিনিই এখানকার চিঠি-পত্র পরদিনের বাসে গরুড় পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেন।

দুপুরে খিচুড়ি খেয়েছি বলে রাতের জন্য অসিত ভাতের অর্ডার দিয়েছিল। কিন্তু তখন বুঝতে পারে নি, তার সাধের ভাত এমন বিচিত্র বস্তু হবে। রাঁধুনী ফেনাভাত রাঁধার চেষ্টা করেছিল। মহৎ প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই। শীতের রাতে বিশুদ্ধ দেশী ঘি দিয়ে গরম গরম ফেনাভাত নিঃসন্দেহে উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু জলাধিক্যের জন্য সেই ফেনাভাত এক বিচিত্র বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সঙ্গের উপকরণ দুটিও উপেক্ষণীয় নয়। একটি উড়দ্‌কা ডাল—জলবৎ—জলবৎ তরলং। অপরটি ভিণ্ডিকা সব্জী—স্বাদহীন অখাদ্য। রাঁধুনী চিনিয়ে দেবার পরেই বুঝতে পারলাম। নইলে সাধ্যও ছিল না ওদের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করি। তবে ওদের সঙ্গে দুটি পরিচিত বস্তু রয়েছে—কাঁচা লঙ্কা ও কাঁচা পেঁয়াজ। পেঁয়াজ যেমন মিষ্টি, লঙ্কা তেমনি ঝাল।

ভাত ডাল ও তরকারীর বর্ণ-পরিচয় যাই হয়ে থাকুক, তাতে কিন্তু রাঁধুনীর কোন সাশ্রয় হল না। সে আমাদের খাবার পরিমাণ দেখে নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করল। ভেবে নিল,, এমন উপাদেয় খাদ্য ইতিপূর্বে আর আমাদের অদৃষ্টে জোটে না। আমরা নিজেরাও কম আশ্চর্য হলাম না। এই না খাবার চেহারা দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করছিলাম। আর খাওয়া শুরু করেই সব বেমালুম ভুলে গেলাম। তবে সব চেয়ে বেশি অবাক করল সুজল। শরীর ঝরঝরে রাখার জন্য উপোস করতে চাইছিল। আর সেই কিনা হাপুসহুপুস শব্দে দোকানীর দুথালা ভাত

সাবাড় করে দিল। কিন্তু না করেই বা উপায় কি? এটি যে হিমালয় পথের নিয়ম। ভাল-মন্দ বিচার না করে, যখন যেখানে যা পাও, তাই পেট পুরে খেয়ে নাও। একজন মানুষের খাদ্য আরেকজন মানুষের অখাদ্য হতে পারে না।

খাওয়া-শেষে ফিরে চলি ডাকবাংলোয়। চলতে চলতে মোহিত জিজ্ঞেস করে, "দেবকীদা এখানে নাকি ভালুক আছে?"

"কেন, তোর ভয় করছে নাকি?" দাশু ঠাট্টা করে।

"না, ভয়ের জন্য নয়, এমনি জিজ্ঞেস করছি।" মোহিত বলে।

"আছে শুনেছি। আর থাকাই স্বাভাবিক।" সিগারেটে সুখটান মেরে দেবকীদা মন্তব্য করেন।

অসিত কিন্তু অন্য চিন্তা করছিল। এবারে সে মনের কথা প্রকাশ করে, "কাল রওনা হতে পারব কিনা কে জানে?"

"কেন?" আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হয় অমিতাভ।

"রামচাঁদ যে এখনও এলো না।"

সত্যই চিন্তার কথা। কথাটা ভাবতে ভাবতে আমরা ওপরে উঠে আসি। সপ্তমীর চাঁদ কখন যেন পালিয়ে গেছে আকাশের আঁচল ছেড়ে। অসংখ্য তারা এসে জমা হয়েছে সেখানে। সন্ধ্যার পরে চাঁদের আলোয় দেখেছিলাম ত্রিশূলকে। এখন চাঁদ নেই, কিন্তু ত্রিশূল রয়েছে সেখানে। আঁধার মুছে ফেলতে পারে নি তাকে। বরং সে রহস্যময় রূপ নিয়ে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে আমাদের। অনন্তকাল ধরে মানুষকে আহ্বান করছে তার বুকে। সে চিরকাল ছিল ওখানে, চিরকাল থাকবে ওখানে, আর চিরকাল আমাদেরই মতো দলে দলে মানুষ ছুটে যাবে তার কাছে।

কিন্তু আমরা যেতে পারব কি? রামচাঁদ যে এখনও আসে নি। আজ আর আসবে না। কালই যে আসবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? তা হলে কি আমরা যাব না রূপকুণ্ডে? না না, যাব বৈকি, নিশ্চয়ই যাব। রামচাঁদকে ছাড়াই আমরা যাব রূপকুণ্ডে। কাল সকালেই আমাদের যাত্রা হবে শুরু।

সিদ্ধান্তশেষে ঘরে এসে স্লিপিং ব্যাগের আশ্রয় নিই। দশটা বাজে, এবারে শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে বেরুতে হবে। ঘোড়াওয়ালা বলে গেছে ঠিক ছটায় হাজির হবে। এবারে বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু শুতে গিয়ে দেখি অসিত চশমা পরছে। তাকে চলাফেরা করার জন্য চশমার সাহায্য নিতে হয় না, কেবল লেখাপড়ার জন্যই চশমার দরকার। অসিত কি এত রাতে আবার বই খুলে বসবে নাকি? না, বই নয়—খাতা, হিসেবের খাতা। আমরা বলি, চিত্রগুপ্তের খাতা। ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটি তার নিত্যকর্ম—দিনের শেষ কাজ। যতই রাত হোক, যত পরিশ্রমই হোক, শোবার আগে সারাদিনের খরচটি লিখে রাখা চাই। কলকাতায় ফিরে গিয়ে যে একখানি করে নিখুঁত 'ব্যালান্স সীট' প্রেজেন্ট করতে হবে প্রত্যেক মেম্বারকে। কো-অপারেটিভ পদযাত্রা, নিখুঁত হিসেবটি রাখা চাই। কুড়েমি করলে চলবে কেন?

কয়েক মিনিট হিসেবের মধ্যে ডুবে থাকে অসিত। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠে, "দেবকীদা, আপনি ক'কাপ চা খেয়েছেন?"

দেবকীদা শুয়ে শুয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, "কখন?"

"সকালে?"

"কোথায়—গরুড়ে, বৈজনাথে, না গোয়ালদামে ?'

"গরুড়ে।"

"এক কাপ।"

"তাহলে যে এক কাপ চায়ের কোন হিসেব পাচ্ছি না।" অসিত সবিশেষ চিন্তিত।

সুজল চিন্তামুক্ত করে তাকে, "আমি দু কাপ খেয়েছি অসিতদা !"

অসিত চড়াস্বরে বলে ওঠে, "এতক্ষণ বলতে পারিস নি ! আমার এদিকে হিসেব মিলছে না, আর তুই ওদিকে দু কাপ চা গিলে চুপ মেরে আছিস।"

"চুপ মেরে রইলাম কোথায় ? তুমি জিজ্ঞেস করতেই তো স্বীকার করলাম।" সুজল তার অপরাধ বুঝতে পারে না।

"কৃতার্থ করেছো। কিন্তু কথাটা তখন বললে তো ব্যালান্স না মেলার জন্য আমাকে এতক্ষণ হাঙ্গামা পোহাতে হত না।"

এতক্ষণে সুজল বুঝতে পারে অপরাধ। তাই এবারে সে সত্যি সত্যি চুপ মেরে যায়। অসিত পুনরায় হিসেবে মনোনিবেশ করে।

কতক্ষণ পরে জানি না। একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। হঠাৎ মনে হল কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে। ইতিমধ্যে কখন যেন আলো নিভিয়ে অসিত শুয়ে পড়েছে। সে উঠে আলো জ্বালাল। আমরাও বিছানায় উঠে বসি। অসিত বলে, "বোধ হয় বীর সিং এসেছে।" সে দরজা খোলে।

না, বীর সিং নয়। একজন অপরিচিত লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির পরনে দেশী পোশাক, পায়ে হাণ্টার শু, মাথায় পাহারী টুপি। উন্নত নাসিকা, কিন্তু চোখ দুটি ছোট ছোট। মাঝারি গড়ন। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। বেশ কেতাদুরস্ত। ঘরে ঢুকে সবাইকে স্যালুট ঠোকে। তারপরে একখানা চেয়ার নিয়ে বসে। লোকটি কে ? আমরা তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে। আগন্তুক ধীরেসুস্থে বলে, "আজ একটু বেশি সরদী পড়েছে। মালুম হচ্ছে আপনাদের বেশ শীত করছে।"

আমরা মাথা নাড়ি। লোকটি বলতে থাকে, "আজ আকাশ সাফ ছিল। কিন্তু কাল কুয়াশা পড়তে পারে। তাহলেই বিপদ, বের হতে দেরি হয়ে যাবে। তা আপনারা কখন বেরুতে পারবেন ?"

"বীর সিং যখন বলবে।" অসিত উত্তর দেয়।

লোকটি অসন্তুষ্ট হয়। বিরক্ত কণ্ঠে বলে, "বীর সিং কি বলবে ? সে কি জানে রূপকুণ্ডের !"

'কিন্তু....." অসিত শেষ করতে পারে না।

"ছটার মধ্যে কি রেডি হতে পারবেন ?"

"কেন পারব না ?"

"তা হলে এবারে শুয়ে পড়ুন। কাল ঠিক ছটার সময় রেডি থাকবেন।" লোকটি উঠে দাঁড়ায়।

"তুমি ?" প্রশ্নটা করে ফেলি কোনমতে।

"আমি ?" সে বিস্মিত হয়। "আমাকে চিনতে পারেন নি ?" সে মৃদু হাসে।

"না, কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"তসবীরও দেখেন নি ?"

"মনে পড়ছে না।"

"আমি রামচাঁদ...."

"হুর্‌রে, থ্রি চিয়ার্স ফর কমরেড্ রামচাঁদ !" সুজল জড়িয়ে ধরে তাকে। আমরাও আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠি। রামচাঁদ খুশি হয়। হয়তো বা একটু গর্ববোধ করে।

"আমরা ভেবেছিলাম তুমি আজ আর আসবে না।" দাশু বলে।

"ভুল ভেবেছিলেন। আমি আজই এসেছি।" বলতে বলতে ঘড়ি দেখে রামচাঁদ, "এখনও রাত বারোটা বাজে নি। রামচাঁদ কখনও কথার খেলাপ করে না। আচ্ছা আসি তাহলে। কাল সকাল ছটায় আসব। রেডি থাকবেন।"

'গুড নাইট' বলে বেরিয়ে যায় রামচাঁদ। আমাদের মাথার বোঝা নেমে যায়। সকল দুশ্চিন্তার অবসান হয়। বিছানায় ফিরে এসে নিশ্চিন্তে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি।

॥ নয় ॥

সকালে ঘুম ভাঙ্গে দেবকীদার ডাকে। চোখ মেলে দেখি জনতা-স্টোভ জ্বলছে, জল ফুটছে—কফির জল। তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে বিছানায় উঠে বসি। দেবকীদা বলেন, "মুখ ধুয়ে এসো।"

"আবার মুখ ধুতে হবে ?"

"গোয়ালদামেই মুখ না ধুয়ে কফি খাবে নাকি ?"

"কিন্তু বেশ শীত করছে যে।"

"করুক গে। মুখ ধুয়ে এসো।"

অগত্যা আমরা বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হই। মুখ ধুয়ে এসে ঘড়ি দেখি, পাঁচটা বেজে গেছে। তাহলে তো আর বসে থাকা ঠিক নয়। অনেক কাজ বাকি আছে। ছটার সময় রামচাঁদ আসবে। ভাগ্যিস দেবকীদা ঠিক সময়ে ঘুমে থেকে উঠেছিলেন।

কফির মগ হাতে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসি। আকাশটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে। ত্রিশূলকে এতক্ষণ দেখাচ্ছিল অস্পষ্ট মর্মর-মূর্তির মতো। এবারে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে তার রং ফিরছে। সাদা লাল হচ্ছে, লাল সোনালী হচ্ছে। সূর্য সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিল মহাদেবের ত্রিশূলকে। তবে কি দেবতাত্মা হিমালয়ের রং বদলের পালা শেষ হয়ে গেল ?

না। এ পালা চলে প্রতি পলে। চলে দিনে রাতে—ঋতুতে ঋতুতে। উষার সঙ্গে মধ্যাহ্নের, গোধূলির সঙ্গে রাতের যেমন কোন মিল নেই, তেমনি মিল নেই গ্রীষ্মের সঙ্গে বর্ষার, শরতের সঙ্গে শীত কিংবা বসন্তের। আর এই অমিলই হিমালয়ের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

ত্রিশূলকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তার এই সোনালী রূপই চিরস্থায়ী। অথচ জানি কিছুক্ষণের মধ্যেই তার রূপ পরিবর্তিত হবে। পরিবর্তন যে হিমালয়ের নিয়ম। প্রথমে কয়েকটি কলঙ্কচিহ্ন দেখা যাবে ত্রিশূলের গায়ে। ধীরে ধীরে সোনালী রং আবার রুপোলী হতে থাকবে। তবে এ রুপোর সঙ্গে আগের রুপোর কোন মিল থাকবে না। জ্বলন্ত রুপোর মত চকচক করতে থাকবে। আমরা সেই শাণিত আয়ুধকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে পদযাত্রা শুরু করব।

ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠি। ছটা বেজে গেছে। রামচাঁদ এখুনি এসে যাবে। আর আমি এখনও এয়ার ম্যাট্রেসের হাওয়া ছাড়ি নি, পোশাক পরি নি। তাড়াতাড়ি ভেতরে আসি। না, এমন কর্মঠ ও বিচক্ষণ নেতা থাকতে বিচলিত হই কেন ? মোহিত, দাশু ও সুজলের সাহায্যে সে সবার মালপত্র গুছিয়ে ফেলেছে। পোশাক পরে একেবারে তৈরি হয়ে বসে আছে ওরা। আমিও পোশাক পরে নিই। তারপরে আবার বারান্দায় বেরিয়ে আসি। এবারে ঘোড়া এবং রামচাঁদ এলেই রওনা হতে পারি। কিন্তু কোথায় তারা ? এমন কি বীর সিং-এর পর্যন্ত পাত্তা নেই। যখন হয় আসবে, আমরা ততক্ষণ এখানে বসে বসে ত্রিশূলকে দেখি। যত দেখছি, ততই ভালো লাগছে। দেখার আশ মিটছে না—ভালোর যে শেষ নেই।

কিন্তু ধৈর্যের শেষ আছে। সাতটা বাজে, এখনও আসছে না ওরা। অসিত সবিশেষ চিন্তিত। আমরা তাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইছি। বলছি—পদযাত্রার প্রারম্ভে প্রত্যেক যাত্রীকে এমন প্রতীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। মালবাহকরা ঘর ছেড়ে দুর্গম গিরি-কান্তারে যাত্রা করে। স্বাভাবিক ভাবেই ঘরের মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিতে তাদের দেরি হয়ে যায়।

অসিত মানতে পারে না আমাদের যুক্তি। বলে, "ঘোড়াওয়ালার ঘরের মানুষ তো তার সঙ্গেই যাচ্ছে, সে সস্ত্রীক চলেছে আমাদের সঙ্গে। আর বীর সিং ও রামচাঁদের ঘরণীরা নেই গোয়ালদামে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। কাজেই চুপ করে থাকতে হয়।

কিছুক্ষণ পরে অসিত আবার বলে, "চলো, একবার নিচে নেমে দেখা যাক ওদের কি হল ?"

অসিতের সঙ্গে আমি ও দাশু ডাকবাংলো থেকে নেমে আসি বাস স্ট্যাণ্ডে। শাদীলালজী নমস্কার করেন আমাদের। আমরা প্রতি-নমস্কার করে তাঁকে বলি সব কথা। আমাদের কথা শুনে শাদীলালজী হেসে দেন। বলেন, "ওদের ছটা মানে আপনাদের আটটা। ওদের বাড়ি গিয়ে দেখবেন, সবে ঘুম ভেঙ্গেছে। সে যাই হোক। আপনাদের যাবার দরকার নেই, আমি লোক পাঠাচ্ছি রামচাঁদের কাছে।"

আমরা বেরিয়ে আসি শাদীলালজীর দোকান থেকে। অসিত দাশুকে বলে, "রওনা হতে যখন দেরি আছে, তখন কিছু খেয়ে নে দোকান থেকে। ডাকবাংলোয় গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় ওদের।"

"আপনারা খাবেন না কিছু ?" দাশু জিজ্ঞেস করে।

"খাবো, তবে তার আগে মহারাজের সঙ্গে একটু ঘুরে আসছি বনবিশ্রাম ভবন থেকে। একবার দেখা করে আসি মৈত্রমহাশয়ের সঙ্গে।"

দাশু চলে যায় ওপরে, আমরা নেমে চলি নিচে।

পর্বতারোহণে গোয়ালদামের অবদান অসামান্য। সেকালে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন হিমালয়ের বহু বিখ্যাত পর্বতাভিযান হয়েছে এই পথে। সাধারণত অভিযাত্রীরা এসে মিলিত হতেন রানীক্ষেতে। সেইখানেই অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ হত। তারপরে তাঁরা গাড়ি করে গরুড় আসতেন। সেখান থেকেই শুরু হত পদযাত্রা। গোয়ালদামে তখন নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলো ছিল না, ছিল এই আবাসটি। তখন ছিল মিস্টার ও মিসেস ন্যাশের বাংলো। এখন বনবিশ্রাম ভবন। এখানেই আশ্রয় নিতেন অভিযাত্রীরা। এখান থেকেই যাত্রা করতেন হিমালয়ের গিরি-কান্তারে।

বড়লার্ট লর্ড মিণ্টোর আমন্ত্রণে হিমালয় সমীক্ষার জন্য ডঃ টি. এস. লংস্টাফ, এ. এল.

মাম, সি. জি. ব্রুস ও তিনজন এ্যালপাইন গাইড এবং ন'জন গুর্খাসহ ১৯০৭ সালের ২৮শে এপ্রিল গোয়ালদাম পৌঁছলেন। এখানে তাঁরা ন্যাশ দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই পথে তাঁরা ওয়ান হয়ে কুয়ারি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তপোবনে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রায় সমস্ত গাড়োয়াল-হিমালয় ভ্রমণ করেছিলেন এবং ১২ই জুন (১৯০৭) ত্রিশূল পর্বতে আরোহণ করেছিলেন। সেই অভিযানের কথা এ. এল. মাম্ তাঁর 'Five months in the Himalaya' (১৯০৯) এবং সি. জি. ব্রুস তাঁর "Twenty years in the Himalaya" (১৯১০) ও 'Himalayan wanderer' (১৯৩৪) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই বই তিনখানি থেকে আমরা সে আমলের গোয়ালদাম ও ওয়ান অঞ্চলের বিষদ বিবরণ পাই।

মাম্ গোয়ালদাম সম্পর্কে লিখেছেন, 'We came, about mid-day, to the bungalow of Mr. & Mrs. Nash at Gwaldam,....charmingly situated on a depression in the chain of hills that overlooks the Pindar river,.....Trisul was now in sight, no longer seen as part of a ridge, but a single summit, its triple crest gleaming against the sky.'

ব্রুস লিখেছেন, 'The march beyond their estate (কৌশানী) brings one the to house of Mr. Nash who was equally kind,....and has...for years travelled in Garhwal, and knows the Garhwali character well and appreciates it. Gwaldam, Mr. Nash's estate, is situated high above the Pindar river on the borders of Kumaon and Garhwal.'

আমাদের দেখে মৈত্রমশাই বেরিয়ে এলেন বাইরে। বৈঠকখানায় এনে বসালেন আমাদের। তারপরে চায়ের ফরমাস দিতে ছুটলেন। ফিরে এসে গল্প জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় বলতে থাকলেন, "হ্যাঁ, সেকালের শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এই বিশ্রাম ভবন।' হঠাৎ তিনি উঠে গেলেন ঘরের অপর প্রান্তে। ছোট টেবিলের ওপরে রাখা ভিজিটরস বুকটা নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এ বইটা ১৯৩২ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদের, তার আগের বইখানি নেই এখানে।"

"চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?" অসিত বলে।

"হাঁ, সে কোন হদিস দিতে পারে নি। সে যাক্‌গে, এ বইটাও বহু মূল্যবান। খুললেই বুঝতে পারবেন।"

অসিত আমার কাছে আসে, আমি বই খুলি—প্রথম দিকেই রয়েছে তারিখ ৩১. ৫. ৩২, প্রথম স্বাক্ষরটি Marcel Kurz, দ্বিতীয়টি পড়া যাচ্ছে না। মার্শেল কুর্জ বিখ্যাত গ্রন্থ 'Himalayan Chronicle'-এর রচয়িতা। কুর্জ হিমালয় ও আলপ্‌সের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

তার খানিক পরে দুটি স্বাক্ষর রয়েছে—H. W. Tilman ও E. E. Shipton, তারিখ—১৩. ৫. ৩৪। নন্দাদেবী শিখরের পথ আবিষ্কার করার জন্য সেবারে টিল্‌ম্যান এসেছিলেন এখানে। তাঁদের সঙ্গে দুজন শেরপা ছিল। সেবারে তাঁরা নন্দাদেবীর রক্ষাপ্রাচীরের ভেতরে প্রবেশ করে একটি মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। 'Tow Mountains and a River' গ্রন্থে টিলম্যান এবং শিপটন 'Upon that Mountain' ও 'Nanda Debi' গ্রন্থে সে অভিযানের কথা লিখে গেছেন।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য তারিখটি—৩০. ৫. ৩৬, লেখা আছে—Tilman with W. E. Loomis. সেবারে টিল্‌ম্যান এসেছিলেন নন্দাদেবী শৃঙ্গে আরোহণ করতে। লুমিস ছিলেন তাঁর প্রধান সহকারী। অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে তিনি আগেই রানীক্ষেত এসেছিলেন। ২৮শে মে টিল্‌ম্যান রানীক্ষেত আসেন। পরদিনই রওনা হন গড়ুরের পথে। ৩০শে মে তাঁরা

গোয়ালদাম পৌঁছান। সেই যাত্রা ও গোয়ালদাম সম্পর্কে টিল্‌ম্যান তাঁর 'Ascent on Nanda Devi' গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'I remembered, the march to Gwaldam in 1934 was a grim affair, for it was a gruelling hot day in May, and when we finally crawled into the bungalow, we were more dead then alive...Gwaldam bungalow is a poor place, at least for a party of six.'

ছ'জন অভিযাত্রীর মধ্যে টিল্‌ম্যান কেন দুজনের নাম লিখলেন, জানি না। তবে ফেরার পথে তিনি ভিজিটরস্ বুকে সবার নাম লিখে রেখে গেছেন। সহযাত্রী ওডেলকে সঙ্গে নিয়ে টিল্‌ম্যান ২৯শে আগস্ট (১৯৩৬) নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫´) শিখরে আরোহণ করেন। পাঁচজন অভিযাত্রী ও দুজন শেরপাকে নিয়ে টিল্‌ম্যান ১০ই জুলাই গোয়ালদাম ফিরে আসেন। ঐ তারিখ দিয়ে ভিজিটরস্ বুকে লেখা আছে—T. Graham Brown, N. E. Odell, P. Lloyd, W. F. Loomis, Chas. Houston. লেখা দেখে মনে হয় টিল্‌ম্যান নিজেই সহযাত্রীদের নাম লিখেছেন। কিন্তু সবার নাম লেখার পরে তিনি বোধ করি নিজের নাম লিখতে ভুলে গেছেন।

তার পরের লেখাটি সব চেয়ে স্মরণীয়—

'I camped out.' F. S. Smythe—5.6.37.

দার্শনিক সাহিত্যিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী প্রকৃতি-প্রেমিক ও পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ। ১৯৩১ সালে কামেট শৃঙ্গে আরোহণ করার পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে স্মাইথ সহযাত্রী হোল্‌ডসওয়ার্থের সঙ্গে আকস্মিক ভাবে এক রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হন। দেওমাংরী চাঁদনী-চক, সপ্তশৃঙ্গ ও সিংহ পর্বত পরিবেষ্টিত এবং পলিগোনাম পোটেনটিলা জেনসিয়ান রডোডেনড্রন ফেণকমল হেমকমল ও ব্রহ্মকমল পরিশোভিত আর নন্দাবতী বিধৌত এই উপত্যকা তাঁকে নন্দন-কাননের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তিনি এই উপত্যকার নাম রাখলেন—Valley of Flowers আর হোলড্‌সওয়ার্থ—Flora Valley. তবে স্মাইথ সেবারে বাস করতে পারলেন না নন্দন-কাননে। তাঁকে ফিরে যেতে হল দেশে। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল নন্দন-কাননে। তাই-ছ বছর পরে স্মাইথ আবার ফিরে এলেন ভারতে। এই পথে গেলেন নন্দন-কাননে। যাবার সময় তিনি একটি রাত কাটিয়ে গেছেন গোয়ালদামে। কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমিক স্মাইথ বিশ্রাম ভবনের চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী করেন নি নিজেকে। বিশ্রাম ভবনের বাইরে গোয়ালদামের উদার অনন্ত প্রকৃতির কোলে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটিয়েছেন।

সেবারে স্মাইথ তাঁবু খাটিয়ে বহুদিন ছিলেন নন্দন-কাননে। তারপরে দেশে ফিরে গিয়ে লিখেছেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ, 'The Valley of Flowers.' এই গ্রন্থে তিনি গোয়ালদাম সম্পর্কে লিখেছেন—

'So at last, after ten miles' walk (গরুড় থেকে) and an ascent of some 4,000 feet, I emerged from the forest on the to ridge where the bungalow stand overlooking the haze-filled depths of the Pinder Valley to the remote gleam of the Himalayan snows.'

পরের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষরটি—Lady Joan Legge, তারিখ ২৫. ৫. ৩৯। স্মাইথের জন্যই তিনি এসেছিলেন এখানে। জোয়ান মার্গারেট লেগী ছিলেন কিউ-য়ের রয়াল বটানিক্যাল গার্ডেনসের একজন বটানিস্ট। স্মাইথের 'দি ভ্যালী অব্ ফ্লাওয়ার্স' পড়ে তিনি এসেছিলেন এদেশে। এই পথে ছুটে গিয়েছিলেন নন্দন-কাননে, কিন্তু আর ফিরে আসেন নি গোয়ালদামে—ফিরে যান নি নিজের ঘরে। ৪১ দিন পরে, ৪ঠা জুলাই তারিখে, তিনি তার মানস-কাননেই শেষ শয্যা পেতেছেন। আজও নন্দন-কাননে তাঁর সমাধিক্ষেত্রটি দর্শনার্থীদের

মনে গভীর রেখাপাত করে।

ঠিক চার মাস পরে অর্থাৎ ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে একদল সুইস দেশীয় পর্বতাভিযাত্রী এসেছিলেন এই বিশ্রাম ভবনে। তাঁদের স্বাক্ষর আছে ভিজিটরস্ বুকে—A. Roch, Steuri, D. Zogg, E. Huber. এ. রশ মানে আঁদ্রে রশ। সেবারে তাঁরা চৌখাম্বা (বদ্রীনাথ) আরোহণের চেষ্টা করে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

আট বছর পরে ১৯৪৭ সালে আর একদল অভিযাত্রীর সঙ্গে আঁদ্রে রশ আবার এসেছিলেন এখানে। সেবারে তাঁরা কেদারনাথ (২২,৭৭০), সতপন্থ (২৩,২১৩) ও কালিন্দী (২০,০১৯) প্রভৃতি শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তেনজিং নোরগে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম নেই ভিজিটরস্ বুকে। অন্যান্য অভিযাত্রীরা স্বাক্ষর করেছেন—

Mme. Lohner, R. Rahaul—10. 9. 47.

Alex Graven, Alfred Sutter—14. 9. 47.

Rene Dittert, Andre Roch—17. 9. 47.*

১৯৫০ সালের ১২ই মে ভিজিটরস্ বুকে সই করেছেন—T. D. Mackinnon, W. S. Murray, D. Scott ও T. Weir. এই অভিযাত্রীদল কুমায়ুন হিমালয়ের কয়েকটি দুর্গম পর্বতশৃঙ্গে অভিযান চালিয়েছেন। একটিতেও সফলকাম হতে পারেননি। কিন্তু মারে 'Scottish Himalayan Expedition' নামে সেই বিফল অভিযানের একখানি উল্লেখযোগ্য বই লিখে গেছেন। তিনি গোয়ালদাম সম্পর্কে লিখেছেন, 'On the hill top above Gwaldam Village, we found the forest rest house. A belvedere of lawn and rose garden fronted the building, commanding great spaces over the Pinder Valley on the Wan Pass to the snows of Nanda Ghunti and Trisul.' গোয়ালদামের প্রকৃতি তাঁকে স্কটল্যাণ্ডের প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এখানে এসে তাঁরা মাতৃভূমির স্পর্শ পেয়েছেন। এই বিশ্রাম ভবনের অবস্থা দেখে তাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, 'beauty of setting is extraordinary, causing us to exclaim time and again that nothing like this could be seen in the Alps and to bewail that so few Indians of the plains have any conception of the untold beauty of their own country.' দুঃখের কথা, এ মন্তব্যটি আজও মিথ্যে নয়।

তার পরে এখানে এসেছেন নিউজিল্যাণ্ডের এক অভিযাত্রী দল। তাঁরা ১৯৫১ সালের ১লা জুনের তারিখ দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন—W. G. Lowe, E. M. Colter, H. E. Reddiford, E. P. Hillary. বম্বের বিখ্যাত পর্বতারোহী কে. এফ. বুন্‌শাও সই করেছেন এঁদের সঙ্গে। ফেরার পথে ২২শে আগস্ট তাঁরা আবার সই করেছেন খাতায়। কিন্তু বুন্‌শার সই নেই তাঁদের সঙ্গে।

ভিজিটরস্ বুকের শেষ উল্লেখযোগ্য নাম সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিমালয় অভিযাত্রী Dr. T. S. Longstaff. প্রবীণ হিমালয়-পথিক পুত্র সি. সি. লংস্টাফের সঙ্গে বেড়াতে এসেছেন গোয়ালদাম। পুত্রই পিতাপুত্রের নাম দুটি লিখে রেখেছেন।

"আর এদিকে যে তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া চা-ও জুড়িয়ে গেল।"

মৈত্রমশায়ের কথায় খেয়াল হয় আমাদের। খাতাটি বুজিয়ে চা-য়ে চুমুক দিই। চা ও

---

* 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' দ্রষ্টব্য।

জলখাবার শেষ করে মৈত্রমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিই। বেরিয়ে আসি হিমালয় অভিযানের পরমতীর্থ গোয়ালদাম বনবিশ্রাম ভবন থেকে। এখানকার ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে বিশ্ববিখ্যাত পর্বতাভিযাত্রীদের পদধূলি, মিশে আছে তাঁদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আশা-নিরাশার স্মৃতি। সেই সুমহান স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যতীর্থকে প্রণাম করে আমরা ফিরে চলেছি ডাকবাংলোয়।

মনটি কিন্তু পড়ে আছে ওখানে। ভেবে চলেছি সেই সব বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহীদের কথা। আর তাঁদের সঙ্গে মনে পড়ে রাধানাথ সিকদার ও শরৎ চন্দ্র দাসের কথা। তাঁদের স্বাক্ষর নেই বিশ্রাম ভবনের খাতায়, কিন্তু তাঁদের দুজনের প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে কোন হিমালয়কাহিনী রচিত হতে পারে না।

রাধানাথ তখন সবে হিন্দু কলেজে ছাত্রজীবন শেষ করেছেন। কলেজের গণিতের অধ্যাপক টাইটলারের কাছে এক চিঠি এলো তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল অভ্ ইন্ডিয়া ও বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ স্যার জর্জ এভারেস্টের কাছ থেকে। এভারেস্ট ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অভ্ ইন্ডিয়ার অফিসে কাজ করার জন্য তিনি একজন মেধাবী ছাত্রকে চেয়ে পাঠিয়েছেন। অধ্যাপক টাইটলার তাঁর প্রিয় ছাত্র রাধানাথকে পাঠিয়ে দিলেন এভারেস্টের কাছে। ১৮৩২ সালে তরুণ রাধানাথ সার্ভে বিভাগে প্রবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি জর্জ এভারেস্টের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। রাধানাথের অসামান্য প্রতিভার প্রসঙ্গে স্যার জর্জ বিলেতে লিখলেন, রাধানাথ অঙ্কে যে রকম বুৎপত্তি লাভ করেছে তাতে তার মত পন্ডিত ভারতবর্ষে তো বটেই ইয়োরোপেও বিরল।

জর্জ এভারেস্ট Ray Trace System নামে এক নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জরিপ কার্য শুরু করেন। রাধানাথ কিছুদিনের মধ্যেই এ পদ্ধতি শিখে নিলেন। স্যার জর্জ তাঁকে হিমালয়ে পাঠালেন। কারণ পার্বত্য অঞ্চলের জরিপ করা সমতলের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। এ কাজে তখন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি ছিল না। এই সময় স্যার এভারেস্ট রাধানাথের বাবা তিতুরামকে লিখেছিলেন—দয়া করে একবার দেরাদুন আসুন। এসে দেখে যান, রাধানাথের মত পুত্রের পিতা হওয়া কতখানি গৌরবের।

১৮৪৩ সালে স্যার জর্জ অবসর গ্রহণ করেন। কর্ণেল অ সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনিও রাধানাথকে খুবই ভালবাসতেন।

১৮৪৯ সালে রাধানাথ এভারেস্ট শিখরের উচ্চতা নির্ণয় শুরু করেন ও ১৮৫২ সালে গণনা শেষ করেন। সে দিনটি হিমালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গণনা শেষ করেই তিনি ছুটে এলেন সার্ভেয়ার জেনারেলের ঘরে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'I have discovered the highest mountain in the world.' এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবজারভেটারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বেশিদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি। ঈর্ষাকাতর ইংরেজ সহকর্মীদের শত্রুতায় ১৮৬২ সালে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপরে কুচক্রীরা রাধানাথের এই অসাধারণ কৃতিত্বকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ইংলিশম্যান, ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া, পাইওনিয়ার ও স্টেট্সম্যান প্রভৃতি সেকালের সব বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় শ্রদ্ধার সঙ্গে রাধানাথের এই অমর আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বীকার করেছেন বিভিন্ন হিমালয় অভিযাত্রীরা তাঁদের Mount Everest, The Reconnaisance 1921, First Over Everest ও Houston Mount

Everest Expedition, 1933 প্রভৃতি গ্রন্থে। স্বীকার করেছেন প্রখ্যাত পর্বতারোহী ও রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড এবং সদস্য ক্যাপ্টেন নোয়েল। স্বীকার করেছেন হিমালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ 'এ্যাবোড অব্ স্নো'র প্রণেতা কেনেথ মেসন।

হিমালয়-প্রেমিক রাধানাথ বিবাহ করেননি। পদত্যাগের পর তিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। ১৮৫৪ সালের ১৬ই আগস্ট প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় চলিত ভাষায় প্রথম বাংলা সাময়িক 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। তিনি যেমন ল্যাটিন ও গ্রীক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন, তেমনি জরিপ এবং গণিতের কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করে গেছেন। তিনি তৎকালীন বহু সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে সাতান্ন বছর বয়সে রাধানাথ দেহত্যাগ করেন।

রাধানাথের পরেই হিমালয় প্রসঙ্গে যে বীর বাঙ্গালীর কথা মনে পড়ছে, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র দাশ। রাধানাথ বিশ্বের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট আবিষ্কার করেছিলেন আর শরৎচন্দ্র সহযাত্রী হরিরামের সঙ্গে মাউণ্ট এভারেস্টের সব চেয়ে কাছে পৌঁছেছিলেন। পরবর্তীকালে এভারেস্ট অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন জে. বি. নোয়েল তাঁরই উল্লেখিত পথে এভারেস্ট অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'I planned the route from the writings of Sarat Chandra Das...journey of Hariram and that of Sarat Chandra Das were the nearest appoaches made to Mount Everest.' তিনি শরৎচন্দ্রকে 'The hardy son of soft Bengal' বলে অভিহিত করেছেন।

সে যুগে শরৎচন্দ্র হিমালয়ের এমন উচ্চতায় উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে তাঁর আগে কেউ পৌঁছতে পারেননি। তিনি বিনা সাজ-সরঞ্জামেই এই উচ্চতায় আরোহণ করতে সমর্থ হন। শরৎচন্দ্র তাঁর তিব্বতী ভাষা-শিক্ষক ও বন্ধু উগায়েন গিয়াৎসু ও শেরপা ফরচুঙ্গের সঙ্গে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সিকিম হয়ে নেপালের কাংলা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। তারপরে কাংবাচেন উপত্যকা অতিক্রম করে ২০,২০০ ফুট উঁচু জংসং লাতে পৌঁছান। সেখান থেকে ছোর্টেন নিমা গিরিপথ দিয়ে তাঁরা তিব্বতের শিগাৎসে পৌঁছান। এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথাপ্রসঙ্গে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ লিখে গেছেন—'This is one of the boldest journeys on record in that part of the world, and crossing of the Jongsong La, a high glacier pass, was a great feat.'

দু বছর বাদে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র কাংবাচেন গ্রামের উত্তরদিকে অবস্থিত নাংগো গিরিপথ অতিক্রম করে লাসায় গিয়েছিলেন। দুটি অভিযানেই তিনি এভারেস্টের ৪০/৪৫ মাইলের মধ্যে পৌঁছেছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি তিব্বত হয়ে পিকিং যান।

১৮৮৭ সালে তিনি বিলেতের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির পুরস্কার পান। দু বছর বাদে সেই সোসাইটি তাঁর তিব্বত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করেন। ১৯০২ সালে Tibetan English Dictionary লেখা শেষ করেন। শরৎচন্দ্র এই অভিধানে তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানসমূহ এবং তৎকালীন তিব্বতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থখানি আজও হিমালয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। ১৯১৭ সালের ৫ই জানুয়ারী ৬৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

ডাকবাংলোয় ফিরে এসে দেখি বীর সিং ও রামচাঁদ এসে গেছে। কিন্তু ঘোড়াওয়ালা আসেনি এখনও। আমাদের দেখে রামচাঁদ ধমক লাগায়, "কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ?"

"একটু বিশ্রাম-ভবনে গিয়েছিলাম।" অসিত বিচলিত।

"কেন ?"

"এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে।"

"দেখাটেখাগুলো কাল সেরে রাখতে পারেন নি ? কাল তো সারাদিন ছিলেন এখানে।" রামচাঁদ কৈফিয়ত চায়।

অসিতের অবস্থা দেখে দুঃখ হচ্ছে। তাই সবিনয়ে রামচাঁদকে বলি, "কিন্তু তোমার ঘোড়াওয়ালা যে এখনও আসে নি।"

"আসে নি। তবে যদি এসে যেত !"

ও হরি ! যদি এসে যেত, তাহলে কি হত—তাই ভেবে এতক্ষণ আমাদের শাসন করছিল আমাদের পদপ্রদর্শক। তবু চুপ মেরে যেতে হয়। জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না।

যে কারণেই রামচাঁদ আমাদের শাসন করে থাক, তার সকল অনুমান ব্যর্থ হল। আধঘণ্টা কেটে গেল তবু ঘোড়াওয়ালা দর্শন দিল না। ইতিমধ্যে ত্রিশূল রূপোলী রং ধারণ করতে শুরু করেছে। তার গায়ের কলঙ্ক চিহ্নকটি অদৃশ্য হয়েছে। সে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এর পরেই সে তপ্ত ত্রিশূলের রূপ নেবে। সেই অপরূপ সংহার রূপের সামনে বিশ্বসংসারের অশুভ শক্তি মাথা নত করবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অপরূপকে দর্শন করার সৌভাগ্য হল না আজ। সুজল ও মোহিত দাঁড়িয়েছিল পথের ধারে। হঠাৎ ওরা চেঁচিয়ে উঠল, "এসে গেছে !"

আমরাও বারান্দা থেকে ছুটে এলাম ওদের কাছে। হ্যাঁ, সত্যই সস্ত্রীক ঘোড়াওয়ালা এসে গেছে। কিন্তু তার তো চারটি ঘোড়া আনার কথা। পাঁচটা এনেছে কেন ? নিশ্চয়ই কারণ আছে। কিন্তু কি কারণ ? এলেই জানা যাবে।

ওরা উঠে এল ওপরে। ঘোড়াগুলো দাঁড় করালো বারান্দার সামনে। আশ্চর্য, রামচাঁদ এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য একটুও শাসন করল না তাকে। বরং মুচকি হেসে স্বামী-স্ত্রীকে অভিনন্দিত করল। অসিত জিজ্ঞেস করে রামচাঁদকে, "চারটে ঘোড়া আনার কথা ছিল, পাঁচটা এনেছে কেন ?"

"দরকার আছে বলে।" রামচাঁদ জবাব দেয়।

"মানে ?" অসন্তুষ্ট অসিত জিজ্ঞেস করে।

"মানে, কাল রাতে আপনাদের মালের বহর দেখে আমিই ওকে পাঁচটা ঘোড়া আনতে বলেছি।"

"কিন্তু মালপত্র সব ওজন করে দেখেছি, চারটার বেশি ঘোড়ার দরকার নাই আমাদের।"

সহসা হেসে ফেলে রামচাঁদ। অসিত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। হাসি থামিয়ে রামচাঁদ বলে, "ওজন দিয়েই যদি ঘোড়ার হিসেব করা যেত, তা হলে তো কথাই ছিল না। ঘোড়া বা কুলির হিসেব করার সময় মালের চেহারাটাও মনে রাখতে হয়।"

অসিত চুপ করে থাকে। বুঝতে পারে, যুক্তির জাল বিস্তার করা বৃথা। কারণ আমাদের মাল সবই ছোট ছোট কিটব্যাগে। তাদের চেহারা মোটেই ভয়াবহ নয়। তা ছাড়া রামচাঁদ কাল রাতে তো মালপত্র দেখে নি। আসলে রামচাঁদ ঘোড়াওয়ালার বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা

করছে। যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয়, তাহলে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কি?

বীর সিং মালপত্র সব বুঝিয়ে দেয় ঘোড়াওয়ালাকে। রামচাঁদ গিয়ে ঘোড়াওয়ালাকে সাহায্য করতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে অসিত বলে, "আর তো এখানে আমাদের কোন দরকার নেই। বেলা নটা বাজে। চোদ্দ মাইল হাঁটতে হবে আজ। আমরা কি আস্তে আস্তে এগোতে থাকব?"

"আস্তে কেন জোরেই যান না।" একবার হাসে রামচাঁদ। "আমরা আপনাদের ধরে ফেলব।"

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে কেউ না গেলে...."

অসিত শেষ করতে পারে না, তার আগেই রামচাঁদ চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি গেলে এদিকে দেখবে কে? আর সঙ্গে যাবার দরকারই বা কি?" রামচাঁদ যেন বিস্মিত হয়।

"আমরা যে রাস্তা চিনি না।"

"চিনবার কি আছে? সোজা রাস্তা।"

"তা হলেও তোমাদের একজনকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমরা বীর সিংকে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি ঘোড়ার সঙ্গে এসো।"

এবারে অসিতের কণ্ঠস্বর শুনে রামচাঁদ বোধ করি আর অমত করতে সাহসী হয় না। তবে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, "বেশ, বীর সঙ্গে যাক্ আপনাদের। আমি আসছি পেছনে। আপনারা দেখছি পাহাড়ী পথকে বড়ই ভয় করেন।"

আমরা ওর উক্তির কোন প্রতিবাদ না করে বীর সিংকে নিয়ে রওনা হই নিচে।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দেখি শাদীলালজীসহ সবাই অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। অপেক্ষা করছেন আমাদের বিদায় দিতে—দুর্গম পদযাত্রার প্রাক্কালে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে। ওদের সবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পর্যন্ত নেই। যাঁদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছে তাঁরাও মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে আমাদের অপরিচিত ছিলেন। অথচ পরমাত্মীয়ের মতো তাঁরা করমর্দন করেন, আলিঙ্গন করেন। শুভার্থীদের সকল শুভেচ্ছা সম্বল করে আমরা এগিয়ে চলি উৎরাই পথে। চলি নন্দকিশোরী দেবল ও বগরিগড়ের পথে, দুর্গম গিরি-কান্তারে অবস্থিত মরণ-হ্রদ রূপকুণ্ডের পথে।

॥ দশ ॥

গোয়ালদাম বাজার পড়ে রইল ডানদিকে, আমরা বাঁদিকের উৎরাই পথে চললাম এগিয়ে। সবার আগে চলেছেন দেবকীদা ও অমিতাভ। সবার শেষে সুজল মোহিত ও দাশু। মাঝখানে আমি অসিত ও বীর সিং। আমরা চলেছি রূপকুণ্ডে। গোয়ালদাম থেকে ৪৩ ½ মাইল। তিনটি ভাগে বিভক্ত এই পদযাত্রা—গোয়ালদাম থেকে ওয়ান, ওয়ান থেকে বাগুয়াবাসা কিংবা হুণিয়াথর, সেখান থেকে রূপকুণ্ড। গোয়ালদাম থেকে ওয়ান ২৫ মাইল। সেখান থেকে বাগুয়াবাসা ১৫ মাইল। আর বাগুয়াবাসা থেকে রূপকুণ্ড যাওয়া আসা ৭ মাইল। পঞ্চম দিনে পৌঁছনো যায় সেই মরণ-হ্রদের তীরে। আমাদের বেশি লাগবে। কারণ উপেনবাবুর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ওয়ানে। গোয়ালদামের উচ্চতা ৬৫০০ ফুট, রূপকুণ্ড ১৬,০০০

ফুট। অর্থাৎ সাড়ে ন'হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে আমাদের কিন্তু চড়াই ভাঙ্গতে হবে অনেক বেশি। আজই আমরা দু হাজার ফুট নেমে যাচ্ছি, ৪৫০০ ফুট উঁচু নন্দকিশোরীতে পৌঁছচ্ছি। তারপরে আবার দেড় হাজার ফুট চড়াই ও পাঁচশ ফুট উৎরাই ভেঙ্গে পৌঁছব ৫৫০০ ফুট উঁচু বগরিগড়ে। গোয়ালদাম থেকে নন্দকিশোরী ৫ মাইল, সেখান থেকে দেবল ২ মাইল। দেবল থেকে বগরিগড় ৮ মাইল।

ফুট চারেক প্রশস্ত পথ। চীর ও দেওদার বনের মধ্য দিয়ে স্যাঁতস্যাঁতে উৎরাই পথ। দুধারে ভুট্টা ও রামদানার ক্ষেত। এরা রামদানাকে বলে চুয়া। হিমাচলেও দেখেছি তাই বলে। মাঝে মাঝে বাড়িঘর। ঘরের মানুষরা আমাদের দেখে পথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সবিনয়ে তারা জিজ্ঞেস করে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি।

উত্তর শুনে খুশি হয়। একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়। তারপরে হাত জোড় করে নিজেদের জীবনদেবতার কাছে আমাদের নির্বিঘ্ন যাত্রার জন্য সকরুণ আবেদন জানায়। ওদের আন্তরিক শুভেচ্ছাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করে আমরা এগিয়ে চলি।

উৎরাই-পথে নেমে আসার পর থেকে আর ত্রিশূলকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি না তুষারমৌলি হিমালয়কে। সামনের বনের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়েছে। অথচ ত্রিশূলের পদপ্রান্তে পৌঁছবার জন্যই আমাদের এই পদযাত্রা। দূরকে কাছে পেতে হলে, তাকে ক্ষণেকের তরে আরও দূরে ঠেলে দিতে হয়। পাওয়া আনন্দের, কিন্তু হারিয়ে পাওয়া পরমানন্দের। বিরহহীন মিলন অসম্পূর্ণ।

সাধারণতঃ হিমালয়ের পথ হয় নদী কিংবা ঝর্ণার ধার দিয়ে। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত নদী পাই নি পথে। আমরা চলেছি তেমনি সঙ্কীর্ণ ও উৎরাই বনপথে। আমরা যে গিরি-কান্তারে এসেছি।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে একটি বড় ঝর্ণার পারে এলাম। এখানেই সাক্ষাৎ হল নির্মিয়মাণ মোটরপথের সঙ্গে। জায়গাটার নাম চিরঙ্গা—একটি ছোট গ্রাম। হাঁটাপথে গোয়ালদাম থেকে তিন মাইল। কিন্তু মোটরপথ এসেছে দশ মাইল ঘুরে। মোটরপথ যাচ্ছে গোয়ালদাম থেকে দেবল। অদূর ভবিষ্যতে রূপকুণ্ড পথযাত্রীদের আর সাতাশি মাইল চড়াই উৎরাই ভাঙতে হবে না। হিমালয়যাত্রীদের কাছে গোয়ালদামের মূল্য যাবে কমে।

ছোট কাঠের পুল পেরিয়ে আমরা সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনীর অপর তীরে এলাম। এগিয়ে চললাম উৎরাই-পথে। পথ ও প্রকৃতি রইল অপরিবর্তিত। তেমনি গহন বনের মধ্য দিয়ে সঙ্কীর্ণ স্যাঁতস্যাঁতে পথ। একটি লোক নালা থেকে সাতটা ছোট ও মাঝারি মাছ ধরেছে। দেখে আর লোভ সামলাতে পারে না সুজল। বলে, "একবেলা বেশ ভাল চলে যাবে আমাদের।" তারপরেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, "কত দিতে হবে ভাই?"

"দেড় টাকা।"

সুজল লাফিয়ে ওঠে। বাংলায় বলে, "অসিতদা, মোটে দেড় টাকা চাইছে, নিয়ে নেওয়া উচিত।"

নির্দয় নেতা সম্মত হয় না। বলে, "বগরিগড় এখনও এগারো মাইল। কখন পৌঁছব ঠিক নেই। অযথা মাছগুলো পচিয়ে কি হবে বলতে পারিস?"

অকাট্য যুক্তি। সুজল প্রতিবাদ করতে পারে না। সে বেজার মুখে এগিয়ে চলে।

একটু এগিয়েই চড়াই-পথের দেখা পেলাম। চড়াই ও উৎরাই দুইকে নিয়েই হিমালয়ের পদযাত্রা। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অসম্পূর্ণ। তাই যে কোন একটির অভাবে পদযাত্রী

পথের প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। কেবল চড়াইয়ের মতো কেবল উৎরাইকেও ভাল লাগছিল না আমাদের। এবারে চড়াই পেয়ে খুশি হলাম। তবে এ চড়াই বড়ই সহজ। তবু ভাল লাগছে—'নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল।'

একটু এগিয়েই একটা নদী। নদীর ওপরে পুল নেই। থাকার দরকারও নেই, কারণ নদীতে জল নেই। জলের নয়, পাথরের নদী। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও একটি দুটি ক্ষীণ জলরেখা বয়ে যাচ্ছে ছলছল করে। পাথর থেকে পাথরের ওপরে সাবধানে পা ফেলে, জিমন্যাস্টিকের কসরৎ করে, প্রভূত পরিশ্রমের পরে আমরা পাথুরে নদী পেরিয়ে এলাম।

আমরা পেরিয়ে এলাম নির্বিঘ্নে। কিন্তু পাথর ডিঙোতে গিয়ে পড়ে গেল অসিত। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটল দুর্ঘটনাটা। তার হাতখানি খুলে এলো কাঁধ থেকে। ছোটবেলায় কুস্তি করত অসিত। কুস্তির সময় একদিন তার হাতখানি খুলে যায়। এখনও ঠিকমত জোড়া লাগে নি। আকস্মিক চোট লাগলেই এমনি হয়। আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু বিচলিত হলো না অসিত। প্রথমে তার পিঠ থেকে রুকস্যাকটা খুলে নিতে বলল, তারপরে নিজেই ভাঙ্গা হাতখানি চেপে ধরল কাঁধের সঙ্গে। সুজল ও দাশু ছুটে গিয়ে হাতখানি ধরল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে হাতটা আবার কাঁধে লেগে গেল। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অসিত হাসতে হাসতে এগিয়ে চলল। বীর সিং তার রুকস্যাকটা তুলে নিল নিজের কাঁধে।

বেলা এগারোটার সময় নন্দকিশোরীতে পৌঁছলাম। পিণ্ডার নদী-বিধৌত বর্ধিষ্ণু গ্রাম নন্দকিশোরী। পিণ্ডারের বেলাভূমি বড়ই সুন্দর। দু তীরেই খড়িমাটি। মনে হয় শ্বেতপাথর। মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে সুনীল জলরাশি। মনে হচ্ছে মর্মরের মাঝে সদাচঞ্চল নীলধারা।

নদীর তীরে শিব ও ভগবতীর প্রাচীন মন্দির। প্রাচীনতর একটি পাথর-বাঁধানো বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি। মন্দিরে রয়েছে কয়েকটি কষ্টিপাথরের প্রতিমূর্তি। জন্মাষ্টমী ও নন্দাষ্টমীতে মেলা বসে মন্দির-প্রাঙ্গণে।

পথের পাশে কয়েকটি চা ও ভাজির দোকান। দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চি। তারই ওপরে বসে ছোলাভাজা ও চা খেয়ে নিই। একটু বিশ্রাম করে আবার পথ চলা শুরু করি।

নন্দকিশোরী চারিপাশের গ্রামসমূহের বাণিজ্যকেন্দ্র। থরালী ও গোয়ালদাম থেকে মহাজনরা মাল নিয়ে আসেন এখানে। এখান থেকে চালান যায় চারিপাশের গ্রামে। গ্রামবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ ভাল। এখানেও শাদীলালজীর মতো একজন দোকানদার-কাম-পোস্টমাস্টার রয়েছেন।

নন্দকিশোরীর পরে পথ কিছুদূর সমতল। তারপরে চড়াই। নন্দকিশোরী থেকে দেবল দু মাইল। দেবলের উচ্চতা ৬০০০ ফুট। তার মানে দু মাইলে আমাদের দেড় হাজার ফুট চড়াই ভাঙ্গতে হবে।

একটু বাদেই আর একটি গ্রাম। বীর সিং দূরের একটি বাড়ি দেখিয়ে বলে, "ঐ আমার মকান।"

"তাই নাকি ?" আমরা ভাল করে চেয়ে দেখি।

"চলুন না, একটু ঘুরে আসবেন।" বীর আমাদের নেমন্তন্ন করে।

কি বলব ! গিরি-কান্তারের যাত্রী ঘরের কাছে এসেছে। মন বলছে, একবার ঘর থেকে ঘুরে এসো, ঘরণীকে দেখে যাও। কিন্তু নির্দয় আমাদের নেতা। মৃদু হেসে বীরকে বলে, "এখন নয় বীর, দেরি হয়ে যাবে। সময় পেলে ফেরার পথে নিশ্চয়ই তোমার মকানে যাব।"

আবেগবিহীন নেতার সিদ্ধান্তে মনে মনে বীর যত ব্যথাই পাক, মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে সে বলে, "বেশ তাই হবে।" হাসতে হাসতেই এগিয়ে চলে বীর সিং। সব সময় ওর মুখে মৃদু হাসি লেগে আছে। হাসতে পারা মানুষের মহৎ গুণ। কবিবর সুকুমার রায়ের 'রাম গরুড়' সকল দেশের, সকল কালের মানুষদের কাছে বিপদ স্বরূপ।

ছোট গ্রাম পূর্ণা। চারিদিকে চীরবন। পথের পাশে কোন দোকান নেই। আমরা গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি।

ওপর দিয়ে আর একটি পথ। ঐ পথটিও লোহাজঙ্গ গেছে। কিন্তু ওপথে কোন দোকানপাট কিংবা লোকালয় নেই। তাই আমরা স্বর্গের পথ পরিহার পরে মর্ত্যের পথে হেঁটে চলেছি।

পূর্ণার পর পথের প্রকৃতি পরিবর্তিত হল। পথের পাশে রঙ্গীন ক্ষেত। ক্ষেতের শেষে বহুদূরে পাহাড়ের রেখা। বন ক্রমেই হালকা হচ্ছে।

পিণ্ডার নদীর ঝুলন্তপুল পেরিয়ে আমরা নন্দকিশোরী পৌঁছলাম। পিণ্ডার নদী পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে সৃষ্ট হয়ে খাতি থেকে এসেছে নন্দকিশোরী। এখান থেকে চলে গেছে কর্ণপ্রয়াগ—অলকানন্দায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডারী নদীর নাম পিণ্ডারগঙ্গা বা কর্ণগঙ্গা। এই নদীর তীর দিয়ে একটি হাঁটাপথ আছে। সেই পথে নন্দকিশোরী থেকে খাতি হয়ে পিণ্ডারী হিমবাহে পৌঁছানো যায়। খাতি থেকে পিণ্ডারী হিমবাহ পর্যন্ত নির্মাণবিভাগের পথ আছে। রূপকুণ্ড থেকে ফিরে আমাদের পিণ্ডারী হিমবাহে যাবার কথা। কিন্তু আমরা এ পথে যাব না। আমরা আবার ফিরে যাব গোয়ালদাম, সেখান থেকে বাসে করে বাগেশ্বর। বাগেশ্বরে মেজর ও প্রাণেশ অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।

নন্দকিশোরী থেকে পিণ্ডার চলেছে আমাদের সঙ্গে—পথের পাশে পাশে। নদী পাশে না থাকলে হিমালয়ের পথে পদচারণা করতে ভাল লাগে না। নদীর কুলুকুলু ধ্বনি জনহীন হিমালয়পথের আবহসঙ্গীত।

সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনতে শুনতে সামান্য চড়াই পেরিয়ে একসময় আমরা এসে পৌঁছলাম একটি বিদ্যালয় ভবনের সামনে। পাইন বনের ভেতর সুন্দর একটি বাড়ি। বীর বলল, এটি মেয়েদের স্কুল। এখান থেকেই দেবল গ্রাম আরম্ভ। আমরা গোয়ালদাম থেকে সাত মাইল হেঁটেছি।"

একটু এগিয়ে বাজার। দেবল বেশ বড় গ্রাম। এখানে ডাকঘর, হোটেল, বনবিশ্রাম ভবন, আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল, পশু চিকিৎসালয় ও প্রসূতিসদন আছে। আছে হেল্‌থ-সেণ্টার, হাই স্কুল ও ইণ্টার কলেজ। অনেক নিচে বয়ে যাচ্ছে কালীগঙ্গা বা কৈলু নদী। এসেছে কৈলু বিনায়ক থেকে। কৈলু ও পিণ্ডারের সঙ্গমে আড়াইশ' বছরের পুরনো ছোট শিবমন্দির। শিবরাত্রির সময় মেলা মেলে মন্দিরচত্বরে।

আগে হিমালয় অভিযাত্রীরা বৈজনাথ থেকে কুলান ও চিরঙ্গা হয়ে দেবল আসতেন। তাঁদের গোয়ালদাম যেতে হত না। নৈনিতালের আবিষ্কর্তা পি. ব্যারন ১৮৪৩ সালে কুয়ারি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে এখানে এসেছিলেন। সেই যাত্রার কথা তিনি লিখে গেছেন তাঁর 'Notes of Wandering in the Himamala' গ্রন্থে। বইখানি ১৮৪৪ সালে আগ্রা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যারন পর্বতাভিযাত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিকারী। তিনি দেবলে মৎস্য শিকারের চেষ্টা করেছিলেন, 'I tried my luck with the fishing rod and fly; but the fish would not bite, and indeed they very seldom do in any of the streams.' শিকারী ব্যারন

মৎস্য শিকারে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ এ অঞ্চলের মাছ ধরার গুপ্ত কৌশলটি জানা ছিল না। এটি বড়ই বিচিত্র। খরস্রোতা নদীনালায় পাথরের বাঁধ দিয়ে সেখানে এক রকমের পাতা ফেলে রাখে। স্রোত এড়াতে দলে দলে মাছ ছুটে আসে সেই আশ্রয়ে। আর এসেই ঐ পাতা খায়। তার পরেই মরে ভেসে ওঠে। অথচ ঐ পাতা খেলে মানুষের কিছুই হয় না। এখনও এখানে প্রচুর ট্রাউট মাছ পাওয়া যায়।

মাম্ দেবল সম্পর্কে লিখেছেন, 'Descending through the terraced tea plantations we entered Garhwal, crossed the river by a fine suspension bridge, and pitched camp at Dewal, a mile or two further up. Here we said good bye to houses, beds table-cloths, and a good many other things for three months.'

বেলা একটা বাজে। ছ মাইল আসতে প্রায় চার ঘণ্টা লেগেছে। পদযাত্রার প্রথম দিন—আমরা ধীরে ধীরে পথ চলছি। তবু ক্লান্তি লাগছে। মাঝে মাঝেই চড়া রোদে হাঁটতে হয়েছে। রাস্তার নিচে একটা ঘরভাড়া নিয়ে সেখানে এসে রুকস্যাক নামাই। তেল সাবান ও গামছা বের করে কলতলায় এসে জড়ো হই।

শীতল জলে স্নান সেরে শরীর স্নিগ্ধ হল—দেহের জ্বালা জুড়ালো। গরম গরম ভাত ডাল ও তরকারী খেয়ে পেটের জ্বালা মিটল। ঢেকুর তুলে আমরা আবার পদচারণা শুরু করি।

সুন্দর গ্রাম দেবল। চক্চকে বাড়িঘর, ছায়াঘন পথ আর শুচিশুভ্র মন্দির।

স্কটিশ অভিযানের নেতা মোহিত হয়েছিলেন দেবলে এসে, 'On either side the hills rose to 10,000 feet, heavily wooded, but never giving us 'a shut in' feeling,....for the eye was at once drawn to a little promontory by the river and caught there by the brilliant white of a temple spire. It gave a lift to the mind and heart, causing head and eyes to lift in sympathy, until—how unexpectedly!—They beheld the snow spire of Trisul shining bright and sudden through the right-hand branch of the Kali. Nowhere else I have seen a temple sited with such inspiring effect. It is small and humble, its white cone catching the sunshine and pointing up, upto where Trisul is, pointing too, pure white too, the one no more beautiful than the other and no less holy.' আমরা শুধু মন্দির-শীর্ষই দেখছি, ত্রিশূল দেখতে পাচ্ছি না—কারণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

পথের পাশে নানা রকমের গাছ। ডালিম গাছ দেখে মোহিত ও সুজল এদিক-ওদিক তাকিয়ে কয়েকটি ডালিম ছিঁড়ে পকেটে পুরল। বীর হেসে বলে, "চুরি করলেন কিন্তু ভোগে লাগবে না।"

"কেন ?" সুজল জিজ্ঞেস করে।

"বড্ড টক।"

"তা হোক্ গে। তিয়াস মিটবে। তোমরা এ ডালিম খাও না ?' মোহিত জিজ্ঞাসা করে।

"না। তবে এ গাছের ছাল খাই।"

"কেন ?" দাশু প্রশ্ন করে।

"ঠাণ্ডায় স্বর বসে গেলে সাফ হয়।"

"বাঃ, বেশ ভাল জিনিস তো। শহরে চালান দিলে দেখছি স্বরবিনের বাজার নষ্ট হবে। গায়করা লুটেপুটে নেবে।"

গল্প করতে করতে পুরনো একটা বড় বাড়ি দেখে অমিতাভ জিজ্ঞেস করে, "এটা কার

বাড়ি ?"

"এটা ছেলেদের স্কুল। ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এ অঞ্চলের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিদ্যালয়।" বীর উত্তর দেয়।

"প্রাচীনতমটি কোথায় ?" দেবকীদা প্রশ্ন করেন।

"ধরালীতে।"

দেবল শেষ হতেই শুরু হল উৎরাই—সামান্য উৎরাই। দেবল থেকে বগরিগড় ৮ মাইল, মাত্র পঁচিশ ফুট নেমে যেতে হবে। তবে পথের প্রকৃতি প্রায় অপরিবর্তিত। তেমনি ক্ষেত আর বন। অনেক নিচে বয়ে যাচ্ছে কৈলু। সব সময়ে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কৈলুর কুলকুল ধ্বনি যাচ্ছে শোনা।

কিছুদূর এসে একটি গ্রাম—কৈল। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও শ্রেণীবিভেদ আছে। এক শ্রেণী হাল ধরতে পারেন, আরেক শ্রেণী পারেন না। তাঁদের পুজো করেই পেট চালাতে হয়। গ্রামের বাইরে কয়েক ঘর রাজপুত ও হরিজন আছেন। রাজপুতদের বলা হয় ব্রিজওয়াল। হরিজনদের মধ্যে আছেন—কর্মকার কারিগর, শিল্পীকার ও সূত্রধর। তাদের সংখ্যা গ্রামের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ।

কৈল গ্রামের শেষে একটি ছোট নালা পেরোতে হল আমাদের। এরা ছোট নালাকে বলে গধেরা, আর বড় নালাকে বলে গড়। পথ তেমনি বনময়। চীর পাইন দেওদার নানা রকমের ছোট বড় গাছ। গাছে গাছে বন বিভাগের নম্বর। আগে টেণ্ডার ডেকে দেরাদুনে বসে বিক্রি হত এইসব গাছ। এখন জেলা সদর চামোলীতেই বেচা-কেনা হয়। ক্রেতা গাছ কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। বিনা ভাড়ায় পরিবহনের কাজ করে পাহাড়ী নদী। বন বিক্রয়ের অর্থ সরকার আত্মসাৎ করেন না, বনাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করেন। গাছের টাকায় গাঁয়ের রাস্তা খাল ও পঞ্চায়েত কোঠি তৈরি হয়।

কিছুদূর এসে একটি ছোট গ্রাম। নাম লোয়ানী।

সহসা বীর কি যেন ইশারা করে। বুঝতে না পেরে আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি। রাস্তার ধারে একটি বেশ বড় বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাড়ি থেকে রেড়িওর শব্দ ভেসে আসছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেডিও শুনতে থাকি। একটু বাদে বীর ফিরে আসে। তার হাতে কয়েকটি কাঁকুড়। আমরা সাগ্রহে তার হাত থেকে কাঁকুড় নিয়ে মহানন্দে খেতে শুরু করি। সুজল হাঁক ছাড়ে, "কমরেড বীর।"

আমরা বলি, "জিন্দাবাদ।"

লোয়ানীর পরে একটি বড় নালা—গসিরগড়। নালা পেরিয়ে বেশ খানিকটা চড়াই ভেঙ্গে ওলাংগুরা—বড় গ্রাম। প্রায় পঞ্চাশ ঘর বাসিন্দা। একটা স্কুল আছে। গ্রামটির অবস্থান বড়ই সুন্দর। বড় একটি পর্বতশিখরকে সমতল করে বাড়িঘর বানানো হয়েছে।

বেলা চারটে কিন্তু কেমন যেন গোধূলির ভাব দেখা দিয়েছে চারিদিকে। এখানে সন্ধ্যা হয় অনেক দেরিতে। আকাশের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারি ব্যাপারটা। কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। তবে কি বৃষ্টি নামবে নাকি ? নামবে কি, নেমে গেছে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। যখন গোয়ালদাম থেকে রওনা হই, তখন ভাবতেও পারি নি বৃষ্টি নামবে। তাই রুকস্যাকের ওজন কমাতে বর্ষাতি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়েছি। হিমালয়ের অস্থির প্রকৃতি আমাদের অচেনা নয়। তবু বর্ষাতি সঙ্গে নিই নি, কারণ রামচাঁদ বলেছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ধরে ফেলবে। অথচ এখন পর্যন্ত তার পাত্তা নেই। বুঝতে পারছি তার কথায়

বিশ্বাস করে ভুল করেছি। আর ভুল করলে হিমালয়ের পথে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

সেই প্রায়শ্চিত্তই করছি আমরা। ভিজতে ভিজতে পথ চলেছি। কিন্তু আর বুঝি এগোনো গেল না। জলের বদলে বরফ পড়ছে—শিলাবৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাধ্য হয়ে পথের পাশে একটা স্কুলবাড়ির বারান্দায় ছুটে এসে আশ্রয় নিতে হয়। বীর বলে—এ গ্রামের নাম লবুয়া।

শিলাবৃষ্টি চলল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। বর্ষার পরে বর্ষাতি এলো। সস্ত্রীক ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে রামচাঁদ এসে উপস্থিত হল। আর এসেই প্রশ্ন করল, "আপনারা এখনও এখানে?"

"কি করব, সঙ্গে বর্ষাতি নেই যে।" অসিত উত্তর দেয়।

"কেন বর্ষাতির কি হল?"

"ঘোড়ার পিঠে রয়েছে।"

"আপনারাও তো ঘোড়ার পিঠে চড়ে এলেই পারতেন।" রামচাঁদ রসিকতা করে। তারপর তিরস্কারের স্বরে বলে, "আপনারা দেখছি, পাহাড়ী পথের নিময়-কানুন কিছুই জানেন না। বর্ষাতি খাবার ও টর্চ সব সময় সঙ্গে রাখতে হয়।"

অপরাধ স্বীকার করে চুপচাপ পথে বেরিয়ে আসি। ঘোড়াওয়ালা এগিয়ে যায়। রামচাঁদ চলতে থাকে আমাদের সঙ্গে।

জলেকাদায় পিচ্ছিল পথ। দেখে দেখে ধীরে ধীরে পথ চলতে হচ্ছে। পথের একপাশে উঁচু পাথুরে জমি আর একপাশে খাদ। দুদিকেই গাছ।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেকও হাঁটি নি। একটা নালা পেরোবার পরে পথটা বাঁক নিয়েছে। আর বাঁক ফিরতেই আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল। হঠাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। অথচ নালার ওপারে বেশ আলো ছিল। পথ চলতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না। বুঝতে পারছি জায়গাটার অবস্থানই আঁধারকে ডেকে এনেছে। অসিত ও অমিতাভর রুকস্যাক থেকে টর্চ বের করা হল। সবার আগে টর্চহাতে চলেছে বীর। তার পেছনে অসিত অমিতাভ আমি ও দেবকীদা। দেবকীদার পরে টর্চ-হাতে রামচাঁদ। সবার পেছনে সুজল মোহিত ও দাশু। সংকীর্ণ ও পিচ্ছিল পথ। সারি বেঁধে একের পেছনে অতি সন্তর্পণে হাঁটতে হচ্ছে অন্যকে। ন'জন মানুষ মিলে অনেকটা জায়গা জুড়ে চলেছি আমরা। দুটি টর্চের আলো আঁধারকে দূর করা দূরে থাক, আরও ভয়াবহ করে তুলেছে দুর্গম আঁধারে পথকে।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরে সুজল—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা, হুঁশিয়ার!
... ...
গিরিসংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথমাঝ?
ক'রে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।'

সুজলের নজরুলগীতি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাশু আবৃত্তি আরম্ভ করে—

'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,

মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্‌-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা॥'

যেভাবে সংগীত ও কাব্য-সরস্বতীর চর্চা চলেছিল, তাতে বাকি পথটুকু শেষ হবার আগে সরস্বতীর সাধনা বন্ধ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবু আমাদের গান ও আবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল, আমাদের কথা গেল ফুরিয়ে। দাশুর আবৃত্তি শেষ হবার পরে মোহিত গলা ভাঁজছিল, কিন্তু তার গান আরম্ভ করার আগেই দেবকীদা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন বীর সিংকে, "কি রকম একটা গন্ধ নাকে আসছে?"

"হ্যাঁ, ভালুর গায়ে গন্ধ।" বীর নির্বিকার ভাবেই উত্তর দেয়।

"ভালুক?" লাফিয়ে ওঠে সুজল।

"কোথায়?" লাফিয়ে উঠি আমরা সবাই।

"হয়ত কাছাকাছি কোথাও আছে। এটা ভালুর জঙ্গল।" রামচাঁদ গম্ভীর স্বরে বলে।

বীর সিং বলে, "দু দিন আগে ঠিক এখানে দুজন মানুষ জখম করেছে।"

আমরা থমকে দাঁড়াই। গা ছমছম করছে।

রামচাঁদ ধমক দেয়, "দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন, দাঁড়িয়ে থাকলে কি ভালু ছেড়ে দেবে?"

"না।" ঢোক গিলে কোনমতে জবাব দিই।

রামচাঁদ বলে, "ভয় কি, আমি সঙ্গে রয়েছি। ওরা আমাকে চেনে, জানে হাতিয়ার ছাড়া আমি কখনও চলা-ফেরা করি না। তাছাড়া এতগুলো মানুষ রয়েছি। একসঙ্গে, প্রত্যেকের হাতে লাঠি কিংবা আইস এক্‌স রয়েছে। এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ওরা কি করবে আমাদের?"

তবু দ্বিধা করতে থাকি আমরা। বীর বলে, "চার-পাঁচজনকে একসঙ্গে দেখলে ওরা কখনও আক্রমণ করে না। আমরা ন'জন রয়েছি। ভালুরা আসবে না আমাদের কাছে। ওদেরও প্রাণের ভয় আছে।"

"চলুন চলুন, আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। দেরি হয়ে যাচ্ছে।" রামচাঁদ তাড়া দেয়।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। বীর চলেছে সবার আগে, রামচাঁদ সবার শেষে। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল দুর্গন্ধযুক্ত সঙ্কীর্ণ পথ। টর্চের আলো খুব সামান্যই সাহায্য করছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলেছি। ক্রমাগত হোঁচট খাচ্ছি, আছাড়া খাচ্ছি। মাঝে-মাঝেই ক্ষীণ জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে বয়ে যাচ্ছে পথের ওপর দিয়ে। জুতো মোজা ও প্যাণ্ট ভিজে যাচ্ছে। কেবল অসিতের প্যাণ্ট ভেজে নি। কারণ সে গোয়ালদাম থেকে হাফ প্যাণ্ট পরে রওনা হয়েছে। এজন্য অবশ্য তাকে তখন অনেক ঠাট্টা সইতে হয়েছে। সুজল ওকে খোকা বলে ডাকছে। এখন আমাদের হিংসে হচ্ছে অসিতের ওপর। বুড়োদের পাতলুন ভিজে গেছে, কিন্তু খোকার হাফপ্যাণ্ট রয়েছে শুকনো।

বীর সিংয়ের ছায়া অনুসরণ করে অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছি। জঙ্গলটা যেন ধীরে ধীরে পাতলা হচ্ছে। হ্যাঁ, পথের পাশে কয়েকখানি বাড়িঘর। বীর সিং বলে, "পিলখাড়া গ্রাম।"

"মানুষজন নেই?"

"আছে বৈকি।"

"সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না তো।'

"সবাই সন্ধ্যার আগে ঘরে ঢুকে দোরে খিল দিয়েছে।"

"কেন ?"

"ভালুকের ভয়ে।"

অসিত বলে, "গ্রামের কারও কাছ থেকে একটা হ্যারিকেন ধার করা যায় না ? কাল ফেরত পাঠিয়ে দেব।"

"চেষ্টা করা যেতে পারে।" রামচাঁদ বলে। সে একটা বড় ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়। ঘরের ভেতরে কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু দ্বার উন্মুক্ত হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সুজল হেসে বলে, "বৃথাই চেষ্টা, অন্তঃপুরবাসীরা মুখ দেখাবে না আমাদের। ওরা ভেবেছে ভালুক মানুষের মতো গলার স্বর করে ওদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে সে ভাবনায় সময় নষ্ট না করে আমরা এগিয়ে চলি। গ্রাম পেরুবার পরে জঙ্গল আবার ঘন হল। এমন ঘন যেন সে কখনও ছিল না। দুপাশের গাছ মাথার ওপরে শাখা মেলেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে এতক্ষণে। তারারা উঁকি মারছে চারদিকে। কিন্তু এ এক ভিন্ন জগৎ, এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না, দেখা যায় না ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে। ক্ষেত-জঙ্গল নদী-নালা পথ ও প্রান্তর সব অসীম আঁধারে একাকার।

সেই সীমাহীন আঁধারের বুক চিড়ে আইস এক্‌স ঠুকে ঠুকে অনুমানে এগিয়ে চলেছি। কেউ কোন কথা বলছি না। তবে পায়ের শব্দ, আইস এক্‌সের শব্দ আর নিঃশ্বাসের শব্দ কর্দমাক্ত পথকে শব্দময় করে তুলেছে। গোড়াতেই রামচাঁদ সবাইকে একসঙ্গে পথ চলতে বলেছিল। এতক্ষণ ছিলামও একসঙ্গে। কিন্তু এবারে কেন যেন ক্রমেই ওরা পেছিয়ে পড়ছে। অসিত অমিতাভ দেবকীদা ও আমি চলেছি বীর সিং-এর সঙ্গে। দাশু মোহিত ও সুজলের সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। ওরা অনেক পেছিয়ে পড়েছে। ওদের সঙ্গে টর্চ নেই, কিন্তু আমাদের শরীরও যে আর বইতে চাইছে না। কোন রকমে পৌঁছতে পারলে বেঁচে যাই। এখন কারও পক্ষে কারও জন্য প্রতীক্ষা করা সম্ভব নয়। আমরা এগিয়ে চলি।

পথের কোথাও কোথাও হাঁটুসমান জল। তীব্র বেগে জল বয়ে চলেছে। জলে পা দিতেই সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে।

কেবলই মনে হচ্ছে পায়ে কোন ঠাণ্ডা জিনিস চলা-ফেরা করছে। হাত দিতেই নরম কিছু হাতে ঠেকে। অমিতাভরও নাকি একই অবস্থা। বীর সিংকে জিজ্ঞেস করি। সে বলে, "জোঁক হতে পারে, এ পথে খুব জোঁক আছে।"

"জোঁক !" লাফিয়ে উঠি, "আগে বলনি কেন ?"

"কি লাভ হত ! বগরিগড় পৌঁছবার আগে তো গা থেকে ছাড়াতে পারবেন না !"

"তা হলে ওরা এতক্ষণ ধরে আমাদের রক্ত খাবে ?"

"কতক্ষণ আর ? আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। ঐ যে লালাজীর দোকানের আলো দেখা যাচ্ছে।"

ঠিকই বলেছে বীর সিং। দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। তাহলে তো আজকের পথ ফুরিয়ে এসেছে। থাক্ গে জোঁক। আগে তো নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছনো যাক্। তারপরে জোঁকের কথা ভাবা যাবে। আমরা চলার বেগ বাড়িয়ে দিই। ছুটে চলি আঁধার থেকে আলোর দিকে।

অপরিচিত লালাজী অভিনন্দন জানান আমাদের। আশ্বাস দেন, "চৌকিদার ডাকবাংলোতেই আছে। সে আপানাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

লালাজীর দোকানে চা ও পুরী-তরকারী থেকে ডাল-আটা, তেল-মশলা সবই পাওয়া যায়। শাদীলালজীর মত লালাজীও বগরিগড়ে অনারারী পোস্ট-মাস্টার। তাঁর দোকানেই খাম-পোস্টকার্ড কিনতে পাওয়া যায়।

দোকানের সামনে নির্মাণ বিভাগের ছোট ডাকবাংলো। চারিদিকে জঙ্গল। একখানি বড় ও একখানি ছোট ঘর। পাশে রান্নাঘর। বড় ঘরখানাই দখল করল অসিত। চৌকিদার দরজা খুলে দিল। মালপত্র এই ঘরেই রেখে দিয়েছে। ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখি, এতেও সবাই হাত-পা মেলে শুতে পারব না। না পারলেই বা উপায় কি ? হাত-পা না মেলেই রাত কাবার করে দিতে হবে। এর থেকে ভাল আশ্রয় নেই বগরিগড়ে। চৌকিদার জানায়—সস্ত্রীক ঘোড়াওয়ালা তার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। রামচাঁদও তার সঙ্গেই থাকবে। কাজেই আমরা বীরকে নিয়ে এ ঘরে থাকতে পারলেই হয়ে যাবে।

অমিতাভ আলো জ্বালায়। আমরা গা থেকে জোঁক ছাড়াতে থাকি। বেশ বড় বড় জোঁক। শরীরের কোথাও কোথাও রক্তপাত হয়েছে। জোঁক ছাড়িয়ে জামা-প্যাণ্ট পালটাতে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। রাত সাড়ে নটা বাজে। ওরা এখনও এলো না। দুশ্চিন্তার কথা। অন্ধকার দুর্গম পথ। ভালুকের জঙ্গল। তবে কি কোন বিপদ হল ?

বাইরে বেরিয়ে আসি। আবার গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ভারী মুশকিলেই পড়া গেল। বীর সিংও চিন্তিত। সে বলে, "আমি বরং ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে একটু এগিয়ে দেখছি, দুটো বর্ষাতি দিন আমাদের। আপনারা চৌকিদারকে নিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করুন। সে জ্বালানি কাঠ দিচ্ছে। ওকে এজন্য কিছু পয়সা দিতে হবে।"

বর্ষাতি ও লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে যায় বীর। চৌকিদারের সঙ্গে অসিত ও অমিতাভ চলে যায় রান্নাঘরে। দেবকীদা বলেন, "এসো আমরা ঘরটা পরিষ্কার করে এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলিয়ে বিছানাগুলি পেতে ফেলি।"

আমরা কাজ শুরু করে দিই। কিন্তু ঠিকমতো মন দিতে পারি না। বার বার ঘড়ি দেখি, বার বার দরজা খুলি। কিন্তু কোথায় ? যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল সীমাহীন আঁধার, কোথাও আলো নেই।

এখনও আসছে না কেন ? কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হতে পারে ? ওরা তিনজনই যুবক। তিনজন লোককে কি ভালুক আক্রমণ করতে সাহসী হবে ? হতে পারে। অন্ধকার দুর্গম পথ, জল পড়ছে। তবে ওরা তো নিরস্ত্র নয়। ওদের সঙ্গে আইস এক্স আছে। আক্রমণ করে থাকলে ভালুক নিশ্চয়ই সুবিধে করে উঠতে পারেনি। দু-একজন হয়ত একটু-আধটু আহত হয়েছে। তাই ওদের এত দেরি হচ্ছে।

আর ভাবতে পারছি না। নানা দুশ্চিন্তায় মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সময় আর কাটতে চাইছে না। সেই কখন বীর বেরিয়ে গেল। তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে। আর এখন ? দশটা বাজেনি ? ঘড়িটা কি বন্ধ হয়ে গেছে নাকি ? আজ বোধ হয় চাবি দিইনি। না, ঘড়ি তো চলছে ঠিকই। তাহলে সময় কাটছে না কেন ?

দরজা খুলতেই মনে হল, বহুদূরে আঁধারের মাঝে একটা আলো নড়া-চড়া করছে। নিজের অলক্ষ্যেই চীৎকার করে উঠি, "সুজল দাশু মোহিত...."

দেবকীদা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে।

বেরিয়ে আসে অমিতাভ, অসিত ও চৌকিদার।

অসিত আবার ডাক দেয়।

এবারে সাড়া মেলে। গলা বুঝতে পারি না। তবে নিশ্চয়ই ওরা। এসময় আর কে আসবে এখানে ?

আমরা ছুটতে শুরু করি। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি, আছাড় খাচ্ছি। তবু ছুটছি। ছুটছি অন্ধকার দুর্গম পথে, ছুটছি ঐ আলোর দিকে। ও আলো আলেয়া নয়। দেয়ালীর রাতে শ্যামাপোকা এমনি করেই ছুটে যায় প্রদীপ-শিখার কাছে। তবে ওরা ছোটে মরণের পানে, আমরা ছুটছি জীবনের কাছে।

একটু বাদেই আমরা ওদের কাছে এসে পৌঁছাই। সে কি, সুজলকে মোহিত আর বীর সিং ধরে নিয়ে আসছে কেন ? তবে কি সত্যই ভালুক ওদের আক্রমণ করেছিল ?

"না", বীর বলে, "ভালুক নয়, নালা পেরোতে গিয়ে পড়ে গেছেন মুখার্জিসাব। আঘাত সামান্য তবে চলতে কষ্ট হচ্ছে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।"

যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ডাকবাংলোয় এসেই ফার্স্ট এড্ বক্স খুলে বসল অমিতাভ। জোঁক পরিষ্কার করে জামা-প্যান্ট পাল্টাবার মধ্যে দেবকীদা কফি বানিয়ে ফেললেন। অসিত ও অমিতাভ সুজলের চিকিৎসায় লেগে গেল। দাশু ও মোহিত কফি খেয়ে বীর সিংয়ের সঙ্গে রান্নাঘরে চলে গেল। বীর সিং বে-সরকারী ভাবে যাই করুক, সরকারী ভাবে সে আমাদের পাচক। দেখা যাক পাচক ঠাকুরের হাতে খিচুড়িটা কেমন হয়।

ভালই হয়েছে। বারো-তেরো ঘণ্টা চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গার পর এই আবহাওয়া আর পরিবেশে কি গরম খিচুড়ি খারাপ লাগতে পারে ? খেতে বসার পরে সুজলকে দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না যে সে অসুস্থ। তাই হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করি, "কি রে, তুই না কিছুক্ষণ আগে চোট খেয়েছিস !"

"তাই তো একটু বেশি খিচুড়ি খাচ্ছি। কাল সকালের মধ্যে শরীরটাকে ঝরঝরে করে তুলতে হবে তো।"

"কিন্তু তুই যেন কাল রাতে বলেছিলি, উপোস দিলেই শরীরটা ঝরঝরে হয় !" দেবকীদা সুজলকে মনে করিয়ে দেন।

"সে থিয়োরিটা এখানে অচল। এখানে যত খাবে, তত বেশি ঝরঝরে হবে।"

ওর নতুন থিয়োরি শুনে হেসে ফেলি। হাসির চোটে আমরাও বেশি খেয়ে ফেলি। হাসির মধ্যেই খাওয়া শেষ হয় আমাদের। রামচাঁদ চলে যায় চৌকিদারের ঘরে। বীর সিং ফায়ার-প্লেসের আগুনটা বাড়িয়ে দেয়। আমরা ভেজা জুতোগুলো রেখে দিই ফায়ার-প্লেসের চারিদিকে। তারপর এসে শুয়ে পড়ি। অসিত হিসেবের খাতা নিয়ে বসে। আর বীর ফায়ার-প্লেসের পাশে বসে আমাদের মোজা শুকোতে থাকে। হিমালয়ের পথে এমন সেবাপরায়ণ বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

॥ এগারো ॥

পাখির গানে ঘুম ভাঙ্গে। আমি কান পেতে গান শুনি। গান থামলে চোখ মেলি। মিঠে রোদে ভরে গেছে ঘর। তাহলে তো অকাল বর্ষণ শেষ হয়েছে। শুধু ঝরণার শব্দ কানে আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। ঘড়ি দেখে চমকে উঠি—নটা বাজে। সবাই ঘুমোচ্ছে, কেবল দেবকীদার শয্যা শূন্য।

ঘরের দরজা খোলা। বোধ হয় বাইরে গেছেন দেবকীদা। আমিও বাইরে বেরিয়ে আসি। পায়চারি করছেন দেবকীদা। জিজ্ঞেস করি, "কখন উঠেছেন ?"

"তা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হবে।"

"কফি বানালেন না ?"

"এইবারে বানাবো। চৌকিদার উনোন ধরিয়ে দিচ্ছে। কফির পরেই রান্না চড়বে। আজ আমরা স্নান-খাওয়া সেরে বের হব।"

দেবকীদা রান্নাঘরের দিকে যান। আমি মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে আসি। একে একে সবাইকে ডেকে তুলি ঘুম থেকে। বীর সিং লজ্জা পায় ঘড়ি দেখে। বলি, "কী আর দেরি হয়েছে ? কাল অত রাতে শুয়েছ।"

বীর সিং চলে যায় রান্নাঘরে। ওরা সবাই মুখ-হাত ধুয়ে নেয়। সুজল অমিতাভকে বলে, "চমৎকার ওষুধ দিয়েছিলেন। খুব ভাল ঘুম হয়েছে। ব্যথাও কমে গেছে।"

একটু বাদে বীর গরম জল নিয়ে ঘরে ঢোকে। দেবকীদা সঙ্গে আসেন। তিনি কফি বানাতে থাকেন। আর তখুনি 'গুড মর্নিং' বলে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে রামচাঁদ।

কফি শেষ করে মোহিত, দাশু ও বীর রান্নাঘরে চলে যায়। আমরা মালপত্র গুছিয়ে ফেলি। ঘোড়াওয়ালা আসে। রামচাঁদ তাকে বুঝিয়ে দেয় সব। সে মাল বোঝাই করতে থাকে। আমরা সামনের ঝরণায় একে একে স্নান সেরে নিই। ঘোড়াওয়ালা চলে যায় মাল নিয়ে। রামচাঁদ ওদের এগিয়ে দেয় ওপরে—বড় রাস্তা পর্যন্ত।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। আমরা তৈরি হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। লালাজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি চড়াই-পথে।

কৈলু বা কোয়েল নদীর তীরে তীরে পথ। চীর ও দেওদারে ছাওয়া পথ। 'বাস' রাস্তা তৈরি হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে 'বাস'-এ করেই মান্দোলী আসা যাবে।

পথের পাশে মাঝে মাঝে গ্রাম পড়ছে। বিচিত্র তাদের নাম—ইছেলী, সুঁইয়াই ও পিলখাড়া প্রভৃতি।

পিলখাড়া গ্রামে উঠেই একটি চীরগাছের গোড়ায় খানিকটা বাঁধানো জায়গা দেখতে পেলাম। বীর বলল—নন্দাযাতের সময় নন্দাদেবীর ডোলা বা পালকি এখানে নামানো হয়।

পাশেই চায়ের দোকান ও একটি দশভূজার মন্দির। নেতা চায়ের দোকানে ঢুকতে দেয় না কিন্তু মন্দিরে প্রণাম করতে তার বোধ করি কোন আপত্তি নেই। অতএব আমরা দেবী দশভূজাকে প্রণাম করি। তারপরে এগিয়ে চলি মান্দোলীর পথে। কৈলু রয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। আমরা চলে এসেছি এপাশে।

ধীরে ধীরে চীর ও দেওদারের চিহ্ন মুছে গেল। গাছপালাহীন পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা ওপরে উঠছি। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। কে বলবে কাল সারারাত অমন দুর্যোগ গেছে। আজ রাতেও যে তেমন হবে না, তাই বা কে বলতে পারে? এখন চারিদিকে চড়া রোদ। চড়াই ভাঙ্গতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তবু চলছি। চলার জন্যেই যে আসা।

মাইল তিনেক এসে একটা পাঠশালার সামনে পৌঁছলাম। এখান থেকে বহুদূরে ছবির মতো দেখা যাচ্ছে গোয়ালদাম। আমরা বগরিগড় থেকে দেড় হাজার ফুট চড়াই ভেঙ্গেছি। এ গ্রামের নাম মান্দেলী—বেশ বড় গ্রাম। উচ্চতা ৭০০০ ফুট।

ছেলে-মেয়েরা ঘাড়-গুঁজে পাঠশালায় পড়াশুনা করছিল। কি কারণে জানি না একজন পড়ুয়া বাইরে এল। এসেই দেখতে পেল আমাদের। আর যায় কোথায়। ইশারা করে সতীর্থদের। একটি দুটি করে গুটি গুটি পড়ুয়া বেরিয়ে আসে বাইরে। গুরুমশায় গর্জন করে ডাকতে থাকেন ওদের। অবাধ্য ছাত্র-ছাত্রীরা আসি বলে দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে। বেত দুলিয়ে গুরুমশায় বেরিয়ে আসেন। এসেই দেখতে পেলেন আমাদের। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ্যতার কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি বেত হাতে এগিয়ে আসেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ছাড়িয়ে আমাদের কাছে এসে হাতজোড় করে নমস্কার করেন। বেতখানি কিন্তু এখনও রয়েছে তাঁর হাতে।

সমস্ত পাঠশালা নেমে এসেছে পথে। ছাত্র-ছাত্রীরা ঘিরে ধরে আমাদের। গুরুমশায় আলাপ করেন। খুশি হন আমাদের পরিচয় পেয়ে। দুঃখিত হন আমরা আজ এখানে থাকব না শুনে। গরম মকাই (ভুট্টা) ও ঠাণ্ডা জল দিয়ে আপ্যায়িত করেন আমাদের। আশ্চর্য এই হিমালয়ের মানুষগুলি। সম্বল সামান্য কিন্তু কি উদার এদের অন্তঃকরণ, কত আন্তরিক এদের আতিথেয়তা।

অতিথিবৎসল এরা চিরকাল। ১৮৪৩ সালে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের আতিথেয়তা দেখে পি. ব্যারণ লিখে গেছেন—

'At the end of almost every lane which led from a village to the main road, a man from it was posted with a lota full of milk, which he never failed to press upon our acceptance with the most gentlemanly courtesy, and was always unwilling to accept any remuneration.'

শতাধিক বছরের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেও ওদের সেই স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। যুগ বিবর্তনের ফলে জল দুধের স্থান নিয়েছে। কিন্তু মানুষগুলোর মন একই রয়ে গেছে।

পথের পাশে ক্ষেত-খামার আর তারই মাঝে মাঝে বাড়িঘর। দু-একটি বাড়ি বেশ বড়। চারিদিকে সারি সারি ঘর, মাঝখানে পাথর বাঁধানো উঠান। উঠানে কাপড় ও কম্বল মেলে দেওয়া হয়েছে, চুয়া শুকানো হচ্ছে। শুকনো চুয়া পেষাই হচ্ছে। গ্রামের পঞ্চায়েত ঘরটিও ভারী সুন্দর। কয়েক বছর আগে আদর্শ গ্রাম হিসেবে উত্তরপ্রদেশ সরকারের পুরস্কার পেয়েছে মান্দোলী।

মেয়েরা কাজ করছে গান গাইছে ক্ষেতে-খামারে, পথে-প্রান্তরে, ঘরে-বাইরে। ফসল তুলছে, কাঠ কাটছে, জল আনছে। আর ছেলেরা চা খাচ্ছে, হুঁকো টানছে, আড্ডা দিচ্ছে। বড় জোর উল বুনছে। রামচাঁদ অবশ্য বলল—বাজারে গেলে নাকি কর্মঠ ছেলেদেরও দেখা মিলবে। কাজের ছেলেরা বাজারে বসছে। বাজার একটু দূরে, গ্রামের ভেতরে।

রামচাঁদ দেখছি গ্রামের মেয়েদের সবাইকেই চেনে। সে ডেকে ডেকে তাদের সঙ্গে

কথা বলে। একটু-আধটু রসিকতাও করে। তারপরে একসময় সহসা আমাদের নির্দেশ দেয়, "আপনারা এই পথে সোজা এগোতে থাকুন, আমি একটু পোস্ট অফিস হয়ে আসছি।"

"পোস্ট অফিস?" বিস্মিত হই।

"হ্যাঁ, এখানে পোস্ট অফিস আছে। এ পথের শেষ পোস্ট অফিস এই মান্দোলীতে। এখানে বাজার ও ডাকবাংলো আছে। ডাকবাংলোয় জায়গা না পেলে বাজারের দোকান কিংবা স্কুলে রাতের আশ্রয় পাওয়া যায়।" একবার থামে রামচাঁদ, তারপরে সে আসল কথাটা বলে, "আমি যাই। আমার একটা জরুরী চিঠি আসার কথা আছে।"

কয়েকটি মেয়ের পেছনে পেছনে রামচাঁদ গ্রামের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। পথটা বড়ই সরু। পাশাপাশি চলা যায় না।

আমরা এগিয়ে চলি নিজেদের পথে। কিছুদূর এসে পথের পাশে বিরাট একটি পাথরের বেদী দেখে দাঁড়িয়ে পড়ি আমরা। বীর আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলে, "নন্দাযাতের সময় যাত্রীরা এখানে রাত কাটান। তাঁরা এই বেদীর ওপরে নন্দাদেবীর মূর্তি নামিয়ে রাখেন।'

নন্দাদেবী গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সর্বশ্রেষ্ঠা আরাধ্যা। তাই বারো বছর বাদে তাঁর রৌপ্যমূর্তি ও ত্রিশূল নিয়ে এক শোভাযাত্রা এই পথে যায় ত্রিশূল পর্বতের দিকে। তাঁদের যাত্রাস্থল রূপকুণ্ড ছাড়িয়ে ১৩,২০০ ফুট উঁচু হোমকুণ্ড। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেন না। এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারলে কুমায়ুনীরা নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন। ১৯৭৭ সালে শেষ যাত্রা হয়েছে। আবার যাত্রা হবে ১৯৮৯ সালে।

নন্দাদেবীর বেদীর শেষে পথও যেন শেষ হয়ে গেল। বীর অবশ্য বলছে, এটাই পথ। কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কেমন করে! বনময় পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র ধারায় বর্ষার জল গড়িয়ে পড়ছে। তারই ওপর দিয়ে খাড়া চড়াই ভাঙ্গছি আমরা। উঠছি এই পাহাড়ের চূড়োয়। ওখানে পৌঁছতে পারলে পরিত্রাণ পাব এই কুৎসিত চড়াইয়ের কবল থেকে।

কিন্তু সে আশা অপূর্ণ রইল। গিরিশিরাটির শেষে এসে বুঝতে পারছি, এর পরেও চড়াই আছে। তবে বীর সিং সামনের গিরিশিরাটি দেখিয়ে আশ্বাস দেয়—ওখানেই আপাতত চড়াই শেষ। ওরই নাম লোহাজঙ্গ। কিন্তু এদিকে যে হাঁটুতে জং ধরে গেল। একটু জিরিয়ে নিয়ে আমরা আবার এগিয়ে চলি।

তবে এগোনো কি সহজ! এও তেমনি, চড়াই, তেমনি পিচ্ছিল। শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। চলার জন্যই যে হিমালয়ে এসেছি, থামার জন্য নয়।

চলার শেষ নেই, কিন্তু চড়াইয়ের শেষ আছে। একসময় আমরা এসে পৌঁছলাম সেই গিরিশিরার শেষে। এলাম লোহাজঙ্গ—ন'হাজার ফুট উঁচু একটি গিরিবর্ত্ম। আমরা মান্দোলী ছাড়ার পরে দেড় মাইলে দু হাজার ফুট চড়াই ভেঙ্গেছি।

গতকাল গোয়ালদাম থেকে রওনা হবার পর যে তুষারমৌলি হিমালয়কে হারিয়ে ফেলেছিলাম, এখানে এসে আবার তাকে পেলাম ফিরে। কেবল ফিরে পেলাম না, পেলাম আরও কাছে, আরও নিবিড় করে।

ভাল করে দেখে নিই নন্দাঘুণ্টিকে। এর আগে এত কাছে আর পাই নি ওকে। নন্দাঘুণ্টি খুব উঁচু শৃঙ্গ নয়। কুমায়ুন হিমালয়ের কনিষ্ঠতম শৃঙ্গ নন্দাঘুণ্টি। তবু তাকে দেখা যায় কুমায়ুনের বহু জায়গা থেকে। মনে হয় ত্রিশূল ও হাতী পর্বতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তারা ওর থেকে অনেক উঁচু। আর সৌন্দর্য! সৌন্দর্যে সে কারও থেকে খাটো নয়। তাই সে আমাদের মন কেড়ে নিয়েছে। আর তাই নন্দাঘুণ্টি থেকেই বাংলার বে-সরকারী পর্বতাভিযান আরম্ভ হয়েছে।

লোহাজঙ্গ গিরিবর্ত্ম হলেও উচ্চতা বেশি নয়। কাজেই কিছু লোক বাস করেন এখানে। বাস করেন বহুদিন থেকেই। তাঁরাই তৈরী করেছেন দুটি ছোট ছোট পাথরের মন্দির। এত ছোট যে ভেতরে প্রবেশ করা কষ্টকর। অথচ অপূর্ব সুন্দর তাদের কারুকার্য। একটিতে শিব-দুর্গার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। স্থানীয়রা বলেন—কালী মাঈজী। আর একটি মন্দিরে মূর্তি নেই। বোধ হয় মূর্তি ব্যবসায়ীরা অপহরণ করেছে। সেটি নিশ্চয়ই আরও সুন্দর ছিল। মন্দিরের নিচে একটি বড় দেওদার গাছের সঙ্গে বিরাট একটা পেতলের ঘণ্টা ঝুলছে।

লোহাজঙ্গ থেকে একটি পথ গেছে বিগুণতাল, ব্রহ্মতাল ও খপলুতালে। আমরা ফেরার পথে এইসব তাল অর্থাৎ হ্রদ-কটি দর্শন করব।

এখানে আছে কয়েকটি চায়ের দোকান। তারই একটিতে বসে বিস্কুট সহযোগে চা খেয়ে নিলাম। চায়ের দোকানে বসেই আলাপ হল একটি স্থানীয় যুবকের সঙ্গে। যুবকটির নাম কলঙ্কিনী।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা আবার চলা শুরু করি। এবারে পথ-রেখা স্পষ্ট। তবে পথের প্রকৃতি ভিন্ন। এতক্ষণ ছিল যেমন চড়াই, এখন তেমনি উৎরাই। লোহাজঙ্গ থেকে ওয়ান প্রায় ৯ মাইল। ওয়ান ৮০০০ ফুট উঁচু। ভেবেছিলাম চার মাইলে হাজার খানেক ফুট নামতে হবে। কাজেই তেমন খাড়া উৎরাই ভাঙ্গতে হবে না। কিন্তু এ যে দেখছি বহু নিচে নেমে গেছে পথ। বুঝতে পারছি এর পরে আবার উঠতে হবে ওপরে।

আস্তে হলেও চড়াইতে মোটামুটি হাঁটতে পারছিল সুজল। কিন্তু উৎরাই ভাঙ্গতে গিয়েই সে হাঁটুতে ব্যথা বোধ করতে থাকল। আমরাও আস্তে আস্তে চলতে থাকি। উৎরাইতে আস্তে চলা বড়ই কষ্টকর। বিশেষ করে পিঠে মাল নিয়ে। আমাদের অসুবিধে বুঝতে পারে বীর। বলে, "আপনারা এগিয়ে যান, আমি মুখার্জিসাবের সঙ্গে আসছি।"

একজনের জন্য সবার দেরি করা ঠিক নয়, বিশেষ করে বীর যখন রয়েছে সুজলের সঙ্গে। কিন্তু আমরা যে পথ চিনি না। রামচাঁদ তো এখনও উদয় হল না। মান্দোলীর মেয়েরা হয়তো তাকে ছুটি দেয় নি। 'ইয়ং হিরো অব্ ফরটিফাইড' আমাদের গাইড। আমরা গর্বিত।

আমরা লজ্জিত। আমরা পথ চিনি না। অচেনা পথে এগিয়ে যাব কেমন করে? বীর ভরসা দেয়, "আমি তো রয়েছি পেছনে। আপনারা এগিয়ে যান। সন্দেহ হলেই আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।" সে পথের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়। আমরা এগিয়ে চলি।

বীর সিং-য়ের নির্দেশিত পথে নেমে চলেছি। নামছি তো নামছিই। এ নামার যেন শেষ নেই। পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। সেই বনের মধ্য দিয়ে পথ। অধিকাংশই চীর ও ঝাঁঝ গাছ। বীর বলেছে ঝাঁঝ গাছ খুব শক্ত। খুব ভাল জ্বলে আর এর পাতা গরুতে খায়। কাজেই এদেশের মানুষের খুব প্রিয় এই গাছ। আরও অনেক রকমের গাছ আছে এ বনে। আছে

ব্রাল। বেশ বড় বড় গাছ। লাল ফুল হয়। ফুলের কেশর খেতে মিষ্টি। আমরা খেলাম। আর এক রকমের গাছে দেখছি গোল হলুদ ফুল। বেশ মিষ্টি গন্ধ। এমন ফুল আর কখনও দেখি নি। পরে জেনেছি, এ গাছের নাম কসনা। এক রকমের গাছে দেখছি অনেকটা আখরোটের মত ফল ধরেছে। এ গাছের নাম পাঙ্গস। খোলস ভেঙ্গে ফেললে কালো পর্দায় ঢাকা একটি সাদা শাঁস পাওয়া যায়। সেই শাঁসটিকে গুঁড়ো করে ওরা কাপড় কাচে। এই গুঁড়োকে বলে পীনা। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-চারটে করে আখরোট গাছও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আখরোট নেই গাছে। সুজলের কথা ভেবে যেমন দুঃখ পাচ্ছি, তেমনি উপেনবাবুর কথা ভেবে আনন্দ হচ্ছে। উপেনবাবু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বহু মাল-মশলা পাবেন এই বনময় পাহাড়ী পথে।

মন-ভোলানো বন। কিন্তু বনের চাইতে বনের পাখি বেশি আকর্ষণ করছে। নানা রংয়ের নানা রকমের ছোটবড় পাখি। কোনটি নীল, কোনটি খয়েরী, কোনটি কালো, আবার কোনটি রং-বেরংয়ের। কোনটি ময়ূরের মতো, কোনটি তিতিরের, কোনটি কোকিলের, কোনটি বা চড়ুইয়ের মতো। পুচ্ছ ও কেশরের কি বাহার ! আর কি সুন্দর কণ্ঠস্বর ! তারা গান গাইছে। সেই সুর বনের পাতায় পাতায় মর্মরিত হচ্ছে, পাহাড়ী পথে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমরা বিহ্বল হয়ে পড়েছি।

তিনটি ছোট ছোট নালা পেরিয়ে দেড় মাইল এসে বাবগড়িগড়—একটি বড় নালা। তীরে বসে একটু বিশ্রাম করি। আর বসেই দেখতে পাই ওদের। মানুষ নয় হনুমান। তবে আমরা সাধারণতঃ যেমন হনুমান দেখি ঠিক তেমন নয়। এদের কেশর সাদা। তাই এখানকার বাসিন্দাদের মতে এরা বালী-সুগ্রীবের ভাই। হনুমানকে এরা বলেন গুণী।

গুণীদের গুণপনা দেখার মতো সময় এখন নেই আমাদের। আমরা গা- ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই। গুণীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি নিজেদের পথে। কিন্তু পথ চলতে চলতে আলোচনা করতে থাকি কুমায়ুনের পশুপক্ষীদের কথা।

কুমায়ুনের গিরি-কান্তার সংকীর্ণ গিরি-সংকট ও সবুজ বনে বোঝাই। কুমায়ুনের তৃণভূমি ঝোপঝাড় ও বড় বড় ঘাসে পরিপূর্ণ। তাই কুমায়ুন প্রাণীসম্পদে সম্পদশালী। নানা বর্ণের, নানা জাতির সংখ্যাতীত পশুপক্ষীদের আনন্দনিকেতন কুমায়ুন।

কুমায়ুনের গিরি-কান্তারে আছে অজগর গোখরো প্রভৃতি বিষাক্ত সাপ। আছে হাতী হায়না হনুমান ও হরিণ, বানর শজারু শেয়াল, বাঘ ভালুক ও লেপার্ড। আছে সেরো মার্তেন মার্মোট কস্তুরী ও লেজহীন ইঁদুর। আছে তুষার-মোরগ, বন-মোরগ, ময়ূর, মুনিয়াল চড়ুই রুবি-থ্রোট, রক্-থ্রাস, রেডস্টার্ট স্টোনচ্যাট্ ডিপার, দাড়িওয়ালা শকুন ও সোনালী ঈগল, আরও কত রকমের পাখি। আছে ট্রাউট মহাশোল প্রভৃতি নানা রকমের মাছ।

মাছ নয়। পাখিদের কথাই প্রথম আলোচনা করছিলাম আমরা। রুবি-থ্রোট বাসা বাঁধে তেরো থেকে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে। মানুষ দেখলে ভারী আনন্দ হয় ওদের। তাই অভিযাত্রীরা যখন তাঁবু ফেলে, ওরা রোজ সকালে গান গেয়ে ঘুম ভাঙ্গায় তাদের। বুগিয়ালে বাস করে নীল রং-য়ের রক্থ্রাস। তারাও রোজ সকালে গান গেয়ে ঘুম ভাঙ্গায় মেষপালকদের। সোনালী ঈগল অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয় অনেক উঁচু পর্যন্ত। তারা মাঝে-মাঝেই তাঁবুর ওপর উড়ে বেরিয়ে অভিযাত্রীদের অভিনন্দন জানায়।

জিম করবেটের অমর গ্রন্থ 'ম্যান ইটারস অব্ কুমায়ুন' নামটি শুনে অনেকেরই ধারণা কুমায়ুন মানুষখেকো বাঘে বোঝাই, আর তারা মনুষ্যরক্ত পানের নেশায় ব্যাকুল হয়ে

কুমায়ুনের পথে ও প্রান্তরে পাগলের মতো পায়চারি করছে। কুমায়ুনে পা দিলেই তারা ঘাড় মটকাবে।

ধারণাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে। কুমায়ুন প্রাণীসম্পদে সম্পদশালী হলেও এখানকার পথে মনুষ্যজীবন বিপন্ন নয়।

ভারতের বন্যজন্তুদের মধ্যে বাঘের স্থান সবার ওপরে। কিন্তু সব বাঘই নরখাদক নয়। নরখাদক না হলে বাঘ অকারণে মানুষকে আক্রমণ করে না। মানুষ যেমন বাঘকে ভয় করে, বাঘও তেমনি মানুষকে এড়িয়ে চলে।

নর-খাদক বাঘের মধ্যেও আবার রকমফের আছে। ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে গাড়োয়ালের দুগ্লোপট্টি এলাকায় একটি নারীমাংসপ্রিয় বাঘ দেখা গিয়েছিল। সে সুবিধা পেলেও পুরুষদের আক্রমণ করত না, কিন্তু মেয়ে দেখলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ত। তিন বছরে সে বহু নারী বধ করেছে।

বাঘ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রাণী। কাজেই তারা বাস করে নিচের দিকে। এসব অঞ্চলে বাঘ আছে কিনা বলতে পারি না। থাকলেও খুবই কম। তবে এ অঞ্চলে আছে স্নো-লেপার্ড, যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি তুষার-চিতা।

বাঘ নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর কিন্তু সে উদার ও সাহসী। সে লেপার্ডের মতো সর্বভুক নয়। এরা উভয়েই বিড়াল জাতীয় প্রাণী—রাতের আঁধারে পরিস্কার দেখতে পায়। উভয়েরই হত্যা করার পদ্ধতি মোটামুটি এক। তবু সাহসের তারতম্যে তাদের শিকারের সময় পৃথক। মানুষখেকো বাঘ মানুষ মারে দিনের আলোয় আর মানুষখেকো লেপার্ড আঁধার রাতে লুকিয়ে লোকালয়ে এসে মানুষ নিয়ে পালিয়ে যায়।

সাধারণের ধারণা স্নো-লেপার্ড মাত্রই মানুষখেকো। তাই এ অঞ্চলের মানুষ ওদের ভয় করে। অথচ ওরা সবাই মানুষখেকো তো নয়ই, বরং মানুষের চেয়েও ভীতু। তাই দিনের বেলা ওরা কখনই লোকালয়ে আসে না। তবে এরা খুবই ধূর্ত। ফলে শিকারীরা এদের সঙ্গে তেমন সুবিধে করতে পারেন না।

বাঘের মতোই স্নো-লেপার্ড মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে মানুষখেকো হয়। অনেক সময়ে বৃদ্ধ বয়সে যখন ছুটোছুটি করে বন্যপশু শিকার করতে পারে না, তখন এরা মানুষ মারে। কারণ পশু মারার চাইতে মানুষ মারা অনেক সহজ। আবার অনেক সময় ব্যর্থ শিকারীর গুলি খেয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ বাঘ বা লেপার্ড নরখাদকে পরিণত হয়।

এ অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রাণী কালো ভালুক। এদের সম্পর্কে মেষপালক গ্রামবাসীরা সর্বদা সশঙ্কিত। এদের থাবা থেকে ভেড়া ও ছাগলকে রক্ষা করার জন্য মেষপালকরা কুকুর পোষে। গ্রামবাসীরাও কুকুর রাখে। যাদের কুকুর নেই তারা সন্ধ্যার আগেই দোরে খিল দেয়। শত ডাকাডাকি করলেও খিল খোলে না।

কুমায়ুনে লাল কিংবা সাদা ভালুক খুবই কম। গাড়োয়ালের উচ্চভূমিতে মাঝে মাঝে লাল ভালুক দেখা যায়।

প্রাণীসম্পদ সম্পদশালী কুমায়ুন, কিন্তু বিবেচনা ও দূরদৃষ্টির অভাবে আমরা এই অমূল্য সম্পদ প্রায় হারাতে বসেছি। কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের গাঁয়ের মেলায় দেখেছি কস্তুরী বিক্রি হচ্ছে। তবে গাঁয়ের মানুষের সাধ্য কি তা কেনে। মহাজনদের দালাল কিনে নিয়ে চালান করছে শহরে। সেখান থেকে রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। ভারত অর্জন করেছে বিদেশী মুদ্রা, যা এখন স্বর্গাদপি গরীয়সী। বর্তমানের মায়ায় আমরা ভবিষ্যৎকে হারিয়ে ফেলেছি। প্রাণীসম্পদে

দরিদ্র হয়ে পড়ছে হিমালয়। কস্তুরী মৃগ আজ অবলুপ্তির পথে।

মনে পড়ছে সেবারের কথা। নীলগিরি পর্বত আরোহণের পরে আমরা গোবিন্দঘাট থেকে বদ্রীনাথ যাচ্ছিলাম। সহযাত্রীরা প্রাচীন পায়ে-চলা পথে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি নির্মিয়মান মোটরপথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা বাঁক পেরিয়ে দেখি কয়েকজন লোক কথাবার্তা বলছে। তাদের একজনের কাছে চার পায়ে দড়ি বাঁধা একটি মৃগশিশু। একটু দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি ঐ মৃগশিশুই তাদের আলোচনার বিষয়। আর সেটি কস্তুরীমৃগ। সেই লোকটি কিছুক্ষণ আগে এটি ধরেছে। এখন বিক্রয় করছে—দরাদরি চলছে। ক্রেতা বলে—বেশ, ছ'টাকা দিচ্ছি।

এবারে বিক্রেতার মন গলে। আমি তাকাই বন্দী মৃগশিশুটির দিকে। সে সজল নয়নে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বোধ করি কিছু প্রার্থনা করে। কী ? সে কি প্রাণভিক্ষা করছে ?

ছ'টাকা কথাটা বার বার আমার কানে আঘাত করতে থাকে। আমি আবার সেই মৃগশিশুর দিকে তাকাই। সে তেমনি করুণ নয়নে চেয়ে আছে। নিজের অলক্ষ্যেই সহসা বলে উঠি, "সাত টাকা।"

বিস্মিত বিক্রেতা আমার দিকে তাকায়। আমি আবার বলি, "আমি সাত টাকা দেব, কস্তুরীমৃগটি তুমি আমাকে দাও।"

ক্রেতা অসন্তুষ্ট হয় আমার আচরণে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি আট টাকা দেব।"

"দশ টাকা!" সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি আমি।

এবারে ক্রেতা রণে ভঙ্গ দেয়। সে বুঝতে পারে, আমি সহজে ছেড়ে দেব না।

দশ টাকার একখানি নোটের বিনিময়ে সেদিন সেই মৃত্যুপথযাত্রী মৃগশিশুটিকে আমি কিনে নিয়েছিলাম। তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলাম। অনুভব করেছিলাম সেই মৃত্যুভয়ে ভীত মৃগশিশুর বুকের স্পন্দন। কিছুদূর এসে একটা জঙ্গলে তাকে দিয়েছিলাম ছেড়ে। মুক্তি পেয়েও পালিয়ে যায় নি সে। যতক্ষণ আমাকে দেখতে পেয়েছে সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর শব্দহীন ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। হয়তো বা আমার মঙ্গল কামনাও করেছে।

জানি না সে আজ কোথায় ? তবু কস্তুরীমৃগের কথা উঠলেই তার কথা আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে তার সেই সকরুণ চাহনি আর সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির কথা।

কস্তুরী মৃগ ছাড়া আরও বহু রকমের হরিণ আছে কুমায়ুনের এ অঞ্চলে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য থার বা বার্কিং ডিয়ার। এদের মাথাটি সরু ও লম্বা। গলায় ও ঘাড়ে কেশর। গায়ের রং কুচকুচে কালো। তবে শৈশবে ওরা অত কালো থাকে না। থার শিশুর রং হয় মেটে কিংবা খয়েরী। সাধারণতঃ থার তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট উঁচু হয়। এদের ওজন হয় প্রায় আড়াই মণ। আর শিং দুটির দৈর্ঘ্য এগারো থেকে ষোল ইঞ্চি।

থারের সংখ্যাও অনেক কমে এসেছে। শীতকালে এরা নিচে নেমে আসতে বাধ্য হয়। শিকারীদের তখন থার মারার মরশুম। গ্রামবাসীরাও রেহাই দেয় না ওদের। তারা থার ধরার ফাঁদ পাতে। তাড়া দিয়ে ক্লান্ত করে ফেলে থারকে। বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে কিংবা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এই নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করে। তারপর এদের চামড়া বিক্রি করে গাঁয়ের মেলায়।

থারের পরেই মনে পড়ছে ছাগজাতীয় প্রাণীদের কথা। বুড়েল বা বড়াল নামে এক রকমের পাহাড়ী ছাগল আছে এ অঞ্চলে। এরা অত্যন্ত চালাক, তাই শিকারীরা খুব সুবিধে করতে পারে না এদের সঙ্গে। ওয়ান ছাড়বার পর থেকে আমরাও নাকি প্রচুর বুড়েল দেখতে পাব

এ পথে। তবে টিলম্যান বা শিপটন যেমন বিরাট বিরাট বুড়েলের দল দেখেছেন, তেমনটি নাকি আর দেখা যায় না আজকাল। আগের চাইতে এদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। কিছু মারা পড়েছে শিকারীদের হাতে, আর কিছু মহামারীতে।

মাঝে-মাঝেই এদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয়। এই মহামারীর কারণটি বেশ বিচিত্র। গ্রীষ্মকালে মেষপালকরা ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে বুগিয়ালে যায়। তখন বুড়েলরা এসে আলাপ জমায় সেই পালিত পশুদলের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে খেলা করে। ফলে পালিত পশুদের কোন সংক্রামক ব্যাধি থাকলে, তা বুড়েলদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। প্রকৃতির কোলে অনন্ত হিমালয়ের বীজানুহীন আবহাওয়ায় বড় হয়েছে তারা। সংক্রামক ব্যাধিকে রুখবার ক্ষমতা নেই ওদের শরীরে। তাই মহামারীতে দলে দলে বুড়েল মারা যায়।

আলোচনাটা আরও কতক্ষণ চলত কে-জানে। কিন্তু সামনে কয়েকজন পথচারী দেখে আমি থেমে যাই। এ পথে পথচারী বড়ই কম। শহরে মানুষদের ভিড়ে পথ চলা যায় না। তাই মানুষের মূল্য বোঝে না রাজপথের পথিক। জনহীন পথের দুঃখ জানে না তারা। সেই দুঃখ ভোগ করছিলাম আমরা। ওদের দেখে তাই আনন্দ হল আমাদের। নিজেদের কথা বন্ধ করে আমরা ওদের কথা শুনতে চাই। জিজ্ঞেস করি, "এ গ্রামের নাম কি?"

ওরা বলেন, "আখোড়ি। ছোট গ্রাম। এখান থেকে একটি পথ চলে গেছে আলিবুগিয়াল।"

বুগিয়াল মানে তৃণভূমি। ছোট বড় ঘাসের ঢেউ খেলানো প্রান্তর। খুব উঁচু-নিচু নয়। হিমালয়ে যেমন নন্দন-কাননের মতো পুষ্পময় উপত্যকা আছে, তেমনি আছে বিস্তীর্ণ তৃণময় প্রান্তর। সাধারণতঃ এগারো-বারো হাজার ফুট উঁচুতে এই তৃণভূমি বা বুগিয়াল হয়ে থাকে। এই সব বুগিয়াল গ্রীষ্মকালে সারা অঞ্চলের পশুচারণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ পথেও তেমনি দুটি বিখ্যাত বুগিয়াল আছে—আলি ও বৈদিনী। উপেনবাবুর প্রধান আকর্ষণ বৈদিনী বুগিয়াল। তিনি এর উদ্ভিদ-সমীক্ষা করবেন। ইতিপূর্বে এ বুগিয়ালের কোন সরকারী সমীক্ষা হয় নি।

আখোড়ির পরে আর একটি গ্রাম—পুলা। এক জায়গায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ছোটবড় ঘর। অথচ মানুষ নেই কোন ঘরে। সব ঘরই বন্ধ। জনশূন্য গ্রাম। এ গ্রামের বাসিন্দারা সবাই এখন ওয়ানে রয়েছে। শীত শুরু হলে তারা চলে আসবে এখানে। পুলা শীতকালীন ওয়ান। হিমালয়ের সর্বত্র এমনি শীতকালীন গ্রাম আছে।

পুলার পর থেকে পথটি ভারী সুন্দর। পথের পাশে গাছপালা আছে কিন্তু আগের মতো ঘন জঙ্গল নেই। পথটি সামান্য চড়াই তবে একেবারে সোজা। ধীরে ধীরে সামনের সবুজ পাহাড়টির ওপরে পৌঁচেছে। মনে হচ্ছে কেউ একখানি বিচিত্র বর্ণের কোমল গালিচা বিছিয়ে রেখেছে।

পাহাড়ের ওপরে যেখানে পথটি গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি গাছ—ঠিক একটি গাছ। জনহীন পথের শেষে প্রতীক্ষারত। কার জন্য? আমাদের জন্য কী? কে জানে?

একক বৃক্ষ আমাদের পথ চলায় নতুন প্রেরণার সঞ্চার করল। সকল শ্রম বিস্মৃত হয়ে আমরা চলার বেগ বাড়িয়ে দিলাম। যত শীঘ্র সম্ভব যেতে হবে ওর কাছে। কোমল গালিচাসম এই যে সরল ও সবুজ সরণি, এ যে আমাদেরই জন্য। ঐ যে একক বৃক্ষ, সে আমাদেরই প্রতীক্ষারত। প্রকৃতি যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের। বলছে—কাছে এসো, আরও কাছে। আমার এই আঁচল জড়ানো বুকের মাঝে—দুর্গম গিরি-কান্তারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পৌঁছলাম এখানে। আর এসেই দু চোখ গেল জুড়িয়ে। দূরে ছবির মত সুন্দর একটি গ্রাম। তা হলে তো আমরা এসে গেছি ওয়ান, প্রায় পৌঁছে গেছি গন্তব্যস্থলে। দিনের যাত্রা হবে শেষ। সকল শ্রমের হবে অবসান। পথপ্রদর্শকের সাহায্য ছাড়াই আমরা এসেছি ওয়ান-এ। কি আনন্দ ! আনন্দের আতিশয্যে সেই একক বৃক্ষতলে বসে পড়ি। প্রাণভরে ওয়ানকে দেখি। ভারী সুন্দর গ্রাম। পথের দুপাশে সারি সারি গাছ—চীর আর অন্যান্য গাছ। দু-একটি গাছে বকফুলের মত অজস্র ফুল ফুটেছে। তবে সে ফুলের রং সাদা নয় বেগুনী। লাল হলুদ ও সাদা রংয়ের ফুলগাছও আছে মাঝে মাঝে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পথের ওপরে ও নিচে বাড়িঘর। অনেকটা করে জমি নিয়ে এক-একটি বাড়ি। একটি বাড়ির সঙ্গে আর একটি বাড়ির দূরত্ব লক্ষ্য করবার মতো। দেখে মনে হচ্ছে সাধারণ পাহাড়ী গ্রাম নয়, যেন কোন বিখ্যাত শৈলাবাস।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেবকীদা বললেন, "কালকের থেকে আজ অনেক তাড়াতাড়ি হেঁটেছি, কি বল ?"

"তা তো হাঁটবই। কাল যে প্রথম দিন ছিল।" অসিত উত্তর দেয়।

"আমরা কি এখানেই বীর আর সুজলের জন্য অপেক্ষা করব ?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

"যদি বৃষ্টি এসে যায় ?" দাশু বলে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মোহিত বলে, "এসে যায় কি, এসে গেল বলে।"

"তাহলে তো আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমরা বরং ডাকবাংলোতে গিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করি।" অসিত উঠে দাঁড়ায়। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। প্রতি বাড়িতেই বাসিন্দাদের সাড়া পাচ্ছি। সন্ধ্যা সমাগমে ঘরে ফিরে ওরা সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই আমরাই কেবল চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, আমাদের কেউ দেখছে না।

না দেখুক। আমরা দেখতে এসেছি। প্রাণভরে দেখে নিই।

ওপরের দিকে একটি বাড়ি দেখে মনে হয় ওটাই ডাকবাংলো। খাড়া চড়াই বেয়ে উঠে আসি ওপরে। আর এসেই বুঝতে পারি, ভুল হয়েছে। ডাকবাংলো নয়, কোন গৃহস্থের বাসগৃহ। কিন্তু এখন আর পালাবার পথ নেই। গুটিচারেক পাহাড়ী কুকুর চারদিক থেকে বন্দী করেছে আমাদের। আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আইস একস উঁচিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করছি আর বৃষ্টিতে ভিজছি। ইতিমধ্যে কৌতূহলী গৃহস্বামী লাঠি হাতে সপরিবারে বেরিয়ে আসেন বাইরে। সব শুনে কিছুক্ষণ হেসে নেন। তারপরে ধীরেসুস্থে জানান—ভুল হয়েছে, এ বাড়িটা যেমন ডাকবাংলো নয়, তেমনি এ গ্রামটিও ওয়ান নয়।

"তাহলে ? এটা কোন্ গ্রাম ?" হতাশ কণ্ঠে নেতা বলে।

"তলওয়ানী। ওয়ান এর পরের গ্রাম। তা আপনারা একটু ঘরে এসে বসুন না, বৃষ্টি কমলে রওনা হবেন।" গৃহস্বামী আহ্বান করেন আমাদের।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আমরা তাঁর পেছনে উঠে আসি ঘরে। ভেতরে এসে তাঁকে সুজল আর বীরের কথা বলি। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর এক ছেলেকে ছাতা দিয়ে পাঠিয়ে দেন বড় রাস্তায়। আমাদের জন্য চায়ের ফরমাস করেন।

চা আসার আগে ওরা এসে গেল। সুজল ভালই আছে। চা খেয়ে কয়েক মিনিট পরে আমরা গৃহস্বামীকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার করে পথে বেরিয়ে আসি। বৃষ্টি প্রায় কমে গেছে। কিন্তু পথ বড়ই পিচ্ছিল। বীর বলে, "বড় রাস্তা দিয়ে গেলে ওয়ান পৌঁছতে প্রায় দু ঘণ্টা লাগবে।"

দু ঘণ্টা ! আমরা হতাশ হয়ে পড়ি।

বীর বলে, "একটা সর্ট-কাট আছে। বড় জোর ঘণ্টাখানেক লাগতে পারে। কিন্তু পথটা তেমন ভাল নয়।"

"আমরা সে পথেই যাব।" সুজল বলে ওঠে।

"জংলা পথ, চড়াই-উৎরাই, জল-কাদা—আপনি পারবেন কি ?"

"নিশ্চয়ই।" সুজল বলে, "গরম গরম চা খেয়েছি, এখন আমার শরীর পুরো ঝরঝরে।"

অতএব আমরা বীরের সঙ্গে তার সর্ট-কাট ধরি। একটু বাদেই বুঝতে পারি সর্ট-কাটের মহিমা। পথ বলে কিছু নেই। বর্ষণসিক্ত পিচ্ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে লতা-পাতা ও গাছের গুঁড়ি ধরে ধরে এগোচ্ছি। কখনও হাঁটছি, কখনও হামাগুড়ি দিচ্ছি; মাঝে-মাঝেই খরস্রোতা পাহাড়ী ঝর্ণা পেরোতে হচ্ছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। জলে নামামাত্র পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে বীর গিয়ে ওপারে উঠেছে। তারপরে আমরা হাত-ধরাধরি করে কোনমতে তার কাছে পৌঁছচ্ছি। সে একে একে আমাদের টেনে তুলছে। রক্ষা যে কালকের মতো জোঁক নেই। কিন্তু অন্ধকার একই রকম। টর্চের আলো সামান্যই সাহায্য করছে। কাল বর্ষাতি সঙ্গে ছিল না। জলে ভিজেছি। আজ বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে ঠিকমতো চলতে পারছি না। কেবলই আছাড় খাচ্ছি।

আধঘণ্টাখানেক চলার পরে বীর জানায় আর তেমন বড় ঝর্ণা নেই পথে, তবে এর পরে চড়াই আরও খাড়াই।

তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে অথবা বুকে ভর করে ওপরে উঠছি। ঝোপঝাড় পেলে সুবিধা হচ্ছে। তাই ধরে সহজে উঠতে পারছি। কিন্তু কাঁটায় হাত ছড়ে যাচ্ছে কিংবা বিছুটির ঘষা লেগে পা জ্বলে যাচ্ছে। তবু চলতে হচ্ছে। থামার উপায় নেই। অবশেষে পাহাড় পেরিয়ে পৌঁছলাম একটা পায়ে-চলা পথে।

পথ তো নয়, মৃত্যুর পরোয়ানা ! জলে কাদায় নিমজ্জিত। একদিকে পাহাড় আর একদিকে খাদ। চলতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে; পা টলছে। এর চাইতে চড়াই অনেক ভাল ছিল। তবে সে ভালর জন্য এখন দুঃখ করে কি হবে ? বর্তমানের চেয়ে বড় সত্য যে কিছু নেই এ জগতে। কিন্তু পা দুটো যেন আর শরীরের ভার বইতে পারছে না।

বীর যে বলেছিল পথে আর কোন বড় ঝর্ণা পড়বে না। সামনে তা হলে ওটা কী ? ঝর্ণা বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে কি আমাদের ওপারে যেতে হবে না ?

বীর হেসে দেয়। বলে, "এটা না পেরোলে ডাকবাংলোয় পৌঁছবেন কেমন করে ?"

"তুমি যে বলেছিলে আর কোন বড় ঝর্ণা নেই পথে। এটাকে তো বেশ বড় বলেই মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, বড় বৈকি। এটা হল গিয়ে লাটুদেবীর নদী। এই নদীর তীরেই লাটুদেবীর মন্দির। আর ওপারেই ডাকবাংলো।"

অগত্যা বীরের পেছনে জলে নেমে পড়ি। যেমন ঠাণ্ডা জল, তেমনি প্রবল স্রোত। তবু কোনমতে হাত-ধরাধরি করে উঠে আসি অপর পারে।

আবার তেমনি পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই-পথ। পাছে আমরা নিরুৎসাহ হই, তাই বীর বলে, "ওপরে উঠলেই ডাকবাংলো, খুবই কাছে।"

আমরা চড়াই ভেঙ্গে ওপরে উঠি। আর উঠেই দেখতে পাই ওয়ান ডাকবাংলো। আমরা ছুটতে শুরু করি। বীর সাবধান করে, "দেখবেন, পথ ভাল নয়।"

কিন্তু কে তার কথা শোনে ! ছুটতে ছুটতে একেবারে ডাকবাংলোর বারান্দায় এসে হাজির হই। সবচেয়ে বিস্ময়কর, সুজলও আমাদের সঙ্গেই ছুটে এসে পৌঁছল এখানে। এখন ওকে দেখে কে বলবে যে কাল সে জখম হয়েছিল, আজও ঠিকমতো পথ চলতে পারে নি। অন্ধ আসে দেবদর্শনে, খঞ্জ আসে গিরিতীর্থে। কোথা থেকে তারা পায় পথ চলার শক্তি ? যিনি দেবের দেব, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনিই শক্তি যোগান দুর্বলকে। হিমালয় যে সেই শক্তিধরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁরই আশীর্বাদে আজ আমরা নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পেরেছি এখানে। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

॥ বারো ॥

ওয়ান একটি সবুজ প্রদীপাকৃতি উপত্যকা। উচ্চতা ৮০০০ ফুট। তিনদিকে বারো তেরো হাজার ফুট উঁচু ধূসর কালো কিংবা সবুজ পাহাড়। পাহাড়গুলির উপরিভাগ বৃক্ষহীন, তাই কালো কিংবা ধূসর তাদের রং। শীতকালে অবশ্য রং পালটায়—তুষারধবল। শুধু পাহাড় নয়, চারিদিকের সব কিছু। এমন কি নিচের এই উপত্যকায় পর্যন্ত ছ-সাত ফুট বরফ জমে যায়।

তাই তখন মানুষ থাকে না এখানে। অধিবাসীরা তুষারপাতের আগেই নেমে যান নিচে। জনহীন ওয়ান অনন্ত প্রকৃতির কোলে ঘুমিয়ে থাকে।

গ্রীষ্মের শুরুতে অধিবাসীরা ফিরে আসেন। ওয়ানের ঘুম ভাঙ্গে। তুষারমুক্ত গ্রাম আবার জনপদে পরিণত হয়।

উপত্যকার তিনদিকের এই পাহাড়গুলির অদ্ভুত সব নাম—তিলবুলি, খামিলা, ফুলকোট, শুকরি ও পট্টি। ডাকবাংলোর সামনের পাহাড়টির নামই পট্টি। এ পাহাড়টির চারটি শিখর। তাই একে ওরা বলেন চারশূল।

ছোট ছোট গাছ, ক্ষেত-খামার আর বাড়িঘরে বোঝাই ওয়ান উপত্যকা। প্রধান পথটি চলে গেছে দেবল হয়ে গোয়ালদাম। ছোট ছোট পথ ওপর কিংবা নিচের থেকে এসে মিশেছে মূলপথে। পাশের পাহাড়ের গায়েও অনেকটা উঁচু পর্যন্ত বাড়ি-ঘর। তার পরে বড় বড় গাছের গভীর বন। বেশ কিছুদূর বিস্তৃত হয়ে হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেছে। হিমালয়ের গাছপালার ধর্ম এই। একটা বিশেষ উচ্চতা পর্যন্ত এক এক জাতীয় গাছ জন্মাতে পারে।

ওয়ানের চারিপাশে আরও কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম আছে। সেই সব গ্রামকে নিয়ে বৃহত্তর ওয়ানের আয়তন বারো বর্গমাইল। এখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পঞ্চায়েত ঘর আছে। রূপকুণ্ডের পথে এটি শেষ জনবসতি।

ওয়ান থেকে একটি পথ গেছে শুকরি হয়ে ভূণা—সাত মাইল। সেখানে একটি বন-বিশ্রাম গৃহ (৯০০০ ফুট) আছে। ভূণা কুটচাষের জন্য বিখ্যাত। কুটগাছে গাঁদা ফুলের মতো ফুল ফোটে। এই গাছের শেকড়কে রোদে কিংবা আগুনে শুকোলে মাটি ছেড়ে যায়। তখন সেই শেকড় থেকে ওষুধ তৈরি হয়। শুকরির উচ্চতা সাড়ে এগারো হাজার ফুট। এই পথেও বাগচো হয়ে পাথর নাচুনি তথা রূপকুণ্ড যাওয়া যায়। আমরা বুগিয়াল দেখবো বলে বৈদিনী হয়ে যাচ্ছি।

সেকালের দেবল থেকে ওয়ানের পথ এবং ওয়ানের প্রাকৃতিক বর্ণনা প্রসঙ্গে এ. এল. মাম্ লিখেছেন, 'The way lay over a depression between Dhunga Bakhtial and Trisul, at the head of river wan, and two short marches brought us to the upper level of the valley where Wan village lies, within easy distance of the Pass,' মাম্ ওয়ান নদী বলতে লাটুদেবীর ঝরণা বুঝিয়েছেন। কাল রাতে আমরা যে ঝরণা পেরিয়ে ডাকবাংলোয় এসেছি, এখন যে ঝরণায় স্নান করতে চলেছি।

মাম্ গিরিবর্ত্ম বলতে কুকিনা খাল বুঝিয়েছেন। ১০,২১০ ফুট উঁচু সেই গিরিপথ পেরিয়ে তাঁরা ঋষি উপত্যকা হয়ে ত্রিশূল পর্বতে আরোহণ করেছিলেন।

ঝরণার তীরে এসে চলা শেষ হল আমাদের। কাছেই ছোট একটি কাঠের কুটির। কুটিরে মানুষ নেই, কিন্তু সে মানুষের স্পর্শবর্জিত নয়। কুটিরে একটি পাথরের প্রদীপ জ্বলছে, কে জ্বালিয়েছে, কেন জ্বালিয়েছে—কিছুই জানি না। কেবল জানি পুণ্যপ্রদীপের পুণ্যরশ্মিতে পুণ্যক্ষেত্র আলোকিত।

বীর বলে—এটি সাধারণ ঝরণা নয়, পুণ্যধারা। নন্দাযাতের সময় নাকি এই জলধারা সাদা হয়ে যায়। স্বর্গ থেকে দুগ্ধধারা মর্ত্যে নেমে আসে। যাত্রীরা সেই স্বর্গধারায় অবগাহন করে পূণ্যার্জন করেন। এখন দুধের নয়, জলের ঝরণা। কিন্তু স্বর্গধারা তো বটেই। স্নান করলে অবশ্যই কিছু পুণ্য অর্জিত হবে। মন তৃপ্ত হবে। কিন্তু ক্ষুদ্র এই জীবনে তো কত পুণ্যক্ষেত্র পরিক্রমা করলাম, কত পুণ্যস্নান করলাম, তবু পুণ্যলোভাতুর মন তো তৃপ্ত হল না। তাই আবার চলেছি রূপকুণ্ডে। এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে। তীর্থের শেষ নেই।

স্নানশেষে শীত কাঁপতে কাঁপতে মন্দির-চত্বরে এলাম। একটি প্রাচীন বৃক্ষতলে দুখানি কাঠের ঘর—মন্দির। বড়টি মূল-মন্দির। দুই মন্দিরেরই দরজা বন্ধ। মূল-মন্দিরের দরজাটি লোহা ও তামা দিয়ে তৈরি। বীর বলে—সোনাও নাকি মেশানো আছে।

বছরে কেবল একদিন এই মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত হয়—বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই এখানে লাটুদেবীর প্রধান পূজা হয়। তখন এখানে মেলা বসে। দূর গাঁয়ের পুণ্যার্থী মানুষ দল বেঁধে মেলায় আসে। তারা কেনা-বেচা করে, নাচ-গান করে। কেবল পুরুষরাই নাচ-গানে অংশ নেয়। মেয়েরা চারপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচ দেখে আর গান শোনে।

মন্দিরের বাইরে বিরাট একটা উনোন রয়েছে। উৎসবের সময় এই উনোনে রান্না হয়। একখানি প্রকাণ্ড পরাতে আটা মাখা হয়। যে ঠিকাদার ডাকবাংলোটি নির্মাণ করেছেন, তিনি ঐ পরাতখানি ওয়ানবাসীদের উপহার দিয়েছেন। বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবে আড়াই সের আটা ও এক সের ঘি-এর ভোগ পান লাটুদেবী। তখন ষোলটি পাঁঠা ও ভেড়া বলিদান করা হয়।

ভাদ্র মাসে এখানে আর একটি উৎসব হয়। এই উৎসবকে বলে আঁঠো পরব। তখন মন্দিরের দরজা খোলা হয় না। কিন্তু উৎসব হিসেবে আঁঠো মোটেই খাটো নয়। গাঁয়ের মেয়েরা তখন নন্দাদেবীর মূর্তি বানিয়ে পুজো করে। তখনও মেলা বসে। ছেলেরা নাচ-গান করে, মেয়েরা দেখে আর শোনে। তবে তখন রাতেও নাচ-গান হয়।

এই সময় পরদেশীদের দেবস্থানে সেবা করা হয়। তখন তাদের উনোন ধরানো মানা। তাঁরা বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ান।

আট দিন আট রাত ধরে উৎসব চলে। ষোল সের আটা আর দু সের ঘি-এর ভোগ দেওয়া হয় লাটুদেবীকে। আট দিনে নব্বইটি পাঁঠা ও ভেড়া বলিদান করা হয়। প্রায় হাজার

দশেক লোক প্রসাদ পায়। দূর-দূরান্ত থেকে পাহাড়ী মানুষরা এখানে আসে। ওয়ানবাসীদের সঙ্গে তারাও ঐ দিন কটিকে হাসি আর গানে ভরে তোলে।

নন্দাযাতের শোভাযাত্রা যখন ওয়ানে পৌঁছয়, তখনও মেলা বসে এই মন্দির-চত্বরে। সে দিনও ওয়ানবাসীদের বড়ই আনন্দের দিন। তবে দিনটি আসে বারো বছর বাদে।

মন্দিরপ্রাঙ্গণটি প্রশস্ত। প্রাচীন বৃক্ষটির পাদদেশে পূজারী পুজোয় বসেছেন। বৃক্ষশাখায় সারি সারি ছোট-বড় ঘণ্টা ঝুলছে। প্রথম সারিতে পাঁচটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারিতে চারটি ও চতুর্থ সারিতে তিনটি ঘণ্টা। কোনটি পেতলের কোনটি কাঁসার কোনটি বা লোহার।

পুজো-শেষে পূজারী দরজার নিচ দিয়ে মন্দিরে ভোগ রেখে দিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমা ছাড়া অন্য কোনদিন কেউ যদি মন্দিরের দরজা খোলে, তাহলে তার নাকি সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত। লাটুদেবীর সর্পটি নাকি পাইন গাছের গুঁড়ির মতো মোটা। সে কিন্তু বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে অদৃশ্য হয়ে থাকে। কারণ সেদিন মন্দির মানুষের জন্য উন্মুক্ত।

পুজোর পরে প্রসাদ নিয়ে আমরা ফিরে এলাম ডাকবাংলোয়। ভিজে জামাকাপড় শুকোতে দিলাম সামনের লনে।

চৌকিদার এসে সেলাম করে। বলে, "রান্না হয়ে গেছে।"

অসিত জিজ্ঞেস করে, "রামচাঁদ এসেছে?"

"না।"

"সে কি! একটা বাজে, এখনও আসে নি! অথচ যাবার সময় বলে গেল এগারোটার সময় আসবে।" অসিত চিন্তিত।

দেবকীদা বলেন, "শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান না করে, খেয়ে নিয়ে মালপত্র বেঁধে ফেল। যারা নিজের বাড়িতে বা অন্যের বাড়িতে লম্বা লিপি লিখতে চাও, তারা কাগজ কলম নিয়ে বস। এর পরে আর রাণার পাবে না। অবশ্য মেঘদূত পেতে পারো।"

সবশেষে শুরু হয় মাল বাঁটা। স্প্রিং ব্যালেন্স দিয়ে তিরিশ সের করে মাল বইবে কুলিরা। স্প্রিংএর ওজনযন্ত্র দিয়ে তিরিশ সের করে মাল ভাগ করে দেয় অসিত। আমরা সেগুলি এক-একটি কিট্‌ব্যাগে পুরে মুখ বেঁধে দিই। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে মাল বাঁধা হয়ে যায়।

পাঁচটার পরে রামচাঁদ দর্শন দেয়। অসিত বলে, "ধন্য হলাম। কিন্তু এত দেরি কেন করলেন প্রভু?"

"কি করব, কুলি না নিয়ে এসে লাভ কি?"

"এনেছো?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"বাইরে।"

বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। একটু মিঠে রোদের পরশ লেগেছে চারিদিকে। কাল আকাশ কি রকম থাকবে কে জানে। এই সুযোগে কয়েকটা ছবি নেওয়া যাক। প্রস্তাবটা পছন্দ হয় অমিতাভর। ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে আমরা দুজনে বেরিয়ে আসি বাইরে। পায়ে-চলা পথটি ধরে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে হেঁটে চলি।

হঠাৎ অমিতাভ বলে ওঠে, "ওখানে কি আগুন লেগেছে নাকি? একটু আগেও যে বৃষ্টি হয়ে গেল।" সে ইশারায় একটা ঝোপ দেখিয়ে দেয়।

ঝোপের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই।

না, আগুন তো দেখা যাচ্ছে না। তাহলে ধোঁয়া উঠছে কেমন করে? নিশ্চয়ই আগুন আছে। আমরা আরও এগিয়ে চলি।

না, আগুন নয় মানুষ। দুজন মানুষ চুপচাপ বসে আছে ঝোপের ভেতরে, মহানন্দে হুঁকো টানছে। বনের আগুন নয়, তামাকের আগুন। এ আগুন নিজেই জ্বলে, কাউকে জ্বালায় না।

কিন্তু হুঁকো টানা তো ফৌজদারী দণ্ডবিধির এলাকায় পড়ে না। এত জায়গা থাকতে ওরা এমন গোপনীয় স্থান নির্বাচন করেছে কেন?

অমিতাভ ও সুজলের সঙ্গে আমি গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছি। পথে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা সেলাম করে। কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি—জিজ্ঞেস করে। প্রায় প্রত্যেকের হাতে উল তৈরীর মাকু কিংবা উল বোনার কাঁটা। সবাই হয় পশম থেকে উল কাটছে, না হয় উল বুনছে। ব্যবসার জন্য নয়, জীবনের জন্যই মাকু কিম্বা কাঁটা ওদের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

ঘুরতে ঘুরতে একটি বেশ বড় বাড়ির সামনে দাঁড়াই। একজন বৃদ্ধ বাড়ির বাইরে এসে হুঁকো টানছিলেন। তিনি আমাদের কাছে ডাকেন। কাছে গেলে হুঁকোটা বাড়িয়ে ধরেন। আমরা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি।

বৃদ্ধ কাশতে কাশতে বলেন, তাঁর বয়স ঊনআশি বছর। এই বাড়িখানি তাঁর। কিছু জমিজমাও আছে। এখন আর নিজে চাষ করতে পারেন না। তবে দেখাশোনা করেন।

"বাড়িতে আর কে আছে আপনার?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

"কেউ নেই!"

"বিয়ে করেন নি বুঝি?" সুজল বলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন বৃদ্ধ। হাসি থামলে বলেন, "বিয়ে করলেই বুঝি বাড়ি বোঝাই হয়ে থাকে আপনজনে?"

লজ্জা পায় সুজল। চট করে কোন কথা বলতে পারে না।

অমিতাভ বলে, "সে কথা বলে নি। আপনি বললেন কিনা, বাড়িতে কেউ নেই। তা তাঁরা বোধ হয় বেড়াতে গেছেন!"

"না, বেড়াতে যাবার জন নেই আমার।" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরটা বড়ই করুণ শোনাচ্ছে। তিনি বলে চলেন, "কেউ নেই। শুধু এ বাড়িতে নয়, জগতের কোথাও কেউ নেই আমার। অথচ একবার নয়, দুবার নয়, পাঁচ-পাঁচবার বিয়ে করেছি আমি।"

ডাকবাংলোয় ফিরে এসে দেখি দুজন সহকারী আর দু-ঘোড়া মাল নিয়ে উপেনবাবু এসে গেছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি সহাস্যে বলে ওঠেন, "সব ঠিক আছে তো?"

এ কথাটা আমাদের নীলগিরি অভিযানের ক্যাম্প-কোড ছিল। অভিযানের নেতা অমূল্য সেন এই অপূর্ব কোডের আবিষ্কর্তা।

হাসতে হাসতে জবাব দিই, "হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।"

"থাকলেই ভাল, নইলে গণ্ডগোল।"

সরল হাস্য-পরিহাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠি আমরা। কর্মহীনতার জন্য বিকেলে যে গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, উপেনবাবুর আগমনে সেটি কেটে গেছে। হাসি আর গল্পে মুখরিত হয়ে ওঠে ডাকবাংলো। আর এমনি সময় গরম কফির কেটলি নিয়ে ঢোকে বীর। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। বীর মৃদু হেসে কফি পরিবেশন করে। আমাদের গল্প চলতে থাকে।

একটু বাদে চৌকিদার ঘরে আসে। আমরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই। সে বলে, "গাঁয়ের মানুষরা দাওয়াই নিতে এসেছে ডগ্‌দর সাবের কাছে।"

আমরা কিছু বলতে পারার আগেই কয়েকজন মেয়েপুরুষ তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। একজন মহিলা তার ছেলেমেয়ের হাত ধরে এগিয়ে আসে উপেনবাবুর কাছে। বিনীত কণ্ঠে তাঁকে বলে, "সাব এই ছেলেটা কেবল বোখারে ভোগে, গায়ে হাত দিয়ে দেখুন—এখনও বোখার আছে। মেহেরবানি করে একটা আচ্ছা দাওয়াই দিন।"

"দাওয়াই....."

উপেনবাবু শেষ করতে পারেন না। মহিলা তার মেয়েটিকে দেখিয়ে বলতে থাকে, "আর আমার এই মেয়েটা, এর কি হয়েছে লাটুদেবী জানেন।" একবার থামে সে। ওপরদিকে মুখ করে চোখ বুজে বোধ করি লাটুদেবীকে স্মরণ করে। তারপরে আবার বলতে থাকে, "মেয়েটার পেটে কিছুই থাকে না, জন্মের পর থেকেই এটা পেটের অসুখে ভুগছে ডগ্‌দর সাব।"

বিব্রত উপেনবাবু কোনমতে বলে ওঠেন, "আমি দাওয়াই দেব কি?"

ইতিমধ্যে ওরা সবাই তাঁকে ঘেরাও করে ফেলেছে। তাদেরই একজন বলে, "আপনি না দিলে কে দেবে সাব। আপনার ঘোড়াওয়ালা বলল, আপনি ডগ্‌দর আছেন, আপনার কাছে বহুত দাওয়াই আছে।"

এইবারে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় আমাদের কাছে। আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে হেসে উঠি। রোগী ও তাদের অভিভাবকরা ঘাবড়ে যায়।

আমাদের হাসি থামলে উপেনবাবু বলেন, "ঘোড়াওয়ালা ভুল বলে নি, আমি ডাক্তার, আমার সঙ্গে ওষুধপত্রও আছে। কিন্তু মানুষের নয়, আমি গাছপালার ডাক্তার, সেসব ওষুধও গাছপালার।"

"ও, আপনি হাকিম আছেন!" একজন গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে।

বাকি সবাই উপেনবাবুকে ভাল করে দেখে নেয়। বোধ করি তাদের জানা হাকিমদের সঙ্গে, তাঁর আকৃতিগত সাদৃশ্যটা মেলাবার চেষ্টা করে।

মিল না পেয়ে একজন হতাশস্বরে বলে, "গাছপালার দাওয়াই আছে, তাই দিন।"

না, উপেনবাবুর মুক্তি পেতে মুশকিল আছে আজ।

শেষ পর্যন্ত অমিতাভ মুশকিল আসানের ভূমিকা নেয়। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে ওদের। তারপরে নিজের হোমিওপ্যাথি বাক্স খুলে ভেবেচিন্তে ওষুধ দেয়। ওরা খুশিমনে ঘরে ফেরে।

॥ তেরো ॥

পদযাত্রার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে আজ। আমরা তাই শেষরাতে শয্যাত্যাগ করেছি। দেবকীদা উঠেছেন সবার আগে। কফি করে আমাদের ডেকে তুলেছেন। আমরা কফি খেয়ে বিছানা ও অন্যান্য জিনিস বেঁধে ফেলি। দাশু আর মোহিতকে নিয়ে বীর রান্নাঘরে চলে যায়। সকালের জলখাবার ও দুপুরের খাবার তৈরি হবে। আমরা জলখাবার খেয়ে, দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে রওনা হব।

আটটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের প্রস্তুতিতে কি এসে যায়। যারা না এলে আমরা অচল, তারা আসে নি এখনও। আসে নি কুলিরা, আসে নি রামচাঁদ। আমরা তাদেরই পথ চেয়ে বসে আছি। জানি না কখন এ প্রতীক্ষার অবসান হবে।

রামচাঁদ এলো বেলা নটার সময়। সে একা আসে নি, কুলিদের সঙ্গে নিয়েই এসেছে। কিন্তু তারা ঘরে ঢুকল না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ডাকবাংলোর বারান্দায়। রামচাঁদ একা ঘরে ঢুকল।

"কি ব্যাপার ? এত দেরি হল তোমাদের ?"

"আর বলেন কেন।" রামচাঁদ একবার থামে। তারপরে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "বেটারা সব শয়তান, বেইমান, নমক-হারাম।"

"কেন কি হল ?" আমরা বিস্মিত।

"সুযোগ বুঝে ব্যাটারা আবার বেঁকে বসেছে।"

"কে বাঁকালো, কাল বিকেলেও তো সোজা ছিল।" সুজল মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

"নিজেরাই বেঁকেছে।" রামচাঁদ বলে, "কাল আপনাদের বলে গেল দৈনিক জনপ্রতি সাড়ে চার টাকা। আজ সকালে বলছে পাঁচ টাকার কমে যাবে না।"

"কতটা মাল বইবে ?" অসিত জিজ্ঞেস করে।

"না, সেদিক থেকে আর কোন গোলমাল করে নি। মাল বিশ সেরই বইবে।"

আমরা আঁতকে উঠি। কিন্তু আশ্চর্য, শান্তস্বরে অসিত বলে, "তাই দেব। তবে মাল নামাবার আগে ওদের একবার ডাকো।"

"কেন ?" রামচাঁদ বিস্মিত হয়।

"আর যাতে না বাঁকে তার একটা ব্যবস্থা করে নিতে চাই।" অসিত শান্ত স্বরে জবাব দেয়।

"না না, আর বাঁকবে কেন ?" রামচাঁদ বলে, "মরদ্‌কা বাত, হাতীকা দাঁত।"

ওর কথা ও ভঙ্গিতে হাসি পায় আমাদের। তবু চুপ করে থাকি।

অসিত বলে, "সেই কথাটাই ওদের সবাইকে লিখে দিতে হবে।"

"লিখে দিতে হবে ? ওরা কি লেখাপড়ার মধ্যে যাবে !"

"না গেলে আমরা ওদের নেব না।"

"না নিলে আপনারা রূপকুণ্ড যাবেন কেমন করে ?"

"যাব না।" অসিত নির্বিকার।

অগত্যা রামচাঁদ বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। যায় তার অনুচরদের কাছে। অসিত রুকস্যাক থেকে কাগজ-কলম বের করে সুজলকে বলে, "দাশুর সঙ্গে পরামর্শ করে হিন্দীতে একটা চুক্তিপত্র লিখে ফেল।"

একটু বাদে অনুচরদের নিয়ে রামচাঁদ ঘরে ঢোকে।

অসিত চুক্তিপত্রটি তার হাতে দেয়। রামচাঁদ সেটি পড়ে কুলিদের বুঝিয়ে দেয়। আর তা শুনে ওরা সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে, "ও সব লেখাপড়ার মধ্যে আমরা নেই।"

"তার মানে তোমরা এটা সই করবে না ?" অসিত ধীরস্বরে বলে।

ওরা উত্তর দেয়, "নহী।"

"বেশ।" একবার থামে অসিত। তারপরে বলে, "তোমরা তাহলে আসতে পারো।"

"মানে ?" রামচাঁদ বলে ওঠে।

"আমাদের কোন দরকার নেই লোকের। আমরা ফিরে যাব গোয়ালদাম। তুমি ঘোড়ার ব্যবস্থা কর।"

রামচাঁদ ও কুলিদের সঙ্গে আমরাও আঁতকে উঠি। তাহলে কি রূপকুণ্ড যাওয়া হবে না? কি বলছ অসিত? কিন্তু এখন চুপ করে থাকতে হবে। আমরা চুপ করে থাকি।

একটু বাদে রামচাঁদ জিজ্ঞেস করে অসিতকে, "আপনারা কি রূপকুণ্ড যেতে চান না?"

"নিশ্চয়ই চাই। না চাইলে এতদূর এসেছি কেন? কিন্তু তাই বলে এদের জুলুম আর সহ্য করতে রাজী নই। স্বামীজী বলে দিয়েছেন চার টাকায় তিরিশ সের মাল বইবে। কাল ঠিক হল সাড়ে চার টাকায় বিশ সের মাল নেবে। আজ বলছে সাড়ে চার নয়, পাঁচ। কাল যে ছ টাকা বলবে না, তারই বা কি স্থিরতা আছে। তাই একটা চুক্তিপত্র লিখে নিতে চাই। লেখাপড়া না করে আমরা কোন কুলি নেব না।"

কি একটু ভাবে রামচাঁদ। তারপরে হেসে বলে, "একবার পাকা কথা দিলে এরা আর নড়চড় করে না।"

"সেই পাকা কথাটাই পাকা করতে চাই।"

রামচাঁদ চট করে কোন জবাব দেয় না। একবার তার অনুচরবর্গের দিকে তাকায়। তারপরে বলে, "তোরা যদি লিখে না দিস, তাহলে সাবরা তোদের নেবেন না।"

ওরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে। তারপরে একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলে, "আমরা যখন রাজী হয়েছি, তখন লিখে দিতে আপত্তি কি। কিন্তু আমরা যে সই করতে পারি না।"

"টিপসই করে দাও।" সুজল কাগজখানি তার হাতে দেয়।

সবার স্বাক্ষর করা হলে ওরা মালপত্রের কাছে এগিয়ে যায়। আর তখুনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উপেনবাবু বলে ওঠেন, "আমি তাহলে রামচাঁদের সঙ্গে একবার লাটুদেবীকে দর্শন করে আসি। চল রামচাঁদ, আমরা ঘুরে আসি?"

"আমাকে যেতে হবে?" রামচাঁদ বিস্মিত।

"একটু পুজো দেব কিনা, তুমি সঙ্গে না থাকলে...তা ছাড়া তুমি আমাদের নিয়ে যাচ্ছ দুর্গম পথে, তোমারও তো একবার লাটুদেবীকে প্রণাম করে আসা উচিত।" উপেনবাবু বলেন।

"বেশ চলুন। কিন্তু এদিকে সাবরা কি মালপত্র ওজন করে দিতে পারবেন?"

"খুব পারব। তুমি নিশ্চিন্তে লাটুদেবীকে প্রণাম করে এসো। এদিককার সব ব্যবস্থা আমরা করে ফেলছি।" দাশু রামচাঁদকে ভরসা দেয়।

"বেশ চলুন।" রামচাঁদের স্বর শুনে বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে অসন্তুষ্ট। নেহাৎ লাটুদেবীর মন্দিরে যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব বলেই সে উপেনবাবুর সঙ্গে যাচ্ছে।

উপেনবাবু মোহিতকে বলেন, "দেখো ভাই, আমার ব্লটিং পেপারটা জন দুয়েক জোয়ান লোককে দিও।"

মোহিত সহাস্যে সম্মতি জানায়। উপেনবাবু রামচাঁদকে নিয়ে বেরিয়ে যান।

উদ্ভিদ সমীক্ষায় ব্লটিং পেপার একটি মূল্যবান সামগ্রী। সমীক্ষার সময় যে সব পাতা কিম্বা ফুলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়, তা যাতে পচে না যায়, তাই এই ব্লটিং পেপার। দুখানি ব্লটিং পেপারের মধ্যে পাতা কিংবা ফুলটি সাজিয়ে নিয়ে, দুদিক থেকে চেপে চেপে তার রসটা শুকিয়ে ফেলতে হয়।

নীলগিরি অভিযানের সময় পিপলকোঠি থেকে জোশীমঠের পথে ধস পেরোবার সময় উপেনবাবুর ব্লটিং পেপার নিয়ে একটি ঘোড়া নিচে পড়ে গিয়েছিল। ঘোড়াটিকে বাঁচানো

যায় নি, কিন্তু ব্লটিং পেপার উদ্ধার করা গিয়েছিল। উপেনবাবু বোধ করি সেই স্মৃতি স্মরণ করেই মোহিতকে সাবধান করে গেলেন।

সুজল ও মোহিতকে সহকারী করে দাশু কুলিদের ম্যাজিক দেখাতে থাকে—ওজনযন্ত্রের ম্যাজিক। প্রত্যেক কুলিকে দেখিয়ে দেয় যে মাত্র বিশ সের মাল বইছে। কেউ ধরতে পারে না যে সবাইকে পঁচিশ সের করে মাল দেওয়া হয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে রামচাঁদ ফিরে এল। আসুক সে, ম্যাজিক শেষ হয়ে গেছে। আমরাও কম যাই নে। তবে মাল ভাগ করে দেওয়ার পরে দেখা গেল, আরও জনতিনেক মালবাহক দরকার।

আলোচনার শেষে রামচাঁদ চলে গেল তিনজন লোক আনতে। কুলিরা মাল নিয়ে রওনা হল। সুজল ও অমিতাভ এখানে অপেক্ষা করবে। তারা রামচাঁদের সঙ্গে পরে আসবে। আমরা আজ বৈদিনীতে তাঁবু ফেলব। চৌকিদার আমাদের দুপুরের খাবার তৈরি করছে। তৈরি হলে খাবার নিয়ে অসিত রওনা হবে। ক্ষিদে পেলেই আমরা পথে বসে পড়ব।

ওয়ান ডাকবাংলো থেকে বিদায় নিলাম। বিদায় নিলাম সুজল আর অমিতাভর কাছ থেকে, বিদায় নিলাম আমাদের নেতার কাছ থেকে, বিদায় নিলাম অতিথিবৎসল চৌকিদার পার সিংয়ের কাছ থেকে। সুজল অমিতাভ ও অসিতের সঙ্গে দেখা হবে কিছুক্ষণ পরে। কিন্তু পার সিং?

ফেরার পথে, আমরা আর আসব না ওয়ান। পাথরনাচুনি থেকে বড়া দেওলডুঙ্গা (১১৫০০) ভুগা ও কুকিনা খাল হয়ে তিনতাল দর্শন করে চলে যাব নন্দকিশোরী। কিন্তু সে কথা বলতে পারি না পার সিংকে। কোনমতে তাকে বলি, "ফির মিলেঙ্গে।"

সেও আবেগজড়িত স্বরে আবৃত্তি করে, "ফির মিলেঙ্গে।" তারপরে আমার হাত ছেড়ে দেয়। আমরা এগিয়ে চলি। ওরা হাত নাড়ে।

সকাল থেকে মিঠে রোদ উঠেছে আজ। তা হলে কি লাটুদেবী সুপ্রসন্না হলেন? নীলগিরি অভিযানের সময়ও লাটুদেবীর পুজো দিয়ে আশাতীত ফল লাভ করেছিলাম। লাটুদেবী গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পরমারাধ্যা নন্দাদেবীর সেবিকা—প্রকৃতির নিয়ন্ত্রী। প্রকৃতির করুণা ছাড়া কোন হিমালয় যাত্রা সফল হতে পারে না।

চকচকে রোদে ভরে গেছে চারদিক। রোদে উত্তাপ আছে। তবু চলতে ভাল লাগছে।

পথ সামান্য চড়াই। পাহাড়ী গাঁয়ের পথ। পথের পাশে ক্ষেত-খামার। ধাপে ধাপে রামদানার ক্ষেত। লাল আর হলুদের মেলা মিলেছে। আমাদের কলহাস্য শুনে আশেপাশের ক্ষেত থেকে ছেলেমেয়েরা আসে পথের ধারে—আমাদের সেলাম করে। আমরা তাদের আনন্দ অভিবাদন গ্রহণ করি। ওয়ান ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি।

ডাকবাংলো থেকে দেড় মাইল এসে রণকধার। 'ধার' মানে পর্বতশ্রেণী আর 'রণক' মানে জমজমাট। মানুষে নয়, প্রাকৃতিক সম্পদে জমজমাট যে পর্বতশ্রেণী তার নাম রণকধার। পর্বতশ্রেণীর প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের কথা বলতে পারি না, তবে এ জায়গাটি সত্যই বড় সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে নানা রকমের ফার্ণ আর ফুল। তারই মাঝে ছোট ছোট গাছে ছাওয়া সবুজ একফালি প্রান্তর। প্রান্তরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে ছোট একটি জলাশয়। চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান এই রণকধার।

রণকধার ওয়ান উপত্যকার প্রান্তসীমা। এখান থেকে প্রদীপাকৃতি উপত্যকাটি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওয়ান ডাকবাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে। তিনদিকে যে পর্বতশ্রেণী দেখতে পেয়েছি

তারই একটি পাহাড়ের উপর উঠে এসেছি আমরা। এখানে চড়াই-পথ শেষ হয়ে গেল। শুরু হল উৎরাই।

পথ বলতে একটি পায়ে-চলা পথ-রেখা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। ঘন জঙ্গল। এত ঘন যে সামনে বা পেছনের সহযাত্রীকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না মাঝে মাঝে। হাঁকডাক করে আমরা একে অন্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। গাছপালা সরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। ডালপালার ঘষায় গা-হাত-পা ছড়ে যাচ্ছে।

উপেনবাবু কিন্তু ভারী খুশি। তিনি মাঝেমাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ছেন। পাতা ছিঁড়ছেন, ফুল তুলছেন, আর ডায়েরী খুলে নোট নিচ্ছেন। উপেনবাবু কাজ করছেন, আমরা গল্প করছি। গল্প করতে করতে বনপথ অতিক্রম করছি।

কিছুক্ষণ বাদে উৎরাই শেষ হল। আমরা গাছে ছাওয়া পাহাড়টির পাদদেশে পৌঁছলাম। দুই পাহাড়ের মাঝে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী—বৈদিনী গঙ্গা। বৈদিনী বুগিয়ালকে বিগলিত করে বয়ে চলেছে নিচে।

একটি কাঠের পুল পেরিয়ে আর একটি পাহাড়ের পাদদেশে এলাম। একই রকমের বনাবৃত পাহাড়। এবারে এটিকে অতিক্রম করতে হবে। এমনি একটির পর একটি পাহাড় পেরিয়েই দুর্গম গিরি-কান্তারে অবস্থিত মরণ-হ্রদ রূপকুণ্ডের পথ। এই সব ছোট ছোট পাহাড়গুলি বড় বড় পাহাড়কে ঘিরে রয়েছে। এরা তাদের রক্ষী। এই সব রক্ষীকে অতিক্রম করতে পারলেই আমরা রূপকুণ্ড তথা ত্রিশূল পর্বতের পাদদেশে পৌঁছতে পারব।

আবার চড়াই ভাঙতে শুরু করেছি। তবে পথের প্রকৃতি অপরিবর্তিত। তেমনি ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বনপথ। গাছের শাখা-প্রশাখায় চতুর্দিক আচ্ছাদিত। আন্দাজে পথ চলতে হচ্ছে।

তবু রক্ষে, পথের পাশে খাদ নেই। নেই কারণ পথ বলে কিছু নেই। পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। বনের ভেতর দিয়ে ভেড়ার পাল যাতায়াত করায় একটি সরু রেখার সৃষ্টি হয়েছে। সেই পথ-রেখা ধরে পাহাড়ের ওপরে উঠছি আমরা। একে দু হাতে গাছপালা সরিয়ে চলতে হচ্ছে, তার ওপরে চড়াই। দম ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু পথ ফুরোচ্ছে না। বিশ্রাম করতেও ভরসা পাচ্ছি না। যে রকম ঘন জঙ্গল, তাতে হিংস্র জন্তুর আবাস হওয়াই স্বাভাবিক। তারা আশেপাশে যে কোন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে এবং যে কোন সময় ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে।

উপেনবাবু কিন্তু গাছ আর ফুল দেখে ভয়-ডর ভুলে গেছেন। তিনি যখন-তখন যেখানে-সেখানে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে তাঁর সহকারীরা তাঁকে অনুসরণ করছেন। একটু বাদে উপেনবাবু কোন দুর্লভ ফুল কিম্বা পাতা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের কাছে ফিরে আসছেন। এসেই আগের কথায় ফিরে আসেন, "হ্যাঁ, গত মাসেই গিয়েছিলাম নন্দন-কানন। চারদিনের ছুটি নিয়ে বসকে কলকাতায় রেখে ফিরে চললাম দেরাদুন।"

"বস্?" বুঝতে পারে না দাশু।

আমি বুঝেও চুপ করে থাকি। উপেনবাবু মুচকি হেসে বলেন, "হ্যাঁ, বস্। অফিসের নয়, বাড়ির। অর্থাৎ তোমার বৌদি।"

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। হাসি থামলে উপেনবাবু শুরু করেন, "ফেরার পথে রেলে বসে কেবলই মনে হতে লাগল—নীলগিরি অভিযানের সময় আমরা নন্দন-কাননে পৌঁচেছিলাম বর্ষার শেষে—২রা অক্টোবর। অনেক ফুল পেয়েছি। তবু শুনেছি নন্দন-কাননের

প্রকৃত রূপ দেখতে হলে যেতে হয় বর্ষাকালে—জুলাই-আগস্টে। যেতে কষ্ট হবে, কিন্তু নন্দন-কাননের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ নাকি সে কষ্ট দেবে ভুলিয়ে। দেরাদুন ফিরে এসেও বার বার সেই একই কথা মনে পড়তে থাকল। কেবল কল্পনা করতে লাগলাম সেই অদেখা নন্দন-কাননের রূপ। মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাছাড়া বুঝতেই পারছেন বিয়ের পরে প্রথম বিরহ আর বিরহ থেকেই নাকি ক্ল্যাসিক্যাল প্রেমের জন্ম। তাই একুশ দিনের ছুটি নিয়ে একদিন ঋষিকেশের বাসে চেপে বসলাম। প্রকৃতি ও প্রেয়সীর মধ্যে প্রথমাকে বেছে নিয়ে পাড়ি জমালাম নন্দন-কাননের পথে।" একবার থামেন উপেনবাবু। একটু হাসেন, আমরাও হাসি। তারপরে অপেক্ষকৃত গম্ভীর স্বরে তিনি বলেন, "বড় ভাল লেগেছে বর্ষার নন্দন-কানন। সেবারের সঙ্গে এবারের কোন তুলনাই চলে না। সুযোগ পেলে আপনারাও একবার বর্ষাকালে ঘুরে আসবেন নন্দন-কানন থেকে।"

উপেনবাবু থামলে দাশু বলে, "উপেনদা, গোয়ালদাম থেকে এ পর্যন্ত আসতে পথের পাশে যেসব গাছপালা দেখলেন, তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলুন না।"

দাশুর প্রস্তাবটা পছন্দ হয় আমাদের। আমরা সমর্থন করি তাকে, "খুব ভাল হবে। গল্প শুনতে শুনতে পথ ফুরিয়ে যাবে।"

"না, নীরস তথ্য শুনে পথকে দীর্ঘতর বলে মনে হবে।"

"না না, আমাদের খুব ভাল লাগবে উপেনদা।" মোহিত অনুরোধ করে।

দেবকীদা বলেন, "বলুন না, তবু কিছু জানা যাবে হিমালয়ের গাছপালা সম্পর্কে। যে গাছপালার সঙ্গে আমাদের এত নিকট-সম্পর্ক, তাদের কথা শুনতে খারাপ লাগবে কেন। আপনি বলুন।"

উপেনবাবু আরম্ভ করেন, "পাহাড়ে পথ চলার আনন্দের সাথী হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতির লীলাসম্ভারের ভেতর গাছপালা আর ফুলের ভূমিকা যে কতটা সেটা সাধারণ মানুষের চাইতে আমাদের অনেক বেশি উপলব্ধি করবার সুযোগ রয়েছে। পাহাড়ের গঠন, উচ্চতা, এমন কি দিক পর্যন্ত নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে গাছপালার সন্নিবেশ অদ্ভুতভাবে সাহায্য করে। এটা খানিকটা অভিজ্ঞতা ও গাছপালার সঙ্গে পরিচয় থেকে জানা যায়। তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য খুব কম লোকেরই আছে। রূপকুণ্ড পথের গাছপালার বর্ণনা ঠিক সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে আপনাদের দিতে পারব না। কেননা কেবল মানসিক আনন্দ লাভের জন্য এ-যাত্রায় আসি নি, এসেছি কর্তব্য পালন করতে। তাই ইচ্ছে আছে আর একবার এই পথে নতুন মন নিয়ে পা বাড়াবো। জানি না অদূর ভবিষ্যতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা।

"যাই হোক, গোয়ালদাম থেকেই শুরু করা যাক। চির-পাইনের রাজত্ব গোয়ালদামে কিন্তু রেস্ট-হাউসটি ঘেরা মনোরম দেওদার বা Cedrus Deodara দিয়ে। দেওদার অবশ্য সবই লাগানো এবং বাঁকাপথে বাস গরুড় থেকে ঘন দেওদারের ভেতর দিয়েই গোয়ালদামে এসেছিল। পরে আমাদের তলওয়ারীর পথে নিয়ে গিয়েছিল। পায়ে-চলা পথ ঘন ওক আর রডোডেনড্রনের ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে দ্রুত নামার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

"Viburnum Berberis, Principea–ও কিছু রয়েছে, কিন্তু খুব কম। নন্দকেশরীর কাছাকাছি এসে আবার পাইনের দেখা পেয়েছি। আর তারা আমাদের সঙ্গে চলেছে প্রায় বগরিগড় পর্যন্ত।

"গোয়ালদাম থেকে নন্দাকিনীর উপত্যকা পরিষ্কার দেখা যায়, পথে ছোট গ্রাম, সামান্য ধানক্ষেতও চোখে পড়ে। গোয়ালদামের রজনের গুদামটি নিশ্চয়ই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছে। ওর কাছেই সেই স্নান করবার কলটি। এতে বেশ বোঝা যায় পাইনের রজন সংগ্রহে গোয়ালদামের গুরুত্ব আছে।

"নন্দকেশরী থেকে দেবলের পথে ওপরের দিকে সবটাই পাইন আর Berberis-এর কাঁটাঝোপ। কিছু Asparagus-ও রয়েছে। পাইনের তলায় কিছু বেগুনী Acchmauthera ছাড়া লক্ষণীয় গাছ প্রায় নেই বললেই চলে। পাইনের পাতা যেখানে পড়ে সেখানে অন্য গাছের জীবনধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। পাইনের পাতায় রয়েছে প্রচুর তেল। মাটিতে পড়ে decompose হয়ে অম্লরসের মাটি সৃষ্টি করে অন্য গাছকে বাঁচতে দেয় না। যারা বাঁচে তাদের জন্যে এ ধরনের মাটি অসহ্য নয়। দেবলের পর বগরিগড়ে যাবার পথে উপত্যকার পূর্বদিকের ঢালে ওকবনের বড়ই দুর্গতি। দেখে মনে হয়েছে বাতাসের রুক্ষ স্পর্শ ও প্রাণহীন পাথরই তাদের দুর্গতির জন্য দায়ী।

"বগরিগড় রেস্ট-হাউসের গেটের বাইরে চোখে পড়েছে এক ধরনের অদ্ভুত লতা—Dicentra (Dutchman's breeches)। তারা হলদে ফুলের ঝুরি দুলিয়ে দিয়েছে মাথার ওপরে। কাছেই দেখতে পেয়েছি গোলাপী Lobelia, লতানো Clematis আর Berberis-এর ঝোপ।

"মান্দোলীর একটু পরে গায়ে লাগানো গুটিকতক অস্বাভাবিক উঁচু Cupressus (cypress)-এর তলায় ফুল খুঁজতে শুরু করেছিলাম। কয়েকটা অদ্ভুত Gentiana আর প্রচুর Aster পেলাম গাছের তলায়। তারা সাদা পাপড়ি মেলে দিয়েছিল। অবশ্য ফোটা ফুল বেশী পাই নি। তারপর চড়াই পথ চলল ওক (Quercus Incana) আর Rhododendron Arborium য়ের বনপথের ভেতর দিয়ে। Q. Incana ও Q. Semecarpifolia-এর সঙ্গে Rhododendron Arborium (লাল ফুল) থাকবেই! যেমন V.O.F. Birch-এর সঙ্গে দেখেছেন কাঁঠাল পাতার মত Rhododendron Campanulatum কে। ওদের সাদা সাদা ফুল হয়। ওক রডোডেনড্রনের তলায় বিভিন্ন ধরনের Anaphalis ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পাই নি। ওকের গায়ে অবশ্য প্রচুর ফার্ণ (Epiphyte) আর Sedum Trifidum ছিল। হাল্কা সবুজ রঙের এ গাছতলাতে যা ফুল ছিল পাতার রঙের সঙ্গে তাদের আলাদা করা যায় না। হঠাৎ গাছতলায় একটি লোককে তুলোর মত খানিকটা জিনিসে লোহা আর পাথর ঠুকে সহজে আগুন জ্বালিয়ে ধূমপানের মৌজ করতে দেখে কৌতূহল হল। ব্যাপারটা মন্দ লাগল না যখন দেখলাম তুলোর মত বস্তুটি অত্যন্ত দাহ্য আর সংগ্রহ করা হয়েছে Anaphalis Triplinervis-এর পাতার বহিরাবরণ থেকে।

"অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হল লোহাজঙের সর্বোচ্চ স্থানটিতে পৌঁছে। বিশ্রাম নিয়ে মন্দিরে ঘণ্টা দুলিয়ে ওয়ানের পথে নেমে এলাম। সেই পরিচিত ওক রডোডেনড্রনের ঘন সন্নিবেশের ভেতর দিয়ে পথ দ্রুত নিচে নেমে এসেছে।

"লোহাজঙ্গ থেকে ওয়ানের দূরত্ব সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের কথায় অবিশ্বাস করে দ্রুতপদে চলতে আরম্ভ করেও দুদিকের ছোট গাছপালার যে সমারোহ দেখেছি তার তুলনা নেই। সবাইকে সমাদর দিতে আরম্ভ করলে কাল কখন যে ওয়ানে পৌঁছতাম জানি না। না দিয়েই রাত ৮টার সময় মৃতপ্রায় অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলাম। তথাপি দেখে মনে হয়েছে সংগ্রহকারীদের ওটা একটা স্বর্গরাজ্য। কেবল ভুইন্দার উপত্যকা তথা নন্দন-কানন পথের গুল্মসমৃদ্ধি বা Richness of Herbaceous forest undergrowth-এর সঙ্গেই খানিকটা তুলনা করা চলে। তবে অনেক বেশি প্রকারের গুল্ম রয়েছে এই পথে। পথের পাশে পাহাড়ের

মাটির গায়ে Gaultheria, Hemipharagma, Anaphalis-এর ছড়াছড়ি আর ঢালে Geranium-এর বেগুনি ফুল চোখে পড়েছে প্রতি পদে। Boeminghausenia-এর সাদা মুড়ির মত ফুল, Thalictrum, Bupleurum, Corydalis-এর বিভিন্ন প্রজাতি সারাপথে প্রচুর দেখতে দেখতে ওয়ান ডাকবাংলোর তলায় সেই ঝরণাটির পারে যখন এসেছি, সন্ধ্যে তখন উত্তীর্ণ হয়েছে। বহু পরিচিত সেই হলদে টকফলের গাছ Hippophac Rhamnoides-এর আবির্ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছি ৮ হাজার ফুটে এসে উপস্থিত হয়েছি।"

হঠাৎ থেমে গেলেন উপেনবাবু। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টিকে এড়াতে পারেন না তিনি। বলেন, "এখন এই পর্যন্তই থাক। ওয়ানের গাছপালার কথা পরে হবে। এখন আসুন ঐ Taxus Baccata গাছটিকে ভাল করে দেখে নেওয়া যাক।" তিনি ব্যগ্রভাবে বনের ভেতরে প্রবেশ করেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি।

গাছটির গোড়ায় পৌঁছে উপেনবাবু বলেন, "ফলগুলোর ওপরের দিকটা দেখুন কেমন সুন্দর লাল। আপনার বোধ হয় মনে আছে মহারাজ, নীলগিরি অভিযানের সময় গোবিন্দঘাট থেকে ঘাংরিয়া যাবার পথে আমরা এই ফল পেয়েছিলাম। কুলিদের দেখাদেখি আমরা তখন এই ফল খেয়েছিলাম।"

কথাটি মনে পড়ে আমার। বলি. "হ্যাঁ, খেতে খুব মিষ্টি।"

"তাই নাকি ?" মোহিত বলে।

"দেখে তো মনে হচ্ছে, এগুলিও গাছপাকা।" দাশু বলে।

"খেলে মন্দ হয় না কিন্তু।" দেবকীদা বলেন।

উপেনবাবু হাসতে হাসতে বলেন, "খেতে ভালই লাগবে কিন্তু খাবার আগে একটি কথা আপনাদের জেনে নেওয়া দরকার, সে কথাটি না জেনেই সেদিন আমরা এই ফল খেয়েছিলাম।"

"কি কথা ?" আমরা বিস্মিত।

"খাবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। কিছুতেই যেন এর আঁটিতে কামড় না পড়ে।"

"কেন ?"

"ফলটি খেতে যতই মিষ্টি হোক, এর বীজটি বিষাক্ত।"

ব্যস্, ফল খাবার সবটুকু উৎসাহ উবে গেল। শুধু তাই নয়, আমার আবার আর একটি ভাবনা দেখা দেয় মনে। আমি ভাবি, ভাগ্যিস আজ উপেনবাবু কথাটা বললেন ! নইলে হয়তো হিমালয়ের পথে একদিন এই নিষিদ্ধ ফল খাবার লোভে অসময়ে এই সুন্দর ভুবন ছেড়ে চলে যেতে হত। কিন্তু সেবারে ঘাংরিয়ার পথে তো না জেনে দিব্যি নির্ভয়ে এই ফল খেয়ে খিদে মিটিয়েছিলাম। আজ তাহলে এত ভয় করছে কেন ? এ তো বিষের ভয় নয়, জ্ঞানের ভয়। জ্ঞান হলেই ভয় হয়। অজ্ঞানের ভয় নেই।

সহসা ভাবনার অবসান হয়। একটা শব্দ কানে ভেসে আসে। আমরা সচকিত হয়ে উঠি। মনে হচ্ছে একটা চিৎকার। কিসের চিৎকার ? কোন বন্যজন্তু কি ? আমরা এক জায়গায় জড়ো হই। কান পেতে শুনি। না, জন্তু নয়, মানুষ। মানুষের চিৎকার। এখানে এসময় আমাদের দলের লোক ছাড়া আর মানুষ আসবে কোথা থেকে। আমরা চিৎকার করে সাড়া দিই। ওদিক থেকেও সাড়া মেলে। আমরা বসে পড়ি।

মিনিট পনেরো বাদে ধুঁকতে ধুঁকতে অসিত এসে হাজির হয়। সে ছুটতে ছুটতে এসেছে।

পিঠ থেকে রুকস্যাকটা নামিয়ে সে-ও বসে পড়ে আমাদের পাশে। তারপরে একটু জিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কি কানে তুলো গুঁজে নিয়েছো ?"

"কেন ?"

"কখন থেকে চেঁচাচ্ছি। গলা ভেঙ্গে গেছে।"

"ইস্ ! এ অবস্থা হবে জানলে সেদিন দেবল থেকে টক ডালিম গাছের ছাল নিয়ে আসতাম।"

অসিত কিন্তু পরিহাসের কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কথা বলে, "কিছু খেতেটেতে হবে, না চড়াই ভাঙ্গলেই চলবে ?"

তাই তো, কথাটা তো খেয়াল হয় নি এতক্ষণ। সত্যই যে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে দেখছি। খেয়াল হতেই খিদে পেয়ে গেল ? হবেই তো, পেটের সঙ্গে যে মনের মিল রয়েছে। এতক্ষণ পথের সৌন্দর্য মনকে ভুলিয়ে রেখেছিল।

অসিতের রুকস্যাক থেকে মোহিত খাবার বের করে পরিবেশন শুরু করে দেয়—পরোটা, আলুসিদ্ধ আর হালুয়া।

দেবকীদা খেতে খেতে বলেন, "অমিতাভ আর সুজল কখন আসবে ?"

"বলা কঠিন, আমি রওনা দেওয়া পর্যন্ত রামচাঁদ ফিরে আসে নি। সে কুলি নিয়ে এলেই ওরা রওনা হবে।"

"আমাদের ধরতে পারবে কি ?"

"রামচাঁদ যদি দুটোর মধ্যেও ফিরে আসে, তা হলেও পারবে। তার বেশি দেরি হলে আমি ওদের আজ রওনা হতে নিষেধ করে এসেছি। কাল খুব সকালে রওনা হবে।"

"কিন্তু ওদের সঙ্গে যে স্লিপিং-ব্যাগ এয়ার-ম্যাট্রেস নেই ?"

"আশা তো করছি রামচাঁদ এসে যাবে দুটোর মধ্যে।"

"আমার কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমার এ আশা একেবারেই দুরাশা। রামচাঁদ আজ ওখানেই থাকবে।" দেবকীদা দৃঢ়কণ্ঠে বলেন।

অসিত চুপ করে থাকে। দেবকীদাও আর কিছু বলেন না। একটু বাদে আমরা উঠে দাঁড়াই। বনপথে এগিয়ে চলি।

কিছুক্ষণ থেকেই বনের ঘনত্ব কমে আসছিল। সহসা বন শেষ হয়ে গেল। আমরা চড়াই পথের প্রান্তে পৌঁছেছি। এখানে গাছপালা কিছুই নেই। ওখান থেকে রওনা হবার পরে চড়াই বেয়ে আমরা রণকধারে উঠেছি। তারপরে উৎরাই পথ দিয়ে নেমে গেছি বহু নিচে। সেখান থেকে আবার চড়াই ভেঙ্গে উঠে এসেছি এই পাহাড়টির ওপরে। এ পর্যন্ত পথ ছিল গাছপালার ভেতর দিয়ে। এখানে এসে সেই বন শেষ হয়ে গেল। উপেনবাবু বললেন, "আমরা ট্রি-লাইনের ওপরে উঠে এসেছি। প্রকৃতির কার্পণ্যের জন্য এ উচ্চতায় বড় গাছ জন্মাতে পারে না। যারা জন্মায় তাদের ঐ দেখতে পাচ্ছেন সামনে।"

আমরা সামনে তাকাই। সামনে কাঁটাগাছ ও ঘাসবন। বিরাট বিরাট ঘাস। যতদূর দেখা যাচ্ছে কেবল ঘাস। কাঁটা ও ঘাস ছাড়া কিছু নেই এখানে। উপেনবাবু কিন্তু ঐ ঘাসের জন্যই এসেছেন এখানে। ঐ ঘাসবনই বুগিয়াল।

বীর বলে, "এ জায়গাটার নাম তিথাক। এটিকে আলি বুগিয়ালের সীমান্ত বলা যেতে পারে। মূল আলি বুগিয়াল এখান থেকে সওয়া দু মাইল। সেখানে বনবিভাগের একখানি বিশ্রাম-গৃহ আছে। কিন্তু কোন চৌকিদার নেই। ওয়ান ডাকবাংলোর চৌকিদারের কাছেই

ঘরের চাবি থাকে। আলি বুগিয়ালে তিন ঘর গৃহস্থ ও ভেড়ার পশম কাটার একটা কারখানা আছে। গৃহস্থরা শীতকালেও সেখানে থাকেন। অথচ আলি বুগিয়ালের উচ্চতা ১১,৩৫৮ ফুট। আলি বুগিয়াল থেকে বালান ও ঘেস হয়ে পিণ্ডারী হিমবাহ যাবার একটি পথ আছে। আপনারা ইচ্ছে করলে এ পথেও পিণ্ডারী যেতে পারেন। আমি পথ জানি, আপনাদের নিয়ে যেতে পারি।"

"এ পথে যেতে পারলে ভালই হত, অনেক সময় এবং পরিশ্রম বেঁচে যেত। কিন্তু প্রাণেশ ও মেজর যে অপেক্ষা করবেন বাগেশ্বরে। আমাদের বাগেশ্বর হয়ে যেতে হবে।"

কিছুদূর এগোবার পরই শুরু হল সেই কাঁটাঝোপ আর ঘাসবন। গুগ্‌গুল ঝোপ আর টাইগার গ্রাসের উঁচুনিচু প্রান্তর। ঘাসের ভেতরে এক রকমের লতা। উপেনবাবু বলেন—ক্লাইম্বার।

বীর বলে—সিমুর।

লতায় লতায় ছোট ছোট বাদামী রং-এর ফল ধরেছে। খেতে নাকি খুব টক।

আর রয়েছে বন-গোলাপ গাছ—অসংখ্য। কিন্তু একটি গাছেও ফুল নেই।

খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘাসবনের ভেতর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে। পথের বাঁদিকে পাতালপ্রসারী খাদ। তাকাতে ভয় করে। মাথা ঘুরে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে বীর বলে, "এ জায়গাটার নাম ডোলিয়া। ইচ্ছে করলে এখানে তাবু ফেলতে পারেন। বেশি দূর এগোলে মুখার্জিসাবদের অসুবিধা হবে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তাছাড়া এ জায়গাটা মোটামুটি সমতল। ঘাসগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু জল? চারিদিকে তাকাই। জিজ্ঞেস করি বীর সিংকে, "জল কোথায়?"

ঘাড় চুলকে বীর বলে, "তা একটু নিচে। ঐ যে ওখানে।" সে ইশারা করে।

"এ যে দেখছি, বহু নিচে।"

"তা একটু নিচে। কিন্তু তাতে কি। কুলিরা জল নিয়ে আসবে।"

"কি দরকার এ হাঙ্গামায়! তাছাড়া জায়গাটার দৃশ্য মোটেই ভাল নয়। রাত কাটাবো—চাঁদনীরাত। তার চেয়ে চল না, একটু এগিয়ে দেখা যাক।"

"তাহলে বৈদিনী বুগিয়ালের আগে আর পছন্দমত জায়গা পাবেন না।"

"আমরা তো বৈদিনীতেই তাঁবু ফেলব, বলে এসেছি সুজলদের।" অসিত বলে, "বৈদিনী আর কতদূর?"

"মাইল দেড়েক।"

"কতক্ষণ লাগবে?"

"অন্তত ঘণ্টা খানেক।"

"তাহলে চল সেখানেই যাওয়া যাক। শুনেছি জায়গাটা খুবই সুন্দর। চাঁদনী রাত—আজ আকাশটাও পরিষ্কার। মনে হচ্ছে লাটুদেবী আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেছেন—রাতেও আকাশ পরিষ্কার থাকবে। বৈদিনী বুগিয়ালেই রাত কাটাবো আজ।"

"কিন্তু মুখার্জিসাবরা কি অতদূর পৌঁছতে পারবেন?" বীর আবার মনে করিয়ে দেয়। সুজল ও অমিতাভ আমাদের সহযাত্রী। কিন্তু তাদের জন্য আমাদের চেয়ে ওর যেন ভাবনা বেশি। আশ্চর্য মানুষ বীর সিং! সত্যই এমন সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অসিত বলে, "ওরা যদি এতদূর আসতে পারে, তাহলে এ দেড় মাইলও যেতে পারবে। চল বৈদিনীতেই যাওয়া যাক।"

আমরা এগিয়ে চললাম।

একটু বাদেই বুঝতে পারি বীর কেন বার বার ডোলিয়াতে তাঁবু ফেলতে বলছিল। আবার সেই মানুষের চেয়ে উঁচু ঘাসবন শুরু হল। তেমনি ঘাস সরিয়ে সারি বেঁধে পথ চলতে হচ্ছে। বীরের পেছনে এগিয়ে চলেছি। কোন্ দিকে যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না। মাঝেমাঝেই ঘাসে পা আটকে যাচ্ছে। হোঁচট খাচ্ছি—পড়ে যাচ্ছি। পড়ার আগে বুঝতে পারছি না কোথায় পড়ব। তবে জানি খাদ থাকলে বিপদ হবে। খাদ আছে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, আমরা কেউই খাদে পড়ি নি এখনও। তবে পাথরের ওপরে পড়ে ব্যথা পেয়েছি। ব্যথায় বিচলিত হই নি। হিমালয়ের প্রেমে পড়েছি। ব্যথাই যে প্রেমিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল।

হিমালয়কে ভালবাসলে, হিমালয়ও ভালবাসে। হিমালয় যাদের ভালবাসে, নন্দাদেবী তাদের করুণা করেন। নন্দাদেবীর অসীম করুণায় আমরা নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছলাম সেই ঘাসবনের শেষে। আর সেখানেই সেই সীমাহীন সৌন্দর্য।

দু চোখ জুড়িয়ে গেল। মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠল। সামনে সুদূরপ্রসারী শ্যামল কোমল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর—বৈদিনী বুগিয়াল। সবুজ সুন্দর হিমালয়। কিন্তু সবুজেই শেষ হয় নি হিমালয়। সবুজের শেষে সাদা--হিমতীর্থ হিমালয়। ত্রিশূল নন্দাঘুণ্টি আর চননিয়া কোটের শৃঙ্গমালা। নীলাকাশের গলায় কে যেন মুক্তোর মালা দিয়েছে পরিয়ে। বৈদিনীও নিরাভরণা নয়। একটি স্বচ্ছ শীর্ণা জলরেখা তার কণ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। রিমিঝিমি রবে জলতরঙ্গ বাজিয়ে সে আমাদের আবাহন করল। আমরা সেই ঝরণার তীরে তাঁবু ফেললাম। আজ থেকে তাঁবু-জীবন শুরু হল আমাদের। দুর্গম গিরি-কান্তার পরিক্রমার আরেকটি দিন ফুরিয়ে গেল।

তুষারাবৃত ত্রিশূলের শিরে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে বৈদিনীর বুকে। কিন্তু সেই আলোকে কেবল বৈদিনী আলোময় হয়ে ওঠে নি, আলোময় করে তুলেছে আমাদের—আমাদের জীবন ও যৌবনকে। যে জীবন মর্ত্যের সম্পদ হয়েও চিরকাল স্বর্গের প্রত্যাশী। যে যৌবনের সাধ মেটাতেই মানুষের দুর্গম গিরি-কান্তার পরিক্রমা।

একসময় সূর্যের শেষ আলো মিলিয়ে গেল। কালো আঁধার নেমে এল বৈদিনীর বুকে।

আবার আঁধার ঘুচে গেল। চাঁদ উঠল। তার আলো পড়ল ত্রিশূলের শ্বেতশুভ্র শিখরে। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল বৈদিনীর বুকে। স্বর্গ ও মর্ত্য এক হয়ে গেল।

॥ চোদ্দ ॥

কাল রাতে আসে নি ওরা। বোধ হয় রওনা হয় নি। হয়তো কুলি যোগাড় করতে পারে নি। অথবা এমন সময় যোগাড় হয়েছে যে রওনা দিতে সাহস পায় নি। তবু রাতে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। বার বার ওদের কথা ভেবেছি। রামচাঁদের মতো মানুষ তিনজন. কুলি যোগাড় করতে পারে নি? যে কারণেই ওরা কাল ওয়ানে আটকে থাকুক, বিছানা ও গরম পোশাকের অভাবে অমিতাভ ও সুজল সারারাত কষ্ট পেয়েছে।

দ্বিতীয়বার কফি খেয়ে উপেনবাবু বলেন, "আমি তাহলে একবার বৈদিনী থেকে ঘুরে আসছি।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। বৈদিনী বুগিয়ালের উদ্ভিদ সমীক্ষা করবার জন্যই উপেনবাবু আমাদের সঙ্গে এসেছেন। অমিতাভ ও সুজলের জন্য এখানে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। এই অবসরে উপেনবাবু অনায়াসে নিজের কাজ এগিয়ে রাখতে পারেন।

হঠাৎ মোহিত জিজ্ঞেস করে উপেনবাবুকে. "কোথা থেকে ঘুরে আসছেন বললেন ?"

"বৈদিনী থেকে।" উপেনবাবু উত্তর দেন।

"কেন এটা কি বৈদিনী নয় ?"

"হ্যাঁ, এটাও বৈদিনীর অংশ। তবে মূল বৈদিনী খানিক নিচে। আমি সেখানেই যেতে চাইছি।"

"আমরা সেখানে যাব না ?" মোহিত বিচলিত।

"যাব রে যাব, সবাই যাব।" অসিত ভরসা দেয় মোহিতকে, "বৈদিনী দিয়েই আমাদের পথ। যাবার পথে বেশি সময় হাতে থাকবে না বলে উপেনবাবু এখনই সমীক্ষা শেষ করে ফেলতে চান।"

"আমি উপেনদার সঙ্গে যাব অসিতদা ?" মাঝখান থেকে দাশু বলে ওঠে।

মোহিত বলে, "এখানে তো কোন কাজ নেই এখন, আমিও একবার ঘুরে আসি না ?"

"বেশ তো যা। কিন্তু দেরি করিস না। এরা এলেই আমরা রওনা হব। ওরা সকালেই এসে যাবে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা রান্না হবার আগেই ফিরে আসছি।"

উপেনবাবু তাঁর দুই সহকারী ও দুই সহযাত্রীর সঙ্গে এগিয়ে চলেন। সহসা পিছু ডাকে বীর, "সাব !"

আমরা বিরক্ত হই। শত হলেও হিমালয়। দুর্গম না হলেও সুগম তো নয়। বিপদ হতে কতক্ষণ। কিন্তু বীর তো এমন করে না। কেন সে পিছু ডাকল ?

বীর বলে, "আপনাদের অচেনা জায়গা। আপনি এই আলম সিংকে সঙ্গে নিয়ে যান।"

সত্যিই তো. এ কথাটা কারও খেয়াল হয় নি।

উপেনবাবু বলেন, "আলম সব চেনে ?"

"হ্যাঁ, এককালে ও এই বুগিয়ালে ভেড়া চরাতো !"

"ভালই হবে তাহলে। চল হে আলমগীর, চল আমাদের সঙ্গে।"

আলম এগিয়ে যায়, ওরা তাকে অনুসরণ করে। বীর আবার রান্নার কাজে মনোনিবেশ করে। আমরা মনে মনে ধন্যবাদ দিই তাকে।

অসিত, দেবকীদা ও আমি কেবল রয়েছি এখানে। কয়েকজন কুলির সাহায্যে আমরা ছোট তাঁবুগুলি গুটিয়ে ফেলি। বড় তাঁবু থেকে মালপত্র বের করে নিই। তারপরে অধিকাংশ কুলিদের ছেড়ে দিই পাথরনাচুনির পথে। ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ছটফট করছিল। বলছিল—দেরি করলে বৃষ্টিতে ভিজবে। আর বিকেলে নাকি বৃষ্টি হবে। অনেক বলে-কয়ে তাঁবু ও খাবারের কিট্ বইবার জন্য পাঁচজন কুলিকে রাজী করালাম এখানে থাকতে। কানে কানে তাদের বকশিশের প্রতিশ্রুতি দিতে হল।

সাড়ে দশটার সময় বীর বলল—আধঘণ্টায় রান্না হয়ে যাবে।

উপেনবাবুরা হয়তো এসে যাবেন ইতিমধ্যে। কিন্তু যাদের পথ চেয়ে বসে রয়েছি কাল বিকেল থেকে, তাদেরই যে পাত্তা নেই এখন পর্যন্ত। আজকের পথ কালকের থেকে দুর্গমতর। আবহাওয়াও ভাল থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। সকালের রোদটুকু মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

আকাশটা আস্তে আস্তে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। কখন বর্ষণ শুরু হবে বুঝতে পারছি না। বেশি দেরি হলে আজ এখানেই থাকতে হবে। এদিকে কুলিদের ছেড়ে দিয়েছি। কি অদৃষ্টে আছে কে জানে ?

ঠাণ্ডা বাড়ছে। আমরা রয়েছি একটা ন্যাড়া পাহাড়ের পেছনে। এখানে একদম হাওয়া নেই। তবু শীত লাগছে। উচ্চতা তো কম নয়, সাড়ে এগারো হাজার ফুট। তাহলেও বাইরে বসে রয়েছি আমরা। বসে বসে কালকের ফেলে আসা পথটিকে দেখছি। পালা করে বাইনোকুলার চোখে লাগাচ্ছি। কিন্তু বৃথা—যতদূর দৃষ্টি যায় কেউ নেই। শুনেছি দুর্গম পথে পেছনে তাকাতে নেই। অথচ আজ সামনে তাকাবার কোন সুযোগই পাচ্ছি না। কেবলই পেছনে তাকাতে হচ্ছে। সহযাত্রীরা যে পড়ে রয়েছে পেছনে।

"এগারোটা বেজে গেল, অথচ ওরা এখনও এলো না।" অসিত বিচলিত।

"তাই তো চিন্তায় ফেললো দেখছি।" আমি বলি।

"চিন্তার বোধ হয় শেষ হল এবারে।" বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে বলে ওঠেন দেবকীদা।

"কেন, এসে গেছে নাকি !" আমরা তাঁর কাছে আসি। দূরে তাকাই, দেখতে পাই না।

"হ্যাঁ, আসছে।" দেবকীদা উত্তর দেন।

"দেখি।" দেবকীদার হাত থেকে বাইনোকুলারটা কেড়ে নেয় অসিত। আর সেটা চোখে লাগিয়েই চীৎকার করে ওঠে, "ঠিকই, এসে গেছে। আগে অমিতাভ, তারপরে রামচাঁদ ও সুজল। ওদের পেছনে কুলিরা—এক দুই তিন চার, চারজন কুলি। না, এ লোকটাকে নিয়ে পারা গেল না দেখছি, তিন কুলির মাল ওজন করে দিয়ে এলাম, আর সে চার-চারজন কুলি জুটিয়েছে।"

"জোটাক গে। এসেছে যে এই আনন্দের। না হয় একজন বেশি কুলি এনেছে। তুমি আবার এ নিয়ে কিছু বলো না অসিত।" দেবকীদা আনন্দিত। তিনি রামচাঁদের অপরাধ মার্জনা করেন।

কিছুক্ষণ বাদে ওদের খালি চোখে দেখতে পাই আমরা। আমরা হাত নাড়ি, চিৎকার করি। ওরা সাড়া দেয়, ওরা এগিয়ে আসে। আমরা এগিয়ে চলি। ওরা ছুটে আসে, আমরা ছুটে চলি। কাছে আরও কাছে। আমরা মিলিত হই। হাত ধরাধরি করে তাঁবুর কাছে ফিরে আসি।

আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বীর কফি আর বিস্কুট এনে দেয় ওদের। আমরা বাইনোকুলারে ওদের দেখতে পেয়েছি শুনেই সে নাকি কফির জল চড়িয়ে দিয়েছিল।

কফিতে চুমুক দিয়ে অমিতাভ বলে, "কাল বিকেলেই কুলি যোগাড় করেছে রামচাঁদ, কিন্তু রাত হয়ে যাবে বলে আর রওনা হই নি।"

"ভালই করেছ।" দেবকীদা বলেন, "কিন্তু বিছানার অভাবে রাতে নিশ্চয়ই তোমরা শীতে কষ্ট পেয়েছো।"

"না, না। চৌকিদার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। নিজেও ছিল আমাদের ঘরে। সারারাত ঘুমায় নি, আগুনের তদারক করেছে। কোন কষ্ট হয় নি আমাদের।" অমিতাভ উত্তর দেয়।

"লোকটি সত্যই বড় ভাল। সকালে আসার সময় পাঁচটা টাকা দিয়েছি। কিছুতেই নেবে না। অনেক বলে-কয়ে নিতে রাজী করিয়েছি শেষ পর্যন্ত।" সুজল বলে।

"কটার সময় রওনা হয়েছ ওয়ান থেকে ?" অমিতাভকে জিজ্ঞেস করি।

"ছটার পরে। পাঁচ ঘণ্টার একটু বেশি লাগল। তোমাদের কাল কতক্ষণ লেগেছে ?"

"প্রায় সাত ঘণ্টা। দেবকীদা উত্তর দেন, "এই প্রবীণ পর্বতারোহী যে সঙ্গে ছিল ভাই। ওদের আস্তে চলতে হয়েছে।"

সুজল বলে, "আজ আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তো?"

"তোরা পারবি কি? পাথরনাচুনি এখান থেকে ন মাইল।" অসিতবাবু বলেন, "বেশ চড়াই পথ।"

"তাতে কি হয়েছে? পারব না কেন?" সুজল বিস্মিত।

"না, তোরা এই এসে পৌঁছলি। তাছাড়া সেদিন তুই চোট পেয়েছিলি।"

"ও, সেই কথা। তাহলে জেনে রাখো, ন মাইল যেতে আমার ছ ঘণ্টার বেশি লাগবে না, কারণ আমার শরীর পুরো ঝরঝরে।" সুজল জানিয়ে দেয়।

"উপেনবাবু, মোহিত, দাশু—ওরা সবাই কোথায়? ওদের তো দেখছি না। ওরা কি রওনা হয়ে গেছে?"

"না, উপেনবাবু উদ্ভিদ সমীক্ষায় বেরিয়েছেন। মোহিত আর দাশু তাঁর সঙ্গে গেছে। এবারে এসে যাবে ওরা।" দেবকীদা বলেন।

"ওরা এলে, খেয়ে নিয়ে চল বেরিয়ে পড়া যাক।" সুজল বলে।

অসিত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, "না খেয়ে বেরুতে পারবি?"

"না।" গম্ভীরতর কণ্ঠে জবাব দেয় সুজল।

আমরা হাসতে থাকি ওদের কথায়। শেষদিকে ওরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমাদের কলহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে বৈদিনী বুগিয়াল।

একটার সময় খাওয়ার পাট চুকলো। দেড়টার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথ মানে সবুজ বৈদিনীর বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এ তো বৈদিনী নয়, বৈকুণ্ঠ কিংবা বৈজয়ন্ত। বৈতরণী পেরোতে পারলেই পৌঁছনো যায় এই বৈরাগ্য-নিকেতনে।

উপেনবাবু চলেছেন সবার আগে। তাঁর পরিচিত পথ। একটু আগে তিনি তাঁবুতে ফিরেছিলেন এই পথে।

আজ আকাশটা হঠাৎ উদার হয়েছে। সকাল থেকে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। এখন তারা যেন কোথায় গেছে পালিয়ে। রোদে ঝলমল করছে বৈদিনী। ঝলমল করছে ত্রিশূল আর নন্দাঘুণ্টি। ঝলমলিয়ে উঠেছে আমাদের মন। লাটুদেবী আমাদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। আবহাওয়া ভাল হয়েছে।

ভেড়াওয়ালাদের কয়েকটি ঝোপড়া ছাড়িয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা বৈদিনী মন্দিরের সামনে এলাম। এখানে আবার বৈদিনী গঙ্গার দেখা পেলাম—শীর্ণ-কায়া স্রোতস্বিনী। উঁচু-নিচু সবুজ প্রান্তরের বুক চিরে বয়ে চলেছে। সেই প্রান্তরে দুটি কাঠের গোলাকার ছোট ধর্মশালা ও পাথরের দুটি ছোট ছোট মন্দির। একটি ধর্মশালায় জন পনেরো যাত্রী থাকতে পারেন, আরেকটি আরও ছোট। দু'টি মন্দিরের একটি তুলনায় একটু বড়। কোনমতে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢোকা যায়। ভেতরটা খুব একটা অন্ধকার নয়। ওপরের দিক থেকে আলো আসার পথ আছে। ভেতরে রয়েছে ভগ্ন দেবীমূর্তি—ওরা বলে মহিষমর্দিনী। আছে একটি ঘণ্টা। তাতে লেখা—বলবন্ত সিং মেহেতা, ১৯২৬।

পুণ্যাত্মা বলবন্ত। পঞ্চাশ বছর আগে গিরি-কান্তারের মন্দিরের জন্য নিয়ে এসেছিলেন

এই ঘণ্টা। সশ্রদ্ধ অন্তরে আমরা তাঁকে স্মরণ করি। স্মরণ করি তাঁদের, যাঁরা এই মন্দির আর মূর্তি নির্মাণ করে গেছেন পরবর্তী কালের পুণ্যার্থী মানুষের জন্য। বরণ করি দেবী দশভুজাকে। যাঁর করুণা না হলে মানুষের কোন আশা পূর্ণ হয় না, কোন যাত্রা সফল হয় না—সেই দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাকে। তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

শক্তিদাত্রীর কাছে শক্তি প্রার্থনা করে আমরা বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

পাশেই ছোট মন্দির। খুবই ছোট। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হল ভেতরে। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। এ মন্দিরেও কয়েকটি মূর্তি আছে। আর তারা প্রায় অক্ষত। মহিষমর্দিনী ও সরস্বতীর মূর্তি দুটি দর্শনীয়। মন্দিরটি ছোট আর ভেতরটা অন্ধকার বলেই বোধ করি দেব-দেবীরা এখনও অক্ষত রয়েছেন। বীরপুঙ্গবদের নজরে পড়েন নি।

মনে পড়ছে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বিখ্যাত উক্তি—'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!' পুণ্যাত্মা ও দুরাত্মার, ধার্মিক ও অধার্মিকের, ভাল ও মন্দের এমন সহাবস্থান আর বোধ হয় নেই কোন দেশে। একদল মানুষ দুঃসহ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে দুর্গম গিরি-কান্তারে মূর্তিময় মন্দির ও মঠ গড়েছেন। আর একদল মানুষ তাই ধ্বংস করেছে। স্রষ্টাদের প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় বিগলিত হয়ে ওঠে আর ধ্বংসকারীদের প্রতি ঘৃণায় অন্তর পূর্ণ হয়। কিন্তু কখনই ভুলে যাই না—ভাল আর মন্দ দুইকে নিয়ে আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ—এই বিচিত্র ও বিশাল দেশ।

পুজো শেষে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করি। তারপরে রওনা হই পাথরনাচুনির পথে। দীর্ঘ ও দুর্গম পথ। আর দেরি করা উচিত হবে না। হিমালয়ের আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই।

মন্দিরের পিছনে ধর্মশালা। বেশ বড় একটি পাথরের ঘর। কাল এ পর্যন্ত এলে আর তাঁবু খাটাবার দরকার হত না। ধর্মশালাতেই রাত কাটাতে পারতাম।

ধর্মশালার পাশে পূজারীর ঘর। কাছেই একটি খুঁটির মাথায় নিশান উড়ছে।

বৈদিনী গঙ্গা পেরিয়ে খানিকটা নেমে এলাম। সামনেই কয়েকখানি কুটির। কাঠ আর শুকনো ঘাসের চাল, পাথরের দেয়াল। বৈদিনী গঙ্গা থেকে নালা কেটে একটি জলধারা নিয়ে যাওয়া হয়েছে কুটিরগুলির ভেতরে। ঘরে বসেই জল। একেবারে জলের কল।

প্রতিটি কুটিরের ভেতরে খানিকটা অংশ বুক-সমান উঁচু পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এই অংশে রাতে মেষপালকরা মেষশাবকদেব রেখে দেয়। ভালুক ও তুষার-চিতার অবাধ গতিবিধি এ অঞ্চলে। ওরা উভয়েই কচি পাঁঠা ও ভেড়া ভারী ভালবাসে।

মেষপালকদের কুটির কটি দেখে আমরা আবার পথ চলা শুরু করি। চলতে চলতে দাশু জিজ্ঞেস করে, "এ সব অঞ্চলে ভালুক ও তুষার-চিতা সত্যই আছে কি?"

"ঠিক এ অঞ্চলে ভালুক থাকে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ ভালুক গভীর বন ছাড়া বাস করে না। তবে তারা হয়ত নিচের থেকে আসে। কিন্তু চিতা খুবই থাকতে পারে। এইরকম ঝোপঝাড় আর ঘাসবনেই যে চিতার বাস।"

কথায় কথায় কখন যে প্রান্তরটি পেরিয়ে এসেছি, কেউ খেয়াল করি নি। খেয়াল হতেই দেখি দূর থেকে ন্যাড়া পাহাড়টা দেখা যাচ্ছিল আমরা তারই পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছি। থরে থরে পাঁচটি গিরিশিরা আছে এ পাহাড়ে, তাই এর নাম পঞ্চকোটি।

এবারে শুরু হল চড়াই। গিরিশিরা বেয়ে উঠতে হবে। কাজেই আর গল্প নয়। এখন কেবলই পথ চলা। গিরি-কান্তারের দুর্গম পথ।

নিচে দাঁড়িয়ে গিরিশিরাদের চেহারা দেখে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের যখন অতিক্রম করতেই হবে, তখন নন্দাদেবী ও লাটুদেবীর নাম স্মরণ করে চড়াই ভাঙ্গতে শুরু করে দিয়েছি। আর তাঁদের করুণায় অনেকটা ওপরেও উঠে এসেছি। নিচের থেকে কাজটাকে যত কঠিন বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখছি ঠিক ততটা কঠিন নয়। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই—কথাটা অন্য সব কিছুর মত পর্বতারোহণেও সমান সত্য।

পঞ্চকোটির তৃতীয় ধাপে এসেছি আমরা। হঠাৎ থামে রামচাঁদ। এগিয়ে যায় খাদের ধারে। হাত বাড়িয়ে বলে, "ঐ দেখুন একটি হ্রদ।"

বহু নিচে, বহু দূরে—সূর্যালোকে ঝকঝক্ করছে একটি সুবৃহৎ জলাশয়। ভারী ভাল লাগছে দেখতে। কিন্তু এখন ভাল করে দেখার সময় নেই আমাদের হাতে। তাই একটু বাদে রামচাঁদ চলতে শুরু করে। আর আমরাও সচল হই।

অবশেষে পঞ্চকোটির শিখরে এসে পৌঁছনো গেল। দূর থেকে এ জায়গাটাকে একটি তোরণের মত দেখাচ্ছিল। ভেবেছিলাম এখানে এলে চড়াই শেষ হবে। কিন্তু এ কি কাণ্ড! আমাদের সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটি উচ্চতর পাহাড়। তবে সেটি পঞ্চকোটির মত বৃক্ষলতাহীন নয়। ঘাসে ছাওয়া সবুজ পাহাড়। মনে হচ্ছে যেন শ্যামল কোমল গালিচা বিছিয়ে আমাদেরই অপেক্ষায় বসে আছে সে।

কিন্তু আমাদের কি এই পাহাড়ে উঠতে হবে নাকি?

"জী, হ্যাঁ।" রামচাঁদ বলে, "এ পাহাড়টির নাম আন্নালোরিয়া। কুমায়ুনী ভাষায় আন্না বা আনিয়াল শব্দের অর্থ ভেড়ার পাল। আর লোরিয়া মানে পা ফসকে যাওয়া।"

"মোদ্দা কথাটা দাঁড়ালো, যে পাহাড়ে চড়তে গেলে ভেড়ার পা ফসকে যায়, সেই পাহাড় এখন চড়তে হবে আমাদের।" সুজল যোগ করে।

ঘাস ধরে ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি আমরা। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিতে হচ্ছে। তবু যতটা কষ্ট হবে ভেবেছিলাম, ততটা কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু কষ্টের সবটুকুই যে এখনও অজানা। কারণ হিমালয়ের অনুচরবৃন্দ এখনও আমাদের আগমন সংবাদ জানতে পারে নি।

পারল একটু বাদেই। আর সংবাদ পাওয়া মাত্রই একযোগে আক্রমণ করে বসল। দলে দলে মেঘ ছুটে এসে ঢেকে ফেলল আমাদের। মেঘের মাঝে হারিয়ে গেলাম আমরা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। রামচাঁদের সতর্কবাণী কানে আসে, "হুঁশিয়ার, যে যাঁর পাশে আছেন তাঁর হাত ধরুন। তারপরে পা ঘষে ঘষে পথ চলুন।"

"জনৈক সহযাত্রীর হাত ধরে বলে উঠি, "কার হাত?"

"আমার।" দাশুর সাড়া পাই।

"তোমার সামনে কে?" জিজ্ঞেস করি।

দাশু প্রশ্ন করে, "আমার সামনে কে?"

"আমি।" মোহিত সাড়া দেয়।

বিচিত্র অবস্থা। এত কাছাকাছি রয়েছে সবাই অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কেবল কথা শুনছি। পা ঘষে ঘষে পথ চলছি। রামচাঁদেরও একই অবস্থা। কিন্তু তার অতি পরিচিত পথ, তাই সে চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে, "সোজা ওপরে উঠে আসুন। খুব সাবধান, পা ফসকে পড়ে যাবেন না যেন।"

কিছুক্ষণ চলার পরে রামচাঁদ আবার বলে, "এবারে বাঁয়ে যেতে হবে।"

আমরা এক জায়গায় নেই। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে চলছি। এ ক্ষেত্রে বাঁয়ে বাঁক নেওয়া....। তবু রামচাঁদের নির্দেশ অমান্য করি না। মেঘের আবরণ ভেদ করে বাঁদিকে অগ্রসর হলাম।

কিন্তু আমি যেন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি! তাহলে কি পথ ভুল হয়েছে? থমকে দাঁড়াই। দাশুকে কথাটা বলি। সে চিৎকার করে বলে রামচাঁদকে।

রামচাঁদ নির্দেশ দেয়, "না না, নিচে নয়, ওপরে। যেখান দিয়ে হোক, যেভাবে হোক, ওপরে উঠে আসুন। সাবধানে পা ফেলবেন।"

সহসা মেঘের আবরণ অপসৃত হল। হিমালয়ের অনুচরবৃন্দকে অতিক্রম করে আমরা আন্নালোরিয়ার ওপরে উঠে এলাম। বহুক্ষণ বাদে আবার আমরা আমাদের দেখতে পাচ্ছি। আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম।

সামনের দূর্বা-ছাওয়া পাহাড়টিকে দেখিয়ে রামচাঁদ বলে, "এবারে ঐ পাহাড়টিতে চড়তে হবে।"

"এর নাম কি?" দেবকীদা জিজ্ঞেস করেন।

"এখন ঘোড়া-ধবল, আগে ছিল ঘোড়া-ধাঁপিয়ো।"

ধবল শব্দের অর্থ বুঝতে পারছি। যদিও পাহাড়টি ধবল নয়, শ্যামল। কিন্তু ধাঁপিয়ো?

রামচাঁদ বলে, "ধাঁপিয়ো মানে ছোটানো। নন্দা ভাগবতী মাঈ এই পাহাড়ে একবার ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন বলে এর নাম ঘোড়া-ধাঁপিয়ো।"

যাক এতক্ষণে একটি সুসংবাদ পরিবেশন করল রামচাঁদ। আগের পাহাড়টিতে ভেড়ার পা ফসকে যায়। আর এটিতে তবু যা হোক ঘোড়া ছুটতে পারে।

পরক্ষণেই খেয়াল হল, সে ঘোড়াটি যে দেবী নন্দার। পক্ষীরাজ হওয়াই স্বাভাবিক। না হলেও সে যে মর্ত্যের প্রাণী নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বর্গের ঘোড়া যেখানে ছুটতে পারে, মর্ত্যের মানুষ সেখানে হাঁটতে পারবে কি? পারতেই হবে। মানুষের অসাধ্য বলে যে কিছুই নেই এ জগতে।

নন্দাদেবীর ঘোড়া শূন্যে ছুটতে পারে, আমাদের অবস্থাও প্রায় শূন্যে পদচারণারই সামিল হয়ে উঠেছে। আগের পাহাড়টিতে তবু যা হোক দূর্বা ছিল। পা ফসকালে চার হাত-পায়ে যেমন করে হোক সামলে নিয়েছি। অনেক সময় দূর্বা ধরে ওপরে উঠেছি। এখানে দূর্বা এত অল্প যে ধরা যাচ্ছে না। অথচ অত্যন্ত পিচ্ছিল। কেবলই পা ফস্‌কে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়ছি, আছাড় খাচ্ছি। তবু পথ চলতে হচ্ছে।

কিন্তু নন্দাদেবী এতো পাহাড় থাকতে এখানে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন কেন? চারিদিকে তাকাই। না, জায়গাটা সত্যই বড় সুন্দর। সীমাহীন সৌন্দর্যই তাঁকে এখানে আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। এই সীমাহীন সৌন্দর্য দর্শনের অবসর নেই এখন। অবকাশও নেই। মুহূর্তের অসাবধানতায় অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়ে যেতে পারে। স্বর্গে যেতে পারলে নন্দাদেবীর দর্শন পাব, কিন্তু রূপকুণ্ড যে দেখা হবে না আমার। রূপকুণ্ড না দেখে স্বর্গ দেখতে চাই না। এখন কেবল দেবী নন্দার অসীম করুণাকে পাথেয় করে এই গিরি-কান্তার পেরিয়ে পৌঁছতে চাই রূপময় রূপকুণ্ডে। তাই কোনদিকে না তাকিয়ে সাবধানে ওপরে উঠছি। ওপরে আরও ওপরে—ঐ ঘোড়া-ধবলের শিখরে।

কিন্তু শিখরে আরোহণ করা কি অতই সহজ ! আর ঘোড়া-ধবলে কি মেঘ নেই বলে কিছুই নেই। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ অজস্রধারায় সাবুদানার মত বরফ পড়তে শুরু করে দিল। কাঁধে ঝোলানো টুপিটা মাথায় পরে নিতে হল। ধীরে ধীরে পতনোন্মুখ ধারার রূপ পালটাচ্ছে। একটু বাদে জল পড়তে আরম্ভ করল, বেশ বড় বড় ফোঁটা। তাড়াতাড়ি একে অন্যের রুকস্যাক থেকে বর্ষাতি বের করে দিলাম।

বর্ষার জন্য বর্ষাতির যত না প্রয়োজন ছিল, তার থেকে ঢের বেশি প্রয়োজন শীতের জন্য। আমাদের বর্ষাতির ভেতরে গরম কাপড়ের লাইনিং দেওয়া আছে। কাজেই এ বর্ষাতি বর্ষা ও শীতে সমান সাহায্য করে।

বর্ষাতি পরলে বর্ষা ও শীত বাঁচে কিন্তু সময় বাঁচে না। বর্ষাতি পরে চড়াইপথে তাড়াতাড়ি চলা যায় না। তাই আমরা আস্তে আস্তে পথ চলেছি। তবে চলতে চলতে একসময় দেখি আমরা ঘোড়া-ধবলের শিখরে এসে গেছি!

রামচাঁদ বলে, "সেদিন রণকধার থেকে যে গিরিশ্রেণী আরম্ভ হয়েছিল, এখানে তা শেষ হয়ে গেল। এর পরে আমাদের আর একটি গিরিশ্রেণী পেরোতে হবে।"

আশা করেছিলাম এখানে এলে এই বিরক্তিকর বর্ষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। কিন্তু সে আশা অপূর্ণ রইল। এখনও বেশ বৃষ্টি হচ্ছে।

ঘোড়া-ধবলের শিখরটি প্রায় সমতল। তবে এখানে কোন গাছপালা নেই। এমন কি ঘাস পর্যন্ত নেই। সেই বৃক্ষলতাহীন সমতল প্রান্তরটুকু পেরিয়ে পরের পাহাড়টির পাদদেশে পৌছলাম।

রামচাঁদ বলে, "এ পাহাড়টা আগের পাহাড়গুলির চেয়ে বড়। এর নাম ত্রেচুলিয়া। তিনটি গিরিশিরা আছে এ পাহাড়ে। তারা শিখর থেকে তিনদিকে বিস্তৃত হয়েছে—বৈদিনী, পাথরনাচুনি ও শুকরি। আমরা এই বৈদিনী গিরিশিরা দিয়ে ওপরে উঠে পাথরনাচুনির গিরিশিরাটি ধরব।"

"তার মানে ত্রেচুলিয়া শিখরটি হচ্ছে রূপকুণ্ড পথের জংশন। আর আমাদের শিখরে উঠতে হবে।" দেবকীদা বলেন।

"শিখরটি তিনটি গিরিশিরার মিলন-বিন্দু হলেও পাথরনাচুনি গিরিশিরাটি ধরার জন্য আমাদের শিখর পর্যন্ত ওঠার দরকার হবে না। আমরা আড়াআড়ি ভাবে পাহাড়টিকে পেরিয়ে যাব।" একবার থামে রামচাঁদ। তারপরে আবার বলে, "আর কোন গাইডের সঙ্গে এলে অবশ্য আপনাদের শিখরে উঠতে হত। কারণ আমি ছাড়া আর কেউ এ পথ চেনে না।...কিরে বীর, চিনিস নাকি এ পথ?"

"জী না।" বীর সবিনয়ে নিবেদন করে।

"তাহলে...." রামচাঁদ হাসে।

আমরাও হাসি। আর হেসে অসিত বলে,-"তাই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি আমরা।"

রামচাঁদ বিগলিত হয়। বলে, "সে আমার জানা আছে। আর ব্যাপারটা কি জানেন?"

"কী?" মোহিত প্রশ্ন করে।

"এ পথটা কেউ দেখলেও মনে রাখতে পারে না। কিরে বীর, পারবি মনে রাখতে?"

"জী না।" একই উত্তর দেয় বীর। ভদ্রলোকের এক কথা।

কিন্তু রামচাঁদ কিছু বলতে পারার আগেই সুজল বলে ওঠে, "আরে ওর সঙ্গে তোমার...কোন তুলনা হয় নাকি!"

এর পরে আর কি বলবে রামচাঁদ। সে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। তবে ওর পদশব্দটা যেন একটু বেশি হচ্ছে। পায়া-ভারি কথাটা দেখছি মিথ্যে নয়।

ওয়ান থেকে রূপকুণ্ডের তিনটি পথ। একটি ভূণা হয়ে, একটি শুক্‌রি হয়ে, আর একটি আমাদের এই পথ, বৈদিনী হয়ে। ভূণার পথটি গিয়ে পড়েছে কৈলু বিনায়কে আর শুক্‌রি ও বৈদিনীর পথ দুটি এসে মিলেছে পাথরনাচুনিতে। তিনটি পথেরই প্রকৃতি একরকম। দূরত্বও প্রায় সমান।

আড়াআড়ি ভাবে পাহাড়টিকে অতিক্রম করছি বলে আমাদের তেমন চড়াই উৎরাই করতে হচ্ছে না। তেচুলিয়া বৃক্ষলতাহীন নয়। ঝোপঝাড় ও ঘাস রয়েছে। ঘাসগুলি খুব বড় নয়, তবে বেশ ঘন। কাজেই আমাদের দু-হাতে ঘাস সরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে।

সামনে একটা জায়গার ঘাসগুলো খুব নড়ছে। কি ব্যাপার ? থমকে দাঁড়াই। রামচাঁদও চলা বন্ধ করেছে।

তার মুখের দিকে তাকাই। সে গম্ভীর। সে তাকিয়ে আছে ওদিকে। ঘাসগুলি নড়ছে। নিশ্চয়ই কোন বন্যজন্তু। বাঘ ভালুক কিংবা তুষার-চিতা ?

আইস এক্‌স নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াই। আমরা প্রস্তুত। যে কোন সময়ে আক্রান্ত হতে পারি। রামচাঁদ কিন্তু লাঠিটা মাটিতে রেখে একখানা পাথর হাতে তুলে নেয়। তারপরে সহসা সেই পাথরখানিকে ছুঁড়ে মারে দোদুল্যমান ঘাসবনে আর চিৎকার করতে থাকে। কুলিরা গলা মেলায় তার সঙ্গে। আমরাও ওদের সঙ্গে যোগ দিই। রামচাঁদ আর একখানি পাথর তুলে নেয়, আবার ছুঁড়ে মারে। তারপরে আবার। শব্দহীন তেচুলিয়া শব্দময় হয়ে ওঠে।

একটু বাদে একটি হরিণ ত্রস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায়, আর তাই তাকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সে এক পলকের জন্য। আমাদের দেখতে পেয়েই সে ছুটে পালায় পাশের ঘাসবনে। অদৃশ্য হয়ে যায় দৃষ্টির বাইরে।

রামচাঁদ হৈ হৈ করে তাকে ধরবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা করে। তারপরে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। দুঃখের সঙ্গে বলে, "ইস, একটু আগে যদি টের পেতাম।"

"কি করতে তাহলে ?"

"চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতাম।"

"ধরতে পারতে ?"

"না পারলে মেরে ফেলতাম।"

"কাজটা কি ভাল হত ?"

"তাছাড়া কি করব, এটা যে সাধারণ হরিণ নয়, কস্তুরীমৃগ।"

ভয়ার্ত হরিণটির মুখখানি আবার আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। বদ্রীনাথের পথে পাওয়া সেই কস্তুরীমৃগটির কথাও মনে পড়ে। তাই চুপ করে থাকতে পারি না। বলি, "এই সব প্রাণীরা হিমালয়ের সম্পদ। আমাদের দেশের ঐশ্বর্য। এইভাবে অকারণে তোমরা কেন এদের হত্যা কর ? এরা যে ক্রমেই কমে যাচ্ছে..."

কিন্তু এসব কথা তাকে বলা বৃথা। হিতোপদেশ ভাল লাগে না তার। তাই রামচাঁদ শেষ করতে দেয় না আমাকে। বলে ওঠে, "জোরে বৃষ্টি আসছে, চলুন এবারে তাড়াতাড়ি পা চালানো যাক।"

অগত্যা নীরবে চলা শুরু করি। কিছুক্ষণ বাদেই আড়াআড়ি ভাবে পাহাড়টিকে অতিক্রম করে পাথরনাচুনির দিকে প্রসারিত গিরিশিরাটির ওপরে এসে পৌঁছই আমরা।

গিরিশিরাটি ফুট তিনেক চওড়া। পথের একটা দিক খাড়া নেমে গেছে নিচে, কম করেও হাজার দুয়েক ফুট। তাকাতে ভয় করে। আর একদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে এই সংকীর্ণ পথ। সেও কম ভয়াবহ নয়।

আবহাওয়া সম্পর্কে রামচাঁদের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয় নি। বৃষ্টি বাড়ে নি, বরং একেবারে কমে গেছে। তাই চারিদিককে এখন বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। দূরদিগন্তে আকাশছোঁওয়া বৃষ্টি-ভেজা নানা রঙের পাহাড়গুলি যেন পটে আঁকা ছবি।

কিছুদিন বাদেই ওরা বরফে ঢেকে যাবে। তখন নানা রঙের বৈচিত্র্য যাবে মুছে, সবাই সাদা হবে। কিন্তু সেই শুচিশুভ্র রূপ দর্শন করতে কেউ আসবে না এখানে।

পথ যে আর ফুরোয় না—চড়াই পথ। সেই কখন চলা শুরু করেছি, এখনও শেষ হয় নি। কখন হবে কে জানে? অমিতাভ আর সুজলের কথা তো ভাবতে পারছি না। ওরা আজ সকালে হাঁটা শুরু করেছে, বিকেল গড়িয়ে এল, এখনও হাঁটছে। তবে ওদের দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে ওদের কোন কষ্ট হচ্ছে। বেশ বহাল তবিয়তে আছে। আমাদের সঙ্গে সমানতালে চড়াই ভাঙ্গছে।

কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে আমার টুপিটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। ধরবার কোন রকম ফুরসতই পেলাম না। টুপিটা প্রথমে পাশের পাহাড়ের গায়ে গিয়ে আছাড় খেল। তারপরে ঘুরপাক খেতে খেতে নিচে গড়াতে থাকল। যত নামছে, তত বেগ বাড়ছে। অবশেষে শ'তিনেক ফুট নিচে গড়িয়ে একটা পাথরে আটকে গেল।

হিমালয়ের পথে মাথা থেকে টুপি উড়ে যাওয়া এই আমার প্রথম নয়। মনে পড়ছে এক যুগ আগের সেই প্রথম হিমালয়-যাত্রার কথা। করুণাময় কেদারনাথ দর্শনে চলেছিলাম। এমনিভাবে একদিন বিকেলে টুপিটা উড়ে গিয়েছিল। তার পরদিনই আমাদের কেদারনাথ পৌঁছবার কথা। ভাবলাম কেদারনাথে গিয়ে টুপি কিনে নেব। কিন্তু হায়, পরদিনই পথে শুরু হল তুষারপাত। মাথাটাকে নিয়ে সেদিন কি মুশকিলেই না পড়েছিলাম! ভেবেছিলাম ঘোড়ার জন্য রাজার রাজ্য গিয়েছিল, আর টুপির জন্য তীর্থযাত্রীর জীবন যাবে। সে ভাবনা সত্য হয় নি। করুণাময় কেদারনাথের অসীম করুণায় সেবারে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পেয়েছিল। তবে হিমালয়ের পথে টুপির প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম।

তাই রামচাঁদকে বলি, "কাউকে পাঠিয়ে টুপিটা তুলে আনার ব্যবস্থা কর। যে আনতে পারবে, তাকে এক টাকা দেব।"

রামচাঁদ একজন কুলিকে কথাটা বলতেই সে পাথরের সঙ্গে ঠেস দিয়ে পিঠ থেকে মালটা নামায়। তারপরে সেই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নামতে থাকে নিচে। দেখে ভয় হচ্ছে পড়ে না যায়। টুপির জন্য আমার প্রাণ যেত কিনা জানি না, কিন্তু এক টাকার জন্য বুঝি ঐ লোকটার জীবন যায়।

একাধিক আছাড় খেলেও শেষ পর্যন্ত লোকটির প্রাণ রয়ে গেল। সে আমার টুপি নিয়ে উঠে এল ওপরে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে টুপিটা আমাকে দিয়েই পথে বসে পড়ল। খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইল। বেচারী খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে সে একটু হেসে উঠে দাঁড়ায়। টাকাটা নিয়ে নিজের মালের কাছে এগিয়ে যায়। আমরাও এগিয়ে চলি পাথরনাচুনির পথে।

॥ পনেরো ॥

বিকেল ছটার সময় থামল রামচাঁদ। কাজেই থামতে হল আমাদের। পাহাড়ী পথের নিয়ম তাই। আগের মানুষ থামলে, পেছনের মানুষকে থামতে হয়।

রামচাঁদ বলে, "এখানেই তাঁবু ফেলব আজ।"

সংবাদটা শুভ। আমরা সবাই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তার ওপর আবার জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু জায়গাটির অবস্থান দেখে রামচাঁদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। সংকীর্ণ গিরিশিরা। একপাশে খাদের ওপারে পাহাড়, একটি নয়, দুটি নয়—অগণিত। একটির পর একটি। ঢেউয়ের পর ঢেউ। সবুজ কালো ধূসর আর সাদার ঢেউ। নানা আকারের পাহাড় মিলে এক-একটি ঢেউ। কিন্তু ঢেউগুলির ঢং প্রায় একই রকম। অন্তত অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য না করলে তাই মনে হয়। অথচ জানি, হিমালয়ে এক রকমের দুটি পাহাড় খুঁজে পাওয়া ভার।

আর একপাশেও খাদ। গভীর খাদ। খাদের নিচে বন—বাগচো বন। বনের ধার দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী—নদীর তীরে তারতোর গ্রাম। তারতোর থেকে শুক্‌রি হয়ে ওয়ান যাবার পথ। তারতোর গ্রামে মেষপালকদের কয়েকটি কুটির আছে। কুটির কটি এখানকার পান্থনিবাস।

ওপরে পাহাড়, নিচে জঙ্গল। তারই মাঝে এই অপ্রশস্ত গিরিশিরা—পাথরনাচুনি। পাথরনাচুনিতে তাঁবু পড়ল। গিরিশিরাটি সংকীর্ণ বলে একই সারিতে তাঁবু ফেলতে হল আমাদের।

ছোট বড় রঙ্গীন তাঁবুগুলি দেখতে মন্দ লাগছে না। অমিতাভ ও সুজলকে একটি তাঁবু দেওয়া হয়েছে। ওরা আমাদের চেয়ে বেশি পরিশ্রান্ত। ওরা আজ ওয়ান থেকে পাথরনাচুনি এসেছে। একদিনে পাঁচ হাজার ফুট দুর্গম চড়াই ভেঙ্গেছে। ওয়ানের উচ্চতা ৮,০০০ ফুট আর পাথরনাচুনি ১৩,০০০ ফুট উঁচু। কাজেই ওদের একটু বিশ্রাম করা উচিত। কিন্তু উচিত কর্ম ক'জন করে এ সংসারে। যাদের জন্য তাঁবু নির্দিষ্ট হল, তারা কফি খেয়ে আমাদেরই সঙ্গে সমানে আড্ডা দিতে শুরু করে দিয়েছে।

একে তো জায়গাটা তেরো হাজার ফুট উঁচু, তার ওপর বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বইছে। বেশ শীত-শীত করছে। আমরা সমস্ত গরম পোশাক পরেও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত জমে যাবে। একটু আগুন পোহাতে পারলে হত। কয়েকজন কুলি নিচে গেছে কাঠ ও জল আনতে। তারা কখন আসবে কে জানে। বীর জনতায় খিচুড়ি চড়িয়েছে। জনতা স্টোভে গরম খিচুড়ি রান্না হতে পারে; কিন্তু শরীর গরম হয় না।

এখানে সর্বদাই বোধ হয় মেঘ আর কুয়াশার মেলা। মেঘমালা মাঝে মাঝে ঢেকে ফেলেছে আমাদের। আমরা মেঘাবৃত হয়ে কাঠের প্রতীক্ষা করছি। কুলিদের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় পল গুনছি। ভাবছি—ঐ আসে, ঐ আসে।

কিছুক্ষণ বাদে ওরা এলো। ওরা কাঠ নিয়ে এলো। আগুন জ্বালানো হল। হুতাশনের

উষ্ণ স্পর্শে আমাদের সকল অবসাদের অবসান হল। ধন্য তুমি হে অগ্নি! হে ধর্মপুত্র, হে বৈশ্বানর, তোমাকে প্রণাম করি।

একটু বাদে রামচাঁদ এসে বলে, "কুলিরা এখানে থাকতে চাচ্ছে না।"

"কেন?" বিস্মিত হই।

"এখানে শীত বেশি।"

"কোথায় কম!" অসিত জিজ্ঞেস করে।

"বাগচোতে। সেখানে ঘর আছে। সেই ঘরে রাত কাটাতে চায় ওরা।"

"ঘর পেলে কেই বা তাঁবুতে থাকে। তাছাড়া বাগচো এখান থেকে হাজার খানেক ফুট নিচে। ওখানে শীত কম। ওদের তেমন জামা-কাপড় নেই। কিন্তু ওরা যদি কাল সময়মত না আসে?"

"আসবে না মানে, আমি ঘাড় ধরে নিয়ে আসব না?"

"তুমি আবার যাবে কাল সকালে?"

"কাল সকালে কেন, আমি তো আজই যাচ্ছি ওদের সঙ্গে।"

এইবার বোঝা গেল ব্যাপারটা। কুলিরা যাচ্ছে না, রামচাঁদই এদের নিয়ে যাচ্ছে নিচে। নিচে ঘর আছে, জল আছে। আর নিচে আমরা থাকব না। কাজেই নিশ্চিন্তে কালকের অভিনয়ের মহড়া দিতে পারবে।

আমরা চুপ করে আছি। রামচাঁদ আবার বলে, "তা ছাড়া কাল সকালে তো এমনি বাগচো যেতে হত।"

"কেন?" দেবকীদা জিজ্ঞেস করেন।

"কাঠ আনতে। এর পরে আর কোথাও কাঠ পাওয়া যাবে না। তাই আমরা আজ রাতেই বাগচো চলে যাচ্ছি। কাল সকাল আটটার মধ্যে একেবারে কাঠ নিয়ে চলে আসব এখানে, আপনারা তৈরি থাকবেন।"

অগত্যা অসিত অনুমতি দেয়। কিন্তু রামচাঁদ তবু চলে যায় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মোহিত জিজ্ঞেস করে, "আর কিছু বলবে নাকি?"

"জী সাব।"

"বেশ বল।" অসিত বলে।

"সাব এর নাম আলম সিং, আমাদের কুলি। খুব কাজের লোক।" রামচাঁদ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দেখিয়ে দেয়। "একে একটু শরাব দিতে হবে। এর রোটি না হলে চলে, কিন্তু সন্ধ্যায় শরাব না হলে চলে না।"

"শরাব?" হেসে দেয় দাশু, "শরাব পাব কোথায়? আমাদের সঙ্গে তো শরাব নেই।"

"সে কি, আপনারা পাহাড়ে এসেছেন, আর শরাব আনেন নি সঙ্গে!" রামচাঁদ বিস্মিত।

"এনেছি।" দেবকীদা বলে ওঠেন।

আমরা সবাই তাঁর দিকে তাকাই। রামচাঁদ অনুনয় করে, "দিন না তা হলে একটু।"

"কিন্তু তাতে কি আলমের কাজ চলবে?"

"খুব চলবে।" রামচাঁদ দেবকীদার প্রশ্নের উত্তর দেয়।

"বেশ, অসিত একটু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে দাও ওকে।"

"ব্র্যাণ্ডি?" যেন মর্মাহত হয় রামচাঁদ।

"হ্যাঁ, এক শিশি ব্র্যাণ্ডি ওষুধ হিসেবে সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমরা।" দেবকীদা বলেন,

"তাই থেকেই একটু দিচ্ছি ওকে।"

"না না, ব্র্যাণ্ডিতে কি হবে আলমের ? ওর দেশী সরাবের অভ্যেস।" একটু থেমে রামচাঁদ আবার বলে, "মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। অথচ শরাব না পেলে আলম কাল সকালেই ওয়ান চলে যাবে।"

সত্যই সমূহ বিপদ। এই উচ্চতায় একজন কুলি কমে গেলে চলবে কেমন করে ? ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।

সহসা অমিতাভ কথা বলে, "ওহে আলম, এদিকে এসো তো।"

আলম নতমস্তকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। চোখ দুটি কোটরাগত। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। পরনে সরু পায়জামা ও গলাবন্ধ কোট। মাথায় পাহাড়ী টুপি। সে সেলাম করে সবাইকে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ভক্তি উছলে পড়ছে।

তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে অমিতাভ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে, "কতদিনের নেশা ?"

"বিশ বছরের।" লজ্জা-জড়িত স্বরে জবাব দেয় আলম।

"তাহলে তো শরাব না হলে তোমার খুবই মুশকিল।"

"জী সাব।" আলম আশান্বিত হয়।

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো শরাব নেই ভাই।" অমিতাভ থামে। আমরা আলমকে লক্ষ্য করি। তার মুখের মৃদু হাসি উবে গেছে। অমিতাভ আবার বলতে থাকে, "তবে তোমার তো নেশা হলেই চলবে।"

"সাব...." আলম ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।

"শরাব না খেয়ে অন্য কিছু খেয়ে যদি তোমার নেশা হয়, তাহলেই তো তোমার চলবে ?"

"তা হ্যাঁ, তা হলে চলে যাবে। সে রকম কিছু আছে নাকি আপনার কাছে ?" আবার আশার আলো জ্বলে ওঠে আলমের মুখে।

"এ কথা আর কাউকে বলতে পারবে না।"

"না সাব, কাউকে বলব না।" আলম অঙ্গীকার করে।

"আমার কাছে একটা নেশার ওষুধ আছে।"

"আমাকে একটু দিন না সাব, আমি বেঁচে যাই। আমি কাউকে বলব না। আমাকে বাঁচান সাব।" আলম মিনতি করে।

অমিতাভ তার তাঁবু থেকে হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিয়ে আসে। আলম উৎসাহিত। আমরা উদ্গ্রীব।

খোঁজাখুঁজির পরে একটা শিশি বের করে অমিতাভ। সাধারণ হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতই দেখতে। অমিতাভ কয়েকটি বড়ি কাগজে ঢালে। আলমকে বলে, "হাঁ কর।"

আলম নির্দেশ পালন করে। অমিতাভ বড়ি কটি তার গলায় ঢেলে দিয়ে বলে, "এবারে একটু জল খেয়ে এখানে একটু বসো, দেখবে পাঁচমিনিটে কি রকম নেশা হয় !"

রামচাঁদ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে বলে, "আমি তা হলে নিচে চলে যাই। কুলিরা অনেকেই চলে গেছে।"

"না না, তুমি গেলে চলবে কেমন করে ? আলমকে নিয়ে যাবে কে ? তার যে নেশা হয়ে এলো বলে।" অমিতাভ রামচাঁদকে বাধা দেয়।

কিছুক্ষণ বাদে আলম জল খেয়ে ফিরে আসে। আমরা তার দিকে তাকাই। অমিতাভ জিজ্ঞেস করে, "কি, কেমন ?"

"আচ...ছাঁ...আ।" আলম উত্তর দেয়।

"কাম হুয়া?"

"হো....র....হা।"

আলম যেন খুশিতে উপচে পড়ে। মানুষ মাতাল হতে কত ভালবাসে।

সত্যই মাতাল হয় আলম। সে টলতে শুরু করে। সে অমিতাভকে সেলাম করে। অর্ধজড়িত স্বরে বলে, "অপনে হমকো ব...চা দীয়া সাব। ...বহৎ কড়....ড়া চীজ দী...য়া..."

"এবার তাহলে তুমি রামচাঁদের সঙ্গে নিচে চলে যাও।" অমিতাভ রামচাঁদকে ইশারা করে। রামচাঁদ তাকে ধরে ধরে নিয়ে চলে। আর টলতে টলতে চলতে থাকে আলম। চলতে চলতে বার বার সেলাম করে আমাদের। আর বলে, "হমকো...বচা দীয়া। বহৎ কড়...ড়া চীজ...."

বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যাবার পরে অমিতাভকে জিজ্ঞেস করি, "কি ওষুধ দিলে?"

"Koch Lymph-30, সংক্ষেপে কক্ থারটি।"

"খেলে কি নেশা হয় নাকি?"

"সবার সব সময় হয় না। তবে কখনও কারো কারো হয়।"

"তার মানে?"

"মানে তোমাদের হবে না। এখন আলমের হয়েছে। কিন্তু কাল সকালে হবে না।" অমিতাভ হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

"আলমের এখন নেশা হল কেন?"

"সে নেশা করতে চাইছিল বলে।" অমিতাভ হাসছে।

"হেঁয়ালি রেখে পরিষ্কার করে বল তো।"

"অভাববোধ যেমনি পীড়াদায়ক, প্রাপ্তি তেমনি আনন্দদায়ক। নেশা করার নেশায় ভুগছিল আলম। নেশার ওষুধ পেয়ে তার অভাব ঘুচেছে, সে আনন্দে নেশায় মশগুল হয়েছে।"

"তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল?"

"মানসিক।" উত্তর দেয় অমিতাভ। "মনের আশা পূর্ণ হবার নেশায় মাতাল হয়ে টলতে টলতে চলে গেল আলম।"

"ব্রেভো ব্রাদার!" বলে আবেগে অমিতাভকে জড়িয়ে ধরে অসিত।

জাগরণ ও সুপ্তির সংমিশ্রণে রাতটা কাবার হল কোনমতে। গতকাল ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে এসেছিলাম পাথরনাচুনি। বরফ ও বৃষ্টি মাথায় করে চড়াই ভেঙ্গে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাতে যদি একটু ভাল খাবার ও গরম বিছানা পেতাম, তাহলে হয়ত ঘুমোতে পারতাম। কিন্তু নানা কারণে কাল কোনটাই পাই নি আমরা। তার ওপরে মাঝে মাঝেই তুষারপাত হয়েছে আর তুষারাবৃত হিমালয়ের হিমেল হাওয়া তাঁবুর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

এখন শুক্লপক্ষ চলেছে। আমরা তুষারতীর্থ ত্রিশূল ও নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টির কত কাছে। কত আশা ছিল, এখান থেকে চাঁদের আলোয় ওদের দেখব। দেখে ধন্য হব। সে আশা সফল হয় নি। শীত ও তুষারকে উপেক্ষা করে কতবার বাইরে এসেছি। কিন্তু হায়, কোথায়

কৌমুদী ! আকাশ শশাঙ্কশূন্য, নিশাকরহীন নিশা।

অমিতাভর ওষুধ খেয়ে টলতে টলতে চলে গিয়েছিল আলম ! কিছুক্ষণ বাদে বীর এক গ্লাস পরিজ আর কয়েকখানি বিস্কুট নিয়ে এসেছিল। সেই বিস্বাদ পানীয় গলাধঃকরণ করে শুয়ে পড়েছিলাম। জাগরণ ও সুপ্তির সংমিশ্রণে রাতটা কোনমতে কাবার হয়েছে।

তাঁবুর মধ্যে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে শুয়ে থাকতেই শীত লাগছে। বাইরে বেরুলে শীতে কষ্ট পাব। তবু আর শুয়ে থাকতে পারি না। বাইরে বেরিয়ে আসি।

কাল রাতে বেশ বরফ পড়েছে চারিদিকে। কুয়াশা আর মেঘের আনাগোনা চলেছে। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যে কোন সময় তুষারপাত শুরু হতে পারে। আবহাওয়াই ভাবিয়ে তুলেছে আমাদের। অথচ কয়েকদিন আগেও নাকি আবহাওয়া খুব ভাল ছিল।

মনে পড়ছে অণিমাদি মানে শ্রীমতী অণিমা সেনগুপ্তার কথা। কয়েক বছর আগে তিনি এসেছিলেন এ পথে। বাগুয়াবাসায় পৌঁছবার পরে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরম্ভ হয়। তিনদিন তিনরাত তাঁরা বন্দী থাকেন সেখানে। সেবারে রূপকুণ্ড দর্শন না করেই অণিমাদিকে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু এ পরাজয় মেনে নেন নি তিনি। পরের বছর অণিমাদি আবার এসেছেন এখানে। দর্শন করেছেন রহস্যময় রূপকুণ্ড। তিনিই বোধ করি সেই রহস্যের প্রথম বাঙালী মহিলা সাক্ষী। তার আগে কোন বাঙালী মেয়ে পৌঁছতে পারেন নি রূপকুণ্ডে।

তার পরের বছরও অণিমাদি এসেছিলেন কুমায়ুনে। আর সেই তাঁর শেষ হিমালয় যাত্রা। কিন্তু সে অগস্ত্যযাত্রার কথা এখন নয়। এখন নিজেদের কথায় ফিরে আসা যাক।

অণিমাদির প্রথম রূপকুণ্ড অভিযানের মত আমাদের এ অভিযানও যদি বিফল হয় ? আমরা যদি রূপকুণ্ড পর্যন্ত পৌঁছতে না পারি ? দুঃখ করব না। পরাজয়ে বিচলিত হব না। অণিমাদির মতই আমরা আবার আসব। যেমন করেই হোক আমাদের যে যেতে হবে সেই অপরূপ রহস্যালোকে। সে যাত্রা যদি আমার অগস্ত্যযাত্রা হয়, তাহলেও দুঃখ করব না। বরং শেষ নিঃশ্বাস নেবার আগে প্রাণভরে হিমালয়কে দেখব আর ভাবব--আমার এই ক্ষুদ্র জীবন ধন্য হল।

হিমালয় চিরকাল এমনি করে কাছে ডেকেছে মানুষকে। কেউ সে ডাকে সাড়া দিয়েছেন, কেউ দেন নি। যাঁরা সাড়া দিয়ে কাছে এসেছেন, হিমালয় তাঁদের দিয়েছে বাধা। সে বাধাকে অতিক্রম করে সবাই পৌঁছতে পারেন নি তাঁদের লক্ষ্যে। যাঁরা পারেন নি তাঁদের যাত্রাও বিফল হয় নি, ব্যর্থ হয় নি তাঁদের তপস্যা। তাঁদের সাধনা পরবর্তী কালের পর্বতারোহীদের সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তাই তাঁদের কথাও লেখা থাকবে পর্বতারোহণের ইতিহাসে। লেখা থাকবে অণিমা সেন ও গৌরাঙ্গ চৌধুরীর কথা, যেমন লেখা আছে মৃত্যুঞ্জয়ী ম্যালোরী আর আরভিণের অবিস্মরণীয় ইতিহাস—

শ্রীরাধানাথ শিকদার ১৮৫২ সালে এভারেস্ট আবিষ্কার করেন। কিন্তু প্রথম এভারেস্ট অভিযান পরিচালিত হয় ১৯২১ সালে কর্নেল হাওয়ার্ড বিউরীর নেতৃত্বে। ডক্টর এ. এম. কেলাস্ ও জর্জ এল. ম্যালোরী এই অভিযানের সদস্য ছিলেন। অভিযানকালে ১৭,২০০ ফুট উঁচুতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ডক্টর কেলাস্ মারা যান। তিনিই এভারেস্ট অভিযানের প্রথম শহীদ।

১৯২২ সালে জেনারেল চার্লস জি. ব্রুসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযান পরিচালিত নয়। ম্যালোরী এই অভিযানের সদস্য ছিলেন।

তৃতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ১৯২৪ সালে জেনারেল ই. এফ. নর্টনের নেতৃত্বে। এই

অভিযানের সদস্য ছিলেন ম্যালোরী, ডাঃ টি. হাওয়ার্ড সমারভেল, জে. জিওফ্রে ব্রুস এবং নবাগত এন. ই. ওডেল্‌ ও এ্যানড্রু আর্ভিন। প্রাণপণ করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিযাত্রীরা বিশ্বের উচ্চতম স্থানে পৌঁছতে চাইলেন। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও তাঁরা দুর্বার বেগে এগিয়ে চললেন। তাপাঙ্ক তখন মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি ফ্যারেনহাইট। তাহলেও নর্টন ও সমারভেল ২৬,৮০০ ফুট উঁচুতে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁরা সেইখানেই থামলেন না। শিখরের দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু সমারভেলের তুষারক্ষত ও গলা ব্যথার জন্য ২৮,০০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেও তাঁরা নেমে আসতে বাধ্য হন। শুকনো হিমেল হাওয়ায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেবার ফলেই সমারভেল অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অসুস্থতার জন্যই শিখর অভিযান স্থগিত রইল।

কয়েকদিন বাদে অভিজ্ঞ ম্যালোরী ও তরুণ আর্ভিন (২২) অক্সিজেন সঙ্গে নিয়ে শিখর অভিযান আরম্ভ করেন। তারপর...ফ্রাঙ্ক স্মাইথের ভাষায়—'On the day they left the highest camp to make their attempt on the summit, he (N. E. Odell) saw them "going strong" along the broken crest of the north-east ridge. It was only a fragmentry glimpse between swirling mists and it was the last ever seen of them for they failed to return. In Mallory, Everest lost its most formidable opponent and mountaineering one of its most brilliant figures. Of him Norton wrote, "It was the spirit of the man that made him the great mountaineer he was : a fire burnt in him and caused his willing spirit to rise superior to the weakness of the flesh." He was indeed a knight "sans peur et sans reproche" amongst mountaineers.'

নয় বছর বাদে ১৯৩৩ সালে পরবর্তী এভারেস্ট অভিযান সংগঠিত হয় হিউ রাটলেজের নেতৃত্বে। অভিযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ফ্রাঙ্ক স্মাইথ, এরিক শিপটন, জে. এল. লংল্যাণ্ড, এল. আর. ওয়েজার ও পি. উইনহ্যারিস।

এই অভিযান প্রসঙ্গে স্মাইথ বলেছেন—

'Camp Six was pitched at 27,400 feet, and from it two attempts were launched on the summit...During the course of their attempt. Why Harris and Wager discovered an ice-axe which can only have belonged to either Mallory or Irvine. It is thought that one of them slipped. The other put down his axe the better to hold the rope in both hands and check the fall of his sliding companion. He failed to do so and the ice-axe was left there, sole testimony of the disaster.'

"কি হে, ঘুম ভাঙ্গল ?" দেবকীদা আমার ভাবনা ভেঙ্গে দেন।

তিনি পায়চারি করছিলেন বাইরে। তেরো হাজার ফুট উঁচুতে এসেও কলকাতার অভ্যেসটি বজায় রাখছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন কাছে। হাসতে হাসতে আবার জিজ্ঞেস করেন, "ঘুম ভাঙ্গল ?"

"ভাঙ্গবে কি, শীতে সারারাত ঘুমোতে পারি নি।"

"আমারও একই অবস্থা। কেউ বোধ হয় ভাল ঘুমোতে পারে নি। তোমরা তবু শুয়ে ছিলে। আমি কিন্তু ফর্সা হতেই বেরিয়ে এসেছি বাইরে। আর এসেই একটা মস্ত লাভ হয়েছে আমার।"

"কী ?"

"সূর্যোদয় দেখেছি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সূর্যোদয় বলা অবশ্য ভুল। সূর্য এখনও মেঘে ঢাকা, তখনও তাই ছিল। আমি দেখেছি আলোর উদয়। আলো এসে কেমন করে কালোকে গ্রাস করে ফেলে। দূরের ঐ অগণিত পর্বতশ্রেণী ছিল আঁধার ঘেরা। একটির পর একটি আলোর ঢেউ এসে সেই অসীম কালো আঁধারকে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল।"

"কতক্ষণ আগে ?"

"তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হল।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেবকীদা বলেন, "ঠিক পৌনে সাতটায় সূর্যোদয় হয়েছে।" বলেই কথাটা খেয়াল হয় দেবকীদার। উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, "আরে তাই তো, এ যে দেখছি আটটা বাজে। বাবুদের তো বেড্-টি না হলে ঘুম ভাঙ্গবে না। এসো, চায়ের জল বসিয়ে দেওয়া যাক। জল বোধ হয় জমে গেছে।"

চা-পর্ব শেষ হতে নটা বাজল। বীর রান্না চাপিয়ে দিল। কুলিরা এখনও আসে নি এখানে। তাই বীরকে গিয়েই নিচের ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু ওরা দেরি করছে কেন ? রামচাঁদ বলে গিয়েছিল, আটটার মধ্যে এসে যাবে।

খবর নিতে হলে নিজেদেরই যেতে হয়। হিমেল হাওয়াকে উপেক্ষা করে আমরা তাঁবু ছাড়িয়ে কিছুদূর নেমে আসি। সামনেই তারতোর গাঁয়ে যাবার পথ। খাড়া নেমে গেছে নিচে। এত খাড়া যে পথের প্রথমাংশ দেখা যায় না। তবে অনেক নিচে পথের শেষাংশ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। আমরা একটা বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিই। হাওয়াটা কম লাগছে এখানে। কাছেই কয়েকখানি ছোট পাথর পড়ে আছে। পাথরের ওপরই বসলাম আমরা।

জায়গাটির অবস্থান বড়ই সুন্দর। সামনেই নন্দাঘুণ্টির শ্বেতশুভ্র শিখর। তারতোর গাঁয়ের পায়েচলা পথটি যেন তারই গা থেকে উঠে এসেছে। নিচে বাগচোর গহন বন। নন্দাঘুণ্টির পেছনে সুনীল আকাশ। মনে হচ্ছে সুবিরাট এক রঙ্গমঞ্চের সামনে বসে আছি। পেছনে টানানো রয়েছে অসীম হিমালয়ের জীবন্ত ছবি। এই সংকীর্ণ গিরিশিরা আর ঐ পায়েচলা উৎরাই পথটিকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চ। এখন মঞ্চ অভিনেতাশূন্য। আমরা দর্শক পাথরের আসনে বসে অভিনেতাদের প্রতীক্ষারত। পরিচালক অসিত হুইসিল দিয়ে চলেছে।

বাঁশি বিফল হয় নি কোনকালে। সেকালে শ্যামের বাঁশির সুরে রাই ছুটে এসেছে। একালে অসিতের বাঁশির টানে রাম ছুটে আসছে।

রামচাঁদ একা নয়। রামচাঁদের পেছনে কয়েকজন কুলি। তারা চড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠছে। রামচাঁদ আসছে আগে আগে, কুলিরা তার পেছনে। কিন্তু রামচাঁদের সঙ্গে ওদের দূরত্ব ক্রমেই যাচ্ছে বেড়ে। ওরা অমন টলতে টলতে পথ চলছে কেন ? ওরা কি নেশা করেছে নাকি ? কিন্তু অমিতাভ তো নেশার ওষুধ খাইয়েছে কেবল আলমকে। তার সঙ্গে রাত্রিবাস করেই কি ওদের নেশা হয়ে গেল ? না, ওদের সঙ্গে দিশী জিনিস ছিল ? হিমালয়ের মানুষ ওরা। মদ না হলে যে মন ভরে না ওদের।

রামচাঁদ উঠে এলো ওপরে। সুপ্রভাত জানালো আমাদের।

জিজ্ঞেস করি, "এত দেরি করলে কেন ?"

"কি হবে আগে এসে। আজ যে আমাদের এখানেই থাকতে হচ্ছে।"

"এখানে থাকতে হচ্ছে ?" আঁতকে উঠি।

"হ্যাঁ, কুলিদের অবস্থা কাহিল। তারা কেউ বোঝা নিয়ে ওপরে যেতে পারবে না।"

"কেন, কি হয়েছে ?"

'কারও মাথাব্যথা, কারও দাঁতব্যথা, কারও পেট, কারও পিঠ, কারও কোমর, কারও

বা পা-ব্যথা।"

"ব্যথাহীন কেউ নেই?" সুজল গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে।

রামচাঁদ কিন্তু বুঝতে পারে তার রসিকতা। সে হেসে জবাব দেয়, "ওদেরই জিজ্ঞেস করুন, ঐ যে ওরা আসছে।"

ব্যথিতরা একে একে উঠে আসছে ওপরে।

অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হচ্ছে।

প্রথম অভিনেতা টলতে টলতে অসিতের সামনে আসে। সে জিজ্ঞেস করে, "কেয়া হুয়া?"

"শির দরদ।"

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে গেছে সামনে। আমাদের নেতা একই প্রশ্ন করে তাকে। সে উত্তর দেয়, "দাঁত দরদ।"

তার পরের জন, "কোমর দরদ।"

তারপরে, "পিঠে দরদ।"

"পেট দরদ।"

"পায়ের দরদ।"

দরদীর দল সারি বেঁধে অসিতের দু পাশে দাঁড়ায়। বিরক্ত নেতা বলে, "বাকি দরদী আদমী কিধর হ্যায়?"

"লেট গিয়া। উঠনেকা কাবিল নহী রহা।" রামচাঁদ জবাব দেয়।

এতক্ষণ বাদে সুজল আবার মুখ খোলে, "কোই বে-দরদী নহী হ্যায়?"

"জরুর হ্যায়, হম্ হ্যায়।"

তাকিয়ে দেখি বীরপুঙ্গব আর কেউ নয়, শ্রীমান আলম সিং। সে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে একবার একটু হাসে। তারপরে এক-পা দু-পা করে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

অসিত কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য দেখালে আজ। শান্ত স্বরে রামচাঁদকে প্রশ্ন করে, "তাহলে এরা আজ কি করবে ঠিক করেছে? এখানেই থাকবে, না কিছু কিছু করে কাঠ রেখে আসবে ওপরে?"

"তা...." একবার থামে রামচাঁদ। কি যেন একটু ভাবে। তারপরে বলে, "তা আসতে পারে। তাই তো, কথাটা যে মনে পড়ে নি এতক্ষণ।"

"এবার যখন পড়ল, ব্যবস্থা করে ফেল। যতটা করে সম্ভব শুকনো কাঠ রেখে এসো হুনিয়াথরে।"

"হুনিয়াথর?" রামচাঁদ বিস্মিত হয়।

"হ্যাঁ। আমরা আর বাগুয়াবাসায় থামব না। কাল হুনিয়াথরে রাত কাটাবো।" নেতা বলে।

"আচ্ছা দেখছি কি করা যায়?" রামচাঁদ কুলিদের ইশারা করে বাগচোর উৎরাই-পথে নেমে যায়। যেতে যেতে বলে, "আপনারা আর বাইরে থাকবেন না। সর্দি লেগে যাবে।"

আমরা ফিরে আসি তাঁবুতে। কিছুক্ষণ বাদে কুলিরা কাঠ নিয়ে উঠে আসে ওপরে। আমাদের সেলাম জানিয়ে রওনা হয় হুনিয়াথরের পথে। এখন কিন্তু ওদের দেহের কোন এলাকায় কোন দরদের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

খাওয়া সেরে আমরা এসে জড়ো হলাম উপেনবাবুর তাঁবুতে। এ তাঁবুটি অপেক্ষাকৃত

বড়। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে হঠাৎ দাশু বলে উপেনবাবুকে, "আপনি কিন্তু ওয়ানে কি কি গাছপালা দেখলেন, কিছুই বললেন না আর।"

"আবার সেই নীরস আলোচনার বৈঠক বসাবে?"

"দোষ কি?" দেবকীদা বলেন।

"দোষ আছে বৈকি আপনাদের সময় নষ্ট হবে।"

"হোক্ গে, আপনি আরম্ভ করুন।" মোহিত বলে।

নিরুপায় উপেনবাবু আরম্ভ করেন :

"কয়েকটা Fir ছাড়া ওয়ানের চতুর্দিকে সুউচ্চ Conifer গুলো সবই Cupressus (cypress)। ওরা ওয়ানের পরিবেশকে অপূর্ব করে তুলেছে। ওয়ান থেকে বৈদিনীর পথে প্রথম দিকে Pyracautta, Princepia ও Berberis–এর কাঁটাঝোপ দুধারে দেখতে দেখতে আমরা রণকধারের গিরিশিরা অতিক্রম করেছি। এগিয়ে এসেছি সেই রুক্ষ ঢালের গা বেয়ে। অর্ধবৃত্তাকার সে ঢালের মুখ ছিল দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে। কাজেই রিক্ততার ছাপ প্রকট হয়ে রয়েছে তার সর্বাঙ্গে। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু বলে ক্ষুদে Berberis Kumaoneusis কাঁটাসর্বস্ব হয়ে ঢেকে রেখেছিল অনেকটা জায়গাকে। কিন্তু তাদের গাঢ় রক্তবর্ণের ছোট ছোট গোলাকার ফল আমাদের চোখে পড়েছে। রণকধারের মাথার উপরে বেখাপ্পা অবস্থায় ছড়িয়েছিল Quercus Semecarpifolia। সেখান থেকে নামার সময় যে বিরাট অর্ধচক্রাকার ঘন বনপথ ধরেছিলাম, তার আবার অধিকাংশ গাছই Q. Semecarpifolias। তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত Rhododendron Arboreum তো ছিলই, তার মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া গেছে Taxus Baccata। যাদের কথা সেদিন তোমাদের বলেছি। সেদিন পথে Hydrangea, Cornus ইত্যাদি মোটামুটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণেই ছিল। আর ছিল Schisandra। আবার অনেকটা নামার পর ছোট সেতুটি অতিক্রম করার সময় নদীর ধারে লালফুলওয়ালা Polygonum Amplexicanle আর Epilopium–এর প্রাচুর্য দেখেছিলাম। এর পরে চড়াইপথের শেষ ধাপের আগেই বুগিয়ালের খানিকটা স্বরূপ দেখতে পেয়েছি। আপাতদৃষ্টিতে বুগিয়ালকে তৃণসর্বস্ব মনে হলেও সেখানে রঙীন ফুলের লুকোচুরি চোখে পড়েছে। এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরে বলব। আগে বৈদিনীতে ওঠার আগে একক Rhododendron Arboreum–এর যে সমাবেশ দেখেছিলাম তার কথা বলে নিই। হিমালয়ের যে সব জায়গা এ পর্যন্ত দেখেছি এরকম সাথী (Quercus) বিহীন একক Rhododendron–এর রাজত্ব আর কোথাও দেখতে পাই নি। জুন মাসে এদের আগুন ধরানো রূপ না দেখা পর্যন্ত আমি পৃথিবী ছাড়তে পারব বলে মনে হয় না। জুন মাসে আবার আমাকে আসতে হবে এ অঞ্চলে। আসতে হবে ফুল দেখতে।

"এই গিরিশিরার শেষপ্রান্ত বাঁদিকে বৈদিনী ও ডানদিকে আলি—এই দুটি বিস্তীর্ণ বুগিয়াল। নীলগিরি অভিযানের সময় বীরেন আমাকে এই বৈদিনীর Orchid সম্বন্ধে এমন একটা রঙীন চিত্র দিয়েছিল যে, ফুলের সমারোহ সম্বন্ধে একটা স্বপ্নরাজ্য মনে মনে সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু বৈদিনীকে আমার ধ্যানগম্ভীর নগ্ন সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্তি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি। সে সৌন্দর্যে জৌলুস নেই এবং বরফহীন এই নিস্তব্ধতা ও নির্মম রূপ উপলব্ধি ছাড়া বর্ণনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। জল হচ্ছে প্রাণের উৎস, সে বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন। ঠিক একই ভাবে পাহাড়ের গায়ে প্রাকৃতিক উদ্যানই বল, গহন অরণ্যই বল, সবটুকুই জলের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল। সেজন্যই নন্দন-বন নন্দন-কানন, ক্ষীর উপত্যকায় ফুলের

সমারোহে এত সমৃদ্ধ। পাহাড়ের গঠনপ্রকৃতির ওপর ও জলের সান্নিধ্যের অভাবেই যে বিশেষ Alpine Pasture Land, তাকেই বলা হয়ে থাকে বুগিয়াল। এর বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রকৃতি ইউরোপীয় আলপসের তৃণক্ষেত্রের সমতুল্য।

"বৈদিনীকে দেখে হঠাৎ কলকাতার গলফগ্রাউন্ডের কথা মনে এসে যায়। যাক সে কথা, এখন বুগিয়ালের স্বরূপ সম্বন্ধে বলি। সৃষ্টির আদি থেকে সীমিত জলে প্রয়োজন মেটাতে পারে, এই ধরনের বিভিন্ন প্রকারের Alpine Herbs-এর ভেতর টিকে থাকবার প্রতিযোগিতায়, কয়েকটি বিশেষ জাতীয় ঘাস প্রতিষ্ঠা লাভ করে সৃষ্টি করেছে এই বুগিয়াল। বৃক্ষসীমার (১২-১৩,০০০´) উর্ধ্বে বলে এবং অত্যন্ত জলাভাবের জন্য বড় গাছ এখানে আসতে পারে নি। Danthonia আর stipa এই দুটি ঘাসকেই বুগিয়ালে প্রাধান্য লাভ করতে দেখা যায়। মাইলের পর মাইল পাহাড়ের গায়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গুচ্ছাকারে (Clump) দেখতে পাওয়া গেছে Danthonia-য়ের রাজত্ব। বছরে প্রায় ছ'মাস তুষারাবৃত থেকেও এদের দীর্ঘস্থায়ী (Perennial) মূল (rootstock) অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে। জুনের মাঝামাঝি থেকে প্রায় নভেম্বর পর্যন্ত তুষারগলা জল ও বৃষ্টি যতটুকু পায় তাতেই তাদের নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়ে যায়। কয়েকটি কস্তুরীমৃগ এই অনন্ত তৃণভূমির আর কতটুকুই বা সদ্ব্যবহার করতে পারে। নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীরা নিয়ে আসে তাদের মেষপাল—পরিতৃপ্তিতে চলে এদের বিচরণ আর সেই সঙ্গে সংগ্রহ হতে থাকে আমাদের শীতবস্ত্রের উপকরণ।

"দূর থেকে শুধুমাত্র ঘাসের রাজত্ব মনে হলেও, কাছে এলে বুগিয়ালে ঘাসের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় হলদে Saxifrage, আর নীল Gentiana, আর বিভিন্ন প্রভৃতি। সাদা Anaphalis, হলদে Tanaceum, কিছু হলদে Corydalis ও বেগুনি Potentilla—ঘাসের আশ্রয়ে বেঁচে থাকে এরা। মাঝে মাঝে দেখা গেছে ধূপ Jurinea macrocephala গাছ। এরা কোথা থেকে এসে এদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। আর নীল Swertia Cuneata তো অনেক জায়গাতেই ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু বৈদিনীর রুক্ষ উঁচুনিচু নিরাভরণ রূপটি যে প্রকৃত বুগিয়ালের চেহারা নয়, সে আমরা ভাল করে উপলব্ধি করতে পেরেছি এই পাথরনাচুনির পথে। তবে সে কথা আজ নয়, আর একদিন হবে।"

॥ ষোল ॥

পরিশ্রম করতে হিমালয়ে আসা, বিশ্রাম নিতে নয়। পরিশ্রান্ত যাত্রীও তাই বিশ্রামের প্রত্যাশী নয়। তবু যদি অযাচিতভাবে বিশ্রামের সুযোগ পায়, সে খুশি হয় বৈকি।

মালবাহকদের অন্যায় আবদার রক্ষা করতে গিয়ে কাল আমাদের বিশ্রাম নিতে হয়েছে পাথরনাচুনিতে। কিন্তু বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করতে পারি নি। কাল আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল। বাতাস আর বরফ সারাদিন সমানে হামলা চালিয়েছে। তাঁবুর ভেতরে বন্দী রয়েছি আমরা।

নিরুপায় নেতা বাধ্য হয়ে মালবাহকদের অন্যায় আবদার মেনে নিয়েছিল। আমরা কর্মহীন হয়ে বার বার আলোচনা করেছি—রামচাঁদের দরদী শিষ্যরা কিট্ বইতে পারে নি, কিন্তু কাঠ বইতে কোন কষ্ট হয় নি ওদের। ওয়ানে ওরা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে, কাজেই মজুরী বাড়াতে

পারে না। কিন্তু দিন বাড়াতে নেই কোন বাধা। অথচ দিন বাড়ালে মজুরী বাড়ে।

সব বুঝেও ওদের জুলুম মেনে নিয়েছি, কারণ আমরা নিরুপায়।

কাল রাতেও ভাল ঘুমোতে পারি নি। তেমনি জাগরণ ও সুপ্তির সংমিশ্রণে নিশিযাপন করেছি। সকালে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে খুশি হলাম। বৃষ্টি বা বরফ পড়ছে না। তবে কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারিদিক। তাঁবুর ওপরে আর আশেপাশে মুক্তোর মতো বরফ ঝলমল করছে।

প্রকৃতি কিন্তু পরাজিত করতে পারে নি বীর সিংকে। সে ইতিমধ্যে উনোন জ্বালিয়েছে। জল নিয়ে এসেছে। কফি হয়ে এল বলে। কাল রাতেও বীর তাঁবুতে তাঁবুতে গরম কফি ও খাবার দিয়ে এসেছে। নইলে আরও বেশি কষ্ট হত আমাদের। এখানে গরম পানীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সহায় আর আমাদের শ্রেষ্ঠ সহায় বীর। বীর কফির কেটলী নিয়ে এল।

কাল কুলিরা কাঠ রেখে সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসেছে। তবে ওদের সবাই পৌঁছতে পারে নি হুনিয়াথর। অনেকে বাগুয়াবাসায় কাঠ রেখে এসেছে। বাগুয়াবাসা থেকে হুনিয়াথর এক মাইল। আমরা আজ বাগুয়াবাসায় না থেমে এগিয়ে যাব। হুনিয়াথরে তাঁবু ফেলে রাত কাটাবো। শুনেছি জায়গাটি চমৎকার। তা ছাড়া আজ এই এক মাইল এগিয়ে থাকার জন্য কাল অনেক সুবিধে হবে। কাল আমরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। মরণ হ্রদের তীরে পৌঁছব—পারব কী?

ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথ মানে ত্রেচুলিয়ার তৃতীয় গিরিশিরা—সংকীর্ণ ও কঠিন চড়াই এই গিরিশিরা বেয়ে সোজা সামনের পাহাড়টার ওপরে উঠে যেতে হবে। পাহাড়টা পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের।

গিরিশিরার দু'দিকেই গভীর খাদ। খুব সাবধানে চড়াই ভাঙ্গছি।

মিনিট পনেরো বাদেই পৌঁছলাম সেখানে। সেই রূপকথার রাজ্যে, যে রূপকথা শুনেছি বীরেনের কাছে—

সে এক স্বেচ্ছাচারী শৌখিন রাজার কাহিনী। রাজার শখ হল তীর্থদর্শন করবেন। সৈন্যসামন্ত ও তিনজন সুন্দরী নর্তকী নিয়ে রাজা এলেন এখানে। পড়ল তাঁবু। শুরু হল নাচ গান আর মদ্যপান। নারীর মোহে ও মদের নেশায় রাজা তীর্থের কথা বিস্মৃত হলেন।

সহসা এক সন্ধ্যায় নন্দাদেবী রুষ্টা হলেন। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো। গভীর রাতে স্বপ্ন দেখলেন রাজা, লাটুদেবী তাঁকে বলছেন—তীর্থের পথে নারীর স্থান নেই। নর্তকীদের হত্যা করে এগিয়ে যা তীর্থপথে। নইলে ধ্বংস অনিবার্য।

পরদিন প্রত্যুষে রাজা সৈন্যদের বললেন সেই স্বপ্নের কথা। আদেশ করলেন, ওদের জীবন্ত কবর দিতে।

নিজের ভোগবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য রাজা যাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, সেই নিরপরাধী অসহায়াদের পাথর চাপা দেওয়া হল এখানে। রাজরোষে নাচুনিরা পাথর হয়ে গেছে বলে এই বধ্যভূমির নাম পাথরনাচুনি।

পাশাপাশি তিনটি গর্ত। একই রকম দেখতে—ফুট তিনেক দীর্ঘ ও ফুট পনেরো গভীর। নির্জন নিশীথে কান পাতলে আরও নাকি এখানে সেই হতভাগিনীদের কান্না শুনতে পাওয়া যায়। যৌবনের বিনিময়ে যারা জীবন চেয়ে পেয়েছে বঞ্চনা, তাদের অতৃপ্ত আত্মা বোধ করি কবরের কোণে কোণে অনন্ত কাল ধরে কাতর কণ্ঠে সুবিচার প্রার্থনা করছে। কিন্তু কার কাছে তারা এই অবিচারের কথা বলছে? মানুষের কাছে কি?

পাথরনাচুনি পড়ে রয়েছে পেছনে, আমরা এসেছি সামনে। সেই গিরিশিরা বেয়ে ওপরে

উঠছি—উত্তরে এগোচ্ছি। চড়াই পথ। চড়াই সর্বত্র সমান নয়—কোথাও কম, কোথাও বেশি। কিন্তু আবহাওয়া অপরিবর্তিত। তেমনি মেঘে-ঢাকা আকাশ, আর কুয়াশা-ছাওয়া পথ। তবে তুষারপাত শুরু হয় নি।

এখন আর পথের পাশে খাদ নেই। পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। এই পাহাড়টির নাম চিরার। গাছপালা দূরের কথা, লতাপাতা পর্যন্ত নেই। উপেনবাবু বেকার। তিনি কেবল মাঝে মাঝে ওপরে তাকাচ্ছেন—তোলিধার গিরিশ্রেণীকে দেখছেন। মাঝখানে একটু টোল খেয়েছে। ঐটি সেই গিরিবর্ত্ম—কৈলু বিনায়ক। ১৪,১১৭ ফুট উঁচু। পাথরনাচুনি থেকে দেড় মাইলের মতো। আপাতত ওখানে উঠতে হবে আমাদের।

মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পথ। পাথরে পা ফসকে যাচ্ছে। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে পথ চলতে হচ্ছে।

এইভাবে পথ চলে, প্রায় দু'ঘণ্টা পরে পৌঁছলাম কৈলু বিনায়ক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রাণান্তকর চড়াই শেষ হয়েছে।

দুদিকের পাহাড় থেকে দুটি গিরিশিরা নেমে এসে মিলিত হয়েছে এখানে। সৃষ্টি হয়েছে গিরিবর্ত্ম—গিরি-কান্তারের শেষ তোরণ।

কৈলু বিনায়ক গণেশতীর্থ। সিদ্ধিদাতার আর এক নাম বিনায়ক। কৈলু শব্দটি সম্ভবতঃ কৈলাস থেকে এসেছে। তার মানে এটি শিবপুত্র বিনায়কের কৈলাস।

গিরিবর্ত্মের ওপরেই গণেশ প্রতিষ্ঠিত—অপূর্ব সুন্দর পাষাণ প্রতিমূর্তি। প্রচলিত নিয়মমত আমরা প্রত্যেকে মূর্তিকে কোলে তুলে নিলাম। কাজটি মোটেই সহজ নয়। মাঝারি আকারের মূর্তি—বেশ ভারী। এতদূর চড়াই ভেঙ্গে এসে, এত উঁচুতে নিরেট পাথরের প্রতিমূর্তিকে কোলে নেওয়া কষ্টকর বৈকি। কিন্তু কষ্ট করতেই তো এখানে আসা। কষ্ট না করলে তীর্থের ফল লাভ হয় না। যে দুর্বল যাত্রী বিনায়ককে কোলে তুলতে সক্ষম হয় না, সে অক্ষমকে এখান থেকে যেতে হয় ফিরে। দুর্বলের জন্য রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ডের পথ নয়।

শেষ পর্যন্ত শক্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল অসিত মোহিত ও সুজলের মধ্যে। বিনায়ককে কোলে নিয়ে নাচানাচি। বলা বাহুল্য সে নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হল অসিত। তার সঙ্গে ওরা পারবে কেন? সে যে কুস্তিগীর।

কুলিরা গতকাল ব্রহ্মকমল নিয়ে এসেছিল। সেই পারিজাত দিয়ে আমরা গণপতির পুজো দিলাম। পার্বতী-তনয় গণনায়কের কৃপা না হলে মানুষের কোন মঙ্গল সাধিত হয় না।

পুজো-শেষে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি বিনায়ককে। গণপতির পায়ের কাছে একটি করে টাকা দক্ষিণা রেখে দিই। তারপর গুঁড়ো বরফ ও লজেন্সের প্রসাদ নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

এবারে ফিরে তাকাই গিরিবর্ত্মের বিপরীত দিকে। এ যেন এক আলাদা জগৎ। পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দুর্গম গিরিশ্রেণীর অন্তরালে গিরিকান্তার। এজন্যই বোধ করি দীর্ঘকাল লুকিয়েছিল রূপকুণ্ড। এখানে না এসে ধারণাই হয় না এর পরেও এত আছে। দূর থেকে মনে হয় এখানেই শেষ। এখানে এলে জানা যায়—শেষ নয়, শুরু। মনে হয়, এর বুঝি আর শেষ নেই।

পাহাড়টা আস্তে আস্তে নেমে গেছে নিচে। ওপরে সাদা আর কালো, নিচে সবুজ। ওপরে বরফ আর পাথর, নিচে সবুজ প্রান্তর। পাহাড় গিয়ে প্রান্তরে শেষ হয়েছে। চারিপাশের পাহাড়ের বরফ-বিগলিত ধারায় সিক্ত হচ্ছে প্রান্তর, তাই সে এমন সবুজ। গিরি-কান্তারের অন্তরে এমন একটি রমণীয় প্রান্তর সত্যই বিস্ময়কর—ধারণাতীত। রূপকুণ্ড আবিষ্কারের

আগে তাই সবার ধারণা ছিল—পাথরনাচুনির পরেই ত্রিশূল। মাঝখানে কিছু নেই।

কিন্তু এ ভুল ধারণাটি হাল-আমলের। যে আমলে আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে বিদেশী আক্রমণকারীকে আমরা আবাহন করে এনেছি। যে আমলে আমরা জননী-জন্মভূমিকে বহিরাগত বণিকদের হাতে তুলে দিয়েছি। যে আমল থেকে আমরা শ্রমবিমুখ ও পরশ্রীকাতর হয়েছি, সৎসাহসকে বিসর্জন দিয়েছি। তার আগের আমলে হিমালয় আমাদের অপরিচিত ছিল না। মহাভারত বা কেদারখণ্ডের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু মহাকবি কালিদাস যে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাতে তো আর কারও কোন সন্দেহ নেই। অথচ কোথায় উজ্জয়িনি আর কোথায় পাণ্ডুকেশ্বর। এগারো বছরের বালক শঙ্করাচার্য যে দাক্ষিণাত্য থেকে জোশীমঠ এসেছিলেন, সে কথাও ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে। তেমনি ইতিহাস স্বীকার করে সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে নন্দাযাত। দেবী নন্দার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা। দুঃসহ শীত সহ্য করে, ঝড় বৃষ্টি আর তুষারপাতকে উপেক্ষা করে, দুর্গম ও দুস্তরকে অতিক্রম করে তাঁরা যাত্রা করতেন হোমকুণ্ডে—নন্দাদেবীর পদপ্রান্তে প্রাণের প্রণতি জানাতে, জীবনের নৈবেদ্য নিবেদন করতে।

এমনি একদল যাত্রী পৌঁছতে পারেন নি হোমকুণ্ডে। পথে রূপকুণ্ডের তীরে এসেই তাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন নন্দাদেবীকে। আজ তাঁদের মৃতদেহ চাপা পড়ে আছে তুষারের তলে। বছরের একটা বিশেষ সময়ে কেবল এই তুষার গলে। তখন সেই পুণ্যকামী মানুষদের দেহাবশেষ দর্শন করা যায়—তুষারতীর্থ রূপকুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে ভারতের ধর্মকে উপলব্ধি করা যায়।

দীর্ঘকাল এরা লুকিয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। মানুষ ভুলে গিয়েছিল সেই পুণ্যার্থীদের কথা। কবে কি ভাবে কে প্রথম রূপকুণ্ডকে আবিষ্কার করে, তা জানা নেই আমার। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এদের সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের ঘরে ঘরে। ১৯০৫ সালে ডাঃ লংস্টাফ নাকি আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন রূপকুণ্ডে। কিন্তু তিনি তাঁর কোন বইয়ে রূপকুণ্ডের কথা লিখে যান নি।

রূপকুণ্ডের কথা প্রথম বিশদভাবে বলেন জনৈক ফরেস্টার। তিনি ১৯২৫ সালে নন্দাযাতের সঙ্গে রূপকুণ্ডের তীরে পৌঁছেছিলেন। সেই কথা শুনে ১৯৪২ সালে কৌতূহলী মাধোয়াল সিং এলেন রূপকুণ্ডে। তিনিও একজন ফরেস্টার ছিলেন।

ফিরে গিয়ে মাধোয়াল সিং রূপকুণ্ডের বিবরণ দিলেন কুমায়ুনের ডেপুটি কমিশনার মিঃ ভার্নিডকে। তিনি স্কটল্যাণ্ড থেকে নিয়ে এলেন মিঃ হ্যামিল্টনকে—বিখ্যাত রক-ক্লাইম্বার। হ্যামিল্টন সাজ-সরঞ্জাম, শেরপা ও কুলি নিয়ে রূপকুণ্ড অভিযানে এলেন। কিছু নিদর্শনসহ ফিরে গিয়ে রূপকুণ্ডের কথা প্রচার করলেন দেশে-বিদেশে। জগৎ জানতে পারল এই মরণ-হ্রদের কথা।

তারপরে ১৯৫৫ সাল। সরকারী সাহায্যে মাধোয়াল সিং আবার এলেন রূপকুণ্ডে। এবারে তিনি কিছু নিদর্শন নিয়ে ফিরলেন। নিদর্শনগুলি তিনি দিলেন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ডি. এন. মজুমদারকে। শুরু হল গবেষণা। ১৯৫৫ সালের ৭ই অক্টোবর রিপোর্ট বের হয়। ১৯৫৬ সালের মে জুন ও সেপ্টেম্বরে ভারত সরকারের নৃবিদ্যা সমীক্ষা বিভাগ ডাঃ নগেন্দ্র দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বে দুটি রূপকুণ্ড অভিযানের আয়োজন করেছিলেন। অভিযাত্রীরা মাংসসমেত একটি দেহের (নারী) কিছু অংশ, কয়েকটি মাথার খুলি, মেয়েদের চুল ও গয়না, জুতো, ছড়ি প্রভৃতি বহু নিদর্শন নিয়ে যান। ঐ সব নিদর্শন

পরীক্ষার পরে রিপোর্ট বের হয়—

(1) Radio Carbon dating shows that the bones are 650 years old with the range of 150 years on either side.

(2) The bones indicate that the Rupkund victims were of a homogeneous ethnic stock and similar to the people of North Western India and to the people of Swat and Hunza Valley.

(3) The majority of the finds do not show any similarity of origin wiht local people, Bhotias and Garhwalis.

(4) The few skulls that show unusual development of the occipital crest, probably belonged to porters, may by Bhotias in origin.

(5) Some of the people received injuries on their skulls but lived some time before they died....

অধ্যাপক মজুমদারের মতে রূপকুণ্ডের মৃতদেহগুলি মহম্মদ বিন তোগলকের চীন অভিযাত্রী সেনাদলের। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দ সমর্থন করেন নি এই মত। এ সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন—

"Rudrakshas, birch bark umbrellas, iron bell stuffed with birch bark and conch pieces collected from here are all articles of worship used by Hindu pilgrims and since conch bangles and toe rings are used only by Hindu women and no arms,....or any other war materials whatsoever have so far been recovered from Rupkund and...no historical evidence is forthcoming...to prove Mohammed Tuglaque's armies entered the Almora or Garhwal Himalayas..."

স্বামীজীর মতে এই মৃতদেহগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত তীর্থযাত্রীদের। কনৌজরাজ যশোদয়াল সপরিবারে যোগদান করেছিলেন নন্দাযাতে। কিন্তু পৌঁছতে পারেন নি লক্ষ্যস্থল হোমকুণ্ডে। পথিমধ্যে গিমতলি ও রূপকুণ্ডের তীরে তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন।

বীরেন তার 'রহস্যময় রূপকুণ্ড' বইতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে স্বামীজীর মতকেই মেনে নিয়েছে। আমরাও তার সঙ্গে একমত।

পাথরনাচুনি থেকে কৈলু বিনায়ক দেড় মাইল। এইটুকু পথ আসতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লেগেছে। তারপরে পুজো-পার্বণে আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। কাজেই এবার চলা শুরু করা উচিত। কিন্তু যাকে নিয়ে চলা, সে এখনও সঙ্গীদের সঙ্গে বসে আছে বাবা বিনায়কদের সামনে। রামচাঁদ ও কুলিরা কি ধ্যানে বসল নাকি ? ওরা দেখছি সত্যই ভক্তি করে সিদ্ধিদাতা গণেশকে। হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষ করে হিমাচল প্রদেশের অধিবাসীদেরও অশেষ গণেশভক্তির পরিচয় পেয়েছি। প্রায় সমস্ত তীর্থে অন্যান্য দেবদেবীদের মত পৃথক গণেশমন্দির আছে। কোথাও কোথাও কেবল গণপতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তীর্থক্ষেত্র। কাজেই রামচাঁদ ও তার সঙ্গীদের আচরণে বিস্মিত হই না। বিস্মিত হই বীর সিং-এর মন্তব্যে, "বিনায়ক-ভক্তি নয়, রূপেয়াপ্রীতি।"

"মানে ?" আমরা বুঝতে পারি না।

"পুজোর পরে আপনারা দক্ষিণার যে টাকা কটি রেখে এসেছেন বাবা বিনায়কের পদতলে, তা নেবার জন্যই ওরা ওভাবে বসে আছে ওখানে। আপনার সরে না গেলে ওদের মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে না।"

বিস্মিত হলেও বীরের সঙ্গে আমরা একটু নিচে নেমে আসি। এখান থেকে আর দেখা যাচ্ছে না ওদের।

বোধ হয় পাঁচ মিনিটও হয় নি। সদলবলে রামচাঁদ এসে হাজির হয়। এসেই বলে, "আপনারা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ?"

চুপ করে থাকি। রামচাঁদ এগিয়ে চলে। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

কৈলু বিনায়ক গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে আমরা চলেছি এগিয়ে—সেই সীমাহীন সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে। কিন্তু ওখানে পৌঁছলে যে আর এমন করে দেখতে পাব না গিরি-কান্তারের এই অনন্ত সৌন্দর্যকে। সুন্দর দূর থেকে সুন্দরতর।

তাই আমি চলতে চলতে চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখি প্রান্তরের শেষে তিনটি আকাশ-ছোঁওয়া শিখর—ত্রিশূল। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ত্রিলোকের রক্ষক ও সংহারক বলে সে মর্ত্যের মানুষের কাছে এমন দুর্লভ। পাছে মানুষের মায়ায় সে কর্তব্যজ্ঞান বিস্মৃত হয়, তাই সে চারিদিকে রক্ষাপ্রাচীর গড়ে তুলেছে। আর সেই রক্ষাপ্রাচীরে পরপারে ত্রিশূলের সামনে সৃষ্ট হয়েছে এক রমণীয় উপত্যকা। ত্রিশূল থেকে গিরিশিরা নেমে এসে বেষ্টন করেছে এই মনোহর ময়দানকে। এ যন বাড়ির বাইরে বাগান কিংবা দেবালয়ের অঙ্গন।

কৈলু বিনায়ক এই রক্ষাপ্রাচীর পেরোবার একমাত্র পথ। তুষার-তীর্থ ত্রিশূলের পাদদেশে পৌঁছবার সকল বাধা অপসারিত হয়েছে। তবু সেখানে পৌঁছবার পথটি মোটেই সহজ নয়। দুটি পথ আছে। একটি রক্ষাপ্রাচীরের ওপর দিয়ে আর একটি একটু নেমে গিয়ে। ওপরের পথটি তৃণাচ্ছাদিত কিন্তু পিচ্ছিল। পা ফসকে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রতি পদে। নিচের পথটি পাথর আর বরফ ভেদ করে। দুর্গম হলেও পিচ্ছিল নয়। তা ছাড়া এ পথটিতে তেমন ওঠা-নামা করতে হবে না। তাই রামচাঁদ এই পথটি পছন্দ করল। আর পথ-প্রদর্শকের পছন্দে পথিকের পছন্দ। আমরা রামচাঁদের পেছনে আস্তে আস্তে সেই বরফ আর পাথর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি।

সহসা দাশুর হাত থেকে আইস-এক্স্‌টা ফসকে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে সেটা পড়ে যাচ্ছে নিচে। হায় হায় করে উঠলাম আমরা। দাশু কেবল দার্শনিকের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দুর্গম পথের শ্রেষ্ঠ সহায়ের দিকে।

আইস-এক্স্‌টা পাহাড়ের গা বেয়ে কেবলই গড়াচ্ছে। গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই। কিন্তু জগতে সব কিছুরই শেষ আছে। আইস-এক্সের ডিগবাজী খাওয়াও একসময় শেষ হল। শ'খানেক ফুট নিচে গিয়ে আইস-এক্স্‌টা একখানি পাথরে আটকে গেল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দাশুর মুখে হাসি ফুটল।

হাসতে হাসতে বীর নেমে গেল নিচে। কিছুক্ষণ বাদে আইস-এক্স্ নিয়ে এসে দাশুর হাতে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর স্বরে রামচাঁদ বলে উঠল, "এবার থেকে একটু শক্ত করে ধরবেন, যাতে আর পড়ে না যায়।"

লজ্জিত দাশু কোন জবাব দিতে পারে না। সে নীরবে রামচাঁদের পেছনে পথ চলতে থাকে।

মাঝে মাঝেই আছাড় খাচ্ছি আমরা। কিন্তু উপেনবাবু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছেন না। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে অসংখ্য সাদা ও রঙ্গীন ছোট-বড় ফুল। ফুল পেলেই প্রজাপতির মতো ছুটোছুটি করতে থাকেন উপেনবাবু। তখন আর তাঁর দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। দুর্গম পথের সকল বিপদ উপেক্ষা করে ফুল তুলছেন উপেনবাবু। বাধ্য হয়ে

তাঁর সহকারীদেরও ছুটতে হচ্ছে সঙ্গে। কি করবে! চাকরির মায়া যে প্রাণের মায়ার চেয়ে বড়।

সহসা উপেনবাবু বলে ওঠেন, "মহারাজ, এদিকে আসুন।"

তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এসে বলি, "কি ব্যাপার?"

"বলুন তো এটা কি ফুল?"

"ব্রহ্মকমল।"

"হ্যাঁ, Saussurca Obvallata, বলুন তো কোথায় এ ফুল এমনি ফুটে থাকতে দেখেছেন?"

"কেন, ঘাংরিয়া থেকে লোকপাল-হেমকুণ্ড যাবার পথে।"

"একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন," উপেনবাবু বলতে থাকেন, "এ জায়গাটার অবস্থান ও পরিবেশ অবিকল হেমকুণ্ড পথের সেই ব্রহ্মকমল বনের মতো। দু জায়গারই উচ্চতা চোদ্দ হাজার ফুটের মতো। এখানেও দেখুন তেমনি তুষারের রাজত্ব। এইরকম প্রাকৃতিক পরিবেশেই দেবদুর্লভ পারিজাত জন্মে থাকে।"

উপেনবাবুর সঙ্গে আবার ফিরে আসি পথে। আস্তে আস্তে চলতে থাকি।

কিছুক্ষণ চলার পরে রামচাঁদ বলে, "ঐ দেখুন, বাগুয়াবাসা ধর্মশালা দেখা যাচ্ছে।" সে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

বহুদূরে বিন্দুর মতো। রূপকুণ্ড পথযাত্রীদের প্রয়োজনে স্বামী প্রণবানন্দ তৈরি করেছেন ঐ ধর্মশালা। ১৯৬০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর এর নির্মাণকার্য শেষ করেছেন। বীরেন ও রথীন এই ধর্মশালার প্রথম অতিথি।

মনে পড়ছে অণিমাদির কথা। পর পর দু বছর তিনি এসেছিলেন এ পথে, বাস করে গেছেন ঐ ধর্মশালাতে। তিনি রূপকুণ্ডে এসেছিলেন কারণ সবাই তাঁকে বলেছিলেন, রূপকুণ্ডের পথ মেয়েদের জন্য নয়। নারী সঙ্গে নিয়ে এসে কেউ নাকি ফিরে যেতে পারে না এখান থেকে। তাই সেই স্বেচ্ছাচারী শৌখিন রাজা সুন্দরী নর্তকীদের হত্যা করেছেন পাথরনাচুনিতে। কনৌজরাজ যশোদয়াল তাঁর গাড়োয়ালী রাণী বল্লভাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। অমান্য করেছিলেন এ পথের নিয়ম। তাই তাঁকে সপরিবারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। রূপকুণ্ড পরিণত হয়েছে মরণ-হ্রদে।

এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যই এসেছিলেন অণিমাদি। তাঁর প্রথম অভিযান বিফল হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তাঁকে কয়েকদিন কাটাতে হয়েছে বাগুয়াবাসা ধর্মশালায়। সেবারে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু পরের বছর তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন রূপকুণ্ডের তীরে। প্রমাণ করেছিলেন, রূপকুণ্ড মেয়েদের পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে নয়।

ভেবে চলি অণিমাদির কথা। তাঁর সেই অগস্ত্যযাত্রার কথা—

'তুমি আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছ।' বলেই অণিমাদি তাকালেন আমার মুখের দিকে। তাঁর চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার পরশ।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'আপনারা নিরাপদে ফিরে আসুন। আমার সকল শ্রম সার্থক হবে।'

হাসতে হাসতে জবাব দিলেন তিনি, 'আসব বৈকি। ট্রেলস্ পাস পেরিয়ে নিশ্চয়ই ফিরে আসব তোমাদের মাঝে। নিরাপদেই ফিরব। বিপদসংকুল পথে যাচ্ছি বলেই বিপদের ভয়

করো না। এখন বিপদই আমাকে ভয় করে।'

খুশি হলাম তাঁর কথায়। এমন আত্মপ্রত্যয় না থাকলে কি দুর্গম পথপরিক্রমার সঙ্গী হওয়া যায়? ওঁরা যাচ্ছেন কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে। যে গিরিবর্ত্ম আবিষ্কৃত হয়েছে আজ থেকে একশ' সাঁইত্রিশ বছর আগে, যখন পর্বতারোহণের কোন সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয় নি।

গুর্খা আক্রমণের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে কায়েম হয়ে বসেছে। জি. ডাবলু. ট্রেল কুমায়ুনের দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার হয়ে এলেন। শাসনকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি পিণ্ডারী উপত্যকা ও গৌরীগঙ্গা উপত্যকার মাঝে একটি সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হলেন। দানপুর পরগণার সুপি গাঁয়ের মালক সিং বুদা তাঁকে ভরসা দিলেন যে, নন্দাদেবী-পূর্ব ও নন্দাকোট শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এরকম একটি পথ পাওয়া যাবে। কয়েকজন স্থানীয় মালবাহককে নিয়ে মিঃ ট্রেল মালক সিংয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

কুমায়ুন-হিমালয়ের সেই প্রথম অভিযান সফল হল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা পিণ্ডারী হিমবাহের দিক থেকে রওনা হয়ে নন্দাদেবী-পূর্ব পর্বতের রক্ষাপ্রাচীর পেরিয়ে গৌরীগঙ্গা উপত্যকার মিলাম গাঁয়ে পৌঁছলেন।

অভিযান সফল হল কিন্তু মিঃ ট্রেলের উদ্দেশ্য সফল হল না। কারণ ১৭,৭০০ ফুট উঁচু সেই দুর্গম গিরিখাতের ওপর দিয়ে মনুষ্য চলাচলের উপযোগী পথ তৈরি করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তুষারক্ষতে আক্রান্ত হলেন। স্থানীয়রা বললেন, তাঁর আচরণে নন্দাদেবী রুষ্টা হয়েছেন বলেই তাঁর এই দুর্ভোগ। আলমোড়ার নন্দাদেবীর মন্দিরে পুজো দিলেই তিনি রোগমুক্ত হবেন। জাঁদরেল ইংরেজ হয়েও মিঃ ট্রেল তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

নন্দাদেবীর পুজো দিয়ে সত্যিই তিনি রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

উদ্দেশ্য সফল হল না। কিন্তু মিঃ ট্রেল অমর হলেন। তাঁর আবিষ্কৃত সেই গিরিখাত এখন ট্রেল্স পাস নামে বিখ্যাত। *

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও ট্রেল্স পাস কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম গিরিখাত। একদিকে পিণ্ডারী হিমবাহ আর একদিকে মিলাম। পিণ্ডারীর দিকে ভয়াবহ ফাটল ও মারাত্মক বরফের দেয়াল। আর মিলামের দিকে পিচ্ছিল বরফাবৃত অসমতল প্রান্তর।

---

* অধ্যাপক গৌরাঙ্গপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ট্রেল সাহেব নিজে এই অভিযানে যোগদান করেন নি। তিনি মালক সিং বুধা নামে জনৈক কুমায়ুনীকে ঐ অভিযানে পাঠান। প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ট্রেল সাহেবের এই চিঠিখানি উদ্ধৃত করেছেন—

'Malak Singh Patwari of Mulla Danpur evinced considerable enterprise and energy in discovering and opening the communication between Danpur and Johar by the Pindari Pass which had not been crossed from time immemorial....'

sd/-Geo W. Traill
Commissioner

Jhunit Banj
November, 1835

যে গিরিশিরাটি নন্দাদেবী-পূর্ব ও নন্দাকোট পর্বতকে সংযুক্ত করেছে, তারই সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে মাত্র সাড়ে তিনশ ফুট নিচে অবস্থিত। স্বভাবতই অতিক্রম করা পরের কথা, এই গিরিখাতকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। বছরের অধিকাংশ সময়েই সে মেঘাবৃত থাকে। কেবল জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) ও আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এই দুমাস, ভাগ্য ভাল থাকলে, খুঁজে পাওয়া যায়।

তাহলেও কয়েকবার এই গিরিখাত লঙ্ঘিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার অতিক্রম করেন এডলফ্ স্লাগিনওয়েটস ১৮৫৫ সালে। সেবারও তাঁকে নন্দাদেবীর পুজো মানত করে রওনা হতে হয়েছিল।

তারপরে ১৮৬১ সালে মালক সিং-য়ের ছেলে দরবান সিং-য়ের সঙ্গে কর্ণেল এডমাণ্ড স্মাইথ এবং ১৮৯৮ সালে জার্মান অভিযাত্রী বুখ এই গিরিখাত অতিক্রম করেন।

মার্তোলি গাঁয়ের দেওয়ান সিং উত্তর অর্থাৎ মিলামের দিক থেকে প্রথম এই গিরিখাত অতিক্রম করেন ১৯১৩ সালে। তিনি খুবই সুদক্ষ পর্বতারোহী ছিলেন।

১৯২৬ সালে কুমায়ুনের ডেপুটি কমিশনার হিউ রাট্‌লেজ তাঁর স্ত্রী ও কর্ণেল আর. সি. উইলসনের সঙ্গে যখন কৈলাস ও মানসসরোবর থেকে ফিরছিলেন, তখন দেওয়ান সিং তাঁদের নিয়ে মিলামের দিক থেকে দ্বিতীয়বার এই গিরিখাত লঙ্ঘন করেন।

দেওয়ান সিং তৃতীয়বার এই গিরিখাত অতিক্রম করেন ১৯৩৬ সালে। সুইস পরিব্রাজক গান্‌সার ও দুজন শেরপাকে নিয়ে ২৫শে আগস্ট মার্তোলি থেকে রওনা হয়ে ২৮শে আগস্ট পিণ্ডারী উপত্যকায় উপনীত হন।

কিন্তু কয়েকদিন পরে এইচ. ডাবলু. টিলম্যান নন্দাদেবী শিখরে আরোহণ করে ফেরার পথে বহু চেষ্টা করেও ট্রেলস্ পাস খুঁজে পান নি। তিনি পথ সংক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি আলমোরায় ফিরে আসতে চেয়েছিলেন।

অথচ ঐ বছরই অক্টোবর মাসে অলিম্পিক স্কি-দৌড়বীর সকুতা তাকেবুশীর নেতৃত্বে জাপানের রিকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল অভিযাত্রী নন্দাকোট পর্বতশৃঙ্গ জয় করার পর দেওয়ান সিংয়ের সঙ্গে ট্রেল্‌স পাস অতিক্রম করে পথ সংক্ষেপ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে দেওয়ান সিং আলমোরার ডেপুটি কমিশনার ডি. ভোরাকে নিয়ে আরেকবার উত্তর দিক থেকে ট্রেল্‌স পাস অতিক্রম করেছিলেন। দেওয়ান সিং আর ইহলোকে নেই। কিন্তু তাঁর সহকারী রাম সিং আজও বেঁচে আছেন। দেওয়ান সিংয়ের সঙ্গে তিনি তিন-চারবার ট্রেল্‌স পাস অতিক্রম করেছেন। তিনিও সুদক্ষ পর্বতারোহী। এখন তিনি মার্তোলি গাঁয়ে ভগবতী মন্দিরের পূজারী।

স্বাধীনোত্তর যুগেও কয়েকবার এই গিরিখাত লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তখন পর্যন্ত এই গিরিখাতে কোন অভিযান পরিচালিত হয় নি। হয় নি বলেই আমরা হিমালয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেবারে এই গিরিখাতের উদ্দেশে একটি পদযাত্রার আয়োজন করেছিলাম। দুজন মহিলাসহ নজন যাত্রী এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন—সর্বশ্রী শৈলেশ চক্রবর্তী (নেতা), অমূল্য সেন, অসিত বসু, রণেশ চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি সরকার, কৃপাণ দাশগুপ্ত, জ্যোৎস্নাময় মুখোপাধ্যায়, রেবা মুখোপাধ্যায় ও অণিমা সেনগুপ্তা।

১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৪) অমৃতসর মেলে অভিযাত্রীরা যাত্রা করলেন এই দুরতিক্রম্য গিরিবর্ত্মের উদ্দেশে।

সেদিনই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অণিমাদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় খেয়াল করি

নি যে গাড়ি ছাড়ার সময় সমাগত। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ে। ব্যস্তভাবে তাঁকে প্রণাম করে বললাম, 'সময় হয়ে গেছে। এবারে গাড়িতে গিয়ে উঠুন।'

তখন বুঝতে পারি নি, সেই আমার শেষ প্রণাম। সে যাত্রা অগস্ত্যযাত্রা।

তারপরে বহু ভেবেছি, কেন এমন হল ? আমরা তো কতবার কত দুর্গম অভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। তিনি নিজেও তো এর চেয়ে দুর্গমতর পথপরিক্রমা পূর্ণ করে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে। ১৯৫৩ সালে গিয়েছিলেন কৈলাস ও মানসসরোবর, ১৯৫৫ সালে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ও কেদারবদ্রী, ১৯৫৯ সালে অমরনাথ, ১৯৬১ সালে গঙ্গোত্রী ও গোমুখী, ১৯৬২ সালে পিণ্ডারী হিমবাহ ও ১৯৬৩ সালে রূপকুণ্ড। তাহলে সেবারে কেন এমন হল ?

অণিমাদি জন্মেছিলেন ১৯২০ সালে, পরাধীন ভারতের অন্যতম মুক্তিযজ্ঞভূমি বরিশালের মাটিতে—গৈলা গ্রামে। পিতা বিমলেন্দু সেন সেযুগের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অণিমাদি। ১৯৪০ সালে তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি. এ. ও ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পাস করেন। পরবর্তীকালে তিনি বি. টি. ও এম. এড্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রীজীবনে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ও কর্মজীবনে প্রগতিশীল নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯৫০ সালে পাকিস্তানী জেহাদের কবলে পড়ে, সর্বস্ব হারিয়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, ছোট দুটি ভাই ও একটি বোনকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জয়লাভ করেছিলেন অণিমাদি। শেষ পর্যন্ত তিনি উত্তর কলকাতার শশীমুখী বসু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হয়েছিলেন।

নিজে সংসারী হবার অবকাশ পান নি, কিন্তু সংসারের তিনি ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী। ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরাই ছিল তাঁর চোখের মণি।

২০শে সেপ্টেম্বর অভিযাত্রীরা মুনসিয়ারী পৌঁছলেন। মালক সিং পিণ্ডারী হিমবাহের দিক থেকে প্রথম ট্রেল্স গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করলেও, এই গিরিপথ বেশিবার অতিক্রান্ত হয়েছে মার্তোলী তথা মুনসিয়ারীর দিক থেকে। তাই অণিমাদিরাও গিয়েছিলেন এই পথে। ওঁরা মুনসিয়ারীর রাত্তি ডাকবাংলোয় রাত কাটান।

পরদিন মাত্র চার মাইল হেঁটেছিলেন অভিযাত্রীরা। পৌঁছেছিলেন লিলাম। লিলামে কোন ডাকবাংলো নেই, আছে একটি পুলিস ব্যারাক। সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন ওঁরা। ফেরার পথেও সেখানে আশ্রয় নেবার জন্যেই ছুটে আসছিলেন অণিমাদি, কিন্তু আসতে পারেন নি। চিরকালের মতোই লিলাম রয়ে গেছে তাঁর পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে।

ফেরার পথে যাই হয়ে থাক, যাবার পথে পরদিন ওঁরা খুব সকালে লিলাম ছেড়েছিলেন। পথ ভাল নয়। ডানদিকে গৌরীগঙ্গা, বাঁদিকে পাহাড়। মাঝে মাঝেই ধস নেমেছে।

অবশেষে ওঁরা পৌঁছলেন একটা কাঁচা পাহাড়ের পাশে। পাহাড়টা প্রায়ই ভাঙ্গছে। অনবরত পাথর পড়ছে গড়িয়ে, কখনও পথে, কখনও তীরে, কখনও বা নদীতে। পাহাড়টা যেন গৌরীগঙ্গার প্রেমে পড়েছে! নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চাইছে গৌরীগঙ্গার বুকে। ভেঙ্গে পড়ার কোন সময়-অসময়, নিয়ম-অনিয়ম নেই। ভালবাসার কি সময় আছে, প্রেমের কি নিয়ম আছে ?

পথ-রেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন। অভিযাত্রীরা অতি সন্তপর্ণে পেরিয়ে এলেন সেই ভয়ঙ্কর স্থান—অভিশপ্ত স্থানও বলতে পারি। এপারে পৌছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পথের ওপরই পড়লেন বসে। তখন লিলাম থেকে ওঁরা মাইল দেড়েক হেঁটেছেন।

বোধ করি মিনিট পাঁচেক বাদে—ওঁদের সামনে শুরু হল প্রকৃতির সেই বিচিত্র লীলা। করুণা বলাই ঠিক হবে। সহসা একটু আগে পেরিয়ে আসা পথের অনেকটা অংশ ধসে পড়ল গৌরীগঙ্গায়। আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গেলেন ওঁরা।

আর জীবন-মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অভিযাত্রীরা দেখলেন এক অপূর্ব দৃশ্য। বিরাট বিরাট পাথর পড়ছে গড়িয়ে—পাহাড় থেকে পথে, পথ থেকে নদীতে। পতনকালে পরিবর্তিত হচ্ছে তাদের রূপ। বড় থেকে মাঝারি, মাঝারি থেকে ছোট, ছোট থেকে নুড়ি, নুড়ি থেকে গুঁড়ি—ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলছে চারিদিক। চারিদিক থরথর করে কাঁপছে। প্রকম্পিত হচ্ছে ডমরুর গম্ভীর গর্জনে। ওঁদের চোখের সামনে রুদ্রের প্রলয় হয়ে গেল। এই ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্যকে কোনদিন বিস্মৃত হবেন না অভিযাত্রীরা।

প্রলয়-শেষে ওঁরা করজোড়ে প্রণাম জানালেন জীবনদেবতাকে। ধন্যবাদ দিলেন দেবতাত্মা হিমালয়কে। একবারও ভাবলেন না, তখনও পদযাত্রার প্রথম পর্যায় চলেছে। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অভিযান বিফল হলে তাঁদের আবার এই পথে আসতে হবে ফিরে। যে বিপদ এখন কাটল, সে বিপদ তখন তাঁদের অদৃষ্টে আসতে পারে নেমে।

অভিযাত্রীরা যাত্রাপথের কথা ভাবতে পারে। কিন্তু পথের ভাবনার চেয়ে তাদের কাছে যাত্রার ভাবনাটা বড়। তাই ওঁদের একসময় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। আবার চলতে হয় এগিয়ে।

মাইল আধেক এগিয়ে ওঁরা পৌছলেন পালতিগড়। দেখলেন একটি অনিন্দ্যসুন্দর ঝরণা। অনেক উঁচুতে পাহাড়ের ওপরে সৃষ্ট হয়ে গৌরীগঙ্গায় পড়ছে। একে অবশ্য ঝরণা না বলে জলপ্রপাত বলাই উচিত হবে।

একটা পুল পেরিয়ে মাইল খানেক এগিয়ে ওঁরা পৌছলেন বুগডিয়ার (৮৬০০)। স্থানীয় স্কুলে আশ্রয় নিলেন। স্কুলের সামনেই রাস্তা। রাস্তার ওপরে কয়েকটা ঘোড়ার মৃতদেহ আছে পড়ে। শীত এসে পড়েছে বলে গ্রামবাসীরা নেমে যাচ্ছিলেন নিচে। ঘোড়াগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁদের মালপত্র। সহসা পথের পাশের খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর পড়েছে গড়িয়ে। ঘোড়াগুলোর ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। ঘোড়া না থেকে সেখানে যদি মানুষ থাকত, তাহলে ?

পরদিন সকালে নব উদ্যমে ওঁরা আবার যাত্রা করলেন চড়াইপথে। চার মাইল এগিয়ে পথের পাশে পেলেন একটি সুবিরাট গুহা। চারজন মানুষ বহাল তবিয়তে বিশ্রাম করতে পারে সেখানে। পাশেই প্রবাহিত হচ্ছে একটি স্বচ্ছশীতল সুমিষ্ট ঝরণা। এমন চমৎকার চড়ুইভাতির জায়গা সচরাচর চোখে পড়ে না।

অভিযাত্রীরা এলেন রিলকোট—ছোট একটি পাহাড়ী গ্রাম। দোকানপাট, বাড়ি-ঘর সবই আছে। কেবল মানুষ নেই। গাঁয়ের মানুষরা কয়েকদিন আগে নেমে গেছে নিচে।

হিমালয়ের ওপরের দিকে সমস্ত পার্বত্য গ্রামের অধিবাসীরাই শীতের আগে তাদের ঘরবাড়ি বন্ধ করে নেমে যায় নিচে। গরু-ঘোড়া, কুকুর-ভেড়া সবই সঙ্গে নিয়ে যায়। গ্রীষ্মের প্রথমে বরফ গলা শুরু হলে ফিরে আসে গ্রামে। সাধারণত এরা অক্টোবরের শেষে কিংবা নভেম্বরের প্রথমে গ্রাম ছাড়ে। কিন্তু সেবার শীত তাড়াতাড়ি আসায় সেপ্টেম্বরের শেষেই

গ্রামগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এ খবরটা জানা ছিল না অভিযাত্রীদের।

রিলকোটের বন্ধ বাড়ি-ঘর পেরিয়ে অভিযাত্রীরা চললেন এগিয়ে। পথে দু জায়গায় গৌরীগঙ্গা একেবারে সমতল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গৌরীগঙ্গার ওপারে টোলা গ্রাম। আরও দু মাইল এগিয়ে মার্তোলী—এ অঞ্চলের বৃহত্তম গ্রাম।

বুগডিয়ার থেকে ন মাইল চড়াই ভেঙ্গে মার্তোলী। উচ্চতা ১২,২২২ ফুট। প্রায় পাঁচশ ঘর বাসিন্দার বাস। কিন্তু বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না অভিযাত্রীদের। তাঁরা তখন নেমে এসেছে নিচে। ফলে মহাবিপদে পড়লেন ওঁরা। কুলিভাড়া বাঁচাতে গিয়ে নেতা মুনসিয়ারী থেকে রেশন নিয়ে যান নি। মার্তোলীতে রেশন কেনার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কাজেই জনশূন্য মার্তোলী ওঁদের কাছে হতাশার বাণী বহন করে আনল। দিন সাতেকের রেশন ছিল সঙ্গে। হয় এই খাবার সম্বল করে এগিয়ে যেতে হবে, নয় অভিযান বন্ধ করে দিতে হবে। সদস্যরা কেউ কিন্তু অভিযান বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষপাতী নন, যেভাবেই হোক অভিযান চালাতে চাইলেন।

কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার যে চিরকাল বিবাদ। প্রকৃতি বাদ সাধলেন। প্রচণ্ড ঝড় আর প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হল। সেই সঙ্গে আবার ভূমিকম্প। অনির্দিষ্ট কাল ধরে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। নিরুপায় অভিযাত্রীরা আধপেটা খেয়ে আশায় বুক বেঁধে দুর্যোগ কমে যাবার জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকলেন।

দু'দিন দুর্যোগ চলার পরে তৃতীয় দিন সকালে প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শান্ত হলেন। ঝড় কমে গেল, তবে বৃষ্টি বন্ধ হল না। বৃষ্টি মাথায় করেই অভিযাত্রীরা চললেন নন্দাদেবীর মন্দিরে—যাঁর করুণা না হলে কুমায়ুন-হিমালয়ে কোন অভিযান সফল হয় না। যিনি কৃপা না করলে কোন অভিযাত্রী প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারেন না কুমায়ুন থেকে, সেই পরমারাধ্যা চিরজাগ্রতা নন্দাদেবীর কাছে।

নন্দাদেবীর মন্দির আছে কুমায়ুনের সর্বত্র। মার্তোলীর নন্দাদেবী মন্দির গ্রামের প্রান্তসীমায় একটু উঁচুতে অবস্থিত। বিচিত্র তার অবস্থান—যেন সদাই তাকিয়ে আছে গ্রামের দিকে চিরজাগ্রত প্রহরীর ন্যায়। নিদ্রাহীনা মাতা সন্তানের শিয়রে রয়েছেন জেগে। স্নেহময়ী মঙ্গলদায়িনী জননী সর্বদা সন্তানকে রক্ষা করছেন।

কয়েকটি ভূর্জগাছ রয়েছে মন্দিরের চারিপাশে। অথচ চারিদিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গরাজী ও হিমবাহের মধ্যে অবস্থিত মালভূমি সদৃশ মার্তোলীর আর কোথাও ভূর্জগাছ নেই।

আবহাওয়া ভাল থাকলে এই মন্দিরচত্বরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায় ত্রিশূলী শিখরকে—তিনটি পর্বতশৃঙ্গের সেই দুর্ভেদ্য দুর্গকে। কেবল ত্রিশূলী নয়—মার্তোলীর চারিদিকেই তুষারাবৃত শৈলশিখর। কিন্তু শ্বেত-শুভ্র শৈলশিখরই মার্তোলীর একমাত্র প্রাকৃতিক পরিচয় নয়। মার্তোলীর উপকণ্ঠে লওয়ান নদী এসে মিলিত হয়েছে পিথোগড়ের প্রাণধারা গৌরীগঙ্গার সঙ্গে। সঙ্গমটি সুন্দর।

মুনসিয়ারীর পথটি কিন্তু মার্তোলী পৌঁছে শেষ হয়ে যায় নি। বারফু ও মিলাম হয়ে গেছে এগিয়ে। উণ্টা (১৭,৯৫০), জয়ন্তী (১৮,৫০০) ও কাংরীবিংরী (১৮,৩০০) গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে পৌঁছেছে তিব্বতে। থাজাং হয়ে চলে গেছে তারচেন তথা কৈলাস পর্বতের পাদদেশে। মার্তোলী থেকে তারচেন মাত্র ১১০ মাইল। মার্তোলী থেকে মুনসিয়ারী ২৫ ও আলমোরা ৭৫ মাইল।

প্রকৃতির নির্দয় আচরণে অধীর অভিযাত্রীরা যখন মার্তোলীর মন্দিরে এলেন। তখনও

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তাঁরা পুজো দিয়ে কায়মনোবাক্যে নন্দাদেবীর করুণা ভিক্ষা করলেন। প্রার্থনা-শেষে বাইরে বেরিয়ে করুণাময়ী নন্দাদেবীর করুণা দেখে বিস্মিত হলেন। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, রোদের রেখা দেখা দিয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের বুকে। দয়াময়ী দেবী নন্দার উদ্দেশে আর একবার সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে অভিযাত্রীরা ফিরে এলেন আস্তানায়।

পরদিন আলো-ঝলমল সকালে ওঁরা রওনা হলেন ওপরে—ট্রেল্স পাসের পথে। পথ বলে কিছু নেই। পথ শেষ হয়ে গেছে মার্তোলীতে। ভেড়া চলাচলের দুর্গম পাকদণ্ডি বেয়ে তাঁরা ওপরে উঠতে থাকলেন।

কিছুদূর এসে সালাং ও লওয়ান নদীর সঙ্গম। এখান থেকে একটি পাকদণ্ডি গেছে ফুরকিয়া—গিরিশ্রেণীর অপর পারে পিণ্ডারী নদীর তীরে খানিকটা সমতল জায়গা। পিণ্ডারী হিমবাহ দর্শনার্থীদের শেষ আশ্রয় ফুরকিয়া ডাকবাংলো।

সে যাই হোক, সেই পাকদণ্ডি দিয়ে গেলে ট্রেল্স পাস না পেরিয়েই পৌছনো যায় পিণ্ডারী উপত্যকায়। কিন্তু ওঁরা তো পিণ্ডারী উপত্যকায় পৌছবার জন্য পথে বের হন নি, ওঁরা গিয়েছিলেন ট্রেল্স পাস অতিক্রম করতে। কাজেই ওঁরা জোর কদমে এগিয়ে যেতে চাইলেন।

পারলেন না। পিণ্ডারী উপত্যকার পাকদণ্ডি দিয়ে পালাতে চাইল কয়েকজন কুলি। অণিমাদি বাধা দিলেন তাদের। বললেন, 'তোমরা না পাহাড়ী নওজওয়ান? বরফ আর ধসের সঙ্গে তোমাদের না জন্মগত পরিচয়? তোমরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চাইছো! অথচ আমাদের কথা ভাবো, আমার কথা ভাবো। আমি মেয়েমানুষ হয়ে এগিয়ে যেতে চাইছি। আর তোমরা...'

শেষ করলেন না অণিমাদি। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। কুলিরা উঠে দাঁড়ালো, নতমস্তকে এগিয়ে চলল।

মার্তোলী থেকে চার মাইল এগিয়ে তাঁরা পৌছলেন প্রায় জনশূন্য লোয়াঁ (১৩,৫০০´) গাঁয়ে। শীতের ভয়ে নিচে পালিয়ে যাবার সময় গাঁয়ের লোকেরা সব আলু তুলে নিয়ে যেতে পারে নি। অণিমাদি মহানন্দে ক্ষেতে নেমে আলু তুলতে আরম্ভ করলেন।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার পদযাত্রা আরম্ভ হল। আরও দু'মাইল এগিয়ে রতগংগাল—মেষপালকদের সাময়িক বিশ্রামস্থল। সেখানেই তুষারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হল ওঁদের। বরফ দেখে অণিমাদির আর আনন্দ ধরে না। শিশুর মতো ছুটোছুটি শুরু করলেন। বরফের বল বানিয়ে সকলের গায়ে ছুঁড়তে লাগলেন। তারপরে একসময় বসে পড়লেন বরফের ওপর। বটুয়া থেকে ডায়েরী ও পেনসিল বের করে ছবি আঁকতে লাগলেন।

চমৎকার ছবি আঁকতেন অণিমাদি। প্রতিবারই পাহাড়ে গিয়ে তিনি বহু স্কেচ করে নিয়ে আসতেন। পরে ঘরে বসে রং আর তুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপর হিমালয়ের শাশ্বত সৌন্দর্যকে সজীব করে তুলতেন। তিনি নিজেই বলতেন, 'পাহাড়ী পথের ফার্ণ পাতা এবং রং-বেরংয়ের নানা নুড়ি-পাথর আর ছবিতে ঘর ভরিয়েছি—অবসরে এরাই আনন্দ—এরাই সঙ্গী। এদের স্মৃতি রোমন্থনই আমার বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গী হবে।'

পরদিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) সকালে রতগংগাল থেকে বেরিয়ে দুপুরের একটু পরে অভিযাত্রীরা নাসপানপট্টিতে পৌছলেন। সেখানে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা করলেন। তাঁরা সন্ধ্যের একটু আগে ট্রেল্স্ পাসের পাদদেশে ১৬,৩০০ ফুট উঁচু বিঠলগোয়ারে তাঁবু ফেললেন। অভিযাত্রীরা সকলেই আনন্দিত। প্রায় লক্ষ্যস্থলে এসে পৌছেছেন। সাফল্য সুনিশ্চিত। কাল সকলেই তাঁরা কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম গিরিখাত ট্রেল্স্ পাস অতিক্রম

করে পিণ্ডারী উপত্যকায় উপনীত হবেন। দর্শন করবেন নন্দাদেবী-পূর্ব ও নন্দাকোট পর্বতের পূর্ণ রূপ। কিন্তু অন্তর্যামী বোধ করি তখন অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে নীরবে হাসছিলেন।

মধ্যরাত্রিতে অকস্মাৎ মত্ত পবনের আবির্ভাব ঘটল। শুরু হল তুষাড়ঝড়। রুদ্র প্রকৃতি প্রচণ্ড আঘাত হানলেন অসহায় অভিযাত্রীদের ওপর। অবিরাম তুষারপাতের মধ্যে বসে নন্দাদেবীর কৃপা প্রার্থনা করলেন তাঁরা। হিমানি সম্প্রপাতের ভয়ঙ্কর গর্জনে থেকে থেকে চমকে উঠলেন। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহিত হল।

২৯শে সেপ্টেম্বর সারাদিন ধরেই তুষারঝড় চলল! দুপুররাতে দুর্যোগ কমে এল। অভিযাত্রীরা আবার আশায় বুক বাঁধলেন। ঠিক হল আবহাওয়া আর খারাপ না হলে তাঁরা শেষরাতেই চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করবেন। রাত আড়াইটার সময় সবাই স্লিপিং ব্যাগের বাইরে বেরিয়ে এলেন। পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলেন। ভোরের আলো ফুটবার আগেই তাঁরা যাত্রা করবেন ট্রেল্‌স্ পাসের দিকে।

কিছুক্ষণ চলার পর ভোর হল—৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৪। তখনও বেশ বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে তুষারপাতও হচ্ছে। তারও মাঝে এগিয়ে চললেন তাঁরা। ক্রমেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁদের বিচলিত করে তুলল। কোথাও বা হাঁটুসমান নরম বরফ, কোথাও বা প্রায় কোমরসমান। চারিদিকে হিমানি সম্প্রপাতের চিহ্ন। তবু তাঁরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আবার মুষলধারে তুষারপাত আরম্ভ হল। সবাই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ বাদে তুযারপাত একটু স্তিমিত হলে কুলিরা অসহযোগ ঘোষণা করল। তারা নেমে যেতে চাইল। অনন্যোপায় হয়ে নেতা সকলের মতামত জানতে চাইলেন। অণিমাদি বললেন, 'প্রকৃতির কাছে এত সহজে হার মানবো না। আমরা এগিয়ে যাব।' কুলিদের ভয় ভাঙ্গাবার অনেক চেষ্টা করলেন।

কিন্তু আজ অণিমাদিকেই হার মানতে হল—প্রকৃতির কাছে নয়, কুলিদের কাছে। কুলিরা কিছুতেই আর এগোতে রাজী হল না। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস নন্দাদেবী রুষ্টা হয়েছেন। আর এগোলে সবাইকেই শেষ শয্যা পাততে হবে নন্দাদেবীর পদতলে।

অগত্যা গভীর দুঃখের সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মাত্র হাজার খানেক ফুট উঠতে পারলেই তাঁরা পৌঁছতে পারতেন লক্ষ্যস্থলে। এত কাছে এসেও এত দূরে রয়ে গেল ট্রেল্‌স্ পাস। অন্ততঃ অণিমাদির কাছে চিরজীবনের মতো। কিন্তু সে কথা এখন থাক। কারণ সেদিন অণিমাদি মুহূর্তের তরেও সে কথা ভাবেন নি। বরং বলেছেন, 'আজ ফিরে যাচ্ছি। তবে আবার আসব। সেদিন কিন্তু তোমার কোন বাধাই মানব না ট্রেল্‌স্ পাস।'

অভিযাত্রীরা সেদিন নাসপানপট্টি ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত কম বরফাবৃত একটি প্রান্তরে রাতের মতো আস্তানা গাড়লেন। পরদিন (১লা অক্টোবর) নেমে এলেন মার্তোলীতে। রাতে খেতে বসে অণিমাদি বললেন, 'বিচিত্র আকর্ষণ হিমালয়ের। এত কষ্ট করি তবু শ্রান্ত হই না। ফিরে যেতে মন চায় না। যাবার সময় কেবলই মনে হয়, আবার কবে আসব? আচ্ছা, আমরা যেমন হিমালয়কে ভালবাসি, হিমালয়ও কি আমাদের তেমনি ভালবাসে?'

'বাসে বই কি।' কৃপাণবাবু বললেন, 'হিমালয়কে ভালবেসে বার বার যারা তার কাছে আসে, একবার হিমালয় তাদের বুকে টেনে নেয়।'

কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে সেদিন নেহাৎ কথাচ্ছলে কৃপাণবাবু যে কথা বলেছিলেন, পরদিনই অণিমাদির জীবনে সে কথা নির্মম সত্য হয়ে দেখা দেবে।

২রা অক্টোবর ১৯৬৪—গান্ধীজীর জন্মতিথি। মার্তোলীর পাট চুকিয়ে অভিযাত্রীরা সকালেই রওনা হলেন বুগডিয়ারের পথে। চলতে চলতে অমূল্য বলল, 'দু বছর আগে আজকের দিনে আমরা নীলগিরি অভিযানের মূল-শিবির স্থাপিত করেছিলাম।'

'আর আজ?' অণিমাদি বললেন, 'পরাজিত হয়ে পালিয়ে চলেছি হিমালয় থেকে।'

দুপুরের পরে ওঁরা এসে পৌঁছলেন বুগডিয়ার। কুলিরা আগেই এসে রান্না খাওয়া সেরে নিয়েছে। কৃপাণবাবুর সঙ্গে অণিমাদিও পৌঁছেছিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। অপেক্ষা করছিলেন সবার জন্য। তাঁরা আসতেই অণিমাদি নেতাকে বললে, 'আমরা দুজনে এগিয়ে যাচ্ছি, আপনারা বিশ্রাম করে আস্তে আস্তে আসুন।'

'কিন্তু সন্ধ্যের আগে লিলাম পৌঁছানো যাবে কি? আসার সময়ই পথের যা চেহারা দেখেছি! আর ইতিমধ্যেই ন মাইল হাঁটা হয়ে গেছে।' নেতা আমতা আমতা করতে থাকেন।

অণিমাদি বলেন, 'আমাকে সাত তারিখের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতেই হবে। আমি না গেলে স্কুলের প্রশ্নপত্র তৈরি হবে না। ছুটির পরই পরীক্ষা।'

নেতা রাজী হলেন। কৃপাণবাবু ও অণিমাদি বেরিয়ে পড়লেন আট মাইল দূরে লিলামের দিকে। যাবার সময় অণিমাদি অমূল্যকে বললেন, 'তোমরাও বেশি দেরি কোর না। তাড়াতাড়ি এস। এখনও কিছু টিনের মাছ আর কিমা মটর রয়েছে। আজ আমি নিজে রান্না করব। আমি আগে গিয়ে রান্না চড়িয়ে দিচ্ছি।'

'তোমার তো পুঁথিগত বিদ্যা। স্কুলের মেয়েদের রান্না শেখানো, আর মুখে দেবার মতো রান্না করা এক জিনিস নয়। খাবারগুলো নষ্ট করবে বুঝতে পারছি।'

অমূল্যর কথায় হেসে ফেললেন অণিমাদি, 'আচ্ছা আজ রাতে খাবার সময় যেন একথা মনে থাকে। আমরা সবাই খাবো, আর তাকিয়ে তাকিয়ে তুমি তাই দেখবে।'

অমূল্য তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না না। আমি এমনি বললাম। আমি জানি তুমি খুউব ভাল রান্না করতে পার অণিমাদি।'

আবার হাসলেন তিনি। কৃপাণবাবুও হাসিতে যোগ দিলেন। তারপরে ওঁরা বিদায় নিলেন হাত নেড়ে। চিরবিদায় নিলেন অণিমাদি তাঁর সহযাত্রীদের কাছ থেকে। আমাদের কাছ থেকে।

বুগডিয়ার থেকে প্রথম কিছুদূর পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পথ। তারপরে অনেকটা সোজা, একটি ঝরণার কাছে এসে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। আবার কিছুটা এসে রাস্তাটি বেঁকেছে বাঁয়ে। বাঁক ছাড়ালেই সেই গিলা বা কাঁচা পাহাড়। পাহাড়ীরা বলে খতরনাক। অর্থাৎ শ'খানেক ফুট বিপদসঙ্কুল স্থান। ডান দিকে প্রায় হাজার ফুট উঁচু খাড়া পাহাড়, বাঁদিকে খরস্রোতা গৌরীগঙ্গা। পাহাড়ের গা দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ। গত কয়েকদিনের বৃষ্টি আর ভূমিকম্পের ফলে ক্রমাগত ধস নেমে সেই পথ-রেখা নিশ্চিহ্ন—মরণফাঁদে রূপান্তরিত। জায়গাটির উচ্চতা মাত্র হাজার ছয়েক ফুট। মার্তোলী থেকে দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছয় মাইল। সেখান থেকে লিলামের পুলিসব্যারাক মাইল দেড়েক।

বিকেল পৌনে ছটা নাগাদ সর্দার লক্ষ্মণ সিং তার কুলির দল নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হল। পাহাড়টাকে ভাল করে লক্ষ্য করে নিয়ে ওরা সেই ধস পেরোতে শুরু করল। অতর্কিতে ওপর থেকে কয়েকখানা পাথর পড়ল গড়িয়ে। লক্ষ্মণ সিং ও একজন স্থানীয় ঘোড়াওয়ালা সামান্য আহত হল। তাহলেও তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লিলামের পুলিসব্যারাকে পৌঁছল সন্ধ্যের একটু আগে।

অণিমাদিকে নিয়ে কৃপাণবাবু যখন সেই মরণফাঁদের কাছে এলেন, তখনও বেশ দিনের

আলো রয়েছে। জায়গাটার চেহারা দেখে ওঁরা দুজনেই একবার থমকে দাঁড়ালেন। একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। সমস্ত পাহাড়টাই যেন টুকরো টুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়তে চাইছে গৌরীগঙ্গার জলে। ওঁরা সাবধান হলেন। কৃপাণবাবু ভাল করে দেখে নিলেন পাহাড়টা। নাঃ, শান্ত ও স্থির। কোথাও একটি নুড়ি পর্যন্ত গড়াচ্ছে না। তাঁর দীর্ঘ পদযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হল, এখন পার হওয়া যেতে পারে। তবে পাশিপাশি নয়। পাশাপাশি চলা সম্ভব নয় সেখানে। অণিমাদি চললেন আগে আগে, কৃপাণবাবু তাঁর পেছনে।

কতটুকুই বা জায়গা। পেরোতে বড় জোর মিনিট পনেরো লাগে। ওঁরা ধীর পদক্ষেপে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পেরিয়ে এলেন। কৃপাণবাবুর কি মনে হল, তিনি ঘড়ি দেখলেন—ছটা বেজে দশ। নাঃ, আলো থাকতেই লিলাম পৌঁছনো যাবে। আর মাত্র মাইল দেড়েক। কিন্তু পাহাড়ী পথে মাইলের হিসেব অচল। দেড় মাইল হলেও লিলাম ছিল বহুদূর। অণিমাদির জীবনের পদক্ষেপের বাইরে।

অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড গর্জন প্রকম্পিত করে তুলল চতুর্দিক। কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই কৃপাণবাবুর চোখের সামনে সারা পৃথিবী দুলে উঠল। বেশ বড় একখানি পাথর বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল অণিমাদির ওপরে। তিনি নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়লেন হিমালয়ের কোলে। হিমালয় নিঃসঙ্কোচে তাঁকে কাছে টেনে নিল চিরকালের মতো। আর কোন দিন হিমালয়ের হাতছানি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলবে না। তিনি আকুল হয়ে হিমালয়ের পথে পথে ছুটে বেড়াবেন না। হিমালয়ের সঙ্গে চিরমিলন হল তাঁর। মেজর জয়াল ও ম্যাডাম কোগানের নামের পাশে আর একটি নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হল—শ্রীমতী অণিমা সেনগুপ্তা।

কিন্তু অণিমাদি যে বলেছিলেন তিনি নিরাপদে ফিরে আসবেন আমাদের মাঝে? বিদায়বেলার সেই শেষ কথাটি কেন সত্য হল না তাঁর জীবনে?

তবে আমাদের জীবনে মিথ্যে হয় নি তাঁর বাণী। ফিরে না এলেও আমরা তাঁকে হারাইনি। তিনি আছেন আমাদের অন্তরে, প্রত্যেক হিমালয়-প্রেমিকের মাঝে। তিনি বেঁচে আছেন হিমালয়ের হিমানীতে, কমনীয়া কুমায়ুনের মাটিতে আর ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে।

॥ সতেরো ॥

কখন যে একটা তুষারাবৃত প্রান্তরে নেমে এসেছি খেয়াল করি নি। খেয়াল হতে দেখি একটা স্বচ্ছ জলধারার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে এই তুষারাবৃত প্রান্তরটি একটি জমাটবাঁধা নদী। আর এই জলধারাটি অচল নদীর সচল সংস্করণ।

লাফ দিয়ে জলধারা ডিঙিয়ে এলাম। জলধারার পরেও বরফাবৃত প্রান্তর। কঠিন বরফ—ক্রমাগত পা পিছলে যাচ্ছে।

কিন্তু কয়েক পা এগোবার পরেই বরফের প্রকৃতি পাল্টে গেল। এখানে নরম তুষারের সমারোহ। প্রতি পদক্ষেপে পা তলিয়ে যাচ্ছে। রামচাঁদ বরফ পরীক্ষা করে করে এগিয়ে চলেছে। তারই প্রদর্শিত আঁকাবাঁকা পথে আমরা চলেছি এগিয়ে।

তুষারাবৃত প্রাঙ্গণ শেষ হল। আমরা আবার ওপরে উঠতে শুরু করলাম। আশ্চর্য এখানে একটুও বরফ নেই। পাথরও নেই বললেই চলে। কালো মাটির পাহাড়। মোটেই সুগম নয়।

কর্দমাক্ত চড়াই পথ। দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে আরোহণ করা কঠিন। ফলে আছাড় খাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। আছাড়ে আছাড়ে সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। কালো কাদায় মাখামাখি হয়ে ভালুকের মতো চেহারা হয়েছে সবার।

কিছুক্ষণ বাদে একটা বিরাট পাথরের প্রাচীর দেখতে পেলাম। একটু এগিয়ে বুঝলাম প্রাচীর নয়, পাহাড়। তবে এদিকটা একেবারে খাড়া উঠে গেছে। বীর বলে, "ওখানেই বাগুয়াবাসা।"

একে একে আমরা উঠে এলাম ধর্মশালার সামনে। একফালি আঙ্গিনা। সেখানে পড়ে আছে আমাদের কয়েক বোঝা জ্বালানি। কুলিরা কাল রেখে গেছে এখানে। পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে সবাই বসে পড়ি এখানে-ওখানে।

পাথরের ওপরে পাথর সাজিয়ে বুকসমান উঁচু করা হয়েছে। তার ওপরে স্লেট পাথরের ছাউনি দিয়ে প্রনবানন্দ তৈরি করেছেন এই ধর্মশালা। দুটি ঘর। প্রত্যেকটিতে জনছয়েক মানুষ কোনমতে শুয়ে থাকতে পারে। ১৪,৫০০ ফুট উঁচু এই দুর্গম স্থানে এ আবাসটি নির্মাণ করতে স্বামীজীকে অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হয়েছে। কিন্তু বিগত বিশ বছরে কেউ কোন সংস্কার করে নি। ফলে বর্তমানে জীর্ণদশা।

অথচ আজও যেসব যাত্রী তাঁবু ছাড়া রূপকুণ্ডে আসেন, তাঁদের কাছে অপরিহার্য এই ধর্মশালা। তাঁরা ওয়ান থেকে শুকরি ও বাগচো হয়ে এখানে আসেন। এখান থেকে রূপকুণ্ড যাওয়া-আসা করেন। জায়গাটা প্রাকৃতিক দিক থেকে বড়ই নিরাপদ। পাশেই প্রবাহিত হচ্ছে একটি স্বচ্ছশীতল জলধারা। কে বলতে পারে এই ধর্মশালাটি না থাকলে হয়ত অণিমাদি প্রমাণ করতে পারতেন না যে মেয়েরাও রূপকুণ্ড দর্শন করতে পারে। মানবসেবাই তো মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা। সাধক প্রণবানন্দকে প্রণাম করি।

রামচাঁদের ইচ্ছে আজ রাতটা আমরা এখানেই থাকি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছে আমরা এগিয়ে যাই। বেলা যখন রয়েছে, তখন এখুনি যাত্রার গতি টানা অর্থহীন। আজ এক মাইল এগিয়ে থাকলে, কাল অনেক সুবিধে হবে। তাই গম্ভীর স্বরে অসিত রামচাঁদকে বলে, "কুলিরা কিছু কিছু জ্বালানি মালের সঙ্গে বেঁধে নিক। কাল সকালে এসে ওরা বাকিটা নিয়ে যাবে। কাল তো ওদের কোন কাজ নেই।"

রামচাঁদ কুলিদের নির্দেশ দেয়। ওরা একে একে উঠে দাঁড়াল। জল খেয়ে নিয়ে মালের সঙ্গে কিছু কিছু জ্বালানি বেঁধে নেয়। তারপরে আস্তে আস্তে চলা শুরু করে। আমরা ওদের অনুসরণ করি।

ধর্মশালার পাশ দিয়ে সেই পাহাড়টির গা ঘেঁষে সঙ্কীর্ণ পথ। পাহাড়টির নাম বলওয়া। কোথাও কোথাও আইস-এক্স্ দিয়ে পথ ঠিক করে নিতে হচ্ছে। কখনও বা পাশের পাথর ধরে ধরে এগোতে হচ্ছে।

একজন কুলির পিঠ থেকে একটা কিট্ পড়ে গেল। চিন্তিত নেতার সঙ্গে চিন্তা করার জন্য আমরাও বসে পড়ি। চিন্তায় সমাধান হল না। তবে সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হল—যা যাবার তা গেছে, যা গেছে তার জন্য হা-হুতাশ না করে এখন এগিয়ে যাওয়াই সঙ্গত। আমরা এগিয়ে চলি।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াতে হল। একটি ছাদহীন পাথরের ঘর। এখানে কার বাসা বাঁধার শখ হয়েছিল? সপ্রশ্ন নয়নে রামচাঁদের দিকে তাকাই। সে উত্তর দেয়, "রানীকা সুলেরা।"

"রানী তো বুঝলাম, সুলেরাটা কি?" মোহিত বলে।
"সুলেরা শব্দের অর্থ আতুরঘর। রানী কা সুলেরা মানে রানীর আতুরঘর।"
"কোথাকার রানী? তিনি কেনই বা এসেছিলেন এখানে?" সঙ্গে সঙ্গে সুজল প্রশ্ন করে।
রামচাঁদ বলে, "সে কথা শুনতে হলে বসতে হবে এখানে। দুর্গম পথ। গল্প করতে করতে চলা যাবে না। তা ছাড়া তাতে শুনতেও পাবেন না সবাই। সারি বেঁধে চলতে হচ্ছে যে।"
"তা একটু বসাই যাক না। কি বলুন অসিতদা?" দাশু নেতার অনুমতি চায়।
"বসলে যে দেরি হয়ে যাবে।" অসিত আপত্তি করে।
ঘড়ি দেখে দেবকীদা বলেন, "মোটে চারটে বাজে। এখনও অনেক সময় আছে। আর কতক্ষণই বা লাগবে? ওরা যখন বলছে....।"
"ঠিক আছে।" নেতা অনুমতি দেয়।
আমরা বসে পড়ি সুলেরার সামনে। বেশ খানিকটা সমতল জায়গা রয়েছে। একটু দূরে একটি ঝরণা—ছিরনাগ। ইচ্ছে করলে এখানেও তাঁবু ফেলা যায়। কিন্তু বেলা যখন রয়েছে আমরা আরও এগিয়ে যাব।
সুলেরার অঙ্গনে দুটি পাথরের বেদী রয়েছে। তারই একটির ওপর বসে পড়ে রামচাঁদ। সে কুলিদের এগিয়ে যেতে বলে। তারপর পকেট থেকে রেশমী রুমাল বের করে মুখ মোছে। রুমাল রেখে সিগারেট বের করে। সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে শুরু করে—সে প্রায় সাতস বছর আগেকার কথা। কনৌজরাজ যশোদয়াল সিং সপরিবারে অংশ নিলেন নন্দাযাতে। আসন্নপ্রসবা রানী বল্লভা তাঁর সঙ্গী হলেন। বহু কষ্ট করে রাজা রানী এসে পৌঁছলেন এখানে এই গিমতলিতে। তাঁবু ফেলা হল। ইতিমধ্যে অগ্রবর্তী দল পৌঁছে গেছেন রূপকুণ্ডে। রাজারানীর মঙ্গল কামনা করে তাঁরা সেখানে লাটুদেবী ও নন্দাদেবীর পূজো দিয়েছেন। পরদিন সকালে তাঁরা এগিয়ে যাবেন মোহকুণ্ডে, রাজা-রানী যাবেন রূপকুণ্ডে।
সহসা রানীর প্রসববেদনা শুরু হল। রাজার সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি পাথর দিয়ে তৈরি করলেন এই সুলেরা। গভীর রাতে রানী সন্তান প্রসব করলেন।
তুষারতীর্থ কলুষিত হল। লাটুদেবী রুষ্টা হলেন, নন্দাদেবী হলেন ক্রুদ্ধা। আরম্ভ হল বজ্রপাত—প্রচণ্ড তুষারঝড়। রূপকুণ্ডের তাঁবু উড়ে গেল। গিমতলির সুলেরা ভেঙ্গে পড়ল। পাত্র-মিত্র-অমাত্যসহ সপরিবারে শহীদ হলেন যশোদয়াল। রূপকুণ্ড পরিণত হল মরণহ্রদে।
বাগুয়াবাসা থেকে যে পাথরের প্রাচীর শুরু হয়েছিল, রানীকা সুলেরায় এসেই তা শেষ হয়ে গেল। প্রাচীরের শেষে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর—তুষারাবৃত। আর সেদিকে নজর পড়তেই উপনেবাবু যেন পাগল হয়ে গেলেন। তিনি বলতে থাকলেন, Saussuri Graninifolia...হেমকমল, ফেণকমল, ব্রহ্মকমল! তা ছাড়া ঐ যে Rheum herb, দেখুন না কি সুন্দর অথচ কত বড় বড় লাল পাতা। আর ঐ দেখুন, কত বিচিত্র ধরনের Delphinium—কোথাও দেখি নি। এক জায়গায় এমন সমারোহ আমি আর দেখি নি।"
মিথ্যে বলেন নি উপেনবাবু। তুষারাবৃত প্রান্তরে যেন পারিজাতের মেলা বসেছে। সত্যই পাগল হবার মতো দৃশ্য।
কিন্তু আমরা এগিয়ে যাব কেমন করে? পারিজাত পথরোধ করেছে! ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে কেবল ফুল আর ফুল। ফুল ছাড়া যে আর কিছুই নেই এখানে। ফুল না মাড়িয়ে পথ চলার উপায় নেই। অথচ উপেনবাবু বার বার সাবধান করেছেন, "দেখবেন ফুল নষ্ট করবেন না যেন।"

এমন সুন্দর ফুল, কে চায় নষ্ট করতে? কিন্তু না করেই বা উপায় কি? তবু যতটা সম্ভব সাবধানে পথ চলেছি। চলতে চলতে পারিজাতের সৌরভে আকুল হচ্ছি। তাদের স্বর্গীয় সৌন্দর্যে ব্যাকুল হচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে ফুল কমে এল। এখানটা অপেক্ষাকৃত অসমতল। কারণ ত্রিশূলের গা থেকে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ গিরিশিরা পাশাপাশি নেমে এসেছে এখানে। একে একে তাদের অতিক্রম করছি আমরা। দুটি গিরিশিরার মাঝে বয়ে যাচ্ছে একটি ঝরণা। ঝরণা ডিঙিয়ে ওপরে উঠেছি আমরা।

খানিকটা উঠেই আবার একটি তুষারাবৃত প্রান্তর। আবার তেমনি ব্রহ্মকমল, ফেণকমল ও হেমকমলের মেলা। আবার সাবধান করেন উপেনবাবু। আবার তেমনি দেখে দেখে পথ চলা।

এ প্রান্তরটি আগেরটির চাইতে বিশালতর, কাজেই ফুলবনও বৃহত্তর। যেখানে একটু সমতল, সেখানেই বরফ। আর যেখানে বরফ, সেখানেই পারিজাত।

যেখানে বরফ নেই, সেখানে পারিজাত নেই। কিন্তু পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে নানা রঙের ছোট ছোট ফুল। পারিজাত বনে ঠাঁই পায় নি ওরা, কিন্তু পালিয়ে যায় নি অমরাবতী থেকে। অমরাবতী? হ্যাঁ, এই তো অমরাবতী।

মনে মনে ধন্যবাদ জানাই রামচাঁদকে। সে আমাদের নিয়ে এসেছে এখানে। নিয়ে এসেছে রূপকুণ্ডের উপকণ্ঠে—হুনিয়াথরে।

আহা, এমন রমণীয় স্থানের কি কুৎসিত নাম! আচ্ছা এর কি একটা নতুন নাম রাখা যায় না? খুব যায়। যেমন রূপনগর। রূপকুণ্ডের উপকণ্ঠে রূপগঙ্গার তীরে আমরা যে বসতি স্থাপন করলাম, তাকে রূপনগর ছাড়া আর কি বলতে পারি?

আমাদের তিনদিকে খাড়া পাহাড়। একদিক আস্তে আস্তে নিচু হয়ে গিয়ে সেই ময়দানে মিশেছে। তার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে রূপগঙ্গা। ত্রিশূলের তুষার-বিগলিত ধারা চলেছে মর্ত্যের মানবের মুক্তিধারায় পরিণত হতে।

ত্রিশূলকে আমরা দেখেছি বহু জায়গা থেকে। দেখেছি রানীক্ষেত, বিনসর, কৌসানী ও গোয়ালদাম থেকে। কিন্তু এ যেন সে ত্রিশূল নয়। সেখান থেকে যাকে মনে হয়েছে শান্ত ও সুন্দর, এখানে সে অশান্ত। তবে সুন্দর বৈকি—পরমসুন্দর। সে যে সত্য ও সুন্দরের প্রতীক।

আমরা এসেছি ত্রিশূলশিখরের দক্ষিণ দিকে, ঠিক শিলিসমুদ্র হিমবাহের নিচে। এই হিমবাহের উত্তর থেকে সৃষ্ট হয়েছে নন্দাকিনী আর দক্ষিণ থেকে রূপগঙ্গা। নন্দাকিনী ত্রিশূল পর্বতের দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, নন্দপ্রয়াগে গিয়ে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর রূপগঙ্গা শিলিসমুদ্রের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সৃষ্ট হয়ে ওই প্রান্তরকে প্লাবিত করে নেমে গেছে দক্ষিণে, সুতোলগাঁয়ে গিয়ে মন্দাকিনীতে মিলেছে।

রূপময়ী রূপগঙ্গা। স্বচ্ছ কিন্তু শীর্ণা, সদাচঞ্চলা কিন্তু গর্জনশীলা নয়। আঁকা-বাঁকা রুপোলী রেখা। প্রান্তরকে বিধৌত করে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে—অদৃশ্য হয়েছে।

পারিজাত বনেই তাঁবু ফেলার প্রস্তাব করল রামচাঁদ। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলেন উপেনবাবু, "সে কি! তাহলে যে ফুল কেটে ফেলতে হবে!"

"তাছাড়া উপায় কি? এখানে তো সর্বত্রই ফুল।"

যুক্তি মানতে চান না উপেনবাবু। বলে ওঠেন, "না না, এ ঠিক হচ্ছে না। হিমালয়ের

অমূল্য সম্পদ এই সব ফুল। এ সম্পদ নষ্ট করা পাপ।"

কথাটা মিথ্যে নয়। এই দুষ্প্রাপ্য কুসুমদলকে দলন করা নেহাতই নিষ্ঠুরতা। কিন্তু এদের না কেটে যে তাঁবু ফেলা সম্ভব নয়। উপেনবাবুকে আবার বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি অবুঝ। বিরক্তকণ্ঠে বলেন, "এ জানলে আমি বাগুয়াবাসাতেই রাত কাটাতাম।"

যত পাপই হোক, শেষ পর্যন্ত সেই পারিজাত বন কেটে বসত হল। তবে হিসেব করে করে তাঁবু ফেললাম। যত কম ফুল কেটে পারা যায়। ফুলগুলি কিন্তু ফেলে দিলাম না। এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলিয়ে তার চারিদিকে সাজিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ বাদেই পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে আকাশে। রূপনগর রূপান্তরিত হবে অমরাবতীতে। ফুলশয্যার এমন সুযোগ আর আসবে না জীবনে।

বাইরে বেরুতে গিয়ে দেখি কাঁচা পেঁপের বিচির মতো অজস্রধারায় তুষারকণা ঝরছে। আর তারই মধ্যে বীর কফির কেট্‌লী নিয়ে এক তাঁবু থেকে আর এক তাঁবুতে ছুটোছুটি করছে। এর মধ্যে কখনই বা সে স্টোভ ধরালো আর কখনই বা কফি বানালো ! তবে এখন আমাদের কফির বড়ই প্রয়োজন। বীর তা জানে বলেই কফির কেট্‌লী নিয়ে এদিকে আসছে।

রুকস্যাক থেকে মগ বের করে বীরের কাছ থেকে কফি নিই ' তাকে ধন্যবাদ দিই। সে মুচকি হেসে পাশের তাঁবুতে চলে যায়।

গরম কফি খেয়ে শরীরে বল পেলাম। বেরিয়ে এলাম বাইরে। তুষারকণা এখনও ঝরছে। ঝরছে মুষলধারায়। ইতিমধ্যেই তাঁবুর ওপরে তুষার সঞ্চিত হয়েছে। তুষারপাতের মধ্যে পায়চারি করতে ভালই লাগছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তুষারপাত কমে এলো। যেমন অতর্কিতে আরম্ভ হয়েছিল, তেমনি শেষ হয়ে গেল। এখানে এমনই হয়। এখন আকাশ মেঘমুক্ত, ত্রিশূল কুয়াশা-মুক্ত আর আমাদের দেহ ও মন অবসাদ মুক্ত।

এখানে আবহাওয়ার কোন স্থিরতা নেই। কাল কেমন থাকবে, কেউ বলতে পারে না। এখন যখন ভাল করে দেখা যাচ্ছে চারিদিক, তখন ছবি নিয়ে নিলে কেমন হয় ?

ভালই হয়। আমার প্রস্তাব সবাই সমর্থন করে। ক্যামেরা বের করে কিছুক্ষণ ধরে ছবি নিলাম চারিদিকের।

ছবি তোলার পরে শুরু হল খেলা—বল খেলা। রাবার বা চামড়ার বল নয়, বরফের বল। পা দিয়ে নয়, হাত দিয়ে খেলছি আমরা। বরফের বল বানিয়ে একে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। যে যাকে কাছে পাচ্ছে তার গায়ে ছুঁড়ছে। কেবল সুজলের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন—অসিতের ভুঁড়ি।

কিছুক্ষণ বাদে কেন যেন কথাটা খেয়াল হয় দাশুর। সে তাড়াতাড়ি তাঁবুতে গিয়ে থার্মোমিটারটা নিয়ে আসে। আর আনতেই আমাদের আক্কেল গুড়ুম—উত্তাপ ছাব্বিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট্।

ইতিমধ্যে আকাশটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। মেঘ আর কুয়াশার শেষ চিহ্ন গেছে মুছে। এমন সুনীল আকাশ বহুদিন দেখি নি। আকাশ তো নয়, যেন চন্দ্রাতপ। সে এসেছে নেমে, একেবারে আমার হাতের নাগালের মধ্যে। এখানে দাঁড়িয়ে কার সাধ্য বলে আকাশ অসীম, আকাশ অনন্ত, আকাশ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

অস্তাচলগামী সোনালী সূর্যের শেষ শিখা এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে আমাদের তাঁবুর ওপরে, রূপনগরের রুপোলী প্রান্তরে আর অনতিদূরের ঐ নন্দাঘুণ্টি ও ত্রিশূলের তুষারশুভ্র

শরীরে। কেউ যেন মুঠো মুঠো আবীর দিয়েছে মাখিয়ে। সে আবীরের ছিটেফোঁটা এসে পড়েছে আমাদের চারিপাশে—রূপনগরে আর তার পারিজাত বনে।

আস্তে আস্তে শেষ শিখা গেল মিলিয়ে। আবীরে গেল মুছে। আঁধার নেমে এল রূপনগরে, নন্দাঘুণ্টি আর ত্রিশূলে। আঁধার নেমে এল আমাদের তাঁবুতে তাঁবুতে।

অমিতাভ আবার থার্মোমিটার বের করল। না, তার অনুমান মিথ্যে নয়। সত্যই উত্তাপ কমে যাচ্ছে। দু ঘণ্টায় দু ডিগ্রি কমে গেছে। এ হারে কমতে থাকলে তো কাল সকালে.... ?

আমাদের মনের উত্তাপ কিন্তু একটুও কমে নি। নইলে আমরা এখনও তাঁবুর বাইরে কেন ?

না থেকে যে উপায় নেই। রূপনগরের আকাশে চাঁদ উঠেছে। আলোর বন্যা নেমেছে। চাঁদের হাসির বাঁধ গেছে ভেঙ্গে।

আকাশের দিকে তাকাই। রাতের আকাশ, কিন্তু তার নীলিমা মুছে যায় নি। সাদা সাদা কয়েকখানি মেঘ মহানন্দে আকাশের বুকে ছুটোছুটি করছে। কয়েকটি তারা এখানে ওখানে উঁকি দিচ্ছে। লাল তাদের রং। নীল চন্দ্রাতপের ওপরে লাল কয়েকটি বুটি।

পাহাড়ের দিকে তাকাই। ত্রিশূল ও নন্দাঘুণ্টি। তুষার নয়, এ যেন শ্বেতপাথরের সীমাহীন সৌন্দর্য। চাঁদের আলো তাদের ওপর আছাড় খেয়ে চারিদিকে প্রতিফলিত হয়েছে। আর তাই এখানে এমন আলোর বন্যা।

মাটির দিকে তাকাই। মাটি বলেই মনে হচ্ছে এখন। চাঁদের হাসি উঁচু-নিচুর ব্যবধান দিয়েছে ঘুচিয়ে। সকল অসাম্য দূর করে সাম্য এনেছে এই অসমতল প্রান্তরে। গিরি-কান্তারে সমতলের সৌন্দর্য এনে তার ভয়াবহতা দিয়েছে দূর করে।

এখান থেকে এখন বহু দূর অবধি দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কৈলু বিনায়ক। ওদিকে তাকালে মনে হয় আমরা একটা সুবিরাট স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখছি। আকাশ পাহাড় আর মাটির মাঝে খেলা চলেছে। চাঁদ তারা আর মেঘ, নন্দাঘুণ্টি আর ত্রিশূল, রূপগঙ্গা পারিজাত আর এই প্রান্তর, সবাই এ খেলায় অংশ নিয়েছে। আমরা কেবল নীরব দর্শক।

আমাদের পেছনে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে ওপরে। নিচের দিকে মসৃণ গ্রানাইট পাথর। তাই তেমন তুষার জমতে পারে নি। কিন্তু ওপরের দিকে যেখানে তুষার জমে আছে, সেখানেও মাঝে মাঝে কালো কালো পাথর জেগে রয়েছে। আমাদের সামনে অনেক উঁচুতে দুটি সাদা-কালো টিলা। দুই টিলার মাঝখানে একটি তুষারাবৃত প্রান্তর। ঐ প্রান্তরের পেছনেই রূপকুণ্ড।

যে পর্বতশিখর থেকে ভারতীয় পর্বতারোহণ আরম্ভ হয়েছে, সেই শিখরের সানুদেশে এসেছি আজ। ত্রিশূল থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের পর্বতারোহণের ইতিহাস। প্রবীণ পর্বতারোহী শ্রীগুরুদয়াল সিং সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। সহযাত্রী রয়. ডি. গ্রীনউড ও শেরপা দাওয়া থাণ্ডুপকে নিয়ে নেতা ১৯৫১ সালের ২১শে জুন ২৩,৩৬০ ফুট উঁচু ত্রিশূল-১ শিখরে আরোহণ করেন। ভারতীয় পর্বতারোহীরা আরও কয়েকবার ত্রিশূলশিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছেন। দিনে—সূর্যের আলোয়, এবং রাতে—চাঁদের আলোয়।

এখান থেকে রূপগঙ্গাকে বড়ই ছোট মনে হচ্ছে। ছোট মনে হচ্ছে এই গিরি-কান্তারকে। তবে মাঝে মাঝে যখন হিমেল হাওয়ার ঝাপটা এসে গায়ে বিঁধছে, তখনই মনে পড়ছে ওরা সবাই অসীমের অংশীদার। ছোট আমরা—আমরা মর্ত্যের মানুষ।

কুলিদের তাঁবু থেকে সমবেত সঙ্গীতের শব্দ আসছে ভেসে। কাল সকালে রওনা হয়ে

রূপকুণ্ড দর্শন করে বিকেলে আমরা ফিরে আসব এখানে। কয়েকজন কুলি কেবল যাবে আমাদের সঙ্গে। বাকি সকলে এখানে থাকবে। বিশ্রাম নেবে। আজ ওদের 'উইক এণ্ড'। তাই মৌজ করে গান গেয়ে নিচ্ছে। গান গাইতে খরচ হয় না। কিন্তু আনন্দের এমন উপকরণ আর নেই। তা ছাড়া গান গাইবার এ রকম আদর্শ স্থান যে বিশ্বসংসারে খুব কমই আছে।

এমন পরিবেশে এমনি আলোঝলমল রাত মানুষের জীবনে বেশি আসে না। আসে নি আমাদের অনেকেরই জীবনে। তাই আমরা রামচাঁদের নির্দেশ অমান্য করে, দুঃসহ শীত উপেক্ষা করে বসে আছি বাইরে। দেখছি স্ফটিকময় হিমালয়ের সীমাহীন সৌন্দর্য, তার অনিন্দ্যসুন্দর অনন্ত রূপ।

রূপের নেশায় বিভোর হয়ে কতক্ষণ বাইরে বসেছিলাম খেয়াল নেই। খেয়াল হতে দেখি, আর কেউ নেই। আমি একা। সবাই শীতের জন্য তাঁবুতে চলে গেছে। আমিও ফিরে চলি তাঁবুতে। আজ দাশু আমার তাঁবুর সঙ্গী।

তাঁবুতে এসে দেখি দাশু স্লিপিং-ব্যাগের ভেতরে। হাসতে হাসতে বলি, "কখন কেটে পড়লে, আমাকে একা ফেলে ?"

দাশু নিরুত্তর। সে কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ? এয়ার-ম্যাট্রেসের ওপরে বসে আবার বলি, "দাশু, ঘুমোচ্ছ নাকি দাশু...."

"এ্যাঁ,...না। না না, ঘুমোইনি। আপনি কখন এলেন ?"

"এই তো একটু আগে।" জুতো খুলে আমিও স্লিপিং-ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ি। সত্যই বড্ড শীত লাগছে।

দাশু আবার নীরব। বলি, "শীতের জন্য চুপ করে আছো, না ঘুম পেয়েছে ?"

"কোনটাই নয়।" দাশু একবার থামে। তারপরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, "এখানে আসার পর থেকে কেন যেন আমার বার বার বিঠলগোয়ারের কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে অণিমাদির কথা।"

"খুবই স্বাভাবিক। আমি সেবারে তোমাদের সঙ্গী হতে পারি নি। কিন্তু অণিমাদির কথা আমারও মনে পড়ছে বৈকি। শুধু অণিমাদি কেন, ম্যালোরী ও আর্ভিন থেকে গৌরাঙ্গ ও অমর পর্যন্ত প্রত্যেকের কথাই আজ মনে পড়ছে।"

দাশু কোন কথা বলে না, আমিও চুপ করে থাকি। ভাবতে থাকি ভারতীয় পর্বতারোহণের কথা, গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও অমর রায়ের কথা।

ভারতীয় পর্বতারোহণ আজ আর অবহেলার সামগ্রী নয়। বিশ্বের যে সব দেশে পর্বতারোহণের প্রচলন আছে, ভারত তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট (২৯,০২৮') শিখরে আমরা ভারতীয় জাতীয়পতাকা প্রোথিত করেছি।

ভারতীয় পর্বতারোহণে বাঙ্গালীর দানও সামান্য নয়। ভারতের প্রথম বেসরকারী অভিযান পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে—নন্দাঘুণ্টি (২০,৭০০') অভিযান। এ ছাড়াও বাঙ্গালী অভিযাত্রী ফ্লাঃ. লেঃ. এ. কে. চৌধুরী, ক্যাপ্টেন দাস, ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী, ভানু ব্যানার্জি ও অমূল্য সেন ও প্রাণেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশী ও সর্বভারতীয় অভিযানে অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। এক কথায় পৃথিবীর পর্বতারোহণের ইতিহাসে বাঙ্গালী তার নিজের আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য কিন্তু কম মূল্য দিতে হয় নি আমাদের। দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবছি না। কারণ দুঃখজয়ী না হলে পর্বতারোহী হওয়া যায় না। সকল প্রকার দৈহিক কষ্টের

উর্ধ্বে না উঠতে পারলে হিমালয়ের পথের পথিক হওয়া যায় না। আমি ভাবছি চরম মূল্যের কথা, শহীদ হবার কথা। এ পর্যন্ত হিমালয়কে আমাদের তিনটি প্রাণ ডালি দিতে হয়েছে। সেই তিন মহাপ্রয়াণের কথাই আমি ভাবছি।

হিমালয়ের পথে প্রথম শহীদ হয়েছেন অণিমাদি। অণিমাদির পরে আমরা হিমালয়ে হারিয়েছি গৌরাঙ্গ চৌধুরীকে, আমাদের সোনার গৌরাঙ্গকে। গৌরাঙ্গের আদি নিবাস বরিশালে। অণিমাদির মত সেও ছিল পিতামাতার প্রথম সন্তান। লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না। সময়মতোই আই. এ. পাস করেছিল। ছোটবেলা থেকে সে ছিল ডানপিটে দুঃসাহসী। কলেজের এন. সি. সি.-তে ছিল একজন পাণ্ডা। এন. সি. সি.-র ক্যাডেট হিসেবে দার্জিলিং থেকে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়ে আসে গৌরাঙ্গ। তার পরেই হিমালয়ের নেশা পেয়ে বসে তাকে। ১৯৬০ সালে গাড়োয়ালের সপ্তশৃঙ্গ শিখরে ও নীলগিরি পর্বতে বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করে। ১৯৬১ সালে মানা অভিযানে প্রায় ২২,০০০ ফুট পর্যন্ত ওঠে। ১৯৬২ সালে নওয়াং গম্বুর সঙ্গে বদ্রীনাথের নারায়ণ পর্বতশিখরে আরোহণ করে।

সাংসারিক প্রয়োজনে গৌরাঙ্গকে চাকরি নিতে হয়। কিন্তু কেবল অফিস আর বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকার ছেলে নয় সে। গৌরাঙ্গ পড়াশুনা শুরু করে ১৯৬৫ সালে বি. এ. পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় পাস করেছিল গৌরাঙ্গ। কিন্তু সে সুসংবাদ শুনে যেতে পারে নি।

পরীক্ষার পরই আবার হিমালয়ের নেশায় পেয়ে বসে তাকে। কম তো নয়, তিন-তিনটি বছর হিমালয়ের হিমেল হাওয়া লাগে নি তার গায়ে, তুষারধবল পথে পা ফেলে নি সে। তাই পরীক্ষার পরেই পুণার ডাক্তার জি. আর. পট্টবর্ধনের সঙ্গে গঙ্গোত্রী-১ (২১,৮৯০) শিখরের উদ্দেশে যাত্রা করে গৌরাঙ্গ।

এ অভিযানের খুব সামান্য সংবাদই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যা প্রকাশিত হয়েছে তাও গৌরাঙ্গ নিখোঁজ হবার পরে। গৌরাঙ্গ নিখোঁজ হবার সময় তার সঙ্গে মিনজুর নামে একজন শেরপা ছিল। মিনজুর এই দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষী।

মিনজুর বলেছে—গঙ্গোত্রী-১ অভিযানে তাদের তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় ১৯,০০০ ফুটে। পুরোহিত, মিনজুর ও আর একজন শেরপাকে নিয়ে গৌরাঙ্গ ৮ই জুন (১৯৬৫) এই শিবির স্থাপিত করে। ১০ই জুন তারা ১৯,০৯০ ফুট উঁচু নিকটবর্তী রুদ্রগৌরী শৃঙ্গে আরোহণ করে। তারপরে পুরোহিত নেমে আসে নিচে। শেরপাদের সঙ্গে গৌরাঙ্গ থেকে যায় সেখানে—গঙ্গোত্রী শিখরের পথ তৈরি করতে থাকে। ১৮ই জুন বিকেলে চশমা খুলে কাজ করবার সময় গৌরাঙ্গ চোখে একটা ব্যথা বোধ করে। সঙ্গী শেরপাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। মিনজুর সঙ্গী শেরপা ও গৌরাঙ্গকে নিয়ে নিচে চলে যেতে চায়। গৌরাঙ্গ রাজী হয় না। শেরপারা নেমে আসে নিচে। তুষার-অন্ধ হয়েও সেই তুষারাবৃত শিবিরে একা পড়ে থাকে গৌরাঙ্গ। পরদিন মিনজুর গৌরাঙ্গের জন্য ওষুধ নিয়ে ফিরে আসে শিবিরে। এসে দেখে গৌরাঙ্গর চোখের অবস্থা বেশ ভাল।

পরদিন সকালে উঠেই গৌরাঙ্গ মিনজুরকে বলে, তার চোখ ভাল হয়ে গেছে। সে শিখরের দিকে এগিয়ে যেতে চায়।

মিনজুর বাধা দেয়। বলে, 'সঙ্গে মাত্র দেড়শ ফুট দড়ি আছে। এতটুকু দড়ি নিয়ে দুজনে উঠব কেমন করে ? তা ছাড়া আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন। তাই ওপরে না গিয়ে, চলুন আমরা নিচে নেমে যাই।'

গৌরাঙ্গ রাজি হয় না। বলে, 'নেমে গেলে সবাই আমাদের কাপুরুষ বলবে। বলবে আমরা

ভয় পেয়েছি। আমার চোখের জন্য কোন চিন্তা করো না তুমি। চোখ আমার বেশ ভাল আছে। তবে দড়ির সমস্যাটা উপেক্ষা করবার মতো নয়। তুমি বরং একটু অপেক্ষা করো এখানে। আমি একবার সেই বিপজ্জনক জায়গাটার একটা ছবি নিয়ে আসি। দেখে আসি, শিখরের জন্য কোন পথ পাওয়া যায় কিনা। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।'

সে আধ ঘণ্টার আজও শেষ হয় নি, কোন দিন হবে না। ১৯৬৫ সালের ২১শে জুন সকাল ছটার সময় কাঁধে ক্যামেরা ও হাতে আইস-এক্স্ নিয়ে গৌরাঙ্গ সেই যে শিবির থেকে বেরিয়ে গেছে, আর সে ফিরে আসে নি। আর্ভিনও ম্যালোরীর মতো গৌরাঙ্গ চৌধুরীও চিরদিনের মতো হিমালয়ে হারিয়ে গেছে। তবে তাঁদের মতো তাকেও চিরকাল খুঁজে পাওয়া যাবে পর্বতারোহণের ইতিহাসে, পাওয়া যাবে দুঃসাহসী ভারতীয় তরুণদের তালিকায়।

গৌরাঙ্গর পরে আমরা হারিয়েছি অমর রায়কে। অমরের পৈতৃক নিবাস যশোহর জেলার বিনোদপুরে। অণিমাদি ও গৌরাঙ্গর মতো অমরও পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তবে প্রথম সন্তান নয়। তার আগে দুটি ভাই হয়ে মারা যায়। তাই বাপ-মা নাম রেখেছিলেন অমর। বোধ করি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের নামকরণ মিথ্যে হবে না। অমর সত্যই অমর হয়েছে। আজ তার সেই অমরত্বলাভের কথাই ভেবে চলেছি।

লেখাপড়ায় অমর মোটামুটি মন্দ ছিল না ছোটবেলায়। কিন্তু খেলাধূলায়, নৌকা টানায় তার জুড়ি পাওয়া যেত না। ১৯৬৫ সালে আই. কম. পাস করে অমর কলকাতা কর্পোরেশনের চাকরিতে ঢোকে। পরে সে প্রাইভেটে বি. কম. পাস করে আইন পড়া শুরু করেছিল। কলেজ স্পোর্টস ও স্বাস্থ্যশ্রী প্রতিযোগিতায় অমর অনেক পুরস্কার পেয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবের সে ছিল একজন নামকরা সদস্য। নৌকা টানায় বহুবার পুরস্কার পেয়েছে অমর। এই রোয়িং ক্লাবেই অমূল্য সেনের সঙ্গে অমরের পরিচয় হয়। অমূল্যর কাছে হিমালয়ের গল্প শুনে অমর পর্বতাভিযানে উৎসাহিত হয়। তারই পরামর্শে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিতে দার্জিলিং যায়। তার পরেই সুজিত বসু তাকে চতুরঙ্গী অভিযানে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানায়। পর্বতাভিযানের আমন্ত্রণ যে কোন পর্বতারোহীর পরম পুরস্কার। অমর সানন্দে সম্মত হয়। যশোহর নিবাসী বৃদ্ধ পিতার কাছে অভিযানে যোগ দেবার অনুমতি চেয়ে পাঠায়। পিতা নিষেধ করেন না, তবে পর্বতাভিযানের বিপদ সম্পর্কে পুত্রকে সতর্ক করে দেন। হয়তো বা পিতার মনে কোন আশঙ্কা দেখা দিয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি জানতেন, দুঃসাহসী পুত্রের জনক হলে সেসব আশঙ্কাকে আমল দিতে নাই। কারণ শাস্তি যা পাবার তা পেতেই হবে। অণিমাদি ও গৌরাঙ্গর বৃদ্ধ পিতাদের সঙ্গে সেই একই শাস্তি ভোগ করছেন তিনি। তবে বীর সন্তানের জনক হতে পারা পরম সৌভাগ্য। সেদিক থেকে সৌভাগ্যবান তাঁরা।

এ অভিযানেরও কোন বিশদ বিবরণ হয় নি। কিন্তু তাতে অমর আর তার সহযাত্রীদের আত্মদানের মূল্য কমে যায় নি। খবরে প্রকাশ—চতুরঙ্গী অভিযাত্রীরা ১০ই অক্টোবর (১৯৬৬) মূল-শিবির স্থাপিত করে। তারা প্রথমে শতপন্থ শিখরে অভিযান চালায়। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও তুষারপাতের জন্য সে অভিযান পরিত্যক্ত হয়। তারপরে তারা অপরাজিত ভাগীরথী-২ শিখর অভিমুখে অভিযান শুরু করে। ২২শে অক্টোবর সকালে অমর রায়, গোবিন্দরাজ, শেরপা গিয়ালবু ও কারমা শেষ শিবির থেকে ভাগীরথী শিখরে যাত্রা করে। বিকেল পাঁচটার সময় তারা শিখরে পৌঁছয়। যে দুর্গম পর্বতশৃঙ্গ বিগত ৩৫ বছরে বহু বিদেশী অভিযাত্রীদের ফিরিয়ে দিয়েছে, সেই অপরাজিত পর্বতশিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা

প্রোথিত করে দুঃসাহসী বাঙ্গালী তরুণ অমর রায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। ভাগীরথী যে জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে তাকে, সে জয়মাল্য তার হাত থেকে গ্রহণ করতে পারি নি আমরা। অমর আর ফিরে আসে নি আমাদের মাঝে।

অভিযাত্রীরা আধ ঘণ্টা শিখরে অতিবাহিত করে নামতে থাকে নিচে। আঁধার আসে ঘনিয়ে, হাওয়ার বেগ ওঠে বেড়ে, শুরু হয় তুষারপাত। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে সাবধানে নামতে থাকে তারা। একই দড়িতে বাঁধা চারজন, গিয়ালবু অমর গোবিন্দরাজ ও কারমা। হঠাৎ কারমার পা ফসকায়। সে ছিল সবার পেছনে। পেছনের আকস্মিক টানে সামলে নেবার অবসর পায় না সামনের অভিযাত্রীরা। কঠিন খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সকলে। পড়ে প্রায় তিন হাজার ফুট নিচে একটা গভীর খাদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হয় অমর। তারপরে গিয়ালবু। পরদিন কারমা। গোবিন্দরাজ সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে বেঁচে যায় শেষ পর্যন্ত। ভারতীয় পর্বতারোহণের বৃহত্তম দুর্ঘটনার সাক্ষী সে। দুর্গম ভাগীরথী শিখর বিজয়ের একমাত্র জীবিত অভিযাত্রী।

বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের ঘরকুনো দুর্নাম ঘুচিয়ে, পৃথিবীর পর্বতারোহণের ইতিহাসে যারা ভারতের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, নিজেদের জীবনের দীপশিখা দিয়ে যারা কোটি মানুষের জীবনে সাহসের আলো জ্বালিয়েছে, তাদের মৃত্যুহীন প্রাণকে প্রণাম করি।

॥ আঠার ॥

'নন্দা মাঈকী....জয়।'

বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে। আজ ২রা অক্টোবর। আজকের তারিখেই আমরা নীলগিরি অভিযানের মূল-শিবির স্থাপিত করেছিলাম নন্দন-কাননে। আজকের তারিখেই অণিমাদি শহীদ হয়েছেন কুমায়ুনে। আর আজই আমরা চলেছি রূপকুণ্ডে—মরণ-হ্রদের তীরে, জীবনের জয়গান গাইতে।

যাত্রার আয়োজন শুরু হয়েছিল শেষরাতে। শীতের জন্য কেউ আমরা ঘুমোতে পারি নি। প্রচণ্ড শীত এখানে। এর চেয়ে উঁচু জায়গায় রাত কাটিয়েছি, কিন্তু এমন শীতে কষ্ট পাই নি। চারিদিক খোলা, তাই তুষারাবৃত হিমালয়ের হিমেল হাওয়া সব সময় দাপাদাপি করে এখানে। বুঝতে পারছি, তাঁবু ফেলার এমন চমৎকার জায়গা ফেলে প্রণবানন্দ কেন এক মাইল পেছিয়ে বাগুয়াবাসায় ধর্মশালা নির্মাণ করেছেন।

ঘুমোতে পারে নি কেউ। হিমেল হাওয়ার দাপটে তাঁবুটা সারারাত থর থর করে কেঁপেছে। চাঁদের আলোয় তাঁবুর ভেতরে ভোরের ছোঁয়া লেগেছে।

কুলিরাও কাল সারারাত আগুনের ধারে বসে নন্দাদেবীর জাগার গেয়েছে। দেবীর নামগান করে জেগে থাকার ক্লান্তি দূর করে শীতের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে।

অমিতাভ মাঝে মাঝে তাঁবু থেকে বেরিয়ে চারিপাশের সব কিছুকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। কিন্তু সে দেখতে পায় নি তাদের, যারা নাকি নির্জন নিশীথে নাচগান করে এখানে আর যাদের জন্যই এই সৌন্দর্যনিকেতনের নাম হুনিয়াথর। হুনিয়া মানে ভৃত্য আর থর মানে স্থান। অমিতাভর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি সেই অশরীরীদের।

তাঁবুতে ফিরে অমিতাভ আর পারে নি ঘুমোতে। একে শীত, তার ওপর পিপাসা। জল খেতে গিয়ে দেখেছে ওয়াটার-বটলের জল জমে বরফ হয়ে আছে। রূপের তৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলের তৃষ্ণা। তৃষ্ণায় আকুল হয়েছে অমিতাভ। ব্যাকুল চিত্তে প্রভাতের প্রতীক্ষা করেছে।

কোনমতে রাতটুকু কাবার করে তাঁবুতে তাঁবুতে এসে আমাদের ডাক দিয়েছে। বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা উঠে বসেছি। যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করেছি। স্লিপিং-ব্যাগের ভেতরে বুকের কাছে রাখা জুতো-মোজা বের করে অনেক কসরতের পরে পায়ে পরেছি। দাঁত না মেজে, একটু গরম জল চোখে-মুখে দিয়ে, কফির মগে চুমুক দিয়েছি।

আয়োজন যখনই শুরু হয়ে থাক, জলখাবার খেয়ে, দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে রওনা হতে সাতটা বেজে গেল। চারিদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে নন্দাদেবীর জয়গান গেয়ে আমরা যাত্রা শুরু করি।

বীর বিদায় জানায় আমাদের। কুলিরাও তার সঙ্গে হাত নাড়ে। তিন জন কুলি কেবল চলেছে সঙ্গে। তারা আমাদের খাবার, ওয়াটারপ্রুফ ও দড়ি বইছে। বাকি কুলিদের নিয়ে বীর আজ এখানেই থাকবে। গোয়ালদাম থেকে পদযাত্রা আরম্ভ করার পরে এই প্রথমে বীরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল।

রামচাঁদ চলেছে আগে। তার পেছনে সারি বেঁধে পথ চলেছি আমরা। কমলবনের ভেতর দিয়ে পথ। কুলিরা কয়েকটি ব্রহ্মকমল তুলে নিল। রূপকুণ্ডে বসে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দেব নন্দাদেবীকে।

কমলবনের প্রায় সমতল ছোট প্রান্তরটুকু পেরিয়ে পৌঁছলাম ডানদিকের গিরিশিরার কাছে। পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের ওপরে ওঠা শুরু হল। পাথর আর বরফ। মাঝে মাঝে নরম বরফ। পাথরগুলো প্রায়ই আলগা। পা দিতেই নড়ে উঠছে। সাবধানে পা ফেলে আইস-এক্সে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি আমরা।

'মর্ণিং শোজ দি ডে' কথাটা হিমালয়ে সত্য নয়। হিমালয়ের সকাল দেখে দুপুরকেও আন্দাজ করা যায় না। যে কোন সময় সহসা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতে পারে। তবু গিরি-কান্তারের যাত্রী সুন্দর সকাল দেখলে খুশি হয়। বহুদিনের আশা পূর্ণ হবার দিন আজ। তাই শরতের সুন্দর সকাল আজ আমাদের মনকে আনন্দময় করে তুলছে। নন্দাদেবীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রাপথে এগিয়ে চলেছি আমরা।

চড়াই বাড়ছে, বরফ বাড়ছে। পথ দুর্গম থেকে দুর্গমতর হচ্ছে। অমিতাভ মোহিত ও সুজল চলেছে রামচাঁদের সঙ্গে। ওরা মাঝে মাঝে আইস-এক্স দিয়ে ধাপ কেটে দিচ্ছে। সেই ধাপের ওপর পা ফেলে ফেলে আমরা ওপরে উঠছি।

অনেক ওপরে উঠতে হবে। রূপকুণ্ডের উচ্চতা ১৬,৫০০ ফুট। কিন্তু আমাদের ১৭,০০০ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে তারপরে নেমে যেতে হবে। হুনিয়াথর ১৪,৫০০ ফুট। সেখান থেকে রূপকুণ্ড আড়াই মাইল। আড়াই মাইলে আড়াই হাজার ফুট চড়াই ভাঙ্গতে হবে। এই উচ্চতায় গড়ে মাইলে হাজার ফুট চড়াই ভাঙ্গা খুবই কঠিন। কিন্তু কঠিন বলেই তো এসেছি এখানে।

পথ বন্ধ। আমাদের সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা দেওয়াল। বরফ নয়, পাথরের দেওয়াল। দেওয়ালটা এত খাড়া যে তার গায়ে বরফ জমতে পারে না। পারলে ভাল হত। ধাপ কেটে ওপরে উঠে যাওয়া যেত।

কিন্তু বরফ নেই বলে তো চলা বন্ধ করা যাবে না। দেওয়ালের গায়ে গর্ত ও ফাটল

খুঁজে বের করে, তাতে পা দিয়ে রক্ ক্লাইম্বিং করে, আমরা একে একে উঠে আসি ওপরে।
ত্রিশূল অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। না, ত্রিশূল নয়। ত্রিশূল অচল ও অটল। সে যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। চিরকাল থাকবে ওখানে। ওখানে দাঁড়িয়েই সে মর্ত্যের মানুষকে কাছে ডাকছে। আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তার কাছে এসেছি।
কিছুক্ষণ পরে এসে পৌঁছলাম একটা তুষারাবৃত ছোট প্রান্তরে। নিচে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে ওঠা আপাতত শেষ হয়েছে। এবার আমাদের আড়াআড়ি ভাবে উত্তরে এগিয়ে যেতে হবে। যেতে হবে চননিয়াকোটের পাদদেশে—রূপকুণ্ডে।
প্রান্তরের কোমল তুষারের ওপর বসে বিশ্রাম করি কয়েক মিনিট। ইতিমধ্যে প্রখর রোদ উঠেছে। সূর্যালোক স্ফটিকস্বচ্ছ হিমালয়ে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকে পড়েছে ছড়িয়ে। কালো চশমা পরেও মনে হচ্ছে এত আলো এর আগে কখনও দেখি নি। কেবল আলো নয়, হিমালয়ে যেন আগুন লেগেছে। আমাদের সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে।
একটু বাদেই হাজির হলাম একটা ভয়ানক স্থানে। অনেকটা জায়গা—বিরাট বিরাট ফাটলে বোঝাই। ফাটলগুলির দিকে তাকালে ভয় করে। যেন আমাদের গিলে ফেলবার জন্য হাঁ করে রয়েছে। ডানদিকের পাহাড়ের গায়ে নরম বরফ। সেখান দিয়ে চললে পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রতি পদক্ষেপে। কাজেই আমাদের এই ফাটল এড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
যেখানে ফাটল নেই, সেখানে পা দেবার পরে যে তলিয়ে যাব না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। তাই আমরা কোমরে দড়ি বেঁধে নিলাম। যাতে একজন তলিয়ে গেলে সঙ্গীরা তাকে টেনে তুলতে পারে।
কেউ তলিয়ে গেল না। রামচাঁদের চেনা জায়গা। সে কোন ফাটলকে বাঁদিকে, কোনটিকে ডানদিকে রেখে নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। তার পেছনে আমরা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এলাম সেই ভয়ানক জায়গা।
গিরি-কান্তারের কি বাধার শেষ আছে ? একটি শেষ না হতেই আর একটি সামনে এসে দাঁড়ায়। বিরাট বিরাট পাথরে বোঝাই অনেকটা জায়গা—চড়াই। খুব খাড়া নয়, তবু কষ্টকর। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে বরফ জমে আছে। তাহলেও জায়গাটা প্রস্তরময়। এত উঁচুতে এমন জায়গা বেশি দেখা যায় না। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে অতিক্রম করলাম সেই দুর্গম স্থান।
এলাম সুবিশাল এক তুষারক্ষেত্রের সামনে। ইতিমধ্যে সূর্য অদৃশ্য হয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে।
চড়াই বেয়ে সেই তুষারক্ষেত্রে উঠতে থাকি। বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র। একসময় উঠে আসি তুষারক্ষেত্রের শেষে। এ যাত্রায় উচ্চতম স্থানে উপনীত হয়েছি। এখানকার উচ্চতা ১৭,০০০ ফুট। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আমাদের শিবির। দেখা যাচ্ছে কৈলু বিনায়ক। দেখা যাচ্ছে চননিয়াকোট, ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি, চৌখাম্বা আর অসংখ্য নাম-না-জানা শৃঙ্গ।
আকাশে সূর্য নেই। হিমশীতল জগৎ। অথচ অত্যন্ত গরম লাগছে। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। মাথা ঝিম ঝিম করছে। টুপিটা খুলে মাথায় একটু হাওয়া লাগাই। মাফলারটা ঢিলে করে দিই। ইচ্ছে করছে সোয়েটার খুলে ফেলি। কিন্তু নিমোনিয়ার ভয়ে সাহস পাই না। চারিদিকে যে বরফ ছাড়া আর কিছু নেই।
বিশ্রামশেষে উঠে দাঁড়াই। রামচাঁদকে জিজ্ঞেস করি, "আর কতদূর ?"
রামচাঁদ একটু হাসে। তারপরে সামনের তুষারময় প্রান্তরের দিকে হাত ইশারা করে বলে,

"আর দূর নয়। ঐ তো দেখা যাচ্ছে রূপকুণ্ড।"

"দেখা যাচ্ছে! কোথায়?" সবাই সমস্বরে বলে উঠি।

"ঐ যে।" রামচাঁদ আবার দেখায়। তুষারাবৃত প্রান্তরের শেষে কোন্ অংশটি রূপকুণ্ড ঠিক বুঝতে পারি না। তবে এটা বুঝতে পারি যে রূপকুণ্ড আর দূরে নয়। আমরা দূরকে নিকট করেছি। দুর্গমকে জয় করেছি।

ছিঃ ছিঃ, এত কাছে এসেও এতক্ষণ এভাবে বসে আছি! আমরা ঢালু তুষারময় প্রান্তর পেরিয়ে নিচে নামতে থাকি। আমরা ছুটতে চাই। পারি না। নরম তুষারে পা তলিয়ে যাচ্ছে। হাঁটুসমান বরফের কাদা ভেঙ্গে চলতে হচ্ছে। আমরা রামচাঁদকে অনুসরণ করি। ধীরে ধীরে পথ চলি।

হঠাৎ খেয়াল হয়—ত্রিশূল নেই। কোন্ ফাঁকে সে যেন পালিয়ে গেছে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। একটা টিলার আড়ালে ঢাকা পড়েছে ত্রিশূল। বহুদিন বাদে ওকে হারালাম। অথচ ওর এত কাছে আর কখনও আসি নি।

না না, ত্রিশূলকে হারাবো কেন? ঐ তো ত্রিশূল। টিলা ছাড়িয়ে একটু নেমে আসতেই আবার দৃশ্যমান হয়েছে।

এখান থেকে ডানদিকে একটা ঢালের মতো উঠে গেছে। রামচাঁদ বলল, "ঐটে জিউন্‌রা গলির পথ।"

থমকে দাঁড়াই। ঐ পথ ধরে গেলে পৌঁছনো যাবে ত্রিশূল পর্বতে। ঐ পথেই অভিযাত্রীরা ত্রিশূল পর্বতে অভিযান চালিয়েছেন। এত কাছে এসেও তাঁরা আসেন নি রূপকুণ্ডে।

যাঁদের নিয়ে রূপকুণ্ড তাঁরাও কিন্তু পথেরই যাত্রী ছিলেন। জিউন্‌রা গলি (১৬,৩০৫) দিয়েই যেতে হয় হোমকুণ্ডে—নন্দাযাতের গন্তব্যস্থলে। সেই পরম পবিত্র তীর্থে বসে নন্দাদেবীর উদ্দেশে প্রণতি জানাবার জন্য যুগে যুগে মানুষ ছুটে এসেছে এই গিরি-কান্তারে।

যতদূর জানা যায় মহাভারতের যুগেও নন্দাযাতের প্রচলন ছিল। এমন কি পাণ্ডবরা পর্যন্ত এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুগে যুগে এই যাত্রা শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। গুপ্তযুগে (৪র্থ থেকে ৮ম শতাব্দী) নন্দাযাত বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হর্ষবর্ধন (৬০৭-৬৫৭ খৃঃ) নন্দাযাতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বানভট্টের হর্ষচরিতে এর উল্লেখ আছে। গুপ্ত-পরবর্তীযুগেও এই যাত্রার জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কমে যায় নি। কাত্যুরী রাজারা 'নন্দা-ভাগবতী-চরণ-কমল-কমলা-সনাথমূর্তি' নামে নিজেদের অভিহিত করেছেন।

মুসলমান আমলে স্বাভাবিক ভাবেই সমতল থেকে নন্দাযাত্রা আসা কমে যায়। কিন্তু ইংরেজ আমলে আবার সমতলবাসীরা যাত্রায় অংশ নিতে শুরু করেন। অ্যাটকিন্‌সন দেখেছেন (১৮৮২ খৃঃ) নন্দাষ্টমীতে শিব-পার্বতীর বিবাহবার্ষিকী পালিত হয়। তখন গাড়োয়ালের চাঁদপুর পরগণার নউটি গ্রাম থেকে প্রতি বছর একটি শোভাযাত্রা বের হত। পালকিতে করে নন্দাদেবীকে নিয়ে আসা হত বৈদিনী কুণ্ডে। সেখানে মহাসমারোহে দেবীপূজা অনুষ্ঠিত হত। বারো বছর বাদে বিশেষ যাত্রা হত। সেই যাত্রায় নন্দাদেবীর সেবিকা লাটুদেবীকেও সঙ্গে নেওয়া হত। নউটিতে লাটুদেবীর একটি মন্দির আছে। এই যাত্রায় বৈদিনী কুণ্ড ছাড়িয়ে যতদূর সম্ভব নন্দাদেবীকে নিয়ে যাওয়া হত। তাঁরা বোধ হয় হোমকুণ্ডে পৌঁছতে চাইতেন। কিন্তু অধিকাংশ বারই তা সম্ভব হত না। যাই হোক, তাঁরা যে পর্যন্ত যেতে পারতেন, সেখানে অভ্রমিশ্রিত দুটি শিলাকে দেবীরূপে পূজা করতেন। সূর্যকিরণে সেই অভ্রশিলা জ্বল-জ্বল করত।

ইংরেজ আমলের আগে কিছুকাল শোভাযাত্রার শেষে নন্দাদেবীর উদ্দেশে নরবলি দেওয়া

হত। উত্তর গাড়োয়ালের দুধাতৌলি অঞ্চলে এখনও নাকি এই নরবলির প্রচলন আছে। সেখানকার কোন কোন গ্রামে এর একটি বিকল্প প্রথা আছে। বারো বছর বাদে বয়স্ক ব্যক্তিরা একত্র হয়ে একজন অতি বৃদ্ধকে নন্দাদেবীর উৎসর্গরূপে নির্বাচিত করেন। সাধারণতঃ ঐ বৃদ্ধ নিজেই নির্বাচিত হতে চান। নির্বাচনের পরে বৃদ্ধ চুল ও নখ কেটে স্নান করেন। তারপর তিলক কাটেন। চাল ডাল, হলুদ ফুল, যব ও জল মিশিয়ে তার মাথায় ঢেলে দেওয়া হয়। ব্যস, সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘুচে গেল। সেদিন থেকে তাঁর আলাদা বাড়ি। তিনি তখন থেকে স্বপাক ও একাহারী। বৃদ্ধের আত্মীয়রা তাড়াতাড়ি করে তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে ফেলেন। কারণ তাঁদের কাছে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বৃদ্ধ কিন্তু সত্যসত্যই বছরখানেকের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অ্যাটকিন্‌সন কুমায়ুনের রণচুলা ও ভাগর এবং গাড়োয়ালে কুরুর, ননৌরা, হিন্দোল, সেমলী, সিং, তল্লীধুরা, নউটি ও গৌড় গ্রামে নন্দাদেবীর মন্দির দেখেছেন।

কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালীরা উচ্চস্থানেই নন্দাদেবীর পুজো করে থাকেন। এই পুজোই তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। কোন কোন গ্রামে পুজোর সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে আসা হয়। ভ্রাতৃবধূরা তাদের কাপড় ও দক্ষিণা দেন। অর্থাৎ নন্দাপুজোর সঙ্গে ননদপুজাও করা হয়।

এদেশের মানুষের ধারণা নউটি ছিল নন্দাদেবীর বাপের বাড়ি। বারো বছর বাদে নন্দা শ্বশুরবাড়ি যেতেন। কৈলাসের পথে হোমকুণ্ডে নন্দা হোম করেছিলেন। তাই বারো বছর বাদে নন্দাযাত হয়। টিহরীরাজ এই যাত্রার অর্ধেক খরচ দেন। বাকি অর্ধেক চাঁদা তোলা হয়। গাড়োয়াল কুমায়ুনের সব জায়গা থেকে, এমন কি হরিদ্বার থেকে পর্যন্ত যাত্রী আসেন। বৈদিক তান্ত্রিক ও শৈবরা একসঙ্গে পথ চলেন। চৌসিঙ্গা খাড়ু বা চার শিংওয়ালা একটি ভেড়া যোগাড় করা হয়। কাপড় গয়না চাল চিঁড়ে গমের অঙ্কুর কাঁকুড় ডালিম কমলালেবু প্রভৃতি সেই ভেড়ার পিঠে চাপিয়ে, তার পেছন পেছন যাত্রীরা পথ চলেন। ওয়ান থেকে নন্দাদেবীর সেবিকা লাটুদেবীকে সঙ্গে নেওয়া হয়। ভেড়াটি যে পর্যন্ত আসতে পারে, যাত্রীরাও সে পর্যন্ত আসে। এক সময় দেখা যায় পথশ্রমে ক্লান্ত ভেড়াটি পথের ওপর বসে পড়েছে। আর সে উঠতে পারে না। যাত্রাও শেষ হয়। যাত্রীরা ফিরে চলে ঘরে। ফলে অধিকাংশ বারই বৈদিনীতে যাত্রা শেষ হয়ে যায়। বড় জোর পাথরনাচুনি পর্যন্ত আসে।

কিন্তু এ নিয়মটি হাল-আমলের। যে আমলে মানুষ আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছে। তার আগের যুগে ভেড়া ছাড়াই তীর্থযাত্রীরা এসেছেন এ পথে। পৌঁছেছেন রূপকুণ্ড ও হেমকুণ্ডের তীরে।

হোমকুণ্ডের উদ্দেশেই যাত্রা করেছিলেন কনৌজরাজ যশোদয়াল। রানী বল্লভা সকলের নিষেধ অমান্য করে স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিলেন। পাত্র-মিত্র সৈন্য-সামন্ত দাস-দাসী নিয়ে রাজা রওনা হয়েছিলেন হোমকুণ্ডে। পথশ্রমে ক্লান্ত বল্লভার অসময়ে প্রসব-বেদনা দেখা দেয়। রানীকা সুলেরায় সন্তান প্রসব করেছিলেন তিনি। ওঁরা বলেন, রাণী বল্লভা কলুষিত করেছিলেন এই পুণ্যভূমিকে। তাই ক্রুদ্ধা হয়েছিলেন নন্দাদেবী। নন্দাদেবীর রোষে ধ্বংস হয়েছেন রাজা-রানী আর তাঁদের সহযাত্রীরা।

কথাটা মেনে নিতে পারি না। মানুষের জন্য যদি তীর্থ, তবে মানুষের মানসী কেন আসতে পারবে না তীর্থে? আমাদের ধর্ম তো সুদূর অতীত থেকেই সর্বকর্মে নারীর সমান অধিকার মেনে নিয়েছে। নারী তো কেবল প্রেয়সী নয়, সে যে সহধর্মিণী। তাই জানকী বনবাসী

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গিনী হয়েছিলেন। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য হয়তো হয়, কিন্তু সতী যদি পতির সঙ্গে তীর্থে আসে, তাহলে তার অন্যায় কোথায় ?

আর সন্তানধারণ ? সে তো রমণীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, নারীজন্মের পরম সার্থকতা। নন্দাদেবী নিজেও যে জননী। এই পুণ্যভূমিতে রানী বল্লভা যে সন্তানকে জন্মদান করেছিলেন, সে তো দেবশিশু, পাপের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় ? তাহলে তার আবির্ভাবে পুণ্যভূমি কলুষিত হবে কেন ?

পাপ নয়, পুণ্য। সার্থক জন্ম সেই পুণ্যার্থীদের। মৃত্যু তো মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু এমন গৌরবময় মৃত্যু কজনে বরণ করতে পারেন। সেকালে মানুষ কত কষ্ট করে মহাপন্থায় গমন করতেন। আর বিনা কষ্টে নন্দাদেবীর কৃপায় তাঁরা এখানে মহাপ্রয়াণ লাভ করেছেন। রূপকুণ্ড পরিণত হয়েছে পুণ্যতীর্থে।

জানি অনেকে আপত্তি জানাবেন। বলবেন রূপকুণ্ড তীর্থ নয়। হোমকুণ্ড যাত্রীরা এখানে এসে রাতের আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র। আর সেই রাতেই প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। তাঁরা মারা যান।

কথাটা মিথ্যে নয়। তবু তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। উচ্চ-হিমালয়ের যেখানে জল আছে, সেখানেই গড়ে উঠেছে তীর্থ। নন্দাযাত্রীরা রূপকুণ্ডে স্নান করে হোমকুণ্ডে যেতেন। কারণ হোমকুণ্ডে জল নেই, আছে তিনখানি শিলা। সেই শিলার ওপরে দাঁড়িয়ে দেবী নন্দা হোম করেছিলেন বলেই নাম হয়েছে হোমকুণ্ড। তাহলে হোমকুণ্ডের পুণ্যস্নানক্ষেত্র রূপকুণ্ড তীর্থ হবে না কেন ?

সব চেয়ে বড় কথা এতগুলি মহৎ মানুষ যেখানে মহাপ্রয়াণ লাভ করলেন, সেই পরম পবিত্র স্থান তীর্থ নয় তো কি ? পরেশনাথ যদি তীর্থ হতে পারে, রূপকুণ্ড তীর্থ নয় কেন ? মানুষের জন্য যদি তীর্থ, তবে রূপকুণ্ড মহাতীর্থ।

জিউনরা গলির পথকে ডানদিকে রেখে আমরা এগিয়ে চলি তীর্থপথে। কিছুদূর এগিয়ে বাঁদিকে নামতে থাকি। বরফ ক্রমেই শক্ত হচ্ছে। চলতে পরিশ্রম কম হচ্ছে, কিন্তু জোরে চলতে গেলেই পা ফস্‌কে যাচ্ছে।

আমাদের ঠিক সামনে চননিয়াকোট। ১৬,৫৮৬ ফুট উঁচু একটি বিচিত্র পাহাড়। বিচিত্র এইজন্য যে, এ উচ্চতায় এমন সাদা আর কালোয় মেশানো পাহাড় বড় একটা দেখা যায় না। এখানে সবই সাদা—পাহাড় সাদা, প্রান্তর সাদা। তাই চননিয়াকোট যেন চারিদিকের মধ্যে খাপছাড়া। ওর গায়ের কালো দাগগুলি বিস্ময়কর। কিন্তু কেন এই কলঙ্কচিহ্ন ?

রাজা যশোদয়ালের সহযাত্রীরা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন রূপকুণ্ডের তীরে। নন্দাদেবীর পুজো দিয়ে তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সহসা ত্রিশূল সংহারমূর্তি ধারণ করেছিলেন। যাঁরা নন্দাযাতে অংশ নেন তাঁরা সবাই জানেন—এ যাত্রা অন্তিমযাত্রায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু মৃত্যুভয়হীন হলেও তীর্থযাত্রীরা তো মানুষ। মানুষ সহজে মরণকে মেনে নেয় না। তাই বিভ্রান্ত যাত্রীরা ছুটে গিয়েছিলেন চননিয়াকোটের কাছে। রক্তাপ্লুত দেহে তাকে জড়িয়ে ধরে করুণ কণ্ঠে বলেছিলেন—তুমি ত্রিশূলকে শান্ত করো।

কিন্তু চননিয়াকোটের সাধ্য কি সে শান্ত করে ত্রিশূলকে ! অসহায় চননিয়াকোট সেদিন কেবল নীরবে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুধু দেখেছিল পুণ্যার্থী মানুষের মহাপ্রয়াণ।

তাঁরা কেউ নেই। কিন্তু আছে তাঁদের সেই রক্তলেখা। আছে চননিয়াকোটের গায়ে—কলঙ্কচিহ্ন রূপে। তাই সাদার জগতে বাস করেও সে এমন কালো।

"হুঁশিয়ার !" রামচাঁদ সাবধান করে। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। ধীরে ধীরে পা ফেলি।

কুয়াশা ঘন হচ্ছে। ঝড়ের পূর্বাভাস কি ? হতে পারে। ঝড় উঠেছিল সাড়ে ছ'শ বছর আগে। আজও উঠতে পারে বৈকি। কিন্তু ঝড়ের ভয়ে ভীত হলে তো গিরি-কান্তারের পথে পা বাড়ানো যায় না। ঘরে বসে হিমালয়ের স্বপ্ন দেখতে হয়।

যুগে যুগে যে সব যাত্রী গিরিতীর্থ পরিক্রমায় এসেছেন, কি সম্বল ছিল তাঁদের ? ছিল না আমাদের মতো সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছদ আর অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক। কেবলমাত্র ভক্তির ডালি পূর্ণ করে তাঁরা এই দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছেন। কেউ ফিরে গেছেন, কেউ বা ফিরতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের কেউ বিফলকাম হন নি। তাঁরা সবাই আমাদের পথিকৃৎ। তাঁদের স্মৃতি আমাদের শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

সহসা চলা বন্ধ করে রামচাঁদ। আমার বিস্মিত হই। তার দিকে তাকাই। সে হাসে। ব্যস্ত হয় মোহিত। বলে, "থামলে কেন ?"

রামচাঁদ আবার হাসে। সহাস্যে বলে, "আমরা এসে গেছি।"

"কোথায় ?"

"রূপকুণ্ডে।"

চমকে উঠি। চারিদিকে তাকাই। কোথায় কুণ্ড ? এ তো কেবলই বরফ। জলের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ছে না। তুষারাবৃত প্রান্তরটি আমাদের পায়ের কাছ থেকে সহসা ঢালু হয়ে গেছে। একটি প্রায় গোলাকার তুষারময় পর্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা।

সেই পর্যাঙ্কটিকে দেখিয়েই রামচাঁদ বলে, "ঐ হচ্ছে কুণ্ড।"

"জল কোথায় ?" অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

"নেই। বরফ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু বীরেনদার বইতে পড়েছি ১৫০ থেকে ২৫০ ফুট ব্যাসের একটি জলাশয় রূপকুণ্ড। ছবি দেখেছি—কুণ্ডের চারিদিকে খাড়া পাথরের দেওয়াল, তীরে ছোট-বড় পাথরের ছড়াছড়ি। সে-সব কোথায় ?" মোহিত বলে।

"সব ঢেকে গেছে বরফে।"

"তাহলে যে আমরা কিছুই দেখতে পাবো না।" নেতা নিরাশ কণ্ঠে বলে।

"জী।"

ছোট্ট উত্তর। কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত করে সবাইকে। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারি না। তারপরে অমিতাভ বলে, "তুমি তো জানো কোথায় আছে। বরফ খুঁড়ে অন্তত দু-একটি দেহাবশেষ বের করা যায় না ?"

"না। কম করেও দশ-বারো ফুট বরফ জমেছে।"

"তাহলে বৃথাই আমাদের এখানে আসা। বিফল হল আমাদের যাত্রা।" অসিত মুষড়ে পড়ে।

রামচাঁদ চুপ করে থাকে। ব্যর্থতার গ্লানি সবাইকে শব্দহীন করে ফেলেছে। করুণ নয়নে আমরা তাকিয়ে আছি তুষারাবৃত রূপকুণ্ডের দিকে।

সত্যই কি আমরা ব্যর্থকাম ? আমাদের যাত্রা কি বিফল হল ? আমরা কি বৃথাই গিরি-কান্তার পরিক্রমা করলাম ?

না। দুর্গম পথের সকল বাধাকে অতিক্রম করে, দুস্তর প্রান্তরের সকল বিপদকে জয় করে আমরা আজ আসতে পেরেছি রূপকুণ্ডের তীরে। প্রণতি জানাতে পারছি সেই মরণজয়ী

তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশে। তাঁদের দেহাবশেষ দেখতে পেলাম না, কিন্তু পেলাম তাঁদের প্রাণের পুণ্যস্পর্শ। তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করছেন। কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলছেন—সার্থক আমাদের মহাপ্রয়াণ। মর্ত্যের মানুষ বিস্মৃত হয় নি আমাদের।

কি হত তাঁদের সেই বিকৃত দেহাবশেষ, অলঙ্কার কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে? আমরা নৃতাত্ত্বিক নই, আমরা তীর্থযাত্রী।

তার চেয়ে এই ভাল হল। পুণ্যার্থীদের ভয়াবহ পরিণতির সঙ্গে পরিচিত হতে হল না, অথচ রূপকুণ্ড দর্শন হল। তাঁদের প্রাণের পুণ্যস্পর্শে আমাদের জীবন ধন্য হল।

রামচাঁদের সঙ্গে আমরা সেই পর্যাঙ্কের ভেতরে নেমে আসি খানিকটা। মরণজয়ী যাত্রীদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি। তারপরে সুজল পুজোয় বসে। সে ব্রহ্মকমল আর চকোলেট উৎসর্গ করে দেবী নন্দার শ্রীচরণে।

পুজোশেষে প্রণাম করি নন্দাদেবীকে, প্রণাম করি ত্রিশূল আর নন্দাঘুণ্টিকে। তাঁদের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করি—তোমরা মৃত্যুঞ্জয়ী তীর্থযাত্রীদের স্বর্গগত আত্মাকে শান্তি দাও। রূপকুণ্ড রূপান্তরিত হোক মহাতীর্থে। সেই মহামানবদের আত্মত্যাগ সার্থক হোক।